

অচেনা পথের যাত্রী

শিল্পী—শ্রীরামেশ্বর প্রসাদ

BLOCKS BY BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.] [Emerald Ptg. Works.



ফাল্গুন, ১৩২৭

দ্বিতীয় খণ্ড] অষ্টম বর্ষ

শ্রীমৎ ভাগবত-পুরাণ ও ভক্তিতত্ত্ব

[শ্রীঅটলবিহারী সিংহ, বি-এল]

স্ত দর্শন-শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় য, তাহা দুঃখবাদে পরিপূর্ণ—তাহাদের ভিত্তিমূল দুঃখবাদের পরই প্রোথিত; এবং সমূহ দর্শনের মতে, দুঃখ-হানিই বের পরম পুরুষার্থ;—দুঃখ-হানির প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনই র্শন ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। আত্যন্তিক দুঃখনাশই জীবের ক্তি। ভিন্ন-ভিন্ন দর্শন এই দুঃখনাশের জন্য বিভিন্ন কারের উপায় অবলম্বন করিয়াছেন,—ইহা সর্ব্ববাদি-ক।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার সম্যক্ আলোচনা করিলেও আমরা খিতে পাই যে, গীতাও সর্ব্বতোভাবে দুঃখবাদের অবতারণা রিয়াছেন;—গীতাও বলিয়াছেন যে, সংসার দুঃখময়—সার ক্ষণভঙ্গুর ও দুঃখের আলয়:—

"মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।"

(গীতা ৮।১৫)

"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।"

(গীতা ৯,৩৩)

"তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু সংসারসাগরাৎ"

(গীতা ১২।৭)

"অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যু সংসার বর্ত্মনি"

(গীতা ৯।৩)

"জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্।"

(গীতা ১৩।৯)

"আমাকে প্রাপ্ত হইলে, আর দুঃখের আলয় ক্ষণভঙ্গুর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইতে হয় না।"

"অনিত্য ও অসুখকর এই লোক প্রাপ্ত হইয়া কেবল আমারই ভজনা কর।"

"এই মৃত্যু-গ্রস্ত সংসার-সমুদ্র হইতে আমিই তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকি।"

.াইয়া এই মৃত্যু-পীড়িত সংসার-

াধি-দুঃখজনিত যে দোষ তাহার জ্ঞানী ব্যক্তি এই সংসারকে জন্ম-মৃত্যু-ও দুঃখ-দোষ-দুষ্ট বলিয়া মনে করেন। ক্লেশ বা দুঃখের আত্যন্তিকতা নিবারণের করিয়াছেন। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের উপায় ক্ত উপায়গুলি বিভিন্ন প্রকারের; অর্থাৎ, ঃখের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ কিছুই নাই। াস্ত্রের কেন্দ্রস্থল ঈশ্বর। গীতার মত— নিযোগ ও ধ্যানযোগ অবলম্বন করিতে বানের সহিত সংযুক্ত হইতে পারা যায়; লই জীবের আত্যন্তিক দুঃখনাশ হইয়া এই তিনটী যোগের সহিতই ভক্তিযোগ হইবে; নচেৎ তাঁহাকে পাইবার জন্য কোন তাঁহার প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি ব্যতিরেকে, ়তে উত্তীর্ণ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। াতে বলিয়াছেন,—

ণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
।প্তন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

(গীতা ৭।১৪)

"এই গুণময়ী মায়া আমার দৈবী-প্রকৃতি; ইহা অতিশয় দুস্তরণীয়। যিনি আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।"

এই মায়ার প্রভাবেই জীবের অবিদ্যাজনিত বন্ধন— এই মায়া অতিক্রম করিতে পারিলে তবেই জীবের মুক্তি ও আত্যন্তিক সুখ। এই মায়া অতিক্রম করিতে হইলে ভগবানকে পাওয়া চাই। তাঁহাকে পাইবার বিভিন্ন পথ বা মার্গের উল্লেখ করিয়া, গীতা সার সত্য নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতেছেন যে, এই সকল পথেই কেবল মাত্র ভগবানে অচলা ভক্তি চাই। ইহাই গীতার সার মর্ম্ম। আদ্যোপান্ত গীতা পাঠ করিলে ইহা হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, এই ভক্তি-তত্ত্বই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য। গীতা নানা স্থানে ভক্তিকেই ঈশ্বর-প্রাপ্তির মুখ্য উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন;—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"

(গীতা ৯।

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥"

(গীতা ১

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥
মৎকর্ম্মকৃৎ মৎ পরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডবঃ॥"

(গীতা ১১।৫৪-

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাং।
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥"

(গীতা ১২।৬-

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুদ্ধ্য চ।
মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥"

(গীতা ৮।৭-৮

"কবিং পুরাণং অনুশাসিতারং
অণোরণীয়াংস মনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
প্রয়াণ কালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥"

(গীতা ৮।৯-১০

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

(গীতা ৮।১৪)

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততং ॥"
(গীতা ৮।২২)

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥"
(গীতা ১৪।২৬)

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥"
(গীতা ১১।৫৪)

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং ॥"
(গীতা ৯।২২)

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং ॥
(গীতা ৯।২৭)

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাং অনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥"
(গীতা ৯।৩০-৩১)

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥"
(গীতা ৯।৩৪)

"সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণোমদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥"
(গীতা ১৮।৫৬)

"যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ব বিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥
(গীতা ১৫।১৯)

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ
(গীতা ১৮।৬৬)

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥"
(গীতা ১৮।৫৫)

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥"
(গীতা ১০।১০-১১)

"আমাতেই মন অর্পণ কর, আমারই ভক্ত হও, আমারই ভজনা কর, আমাকেই নমস্কার কর, আমারই সেবায় রত থাক—এই প্রকারে আপনার আত্মাকে আমার সহিত যুক্ত করিতে পারিলে, আমাকে প্রাপ্ত হইবে, আমার সহিত মিলিত হইবে।"

"যাঁহারা মদগতচিত্ত, যাঁহারা আমাতেই প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা আমার কথা কীর্ত্তন করিয়া, আমার গুণগান করিয়া এবং পরস্পরকে আমার কথা বুঝাইয়া দিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন, এবং অবশেষে নিরতিশয় সুখ লাভ করেন।"

"হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি-দ্বারাই এবম্ভূত আমাকে স্বরূপতঃ দেখিতে ও জানিতে পারা যায়; এবং অবশেষে আমাতেই প্রবেশ করিতে পারা যায়। অতএব হে পাণ্ডব! যে আমার কর্ম্ম করিয়া থাকে, আমিই যাহার পরম আশ্রয়, যে আমার ভক্ত, যে ভক্ত আসক্তি-শূন্য এবং সর্ব্বভূতে বৈরীভাববিরহিত, সেই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

"যাহারা সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, অনন্যা যোগ সহকারে আমারই ধ্যান করে ও আমারই উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে অচিরে মৃত্যু-সংসার-সঙ্কুল সাগর হইতে উদ্ধার করি; কেন না, তাহারা কেবল মাত্র আমাতেই চিত্ত অর্পণ করিয়াছে। অতএব তুমি আমাতেই তোমার মন সমর্পণ কর, আমাতেই তোমার বুদ্ধি স্থাপন কর। তাহা হইলে তোমার দেহান্তে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে ও আমাতেই বাস করিতে পারিবে।"

"অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সকল সময়ে আমাকে স্মরণ করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, অর্থাৎ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর। কেন না, মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পণ করিলে, নিঃসংশয়ে আমাকেই পাইবে। হে পার্থ! অভ্যাসযোগের দ্বারা যুক্ত

হইয়া অনন্যগামী চিত্তের সাহায্যে দিব্যপুরুষকে চিন্তা করিলে, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

"যিনি কবি অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, পুরাতন, নিয়ন্তা, অণু হইতেও অণু, স্মৃতি সূক্ষ্ম, সকলের ধাতা, অচিন্ত্যরূপ, আদিত্য বর্ণ, তমসের পরপারে অবস্থিত পুরুষকে মৃত্যুকালে নিশ্চল মনে ভক্তিযুক্ত হইয়া, যোগবলে আপনার ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণ-বায়ুকে সুস্থির করিয়া ধ্যান করিতে পারেন, তিনিই সেই দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন।"

"যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া নিত্যই আমাকে স্মরণ করেন, নিত্যযুক্ত সেই যোগীর পক্ষে আমি নিরতিশয় সুলভ হইয়া থাকি।"

"হে পার্থ! যাঁহার দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত—চরাচর-সমূহ জগৎ যাঁহাতে অবস্থিত, সেই সর্ব্বব্যাপী পরম পুরুষকে কেবল একমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়।"

"আমাকে যে সাধক অব্যভিচারী ভক্তিযোগের দ্বারা সেবা করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভূত হইয়া থাকেন।"

"হে অর্জ্জুন! কেবল একমতি অনন্যা ভক্তি দ্বারাই সাধক এবম্ভূত আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে, দেখিতে ও প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।"

"যাঁহারা অনন্য চিন্তা দ্বারা আমার সেবা করিয়া থাকেন, সেই সকল নিত্যযুক্ত সাধকের যোগক্ষেম আমিই নিজ মস্তকে বহন করিয়া থাকি।"

"হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভক্ষণ কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমূহই তুমি আমাকে অর্পণ করিও।"

"যদি নিরতিশয় দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যভক্তি হইয়া আমার ভজনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সাধু বলিয়া গণনা করিতে হইবে। কেন না, তিনি সম্যক্ ব্যসিত, তিনি অচিরেই ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিরন্তর শান্তি উপভোগ করেন।"

"আমাতেই মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকেই যজন কর, আমাকেই প্রণাম কর। এই প্রকারে মদেক-পরায়ণ হইয়া যোগযুক্ত হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।"

"আমাকে আশ্রয় করিয়া সকল কর্ম্ম করিলে আমার প্রসাদে সনাতন অব্যয়পদ প্রাপ্ত হইবে।"

"যিনি মোহবিনির্মুক্ত হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সর্ব্বভাবে আমারই ভ করেন।"

"আমাতেই যিনি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি আ প্রসাদে সকল দুর্গই অতিক্রম করিয়া থাকেন; অ তিনি মায়াতীত হন্।"

"তুমি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল একম আমারই শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে সকল পা হইতে মোচন করিব। তুমি শোক করিও না।"

"আমি স্বরূপতঃ যে প্রকারের, তাহা কেবল মাত্র ভা দ্বারাই জানা যায়। তৎপরে সাধক আমার স্বরূপ অবগ হইয়া আমাতেই প্রবেশ করিয়া থাকেন।"

"যে সকল সাধক সতত আমাতে অর্পিত-চিত্ত, এ প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকেই প্রা হন্। তাঁহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আমি আত্মভা অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া, উজ্জ্বল জ্ঞানদীপের দ্বার তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করি।"

উদ্ধৃত শ্লোকাবলী হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, গীতা ভক্তিকেই মায়া-তরণের তরণীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং ভক্তিকে নিরতিশয় মুখ্য স্থান প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সে ভক্তি জ্ঞান, কর্ম্ম, ধ্যান-বিবর্জ্জিত ভক্তি নহে; পরন্তু, সেই ভক্তির সহিত জ্ঞান কর্ম্ম ও ধ্যান এক অপূর্ব্ব সমন্বয়-সূত্রে গ্রথিত। এই ত্রিবিধ যোগের সহিত ভক্তি অনুস্যূত। জ্ঞানী জ্ঞানমার্গে বিচরণ করুন—কর্ম্মী কর্ম্ম-মার্গে বিচরণ করুন—যোগী ধ্যানমার্গে বিচরণ করুন; কিন্তু এই সকল মার্গেই অব্যভিচারিণী ভক্তি চাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভক্ত সাধক বা ভগবদ্ভক্ত উচ্চতম জ্ঞানের অধিকারী হন।

"তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

(গীতা ১১।১০)

ভগবদ্ভক্ত শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের অধিকারী; তিনি নিষ্কর্ম্মা নহেন—

"মৎ কর্ম্ম কৃৎ মৎ পরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"

(গীতা ১১।৫৫

আর ভগবদ্ভক্ত ধ্যানযোগেও বিরক্ত নন্—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥"

(গীতা ৯।৩৪)।

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥"

(গীতা ১২।৬)।

অতএব গীতায় অনুমোদিত ভক্তি জ্ঞান-কর্ম্ম ধ্যান-সমন্বিত ভক্তি।

এই ভক্তিতত্ত্ব অতিশয় জটিল—ইহার প্রকৃত মীমাংসা সহজসাধ্য নহে। বিশিষ্ট রূপে আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, এই ভক্তিতত্ত্বের মূল বীজ বা অঙ্কুর উপনিষদে;—দর্শনশাস্ত্রে ইহার অভাব—মহাভারতে, গীতাতে ইহা পল্লবিত। আবার আমরা যখন শ্রীমদ্ভাগবত বিশিষ্ট রূপে আলোচনা করিব, ত দেখিতে পাইব যে, এই ভক্তিতত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সর্ব্বতোভাবে প্রস্ফুটিত। ভগবান যেমন সচ্চিদানন্দ জীবও তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ। প্রভেদ এই যে, জীবের সৎভাব, চিৎভাব ও আনন্দ ভাব অব্যক্ত। কিন্তু ভগবানের তাহা নহে। তাঁহার এই ভাবগুলি সুব্যক্ত। জীবের এই তিনটী ভাবকে ক্রমশঃ বিকশিত করিতে হইবে। জীবের যখন আনন্দময় ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইবে—যখন তাহার আনন্দময় কোষের সম্পূর্ণ বিকাশ হইবে, তখনই নির্ম্মলা ভক্তির আবির্ভাব হওয়া সম্ভব। এই ভক্তির শিক্ষা—এই ভক্তির কথা,—এ যে আনন্দময় রাজ্যের কথা—এ যে স্থূল জগতের কথা নয়। স্থূল জগতের ভাষায় ইহার প্রকৃত অভিব্যক্তি হইতে পারে না। তাই সময়-সময় আমরা ভ্রমপ্রমাদে পতিত হই—তাই আমরা অনেক সময়ে পুরাণের প্রকৃত অর্থ বোধ করিতে পারি না—এমন কি, বিকৃত অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার অঙ্কুর উপনিষদে; ইহার অভাব দর্শনে; মহাভারতে ইহার উন্মেষ;—এবং পরে দেখিব, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে ইহার পরাকাষ্ঠা। মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ কেবল মাত্র আখ্যায়িকা বা উপন্যাস বা কবির কল্পনা বলিয়া যেন মনে না হয়। আমরা বেদব্যাসের বাক্যেই দেখিতে পাই যে, মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ পঞ্চম বেদ বলিয়া পরিগণিত।

"ইতিহাস পুরাণঞ্চ পঞ্চমে বেদ উচ্যতে।"

(ভাগবত ১।৪।২০)।

"ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ বলিয়া পরিগণিত। এবং আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সর্ব্ববেদের সার—

"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণাং ব্রহ্মসম্মিতং।"

(ভাগবত ১।৩।৪০)।

"এই ভাগবত পুরাণ ব্রহ্ম সম্মিত অর্থাৎ সর্ব্ব বেদতুল্য।"

তদিদং গ্রাহয়ামাস সুত মাত্মবতাম্বরং।
সর্ব্ব বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতঃ ॥

(ভাগবত ১।৩।৪১)।

"মহর্ষি বেদব্যাস, সর্ব্ববেদ এবং ইতিহাসের সার উদ্ধার করিয়া আপন পুত্র ধীর শ্রেষ্ঠ শুকদেবকে এই ভাগবত পুরাণ উপদেশ দিয়াছিলেন।"

অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যিনি লোক-পরম্পরায় যজ্ঞ প্রচলিত করিবার জন্য এক বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়াছিলেন—যাঁহারই কৃপায় ইতিহাস পুরাণাদি পঞ্চম বেদরূপে পরিণত হইল; যাঁহার কৃপায় মহাভারতের অন্তর্গত ভগবৎ-গীতারূপ উপনিষদে, ভক্তি-সমন্বিত জ্ঞান-কর্ম্ম-ধ্যান-যোগের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদত্ত হইল, সেই বেদব্যাসের কৃপাতেই, জগতে পঞ্চম বেদ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ আবিষ্কৃত হইল; সেই ভাগবত-পুরাণ-স্বরূপ কল্পবৃক্ষের ফল—ভক্তি !!! কিরূপ ভক্তি ?

"আত্মারামাশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থাঅপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥"

(ভাগবত ১।৭।১০)

"যাহারা আত্মারাম—যাঁহাদের হৃদয়-গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হইয়াছে, এবম্প্রকার মুনিগণ, উরুক্রম ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করেন। হরির এমনই গুণ—।"

এই ভাগবৎ শাস্ত্র সর্ব্বপুরুষার্থ প্রদায়ক বেদরূপ কল্প-বৃক্ষের ফল, শুক-মুখ হইতে গলিত হইয়া ধরণীমণ্ডলে অখণ্ডরূপে পতিত হইয়াছে।"

"নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং।
শুকমুখাৎ অমৃতং দ্রবসংযুতং ॥" (ভাগবত ১।১।৩)

অতএব ভাগবত পুরাণ যে বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল, ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

মেঘনাদ

[শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল]

১৩

সেই দিন সকালবেলায় যোগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে ইনস্পেক্টর সদরবাবু এবং কোর্ট-ইনস্পেক্টর সুকুমারবাবু বসিয়া, তাঁহার সঙ্গে মনোরমার মোকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন।

সুকুমারবাবু বলিতেছিলেন যে, জেলের হাজতে যে বুড়ী মেঘনাদ ও মনোরমার প্রেমসম্ভাষণ দেখিয়াছিল, তাহাকে দিয়া আজ সাক্ষ্য দেওয়াইবেন। মেঘনাদের জবানবন্দীটা নষ্ট করিতে না পারিলে সুবিধা হইবে না।

যোগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "মিথ্যে কেন ময়লা ঘাঁটা—ও বুড়ীকে বিশ্বাস ক'রছে কে? আপনি ওকে যে এই সাক্ষ্য দেওয়াবার জন্যই চক্রান্ত ক'রে হাজতে ঢুকিয়েছিলেন, এ কথা যদি প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, তবে আপনার সাক্ষী দাঁড়াবে কোথায়?"

সুকুমারবাবু বলিলেন, "সে প্রকাশ হ'বার কোনও সম্ভাবনাই নেই। আর তা' হ'লেও, এ রকম একটা suggestion আমাদের পক্ষে থাকা দরকার। তা' না হ'লে মেঘনাদবাবুর সাক্ষ্য আমাদের ভয়ানক বিরুদ্ধ হ'য়ে রইল যে।"

যোগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, মেঘনাদ না হয় গেল। আর একটা ডাক্তারও যে সেই কথা ব'লে গেছে, তা'র কি ক'রছেন।"

"সে প্রাইভেট ডাক্তার। সরকারী ডাক্তারের সাক্ষ্যে যতটা জোর হ'বে, তা'র সাক্ষ্যে ততটা হ'বে না। তা ছাড়া, এ evidenceএর বিরুদ্ধে তো আমাদের লড়্‌তে হ'বেই;—তবু একে যতটা জখম করা যায়, ক'রে রাখা ভাল।"

যোগেন্দ্রবাবু তামাক খাইতেছিলেন; গড়গড়ার নলটা মুখ হইতে নামাইয়া, তাঁহার টেবিলের ড্রয়ার হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া সুকুমারবাবুকে দিলেন। চিঠিখানা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসার গ্র্যাণ্ট সাহেবের লেখা। গ্র্যাণ্ট সাহেব সিভিল সার্জ্জন থাকিতে যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। তিনি যোগেন্দ্রবাবুর বুদ্ধি ও কর্ম্মপটুতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। যোগেন্দ্রবাবু তাঁহার নিকট মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স-ঘটিত অনেক বিষয় শিক্ষা করেন। এখনও কোনও জটিল সমস্যা উপস্থিত হইলেই যোগেন্দ্রবাবু গ্র্যাণ্টকে তাহা জানাইতেন। এই মোকদ্দমায় কেমিক্যাল একজামিনারের রিপোর্ট পাইয়া যোগেন্দ্রবাবু গ্র্যাণ্ট সাহেবকে বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া জানান। সেই পত্রের উত্তরে গ্র্যাণ্ট সাহেব সমস্ত অবস্থা আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, বিষপ্রয়োগে মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু মৃত ব্যক্তি ক্ষুর দিয়া গলা কাটিয়া আত্মহত্যা করার থিওরীও একেবারে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। মোটের উপর, post-mortem reportএর উপর, ডাক্তারী শাস্ত্র অনুসারে, কোনও একটা নিশ্চয় মতামত দেওয়াই অসম্ভব।

সুকুমারবাবু চিঠিখানা পড়িয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিলেন। যোগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "দেখেছেন তো। এ অবস্থায় ডাক্তারদের সাক্ষ্য নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি ক'রে লাভ নেই। আসামীর পক্ষ থেকে যদি সিভিল সার্জ্জনকে, কি, চাই কি, গ্র্যাণ্ট সাহেবকেই যদি সাক্ষী মেনে বসে, তবে তো আপনাদের যা' তাই হ'বে। আর আমাদের সিভিল সার্জ্জন বাহাদুর যে প্রকার লোক, তা' তো জানেন। মোটা হাতে টাকা পেলে, তিনি মেঘনাদের চেয়ে অনেক সরেশ সাক্ষ্য দিতে পারেন। মাঝখান থেকে মিছামিছি একটা ভদ্রলোকের ছেলেকে অপদস্থ ক'রবেন বই তো নয়! মেঘনাদ মনোরমাকে ভালই বাসুক আর যাই করুক, তা'তে সে যে নিজের বিশ্বাস-বিরুদ্ধ মিথ্যা কথা ব'লতে যাবে, তা' তো আমার মনে হয় না। জুরীরাই কয়জন এ কথা বিশ্বাস ক'রবে, কে ব'ল্‌তে পারে।"

সুকুমারবাবু ও সদরবাবু তবু কিছুক্ষণ তর্ক করিলেন; কিন্তু শেষে তাঁহাদের এ সঙ্কল্প ছাড়িতে হইল। তা'র

পর সদয়বাবু বলিলেন, "কাল মেঘনাদ ডাক্তার সন্ধ্যাবেলায় সতীশবাবুর বাড়ী গিয়েছিল; আর সুনীতির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা-বার্ত্তা ক'য়ে এসেছে।"

যোগেন্দ্রবাবু বেশ একটু চটিয়া বলিলেন, "আপনি কি ব'লতে চান, সে সুনীতিকে ভাঙ্গাতে গিয়েছিল?"

"আমার তো তাই সন্দেহ হয়।"

যোগেন্দ্র। মানলাম যে তাই গিয়েছিল। তাই কি ক'রতে চান?

"আজ এই কথাটা একবার বের করে নিলে ভাল হয়।"

যোগেন্দ্র। তার আগে প্রথম জানা দরকার, সুনীতি সাক্ষ্যে মিথ্যা কথা বলে কি না।

সদয়। তা' অবশ্য। যদি সুনীতি উল্টা সাক্ষ্য দেয়, তবেই এ কথা উঠবে।

যোগেন্দ্র। আর যদিও সে বলে, তা' বলবার তার হাজার কারণ র'য়েছে। সব চেয়ে জবর কারণ হ'চ্ছে যে তার মা আর শাশুড়ী তা'কে দিন-রাত জপাচ্ছে। প্রহ্লাদবাবুও তলায়-তলায় হয় তো আছেন,—তবে আপনারা তাঁকে ধরতে-ছুঁতে পান নি। তা' ছাড়া, হিন্দু-স্ত্রী স্বামীর হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে, সেটা এমনই কি বিচিত্র যে, সেটার হেতু দর্শাবার জন্য আপনাদের মেঘনাদকে না টানলে চ'লছে না?

সুকুমার। দেখুন, জুরীর বিচার,—এতে যতদূর সম্ভব প্রমাণ দিয়ে রাখা ভাল। আপনি যা' মনে ক'রছেন, জুরী ঠিক সে রকম নাও মনে ক'রতে পারে তো।

যোগেন্দ্র। তাই ব'লে, যত কিছু অসম্ভব suggestion ক'রতে হ'বে—তা'তে যাই হ'ক, এমনি কি কথা আছে? আপনারা যে একজন ভদ্রলোকের সম্মান নিয়ে টানাটানি ক'রছেন, সেটা একবার খেয়াল ক'রছেন না। আপনারা যতই যা বলুন না—মেঘনাদকে আমি একটা পয়লা নম্বরের পাপিষ্ঠ মনে ক'রতে পারছি না। জুরীও যদি আমার মত ভাবে, তবে একজন গভর্ণমেণ্টের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নামে এই সব সাক্ষ্য দেওয়ায়, জুরীর মন আপনাদের বিরুদ্ধে বিগড়ে যেতে পারে না কি? আর, তা' ছাড়া, এই suggestion যদি আপনারা খাড়া করা'তে যান, তবে আগে আপনাদের প্রমাণ ক'রতে হ'বে যে, মেঘনাদ মনোরমাতে এতটা মজে গেছে যে, তা'র জন্য সে এতটা তদ্বির ক'রছে। আপনাদের এ বিষয়ে প্রমাণ এক বুড়ী—যা'কে দিয়ে আপনারা ঘুষো বার পুলিসের পক্ষে সাক্ষ্য দিইয়েছেন! তাকে যে আপনারাই একটা বাক্সে শুদ্ধহাতে হাজতে ঢুকিয়েছিলেন,—এ কথা তো চট্ ক'রে লোকে সিদ্ধান্ত করে ব'সবে; আর পুলিসের যে সুনাম আছে, তা'র উপর একটা চেক্নাই লেগে যাবে।

যোগেন্দ্রবাবু এতটা উত্তাপের সহিত কথাগুলি বলিলেন যে, সদয়বাবু ও সুকুমারবাবুর বুঝিতে দেরী হইল না যে, তিনি অত্যন্ত চটিয়াছেন। যোগেন্দ্রবাবুর মেঘনাদের উপর যে এতটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তা'র পরিচয় ইঁহারা পূর্ব্বে কখনও পান নাই। তাই অজ্ঞাতসারে তাঁহারা তাঁহার অসন্তোষের কারণ হইয়াছিলেন।

যখন তাঁহারা উঠিয়া গেলেন, তখন যোগেন্দ্রবাবু একখানা ইজি-চেয়ারে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে লাগি[illegible]। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত এবং হস্ত দুখানি সবলে মুষ্টিবদ্ধ হইয়া রহিল। তিনি যখন এই অবস্থায় আছেন, তখন অতি সন্তর্পণে ধীরে-ধীরে মেঘনাদ সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

যোগেন্দ্রবাবু চক্ষু মেলিয়া মেঘনাদকে দেখিয়াই লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইল। অনেক-দিনকার হারানো বন্ধু পাইলে যে আনন্দ হয়, একটা দুরন্ত রোগ হইতে মুক্ত আত্মীয়কে দেখিলে যে প্রফুল্লতা জন্মে, যোগেন্দ্রবাবুর সেই আনন্দ হইল।

তিনি মেঘনাদকে বলিলেন, "মেঘনাদবাবু, আপনি Will-power মানেন?"

মেঘনাদ হাসিয়া বলিল, "মানি বই কি! Willএর যে একটা পাওয়ার আছে, তা' না মেনে উপায় আছে? এই ধরুন, আমি ইচ্ছা ক'রলাম এখানে আসতে, অমনি will স্নায়ু মাংসপেশী প্রভৃতির উপর উপযুক্ত power খাটিয়ে আমাকে এখানে হাজির ক'রে দিলে।"

"তা' নয়। আমার will যে আপনার উপর ক্রিয়া ক'রতে পারে, তা' মানেন?"

"তাও পারে। এই ধরুন না, মিসেস চ্যাটার্জ্জীর উইল যেমন আপনার উপর ক্রিয়া ক'রে এই দেশের পুলিশ শাসন ক'রছে।"

যোগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা' নয়! এই আমি

ব'সে একাগ্র মনে আপনার কথা ভাবছিলাম, আর অমনি আপনি এসে পৌছুলেন—এটা কি 'উইল পাওয়ারের' ক্রিয়া নয়?"

"এ রকম Will-power ইংরাজী শাস্ত্র অনুসারে একজনের সম্বন্ধে খাটে—ঐ যে বলে Think of the Devil—"

যোগেন্দ্রবাবুর মনের ভিতর কথাটায় ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি এই কথাই ভাবিতেছিলেন। 'মেঘনাদ কি সত্যসত্যই একটা Devil!'

মেঘনাদ বলিল, "তা' আপনি এত একাগ্র মনে আমার কথা ভাবছিলেন কেন? বাড়ীতে কি আজকে পুলি-পিঠে, না ফাউল-কাট্‌লেট আছে?" যোগেন্দ্রবাবুর গৃহিণীর রন্ধন-বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি ছিল।

যোগেন্দ্র। না, সে সব কিছুই নাই। বাঙ্গলা ডাল-ভাতে যদি আপত্তি না থাকে, তবে তা' আছে।

মেঘনাদ। Rot! ঐ সব অসভ্য জিনিষ যে এই বিংশ শতাব্দীতে আছে এই যথেষ্ট;—আবার তা' লোককে ডেকে খাওয়াবার চেষ্টা! এ একেবারে অসহ্য!

যোগেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "মেঘনাদ বাবু, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তো, আপনাকে কয়েকটা কথা বলি।"

মেঘনাদের বুকের ভিতর গুড়্‌গুড় করিয়া উঠিল,—মুখ হঠাৎ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। যথাসম্ভব আত্মদমন করিয়া সে বলিল, "কি ব'লবেন বলুন।"

যোগেন্দ্রবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, "না, থাক্; এ মোকদ্দমাটা হ'য়ে যা'ক, তার পর ব'লবো।"

মেঘনাদ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এ মোকদ্দমার সম্বন্ধে কোনও কথা যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে বলিতে তা'র মোটেই সাহস ছিল না।

পরক্ষণেই যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন, "কিন্তু, তখন হয় তো কথা বলার কোনও সার্থকতা নাও থাকতে পারে। আমি এখনি বলি। কিন্তু আপনাকে চুপ ক'রে কেবল শুনতে হ'বে। আপনি আমার কোনও কথার জবাব দেবেন না। এ মোকদ্দমা হ'য়ে যাবার আগে এ সব বিষয়ে আপনার মুখ থেকে আমি কোনও কথা শুনতে চাই না।"

মেঘনাদ কেবল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আপনার সম্বন্ধে কয়েকটা গুরুতর কথা আমাকে কেউ ব'লেছে। সে কথা সত্য কি মিথ্যা, অনুসন্ধান ক'রতেও আমার ইচ্ছা নাই। যদি সত্য হয়, তবে সে সম্বন্ধে আপনাকে আমার সাবধান করে দেওয়া উচিত। শুনতে পেলাম, আপনি মনোরমার উপর না কি ভারি অনুরক্ত হ'য়ে প'ড়েছেন,—আপনি না কি জেলে গিয়ে তার সঙ্গে রোজ দেখা করেন,—এবং আমাকে মাপ ক'রবেন—তা'কে আপনি না কি চুমো খেয়েছেন—আলিঙ্গন ক'রেছেন। এ কথা আমার বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু যদি আপনার এমন মতিভ্রম হ'য়ে থাকে, তবে, আপনাকে আগেও ব'লেছি, এখনো ব'লছি সাবধান! মনোরমা ভয়ানক স্ত্রীলোক—ওর ছায়ামাত্র আপনি দেখ্‌বেন না। আর—আমার আর একটা কথা এই যে, আপনি বিয়ে করুন।"

মেঘনাদ ঘাড় হেঁট করিয়া কথাগুলি শুনিয়া গেল। শেষে বলিল, "আপনার শেষ কথাটার জবাব দিতে বোধ হয় আপত্তি নেই। বিয়ে ক'রবো যে যোগেন্দ্র বাবু,—স্ত্রীকে ভাল ভাবে প্রতিপালন ক'রবার আমার এখন পর্য্যন্ত শক্তি নেই।"

"যথেষ্ট আছে। ভাল থাকা সম্বন্ধে একটা অসম্ভব উঁচু আদর্শ খাড়া করা কিছু নয়। তা' ছাড়া, যে আসবে, সে তার খোরাক সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। ভগবানের রাজ্যে এই নিয়ম।"

"তা' যদি হ'ত, তবে দুনিয়ায় এত দুঃখ-কষ্ট থাকতো না। এই দেখুন না, আমাদের বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের ঘরে-ঘরে কি দুরবস্থা! কাল সতীশ বাবুর বাড়ী গিয়েছিলাম তা'র ছেলেকে দেখ্‌তে। এমন একটা অশান্তিপূর্ণ পরিবার আমি আগে কল্পনা ক'রতে পারি নি। স্ত্রীটি কঙ্কালসার। ছেলেপিলেগুলি উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে জীর্ণশীর্ণ,—বোধ হয় প্রত্যেকটী পিলে-যকৃতে বোঝাই। ঘরের সর্ব্বত্র একটা দৈন্যের কালো ছায়া প'ড়ে র'য়েছে। সতীশ বাবু যখন বিয়ে করেন, তখন তাঁর পরিবার প্রতিপালনের উপায় ছিল না। রোজগার ক'রতে আরম্ভ ক'রবার আগেই গণ্ডা-খানেক ছেলেপিলে হ'ল। ওদিকে শ্বশুরটী গেলেন মরে। ভদ্রলোক অথৈ জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। তা'র পর রোজগার হ'ল বটে. কিন্তু সেই যে প্রথম বোঝা

নিয়ে জীবন আরম্ভ ক'রলেন, তা' আর কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। তাঁর মেজাজ খিটখিটে হ'য়ে গেল,—স্ত্রীর উপর, ছেলেপিলের উপর অত্যাচার আরম্ভ ক'রলেন,—বাড়ীটা একটা নরক হ'য়ে উঠলো। তখন বিয়ে না ক'রে আজ যদি সতীশ বাবু বিয়ে ক'রতেন, তবে তাঁর পারিবারিক ইতিহাস অন্য রকম হ'ত,—আজ হয়তো তাঁকে এ মোকদ্দমায় জড়িয়েও প'ড়তে হ'ত না। এই তো বাঙ্গালা দেশের বেশীর ভাগ পরিবারের ইতিহাস।"

যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তবু তো সতীশ বোঝার উপর শাকের আঁটি মনোরমাকে জুটিয়েছিল।"

"তারও ঐ কারণ। বাড়ীতে সুখ না থাকলে মানুষ বাইরে সুখ খোঁজে। তা' ছাড়া, সতীশ বাবু এখনও যুবক। তাঁর অল্পবয়সে-পরিণীতা স্ত্রীটি নানা বোঝায় পীড়িত হ'য়ে এই অল্প বয়সেই বুড়ী হ'য়ে উঠেছেন। কাজেই তাঁর ঘরের টান জোর না হওয়া অন্যায় হ'তে পারে, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়।"

"মেঘনাদ বাবু, আপনি একটা জিনিষ এ সব হিসাবের ভিতর থেকে বাদ দিচ্ছেন। সেটা হ'চ্ছে চরিত্র-বল। মানুষ ঠিক কল নয়—যে, কেবল নানা অবস্থার টানাটানিতে এদিক-ওদিক হ'তে থাকবে। তার একটা আত্ম-কর্ত্তৃত্ব আছে,—will আছে। যা'র সেই ইচ্ছাশক্তির জোর আছে —character আছে, সে সব বাইরের শক্তি প্রতিহত ক'রে আত্মকর্ত্তৃত্ব বহাল রাখতে পারে। যা'র সেটা নেই, সেই অবস্থার সুযোগ পেয়ে নষ্ট হয়। সতীশ বাবু কেবল অবস্থার গতিকে নষ্ট হ'য়েছেন, মনে ক'রছেন কেন? এ কথাও তো ব'লতে পারেন যে, তাঁর character নেই ব'লে মাটি হ'য়েছেন। একই অবস্থায় ভিন্ন-ভিন্ন লোকে যে ভিন্ন-ভিন্ন পথে যায়, Criminology শাস্ত্রে তা'র ঝুড়ি-ঝুড়ি প্রমাণ র'য়ে গেছে। আপনি দেখেছেন তো গ্যারোফ্যালোর মত? স্বভাব-অপরাধী না হ'লে কেউ কখনো অবস্থায় প'ড়ে অপরাধ করে না। যে অবস্থায় প'ড়ে এই স্বভাব-অপরাধীর অপরাধ ক'রতে প্রবৃত্তি হয়, সেই অবস্থায় প'ড়ে normal মানুষের কখনই সে প্রবৃত্তি হয় না। কেন? স্বাভাবিক মানুষের চরিত্র-বল ব'লে একটা জিনিষ আছে। অপরাধীর সে জিনিষটা নেই, বা আংশিক ভাবে আছে। তারা প্রধানতঃ কেবল প্রবৃত্তির দাস হয়। যখন যে প্রবৃত্তিটা মাথায় চোকে, তখন সেই অনুসারে কাজ করে তা'রা। স্বভাব অপরাধীর মধ্যে চরিত্র-বলটা একেবারে নেই, আর স্বাভাবিক মানুষের ভিতর আছে। আবার, তাও কারও কম থাকে, কারও বেশী থাকে। ধরুন, কত লোকেই তো বেশী বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে না ক'রে ব'য়ে যায়। আপনি তা যান নি। কাজেই, বিয়ে না করাটাই যে ব'য়ে যাবার কারণ, তা' ব'লতে পারেন না। তা'তে কেবলমাত্র একটা ব'য়ে যাবার প্রবৃত্তি জন্মাতে পারে। সেই প্রবৃত্তির গতিরোধ ক'রবে যে চরিত্র বল, সেটা যার আছে, সে ব'য়ে যাবে না। সেটা যা'র নেই, সেই ব'য়ে যাবে।"

মেঘনাদের মনের ভিতর কথাটায় একটু খোঁচা দিল। তা'র এই সুখ্যাতি যে এখন আর তার ষোল-আনা পাওনা নয়, তাই ভাবিয়া সে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। সে বলিল, "কিন্তু, এই চরিত্র-বল জিনিষটা যে কতটা অবস্থার অধীন, তার হিসাবে আপনারা মস্ত ভুল ক'রছেন। মানুষের ভিতর পশুশক্তিটা এত প্রবল যে, উপযুক্ত সুযোগ পেলে, খুব শক্ত চরিত্রকেও আস্তে-আস্তে ক্ষয় ক'রে, ভিত্তি নেড়ে দিতে পারে। যা'র জীবনে কোনও শক্ত প্রলোভন আসে নি, তা'র পক্ষে চরিত্রবলের স্পর্দ্ধা করা সহজ; যে সেই অবস্থার পীড়নে প্রবল ধাক্কা সামলাতে পারে নি, তাই ব'লেই তাকে একেবারে চরিত্রহীন ব'লে তিরস্কার ক'রবার অধিকার কারো নেই।"

"Character অতটা ঠুনকো জিনিষ নয় মেঘনাদ বাবু! এ একটা প্রচণ্ড জীবন্ত শক্তি! চরিত্র-বল থাকলেও লোকে যে এক-আধবার এক-আধটা প্রবৃত্তির ধাক্কায় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না হ'তে পারে এমন নয়। কিন্তু যার প্রকৃত চরিত্রবল আছে, সে এই রকম এক-আধটা আঘাতে কাবু হ'য়ে পড়ে না; বরং তাতে তার চরিত্রের গাঁথুনীটা আরও শক্ত হ'য়ে ওঠে। আপনি একটা কাচের বাসনে ঘা মারুন, সেটা ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যা'বে,—আর তা' জোড়া লাগবে না। কিন্তু একটা গাছের গায় কোপ মারুন,—ঘা'টা তার লাগবে বটে, কিন্তু সে তখনি সেটা মেরামত ক'রতে সুরু ক'রবে। বরং তার জীবন-ক্রিয়াটা এই ক্ষতি মেরামত ক'রবার জন্য বেড়ে উঠবে। শেষ পর্য্যন্ত দাগটা থেকে যাবে বটে, কিন্তু তার জীবনের কোনও ব্যতিক্রম হবে না।

তেমনি অবস্থার আঘাতে characterএ ঘা লাগতে পারে,—চিরজীবন সে ঘায়ের ছাপও থাকতে পারে বটে,—কিন্তু তাতে সে আরও শক্ত ও আঘাতসহিষ্ণু হয় মাত্র,—তার জীবনের ব্যতিক্রম হয় না। আমার জীবনের একটা কথা আপনাকে বলি।—আমি প্রথমে ইনস্পেক্টর হ'য়ে ঢুকি। সেই সময় একটা ভয়ানক সঙ্গীন মোকদ্দমায় আমি ভয়ানক বিপদে টাকার অভাবে প'ড়ে ঘুষ নিয়েছিলাম। কিন্তু তা'তে নাকালের অন্ত হ'য়েছিলাম;—প্রায় হাতে-নাতে ধরা পড়্‌বার উপক্রম। টাকা তো তখনি ফিরিয়ে দিলাম। আমাকে তখনি অন্য জায়গায় বদলি ক'রে দিলে। তার পর আমার চাকরী নিয়ে টানাটানি। সৌভাগ্যক্রমে তখনি একটা খুব শক্ত ডাকাতি মোকদ্দমায় আমি খুব একটু বাহাদুরী দেখিয়ে, কোনও মতে চাকরীটা বজায় রাখলাম; কিন্তু আমার পুরস্কারটা পেলাম না, আর প্রমোশন বন্ধ হ'য়ে গেল। সেখানে এ মোকদ্দমায়ও পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ আমাকে দিতে চেয়েছিল, আমি নিই নি। তা'র পর থেকে কোনও দিনই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হই নি। প্রথম জীবনে ঐ যে ধাক্কাটা খেয়েছিলাম, তা'তে আমি ভেঙ্গে পড়ি নি,—বরং তা'তে আমার ভিতর ধর্ম্মের শক্তিটা বেড়েই গিয়েছিল।"

মেঘনাদ বুঝিল যে, কথাটার একটা গূঢ় অর্থ আছে। যোগেন্দ্রবাবু ইহার দ্বারা এই ইঙ্গিত করিলেন যে, মেঘনাদের অপকর্ম্মের কথা সব প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, আর পুলিস খুব সম্ভবতঃ দায়রায় জেরা করিয়া তাহাকে লোক-সমাজে নাকাল করিবার চেষ্টা করিবে। যোগেন্দ্রবাবুর এ কথার তাৎপর্য্য সে ইহাই বুঝিল যে, এ সম্বন্ধে পুলিসের কর্ত্তব্য ঠিক হইয়া গেছে। যোগেন্দ্রবাবু তাহাকে এই শাস্তিটা মঙ্গলময় বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত করিতেছেন মাত্র।

(ক্রমশঃ)

রাজগিরে দু-দিন

[প্রিন্সিপ্যাল শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, এম্‌-এ, আই-ই-এস্‌]

রাজগির, শনিবার, ৯ই আশ্বিন, ১৩২৭।

মধ্যাহ্ন। শরতের নীল আকাশে সাদা মেঘ বিশ্রাম কচ্ছে। এখানে পাখীর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই;—গাছ-পালাগুলি নীরবে আলোকে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে-মাঝে কেবল এক-একটা হাওয়া এসে তাদের উতলা করে দিচ্ছে। পাতার গায়ে শত সূর্য্য।—পাতার আড়ালে লুকান আঁধার। বর্ষান্তে প্রকৃতির শ্যাম অঙ্গের শোভা বেশ ফুটে উঠেছে। বর্ষার ঠিক পরে এখানে কখনো আসি নি, তাই রাজগিরের এ চেহারা কখনো দেখি নি। নিকটের পাহাড়গুলি কোথাও অনাবৃত, কোথাও ঘন-কৃষ্ণ ছায়া-ঢাকা, কোথাও বা সবুজ। যেখানে আলোক ও ছায়ার সন্নিবেশ, সেই স্থানগুলি দেখিতে অতীব মনোহর। দূরের পাহাড় ক্রমশঃ ধূসর হ'য়ে এক স্নিগ্ধ কোমল শ্রী ধারণ করেছে। বাঙ্গলার আঙ্গিনায় ঘাসগুলি এত সবুজ কখনও নাই নাই।

এই সমস্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে কিন্তু জীবনের অবিশ্রান্ত চাঞ্চল্য। একটা হল্‌দে প্রজাপতি ঘাসের উপর দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথে উড়ে গেল। আর দু'টো ঐ আলো ও ছায়ার ভিতরে গাছের পাশে ও গাছের নীচে লুকোচুরি খেলছে। একটা নীলকণ্ঠ আমগাছের এক ডাল থেকে অন্য ডালে ছুটে চলে গেল।

গাছের ছায়া-ঢাকা ডালে সুখাসীন হয়ে একটা শালিক ও একটা কাক মাঝে-মাঝে আপনা-আপনি কত রকমের বুলি বলছে। দুটো ঘুঘু কোমল মৃদু স্বরে ডেকে-ডেকে আকাশ দিয়ে উড়ে গেল। প্রকৃতির হৃদয় ভাবে ভরা, তাই এত চাঞ্চল্য ও সঙ্গীত।

সায়াহ্ন। এখন সূর্য্য পশ্চিমদিকে ঝুঁকে পড়েছে, আর বিপুল পাহাড়ের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে। দূরে পশ্চিমে জল চক্‌মক্‌ কচ্ছে। ধোঁয়াটে পাহাড়গুলি আরও ধোঁয়াটে হ'য়ে উঠ্‌ছে। দিনের বেলা যে মেঘগুলি ভেসে

এসেছিল, এখন তারা ধীরে-ধীরে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। গোরু আর মহিষগুলি সারাদিন রাজগির উপত্যকার জঙ্গলে-জঙ্গলে বিচরণ ক'রে, এখন মন্থর গতিতে ফিরে আস্ছে। তাদের গলার ঘণ্টাগুলি সুমধুর স্বরে বাজ্ছে। আমার সাম্নে পুরাতন নগরের শ্যামল উপত্যকা। একদিকে বৈভার-গিরি ও অন্যদিকে বিপুল গিরি,—তার মাঝখানে সরস্বতী নদী। এই দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়া রাজগির সহরের বনরাজি এবং তাহার পশ্চাতে সুবর্ণ-গিরি দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যার ছায়া পাহাড়ের পূর্ব্ব-তীরে নেমে এসেছে, পশ্চিমে এখনও উজ্জ্বল রৌদ্র। কন্দরগুলি সব সবুজ ও গভীর ছায়ায় আবৃত। একটা হুতুম পেঁচা পাহাড়ের খোড়ল থেকে গুরু গম্ভীর স্বরে সন্ধ্যার আগমন ঘোষণা ক'চ্ছে। এখানে কি একটা বিশ্রামের ভাব! সহরের চাঞ্চল্য একেবারেই নাই। গোরুগুলি গুণে-গুণে পা ফেল্ছে; মাঝে-মাঝে সরস সবুজ তৃণ পেলে, পালে-পালে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এদের কাছে যেন পৃথিবীর গতিটা অত্যন্ত ধীর। এখানকার মানুষগুলিও তেমনি। কোন বিষয়ে ব্যস্ততা নাই,— না মনের, না শরীরের। একবছর রোজগার ক'রে, তিন বছর বসে খায়। মায়েরা বাছাদের কখনও পাঠশালায় পাঠান না, পাছে খোকার কষ্ট হয়। এখানকার পাণ্ডারা মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ;—অনেক পুরুষ হ'তে এখানে বসতি। কিন্তু এখন এঁদের অত্যন্ত হীনাবস্থা। লেখা-পড়ার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই। তিন বছর পরে এখানে একটা মেলা হয়। তাহাতে লক্ষ-লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। সে সময়ে এঁরা বেশ রোজগার করেন। তাই আর ক'বছর বসে খাওয়া চলে। এখানে যেন বিশ্রামের ভাবটাই বেশী। গাছপালাগুলি বাড়ে না—সব ছোট-ছোট। মানুষগুলি, জানোয়ারগুলি—সব ক্ষীণকায় ও খর্ব্বাকৃতি। এখানে প্রকৃতিও বিশ্রামে মগ্ন। এ এক-রকমের নির্ব্বাণের চেষ্টা। সূর্য্য একবার দিনের শেষ রশ্মি বর্ষণ করে, মেঘের আড়ালে ডুবে গেলেন। আমার সাম্নের উপত্যকা গভীর ছায়ায় ঢেকে গেল। গাছ-পালা-গুলি সব কেমন মোলায়েম হ'য়ে যাচ্ছে। সুবর্ণ-গিরির গায়ে কে যেন, সবুজ কৃষ্ণ মখমলের আস্তরণ পরিয়ে দিচ্ছে। আমার সাম্নে ডানদিকে বৈভার-গিরির গা সুন্দর সবুজ শোভা ধারণ ক'রেছে। ছোট-ছোট গাছ ও বাঁশ-ঝাড়ের ঢালু পার্শ্ব বড়ই সুন্দর। দূরে একটা কন্দরে গভীর ছায়া পড়েছে। একটা মখমলের প্রকাণ্ড আঁচল দিয়ে বৈভার পাহাড়ের গা যেন কে ঢেকে দিয়েছে; আর যেখানে কন্দর পাহাড়ের উপর থেকে নেবে এসেছে, সেখানে কে যেন আঁচলখানা কুঞ্চিত ক'রে রেখেছে। আমার সাম্নে বাঁ-দিকে বিপুল পাহাড়। তার উপরে মহাবীরের (জৈন) ছোট সাদা ধপ্ধপে মন্দির। এ পাহাড়ে তত গাছপালা নাই। অধিকাংশই অনাবৃত, মাঝে-মাঝে ছোট গাছ। সূর্য্য আর একবার দেখা দিচ্ছেন—একখানা কাল মেঘ ও আর একটা ধূম্র পাহাড়ের মাঝখানে। এবার চেহারা অন্য রকম। একেবারে কাঁচা-সোণার মত রং। চারিদিকে সোনালি রংএর কত খেলা। পাহাড়ের ওদিকে কত শিগ্গির ডুবে যাচ্ছেন! মেঘের উপর থেকে মেরু-জ্যোতির মত আলোক-রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে। বিদায়ের ম্লান হাসি হেসে সূর্য্য অস্ত গেলেন। আকাশে সোনালি আভা এখনও রয়েছে। এরই মধ্যে চাঁদ পাহাড়ের উপর অনেক উঁচুতে উঠে গেছেন; এখনও সূর্য্যের সরমে চোখ খুলে ভাল ক'রে চাইতে পাচ্ছেন না।

সন্ধ্যা। চাঁদের এখন কিছু সাহস হয়েছে। নির্ভয়ে শুভ্র রজত-রশ্মি বর্ষণ কর্তে সুরু করেছেন। অপর দিকে পশ্চিমে সাঁঝের তারা উঠেছে। সাঁঝের রাণী একলাটী আকাশকে সুন্দর ক'রে তুলেছে। এক ফোঁটা তরল আলোক যেন শূন্যে ঝুল্চে। এখনও পশ্চিমাকাশে সোণার রং একেবারে মুছে যায় নি। দিনের আকাশের নীল-রং একেবারে মিলিয়ে যায় নি। সমস্ত আকাশখানা যেন একটা প্রকাণ্ড ইন্দ্রনীল মণি। ধীরে-ধীরে রাজগিরের উপত্যকা সাঁঝের আঁধারে পাহাড়ের গায় মিলিয়ে গেল। এক দিকে চাঁদ, আর অন্য দিকে সাঁঝের রাণী;—আর একটা তারাও নেই।

রাত্রি। সাঁঝের তারা ডুবে গেল। এখন সব রংগুলি একেবারে মিলিয়ে গেছে। জ্যোৎস্না, পাহাড়, উপত্যকা, গাছপালা সকলের উপর পড়েছে। পাখীর আওয়াজ কখন বন্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু ঝিল্লীর ঐক্যতান বাদ্য আরম্ভ হয়েছে। মাঝে-মাঝে হুতুম-পেঁচা গভীর স্বরে 'ভুতুম্' 'ভুতুম্', ক'চ্ছে। আকাশে এখন অনেক তারা ফুটে উঠেছে। আমাদের বারান্দার সাম্নের বৃদ্ধ বট-গাছটা

এবার কয়েকটা সবুজ পাতা পেয়েছিল,—সেই পাতার ধসন পরে জ্যোৎস্নায় কি সুন্দর দেখাচ্ছে! পাতার মাঝে যেখানে অন্ধকার, সেখানে দু'একটা জোনাকি মাঝে-মাঝে জলে উঠ্‌ছে। সন্ধ্যার হাওয়া এতক্ষণ অলস হয়ে ছিল,—এখন তা'র একটু-একটু সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বড় মিষ্টি, শীতল ও মনোরম!

রবিবার, ১০ই আশ্বিন, ১৩২৭।

আজ ভোরে উঠে দেখি, তখনও আঁধার যায় নি,—যদিও পূর্ব্বদিকে অরুণ-রাগ দেখা দিয়েছে। পাহাড়, উপত্যকা, নদী আবার আস্তে-আস্তে গা-ঝাড়া দিয়ে অন্ধকারের গর্ভ হ'তে আলোতে এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যাবেলা ছিল ঝিঁঝিঁ-পোকার ঐক্যতান বাদ্য,—এখন ঘুঘুগুলির গলা এক সুরে বেজে উঠ্‌ল। সারাদিনই এদের অমিয়মাখা আকুল আহ্বান। আজ সকালে আর কিছু অনুসন্ধান করতে যাই নাই। কেবল এলো-মেলো কয়েক-পা বেড়িয়ে, বিপুল-পাহাড়ের গায়ে ছায়াতে বসেছিলাম। আমার দক্ষিণে রাজ-গিরের উপত্যকা,—আমার পশ্চিমে বিপুলকায় বৈভার পাহাড়। আমার নিম্নে পুরাতন রাজধানীর উত্তর দ্বার। ঘাসের ভিতর হ'তে নীল 'ফরগেট্ মি-নট্' (forget-me-not) গুলি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়েছিল। বল্‌ছিলো যেন "ভুলো না", "ভুলো না"। আমি কি তোমাদের ভুল্‌তে পারি! এই পাহাড়গুলির ভিতর যে আমার মনটা পড়ে রয়েছে। এদের সব কথা এখনও জানা হয় নাই,—জানা হবেও না।

এবারকার কাজ। সেদিন পুরাতন সহরের দক্ষিণ দিকটা গিয়াছিলাম। সহরে ঢুকেই পুরাতন রাস্তা ধরে প্রথমে পশ্চিম দিকে গেলাম। রাস্তার দুধারে উঁচু যায়গা। ক্রমে পশ্চিমে একটা নদী পেলাম। সাপের মত এঁকে-বেঁকে দক্ষিণ দিক হ'তে নেমে এসেছে। এই কি সেই "সর্পিণী" নদী, যার কথা পালি-ত্রিপিটকে এত পাওয়া যায়? লেখা আছে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এই নদীর ধারে অভ্যাগত পরিব্রাজকদিগের জন্য অতিথিশালা ছিল। তার পর সোজাসুজি পূর্ব্বদিকে যাইয়া নির্ম্মাল্যকূপের উপর দিয়া যাত্রীদের রাস্তায় গিয়ে পড়্‌লাম। দুঃখের বিষয় নির্ম্মাল্য-কূপের গায়ের মূর্ত্তিগুলি একটীও আপন অবস্থায় নাই। এই রাস্তা ধরিয়া ক্রমশঃ সহরের দক্ষিণ-সীমায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেথান থেকে পূর্ব্বদ্বারের দিকে যাই; দেয়ালের নীচে-নীচে হেঁটে একটা প্রকাণ্ড পুকুরের নিকট এসে পৌঁছিলাম। এইটা দেখবার জন্যই এদিনকার যাত্রা। কিংবদন্তী আছে, বুদ্ধকে মারিবার জন্য অগ্নিময় খাদ তৈয়ার করা হইয়াছিল,—কিন্তু তাঁহার পাদস্পর্শে তাহা কমল-সরোবরে পরিণত হয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনের যাত্রা।—আজ গিয়াছিলাম প্রথম বৌদ্ধ-সংহতির মণ্ডপের রাস্তায়। বাঙ্গলো হইতে বাহির হইয়া, নদী উত্তীর্ণ হইয়া, সোজাসুজি বৈভার পাহাড়ের দিকে চলিলাম। রাস্তায় একটী নালা কতক যষ্টির ও কতক আমার পথপ্রদর্শক 'আক্রুর' ওপর ভর দিয়া, পার হ'তে হল। তার পর একটা প্রকাণ্ড পুকুরের ধার দিয়া বৈভার পাহাড়ের বিপুল কায়ের শীতল ছায়ায় এসে দাঁড়ালাম। একটা প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের উপর তিনটী গৃধ্র পাথরে-গড়া পাখীর মত বসে ছিল,—আমরা যাওয়াতে উড়ে পালাল। আমি সভ্যতার খাতিরে অনেকবার থাক্‌তে বল্‌লাম; তা' তারা কিছুই শুনল না—ডানা মেলে পাহাড়ের গায়ে উড়ে গেল। তার পর কতকদূর হেঁটে একটা প্রকাণ্ড গুহার নীচে এসে দাঁড়ালাম। এইটীই কি সপ্তপর্ণী গুহা? বৈভার পাহাড়ের গায়ে সমতলভূমি হতে অনেক উঁচুতে এই প্রকাণ্ড গুহা। এই বিস্তৃত-আয়তন সমতল ভূমিতে প্রথম সভা হয়েছিল মনে হয়। কিছু দূরে একটা উঁচু প্রস্তরময় প্রদেশে কতকগুলি পুরাতন ভগ্নাবশেষ আছে; এবং এই উচ্চ ভূমিতে উঠিবার জন্য ঢালু রাস্তা করা আছে। Sir John Marshal বলেন, এই স্থানটীতেই সভা হইয়াছিল। যদি তাই হয়, তা হলে সপ্তপর্ণী গুহা কোথায়? কোন গুহার ত চিহ্নও এখানে পেলাম না, আর অন্য কেহও পায় নি। শুনা যায়, যেখানে আনন্দ অর্হত্ব লাভ করেছিলেন, সেখানে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এখানে গোল বুনিয়াদ-যুক্ত একটী স্থান আছে। এটা কি তবে আনন্দের অর্হত্ব-লাভের স্মৃতি-চিহ্ন? ফিরে আসবার সময়ে তিনটী গিরি-গুহা দেখে এসেছিলেম। প্রথমটীতে একটী মানুষ বেশ বসতে পারে। গুহাগুলির ধারে পাথরের ঢালু সহজ-গম্য ধাপের মত রয়েছে। ইহারই সাম্‌নে নিম্নভূমিতে কাশ্যপের বিহার ছিল বলে' মনে হয়। এখানে বৌদ্ধ-যুগনির্ম্মিত গৃহাদির ভিত্তির বড়-বড় ইঁট এখনও পাওয়া

যায়। ওইধার ধারে বসে' পুকুরে প্রস্ফুটিত সাদা কুমুদ; আর ফুলের আশে-পাশের ছোট-ছোট ঢেউগুলি বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল। অনেকক্ষণ বসে' মন ভরে দেখে নিলাম। অন্যবার যখন এসেছি, এ পুকুরে জল পাই নাই।

এবার বিষম জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করেছিলাম। সহজ অবস্থাতেই তার মধ্যে রাস্তা খুঁজে পাওয়া কঠিন। এখন আবার সব ঝোপগুলি বর্ষার জল পেয়ে খুব বেড়ে উঠেছে। কিন্তু আমার সঙ্গে সেই পথপ্রদর্শক 'আরু' ছিল। এরা এক রকম জঙ্গলী জাত। বন-জঙ্গলের সব খবর এরা রাখে। বনের গাছ কেটে, আর গোরু চরিয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এ লোকটী আমার বন্ধু। খুব বিশ্বাসী। আমার আগে-আগে 'আরু' রাস্তা খুঁজে বার কচ্ছিল; এবং আমি তা'র পাছে-পাছে যাচ্ছিলাম। গাছের পাতাগুলি শিশিরে এমন ভিজা ছিল যে, আমার কাপড়-চোপড় ভিজে গেল। এত গভীর জঙ্গলে আর যাই নাই। কোথাও কোন ভয়ের কারণ দেখিলাম না। সে যাহা হউক আমার কাজ হয়ে গেল—সংকল্প সিদ্ধ হ'ল।—যে পুকুরটার অনুসন্ধানে বার হয়েছিলাম, তা দেখা হল।

শ্রান্ত মন ও শরীর নিয়ে এসেছিলাম,—দুইদিন রাজগির-বাসে সমস্ত শ্রান্তি দূর হল। আবার সবল মন ও সুস্থ দেহ নিয়ে কার্য্যভূমিতে ফিরে যাচ্ছি।

ইমানদার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

সমস্ত দিনের কর্ম্ম-কোলাহলমুখর জমিদার-বাড়ী সন্ধ্যার পর অনেকটা শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। বিবাহ-উৎসবের বাড়ীতে ইতিমধ্যেই বিস্তর কুটুম্ব-সমাগম হইয়াছিল। নব-সংস্কৃত সুবৃহৎ বাড়ীখানা উৎসব-ব্যস্ত লোকজনে ভরিয়া যেন প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

উপরে সুনীলের পড়িবার ঘরে সুমতি দেবী বসিয়া কিছুক্ষণ হইতে কি একটা বিষয় লইয়া সুনীলের সহিত আলোচনা করিতেছিলেন। ঘরে আর কেহ ছিল না। পিসিমা, রাম পিসিমা, রাঙা জ্যাঠাইমা, মৃত রায় মহাশয়ের বিধবা প্রভৃতি বর্ষীয়সীগণ রান্না ও ভাঁড়ার ঘরের কাযের জন্য ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ঘোরাঘুরি করিতেছিলেন, মানদা তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। নীচের দালানে অনেক মেয়ে-পুরুষ তখনও জড় হইয়াছিল, উপরটা অপেক্ষাকৃত জনবিরল। শুধু বারেণ্ডায় গুটিকতক ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করিতেছিল।

বহুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আলোচিত বিষয়টা শেষ মীমাংসার দিকে ঠেলিয়া আনিয়া,—সুমতি দেবী শান্ত মৃদু স্বরে বলিলেন,—"পাগলকে তাহলে কালই বহরমপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। আর ওর বাপকে ডাকিয়ে এনে অবস্থাটা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে মেয়েটির এইখানে থাকবার ব্যবস্থা করা হোক।"

সুনীল বলিল, "আর ঐ কৈবর্ত্তদের মেয়েটির ব্যবস্থার জন্যে কারুর পার্মিশন-টার্মিশন চাই না কি?"

ঈষৎ ম্লান হাসি হাসিয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "ওর অভিভাবক সেই রুদ্র প্রকৃতি মাস্তুতো ভাই তো ওকে মেরে-ধোরে তাড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। পিতৃ-মাতৃহারা তেরো বছরের বিধবা মেয়ে—ওর মত বালাই সংসারে আর কিছুই নাই, ওর জন্যে কোন আত্মীয়ই মাথা ঘামাতে রাজী হবে না; নিশ্চিন্ত থাক। ভাবনা বটে,—হতভাগী ময়রাণীর জন্যে।"

সুনীল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তার পর দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া বিরক্ত স্বরে বলিল, "যেমন পশুর সমাজ, তেমনি পৈশাচিক বর্ব্বরতাপূর্ণ কার্য্যনীতি এদের! বদ্ধ পাগল পঙ্গু জড়,—যে মানুষ ভগবানের দণ্ডে বিষম আহত, জীবন্মৃত মাত্র, তার হাতে অমন সুন্দর মেয়ে দিয়ে বাপ-মা জাত বাঁচিয়ে স্বর্গের পথ সাফ্ করে নিশ্চিন্ত হলেন! কি চমৎকার পলিসি এদের! এদের ঘরে কি সুখেই জীবগুলো জন্ম নেয়!"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিষণ্ণ হাস্যে সুমতি দেবী বলিলেন, "জীব কি কেবল সুখের জন্যেই জন্ম নেয় রে সুনীল ?—না পছন্দমত স্থানে বেছে-খুঁজে জন্ম নেবার অধিকারটা জীবের আছে ! জন্মটা শুধু প্রাক্তন-ক্রিয়ার ফল মাত্র ভাই ! কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক কথা থাক,—আমায় 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ' কায করতে হবে। এই ব্যথিত, আর্ত্ত, আসুরিক দম্ভের উৎপীড়নে উদ্বাস্ত নিরাশ্রয়দের বুকে তুলে নেবার জন্যে আমায় বুক পেতে দিতেই হবে। আমায় মুক্তি দেবার জন্যেই এরা—আমার ইষ্ট দেবতা—এমন দুঃখের মূর্ত্তি ধরে আমার সামনে দেখা দিয়েছেন। এদের দয়ার ঋণ পরিশোধ করবার নয়, এখন সেবার দিকে এগিয়ে পড়বার অপেক্ষা মাত্র আমার !—"

ঈষৎ ক্ষুব্ধ হাসি হাসিয়া সুনীল বলিল, "আর আমার এ ক্ষেত্রে যোগ্য কর্ত্তব্য হচ্ছে কি জানো ? ঐ ময়রার মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সোজা তার শ্বশুর-বাড়ীতে যাওয়া, আর তাদের গ্রামের সেই পাজী ছোক্‌রাগুলোর বদমাইসি বুদ্ধির বহর স্বচক্ষে দেখে, ঘোড়া দুরুস্ত করবার চাবুকের জোরে—তাদের কাণ্ডজ্ঞানগুলো উদ্বোধন করা ! শুধু এ রকম ভাবে কুকুরের মুখ থেকে চুপি-চুপি শিকার ছিনিয়ে লুকিয়ে রাখলেই সমাজের মঙ্গল হয় না, কুকুর-গুলোর মুখের মতন উপযুক্ত জিনিসও কিছু দিতে হয় দিদি—"

অতি শান্ত, অতি ধীর ভাবে সুমতি দেবী বলিলেন, "হাঁ দিতে হয়,—দেওয়াই উচিত। খাঁটি তামসিক বৃত্তিকে দমন করবার জন্যে খাঁটি রাজসিক বৃত্তির অভ্যুত্থানই উচিত ! কিন্তু তোমার এ দিকের কাযগুলোও যে বজায় রাখতে হবে ভাই,—বাড়ীতে এখন সামনেই এই মস্ত কায,—এই অবশ্য-কর্ত্তব্যকে ছেড়ে, এখন যা না করলেও চলে, তার দিকে ঝুঁকে পড়া তোমার উচিত হয় কি ? —অবশ্য অন্য সময় হলে, কথা ছিল।"

দুঃখিত ভাবে সুনীল বলিল, "সেই জন্যেই ত বলেছিলুম দিদি, যে এখন আমার বিয়ে দিও না। একলা ঝাড়া-হাত-পা থেকে কাযের সুবিধে কত মানুষের ! তা নয়, মানুষ,—মানুষ হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে আজ তার বিয়ে, কাল তার ছেলে, পশু ছেলের ব্রন্‌কাইটিস্, তশু নিউ-মোনিয়া, তার পরদিন—ইনফ্যান্টাইল লিভার, তার পর মরণ,—কত হাঙ্গামা ! জলজ্যান্ত মানুষকে আজীবন দগ্ধে দগ্ধে মারবার ব্যবস্থা ! দণ্ডবৎ বাপু তোমাদের বাল্য-বিবাহের পায়ে,—শুভক্ষণে সমাজের কাঁধ কেটে ঐ জোয়াল বসান হয়েছিল, মানুষগুলোর প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হচ্ছে, তবু নিস্তার নাই !" সুনীলের কণ্ঠস্বর ক্রমে উষ্ণ বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল !

স্মিত হাস্যে সুমতি দেবী বলিলেন, "ওর জন্যে আমার কাছে বসে রাগ জানালে তোমার কোন উপকারই হবে না ; বাঙালাদেশের সমস্ত মেয়ে যে দিন এক-সঙ্গে,——কিন্তু সে কথা থাক, আমার অনধিকারচর্চ্চা হচ্ছে ! আপাততঃ আমার ভ্রাতৃজায়ার কথা বলছি—"

দিদির হাসি দেখিয়া ক্রুদ্ধ সুনীল লজ্জায় পড়িল, বাধা দিয়া বিব্রত ভাবে বলিল, "হ্যাঁ, নাও, আর তোমায় বলতে হবে না। দিদি, তুমি সব চেয়ে যে জিনিষ বেশী ভাল বাসো,—সেই জিনিস দিয়ে আমায় আশীর্ব্বাদ কোরো, তা হলেই আমার বেশী তৃপ্তি হবে, এই নাও—" বলিয়া পাশে খোলা গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগের ভিতর হইতে একখানি উৎকৃষ্ট সংস্করণের শ্রীমদ্ভাগবত গীতা বাহির করিয়া সুমতি দেবীর হাতে দিল। সুমতি দেবী হাসি মুখে গীতাখানি কপালে ঠেকাইয়া প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠায় একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া, প্রসন্নোজ্জল দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, "তোমার এতখানি বুদ্ধি বেড়েছে দেখে ভারি খুসী হলুম। আমি ভাব-ছিলুম, কাল মিত্তির মশাই গায়ে হলুদের বাজার করতে যাবেন, তাঁকেই বলে দেব এটার জন্যে। তোর মা—মনু, পুত্র-বধূকে যৌতুক করবে বলে একটা সোণার সিঁদুর-কৌটো গড়াতে দিয়েছে, আহা এ বিয়েতে তার যা আনন্দ রে ! ওর হাসি দেখে আজ আমার বড় তৃপ্তি হচ্ছে !"

একটা মৃদু নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সুমতি দেবী নীরব হইলেন ; চকিতে অতীতের অনেক কথা দুজনের মনে পড়িয়া গেল। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া মৃদু স্বরে সুনীল বলিল, "আর একটা কথা শুনেছ দিদি, হাজতে মোহন্ত মশায়ের সর্ব্বাঙ্গ কুষ্ঠ-ব্যাধিতে গলে গেছে, অবস্থা মুমূর্ষু। আমি কাউকে বলিনি। হাঁসপাতালে পাঠান হয়েছে, শেষ বিচার পর্য্যন্ত টিকবেন না। আলজিবটা খসে গেছে।"

সুমতি মুহূর্ত্তকাল বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। তার পর বেদনার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "তাই না কি ? এমন

কষ্ট পাচ্ছেন?" পরস্পর বদ্ধ হাতের উপর চিবুক রাখিয়া ...ত দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন।

সুনীল ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া অধিকতর মৃদু স্বরে বলিল, "এতেও মানুষ বোঝে না দিদি, ভগবানের দণ্ড কি বিষম জিনিস! মানুষ গায়ের জোরে মনুষ্যসমাজকে ফাঁকি দিতে পারে অনেক সময়,—কিন্তু ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারে এক সময়ে তাকে ঘাড়-ভেঙে পড়্‌তেই হয়!"

গাঢ় চিন্তা ও তন্ময়তার মাঝখানেই সুমতি দেবী যন্ত্র-চালিতের মত বলিলেন,—"হয়।"

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। নীচে হইতে পিসিমা সুমতী দেবীকে ডাকাডাকি করিতেছেন শুনিয়া সুনীল বলিল, "পিসিমা ডাকছেন দিদি, শুন্‌তে পাচ্ছ? কি ভাব্‌ছ এত?—"

শান্ত দৃষ্টি তুলিয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "ভাব্‌ছি, সমাজ যদি অধিকারে বঞ্চিত না কর্‌ত, তবে আজ এই অবস্থায়, মায়ের মত স্নেহ নিয়ে, মেয়ের মত ভক্তি নিয়ে—ঐ রোগাক্রান্ত মানুষটির সেবায় আত্মনিয়োগ করে ধন্য হতুম। সমাজ আমাদের মন-বাড়াবার-উপায়, অনেক বড়-বড় অধিকারে আমাদের বঞ্চিত করে রেখেছে সুনীল! আমার সব চেয়ে বেশী দুঃখ হয়,—এই রকম সব যোগ্য-ক্ষেত্রে সেবার অধিকারে বঞ্চিত হয়ে থাকাটার জন্যে। ...াক, ভগবান আমায় যে পথে সেবার অধিকার দিয়েছেন, ...সই পথেই আপাততঃ সন্তুষ্ট চিত্তে কায করে চলি,—আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের পাঁচজনের চেষ্টা যেন সফল ...য়, দেশের ভবিষ্যত মেয়েদের অধিকার-সীমা যেন বড় ...য়ে দেশকে ধন্য করে। নির্ব্বিচার শাসন-পেষণের রুক্ষ, ...ক্ত ভ্রূকুটি মেয়েদের অন্তরাত্মাগুলোকে সদ্যঃ নরক ভোগ ...রাচ্ছে,—এ যন্ত্রণা থেকে তারা যেন চির-তরে পরিত্রাণ ...ায়, এই আমার প্রার্থনা।"

ইতস্ততঃ করিয়া সুনীল বলিল, "দ্যাখো দিদি, সাধে ...লছি বাল্য-বিবাহটা—"

বাধা দিয়া স্মিত মুখে সুমতি দেবী বলিলেন, "আবার ...াল্য-বিবাহ নিয়ে তর্ক তোলে! বলেছি তো, গায়ের জোরে ...টার প্রতিকার করবার উপায় যখন আপাততঃ হাতে ...ই, তখন মনের জোরে ওটার সুব্যবস্থার ভার তোমরা ...জেদের হাতে নাও। বাল্য-বিবাহ হচ্ছে হোক,—বাল্য-পিতৃত্ব, বাল্য-মাতৃত্বে তোমরা কেউ অভিষিক্ত হবে না বলে, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে একান্ত-সংযমে জ্ঞানের জন্য শিক্ষায়, মঙ্গলের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হও,—দেখো, তার ফল কখনই ব্যর্থ হবে না। তোমাদের ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল,—দেখ্‌বে একদিন সমস্ত জাতির উপর কায করবে। নিজেকে আগে গড়বার চেষ্টায় প্রাণপণে লাগ ভাই,—তারপর অন্য কথা বোলো,—সে কথা শোন্‌বার লোকের অভাব হবে না।"

কথাটা শেষ করিয়াই সুমতি দেবী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুনীল মাথা হেঁট করিয়া,—সামনে-খোলা, আমেরিকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্যের বিস্তৃত বিবরণপূর্ণ ইংরেজি মাসিক পত্রিকাখানি দেখিতে লাগিল। কোন কথা বলিল না।

প্রস্থানোদ্যতা সুমতি দেবী দুয়ারের বাহিরে পা দিয়া আবার কি মনে পড়ায়, ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন—"হ্যাঁ রে, ফৈজুর খোকার জন্যে জামা-জুতো নিজে কিন্‌বি বলে তাড়াতাড়ি মাপ-জোঁক নিলি,—তারপর কি কর্‌লি তার?"

সহাস্য দৃষ্টি তুলিয়া সুনীল বলিল, "বাঃ, সেটাও ভুলে যাব, আমি এম্নিই আর কি! সে আমি নিজে বেছে-বেছে পছন্দ করে কিনেছি। কাল সকালে খোকাটিকে এনে, একেবারে পরিয়ে দেখে পাঠিয়ে দেব। দেখবে এখন,—ঐ ট্রাঙ্কটা তা হলে এখুনি খুল্‌তে হয়।"

সুমতী দেবী বলিলেন, "এখন থাক, পিসিমা ডাক্‌ছেন। কাল সকালবেলা পোষাক পরিয়ে পিসিমাকে একবার দেখাস্। আহা, বুড়ো মানুষ, কত আহ্লাদ কর্‌বেন।"

হঠাৎ সুনীল বলিয়া উঠিল, "উঃ, আজ এক বচ্ছর হোলো গা-ঢাকা দিয়েছে! কোন পাত্তাই নাই!—আর কিছু নয় দিদি, আমার সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য লাগে যে ছেলেটার জন্যেও তার একটু মন-কেমন করে না? ফৈজুর মনটা নিরেট পাষাণই বটে,—আমি এতদিন তাকে চিন্‌তে ভুল করেছি।"

দুঃখিত হাস্যে সুমতি দেবী বলিলেন, "হয় ত এখনো ভুল কর্‌ছিস্ সুনীল,—কে বল্‌তে পারে? মানুষ নিজেই নিজের সঠিক পরিচয় সব সময় টের পায় না, তা পরের ওপর আন্দাজী বুদ্ধি খাটিয়ে কি বিচার নিষ্পত্তি কর্‌বে—হঠাৎ একটা বিশেষ ব্যবহার বা বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ্য

করে।—ভুল, ভুল রে সুনীল!—হাজার মানুষের হাজার মনোবৃত্তি, হাজারো জটিল বৈচিত্র্যে ভরা,—বাইরে থেকে চোখ্ বুজে ওকে হাৎড়ে ঠাওর পাওয়া ভারী শক্ত।"

সুনীল বলিল, "সে ত নিশ্চয়ই! আমি ত তোমায় বরাবরই বল্‌ছি, তার নিরুদ্দেশ হওয়ার মূলে একটা বিশেষ গুরুতর কারণ আছেই!' কিন্তু তার যে কোন সূত্রই আজ পর্য্যন্ত খুঁজে পাচ্ছি নে; তাই ত ক্রমে সন্দেহ হচ্ছে, হয় ত বা খামকাই খামখেয়ালি বুদ্ধির ঝোঁকে সে গা-ঢাকা দিয়ে, গুষ্টিশুদ্ধ সকলকে জব্দ ক'রে মজা দেখ্‌ছে! আহা বাচ্চা ছেলেটা, ওকে দেখ্‌লে আমার ভারী মায়া হয়। ফৈজু—ষ্টুপিড্‌টা ওর কথাও একবার মনে করে না কি ব'লে? অন্যায় নয় এটা—"

মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষুণ্ণ হাস্যে সুমতী দেবী বলিলেন "বড়ই দুঃখের বিষয়, তার আর সন্দেহ কি।—বুড়ো বাপেরই কি কম যন্ত্রণাভোগ হচ্ছে। আহা! সন্তান শুধু হ'লেই হয় না রে,—অদৃষ্টদোষে অনেক সময় তারা বাপ-মার জীবনের পক্ষে শাস্তিদায়ক—পীড়া হ'য়ে দাঁড়ায়!"

সুমতি দেবী নীচে নামিয়া গেলেন। সুনীল অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া-বসিয়া ভাবিল। তারপর ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া নীচে নামিয়া গেল।

ত্রিচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

জরাজীর্ণ স্থবিরের মত অলস-মন্থর-গমনে শীতের সুদীর্ঘ রাত্রি কাটিয়া চলিয়াছে। ঘরে-ঘরে মানুষ লেপ, কাঁথা, কম্বল মুড়ি দিয়া, আটঘাট বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছে। সমস্ত জগৎ সুষুপ্ত—নীরব। রাত্রি তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শান্ত, সুপ্ত গ্রামের বক্ষঃ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ উৎকট রুদ্রগর্জ্জনে উপর্য্যুপরি বন্দুক গর্জ্জিল! গ্রামবাসী সুপ্তি ভাঙিয়া আতঙ্ক-ব্যাকুল হইয়া উঠিল; চারিদিকে হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি পড়িয়া গেল,—বলিষ্ঠ গ্রাম্য যুবকগণ লাঠি-সোটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল,—ব্যাপার কি জানিতে।

জমিদার-বাড়ীতে আজ বিস্তর লোক-সমাগম হইয়াছে বলিয়া বৃদ্ধ সর্দ্দার বৈবাহিককে লইয়া নিজের বাড়ীতে শুইয়াছিলেন। গ্রামে গোলমাল শুনিয়া, ব্যস্ত-উৎকণ্ঠিত-চিত্তে তিনি শয্যা ছাড়িয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে লাঠিগাছটা কাঁধে লইয়া বাহির হইলেন;—বৈবাহিককে বাড়ীতে থাকিতে বলিয়া গেলেন।

রাস্তায় পা দিয়াই তিনি স্তম্ভিত, বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, দুইজন মশালধারী চৌকীদার সঙ্গে, অশ্বারোহণে বন্দুক বাগাইয়া ধরিয়া একজন বাঙালী পুলিশ ইনেস্‌পেক্টার ঊর্দ্ধশ্বাসে জমিদার-বাড়ীর দিকে ছুটিতেছেন,—পিছনে দশ বার জন কনষ্টেবল ও চৌকীদার ছুটিতেছে! রাস্তার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, গ্রামবাসীরা অবাক্ হইয়া তাহাদের দিকে তাকাইয়া আছে!

চমকাহত বৃদ্ধ বলিলেন, "হয়েছে কি?"

"জমিদার-বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে, এতক্ষণ কত খুন-খারাপি হ'য়ে গেল দেখ গিয়ে!"—বলিতে-বলিতে পুলিশের দল তীরবেগে পাশ-কাটাইয়া ছুটিয়া গেল। দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া বৃদ্ধ তাহাদের সঙ্গ লইলেন। গ্রামবাসীরা কোলাহল করিতে-করিতে ছুটিল।

জমিদার-বাড়ীর সদর তখন লোকারণ্য;—ফটকের সাম্‌নেই গ্রাম্য চৌকীদারের মৃতদেহ বর্শা-বিদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছে।—অদূরে উঠানের মধ্যে, একজন ভীমকান্তি, গালপাট্টা-বাঁধা পশ্চিমার রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে; —তার একটু দূরে পাঁচিলের কোল ঘেঁসিয়া পড়িয়া, একজন বিপুলকায়, ভদ্র-পরিচ্ছদধারী ব্যক্তি অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় ধূলায় লুটাপুটি খাইয়া, বিকটস্বরে গোঙাইতেছেন। অন্তঃপুরের দ্বারের সাম্‌নে আর একজনের রক্তাক্ত দেহ জড়াইয়া ধরিয়া সুনীল স্তম্ভিত-বিবর্ণ মুখে বসিয়া আছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খল কোলাহলের উন্মাদ-গর্জ্জন!

দুইটা উজ্জ্বল মশালের আলোয় বিস্তৃত প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক দিনের আলোর মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধ সর্দ্দার উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ইস্ এত রক্ত! বাচ্চা, তুমি এমন জখম হ'য়ে গেছ!—"

সুনীলের কাঁধের উপর হইতে আড়ষ্ট প্রায় মাথাটা কষ্টে টানিয়া তুলিয়া আহত ব্যক্তি ফিরিয়া চাহিল, নিঃশব্দে ললাটে করস্পর্শ করিয়া একটা ক্ষীণ শব্দ করিয়া আবার সে হেলিয়া পড়িল।—যন্ত্রণার্ত্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া সুনীল বলিল, "ফৈজুর রক্ত সর্দ্দার,—সমস্তই ফৈজুর রক্ত!—"

"ফৈজু!—"বৃদ্ধ দুই হাতে মাথা ধরিয়া, সেইখানে বসিলেন। অতিশয় স্থির দৃষ্টিতে—সুনীলের আশ্রয়-

প্লাবিত, সেই রক্তস্রোতের উজ্জ্বল-তীব্র বর্ণের দিকে ইন্দ্রজাল-মুগ্ধের মত চাহিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

ফৈজু অতি কষ্টে মাথা ফিরাইয়া আবার পিতার দিকে চাহিল; নিষ্পলক নয়নে মুহূর্ত্তকাল সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া—পিতার অবস্থাটা দেখিল, তারপর সুনীলের দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "আর আমায় কি দেখ্‌বেন? ওখানে দেখুন এবার।"

দুই তিনজন লোক পিছন হইতে আসিয়া ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধকে সরাইয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধ কোন আপত্তি করিলেন না, করিবার ক্ষমতাও ছিল না, শুধু বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

পুলিশ ইনেস্‌পেক্টার ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্রথমেই নিহত মৃতদেহ দুইটি পরীক্ষা করিলেন; তারপর পাঁচিলের নিকট পতিত আহত ব্যক্তিকে টানিয়া সোজা করিয়া শোয়াইয়া মশালের আলোয় মুখখানা ভাল করিয়া দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "কনেষ্টবল রামশরণ সিং,—লাগাও হাতকড়ি;—সঙ্কটপুরের জমিদার নীলকণ্ঠ বাবু সহজে মরবার ছেলে নন্, মাথায় ঐটুকু লাঠি ছোঁয়ানতে ওঁর কিছুই হয় নি, গবর্ণমেণ্টের ফাঁসীকাঠ পবিত্র না করে ওঁর পরিত্রাণ নাই! মাথায় জলের ঝাপ্‌টা মার, এখনি চাঙ্গা হয়ে যাবেন—। ওঁর বন্দুকটা চুন্না, তোমার জিম্মায় রাখো, আমারটাও নাও। আর কে জখমী আছে—" ফৈজুর নিকটস্থ হইয়া ইনেস্‌পেক্টার সবিস্ময়ে বলিলেন, "আহা-হা! তুমি বেচারা জখম হয়েছ! উরুতে বন্দুকের গুলি লেগেছে, ইঃ। কাঁধটা যে ছুরির ঘায়ে বেজায় জখম হয়েছে হে! বন্ধু দুবে, জল্‌দি আমার ঘোড়া নিয়ে ছুটে যাও, পাশের গ্রামে গবর্ণমেণ্টের ডিস্পেন্সারীর ডাক্তার আছে, আমার নাম করে বোলো—যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থায় যেন চলে আসেন।"

বন্ধু জমাদার তৎক্ষণাৎ ঘোড়া লইয়া ছুটিল। ইনেস্‌পেক্টার নতজানু হইয়া ফৈজুর ক্ষতস্থানগুলা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া দুঃখিতস্বরে বলিলেন, "তুফানে বাঁচিয়ে এনে কিনারায় নৌকা ডুবালে দাদা,—শেষের চোট্‌টা রুখতে পার্‌লে না?"—

ক্ষীণহাস্যে ফৈজু সবিনয়ে উত্তর দিল "খোদার মর্জ্জি!"

ইনেস্‌পেক্টার বলিলেন, "সুনীল বাবু কই?"

ফৈজু অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে সুনীলকে দেখাইল। ইনেস্‌পেক্টার মুহূর্ত্তকাল বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনি সুনীল বাবু! নমস্কার, আজ আপনি খুব বেঁচে গেছেন মশাই,—পাকা দু-ডজন মির্জ্জাপুরী গুণ্ডার নিমন্ত্রণ হয়েছিল আজ আপনার মাথা নেবার জন্যে! সঙ্কটপুরের জমিদার নীলকণ্ঠ বাবু জমিদার লোক; সকল তাতেই ওঁর জমিদারী-কায়দা,—পাঁচজন সর্দ্দার গুণ্ডাকে নিয়ে নিজে আগে-ভাগে এগিয়ে এসেছিলেন। বাকী উনিশজনকে নিয়ে ওঁর দুজন বিশ্বাসী অনুচর—নজিরুদ্দীন আর ভুবন গোয়ালা পিছনে আস্‌ছিল। বাঁকুড়ো ষ্টেশনের রেল-পুলিশের হাতে তারা গ্রেপ্তার হয়েছে,—ভাগ্যে আপনার এই জাঁহাবাজ ফৈজু লোকটি ছিল, নইলে পুলিশের সাধ্য কি সেই সব তেলক-ছাপাকাটা গয়ার পাণ্ডা, কাশীর পাণ্ডা, বৈদ্যনাথের পাণ্ডার সন্ধান পায়; খুব আট্‌কানো গেছে মশাই, নইলে তারা এসে পড়্‌লে আজ আপনার বাঁচোয়া ছিল না কিছুতেই! নীলকণ্ঠ বাবু বাকী সঙ্গীদের না পেয়ে শেষে 'মোরিয়া' হয়ে নিজেই যে চড়াও হবেন বাড়ীতে,—সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্টই সন্দেহ ছিল; কিন্তু ও-ছোকরার আগ্রহকে কিছুতেই ঠেকাতে পার্‌লুম না,—এই দুর্জ্জয় শীতের রাত্রে, এতগুলো প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে আন্‌লুম। এখন দেখ্‌ছি সত্যিই!—আচ্ছা এরা কখন—কি রকম ভাবে বাড়ীতে ঢুকেছিল?"

সুনীল শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কিছুই জানি না। একেবারে বন্দুকের শব্দে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, সদরে মহা গোলমাল! ওপর থেকে নেমে এসে দেখি,—অন্দরের দেউড়ী ভাঙা, শ্যামল পায়ে লাঠি খেয়ে পড়ে আছে, চীৎকার করছে 'ফৈজু মানুষকে খুন করলে, খুন করলে,—' বেরিয়ে এসে দেখি চারজন সদরের দেউড়ী দিয়ে ছুটে পালাল আর এই সব পড়ে রয়েছে।—"

ইনেস্‌পেক্টার সংক্ষেপেই শ্যামলের পরিচয় ও আঘাতের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সে সামান্যই আহত হইয়াছে। অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকেরা তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। ইনেস্‌পেক্টার ফৈজুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি ত আমাদের পাঁচ মিনিট আগে বেরিয়েছিলে,—এইটুকু সময়ের মধ্যে এসে এত কাণ্ড করলে কখন হে?"

শুষ্ক, বিবর্ণ ওষ্ঠ-প্রান্তে শান্ত হাসির রেখা টানিয়া আনিয়া,

ফৈজু ধীরে ধীরে উত্তর দিল "কাণ্ড আমার কিছুই করতে হয় নি, খোদাই সব ঠিকঠাক করে সাজিয়ে রেখেছিলেন ইনেস্‌পেক্টার বাবু! প্রাণের দায়ে উর্দ্ধশ্বাসে সমস্ত পথটা ছুটে পার হয়ে এসেছিলাম। গ্রামে ঢুকে দেখি সব নিঃশব্দ। চুপি-চুপি এ-দিকের খবর নিতে এসে দেখি, দেউড়ী ভাঙা,—সামনেই ঐ দুস্‌মন্‌-চেহারার গুণ্ডা ব্যাটা দাঁড়িয়ে। আমার রাস্তা রুখ্‌তেই—মাথায় এক ঘা বসিয়ে পথ সাফ করে নিলুম, ব্যাটা 'হাঁক্‌' করে চেঁচিয়েই মাটী নিলে। সেজবাবু অন্দরের দেউড়ী ভেঙে বন্দুক নিয়ে তখন সেই চারটেকে সঙ্গে করে ভিতরে ঢুক্‌ছিলেন। গোল শুনে হেঁটে দাঁড়ালেন, সে চারটের সঙ্গে আমার একটুখানি লাঠিবাজি চলেছিল। সেজবাবু বেগতিক দেখে, দুবার বন্দুক ছুড়্‌লেন—কিন্তু তাগ ফস্কে গেল। শ্যামল-ট্যামল শব্দ শুনেই বেরিয়ে পড়্‌ছে দেখে তারাও ভয় পেয়ে গেল। ঠিক সেই সময় সেজবাবুর শেষ গুলি পায়ে লাগ্‌তেই আমি বসে পড়ে অগত্যা তাঁর মাথা-তাগ করে লাঠি ছুড়ে দিলুম, উনি ঘা খেয়ে পড়্‌তেই তারা মার-দৌড়! যাবার সময় এক ব্যাটা কাঁধে ছুরিটা বসিয়ে দিয়ে গেল!—" ডান হাতে করিয়া বাঁ কাঁধের উপর হইতে ছুরিখানা টানিয়া তুলিয়া মাটীর উপর ফেলিয়া ঈষৎ হাসিয়া ফৈজু বলিল, "সেজবাবুর আড়াই হাজার টাকা বায়নাটা নেহাৎ লোকসান হয় নি,—তারা একটুখানি কায করে গেছে,—এইখানে।"

ক্ষতমুখে নূতন তেজে রক্তস্রোত উছলিয়া উঠিল; ক্লান্ত ভাবে হেলিয়া পড়িয়া ফৈজু বলিল, "ছোটবাবু, ভোরের ঠাণ্ডাটা খালি-গায়ে বড্ডই লাগাচ্ছেন, এবার উঠে যান আপনি। আমার জন্যে এক গ্লাশ জল পাঠিয়ে দেন, বড় পিপাসা পেয়েছে।"

সুনীলের ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ একজন জল আনিতে ছুটিল। ইনেস্‌পেক্টারের দিকে চাহিয়া সুনীল বলিল, "আপনি অনুগ্রহ করে অনুমতি দেন, ফৈজুকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাই।"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া ইনেস্‌পেক্টার বলিলেন, "নিয়ে যান। কোথা নিয়ে যাবেন?"

ইতস্ততঃ করিয়া সুনীল বলিল, "ফৈজু, তোমার বাড়ীতে যাওয়া যাক, কি বল?"

মুদ্রিত-নেত্র ফৈজু নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া তর্জ্জনী-নির্দ্দেশে বাহিরের ঘর দেখাইয়া দিল। সুনীল দ্বিধা-জড়িত স্বরে বলিল, "কেন, বাড়ীতে—"

চোখ মেলিয়া ফৈজু একবার এদিক-ওদিক তাকাইল, অস্ফুট স্বরে বলিল, "না, সে শুধু মেয়েদের কান্না বাড়ানো হবে। ঐখানে চলুন, আপনার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে।"

সুনীল ইঙ্গিত করিল। কয়জন লোক সাবধানে বাহিরের ঘরে একটা শয্যার উপর ফৈজুকে লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিল। ফৈজু চক্ষু মুদিয়া নিঝুম হইয়া পড়িয়া রহিল, এইটুকু নড়াচড়ার ক্লেশে তাহার কথা কহিবার শক্তি যেন ক্ষণেকের জন্য লোপ হইয়া গেল; ভিতরে অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য বোধ করিল।

একটু পরে অনুভব করিল, সুনীল মুখ খুলিয়া কি যেন মুখে ঢালিয়া দিতেছে। ঢোক গিলিয়া ফৈজু ভাল করিয়া চাহিতে চেষ্টা করিল;—কিন্তু চোখে সবই যেন কেমন ঝাপ্সা-অস্পষ্ট ঠেকিল, কাণ ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল। আশপাশের মানুষদের কথাবার্ত্তা, দূরাগত সঙ্গীতের মৃদু গুঞ্জনের মত কাণে ঠেকিল। ফৈজু হতবুদ্ধির মত চাহিয়া চুপ করিয়া কি যেন ভাবিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সুনীল মুখের কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমায় কি বল্‌বে বল্‌ছিলে ফৈজু?"

ফৈজু হতাশ ভাবে একটু হাসিয়া বলিল "হয়েছে! এই-বার বাইরের দিকটায় সব গোলমাল ঠেক্‌তে সুরু করেছে। অনেক কথাই বল্‌বার ছিল, কিন্তু আর যে কিছুই ঠিক মনে পড়্‌ছে না। থাক্‌ গে। হাঁ, একটা কথা ছোটবাবু—" ফৈজুর ওষ্ঠ-প্রান্তে—চিরাভ্যস্ত বিনয়-ভরা, সসম্ভ্রম-কৌতুক হাস্য ক্ষীণ বিকশিত হইয়া উঠিল;—সুনীলের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া কাণটা মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া চুপি-চুপি বলিল, "আচ্ছা ছোটবাবু, আপনিও কি মনে করেছিলেন, ফৈজু সত্যিকার একটা নেমকহারাম বেইমান?"

সুনীলের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল; রুদ্ধ ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "কে তোমার এ কথা বলেছে ফৈজু? তুমি কোন দিন ত ভুলেও আমার সঙ্গে এতটুকু অবিশ্বাসের আচরণ কর নি, আমি কেন এ কথা মনে করব?"

উদাস হাস্যে ফৈজু বলিল, "কিছু না, এম্নি আমার একটু

কৌতুহল হয়েছিল শুধু—" শ্রান্ত ভাবে চক্ষু মুদিয়া ফৈজু আবার নীরব হইল।

সুনীল চক্ষু মুছিয়া বলিল, "ফৈজু, তোমার কি কষ্ট বোধ হচ্ছে এখন?"

চক্ষু মুদিয়া অবিকৃত, শান্ত মুখে ফৈজু উত্তর দিল "কিছুই না। বেশ তৃপ্তি আর আনন্দ বোধ হচ্ছে।"

উদ্বেগ-ব্যাকুল কণ্ঠে সুনীল বলিল, "আনন্দ?"

"হাঁ" চক্ষু মেলিয়া শান্ত স্বরে ফৈজু বলিল, "একটা ভাবনা ছিল যে, বেশী দিন এ রকমে বাঁচতে হলে, ক্রমাগত দুঃখ-দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়ে হয় ত কোন দিন খোদার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে বেইমান-পাগল হয়ে দাঁড়াব। আজ সে ভয় চুকে গেল। এবার বেশ নিশ্চিন্তের ঘুম আসছে,—ভারি তৃপ্তি বোধ হচ্ছে এবার।"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সুনীল বলিল, "ফৈজু, যা হবার হোত, তুমি এমন দুঃসাহসীর মত কেন হঠাৎ এগিয়ে এসে প্রাণ দিলে ফৈজু! তোমায় এখন বাঁচাই কেমন করে বল দেখি?"

ফৈজু হাসিল! নিস্তেজ-ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে প্রবল শক্তি চালিয়া সজোরে বলিল, "এই ত আমার বাঁচা ছোটবাবু! বিড়ম্বনার বাঁচাটা সগৌরবে বলিদান দিয়ে,—এই তৃপ্তির মরণের মাঝে হারানো প্রাণটাকে ফিরে পেয়ে, আজ বড় সুখের বাঁচায় বাঁচলুম ছোটবাবু,—এর জন্যে কি কাঁদতে আছে,—কাঁদবেন না।" ফৈজু হাঁপাইয়া উঠিয়া, সজোরে শ্রান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু বুজিল। অতিরিক্ত শোণিত-ক্ষয়ে সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া দারুণ-অবসন্নতার মহাতন্দ্রা ছাইয়া আসিতে লাগিল।

ক্ষণপরে গৃহমধ্যে সহসা কি যেন একটা ব্যগ্র-চাঞ্চল্যের ঢেউ উঠিয়া মুহূর্ত্তেই সংযত হইয়া গেল। সুনীল অশ্রু-উচ্ছ্বাস-বিকৃত কণ্ঠে ডাকিল "ফৈজু—"

ফৈজু চক্ষু মুদিয়াই উত্তর দিল—"কেন?"

"তোমার খোকাকে দেখবে?"

"দরকার নাই।"

"কেন, ত্যাখো না, অনেক দিন যে দেখনি তাকে।"

মুদ্রিত-নয়নে ম্লান হাসি হাসিয়া ফৈজু বলিল, "না, বাড়ীতে আছে তারা, থাক।" একটু থামিয়া মৃদুতর স্বরে বলিল, "ওর জন্যে হাজার তিন টাকার একটা লাইফ-ইন্‌সিওর করেছি, কাগজগুলা ইনেস্‌পেক্টার বাবুর কাছ থেকে চেয়ে নেবেন। ওঁর জিম্মায় গছিয়ে দিয়েছি।"

সুনীল রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "খোকা এসেছে, চেয়ে ত্যাখো ফৈজু—"

বাহির হইতে কে একজন আসিয়া নিকটে শিশুকে ছাড়িয়া দিল। সে এতগুলা মানুষের মাঝে পড়িয়া, মুহূর্ত্তের জন্য থতমত খাইয়া অবাক্ হইয়া রহিল। তার পর পরিচিত মুখ দেখিয়া সোৎসুকে ব্যগ্রভাবে হামা টানিয়া গিয়া, ফৈজুর শিয়রে স্তব্ধ নিঝুম ভাবে, দু'হাতে মাথা ধরিয়া উপবিষ্ট পিতামহের হাঁটু ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আধ আধ কণ্ঠে ডাকিল—"দা-ই-দা—"

বৃদ্ধ কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন। শিশুর উচ্ছ্বাসে এতটুকুও নড়িতে পারিলেন না। ফৈজু অতি কষ্টে ঘাড় ঘুরাইয়া চাহিল; পিতার দিকে দৃষ্টি পড়িল,—কিছু বলিল না। পুত্রের দিকে চাহিয়া দেখিল, সে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া, একাগ্র-দৃষ্টিতে তাহাকেই দেখিতেছে। ফৈজু চাহিয়া-চাহিয়া ম্লানভাবে একটু হাসিল,—তাহাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টায় হাত বাড়াইয়া, ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল "কি, চিনতে পারছ না?"

শিশু পিতামহকে ছাড়িয়া তাহার হাতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ডানহাতে তখনো ফৈজুর একটু জোর ছিল,—পুত্রকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া ধীরে চুম্বন করিল; সঙ্গে সঙ্গে এক ফোঁটা জল, চোখের প্রান্ত বহিয়া গড়াইয়া পড়িল; পুত্রকে ছাড়িয়া দিয়া, সুনীলের হাত চাপিয়া ধরিয়া পাশ ফিরিতে-ফিরিতে, যন্ত্রণা-বিজড়িত স্বরে ফৈজু বলিল, "উঃ, বড় কষ্ট ছোটবাবু—বড় কষ্ট এবার!"

সুনীল অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখে কাপড় চাপিয়া ধরিল। ফৈজু তাহার হাতটা সজোরে মুঠাইয়া ধরিয়া, চোখ মুদিয়া কষ্টশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

শিশু অত্যন্ত বিস্ময়-কৌতুকপূর্ণ নয়নে, চাহিয়া-চাহিয়া সকলকে দেখিল; তারপর ব্যগ্র-কৌতূহলে,—ব্যস্ত-ত্রস্ত হইয়া তড়্‌তড়্ করিয়া হামা টানিয়া, ফৈজুর মাথার দিক হইতে ঘুরিয়া গিয়া আবার মুখের সামনে জানু পাতিয়া বসিল। পিতার মুদ্রিত চোখ্ খুলিয়া দিবার চেষ্টায়, ঝুঁকিয়া পড়িয়া ফৈজুর ভ্রূর উপর কচি-আঙুলগুলি সসঙ্কোচে

সঞ্চালন করিল। ফৈজু চাহিল,—ক্লিষ্টভাবে হাসিয়া বলিল, "কি?—"

শিশু সোজা হইয়া বসিল। পিতামহের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া সাগ্রহে বলিল, "দাদা"—যেন অপরিচিত ফৈজুকে সে পরিচয় করাইয়া দিতে চায়,—ওই তাহার প্রিয়তম পিতামহ!

কি যেন একটা অব্যক্ত বেদনার মুখে অকস্মাৎ তীব্র আঘাত পাইয়া ফৈজু মুহূর্ত্তের জন্য অধীর-বিচলিত হইয়া উঠিল! আত্মসম্বরণের জন্য ক্ষণেক স্তব্ধ, নীরব রহিল; তার পর সেই চিরাভ্যস্ত, প্রশান্ত-প্রসন্নতা-ভরা মুখে ধীর স্বরে বলিল, "হাঁ, যাও বাচ্ছা,—আমার হয়ে মাপ চেয়ে নেবার জন্যে তুমিই আজ ওখানে গিয়ে দাঁড়াও। দুনিয়ার মানুষের সসীম বুদ্ধির, সীমাবদ্ধ বিচার-বিধানে, অনেক ভুলচুকের অনেক গলদ থাকে; কিন্তু দুনিয়ার মালিকের বিচার বড় সূক্ষ্ম,—বড় চমৎকার, সুন্দর! তাঁর ন্যায়-বিচারের জয় হোক—তাঁর করুণায় আজ আমার—" সুগভীর আবেগ-পীড়নে ফৈজুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল! মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া, হাঁপাইয়া, নিঃশ্বাস টানিয়া, পুত্রের মাথার উপর শ্লথ-কম্পিত ডান হাতখানা রাখিয়া, ধীরে-ধীরে বলিল, "আজ চল্‌বার পথে দাঁড়িয়ে, প্রাণের গভীর ব্যথাভরা ভালবাসাটুকুর সঙ্গেই তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি,—জীবনের সমস্ত সঙ্কটের মুখে, পৃথিবীর সকল অন্যায় দুঃখ-লাঞ্ছনা মাথায় করে নিয়েও, ওপর দিকে নজর রাখ্‌বার শক্তি যেন তোমার থাকে! ঈশ্বরে অকপট বিশ্বাস,—ইমানের মান, ও-যেন তোমার হৃদ্‌পিণ্ডের গতির তালে প্রতি মুহূর্ত্তে সাড়া দিয়ে চলে। জীবনের কর্ত্তব্য শেষ করে যেদিন ছুটি নেবে, সেদিন ইমান্‌দারের মত সগৌরবে মাথা উঁচু করে তাঁর পায়ের তলায় যেও, এই আমার শেষ আশীর্ব্বাদ!"

সুনীলের দিকে চাহিয়া ক্লান্ত স্বরে ফৈজু বলিল, "উঠুন ছোটবাবু, আপনার ঢের কাজ আছে। সেজবাবুকে দেখুন গিয়ে। অত বড় মানীর মানটা যাতে নষ্ট না হয়, যতটা পারেন চেষ্টা করে দেখুন। এটাকে দেখবেন্‌, যেন মানুষ হয়;—" পুত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, সজোরে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, ফৈজু শ্রান্ত ভাবে চক্ষু মুদিল,—বক্ষঃ স্পন্দন স্থির হইয়া গেল!

শোকাহত, মুহ্যমান সুনীলের কাঁধের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, নির্ব্বিকার-চেতা সরল শিশু দুই হাতে তালি বাজাইয়া মহানন্দে খেলিল—"তাই—তাই তাই—তাই!"

(সমাপ্ত)

মানসিক বিকার

[অধ্যাপক শ্রীরঙ্গীন হালদার, এম্ এ]

মনোযন্ত্র

বিরোধ

আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছি, মানুষের মনোমধ্যে কখন-কখন সংগ্রাম উপস্থিত হয়,—এবং তার চেতস্ চার উপায়ের এক উপায়ে তার একটা-না-একটা কিনারা করে। সে সম্বন্ধে অধুনা আর একটু ভাল করিয়া দেখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

আমরা গত অধ্যায়ে দেখিলাম যে, কম্‌প্লেক্স হ'চ্ছে নিষ্পেষিত কতকগুলি আইডিয়ার এক-একটা গ্রন্থি, এবং তার মধ্যে নিয়ন্তর এমন একটা আবেগের বেগ রহিয়াছে, যা বিশেষ বিশেষ কাজ ও চিন্তার দিকে অহরহঃ আপনাকে ঠেলিয়া লইতেছে। এই কারণে ভাব-গ্রন্থির মধ্যে অল্প-বিস্তর শক্তি বর্ত্তমান; এবং এই শক্তি সমুদয় চিচ্ছক্তির একটা প্রকাশ বই আর কিছু নয়। (আমরা পূর্ব্বের আলোচনায় 'horme'কে চিচ্ছক্তি আখ্যা দিয়াছিলাম।) কম্‌প্লেক্সের গেরো'র মধ্যে আটকা-পড়া এই যে শক্তি, এর বন্ধন-মুক্তি হইতে পারে দুই উপায়ের এক উপায়ে—(১) আবেগের উচ্ছ্বাস ও ব্যয়, বা (২) কম্‌প্লেক্সটার ঈপ্সিত

পদার্থের প্রাপ্তি। একে "অভিক্রিয়া" (abreaction) যেমন, প্রেম-কম্‌প্লেক্সের অভিক্রিয়া হ'চ্ছে বাঞ্ছিতকে হাতে পাওয়া।

তা' যেন হইল। এখন এমনও ত হইতে পারে,—মনের মধ্যে কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র ধরিয়া দুই-দুইটা কম্‌প্লেক্স এক-সময়ে জমিয়া গিয়াছে, যাদের একটার সঙ্গে আর একটার মিল্ ত নাই-ই, পরন্তু, একটা আর-একটাকে নিয়ত প্রতিহত ও নিষ্ক্রিয় করে। এইরূপ ঘটিলেই "বিরোধের" (conflict) সূত্রপাত।

অথবা, কতকগুলি ভাবের এমন এক গ্রন্থি-বন্ধন হইয়া গেছে, যা' হয় ব্যক্তিটির পক্ষে বেদনাপ্রদ, নয় ব্যক্তিটির সাধারণ মতামত ও প্রিন্‌সিপল্‌গুলির সঙ্গে বেখাপ। সেই অবস্থাতে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ভাবগ্রন্থির যুদ্ধ বাধে।

আমরা কথায় বলি, অমুকে অমুক প্রলোভন পরাজয় করিয়াছে, বা অমুকে বাসনার বশ হইয়াছে। এই কথাগুলির দ্বারা মনোমধ্যগত যে জাতীয় দ্বন্দ্বের কথা আমরা বুঝাইতে চাই, বক্ষ্যমান "বিরোধ" সেই রকম বলিতে পারি। মনটা যেন দুই-ভাগ হইয়া যায় এক-রকম।

A house divided against itself will fall,—এবং এই বিরোধের অবস্থাটা মনের এক-রকম বাতব্যাধি। দুইটা শক্তি দুই দিক হইতে একে অন্যকে ঠেলিতেছে,—মাঝ-থেকে মনটি একদম্ অসাড় ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া গেল।

প্রবল রাজ্যলিপ্সা একদিকে, আর একদিকে আশৈশবের শিক্ষা ও সংস্কার, কৃতজ্ঞতা, আতিথেয়তা, ফলাফল-চিন্তা ও ভয়,—এই দুই'এর মাঝখানে পড়িয়া ম্যাক্‌বেথের কি-প্রকার অব্যবস্থিত-চিত্ততা হইয়াছিল, তা কে না জানে?

এমন-কি সন্দীপকেও যে, psychological moment-টা'র যথোচিত ব্যবহার করিতে না পারিয়া, আপ্‌শোষ করিতে হইয়াছিল, তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে, তা'রও মধ্যে নীতি-কম্‌প্লেক্স ছিল। শিক্ষা-দীক্ষা সমাজ-ধর্ম্ম, সঙ্কোচ—এ-সবে মিলিয়াই তার ঐ পরম মুহূর্ত্তটাকে ফস্‌কাইয়া দিয়াছিল।

একঝুড়ি মাছ ও একবাটি জলের মাঝখানে একটী বিড়াল ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় একই কালে পীড়িত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কোন্‌টাতে মুখ দিবে স্থির করিতে না পারিয়া জন্তুটা শেষকালে মারা যায়। দু'টি পুষ্টি-কম্‌প্লেক্সের দ্বন্দ্বের একটী নমুনা পাই এই কল্পিত গল্পটিতে।

পথিক হিমালয়ের এমন এক শৃঙ্গে সহসা নিপতিত, যেখান থেকে একটু নড়িলেই পড়িয়া মরা নিশ্চিত; অথচ, নিশ্চেষ্টতা মানে অনশনে মৃত্যু—এইখানে দু'টি আত্ম-রক্ষা-কম্‌প্লেক্সের দ্বন্দ্ব। দু'টি স্ত্রীলোককে একসঙ্গে পত্নী করিলে যে দ্বন্দ্ব, সে ত সামান্য; কেন না, যতই তার কলরব হোক্, সে বাহিরের। কিন্তু যদি কোনও লোক একই কালে দু'টি স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়া ফেলে, তবে তার অবস্থা বস্তুতঃই একটু কাহিল। কেন না, এ দ্বন্দ্ব একেবারে অন্তর্দ্বন্দ্ব।

একটা পুষ্টি-কম্‌প্লেক্স, আর একটা যৌন-কম্‌প্লেক্সের মধ্যে কিন্তু কদাপি বিরোধ বাধে না। একটা আত্মরক্ষা-কম্‌প্লেক্স আর একটা পুষ্টি কম্‌প্লেক্সের মধ্যেও বাধে না—অবশ্য যদি না, প্রাগুক্ত দৃষ্টান্তের মত, পুষ্টি-কম্‌প্লেক্সটাই একই কালে আত্মরক্ষা-কম্‌প্লেক্স হইয়া দাঁড়ায়। যৌন-কম্‌প্লেক্স আর আত্মরক্ষা-কম্‌প্লেক্সের মধ্যে বিরোধ প্রায়ই দৃষ্ট হয়। ধোপানীকে বিবাহ করিবার জন্য কবি ছাড়া অন্য লোকেও ঘর থেকে বিতাড়িত হইতে গর্‌রাজি হয় নাই। বিপন্ন প্রেম-পাত্রকে উদ্ধার করিবার জন্য মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার দৃষ্টান্ত উপন্যাসের বাহিরেও দেখা গেছে।

সে যাই হোক্, বেশির ভাগ বিরোধ-ই দেখা গেছে, একটা ব্যক্তিগত কম্‌প্লেক্স, আর একটা যূথ-কম্‌প্লেক্সের মধ্যে ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ কি, নীতি, ধর্ম্ম ও ফ্যাশান্ এক দিকে, পুষ্টি, আত্মরক্ষা আর মৈথুন অন্য দিকে। যূথ-সংস্কারের সঙ্গে পুষ্টি-কম্‌প্লেক্স আর আত্মরক্ষা-কম্‌প্লেক্সের দ্বন্দ্বটা হত্যা, চৌর্য্য ও অসততার মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে। কিন্তু যূথ-সংস্কারের সঙ্গে মৈথুন-সংস্কারের কাজিয়াটা কালে-কালে এক অপরূপ মীমাংসাতে আসিয়া ঠেকিয়াছে—সাধু ভাষায় তাকে উদ্‌বাহ বলে। বার্ণার্ড শ'র ভাষায়—"It combines the maximum of temptation with the maximum of opportunity." "স্বমৈথুন" (masturbation), "সলিঙ্গাসঙ্গ" (homo-sexuality), পরদার, ব্যভিচার, (?) "প্রদিদৃক্ষা" (exhibitionism), যৌনচণ্ডতা (sadism), প্রতীক-রতি (fetichism)

ইত্যাদি যা' সব ব্যাপার আছে, যা' সবাই জানে, যা' সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে ঘটিতেছে—এ সমস্তের উপরেই সমাজের একটা নিন্দা, একটা মানা আছে। মনোবিশ্লেষণের দ্বারা দেখা গেছে, প্রাগুক্ত বিকার, স্নায়বিক পীড়া এবং মানসিক পীড়াগুলির মূলে যে-সব অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে, সে-সবের বেশির ভাগই যৌন আর যৌথ ভাবগ্রন্থির বিরোধ।

কিন্তু জীবনের প্রয়োজনই হচ্ছে কর্ম্ম। এই "বিরোধ" কর্ম্মকে নিস্পন্দ করে। একটা কিছু সিদ্ধান্তে পহুঁছিতেই হইবে, সময় নাই—এই হচ্ছে জীবন। আবেগের টানাটানিতে পড়িয়া মনটি নিশ্চল। অতএব বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এই বিরোধের একটা-না-একটা সমাধান করিতেই হইবে। এই সমাধান হইতে পারে নানা বিভিন্ন উপায়ে। যেমন ধরুন, কম্প্লেক্সটা এই রকম রূপান্তরিত হইতে পারে যে, এর সঙ্গে সমুদায় ব্যক্তিত্বের অসামঞ্জস্যটি আর বিদ্যমান থাকিবে না; অথবা ধরুন, চেতস্ স্পষ্টই দেখিতে পাইতে পারে যে, উভয় লক্ষ্য একই কালে সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব; অতএব সে উভয়ের গুণাগুণ ভাল করিয়া ওজন করিয়া, সজ্ঞানে একটাকে পরিত্যাগ করিয়া অপরটাকে ধরিতে পারে।

এই যে ভিতরকার শক্তিপুঞ্জের দ্বন্দ্ব, এ'র সম্বন্ধে সচেতন হইয়া, ভাবিয়া-চিন্তিয়া, একটা বিশেষ আচরণ-প্রণালী অবলম্বন করা—এই হচ্ছে বিরোধের আদর্শ-সমাধান—ইহা যুক্তির দ্বারা অনুমোদিত ও যথার্থ। এবং সমাধান বলিতে খাঁটি যা' বোঝায়, ঠিক তা'ই ধরিতে গেলে, এ-ছাড়া আর সমাধান নাই-ও। আমরা এখনই যে-সব অপরাপর প্রণালীর বর্ণনা করিব, সেগুলি বাস্তবিক পক্ষে কেবলমাত্র বিয়োগটা-কে এড়াইয়া চলার প্রণালী—সম্মুখ সমর এবং নিঃশেষে যুদ্ধজয়ের প্রণালী নয় তা'রা। লড়াইএর হট্টগোল থেকে মনটা রক্ষা পায় এই কারণে যে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোটে সাক্ষাৎকারই হইতে দেওয়া হয় না। বিরোধ-ব্যাধির রোগী যখন সমস্যাটার সম্মুখীন না হইয়া তাকে এড়াইতে চায়, তখন, যেমন আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেটা চার উপায়ের এক উপায়ে হইতে পারে।

(১) সে যূথ-সংস্কারের প্রতাপ দেখিতে পাইয়াও সজ্ঞানে তাকে অমান্য করিতে পারে। এই হচ্ছে আমাদের চিরপরিচিত বে-পরোয়া অবিবেকী আদমি। কিন্তু কথাটা এই, অবিবেকী যতই জবরদস্ত হোক্, শেষ পর্য্যন্ত এই প্রণালীটা টেঁকে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ কি, যূথ সংস্কার একটা সত্য সংস্কার—এবং যূথ নামক ব্যাপারটি অতি প্রবল এবং যাদের লইয়া যূথ, তাদের সংখ্যাও নিরতিশয় অধিক। অতএব দেখা যায়, লোকটি অনুতাপ ভোগ করে, এবং এই অনুশোচনার সঙ্গে প্রায় এক রকম অনির্দ্দেশ্য মাথাধরা, এবং অন্যান্য উপসর্গ থাকে, যা সারানো শক্ত।

(২) সে যুক্তি-যোজনের ('rationalisation') আশ্রয় লইতে পারে।

এখানে আমাদের একটু গোড়ায় ফিরিয়া যাওয়া দরকার। "স্বপ্নপ্রয়াণ" (somnambulism), "দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব" (double personation), "অবশেষণ" (obsessions), "প্রত্যক্ষ ভ্রম" (hallucination), আর ভ্রম (delusions) প্রভৃতি যে কতকগুলি বিকৃত মনস্‌এর প্রতিভাস (phenomena) আছে, সেই গুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দেখা গেছে, একটী সাধারণ সূত্র দ্বারা সেই সবগুলো ঘটনার মানে বোঝা সহজ। সেই সূত্রটি dissociation, বা চিদ্‌ভেদ,সংবিচ্ছেদ, বা 'splitting of consciousness'।

সাধারণতঃ দেখা যায়, যখন আমরা আঁক কসি, সেই সময়ে আমাদের পক্ষে আর কিছু ভাবা অসম্ভব। অর্থাৎ, আমাদের 'field of consciousness'এর দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই যে, চেতস্ একটা অবিভাজ্য, অখণ্ড পদার্থ—একটা একমুখী চিন্তা-স্রোত। এ'র সব স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র খণ্ড নাই;—কিন্তু এ হচ্ছে একই লক্ষ্যে ধাবমান অনুভূতি,—ভাব ও ইচ্ছার একটী পুঞ্জ।

কিন্তু তথাপি কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। ওস্তাদ বেহালা-বাদক বাজাইতে-বাজাইতে অন্য গুরুতর বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে না কি? খেয়া-নৌকায় মাঝি বৈঠা বাহিতে-বাহিতে গান গায় না কি? নিপুণ ব্যবসাদার ব্যবসায় কাজ করিতে-করিতে বাজে কাজ চালায় না কি? আহ্নিকের মন্ত্রোচ্চারণ এবং খতের মেয়াদ ফুরাইবার ভাবনা এক সঙ্গে হওয়ার দৃষ্টান্ত নিরতিশয় বিরল নয়। চিঠি লিখিতেছি, এমন সময়েও বন্ধুদের কথার জবাব দিতে হইতেছে—এ ত' এ দেশে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই দৃষ্টান্তগুলিতে চৈতন্যের অসংলগ্নতা সাময়িক-মাত্র, এবং

আংশিক। উভয় কর্ম্মই ব্যক্তিটির অধীন, সে ইচ্ছা করিলেই যে-কোনটা ছাড়িয়া দিতে পারে। কিন্তু চিদ্‌ভেদ আর একটু চড়িলেই এই ইচ্ছাধীনতাটুকু লুপ্ত হয়।

হিষ্টিরিয়ার রোগীর সঙ্গে একজন কথাবার্ত্তা চালাইতেছে;—অন্য এক ব্যক্তি তার হাতে এক-টুক্‌রা কাগজ ও পেন্‌শিল্‌ দিয়া কাণে-কাণে অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিল;—রোগী প্রথম ব্যক্তির সহিত কথোপকথন এবং কাগজে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রশ্নের যথাযথ জবাব লিখিয়া দেওয়া—এ দুই এক সঙ্গে চালাইতেছে।

এ যেন ঠিক্ একটা সিনেমা পর্দ্দার দুই আলাদা অংশে একই সময়ে দুইটি ফিলিমে ছবি দেখানো।

একটী রোগিণীর মা অনেক দিন আগে মারা গিয়াছেন। সে মা'র মৃত্যু-শয্যায় শুশ্রূষা করিয়াছিল। পরে, কখন-কখনও, সে, ভালমানুষ—সকলের সঙ্গে ভাল রকম কথা-বার্ত্তা বলিতেছে;—হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, মাকে কি রকম করিয়া শুশ্রূষাদি করিয়াছিল, সে সমুদায় আদ্যন্ত অভিনয় করে; পরে এক সময়ে হঠাৎ পুনরায় পূর্ব্বের কথা-বার্ত্তায় ফিরিয়া আসে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, ইতিমধ্যে যা কিছু করিয়াছে তার কিছুই তার মনে নাই। এ'ই "স্বপ্ন-প্রয়াণ" (somnambulism)।

এ যেন ঠিক্ একই সিনেমা পর্দ্দার উপরে, একই কালে দুই বিভিন্ন অংশে নয়, কিন্তু সমস্তটা পর্দ্দা জুড়িয়া পূর্ব্বাপর একই ফিলিমে কাজ চলিয়া, হঠাৎ এক সময়ে পূর্ব্ব ফিলিমের কাজ ক্ষান্ত হইয়া, নতুন একটা ফিলিমে খানিকক্ষণ ছবি দেখানোর পর, ফের পূর্ব্বের ফিলিমে কাজ চলিতে থাকা। দ্বৈত-ব্যক্তিত্বে ঠিক্ এই ঘটে। তবে এতে চিদ্-ভিন্ন মনোধারাটা স্থায়ী, এবং অনেকটা সুশৃঙ্খলিত। উইলিয়াম জেম্‌স্, রেভারেণ্ড্ আন্‌সেল্‌বোর্ণএর যে গল্পটি এতৎসম্পর্কে দিয়াছেন তা উল্লেখযোগ্য।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে পরিব্রাজক-ধর্ম্মপ্রচারক রেভারেণ্ড আন্‌সেল্‌বোর্ণ Providenceএর এক ব্যাঙ্ক হইতে কিছু টাকা লইয়া ট্রামে চাপেন। এই হচ্ছে শেষ ঘটনা, যা তাঁর মনে ছিল। সেদিন আর তিনি বাড়ী ফিরেন না, আর দুই মাসের মধ্যে তাঁর খোঁজ-খবর নাই। ৪ঠা মার্চ্চ ভোরে Pennsylvania Norristownএ ছোট্ট একটী মণিহারী দোকানে এ, জে, ব্রাউন্ নামে এক ব্যক্তি জাগিয়া চীৎকার রবে সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি কোথায়?' লোকটি ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে ছোট-খাট একটী ঘর ভাড়া করিয়া এই দোকানটি সাজাইয়াছিল; এবং সহজ মানুষের মত, লোকের কাছে কোন রকম অদ্ভুত বা উৎকেন্দ্রিক না ঠেকিয়া, আপন মনে ব্যবসা চালাইতে-ছিল। সে বলিল, তার নাম আন্‌সেল্‌বোর্ণ,—সে দোকানদারীর কিছুই জানে না। তার মনে পড়ে, কেবল গত কল্য সে Providenceএর ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়াছে।

রোগী আপনার পরিবারের সমস্ত ইতিহাস জানে, অথচ, সে আপনাকে তৃতীয় জর্জ্জের ছেলে ঠাওরাইয়াছে; অথচ, তখনি হয় ত তাকে ঘর ঝাঁট দিতে হইতেছে। সে সকলই বোঝে, অথচ, ঐ যে জর্জ্জ-পুত্রের ধারণাটা, ওটা কোন বিচার-বিতর্কে আর তার মন থেকে তাড়ানো যাইতেছে না।

বিরুদ্ধ ধারণা দু'টি, যাকে 'logic-tight compartment' বলে, তা'তে উত্তম রূপে ঠাসা রহিয়াছে।

ভূত নাই জানি, অথচ ভূতের ভয় কিছুতেই দূর হইতেছে না। কোন লজিক্ আসল জায়গায় কিছু কাজ করিতেছে না।

যার উপরে প্রেম-দৃষ্টি পড়িয়াছে, তার জাজ্বল্যমান ত্রুটীগুলি, এবং জন্ম-সুলভ, সৌন্দর্য্য-ব্যাঘাতক শারীর-ব্যাপারগুলি যে মুগ্ধ ব্যক্তি দেখিয়াও দেখে না, তারও মূলে এই রহস্যটি রহিয়াছে। বিরোধ ঘটিতেছে না—কেন? কারণ, বিশ্বাসগুলি এবং বাস্তব তথ্যগুলি মনের পৃথক্-পৃথক্ লজিক্ ঠাসা কোঠায় বন্দী আছে,—সংবিদের খোলা মাঠে তাদের দেখা সাক্ষাৎ হইবার জোটি নাই।

কিন্তু, একটা কথা। আমরা দেখিব যে, মনের যে যে কুঠ্‌রীতে কম্‌প্লেক্সগুলি ঠাসা আছে, তারা 'logic-tight' হইতে পারে, কিন্তু 'idea tight' নয় আদপেই অর্থাৎ, বন্দী। বিরুদ্ধ ভাবগ্রন্থিগুলির পরস্পরের সঙ্গে সংস্পর্শ যে একেবারেই ঘটিবে না, এ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টান্তগুলি থেকে যা' একটা ধারণা হইতে পারে, তা' সম্যক্ যথার্থ নয়। বিরোধী ধারাগুলির দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিবেই; কিন্তু এমন একটা প্রণালীর মধ্য দিয়া ঘটিবে, যাতে তাদের চেহারা এমনই বিলকুল বদলাইয়া দেয়, যে, তাদের পরস্পর

বিরুদ্ধতাটা ধরাই পড়ে না। এ এক রকমের জোড়া-তালি এবং ঠেকোর প্রণালী। এই হচ্ছে আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত 'যুক্তি যোজন'।

আমরা যখন কোন একটা দুষ্কর্ম্ম করিতে উদ্যত হই, বা করিয়া ফেলি, তখন পতনোন্মুখ, বা ভূমিসাৎ, নৈতিক আদর্শটাকে কি রকম নানান্ ঠেকো দিয়া খাড়া রাখিতে চেষ্টাপর হই, তা আমরা সবাই আপন মনে জানি, এবং গতবারে তার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। আমাদের নিজের দুষ্কর্ম্মটা সর্ব্বদাই, ও একটা 'special case'! দারার মৃত্যুদণ্ডে 'কাজির বিচার', 'ইস্‌লাম-ভক্তি' ইত্যাদি তালির কাজ করিয়াছিল। উপদেশ এবং আচরণের মধ্যে চিরন্তন যে জ্ঞাতি শত্রুতা আছে, এই আলোতেই তারও মানে দেখা যাইবে।

(৩) তৃতীয়তঃ, বিরোধ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি তার কম্‌প্লেক্সের অন্তর্নিহিত শক্তি বেগটাকে তার স্বাভাবিক গতি-পথ থেকে বিভ্রান্ত করিয়া অন্য পথে প্রবাহিত করিয়া দিতে পারে। এই প্রণালীটাকে "ভদ্রী ভবন" (sublimation) বলিতে পারি। এ ব্যাপারেরও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত যা' সব, তা' যৌন-ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। কপালের ফেরে যে নেহাৎ অল্প বয়সেই বিধবা হইয়া গেল, এক কালে তারও যৌন-বাসনাগুলি তা'র জা'দের মতই বিপুল হইয়া জাগিয়াছিল। কিন্তু সেই তীব্র ইচ্ছার পূরণের স্বাভাবিক পথ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তা'র এই নিরুদ্ধ উদ্‌বেগের বহিঃপথ কোথায়? সেবায়, শুশ্রূষায়, দুশ্চর ব্রতানুষ্ঠানে। বিবাহ-উৎসবে যোগ দিতে তা'র আমোদ। এবং এও দেখা যায় যে, গ্রামের যত কিছু গুপ্ত ব্যাপার এবং কুৎসা—তার চিরন্তন সংবাদবাহক হচ্ছেন বিধবা। অধিকন্তু, তার মাতৃ-ভাব-গ্রন্থিরও ত তৃপ্তি চাই। জা'দের ছেলেমেয়ে, তদভাবে কুকুর, বিড়াল, ময়না, কাকাতুয়া পালিতে তা'র অকৃত্রিম অনুরাগ ও উৎসাহ।

যৌন সংস্কারগুলি ভয়াবহ সব খেলায় ভদ্রীকৃত (?) হইতে পারে। যে শ্রেণীর বঙ্গীয় উপন্যাসের ঘটনার ক্ষেত্র রাজপুতানা বা পাঞ্জাব, সেইগুলিতে, প্রেমের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা না হইলে, কি প্রকারে মৃগয়ায় ও যুদ্ধে নায়কদের বীর্য্যের পর্য্যবসান ঘটিয়া থাকে, তার সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত আছি। লেখাপড়ার চর্চ্চা, কার্য্য কর্ম্মে উৎসাহ-বৃদ্ধি, দেশ-পর্য্যটন, সংগ্রহ-বাতিক, ধূম-পান, চা-পান ও মদ্য-পান—এই সমস্ত আকারে যৌন ভদ্রী-ভবনের প্রকাশ ঘটিতে পারে।

ভদ্রী-ভবন কখন-কখনও "বিপর্য্যয়ের" (inversion) চেহারা লয়। বালবিধবার অত্যধিক ধর্ম্ম-পরায়ণতার কথা সুবিদিত। স্বমৈথুন ভাব-গ্রন্থি স্থানচ্যুত হইলে, সাধারণতঃ রোগী তার শরীরকে অন্যান্য ভাবে "হাতায়"; যেমন, নখ-খুঁটা, নখ-কাম্‌ড়ানো, নাক-খুঁটা। কিন্তু এইগুলিকে "ভদ্রী-করণ" বলা চলে না ত'; কারণ, কম্‌প্লেক্সের বেগকে ভদ্র, কল্যাণকর সামাজিক সব লক্ষ্যের মুখে চালিত করিয়া দেওয়ার অর্থেই এই শব্দটির ব্যবহার।

(৪) অবশেষে, সব-চেয়ে যেটা উল্লেখযোগ্য, বিরোধ-উৎপাদক কম্‌প্লেক্সটা সংবিদের মধ্যে হজম হইয়া যাইতে গর্-রাজি হইতে পারে। তার মানে, রোগী স্বীকারই করিতে চায় না, ও রকম একটা কম্‌প্লেক্স কখনও ছিল। এই ব্যাপারটাকে কথায় বলা হয়, 'মন থেকে দূর করিয়া দেওয়া'। কিন্তু আসলে যা' ঘটে তা' হচ্ছে, 'মনের ভিতরে আরো গাড়িয়া দেওয়া'। এই ব্যাপারটাকেই বিজ্ঞানের পরিভাষায় "নিষ্পেষণ" বলি—এটা আসলে চিদ্-ভেদেরই (dissociation) অন্যতর প্রকার। কিয়ৎপূর্ব্বে উল্লিখিত প্রকারের সঙ্গে বক্ষ্যমান প্রকারের পার্থক্য এই যে, নিষ্পেষণের দ্বারা স্বতন্ত্রীকৃত যে ভাবগ্রন্থি, সে আত্মতন্ত্র, স্বাধীন এবং স্বরাট্। প্রতিভাসিক সংবিদের সঙ্গে যুক্ত হইবার পথে নিষ্পিষ্ট কম্‌প্লেক্সের পক্ষে একটা নিয়ত-বর্ত্তমান প্রতিরোধ বা বাধা আছে। এই প্রতিরোধ আদিম নিষ্পেষণেরই জের ছাড়া আর কিছু নয়—এটাকেই নব পরিভাষায় "উপালম্ভ" (censure) বলে।

বৎসরের এই-মাথা হইতে ও-মাথা পর্য্যন্ত প্রকৃতিস্থ চিন্তাধারা কখনও কোনও দিন এমন একটা আইডিয়ার উপরে আসিয়া পড়িবেই না, যা' নিষ্পেষিত কম্‌প্লেক্সটাকে চাগাড় দিতে পারে,—এ হইতেই পারে না। ঈদৃশী সব আইডিয়া বা অপর মানসিক অবস্থা আসিয়া পড়িবেই; এবং যে-হেতু "শেন্‌সর" এই সকল নিষ্পেষিত ভাবরাজিকে সংবিদ্ রাজ্যে ঢুকিতে দিবেই না, অতএব সচেতন আইডিয়াগুলির অচেতন কম্‌প্লেক্সটার সঙ্গে গাঁথিয়া পড়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। ফলে, চৈতন্যের ক্ষতি হইয়া-হইয়া

অসংবিদ্ কেবল বাড়িতে থাকে। এই কারণেই ত' ব্যামোহ যত পুরানা হয়, ততই দুরারোগ্য হইয়া ওঠে।

"চিদ্-ভেদ" আর "নিষ্পেষণ" ঘনিষ্ঠরূপে সম্পৃক্ত। আর, "ভদ্রী-করণ" প্রণালীর মধ্যে "নিষ্পেষণ" নিহিত আছে। বালবিধবা বেড়াল পুষিয়া মাতৃভাবগ্রন্থিকে নিষ্পেষিত করিয়াছে। আর, অবিবাহিত পুরুষ মৃদং বাজাইয়া, আর কৌপীন পরিয়া যৌন-ভাবগ্রন্থিকে (sex-complex) ঠাসিয়া দিয়াছে।

কেহ যেন মনে না করেন যে, "ভদ্রীকরণ" আর "নিষ্পেষণ" সচরাচরই অপ্রাকৃতিক বা abnormal. পরন্তু, শৈশবে, শিক্ষা দীক্ষায়, এই দুই প্রণালীর কার্য্য বিপুল রূপে চলিতে থাকে। এ দুই-এর দ্বারাই ত আমাদের স্বভাবগত জান্তবিকতা অসংবিদের মধ্যে নিষ্পেষিত, এবং প্রয়োজনীয় সব কল্যাণ কর্ম্ম-নিষ্ঠায় ভদ্রীকৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ, অসংবিদের গোড়াপত্তনই ত' ঐখানে। শিশুচিত ভাবগ্রন্থিগুলি লইয়াই ত' অসংবিদ্,—এক রকম বলিতে পারি; আর শৈশবের প্রথম বর্ষগুলির উপরকার যে বিস্মৃতির যবনিকা, তারও ত' মূল অনেকটা ঐখানেই।

এই সকল "নিষ্পেষণ" ও "ভদ্রী-করণ" ব্যর্থ হইলেই মানসিক বিকারের ক্ষেত্র তৈয়ার হইল। কেন না, তখনি নিষ্পেষিত ভাবগ্রন্থিতে আর প্রাতিভাসিক সংবিদে বিরোধের সূত্রপাত হইয়া থাকে। এই সকল অবস্থায় নিষ্পেষণ হইতে ছাড়া-পাওয়া ভাবগ্রন্থিটা রূপান্তরিত হইয়া চৈতন্য-লোকে 'চল' হইবার মত ছদ্মবেশ লয়; এবং এরই অপরূপ সব প্রকাশকে আমরা মনোব্যাধির সব উপসর্গ বলিয়া দেখি। তার নিষ্পেষিত ভাবগ্রন্থির ভিতর কি আছে না আছে, সব খুলিয়া রোগীকে স্পষ্ট দেখানোই হইতেছে মনোজ্বর চিকিৎসার প্রণালী।

কি প্রকারে ভাবের গেরো খোলা যায়, তাই আমাদের কোনও এক পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদের দ্রষ্টব্য হইবে।

পথ-হারা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রাণী স্বামীর ঘর করিতে লাগিল। সসর্প গৃহে বাস করিতে মানুষ যেমন সশঙ্ক হইয়া থাকে, তেমনি করিয়াই এই তরুণী নারীটি সদা-শঙ্কিত থাকিত যে, কোন্ সময়ে তাহার কি ত্রুটিতে, কি না জানি বিপত্তি ঘটিয়া যাইবে। দেবতুষ্টির জন্য মানুষ যদি এমন করিয়া সচেষ্ট থাকে, দেবতা তাহার উপরে অসন্তোষ রাখিতে পারেন না, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু মানুষ দেবতা নয়; তাই অসাধ্য-সাধন ইন্দ্রাণীর সহস্র আরাধনাতেও ঘটিল না—বিমলেন্দুর দিদিমার বিমুখ চিত্ত তাঁহার প্রতি একটী দিনের জন্যও উন্মুখ হইতে দেখা গেল না। তবে সেই প্রথম দিনের ব্যাপারে এই একটুখানি পরিবর্ত্তন তাঁহার ঘটিয়াছিল যে, ইদানীং আর তিনি জামাইয়ের রাকাতে উচ্চ চীৎকার, কান্নাকাটি ত বড় একটা করিতেনই না,—বরং সম্ভব-মত তাঁহাকে এড়াইয়াই চলিতে চাহিতেন। সংসারের কর্ম্মকাজ ঘরের নূতন বধূই করিতেন; তবে ভাণ্ডারের এবং সংসারের যা কিছু চাবিতালার ভার, সে বাটীর গৃহিণী পদবাচ্যার হাতেই সযত্নে রক্ষিত ছিল; প্রাণ গেলেও কখন তিনি উহা হস্তান্তর করিতেন না। একদিন বিমলেন্দুর দিদিমার কোমরে বেদনা হওয়ায় শয্যাগত ছিলেন,—সে দিন বাজার হইতে উঠনা আনিয়া রান্না-খাওয়া হইল। রান্না ইন্দ্রাণীই করে,—কিন্তু বিমলের ভাত খাওয়ান রহিয়া গেল তাহার দিদিমার হাতে। কাজেই তাহার বয়সের পক্ষে তাহার খাদ্যের পরিমাণ ও গুরুপাচ্যতা ইন্দ্রাণীর বিবেককে পীড়া দান করিতে থাকিলেও, প্রতিকার-চেষ্টা তাহার সাধ্যের অতীতই রহিয়া গেল। একদিন এ সম্বন্ধে এতটুকু মুখ খুলিয়া ফেলিয়াই এমন তাড়া খাইল যে, আর কিছু বলিবার বা করিবার ভরসাই তাহার রহিল না। "ওর পেটটা বেশ ভাল নেই,—আজ ওকে লুচিটা না দিলে হয় না মা?" এই

কথার জবাবে বিমলেন্দুর দিদিমা ছুই চোখ পাকাইয়া, গোল করিয়া, পরুষ কণ্ঠে কহিলেন, "কোথায় ওর পেট খারাপ হয়েছে বৌ? তুমি তো চব্বিশটি ঘণ্টাই ওর খাওয়া টেঁকৃচো,—তুখানার ওপোর তিনখানা চাইলেই অম্নি চম্‌কে ওঠো,—মনে করো আপদটা তোমার সোয়ামীর ধন বুঝি সবই গিলে ফেল্লে! তা, ওরও এতে ভাগ আছে গো,—বিষয় অর্দ্ধেক ওর নামে লেখাপড়া করা। তবে যদি কাণে গুরুমন্ত্র দিয়ে-দিয়ে আদায় করে নাও, সে আলাদা কথা।"

শুনিয়া ইন্দ্রাণীর ডাগর ছটি চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। আর কোন দিন বিমলের খাওয়ার প্রতিবাদ সে করে নাই। তবে যথাসাধ্য গোপনে-গোপনে শিশুর খাদ্যে গুরুপাচ্যতা যতটা কম ঘটে, বা বিশুদ্ধ হয়, এ সকল দিকে সে দৃষ্টি ও চিত্ত রাখিত।

বিমলেন্দু মা জানে না। দিদিমার নিকট সে অশেষ ঋণে ঋণী হইলেও, সে ঋণ মাতৃঋণ নয়। সেখান হইতে সে যাহা পায়, তাহাকে মাতৃস্নেহ বলা যায় না। বিমলেন্দুর দিদিমা মঙ্গলাদেবী অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক। এক একজন লোক ভাল কথাটাকেও মন্দ করিয়া বলে, হাসিলেও মনে হয় রাগ করিয়া আছে,—বিমলের দিদিমার সেই স্বভাব। ইন্দ্রাণীকে তিনি না হয় দেখিতে পারেন না; কিন্তু বিমলকে তো পারেন। অথচ, তাঁহার এই বিরাগ এবং অনুরাগ এ ছুইয়ের মধ্যে প্রভেদ খুব বেশি বুঝা যাইত না। ইন্দ্রাণীকে তিনি উঠিতে-বসিতে, খাইতে-শুইতে চোখা-চোখা বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়া বিঁধিতেন,—সে তাহার প্রতি বিদ্বেষে। আবার বিমলের ভাগ্যে শুধু বাক্যবাণই নয়; গাল-টেপা এবং কিলটা-চড়টা অজস্র পরিমাণেই লাভ করিতে হইত,—যেহেতু সে তাঁহার একমাত্র আপন জন। যে সব ক্রোধ পরের উপর মিটান যায় না, সেই সকল বিদ্বেষের জ্বালা তাহার উপর দিয়াই অগত্যা মিটাইতে হয়। তা, ইহার পরিমাণটাও নিতান্ত কম না থাকায়, উহার শাস্তির মাপটাও নেহাৎ সামান্য হইত না। কিন্তু তাই বলিয়া,—তাঁর নিজের ছাগল, তিনি যদি ল্যাজের দিক দিয়াই কাটেন,—অন্যের পক্ষে বিমলকে তুমি ভিন্ন তুই বলিবারও উপায় ছিল না। পূর্ণেন্দু তো তাহার নাগালই পান নাই, পাছে—বাপের বশ হইয়া পড়িয়া দিদিমাকে অপ্রয়োজনীয় করিয়া ফেলে, এই ভয়ে বিমলেন্দুর কোন দিনই বাপের কোলের অধিকার ছিল না। আজও ইন্দ্রাণীকে লইয়া সেই লড়াই-ই চলিতেছে; অথচ বাহিরে, এমন কি বিমলেন্দুর দিদিমার নিজের কাছেও, বাপের নির্লিপ্ততা এবং বিমাতার নির্ম্মমতাই ছেলের পক্ষে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণের একমাত্র কারণ, এই কথাই সুপ্রচারিত। অপরকে, এবং মধ্যে-মধ্যে আর কেহ না থাকিলেও, ঘরের দেওয়ালগুলাকেও শুনাইয়া,তিনি বিনাইয়া-বিনাইয়া কান্নার সুরে বলিতে থাকেন, "মা মরে গেল,—বাপ তো একটী দিনের তরেও চক্ষু চেয়ে দেখ্‌লে না,—কাজেই, না গিয়ে, না দেখে, কি করি বলো! বলি, থাক্‌লে তো আমারই সুষির নাম বজায় থাক্‌বে, আর কার কি? এই আজও যে এই মরতে-মরতে চব্বিশটি ঘণ্টাই ছেলে বইছি,—তা যদি ওর কেউ মাসি পিসি যত্ন কর্‌বার থাক্‌তো তা হ'লে কি, এই বাতের ব্যাথায় কাঁকাল খসে যাচ্চে, একটীবার ধরতো না? কে ওর আছে, কা'কে ওকে দিই? একবারও আমার উপায় নেই।"

অথচ, ইন্দ্রাণী এই কথায় অপ্রতিভের একশেষ হইয়া, রান্না বা কুটনা-কোটা ফেলিয়া ছুটিয়া ছেলে লইতে আসিলে, ভীমরুলের মত মুখ করিয়া বিমুর দিদিমা ঝঙ্কার তোলেন, "যাও গো, যাও,—ঢের দেখেছি,—আর দেখাতে হবে না। বলে, যেচে সোহাগ, আর...........সে বেশিক্ষণ চলে না। হুঃ।"

বিমলের কাপড়-পরান, স্নান-করান, তাহার কান্না-আব্দারের সকল ঝঞ্ঝাট—ক্রমে-ক্রমে সবই ইন্দ্রাণীর ঘাড়ে পড়িয়াছিল। খাওয়ান তাহাকে একটী সহজ কাণ্ড নয়,—কান্না, রাগ,—ভাত ছড়াইয়া ফেলিয়া, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া চীৎকার—খাইতে বসিয়া এম্‌নি সব উপদ্রবে সে ত্রস্তব্যস্ত করিয়া তোলে! বিমলেন্দুর দিদিমা, যতক্ষণ ধৈর্য্য থাকে, তোষামোদ-আদর করিয়া, শেষে যখন আর কিছুতেই বাগ মানাইতে পারেন না, তখন চড়-কিল চালাইয়া ছেলেকে টানিতে-টানিতে লইয়া চলিয়া যান। তার পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দিদিমা-নাতির যুদ্ধ চলিতে থাকে। ইন্দ্রাণী নিজের প্রবল ইচ্ছা দমন করিয়া আড়ষ্ট হইয়া থাকে,—ইহাদের মাঝখানে অনধিকার-প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না। এক দিন ছ-বেলাই এমনি হইল। সারাদিনে পেটে এতটুকু কিছু খাদ্য গেল না। আব্দার সহিয়া এবং

সহাইয়া ছেলের দিদিমা উহার ইহকালটি নিত্যই ঝরঝরে করিয়া তুলিতেছিলেন। এখন নিজের সৃষ্টি-করা, দুর্দ্দমনীয় শিশু লইয়া নিজেই তিনি ফাঁপরে পড়িয়াছেন,—আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। সে-দিন সাহসে ভর করিয়া ইন্দ্রাণী আসিয়া বলিল, "আমি একবার দেখ্‌বো মা ?" বিমলেন্দুর দিদিমা অসহায় ভাবে রাগিয়া ছিলেন;—উপায় পাইয়া অগ্নি বৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "তোমার সে দেখ্‌বার ফুরসুৎ কোথায় যে দেখ্‌বে বাছা! এ ত আর কপালে টিপ কেটে, ঠোটে রং মেখে, আমার কলের পুতুল জামাইয়ের কাছে বসে ফষ্টি-নষ্টি করা নয়।"—ইন্দ্রাণীর ঠোটের রংটাই আলতা-মাখার মত লাল। কিন্তু মঙ্গলাদেবী সে কথা বিশ্বাস করিতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল, সৌখীন ইন্দ্রাণী স্বামীকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য, চুপি-চুপি ঠোটে সর্ব্বদা রং লাগাইয়া রাখিয়া সত্যের ভান দেখায়। উহারা কত রকমই জানে!

ইন্দ্রাণী ডাগর চোখ নত করিয়া একটু ক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পরই বিমলেন্দুর কাছে বসিয়া পড়িয়া, শান্ত, মিষ্ট স্বরে তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে তখন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া, হাত পা ছুঁড়িয়া, তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল। মুখে, হাতে, বুকে, পেটে সর্ব্বত্র তাহার ভাত-মাখা। দিদিমার গালে-পিঠে সেই ভাত-মাখান হাতে যত পারিয়াছে চড়াইয়া দিয়া, তার পর নিজের স্নাত অঙ্গে এখন যতদূর সম্ভব ধূলি মাখাইতেছে। ইন্দ্রাণী তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিতে গেলে, হিংস্র জন্তুর মত ভীষণ ক্রোধে গর্জ্জিয়া সে তাহাকে আক্রমণ করিল। দুই হাতে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া, দাঁত দিয়া কাপড় ছিঁড়িয়া, নখ দিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া চেঁচাইতে লাগিল, "দুষ্টু ছেলে, তুই দূর হ'য়ে চলে যা, পাজি ছেলে তুই পালিয়ে যা, তুই চলে যা না, তুই যা না।"

ইন্দ্রাণী নিজেকে তাহার আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার চেষ্টামাত্র না করিয়াই, তাহার মাথায়-পিঠে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিতে লাগিল, "আচ্ছা, আমি পালিয়ে যাচ্ছি, তুমি চুপ করে লক্ষ্মী হ'য়ে ভাত খাও,—ধন আমার, গোপাল আমার। ছিঃ, দেখ দেখি, জামা-কাপড় সব নোংরা হ'য়ে গেল!"

বিমলেন্দু পাগলের মত চোখ বুজিয়া থাকিয়া, দু-হাতে কিল-চড় বর্ষণ করিতে-করিতে, দুই পায়ে দমাদম লাথি ছুঁড়িতে-ছুঁড়িতে, পূর্ব্বের মতই এলোমেলো চীৎকার করিতে লাগিল, "তুই চলে যা, তুই চলে যা,—তুই আমায় মার্‌বি, আমায় কাম্‌ড়াবি, তুই রাক্ষসী, তুই চলে যা!"

রান্নাঘরের ঝি ক্ষেন্তি ধোয়া বাসন জল ঝরিবার জন্য দেওয়ালের গায়ে কাৎ করিয়া রাখিতেছিল। জিভ্ কাটিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ওকি গো খোকা বাবু, অমন কথা মুখে এনো নি। উনি তোমার মা হচ্চেন, মাকে কি রাক্ষসী বল্‌তে আছে গা?"

বিমলেন্দু অধিকতর রুক্ষস্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "মা না, রাক্ষসী, রাক্ষসী, রাক্ষসী,—ও আমায় আঁচড়াবে, কামড়াবে,—"

বিমলেন্দুর দিদিমা, সর্ব্বাঙ্গে 'সখ্‌ড়ি' মাখিতে হওয়ায় নাতির উপরে ভীষণ ভাবে চটিয়াছিলেন; কিন্তু ইন্দ্রাণীর দুরবস্থা তাঁহাকেও অতিক্রম করায়, এক্ষণে যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। বিশেষতঃ, বিমলেন্দুর শেষ মন্তব্যটা তাঁহাকে এতই প্রীত করিল যে, ততটা হর্ষোচ্ছ্বাস দমনে রাখা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, তিনি নিজের আনন্দে নিজেই গড়াইয়া পড়িলেন। হাসিতে-হাসিতে বেদম হইয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওমা, ছেলের কথা শোন! বলে কি না 'ওকে কামড়াবে!' হাঁ রে, ও কি কুকুর না বাঁদর, যে আঁচড়াবে, কামড়াবে তোকে? হাঁ রে, ও কি তোকে কোন দিন কামড়েছে না কি রে? কি যে তুই বলিস বিমু! হাসিয়ে হাসিয়ে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি যেন ছিঁড়ে দিস্!..."

ইন্দ্রাণী বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়া, কি করিবে যেন কোন কূলকিনারাই খুঁজিয়া পাইতেছিল না; না উহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে, না পারে কিছু করিতে। বিমলেন্দু সমানেই তেমনি উন্মত্ত ঝোঁকে লাথি ও গালি বর্ষণ করিয়াই চলিয়াছে। আর তাহার দিদিমা পরম পরিতোষের হাস্যে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছেন,—"ওমা, ছেলের কথা শোন! বলে কি না, তুই বাঁদর, তুই কুকুর, তুই যা, তুই আমায় মেরে ফেল্‌বি, ওমা কি ছেলে গো! কেউ তো বাবু শেখায় না,—এ সব জান্‌লে কোত্থেকে? ওমা, কি বুদ্ধি দেখ!......"

পিছনে কখন জুতা-পায়ের শব্দ হইয়াছিল,—দিদিমা-নাতির হাসি-কান্নার স্রোতে উহা কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। একেবারে ঠিক পিঠের কাছেই গম্ভীর ধ্বনি শুনা গেল,

"শেখায় বই কি,—না শেখালে এত বড় হতভাগা ও আর্জ হ'য়ে উঠ্‌তো না।"

ইন্দ্রাণী চমকিয়া ত্রস্তে ঘোমটা টানিল। মঙ্গলা ঠাকুরাণী, ধনুকে গুণ চড়াইলে যেমন করিয়া ছিটকাইয়া উঠে, ঠিক্ তেমনি করিয়াই জামাইয়ের দিকে ফিরিলেন, "তা'হ'লে আমিই তোমার ছেলেকে খারাপ করে দিচ্ছি, কেমন গা?"

পূর্ণেন্দু অত্যন্ত নাগত হইয়াছিলেন;—ভূমে পতিত পুত্রকে কঠিন হস্তে টানিয়া তুলিতে তুলিতে, কিছু পরুষ কণ্ঠেই কহিলেন, "তা না ই বা বলি কি করে?" এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ছেলের পিঠে প্রবল চপেটাঘাত পড়িল—"পাজি ছেলে, ও বাঁদর, ও কুকুর, ও তোমায় মেরে ফেল্‌বে, না? বার কর্‌ছি বদমায়েসি,—বদমাসের ধাড়ি হচ্চেন দিন-দিন!"

বিমল পৃথিবীর মধ্যে বাপকেই একটুখানি যা ভয় করিত। কিন্তু সে যখন ক্ষেপিয়া উঠিত, তখন ভয়-ডর তাহার মধ্যে কিছুই থাকিত না। মার খাইয়া নিজের খেয়ালেই চেঁচাইতে থাকিল "ওটা লাক্ষুসী, ওটা লাক্ষুসী, ও মা নয়, ও লাক্ষুসী—"

বিমলেন্দুর দি'দমা বলিলেন, "তা'হ'লে তো আমার আর এখানে না থাকাই উচিত! তোমাদের মন্দ করবার জন্য তোমাদেরই অন্ন ধ্বংস করে তো তা'হ'লে আমার থাকা একটুও সঙ্গত হয় না।"

ইন্দ্রাণীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "তোমার ঘর-সংসার তুমি দেখে-শুনে নিয়ে, আমায় ছুটী দিয়ে দাওসে বাছা,—আমি আজই রাণাঘাট চলে যাই। কারুর লোকসান আমি করতে চাইনে, আমার সে স্বভাবই নয়।"—প্রচণ্ড রাগের মাথায়, জন্মের মধ্যে এই একবারটি মাত্র, মঙ্গলা ঠাকুরাণী তাঁহার পরলোকগতা কন্যার ঘর-সংসারকে ইন্দ্রাণীর বলিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছিলেন, বারান্তরে আর কখনই এমন ভুল তিনি করেন নাই।—এই বলিয়া সিপাহীরা যেমন চালে পা ফেলিয়া মার্চ্চ করিয়া যায়, তেমনি করিয়া লম্বা-লম্বা—অথচ, পিছনে কোন মন্তব্য হয় কি না, উহা শোনার আগ্রহে কিছু বিলম্বিত চরণক্ষেপে—তিনি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলে, ইন্দ্রাণী স্বামীর কাছে সরিয়া আসিয়া সভয়ে কহিয়া উঠিল, "ভাল কর্‌লে না, যদি উনি চলে যান—"

পূর্ণেন্দু ছেলেকে লইয়া ধস্তাধস্তি করিতেছিল। মেজাজ অত্যন্ত চড়া,—কড়া কথায় জবাব দিল, "যান যাবেন, ভয়টা কিসের?"

ইন্দ্রাণী জিভ কাটিয়া বলিল, "ছিঃ! অমন কথা বলো না, গুরুজন! তা ভিন্ন, এতদিন ধরে বিমুকে আমাদের মানুষ করে দিলেন। ওঁরই বা কে আছে?"

"মানুষ তো ছাই করেছেন! বাঁদর তৈরি করেছেন ছেলেটাকে। বিমল! শীগ্‌গির চুপ করো, না হ'লে আজ তোমায় আমি মেরেই ফেল্‌বো।"

ঘরের মধ্য হইতে তখনই উচ্চ রোদন-রোল উঠিল, "ওরে, সুষি মা রে আমার! আজ তুই কোথায় রে মা, তুই যে পায়ে ধরে মাকে এনে ছেলে দিয়ে গেছলি রে মা, সেই ছেলে ডাকিনী এসে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিলে গো মা। ওমা, এ ভালখাকি ডাইনীর হাতে তোর সর্ব্বস্ব সঁপে দিয়ে আজ উদাসিনী হ'য়ে ফিরে চল্লুম রে মা"—ইত্যাদি ইত্যাদি। (ক্রমশঃ)

অনিতা

[শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায়, বি-এল]

"দিবা অবসান হল কি কর বসিয়া মন।
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন॥"

সেই পুরাতন গীত, সেই পরিচিত পূরবী সুরে ধ্বনিত হইয়া এই দূর-বিদেশে—এই ব্রহ্মদেশের টঙ্গু সহরে আমার কর্ণে সুধার ধারা ঢালিয়া দিল। আমি সুর লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই ভরা ভাদ্রে সিটাং-নদী কূলে-কূলে পরিপূর্ণ। তাহার অপর পারে তীরতরুরাজির সবুজ পাহাড়। তাহার পরে একটু পূর্ব্বেই অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য-কিরণে যে সকল মেঘ জবাকুসুমসন্নিভ ছিল, তাহারা ক্রমে মলিন হইয়া আসিতেছে—

আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায়,
দেখিয়ে দেখ না তায় ;
ভুলিয়ে মোহমায়ায় হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান।"

আমি আরো আশ্চর্য্য হইলাম। দেখি সিটাং-নদীর উপর যে সুন্দর পুল আছে—যে পুলের উপর ভ্রমণ করা আমার টঙ্গু-জীবনের প্রধানতম আনন্দ—সেই পুলের উপর বসিয়া একজন ফুঙ্গি (সন্ন্যাসী) একতারা-যোগে ঐ বাঙ্গালা গানটী গাহিতেছেন। আমি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলাম। তিনি পূর্ব্ববৎ নিমীলিত নয়নে অনন্যমনা হইয়া গাহিতে লাগিলেন—

ফুঙ্গি। হাঁ, তুমি কত দিন এখানে আসিয়াছ?

আমি। আমি আজ এক বৎসর হইল এখানে আসিয়াছি—ওকালতি করি। আপনি কোথায় থাকেন?

ফুঙ্গি। কিছু স্থির নাই। আমি পরিব্রাজক—ঘুরিয়া বেড়াই; যখন যে ফুঙ্গি চং (সন্ন্যাসী-আশ্রম) নিকটে পাই, সেইখানে বিশ্রাম করি। আমি বাঙ্গালী।

আকাশে ধীরে-ধীরে যে মেঘ সঞ্চার হইতেছিল, তাহার মধ্য হইতে ভীষণ গর্জ্জন-ধ্বনি শ্রুত হইল। আমি চমকিয়া উঠিলাম। এখনি বৃষ্টি আরম্ভ হইবে। টঙ্গুর বর্ষা—তাহার আদি নাই, অন্ত নাই।



সিটাং নদীর পোল

"নিজ হিত যদি চাও,
তাঁহারই শরণ লও,
ভব-কর্ণধার যিনি পাপ-সন্তাপ-হরণ।"

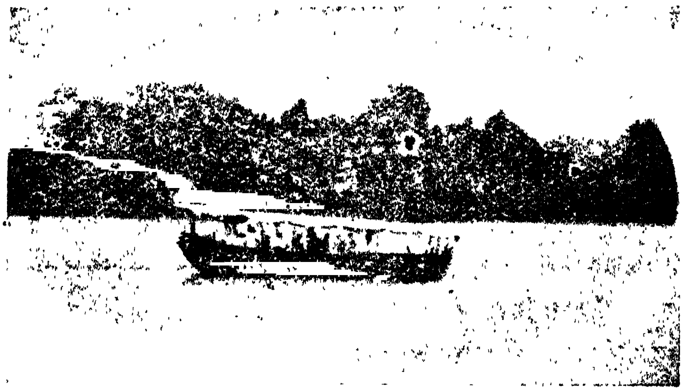
গুম্ফ-শ্মশ্রু-কেশ-বিহীন, পীত-বসন-পরিহিত এই ব্রহ্মদেশীয় ফুঙ্গির মুখে পরিষ্কার-উচ্চারিত বঙ্গদেশ-প্রসিদ্ধ বাঙ্গলা গান শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। গীতান্তে ফুঙ্গি কিছুকাল ধ্যান-নিমীলিত নয়নে নীরবেই রহিলেন। পরে কয়েকটী মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—বোধ হয় তাহা পালি ভাষায়। পরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, আমি নিকটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। ঈষৎ হাসিলেন। আমি যুক্ত-করে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি কখন বাঙ্গলা দেশে গিয়াছিলেন?"

আমি। বড় মেঘ করিয়াছে—এখনি ভীষণ বর্ষা আরম্ভ হইবে। অনুগ্রহ করিয়া আমার বাসায় চলুন।

ফুঙ্গি। বহুকাল গৃহস্থের বাসায় প্রবেশ করি নাই। তুমি বাঙ্গালী—চল।

বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অল্প ভিজিতে-ভিজিতে আমরা, পুলের নিকট আমার যে গাড়ী ছিল, তাহাতে উঠিলাম। গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। আমার বাসার সম্মুখে গাড়ী আসিলে, আমরা উভয়ে বাসায় উঠিলাম।

আমার ড্রয়িং-রুমটী বেশ সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। পরদা, চিত্র, পুতুল, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি আমার স্ত্রীর নিপুণ হস্তে যথাস্থানে রক্ষিত হইয়া, সকলের মনোরম হইয়াছিল। বিদ্যুতালোকে ঘরের ছোট-বড় সকল



সিটাং নদীর খেয়া-নৌকা



সিটাং নদী ও তদুপরি সেগুন কাঠের ভেলা

জিনিষ পরিষ্কার দেখাইতেছিল। বড় সুন্দর দেখিলাম আমার স্ত্রীকে—ভিতর হইতে ড্রয়িং-রুমে আসিবার দরজায় একখানি জীবিত আলেখ্যের ন্যায় নিশ্চল, নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু এ কি! ফুঙ্গি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, আমার স্ত্রীকে দেখিয়াই, "ও কে" বলিয়া একটা চীৎকার করিয়া বসিয়া পড়িলেন; তাঁহার যেন সংজ্ঞালোপ হইবার উপক্রম হইল। আমার স্ত্রী অত্যন্ত ভীত হইয়া, আমার নিকট আসিয়া, একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। আমি স্মেলিং সল্টের শিশিটা হস্তে লইয়া ফুঙ্গির নিকট গেলে, বলিলেন, "প্রয়োজন নাই; স্থির হও, কিছু ভয় নাই।" তার পর তিনি ধ্যানস্থ হইয়া বসিলেন;—বুদ্ধের যেরূপ প্রতিকৃতি আমার ঘরের মধ্যেই অনেকগুলি ছিল, সেইরূপ ভাবে বসিলেন। আমার স্ত্রী আশ্বস্ত হইলেন; কিন্তু তিনি আমারই চেয়ারের এক পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। আমি আমার স্ত্রীকে জানাইলাম যে, উনি একজন বাঙ্গালী ফুঙ্গি।

বাহিরে ভীষণ ঝড় ও মুষল-ধারে বৃষ্টি হইতেছে—মাঝে-মাঝে ভীষণ মেঘ-গর্জ্জন হইতেছিল।

ফুঙ্গি চক্ষু উন্মীলন করিলে, আমার স্ত্রী তাঁহার পদ-সন্নিধানে উপনীত হইয়া, প্রণাম করিয়া কহিলেন—"বাবা, আমার উপর রাগ করিবেন না—আমি কি কোনও অপরাধ করিয়াছি?" ফুঙ্গি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "না মা! তোমার উপর রাগ কি?" আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"একটু চা আনিয়া দিব কি?" "চা" বলিয়া



টঙ্গু বাজার



সুহতালা প্যাগোডা টঙ্গু

ফুঙ্গি হাসিয়া উঠিলেন, পরে বলিলেন—"আচ্ছা, আন।" আমার স্ত্রী স্বহস্তে চা প্রস্তুত করিতে গেলে, ফুঙ্গি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার স্ত্রীর নাম কি?" প্রশ্ন শুনিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইলাম; কিন্তু, আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, যখন আমি উত্তর করিলাম—"অনিতা"। নামটী শুনিবামাত্র বিস্ময়ের ও ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ ফুঙ্গির দেহ বিকম্পিত করিয়া তুলিল; কিন্তু তিনি ক্ষণপরেই ধ্যানস্থ হইয়া বসিলেন। আমার স্ত্রী চা ও কিছু খাবার লইয়া আসিলে তিনি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন। তার পর বলিলেন—"তবে শোন—

"ওঃ, কি বর্ষা! দেবতারা আজ যেন কি একটা অঘটন ঘটাইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন! শোন আমার কথা। সকল কথা বলিবার সময় নাই—গোটাকয়েক কথা তোমাদিগকে বলি।

"আমি কুড়ি বৎসর বয়সে বি.এ. পাস করিয়া বিবাহ করি ও ওকালতি পড়িতে আরম্ভ করি। আমার স্ত্রীকে আমার বড় ভাল লাগিল—ওকালতি পড়া তত ভাল লাগিল না। ওকালতি পড়া ছাড়িয়া দিলাম—ব্যবসা করিব স্থির করিলাম। বর্ম্মায় আসিলাম—সে আজ কতদিনের কথা; তবু মনে হয়—সে যেন সেদিন। আহা, আমার স্ত্রীর সজল-নয়ন ছবিখানি যেন এখনও আমার চক্ষুর সম্মুখে রহিয়াছে!

"রেঙ্গুনে ৩।৪ বৎসর ব্যবসা করিয়া, বেশ কিছু অর্থসঞ্চয় করিয়া, এই টঙ্গুতে সেগুন-কাঠের ব্যবসায়ের জন্য আসিলাম। এই বাড়ীতেই আমি ছিলাম। এই বাড়ীর পশ্চিম-পার্শ্বে একটা আস্তাবল আছে না? ঐখানে আমার দুইটা বর্ম্মা টাটু ও গাড়ী থাকিত। প্রত্যহ বিকালে গাড়ী করিয়া সিটাং-নদীর তীরে বেড়াইতে যাইতাম। যেখানে আমার গাড়ী থামাইয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিতাম,—সেইখানে রাস্তার পার্শ্বস্থ একটা ঘরের একটা জানালায় প্রত্যহ একটা সুন্দর মুখ দেখিতে পাইতাম। ক্রমে সেই মুখে হাসি দেখিলাম—হাসির বিনিময় দেখিলাম। একদিন গাড়ীতে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম—জানালা হইতে মুখ সরিল না। মাথায় চুলের উপর ফুলের মালা, কাণে হীরার দুল, মুখে তনেখা, হাসিতে বাসনা-রাশি। আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে, যাহার সুন্দর মুখ, তাহার হাত হইতে একরাশি চাঁপা ফুল আমার গাড়ীর মধ্যে আ: পড়িল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া জানালার নি দাঁড়াইলাম। সুন্দর মুখটী যাহার, সে হাসিতে-হাসি দৌড়াইতে-দৌড়াইতে আসিয়া, আমার হাত ধরিয়া বেড়াই চলিল—আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ চলিলাম। সেদিন শুক্লা চতুর্দ্দশী জ্যোৎস্নায় সিটাংয়ের জলরাশি সোণামাখা হইয়াছে—ম



আরাকান প্যাগোডার অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধ মূর্ত্তি



সিউ-ডেগন প্যাগোডার প্রবেশদ্বার—রেঙ্গুন

শীতল বায়ু উড়িয়া আসিতেছে। আজ যে পোলের উপর বসিয়াছিলাম, তখন সে পোল হয় নাই; কিন্তু সেইখানে অতি সুন্দর একখানি খেয়া নৌকা ছিল। বহু সেগুন-কাঠ একত্র করিয়া ভেলার মত করিয়া, সেইগুলিকে নদীতে ভাসাইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যায়। সেইরূপ অনেক ভেলা তীরসংলগ্ন ছিল। সেই ভেলাগুলির উপর ছোট-ছোট চালা বাঁধিয়া চালকেরা বাস করে—তাহারা সুন্দর বাঁশি বাজাইতেছিল।

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'তোমার নাম কি?' রমণী বলিল, 'সালোয়া (চাঁপা)। সালোয়া ত তোমার চরণে ধরা দিয়াছে।' তার পর যে সব কথা হইল, তাহা আর বলিয়া কায কি। অনেকক্ষণ বেড়াইবার পর যখন আমি গাড়ীতে উঠিব, সালোয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার স্ত্রী কোথায়?' আমি অম্লান বদনে বলিলাম, 'আমি ত বিবাহ করি নাই।'

"তাহার পরদিন আমার গাড়ী সালোয়ার বাড়ীর নিকট আসিলেই, সালোয়া আমার গাড়ীতে উঠিয়া আমারই পার্শ্বে বসিল; বলিল, 'চল, সরোবরের নিকট যাই।' গাড়ী টঙ্গু সরোবরে চলিল—সরোবরের পার্শ্বস্থ রাস্তা ঘুরিয়া চলিল। রাস্তার একপার্শ্বে বহু পুরাতন প্রাচীর—ইংরাজ-রাজত্বের অনেক পূর্ব্বের গড়ের সীমানা। প্রাচীরের পার্শ্বে ও উপরে চন্দন ও কর্পূর বৃক্ষ ও অন্যান্য অনেক তরুরাজি। সরোবরের পূর্ব্বপার্শ্বে প্যাগোডার স্বর্ণচূড়া, এবং সেই চূড়াকে বেষ্টন করিয়া সুবর্ণ ঘণ্টাবলী;—তাহারা বায়ু-হিল্লোলে পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া মৃদু-নিক্কণে মধুর ধ্বনি করিতেছে। চীনাম্যানেরা তাহাদের অসংখ্য মরাল সরোবর হইতে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছে। সরোবরের প্রশান্ত, প্রশস্ত জলরাশিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঈষৎ স্পর্শ করিতে না করিতেই, চাঁদের আলো আসিয়া হাসিতে নাচাইয়া তুলিল। আমি ও সালোয়া একখানি বোটে উঠিয়া সরোবর মধ্যে গিয়া বোট ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া রহিলাম—মাথার উপর পূর্ণিমার পরিপূর্ণ চাঁদ। পরিপূর্ণ পূর্ণিমাই বটে!

"কাহিনী আর কত বলিব? সালোয়া আমার গৃহে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন; আমার একটী মুসলমান খানসামা ছিল,—তাহাকে বরখাস্ত করিয়া, তাহার একটী আত্মীয় বর্ম্মিজকে খানসামা পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

"এদিকে আমার স্ত্রী বর্ম্মায় আসিবার জন্য বারবার পত্র লিখিতে লাগিলেন। তাঁহাকে যতদিন সম্ভব, নিরস্ত করাইয়া রাখিলাম;—কিন্তু শেষে আমার কথা না শুনিয়াই তিনি চলিয়া আসিলেন। যেদিন টঙ্গুতে আসিয়া পৌঁছিলেন, আমি ষ্টেশনে গেলাম;—গাড়ীতে উঠিলে আমার স্ত্রীকে আমার দুর্দ্দশার কথা বলিলাম। তিনি কাঁদিয়া আকুল—বলিলেন, 'তুমি সুখে আছ জানিলে আমি কিছুতেই এখানে আসিতাম না। তুমি কষ্ট পাইতেছ মনে করিয়াই আমি পাগল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছি। যাহা হউক, তুমি আমাকে আজই ফিরাইয়া পাঠাও, না হয় আমাকে একটী পৃথক্ বাড়ী করিয়া দাও, আমি ও-বাড়ীতে কিছুতেই যাইব না।' গাড়ী বাড়ীর দরজায় আসিল,—আমি চক্ষু মুদাইয়া দিলাম, তিনি নামিলেন।

"প্রথম ছয় মাস এক রকমে কাটিয়া গেল—বিশেষ গণ্ডগোল আমি বুঝিতে পারি নাই। ক্রমেই বুঝিলাম যে, আর চলে না। আমি যাহা কিছু টাকা আনি, সালোয়া তাহা সমস্তই হস্তগত করে—বর্ম্মিজ খানসামা মংলে যাহা ইচ্ছা খরচ করে—আমার কোন কথা কেহ শুনে না। আমার স্ত্রীর উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিতেছিল, তাহারও কিছু-কিছু আভাষ পাইলাম।

"আমি একদিন সালোয়াকে বলিলাম, "আমার শরীর এখানে ভাল নাই—আমি দেশে ফিরিয়া যাইব।"

সালোয়া বলিল, ভালই, "আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "তাহা কি হয়?"

সালোয়া বলিল, "তবে তোমার স্ত্রীকে এখানে রাখিয়া যাইতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "তাও কি হয়?"

সালোয়া একটু বিদ্রূপাত্মক-স্বরে বলিল, "তিনি বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই থাকিবেন।"

আমি একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "সে কি কথা?"

সালোয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "তুমি যদি কোনও রূপ চালাকি করিতে যাও, তাহা হইলে তোমার অন্তঃস্বত্বা স্ত্রীকে আমি খুন করিব, অথবা করাইব। আমরা এ বিষয়ে সিদ্ধ-হস্ত, তাহা জান ত।"

আমি নীরব হইলাম।

আমি তাহার পর দুই-একদিন মাত্র টঙ্গুতে থাকিয়া মফঃস্বলে ২।৩ মাস কাটাইয়া কাটাইতে লাগিলাম। আমার স্ত্রী যে-দিন একটী কন্যা প্রসব করিলেন, আমি সেদিন টঙ্গুতেই ছিলাম। একজন ফুঙ্গি সেইদিন আমার এই গৃহে আসিয়া আমাকে বুঝাইলেন যে, সন্তান হইয়াছে বলিয়া আনন্দ করিতে নাই। তিনি বলিলেন যে, সংসার অনিত্য, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা অনিত্য, মায়া অনিত্য, সকলই অনিত্য। অবশ্য 'অনিত্য' কথাটা তিনি 'অনিটা' বলিয়া উচ্চারণ

করিতেন। আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম যে, মেয়েটার নাম রাখিতে হইবে 'অনিতা'।"

আগন্তুক ফুঙ্গি আর কথা শেষ করিতে পারিলেন না,—আমার স্ত্রী "বাবা" বলিয়া ফুঙ্গির চরণমূলে লুটাইয়া পড়িলেন—বলিলেন, "বাবা! আমিই তোমার সেই অনিতা।"

ফুঙ্গি কহিলেন, "অনিতাই বটে! তোমার মুখখানি একেবারে ঠিক তোমার মা'র মুখের মত হইয়াছে। শোন তারপর—সকল কথা ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারিতেছি না। একদিন টঙ্গু হইতে দশ ক্রোশ দূরে একটা বাংলোতে আমি আছি, সেইদিন সন্ধ্যায় সাগোয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। আমাকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, এই কথা নানা ভাবে, ভঙ্গীতে ও কথায় আমাকে জানাইল। তারপর বলিল, 'আমার কথা ত তুমি বিশ্বাস করো না—আমি নিত্য যাহা চক্ষে দেখিতেছি, আমার সঙ্গে গেলে তোমাকে তাহা দেখাইতে পারি।' তাহার কথা আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস না হইলেও, কেমন ইচ্ছা হইল যে, আচ্ছা একবার দেখিই না। তার পরদিন দ্বিপ্রহরে মোটরে আমরা টঙ্গুতে আসিলাম। সাগোয়া বাহির হইতে কি কৌশলে এই ঘরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিল। তখন যাহা দেখিলাম, তাহা বিস্ময়কর! আমার স্ত্রী তাহার কন্যাকে লইয়া যে বিছানায় নিদ্রামগ্ন, সেই বিছানারই এক পার্শ্বে মংলে শুইয়া রহিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী যেন মনে হইল একটা বিরাট মিথ্যা, প্রবঞ্চনা। তাহার পরেই সমস্ত বিষয়টা যে সাগোয়ার ষড়যন্ত্র ও চাতুরী, তাহা বিদ্যুতের মত মনের মধ্যে ঝলসিয়া উঠিল। মংলে জাগিয়া ছিল, তাহা বুঝিলাম; আমাদের গৃহ-প্রবেশের পর যেন নিদ্রিত অবস্থায় আমার স্ত্রীর গাত্রে হাত দিতে গেল। আমি "সাবধান" বলিয়া চীৎকার করিয়া গৃহ-কোণে বিলম্বিত দা হাতে লইলাম। মংলে যেন আমার সম্মুখেই বলপূর্ব্বক আমার স্ত্রীর অপমান করিবে এইরূপ ভাব দেখাইতে লাগিল। আমি সজোরে সেই দা মংলের হাতে বসাইয়া দিলাম, মংলের হাত কাটিয়া দা মাথায় লাগিল, সে অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, রক্তস্রোতে ঘর ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সাগোয়া মংলেকে তাহার কোলের উপর লইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমার স্ত্রী উঠিয়া আমার হাত হইতে দা কাড়িয়া লইয়া একটা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিলেন; আমাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। তিনি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমাকে বলিলেন, "আমি ত সাগোয়ার বিষয় তোমাকে কিছুই বলি নাই, তুমি কেন এই বিপদ ঘটাইলে।"

কিছুক্ষণ পরে মংলে হাসপাতালে গেল, আমি হাজতে গেলাম। সকল কথাই শুনিলাম। মংলে সাগোয়ার প্রেম-পাত্র; আমি তাহাদের অর্থ যোগাইবার কল মাত্র। আমার স্ত্রী স্বচক্ষে প্রত্যহ সকল দেখিয়া-শুনিয়া আমার মনে ব্যথা লাগিবে বলিয়া নীরবতার প্রতিমূর্ত্তি হইয়াছিলেন, নীরবে প্রতিদিন প্রতি-মুহূর্ত্তে কি বৃশ্চিক-দংশন সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা আর কি করিয়া বলিব।"

ফুঙ্গি নীরব হইলেন—তাঁহার পার্শ্বে ভূপতিত একতারাটীর তারে দুই একবার একটু আঘাত করিলেন, আমার স্ত্রী ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিলেন।

ফুঙ্গি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "শোন অনিতা! কাঁদিও না। দায়রায় বড় বড় এডভোকেট আমার পক্ষে ওকালতি করিয়াছিলেন—কিন্তু আমার সাত বৎসরের কারাদণ্ড হইল। কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়াই এই গৃহে ফিরিয়া আসিলাম;—দেখি মংলে ও সাগোয়া স্বামী স্ত্রীর মত এখানে বাস করিতেছে। মংলে আমাকে দেখিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "আবার মারিবে না কি? তোমার হৃদয়-উদ্যানের এই সাগোয়াকুসুম আবার আঘ্রাণ করিবে না কি?"

আমি বলিলাম, "না।"

সাগোয়া হাসিয়া বলিল, "আমাদের এই প্রেমোদ্যানের ঝাড়ুদারি করিবে?"

আমি বলিলাম, "না"।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার স্ত্রী কোথায়?"

সাগোয়া বলিল, "মংলেকে না পাইয়া প্রাণের আবেগে আত্মহত্যা করিয়াছে।"

আমার মনে হইল, তাঁহার পক্ষে আত্মহত্যা করা কিছু বিচিত্র নহে। আমি পুনরায় বলিলাম, "আমার কন্যা কোথায়?" সাগোয়া বলিল, "আমরা রেঙ্গুনে বেচিয়া আসিয়াছি।" কোন কথা না বলিয়া আমি সেই গৃহ হইতে বাহির হইলাম। তাহার পর কত স্থানে তাঁহাদের অনুসন্ধান

করিয়াছি, দেশে গিয়া পর্য্যন্ত খুঁজিয়াছি, কিন্তু সবই বৃথা হইয়াছিল।"

আমার স্ত্রী বলিলেন, "কি করিয়া খোঁজ পাইবেন, আমার মা আমাকে লইয়া তাঁহার বাপের বাড়ী ছিলেন, তিনি ত কলিকাতায় ছিলেন না।"

ফুঙ্গি। তার পর পৃথিবীর সকলই অনিত্য, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য, সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য, নির্ব্বাণের আশায় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের অল্প দিন পরেই ফুঙ্গি হইলাম। কিছুদিন টঙ্গুতে স্থইতাজা প্যাগোডায়, কিছুদিন রেঙ্গুনে সিউডেগন প্যাগোডায় কাটাইলাম। তার পর পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আজ সাত বৎসর পরে পুনরায় টঙ্গুতে আসিয়াছি।"

আমার স্ত্রী বলিলেন "আমার মা আমাকে লইয়া আমার মাতুলালয়ে যতদিন ছিলেন, তিনি হাতের শাঁখা খুলেন নাই ও মাথায় সিন্দুর দিতে ভুলেন নাই, আর সর্ব্বাংশে বিধবার আচরণ করিতেন। কোনও আমোদ প্রমোদ হাসি তামাসায় কখনও যোগ দেন নাই, বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন। চক্ষের জলই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। আপনার কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কেবল বলিতেন, আপনি নিরুদ্দিষ্ট। আমাকে পর্য্যন্ত কোন দিন কোন কথা বলেন নাই, তবে যখন-তখনই বলিতেন 'তোর বিয়ে দিতে পারিলেই আমি বর্ম্মায় একবার যাব।' ওঁকে ত তিনিই জোর করে এখানে ওকালতি করতে এনেছিলেন। এখন বুঝ্‌তে পারছি সব,—এখন বুঝ্‌তে পারছি,—বড় আশা ছিল যে, একদিন আপনার দেখা পাবেন, আপনার পায়ে মাথা রেখে জীবনের অবসান করবেন। তাঁর সে বাসনা আর পূর্ণ হোলো না বাবা! এতদিন পরে আজ চারি দিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বাবা গো! আর চার দিন আগে এলেই আমার হতভাগিনী মায়ের চিরজীবনের আশা পূর্ণ হোতো।"

এই কথা শুনিয়া ফুঙ্গি এমন এক বিকট চীৎকার করিলেন যে, বাহিরের বজ্রনির্ঘোষ তাহার নিকট কিছুই না বলিয়া মনে হইল। আমার দুই বৎসরের পুত্র ধাইএর নিকট এতক্ষণ ঘুমাইতেছিল, এই বিকট চীৎকারে তাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে মাতালের মত পা ফেলিতে-ফেলিতে 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে আমার স্ত্রীর কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে ফুঙ্গির দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল, "ও"।

আমার স্ত্রী —"উনি তোমার দাদা।"

আমার ছেলে 'দাদা' 'দাদা' বলিতে-বলিতে হাততালি দিতে দিতে ফুঙ্গির দিকে অগ্রসর হইল।

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমার স্ত্রী মাটিতে জানু পাতিয়া যুক্তকরে অশ্রুসিক্ত নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাবা! আমি আর আপনাকে কোথাও যাইতে দিব না, এইখানেই জীবনের শেষ কয়টা দিন থাকিতে হইবে।"

তিনি বলিলেন, "আমি ফুঙ্গি। আমাদের সুখ নাই, দুঃখ নাই, সংসার অনিত্য।"

আমার স্ত্রী বলিলেন "ও কথা আমি শুনিব না।"

ফুঙ্গি আ-হা-হা-হা বলিয়া আবার একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমার শিশু ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিল; স্ত্রী তাহাকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। ইত্যবসরে ফুঙ্গি গৃহ হইতে বাহির হইয়া সেই ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—ভীষণ বজ্রনিনাদের সঙ্গে তাঁহার আর একটা "আ হা হা হা" বিকট রব শ্রুত হইল।

তাহার পর বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার আর কোনও সন্ধান পাই নাই।

ভ্রষ্ট-নেতা

(রবার্ট ব্রাউনিং)

[শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

মুঠোখানেক রূপোর তরে দলপতি গেলেন পরের কোটে
চলে গেলেন দলকে ছেড়ে তক্‌মা-নামক টুক্‌রো ফিতের লোভে ;
লাভ ক'রেছেন একটি জিনিস্ অদৃষ্ট যা' ছোঁয়নি মোদের মোটে,
হারিয়েছেন আর বাকী সবই যা' মানুষের নিশান হ'য়ে শোভে।

মোহর যাদের হাতের মলা, রেজ্‌কী মুঠো তারাই দেছে ওঁকে,
প্রচুর আছে, দেবার বেলা ছিটেফোঁটায় কাজ সেরেছে তবু,
চাঁদা ক'রে তাঁবার কাঁড়ি ওঁর সেবাতে ঢাল্‌ত দেশের লোকে,
ন্যাক্‌ড়া পেয়ে হরফ-তোলা এত খুসী হয় কি মানুষ কভু !

শ্রদ্ধা-প্রীতির অর্ঘ্য নিয়ে পিছন-পিছন ফিরেছি ওঁর মোরা,
সিংহ-চোখের দীপ্ত আলোয় উঁচিয়ে মাথা ফিরেছি গৌরবে !
নিইছি মোরা বুক পেতে ওঁর ওজস্বিনী বাণীর পাগ্‌লা-ঝোরা,
মরা বাঁচার কর্ত্তা মেনে, চলেছিলাম যেতে মাভৈঃ রবে।

দেশের কবি, ভক্ত, ভাবুক, দেশের সেরা মনীষি আর ঋষি
তাকিয়ে তাঁরা স্বর্গ-সীমায় নিমেষ-হারা চেয়ে মোদের দিকে,
স্বাধান-মনের ফৌজ হ'তে হাঁটুগাড়ার দলে হঠাৎ মিশি'
[illegible]ই শুধু পিছিয়ে গেলেন, গোলাম হ'লেন খামকা খৎ লিখে !

[illegible] তরই পন্থা ধ'রে চ'ল্‌ব মোরা ওঁর অনুপস্থিতেই,
[illegible] যোগাবে চিত্তে মোদের—ওঁর বাণী নয়—আর কারো বাগ্মিতা
কর্ম্ম ধারা চল্‌বে আগে, সমান বেগেই, সন্দেহ তায় নেই,
ওঁর হুকুমে হেঁট কে হবে, বাকী যখন শেখায় শৌর্য্য-গীতা !

নাম কেটে দাও ভ্রষ্ট-নেতার, মুছে ফেল সকল হিসাব থেকে,
নিম্নগামী আরেক আত্মা, আরেক মুখে কাজ-নারাজের বাণী
অপদেবের পড়্‌ছে ডঙ্কা দেব-দূতেদের লজ্জাতে মুখ ঢেকে,
বিশ্বনরের আরেক হানি, বিশ্বনাথের আরেক দফা গ্লানি।

বিচার

[মৌলবী তরিকুল আলম্ এম-এ, বি-এল]

মতি মিজি ছোট বেলায় গ্রামের মক্তবে পড়েছিল, তাই তার মিজি উপাধি। খুব সাদাসিদে মানুষ। বেশী কথা বলে না। আপনার জমি চাষ করে, নমাজ পড়ে, আর একলাটি ঘরে বসে-বসে ভাবে। যে-দিন মন বড্ড খারাপ হয়, সে-দিন ছেলেবেলার বস্তানি থেকে কেতাব বের করে সুর করে পড়ে,

"কারিমা বেবখশ্ আয় বর্হালেমা
কে হস্তেম আছিরে কমন্দে হাওয়া।"

মতি মিজির দুঃখ কর্বার অনেক কারণ আছে। এক নম্বর, তা'র স্ত্রী নসিবন তিন দিনের একটী মেয়ে রেখে আজ পনের বছর হলো মরে গিয়েছে। তার কথা মনে পড়্লে মতি মিজির চোখ আজও ছল-ছল করে ওঠে। আল্লা তা'কে বেহেস্ত নসিব করুক, খোদা তোমার মর্জ্জি, —এই সমস্ত বলে মিজি কোনমতে মনকে প্রবোধ দেয়। অনেক পীড়াপীড়িতেও সে আর বিয়ে করে নি। দ্বিতীয় নম্বর, তার মেয়ে হাফিজনের আজ এক বৎসর হলো বিয়ে হয়ে গিয়েছে। জামাইটী ভাল; কিন্তু বেহাই, বেহাইন লোক বড় ভাল নয়। এক গ্রামেই বাড়ী, তবুও সেই যে ঘর-চিনানির পর তাকে নিয়ে গিয়েছে, আর তাকে আস্তে দেয় নি। মতি মিজিও মেয়েকে দেখ্তে তা'র শ্বশুরবাড়ী যায় নি। কেবল ঘরের ভেতর শুয়ে-শুয়ে তার কথা ভেবেছে। তৃতীয় নম্বর, আজ ক'দিন থেকে তা'র মনটার ভেতর কি যেন একটা অজানা-অচেনা দুঃখ এসে বাসা করেছে। জ্ঞান হওয়া অবধি মিজি কোন দিন নমাজ কাজা করে নি। এম্‌নি করে তা'র চল্লিশ বৎসর কেটে গিয়েছে। হঠাৎ একদিন তার মনে হলো, এদ্দিন ধরে কি করেছি? রোজ পাঁচবেলা করে কি সমস্ত আউড়িয়ে গিয়েছি? তার মানে ত মাথামুণ্ডু কিছুই জানা নেই! যা আউড়িয়েছি, তাও যে শুদ্ধ করে আওড়াতে পেরেছি, এমনও ত মনে হয় না। সে-দিন মৌলানা সাহেব ওয়াজ করে গেলেন,—যারা কোরাণ অশুদ্ধ ভাবে পড়ে, তারা কাফের, —তারা জাহান্নামে যাবে। জাহান্নামের কথা স্মরণ হ'লে মিজির শরীরটা কেঁপে ওঠে। উঃ! সেখানে অহরহ আগুনে পুড়্তে হবে, আর খুব পিপাসা লাগ্‌লে ফুটন্ত জল খেতে হবে। উঃ আল্লা রহ্‌মান, রহিম! আমি ত ইচ্ছা করে অশুদ্ধ করে পড়ি নি। আমি তোমার এবাদত করেছি মনে করেই, যা কিছু করেছি—করেছি, তবুও কি আমাকে জাহান্নামে যেতে হবে? তবে কি মৌলানা সাহেব মিথ্যা বলে গেলেন? মৌলানা সাহেবের ওয়াজ শোনা অবধি মতি মিজির মনটা একটা পর্ব্বত-প্রমাণ বোঝার চাপে যেন একেবারে নুইয়ে পড়েছে। চতুর্থ নম্বর, মানুষের কাণ্ড-কীর্ত্তি দেখে মতি মিজির মনটা পৃথিবীর উপর বিতৃষ্ণায় একেবারে ভরে গিয়েছে। গ্রামের মাতব্বর দরবেশ গোলদার সে-দিন অম্লান বদনে হলপান বলে গেল, রহিম বলি চোর, চুরি করে খায়; অথচ রহিম বলি আপনার প্রাণকে তুচ্ছ করে সে-দিন যদি পাগ্‌লা মোষটাকে না থামাতো, তা হ'লে মাতব্বরের মাতব্বরি সেই দিনই শেষ হতো।

একে শীতের দিন, তাতে আবার মেঘলা, তায় সন্ধ্যা। টিপ টিপ করে একটু-একটু বৃষ্টি পড়্ছে। আর কন্‌কনে উত্তরে হাওয়া বইছে। আজ মিজির ভেতর-বাহির সমান অন্ধকার। তাই মগরেবের নামাজ পড়ে, ছেড়া কাঁথাখানা গায়ের উপর ভাল করে টেনে নিয়ে, একটা কুপির আলোতে মিজি সুর করে পড়্তে লাগ্‌লো,

"কারিমা বেবখশ্ আয় বর্হালেমা
কে হস্তেম আছিরে কমন্দে হাওয়া।"

হাফিজনের মার কথা মোটেই মনে পড়ে না। মনে পড়ে কেবল বাপজানের কথা। বাপজান তাকে কতই না আদরে, কতই না যত্নে সেই ছোট্ট থেকে মানুষ করেছেন। বাপজানের আদরে তার একদিনের তরেও মনে হয় নি যে তার মা নেই।

হাফিজন স্কুলে-পড়া মেয়ে। বেশ চালাক চতুর।

মতি মিজি সেকেলে লোক। একটুখানি আরবী-পার্শী পড়েছে। বাঙ্গালায় নামটা কোনমতে দস্তখত করতে পারে।

এমন লোক যে মেয়েকে স্কুলে পড়াবে, এটা নিজ চোখে না দেখলে, শুনে বিশ্বাস করবার মত কথা নয়; কিন্তু এটা সত্যি যে, মতি মিজি গ্রামের মাতব্বর দরবেশ গোলদার ও অন্যান্য অনেক মাতব্বর ও অমাতব্বরের নসিহৎ অবহেলা করে হাফিজনকে স্কুলে পাঠিয়েছিল। তার কারণও ছিল। তাদের পাশের গ্রামের আব্দুল হামিদ সে-বার বি-এ পাশ করেছে। যে দিন তার পাশের সংবাদ এলো, সে-দিন আব্দুল হামিদ মনে-মনে একটা সঙ্কল্প স্থির করল। সে একটু চিন্তা করে দেখল যে, তার বি-এ পাশ বা ফেল করাতে তার দেশের বা জগতের বিশেষ কোন আস্‌ছে-যাচ্ছে না, যদ্দিন না সে সেই পাশ-করা বিদ্যাটা দেশের বা জগতের উপকারে লাগাচ্ছে। তার পর প্রশ্ন হলো, জগতের উপকার সব চেয়ে কিসে বেশী হবে? এবং এমন কোন্ সে কাজ, যা' তার আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে? অনেক রাত ভেবে-ভেবে সে ঠিক্ করল যে, দেশের সব চেয়ে বেশী উপকার হবে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার করলে। যেমন সঙ্কল্প, তেমনি কাজ। পরের দিনই হামিদ গ্রামে বের হয়ে পড়লো। ঘুরতে-ঘুরতে সে মতি মিজির গ্রামে এলো। এসে দেখল, দরবেশ গোলদারের কাচারিতে কিসের একটা সভা বসেছে। এই তার মস্ত একটা সুযোগ মনে করে' সে গোলদারের কাচারিতে গিয়ে উঠল।

তার পর একথা-সেকথার পর, সে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা সুরু করে দিল। কথাটা মুহূর্ত্তের মধ্যে গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে গেল। এক দুই করে আরও অনেকে এসে সেখানে জমা হলো। তাদের মধ্যে একজন ছিল মতি মিজি। তখন হামিদ বলছিল, "আপনারা বোধ হয় বলবেন যে, মেয়েরা লেখা-পড়া শিখে কি করবে,—তারা ত চাকুরি করতে পারবে না! সত্যি কথা—তারা চাকুরি করতে পারবে না। কিন্তু চাকুরি করা ছাড়া তার আর কি কোন উদ্দেশ্য নাই? এত যে ছেলেরা পড়ছে, তারা কি সবাই চাকুরি করছে?" কে একজন বলে উঠল, "তারা বিষয়-কর্ম্ম দেখে।" হামিদ বলতে লাগল, "চাকুরি আর বিষয়-কর্ম্ম ছাড়া লেখা-পড়া শেখবার আর কোন দরকার নেই কি? আপনারা আমাকে বলতে পারেন কি, আজ পৃথিবীর সব জায়গায় মুসলমানদের এমন হীন অবস্থা কেন? তারা আজ সবার লাথি-গুঁতো খাচ্ছে কেন? আপনারা কখন ভেবে দেখেছেন কি?—না।" একজন বলল, "আল্লার হুকুম।" "সত্য, কিন্তু আল্লা ত বারবার বলেছেন, তিনি কারুর উপর অন্যায় অত্যাচার করেন না। তা'হলে এটা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, মুসলমানেরা কোন রকমে আল্লার অবাধ্যতা করেছে। সেই অবাধ্যতার মধ্যে একটী হচ্ছে মেয়েদের শিক্ষা না দেওয়া। তারাও মানুষ ত,—পশু ত নয়! তার শরীর যেমন একটা আছে, তার আত্মা বলে তেমনি একটা জিনিষ আছে। শরীরের পুষ্টির জন্য যেমন ভাত-কাপড় দরকার, আত্মার জন্যও তেমনি দরকার। আত্মার পুষ্টি হচ্ছে জ্ঞান অর্জ্জন করাতে। যে জাতের পুরুষেরা শুধু ভাত খায়, আর মেয়েদের উপোসী রাখে, সে জাতের উপর আল্লার গজব নাজেল হবে, এ আর আশ্চর্য্য কি?" বক্তৃতা শেষ হলো।

হামিদ মিনিট কয়েক চুপ করে বসে থেকে, আবার দাঁড়াল; বলল, "আমি শুধু বক্তৃতা করে চলে যেতে আসি নি। আমি একটা বালিকা-স্কুল খুলবো,—আপনারা কে কে তাতে মেয়ে দেবেন, আমাকে বলুন।" সভায় যারা ছিল, তারা ভেবেছিল যে, হামিদ বুঝি বক্তৃতার পর টুপিটা খুলে সবার কাছে ধরবে;—মৌলানা সাহেব পাগড়ী বিছিয়ে দেন; হামিদের ত পাগড়ী নেই,—দু'চার আনা যার যা ইচ্ছে দেবে। তারা দু'চার আনা দিতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এ যে একেবারে মেয়ে চেয়ে বসল। সবাই তখন মুখ-চাওয়া-চাওই আরম্ভ করল। দরবেশ গোলদার চোখ টিপে টিপে সব্বাইকে নিষেধ করে দিল। গোলদার-বাড়ীর মুন্সিজি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, "আরে কিতাব মে লিখ্যা হ্যায়, আওরৎ নাকেস আকেল হ্যায়। গাধাকে পিঠ পর কেতাবকা বোঝা রাখনেসে ক্যোয়া গাধা কভি আদমি হোতা হ্যায়?" মতি গোলদার, তার সঙ্গে অন্যান্য গোলদার, সিকদার, বসী, খুনি প্রভৃতি সব্বাই মাথা দুলিয়ে মুন্সিজির কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করল। হামিদের উৎসাহ এক মুহূর্ত্তে একেবারে জল হয়ে গেল। তার

সুন্দর মুখখানি একেবারে ছোট্ট হয়ে গেল। সে উঠে দাঁড়াল। কেবল 'গেলাম' বলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। মতি মিজি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল। হামিদ তাকে না দেখে পাশ-কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, এমন সময়ে মতি মিজি তার কাঁধের উপর হাত রেখে বল্ল, 'বাবা, তোমার বালিকা-স্কুল কবে খুল্বে?' হামিদ ফিরে দাঁড়াল। তার ইচ্ছা হচ্ছিল, লোকটার কদম বোসি করি; কিন্তু সামলিয়ে নিল। সেলাম করে' বল্ল, 'আপনি মেয়ে দিলে আজই খুলি।' মতি একবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখ্‌ল; তার পর আস্তে-আস্তে বল্‌ল, 'আজ বেলা হয়ে গিয়েছে বাবা, আজ কাজ নেই,··· কাল থেকে খুলো। আজ চল, আমাদের ওখানে দু'টো নুন ভাত খেয়ে যাও।' হামিদের মনে আনন্দ আর তখন ধরছিল না। সে রাজি হয়ে গেল। মতি আর হামিদ মতি মিজির বাড়ীর দিকে গেল।

মতি গোলদার এতক্ষণ অবাক্ হয়ে তাদের কাণ্ড দেখ্‌ছিল। তারা চলে গেলে যেন আপন মনে বল্‌ল, 'উঁহু; তার কোন আশা নেই হে! তোমার মেয়ে বড্ড ছোট্ট যে।' উপস্থিত সব্বাই ইঙ্গিতটা বুঝে, হো-হো করে হেসে উঠ্‌ল। একজন স্পষ্টবাদী স্পষ্টতর করে বলে ফেল্‌ল "আরে তুমিও যেমন গোলদার। কোথায় আব্দুল হামিদ বি-এ পাশ, আর কোথায় মতি মিজির ঐ প্যাঁটু-প্যাঁটে সাত বছরের মেয়ে। তবুও তোমার মেয়েটা হলে না হয় বুঝ্‌তাম।' গোলদার মুখে কোন উত্তর করল না বটে, কিন্তু চেহারা দেখে মনে হলো, সে যেন খুসীই হয়েছে। সেই অবধি হামিদের স্কুলে হাফিজন লেখা পড়া করেছে। হামিদ তাকে খুব যত্ন করেই শিখিয়েছে। তার ওপর মেয়েও বেশ চালাক,··· হামিদের শ্রম সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে।

তার পর এক বছর হলো হাফিজনের বিবাহ হয়েছে। দরবেশ গোলদারের পুত্র আব্দুর রহমান হাওলাদার, ওরফে আব্দুর রহমান চৌধুরী, তার পাণি-প্রার্থী ছিল। আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আহাম্মদ আখনের ছেলে ইদ্রিস আখন্। দরবেশ গোলদারের ইচ্ছা ছিল না···মতি মিজির সঙ্গে সম্বন্ধটা করে। কিন্তু ছেলেটা একেবারে নাছোড়;...তার মার মার্ফৎ ভয় দেখিয়েছে, এ বিয়ে না হলে, সে বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যাবে। কাজেই, বাধ্য হয়েই দরবেশকে মতির কাছে কথা পাড়তে হয়েছিল। সে ত জান্‌তই যে, মতিকে বল্লেই সে হাঁ কর্‌বে। তাই যদিও খপর পাচ্ছিল যে, আহাম্মদ আখন তার ছেলের জন্য কথা প্রায় পাকাপাকি করে ফেলেছে, তবুও সে বড় গা লাগাচ্ছিল না। শেষে একদিন স্ত্রীর, তথা পুত্রের, তাড়া খেয়ে, মতির কাছে কথা পাড়্‌ল। কিন্তু মতির উত্তরটা যখন তার কাণে গেল, তখন কিন্তু বিশ্বাস হল না। চারি দিকে চেয়ে মতিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে না বল্লে? আমাকে?' মতি উত্তর কর্‌ল 'হাঁ।' দরবেশ গোলদারের চোখ দুটো রাগে লাল হয়ে গেল,—এত বড় অপমান তাকে! একরকম ধমকিয়েই জিজ্ঞাসা কর্‌ল, 'কেন?' মতি উত্তর কর্‌ল, 'তোমার ছেলে মদ খায়।' দরবেশ গোলদার রাগে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে, মতি মিজির দাড়ি ধরে' ঠাস্ করে একটা চড় লাগিয়ে দিল। চারিদিক থেকে হাঁ-হাঁ কর্‌তে কর্‌তে লোক দৌড়িয়ে এসে, দুজনকে তফাৎ করে দিল। দরবেশ গোলদার রাগে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপ্‌ছিল, আর এক-একবার তার রক্তবর্ণ চোখ দুটো থেকে আগুনের ঝলক বেরিয়ে, যেন মতিকে একেবারে পুড়িয়ে ছাই কর্‌তে চাচ্ছিল। হাফিজন দেউড়িতে দাঁড়িয়ে সব দেখ্‌তে পাচ্ছিল। সে ছুটে এসে বাপের হাত ধরে টেনে ভিতরে নিয়ে গেল।

তারপর আর বিলম্ব হলো না,—ইদ্রিস আখনের সঙ্গে হাফিজনের বিয়ে হয়ে গেল।

ইদ্রিস আখন ইংরেজী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েছিল। ছোট্ট বেলা থেকেই তার বুদ্ধি-শুদ্ধি কম। চোখ দুটো তার ভাসা-ভাসা, বড়-বড়—সদাই যেন তা থেকে জল ঝরছে। সে যখন বড় বড় চোখ দুটো ফিরিয়ে কারো দিকে তাকাত, তখন মনে হতো, যেন একটা হরিণের বাচ্চা প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে ব্যাধের দিকে তাকাচ্ছে। তার চাউনির মধ্যে আর কোন ভাবের খেলা কোন দিন দেখা যেত না। ইদ্রিসকে মতি মিজি হাফিজনের জন্য কেন যে বেছে বের করেছিল, তার সঠিক কারণ এখনও কেউ বল্‌তে পারে না। তবে গোলদার-বাড়ীর মুন্সিজি বলেন,—

"হাম জেনস্ বা হাম জেন্স কুনদ পরওয়াজ।
কবুতর বা কবুতর বাজ বা বাজ॥"

শ্বশুর যেমন বোবা, জামাই তেম্‌নি বোবা; যেমন শ্বশুর গাধা, তেমনি জামাই গাধা। একজন একদিন আপত্তি করে বলেছিল, মতি মিঞি গাধা। উত্তরে মুন্সিজি হিন্দিতে বলেছিলেন, "আরে, গাধা নাহি হোনেসে কোই আপনা লাড়্‌ককো স্কুলমে ভেজতা হ্যায়, না গোলদারকে লড়কাকো ছোড়কে ইদ্রিসকে সাথ লেড়্‌কিকে সাদি দেলাতা হ্যায়।"

বিয়ের মাস কয়েক পর ইদ্রিসের বড্ড ব্যারাম হলো। তখন আহাম্মদ কি জরুরি কাজে বাড়ী ছেড়ে দিন-কয়েকের জন্য কোথায় গিয়েছিল,—বাড়ীতে পুরুষ মানুষ আর কেউ ছিল না। হাফিজন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বই দেখে ইদ্রিসকে দুই-এক ফোঁটা ঔষধ দিল; কিন্তু ফল কিছুই হলো না; বরং উল্টো, পেটে বাতাস ধরে একটা উপসর্গ বেড়ে গেল। শ্বাশুড়ীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, 'মা, এখন কি করি?' শ্বাশুড়ী এই শিক্ষিতা বউটীকে দু'চোখে দেখ্‌তে পার্‌তেন না,—ঝাঁঝিয়ে উত্তর কর্‌লেন, 'যা পার, করগে।' হাফিজন ঘরে এসে অনেকক্ষণ ভাব্‌ল। তার পর হামিদকে একখানা চিঠি লিখে, পাশের বাড়ীর গেন্তুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল। তখন রাত বোধ হয় ৮টা। চিঠি পেয়েই হামিদ তার ঔষধের বাক্স আর বই নিয়ে হাজির হলো। হাফিজন তাকে স্বামীর কাছে নিয়ে গেল। হামিদ থার্ম্মমিটার দিয়ে দেখ্‌ল, ১০৫° ডিগ্রী জ্বর। কোন কথা না বলে, সে ইদ্রিসের চিকিৎসা আর শুশ্রূষায় লেগে গেল। হাফিজন পায়ের দিকে বসে, ইদ্রিসের পায়ে হাত বুলাতে লাগ্‌ল। এমনি করে দু'রাত দুদিন কেটে গিয়ে ইদ্রিসের জ্ঞান হলো। পরদিন আহাম্মদ এসে উপস্থিত হলো। ইদ্রিসের মা কি জানি তাকে কি বলে দিয়েছিল।, এসে সেই হামিদকে বিদায় করে দিল। তার পর ইদ্রিস ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠ্‌ল; কিন্তু তার যেটুকু বুদ্ধি ছিল, তাও লোপ পেল; আর সেই সঙ্গে একটু স্মরণ-শক্তি যা ছিল, তাও গেল। আরও মাস-কয়েক গেল। হাফিজনের গা-বমি-বমি করতে আরম্ভ কর্‌ল; আনুষঙ্গিক আর-আর লক্ষণও ক্রমশঃ প্রকাশ পেতে লাগল। কথাটা একাণ-সেকাণ হতে-হতে, গ্রামের কারও জান্‌তে বাকী রইল না লক্ষণটা কিন্তু শ্বাশুড়ীর চোখে প্রীতিকর ঠেক্‌ল না। একে ত দজ্জাল মেয়ে—স্বামীকে পেয়ে বসেছে; তার ওপর যদি বেটা হয়, তা'হলে ত সে-ই বাড়ীর মালিক হবে, বুড়ো আহাম্মদ আথন আর ক'দিন।

আরও দিন-কয়েক গেল। একদিন ইদ্রিস তাদের গ্রামের খালের ধার দিয়ে কোথায় যাচ্ছিল—এমন সময়ে আব্দুর রহমান হাওলাদারের সঙ্গে দেখা হলো। আব্দুর রহমানও শুনেছিল; তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "হ্যাঁরে পাগ্‌লা, তোর না কি ছেলে হবে?" ইদ্রিস একবার নিজের পেটের উপর হাত বুলিয়ে বল্‌ল, "কই, না!" আব্দুর রহমান ত হেসেই খুন "আরে দূর পাগ্‌লা! তোর ছেলে কি তোর পেটে হবে? হাফিজনের পেটে হবে।" "কেন, আমার ছেলে হাফিজনের পেটে কেন?" "তাকে যে তুই বিয়ে করেছিস্ রে।" ইদ্রিস হঠাৎ ক্ষেপে উঠে, ক্রমাগত চীৎকার করে বল্‌তে লাগ্‌ল, "ছেলে কথ্‌খন না—কথ্‌খন না, কথ্‌খন না।" আব্দুর রহমান কতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বল্‌ল, "যা পাগ্‌লা, বাড়ী যা।"

আব্দুর রহমান বাড়ীতে পৌঁছেই তার স্ত্রীর সাম্‌নে গল্পটা কর্‌ল। তার স্ত্রী তাকে একটু বস্‌তে বলে, দৌড়িয়ে গিয়ে মাকে বলে এল। মা কেবল ছটফট কর্‌তে লাগ্‌ল—গোলদার কতক্ষণে বাইরের কাচারী বরখাস্ত করে' ভিতরে আস্‌বে। বেশী দেরী হলো না। ঘরে কাসির শব্দ শুনেই, আব্দুর রহমানের মা হাতের কাজ ফেলে, ঘরে গিয়ে গোলদারকে গল্পটা বল্‌ল। গোলদার শুনে চুপ করে রইল।

তার পর কথাটা রাষ্ট্র হয়ে, ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে হাফিজনের শ্বাশুড়ীর কাণে গেল; এবং অবশেষে হাফিজনের কাণেও গেল। হাফিজন সেই রাত্রেই ইদ্রিসকে জিজ্ঞেস কর্‌ল, "তুমি এমনি বলেছ?" ইদ্রিস বল্‌ল, "হাঁ।" "তবে আমার পেটে কার ছেলে?" "আমি কি জানি!" হাফিজনের মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল,—সে কাঁপ্‌তে-কাঁপ্‌তে সেখানে বসে পড়্‌ল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে ইদ্রিসের মা ওৎপেতে শুন্‌ছিল। সে স্বামী ও স্ত্রীর সমস্ত কথাবার্ত্তা শুন্‌ল, আর হাফিজনের অবস্থা দেখ্‌ল। সে রাত্রে

হাফিজনের ঘুম হলো না,—সে ভোরবেলা উঠে, এক চিঠি লিখে হামিদের কাছে পাঠিয়ে দিল; লিখে দিল, তার বড্ড বিপদ, যেন একবার তার সঙ্গে হামিদ দেখা করে। হামিদ চিঠি পেয়ে একবার ইতস্ততঃ করল। আহাম্মদ আখনের সে-বারের ব্যবহারে সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল যে, আহাম্মদ ইচ্ছা করে না যে, হাফিজন তার সামনে আসে বা তার সঙ্গে কথা বলে। তার ওপর আবার হাফিজন গেহুকে দিয়ে মুখে বলে পাঠিয়েছে, যেন দুপুর বেলা গোপনে তার সঙ্গে তাদের সুপারী-বাগানে দেখা করে। হামিদ গেহুকে বিদায় করে দিয়ে, অনেকক্ষণ ধরে মনের সঙ্গে পরামর্শ করে যাওয়াই ঠিক করল।

দুপুর বেলা—সুপারী-বাগান। চারিদিকে মাদার গাছের ঘন বন। বাহির থেকে কিছু দেখা যায় না। একটা পরিষ্কার জায়গায় হামিদ আর হাফিজন দাঁড়িয়ে। দেখা হতেই, হামিদ বলতে আরম্ভ করল—"আমাকে এমন গোপনে—" কিন্তু আর বলা হলো না,—হাফিজনের মরার মত সাদা মুখ, আর তার চোখের ভীত দৃষ্টি দেখে, সে থমকে গিয়ে, হাফিজনের দৃষ্টির অনুসরণ করে ফিরে তাকাল; দেখল,—একটা নারিকেল গাছের পেছন থেকে ইদ্রিসের মা উঁকি মেরে দেখছে, আর মুচকি-মুচকি হাসছে। আর কিছু বলা হলো না। শুধু হাফিজন আপন কপাল থাপড়িয়ে বলল, "আমার কপাল পুড়েছে।" বলেই সে বাড়ীর দিকে চলে গেল। হামিদও চলে গেল।

দরবেশ গোলদারের বাড়ীতে পঞ্চায়েতী বৈঠকে আজ হাফিজনের বিচার হবে। হাফিজন আর হাফিজনের শাশুড়ী আধ হাত ঘোমটা টেনে, ছাতা আড়াল দিয়ে বসে আছে। ইদ্রিস, আহাম্মদ, মতি মিস্ত্রি—এরাও এসেছে। আব্দুর রহমান হাওলাদারের বাড়ী—সে ত আছেই। হামিদকে ডাকা হয়েছিল, সে আসে নি।

আব্দুর রহমান যা দেখেছিল, আর যা শুনেছিল, বলে গেল। ইদ্রিস পেটে হাত দিয়ে বলল, "কই আমার ছেলে না,—কখ্খন না,—কখ্খন না,—আমাকে কি তোমরা সব তাতেই পাগল ঠাউরেছ?" তার কথায় কিন্তু সব্বাই তাই ঠাওরাল। দরবেশ আর তার ছেলের মুখটা যেন একটু তার-তার হয়ে গেল। তার পর ইদ্রিসের মা যা বলল, তাতে সব্বাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। রাত দুপুরে ইদ্রিসের অসুখের ওছিলায় হামিদকে ডেকে আনা,—দু'রাত তার সঙ্গে থাকা,—সবশেষে দুপুরবেলা বাগানে তার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করা। ইদ্রিসের মা শেষ বলল, "আমি যদি মিছে কথা বলে থাকি, তা'হলে আমি আমার ছেলের মাথায় হাত দিয়ে কিড়া করছি। আর আমার কথা যদি সত্যি না হয়, তা'হলে বৌ তার স্বামীর মাথায় হাত রেখে বলুক, সে এ সমস্ত কাজ করে নি।" সব্বাই হাফিজনের দিকে তাকাল। সে কাঠ হয়ে থাকল। তার নড়বার-চড়বার শক্তি ছিল না; এমন কি, কথা যে বলবে, তারও উপায় ছিল না,—কে যেন দু'হাতে তার গলাটা চেপে ধরেছে।

দরবেশ গোলদার তখন আহাম্মদ আখনকে বলল, "দেখ আখন, এর পর ত আর কোন সন্দেহ নাই। এখন যদি সমাজে থাকতে চাও, আমাদের পঞ্চায়েতকে ৫০০৲ টাকা জরিমানা দেবে; আর তোমার বউকে বাড়ী থেকে বের করে দেবে।" একজন বলে উঠল, "শুধু বের করে দিলে হবে না। ভাল রকম শিক্ষা দিয়ে বের করে দিতে হবে।" আহাম্মদ আখন গলায় চাদর দিয়ে দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে বলল, "পঞ্চের হুকুম আমি মানতে বাধ্য।" পঞ্চের মাতব্বরদের মুখের উপর বেশ একটা আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। এক-সঙ্গে পাঁচ-পাঁচশ টাকা পাওয়া যাবে।

তার পর দরবেশ গোলদার মতি মিস্ত্রিকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি করবে?" মতি চুপ করে রইল। তার পাশে একজন মাতব্বর বসে ছিল। সে তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বলল, "শুনছ মিস্ত্রি? তুমি কত দেবে?" মতি জিজ্ঞেস করল, "কেন?" দরবেশ উত্তর করল, "শোন। তোমার মেয়ে জাতে কালি দিয়েছে। তুমি যদি পঞ্চায়েতকে ৫০০৲ টাকা দেও, আর মেয়েকে বাড়ীতে না উঠতে দেও, তা'হলে তোমাকে আমরা জাতে রাখব। নইলে তোমাকে ঠেকা করব।" মতি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর করল, "উঁহু।" দরবেশ রেগে জিজ্ঞেস করল, "উঁহু কি?" "আমি বিশ্বাস করি না।" "তুমি কর আর না কর, টাকা দেবে কি না?" "উঁহু,

নেব না।" "উঁহু! বেশ, তা হলে, আজ থেকে—এখন থেকে তুমি ঠেকা থাক্‌লে। এর পর কিন্তু দুগুণো কব্‌লালেও আমরা তোমায় ফিরে নেব না।" উত্তরে মতি হাফিজনকে ডাক্‌ল, "আয় মা!" হাফিজন মতির দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য এক পা বাড়িয়েছে, এমন সময়ে ইদ্রিসের মা তার হাত ধরে বল্‌ল, "বাড়ী চল আগে।" সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ল। ইদ্রিসের মা তাকে টান্‌তে লাগল। সে নড়ে না দেখে, ইদ্রিসের বাপও টানাটানিতে যোগ দিল। তাতেও কিছু ফল হলো না দেখে, ইদ্রিসও যোগ দিল। টানাটানিতে হাফিজনের মাথার কাপড় পড়ে গেল। ইদ্রিসের মা তার চুল ধরে হিড়্‌হিড়্‌ করে টেনে নিয়ে যেতে লাগ্‌ল। হাফিজন কোন রকম চীৎকার কর্‌ল না; একবার শুধু চারিদিকে তাকালো। দেখল, সেই যেদিন দরবেশ গোলদার তার বাপকে চড় মেরেছিল, সে-দিন যেমন ভাবে তার বাপ দাঁড়িয়ে ছিল, আজও তেমনি রয়েছে। চারি চোখ এক হওয়ামাত্র, মতি দু'হাতে আপন মুখ ঢেকে ফেল্‌ল। হাফিজন আর কিছু দেখ্‌তে পেল না।

যখন হাফিজনের জ্ঞান হলো, তখন সে দেখ্‌ল, সে তার শ্বশুরবাড়ীতে আপন ঘরে,—আর তাকে ঘিরে তার শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী আর সব্বাই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে মাথার কাপড় টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার পর জোড় হাত করে বল্‌ল, "আপনারা আমাকে যা ইচ্ছা কর্‌বেন,—আমাকে শুধু পাঁচ মিনিট সময় দেন। আপনারা একটু ঘরের বাইরে যান,—আমি পালিয়ে যাব না; আপনারা ঘরের চারিদিকে পাহারায় থাকুন।" কি জানি কি ভেবে সব্বাই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল। হাফিজন ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

কিছু সময় গেল। বাইরে থেকে ইদ্রিসের মা ডাক দিল, "বৌ।" কোন উত্তর পাওয়া গেল না। আরও একটু সময় গেল, ইদ্রিসের মা ডাকল, "বৌ।" এবারও উত্তর নেই। তার পরই একটা গোঙানী শব্দ পাওয়া গেল। আহাম্মদ আখন চেঁচিয়ে দৌড়ে এল, "তবে রে হারামজাদী, তুই নিজে মরতে বসেছিস, আর সেই সঙ্গে আমাদেরও ডুবোতে বসেছিস।" তার দুমদাম লাথিতে দরজা খুলে গেল। দেখা গেল, হাফিজন বিছানার চাদরটা উঠিয়ে, তাই পাকিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়েছে। আহাম্মদ গিয়েই, তার সেই টাঙ্গান শরীরের ওপর দু'চার লাথি মারল। ইদ্রিস লাফ্‌ দিয়ে উঠে, চাদরটা আড়া থেকে খুলে দিতেই, হাফিজন ধপ করে মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে-সঙ্গে ইদ্রিস গিয়ে তার পেটে একটা লাথি মারল। ইদ্রিসের মা এতক্ষণে একটা ঝাঁটা নিয়ে এসে হাজির হলো। তার পর কিল আর লাথি, আর ঝাঁটার বাড়ী সমানে চল্‌তে লাগ্‌ল। এমন সময় ছোট বৌ এসে আস্তে-আস্তে বল্‌ল, "বাবা, তোমরা কি মানুষটাকে একেবারে মেরে ফেললে?" তখন সবার হুঁস হলো; কিন্তু হাফিজনের আর হুঁস হলো না।

রাত দুপুরে দরবেশ গোলদার আর আহাম্মদ আখন বাড়ীতে বসে পরামর্শ কর্‌ছে। দরবেশ তার পাইককে পাঠিয়ে দিল যেখানে পা'ক, যেমন করেই পারুক, মতি মিজিকে নিয়ে আসতে।

পাইক মতি মিজিকে বাড়ীতে পেল। মতি তখন কুপির আলোতে কি একটা কেতাব পড়্‌ছিল। দরবেশের পাইক তাকে বল্‌ল, "আখনজি আপনাকে ডাক্‌ছে।" মতি যেন এই ডাকের অপেক্ষাতেই ছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠে পাইকের সঙ্গে আখনের বাড়ীতে গেল। দরবেশ আর আহাম্মদ তাকে কিছু না বলে, যে ঘরে হাফিজনের লাস ছিল, একেবারে সেই ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে বাতি ছিল,—দরবেশ লাসের ওপরের কাপড়খানা সরিয়ে ফেল্‌ল। মতি মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে, পড়ে যেতে-যেতে, কি বলে চীৎকার করতে যাচ্ছিল, এমন সময় দরবেশ তাকে খপ্‌ করে ধরে ফেলে, তার মুখের ওপর একটা হাত রেখে বল্‌ল, "চুপ।" তাকে ধরে জোর করে লাসের পাশে মাটিতে বসিয়ে বল্‌তে লাগল, "দেখ মিজি, তোমার মেয়ের যা হবার তা হয়েছে। এখন তুমি কি করবে?" মতি মুখ থেকে গোলদারের হাত সরিয়ে দিয়ে বল্‌ল, "তোমরা খুন করেছ,—তোমাদের ফাঁসিতে লটকাব।" দরবেশ ধমক দিয়ে বল্‌ল "চুপ্‌।" একটা রাম-দা দেখিয়ে বল্‌ল, 'যদি চেঁচাবি, তা'হলে তোকেও খুন কর্‌ব। চুপ্‌ করে শোন্‌। তুই খুনের দাবী করে নালিশ করলে, সাক্ষী ত পাবিই না—লাকের

মধ্যে মেয়ের লাসকে ন্যাংটা করে ডোম-মেথর ঘাঁটবে,—আর ডাক্তার তাকে কাটবে। আর তুই ত জেলাকে যাবিই। এখন কি করবি বল?"

"কি? লাস কি করবে?"

'লাস কাটবে, টুকরো-টুকরো করে কাটবে। ডোম মেথরে টেনে ফেলবে।"

মতি চুপ করে রইল।

"কি? কিছু বলছিস না যে? শোন্ আমার কথা। আমরা দারোগাকে ঠিক করেছি,—সংবাদ দিয়েছি, মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। তুই যদি কোন গোলমাল না করিস, তা'হলে দারোগাও ঐ রিপোর্ট দেবে—আর লাস তুই এখানেই দফন করতে পারবি। কেমন, রাজি আছিস?"——"আছি।"

আজ অনেক বৎসর হলো, এসব ঘটে গিয়েছে। কিন্তু মতি মিস্ত্রি হাফিজনের কবরের সামনে ঘরের দাওয়ায় বসে এখনও প্রতি রাত্রে সুর করে পড়ে——

"কারিমা বেবখশ্ আয় বর্হালেমা।
কে হস্তেম আছিরে কমন্দে হাওয়া॥"

বিবিধ-প্রসঙ্গ

খেলার কথা

[শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বি-এ, বি-টি]

আজ আপনাদের নিকট খেলার পক্ষে দু'একটা কথা লইয়া হাজির হইয়াছি। তার জন্য এক দলের নিকট যেমন আমার একটা জবাবদিহি করিতে হইবে—অন্য এক দলের নিকট একটা অনুরোধ করিতেও হইবে। জবাবদিহি হইবে প্রবীণ, প্রাচীন প্রবাসীদের কাছে—তরুণদের বিরুদ্ধে যাঁদের অভিযোগের এ যুগের বুলি হচ্ছে, "তরুণস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ।" তাঁদের যদি ভাবুকতার এক উচ্ছ্বাসে বলি, "খেলার ঢেউ জলে স্থলে", "খেলা ছাড়া কোথাও কিছু নাই", তবে তা'ও পারি। তা'ছাড়া, আজকাল যেমন যে কেউ যেখানে যে কোন নূতন মত জোরের সঙ্গে জাহির করিতে চায়, সে ই বিজ্ঞানের দোহাই দেয়,—তেমনি আমরাও তাঁদেরই দু'একটী খেলার কথা বিজ্ঞানোচিত ভাবে আপনাদের কাছে উপস্থিত করিব। ভরসা আছে, কিছু সুফল ফলিবে।

আর এক দল আছেন, যাঁরা ছাত্র;—খেলার কথা যখন একজন শিক্ষকের কথার দ্বারা সমর্থিত হইতে তাঁরা দেখিবেন, তখন খেলা তাঁরা ভালবাসেন বলিয়াই, তাঁদের ভালবাসার বেগ একটু বৃদ্ধি পাইবে। ...র ত খেলা ছাড়া জগতে যে আরও কিছু তাঁদের করণীয় আছে, তা ভুলিয়া যাইতে একটুও দ্বিধা করিবেন না। তাই তাঁদের নিকট আমাদের অনুরোধ—খেলা আবশ্যক বলিয়া, তাঁরা যেন মনে না ...রেন, খেলাই শুধু আমরা চাই—অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নহে।

প্রথমতঃ, খেলাটা কি, তাই আমাদের বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ...র দ্বারা আমরা মনে একটা আনন্দ কি শান্তি পাই, খেলা তা'ই। ...ক যখন তা'তে মগ্ন থাকি, তখন ভাবিয়া দেখি না, ভবিষ্যতে তা আমাদের কি উপকারে আসিবে। আর খেলার বিপরীত হচ্ছে—যা'কে ইংরাজীতে বলে 'Drudgery';—এতে শান্তি নাই, আনন্দ নাই। বরং, ভবিষ্যতে কোনও উপকার হইতে পারে, এই ক্ষীণ আশার বশবর্ত্তী হইয়া, অনেক সময়ে আমরা এমন কিছুতে নিযুক্ত থাকি, যা' নিরানন্দজনক ও অশান্তিবর্দ্ধক। দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতে হইলে বলিতে পারা যায় যে, 'ফুটবল্', 'ক্রিকেট্' ইত্যাদি খেলা;—কারণ, ইহাতে আনন্দ আছে—কিন্তু ভবিষ্যতে কি উপকার হইবে সে চিন্তার স্থান নাই। আর, ছাত্রদের খাতা সংশোধন করা হচ্ছে একটা 'drudgery';—কারণ, এতে অশান্তি ও উপদ্রবই আনয়ন করে; আর উপকার যা' হয় তা অতি ক্ষীণ।

খেলা ও 'drudgery' এই দুইএর মধ্যে আমি আসন দেই সেটাকে—যাকে 'কাজ' বলে। কারণ, 'কাজের' মধ্যে আমাদের একটা উদ্দেশ্য আছে, যা খেলায় নাই, এবং একটা অনিচ্ছা আছে, যা 'drudgery'তে আছে। খেলাটা স্বতঃপ্রণোদিত, spontaneous, উদ্দেশ্যবিহীন। কাজটা উদ্দেশ্যযুক্ত ও চেষ্টা-প্রণোদিত।

তাই, দেখিতেছি, খেলার বিশেষত্ব এই যে, খেলার মধ্যে আছে—স্বাধীনতা, স্বেচ্ছা, আনন্দ এবং স্বতঃ প্রবৃত্তি।

এই খেলা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেক চিন্তা করিয়াছেন; এবং অনেকে অনেক ভাবে জীবের এই স্বাভাবিকী ইচ্ছাটাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। খেলার সম্বন্ধে তাঁরা কতকগুলি থিওরি' স্থাপিত করিয়াছেন; আমি সংক্ষেপে সেইগুলির উল্লেখ করিয়া যাইব।

Adaptation Theory

একটা 'থিওরি' হচ্ছে—খেলাটা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্ম প্রস্তুত করিবার উপলক্ষ মাত্র। এই 'থিওরি'র প্রবর্ত্তক হচ্ছেন পণ্ডিত 'গ্রুস'। তিনি বলেন যে, (সকল জীবের মধ্যে এই যে একটা খেলায় স্বাভাবিকী ইচ্ছা দেখিতে পাই, (যে ইচ্ছার গুণে অনেক বালকের পৃষ্ঠদেশ শিক্ষক ও অভিভাবকগণের সুমধুর হস্তস্পর্শ অহরহঃ আস্বাদ করিতেছে), সেই ইচ্ছাটা একটা অনাবশ্যক বাজে খেয়াল নহে মোটেই। বস্তুতঃ, সে ইচ্ছা আছে বলিয়াই, খেলার মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র জীব আপনাকে ভবিষ্যতের জন্ম প্রস্তুত করিয়া লইতেছে। যাঁরা মার্জ্জার-শিশু কিংবা কুকুর-শাবকের খেলা একটু নিবিষ্ট চিত্তে দেখিয়াছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই অনুধাবন করিয়াছেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণহীন বস্তুকে শিকার ভাবে গ্রহণ করিয়া, তারা সেইগুলিকে লইয়া যে আস্ফালন করে, তা'তে শুধু ভবিষ্যৎ-জীবনে কি ভাবে শিকারের দ্বারা তারা উদরান্নের সংস্থান করিবে, সেই শিক্ষাই তারা করিতেছে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, মার্জ্জারজননী কিংবা কুকুরী তাদের শাবকগুলিকে লইয়া এইরূপ 'শিকার-ধরা' খেলা খেলিতেছে। তাই মনে হয়, শিশুকাল হইতে মানব-শিশু যে খেলায় স্বতঃ-প্রণোদিত ভাবে যোগ দেয়, আনন্দ পায়—তার একটা ভবিষ্যৎ সার্থকতা থাকিতেও পারে। তাই মনে হয়, কে বলিবে, ঐ যে ক্ষুদ্র বালিকা স্বীয় খেলাঘরে পুতুলগুলিকে স্নান করাইয়া, আহার করাইয়া, শয়ন করাইয়া একটা গভীর আনন্দ ও তৃপ্তি ভোগ করিতেছে,—ঐ খেলাই তার মধ্যে ভবিষ্যতের স্নেহময়ী জননী ও পরিপক্ব গৃহিণীর বীজ রোপন করিয়া দিতেছে না? আর, ঐ যে বালক অশ্বত্থপত্রের মুকুট মস্তকে পরিয়া—কঞ্চির ধনুর্ব্বাণ হস্তে মহাশব্দে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করিতেছে—কে বলিবে, ঐ বালক ভবিষ্যতে যে একজন বীর বলিয়া পরিগণিত হইবে, সেই বীরত্বের বীজ এই খেলার মধ্যেই তার প্রাণে রোপিত হইতেছে না?

তাই বলিতে হয়, বালক-বালিকাদের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। বাহিরে সমাজে যে জীবনটা তাদের চিত্তাকর্ষক হয়, সেই জীবনটা যদি খেলার মধ্যে শিশুকালে তাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে চায়, তবে বারণ করা, দমন করা, শুধু—যা স্বভাবের জোরে গড়িয়া উঠিত, তা ভাঙ্গা বই অন্য কিছুই বলিয়া বোধ হয় না।

Atavistic Theory

আর একটা 'থিওরি' হচ্ছে 'এটাবিষ্টিক্ থিওরি'—Stanley Hall হচ্ছেন এই 'থিওরি'র প্রবর্ত্তক। তিনি বলেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের যে সমস্ত কার্য্য একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, সেই কার্য্যগুলির সাক্ষী স্বরূপ এবং চিহ্ন স্বরূপ ছেলেবেলায় আমাদের খেলিবার একটা স্বাভাবিকী ইচ্ছা আছে। Evolution Theory মানিতে হইলে, মানুষকে পূর্ব্বপুরুষগণের সমস্ত ইচ্ছা ও কার্য্যের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। পূর্ব্বপুরুষের সেই কার্য্যগুলিই আমাদের মধ্যে খেলার রূপে ফুটিয়া ওঠে। কথাটা একটু পরিষ্কার করা দরকার। মানুষ যে বানর থেকে বিবর্ত্তিত হইয়াছে, এ ত অনেকের নিকট অবিসংবাদিত। বৃক্ষারোহণ ও লম্ফপ্রদান জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্ম এই জন্তুটির অপরিহার্য্য আবশ্যক ছিল (এবং এখনও কতক আছে)। ছেলেরা কিন্তু যখন গাছে উঠিতে কিংবা লাফ দিতে যায়, তখন একটা উদ্দেশ্য লইয়া যায় না। কিন্তু, এই গাছে উঠিবার একটা স্বাভাবিকী ইচ্ছা তাদের মধ্যে আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ঘরে বসিয়া আমি কতকগুলি ছেলের খেলা দেখিতেছিলাম। তারা একটা লেবু দিয়া 'ফুটবল্' খেলিতেছিল। হঠাৎ খেলা ছাড়িয়া একটা ভাঙ্গা কলাগাছের নিকট সকলে হাজির; এবং একজন কলাগাছে আরোহণ করিল—অন্য সকলে তাকে দোলাইতে লাগিল। আমরা কি মনে করিতে পারি না যে, ঐ বালকটির ঐ খেলার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই গাছে ওঠা কাজ, যার দ্বারা তার জনৈক পূর্ব্বপুরুষ বানরপুঙ্গব স্বীয় উদর-পূর্ত্তির দ্রব্য সংগ্রহ করিত? এই 'থিওরি' যাঁরা মানেন, তাঁরা বলেন না যে এই খেলা বালকদের ভবিষ্যতে কোনও উপকারে আসিবে; কিন্তু মনে করেন, এই খেলা বালকের আবশ্যক সেই ভাবে—যে ভাবে ব্যাঙ্ঙ বেঙাচি অবস্থায় তার ল্যাজটার প্রয়োজন অনুভব করিত। তাঁরা মনে করেন, খেলাটা আবশ্যক; কারণ, এই খেলার ছলে বালক তার পূর্ব্বপুরুষগণের অনেক অসৎকার্য্যের অভিনয় বাল্যজীবনেই শেষ করিয়া লইতে পারে। যে সব হিংসা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়া সকলকেই একবার যাইতে হইবে, তা' এই খেলার জীবনেই শেষ হইতে দেওয়ার বিশেষ এক সুবিধা বালককে খেলিতে দেওয়া। খেলা যেন একটা 'জোলাপ'। জোলাপ যেমন সব পরিষ্কার করিয়া শরীরটাকে ঝর্‌ঝরে করে, খেলাও সেইরূপ বালকের এবং যুবকের নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে ঘাত-প্রতিঘাতে দূরীভূত করিয়া, তাকে শুদ্ধ, সংযত 'মানুষ' করিয়া তোলে।

পণ্ডিতপ্রবর স্পেন্সর ও শিলার বলেন যে, খেলাটা দরকার হচ্ছে—অনাবশ্যক কর্ম্মশক্তির একটা পথ খোলসা করিয়া দেওয়ার জন্ম। পশু-পক্ষীর ও বালকদের আহার ও নিদ্রার পরে, তাদের শরীর বৃদ্ধির জন্ম যতটুকু 'energy' দরকার, তা' হইতে অনেক বেশী 'energy' থাকে। সেই 'energy'টা একটা 'outlet' পায় খেলায়। এই শক্তিবেগটা দমন করার কুফল আমরা অনেকেই জানি ও হৃদয়ঙ্গম করি। ইহাও জানি যে, ইহা যদি সৎপথে ধাবিত না হয়, তবে কত প্রকার অঘটন ঘটাইতে পারে। তাই আমাদে শিক্ষার একটা মূল লক্ষ্য—কি প্রকারে বালকেরা তাদের অবসর-মুহূর্ত্তগুলি কাটাইবে। তাই আমরা ডিবেটিং ক্লব করি,—কলেজ কি স্কুল ম্যাগাজিন্ বাহির করি—নানান্ রকম খেলার প্রচলন করি। বাস্তবিক, শিক্ষিত মানুষ আমরা তাঁহাদিগকেই বলিব, যাঁরা অবসর-মুহূর্ত্তগুলি ভাল ভাবে কাটাইতে শিক্ষা পাইয়াছেন। উদরান্নের সংস্থান সকলেই করে;—পণ্ডিতেও করে, মূর্খেও করে; প্রত্যেক মানুষেই যেরূপে হৌক করিবে। কিন্তু শিক্ষাকার্য্যে একটা প্রধান ভাব্‌বার কথা,—বর্ত্তমানে যাঁরা শিক্ষা পাচ্ছেন, তাঁদের 'Tastes' কোন্

দিকে যাচ্ছে। তাঁরা অবসর-মুহূর্তগুলি কি ভাবে কাটাইতে চান্? কারণ, স্বাধীন অবস্থায় মানুষ যা করে, তা'তেই তার মনুষ্যত্ব ফুটিয়া ওঠে।

এই জন্যই আজ 'হাতে-কলমে' শিক্ষা দিবার প্রণালীটা এত জোরের সহিত প্রচারিত হইতেছে। হাতে-কলমে ছেলেরা যা'ই করুক্, তা'তেই তারা একটা খেলায় আনন্দ পায়। পাশ্চাত্য জগতে 'manual work' বলিয়া যে ধ্বনি প্রত্যেক শিক্ষা-কেন্দ্রে উঠিতেছে, তার মূল ভিত্তি হচ্ছে, এই উদ্বৃত্ত শক্তি বেগের স্ফূর্ত্তির জন্য একটা পথ তৈরি করা।

তাই কাঠের কাজ, পাথরের কাজ, ম্যাপ্ আঁকা, ছবি আঁকা, বাস্কেট্ বানান,—এই সমস্ত কাজই ছেলেরা স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া সুন্দর ভাবে করিবে। এই সব কাজ ছেলেরা করে বলিয়াই, শিক্ষকদের রক্তচক্ষুতে শাসাইয়া ছেলেদিগকে জড় স্থাণু করিয়া তুলিতে হয় না। স্কুলের কাজের মধ্যে ছেলেরা এবং শিক্ষকেরা একটা খেলায় আনন্দ পান—এবং বিদ্যালয়কে কারাগৃহ বলিয়া মনে করেন না। 'Shall' এবং 'Will'-এর নিয়ম মুখস্থ করিয়া, জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা কণ্ঠস্থ করিয়া, ইতিহাসের অজ্ঞাত-শত্রুর নাম জিহ্বাগ্রে রাখিয়া, আমাদের ছেলেগুলি ক্রমে-ক্রমে তাদের বাল্য-জীবনটা দুঃসহ, নীরস ও নিরানন্দ বলিয়া বোধ করিতেছে; সেই বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদের কর্তৃপক্ষগণ কি শিক্ষার ধারা অন্য পথে লইতে চেষ্টা করিবেন না? যাক্—এদিকে বলিতে গেলে বলিবার অনেক আছে,—যদি সুযোগ পাই সময়ান্তরে চেষ্টা করিব।

Recreation Theory

খেলার সম্বন্ধে আর একটা 'থিওরি' হচ্ছে—যা মোটামুটি আমরা মানিয়া লই—'recreation theory':—খেলা আবশ্যক,—কারণ, কাজ করিতে-করিতে আমাদের যে শক্তি ক্ষয় হয়, খেলার দ্বারা সে শক্তি আমরা পুনরায় লাভ করি। খেলার দ্বারা আমাদের লুপ্ত শক্তি ফিরাইয়া পাই কি না সন্দেহ;—তবে এটা ঠিক্ যে, কাজ করিতে করিতে যে অবসাদ আসে, খেলায় সেই অবসাদ দূর হয়, এবং প্রসন্ন ভাব আনয়ন করে। তাই ছেলেদের মধ্যে কাজ ও খেলা দুই-ই থাকা দরকার; তবে তাদের মনে রাখা উচিত—

Work while you work, and play while you play,
That is the way to be healthy. cheerful and gay.

খেলার সর্ব্বশেষ 'থিওরি' হচ্ছে এই যে, জীবের মধ্যে একটা যে দ্বন্দ্বের, একটা rivalry'র ভাব নিহিত আছে, তার স্ফূরণই হচ্ছে খেলা। মনস্তত্ত্ববিৎ ম্যাকডুগেল হচ্ছেন এই 'থিওরি'র প্রবর্ত্তক। তিনি বলেন, প্রত্যেক জীবের মধ্যে একটা ভাব আছে যে, সে অন্য সকলের চেয়ে বড় হইবে। অন্য সকলের ধ্বংস সে চায় না; কিন্তু ইহা চায় যে, অন্য সকলে তার নিকট পরাভব স্বীকার করুক্। এই স্বাভাবিকী ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া শিশুরা খেলায় মাতিয়া উঠে।

উল্লিখিত 'থিওরি'-গুলির সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যদিও কোনও একটা 'থিওরি'র সঙ্গে খেলার সম্বন্ধে সব কথাই খাপ খায় না, তথাপি প্রত্যেকটাতেই কিছু না কিছু সত্য আছে; এবং প্রত্যেকটিই এক-এক দিকে আমাদের চিন্তার স্রোত বহাইয়া লইয়া যায়।

এক্ষণে, বালকদের বয়স অনুযায়ী কিরূপ খেলা তাদের সন্তোষজনক হয়, সে বিষয়ে মনস্তত্ত্ববিদেরা কি বলিয়াছেন, সেই বিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শৈশবাবস্থায় মানুষের খেলার মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্যের ভাব দেখা যায়। প্রত্যেক শিশুই তখন নিজে-নিজে খেলিতে ভালবাসে। বাস্তবিক যখন আমরা দেখি যে, একটী শিশু তার খেলাঘরে বসিয়া, তার সামান্য-সামান্য খেলনাগুলির সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতেছে—একবার ভাঙ্গিতেছে আর একবার গড়িতেছে, আবার ভাঙ্গিতেছে, তখন তার সেই অসীম ধৈর্য্য দর্শনে মনে হয়, ধৈর্য্যশীলতায় সে একজন প্রবীণ জ্ঞান-বৃদ্ধকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ। তাই পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত তার সমস্ত কার্য্যই খেলার অঙ্গ বা খেলার দ্বারায় রঞ্জিত। এই অকাট্য সত্যটার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই ফ্রুবেল্ তাঁর কিণ্ডার-গার্টেন্ শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, শিশুরা এই খেলার মধ্য দিয়াই উৎসাহের সহিত অনেক বিষয় শিখিতে পারে। তাই, যদিও চিরন্তন বুড়ার কাতরোক্তি এই, যে, "ছেলেরা তাবৎ খেলায় মত্ত", তথাপি সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই ক্রীড়ানুরক্তি ছেলেদের যত জিনিষ শিখায়, "ভালমানুষী" তার শতাংশের একাংশও শিক্ষা দেয় না।

প্রায় পাঁচ বৎসর হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত বালকদের মধ্যে দেখা যায় যে, তারা 'সমবায় ক্রীড়া'র বিশেষ পক্ষপাতী। সকলে একসঙ্গে মিলিয়া খেলিতে এই বয়সে তারা খুবই ভালবাসে। একসঙ্গে রেলগাড়ী তৈরি করে, বাড়ী প্রস্তুত করে, রান্না হয়, বাজার করা হয়, ফুটবল খেলে,—সব কাজই এই সময়ে একত্র করিতে ভালবাসে। এই সময়ে যে সমবায়-নীতি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তারা খেলায় মত্ত হয়, সেই নীতির সম্যক্ অনুশীলন যদি তাদের দৈনন্দিন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কাজের মধ্যে করিতে উৎসাহ দেওয়া যায়, তবে উত্তরকালে যে তারা বিশেষ লাভবান্ হয়, তা'তে সন্দেহ নাই।

এই দশ বৎসরের সময় দেখা যায়, বালকেরা খেলায় পুনর্ব্বার স্বাতন্ত্র্যের দিকে চালিত হয়। তখন দেখা যায়, তারা কুস্তি, ঘুষাঘুষি, ইত্যাদি যে সব খেলায় নিজেদের শারীরিক বলের পরিচয় দিতে পারা যায়, সেই সব খেলায় বিশেষ ব্যস্ত। এই স্বাতন্ত্র্য তাদের জীবনের প্রত্যেক কার্য্যেই তখন পরিস্ফুট। খাওয়া, শোওয়া, পড়া ইত্যাদি সব কাজেই তারা নিজেদের দিক্‌টাই দেখে। নিজেদের জিনিষগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিতে প্রয়াস পায়;—কেহ তা'তে হস্তক্ষেপ করিলে বিরক্তি ও রাগ প্রকাশ করে।

বেশী দিন এই ভাব থাকে না—তেরো কি চৌদ্দ বৎসর বয়সেই আবার তারা দলবল লইয়া খেলায় মগ্ন হয়। এই সময় অপর দলকে পরাস্ত করিবার একটা বিশেষ আগ্রহ যেমন থাকে, সেই রকম,

নিজেদের দলের প্রত্যেকের জন্যই একটা সহানুভূতি প্রত্যেকের মধ্যেই প্রকাশ পায়। এই সময়ের খেলা—হাডুডু, ফুটবল্, ক্রিকেট্ ইত্যাদি। এই সব খেলায় সংঘবদ্ধও হওয়া চাই, আবার অপর পক্ষকে পরাস্ত করিবার জেদ্‌ও থাকা চাই।

খেলার পক্ষে এত কথা বলিয়া, যদি—খেলায় কি উপকার হয়, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না করি, তবে খেলার জন্য যে এত ওকালতি করিতেছি, তা সকলই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাই সংক্ষেপে কিছু বলিব।

মোটা কথায় সকলেই জানি যে, খেলায় শরীরকে দৃঢ়, ঋজু এবং সবল করিয়া দেয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি নানা প্রকারে চালিত হইয়া সুস্থ ও সম্যক্ ব্যবহারযোগ্য হয়। শুধু শারীরিক উন্নতির দিক দিয়াই যে খেলার প্রয়োজন, তা নয়। মানসিক উন্নতির জন্যও খেলা আবশ্যক। পূর্ব্বে যা বলিয়াছি; তার থেকে বোঝা যাইবে, এই খেলার মধ্য দিয়াই বালক পৃথিবীর সহিত, তার পারিপার্শ্বিক সমস্ত জিনিষের সহিত, পরিচিত হইয়া ওঠে। যে বালক অবাধে ঘরে বাহিরে, হাটে, মাঠে, ঘাটে তার খেলায় তুফান তুলিয়া দিতে পারে, যে যতটা এক কথায় 'practical' হইতে পারে—জগৎটাকে আপন করিয়া লইতে পারে, আপনাদের 'শান্ত', 'শিষ্ট', 'ভালমানুষ' জড়-ভরতটি তার শতাংশের একাংশ করিতে সমর্থ নয়। বস্তুর সহিত প্রথম জনের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে, আর দ্বিতীয় জনের বিদ্যা শুধু পুঁথিগতই থাকিয়া যায়। এবং 'খাপগাছে কড়িকাঠ হয়' এইরূপ কথা দ্বারা নিজেকে হাস্যাস্পদ করাও তার পক্ষে বিচিত্র নয়। এই জন্যই আজ-কাল 'প্রকৃতি-পরিচয়', 'maunal work' প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দিবার এত প্রয়াস; এবং এই সব শিক্ষা খেলার মধ্য দিয়া দিলেই সফলতা লাভ করা যায়।

সামাজিক জীবনের উপর খেলার যে আধিপত্য, তা অনেকেই বেশ দেখিতে এবং অনুভব করিতে পারেন। পরস্পরের সহিত ভাবের আদান-প্রদান,—পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা—অপরের জন্য দরদ্ প্রকাশ করা,—সংঘের মিলনের যে একটা আনন্দ, তার আস্বাদ নেওয়া—শুধু খেলার মধ্য দিয়াই সম্ভব। অনেকের শক্তি একীভূত করিয়া এক দল অন্য দলের বিপক্ষে যে জীবন-সংগ্রামে দাঁড়ায়—এই ভাবটা পাশ্চাত্য জগতে খেলার মধ্য দিয়াই শিক্ষা দেওয়া হয়।

তার পর, যে প্রকৃত খেলোয়াড়, সে অনেক গুণে বিভূষিত হয়। সে সর্ব্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়; তার স্পষ্ট কথা বলিবার সাহস আছে, সে ধৈর্য্যশীলতার উদাহরণ হয়; নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া, সকল প্রকারে সঙ্ঘের, সমাজের জন্য দাঁড়াইতে হয়—তার প্রাথমিক শিক্ষা খেলার জগতেই আরম্ভ হয়। এতদ্ব্যতীত, অনেক বিষয়েই তাঁরা খেলার প্রভাব অনুভব করিবেন, যাঁরা খোলা চোখে—রঙীন চশমা না পরিয়া—এর প্রকাশ ও বিস্তৃতি বালকদের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা করিবেন।

আধুনিক জগতে শিক্ষার উন্নতি কল্পে নানারূপ খেলার প্রচলন হইতেছে। তাই প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ব্যায়াম-আগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে;—খেলার মাঠ বিদ্যালয়ের একটা প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্কুলে, হোষ্টেলে বালকদের মধ্যে যে 'স্বরাজ' দেওয়া হয়, তা'ও এই খেলার উদ্দেশ্যে। হস্তলিখিত পত্রিকার প্রচলন—মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা—স্কুলে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, নানান্ রকম সমিতির প্রতিষ্ঠা—ছেলেদের খেলার স্বাভাবিকী ইচ্ছাকে সৎপথে চালিত করিবার প্রচেষ্টা। স্কুলে সঙ্গীত-সমিতি স্থাপন করার উদ্দেশ্যও তাই। পাশ্চাত্য জগতে ছেলেদের লইয়া ভ্রমণ, এবং গ্রীষ্মাবকাশে কোনও এক স্থানে তাঁবু স্থাপন করিয়া ছেলেদের বাস—খেলারই অঙ্গ।

এই খেলার প্রতিষ্ঠা আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে করিতে হইলে, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যেন তাদের খেলার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে ধ্বংস না করি; চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তাদের পক্ষে অসম্ভব—সেটা যেন না ভুলিয়া যাই। পাঠদান কালে, তারা মাঝে মাঝে হাত-পা নাড়িতে পারে—চলিতে পারে, এরূপ কোনও না কোনও উপায় যেন অবলম্বন করি;—এইরূপেই, তাদের যে strain করিতে হয়, তার কুফল দূর করিতে পারি। বিভিন্ন প্রকারের কাজে নিযুক্ত রাখিয়া,—কাজটাকে খেলার মতই তাদের নিকট উপস্থিত করাই হচ্ছে ছোট ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার নিয়ম। এই খেলাটাই ক্রমে কাজ হইয়া দাঁড়াইবে। ছেলেদের খেলার প্রতি দৃষ্টি রাখা, এবং সেটাকে যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক।

আজ এই খেলার বিষয়ে এত করিয়া বলার কারণটা প্রকাশ না করিলে, হয় ত বিষয়টা অনাবশ্যক বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন। তাই বলিতে হইতেছে যে, আধুনিক শিক্ষা-জগৎ খেলাটাকে লেখাপড়া হইতে আমাদের মতন পৃথক্ করিয়া দেখিতেছে না। ফ্রেবল্ যদিও এই খেলার উপরই তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতি স্থাপন করিয়া শুধু শিশুদের জন্য কিণ্ডার-গার্টেন খুলিয়াছিলেন—আধুনিক পাশ্চাত্য জগৎ, বিশেষতঃ আমেরিকা, প্রধানতঃ এই খেলার মধ্য দিয়াই কিশোর-বয়স্ক বালকদেরও শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। "Education through Play" বলিয়া একখানা পুস্তক জনৈক আমেরিকা-নিবাসী মনীষী লিখিয়াছেন—তা'তে তিনি বলেন, 'Nowadays tasks which involved physical labour in past, are performed by machines. But physical strength is necessary against accidents and is to be developed through play." যদিও আমাদের দেশে কলকারখানার আবির্ভাব প্রচুর পরিমাণে এখনও হয় নাই—তথাপি, আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারি যে, আমাদের বালকেরা এবং যুবকেরা সকালে, দুপুরে এবং রাত্রে পড়াশুনার চাপে এত সময় বসিয়া-বসিয়া কাটায় যে, কলেজ হইতে বাহির হইলেই তাদের মেরুদণ্ডহীন বলিয়া বোধ হয়। যা শেখে তা'তে ইচ্ছা নাই, আগ্রহও নাই; এবং তা জীবনসংগ্রামে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াও বোধ হয় না;—কিন্তু শরীরটা তা'তে একদম ভাঙিয়া পড়ে। এই যে শিক্ষাবিধি—এর পরিবর্ত্তন একান্ত বাঞ্ছনীয়, এবং যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল।

নূতন শিক্ষা-জগতের মূলমন্ত্র হইতেছে "Education of Interest," ছেলেদের মধ্যে many-sided interests জাগাইয়া দিতে হইবে। কল বিষয়ে জাগ্রত, সতর্ক করিয়া দিতে হইবে;—এবং আগ্রহের সহিত : যে কাজে লিপ্ত হইতে চায়—যে বিষয়ে শিক্ষা করিতে চায়,—তাকে ়ই সুবিধা দিতে হইবে। 'Hobby'র এইটা ভাল দিক। পশ্চিমে প্রত্যেক লের একটা না একটা বাতিক আছে। কেহ চিত্রাঙ্কনে, কেহ সাহিত্যে, ়হ বিজ্ঞানে, কেহ ইতিহাসে, কেহ উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে পরম আগ্রহের সহিত যুক্ত থাকে। 'Every one must ride his own hobby' এতে লাভ : এই যে, বাড়ীতে তারা অলস থাকে না,—নিজেদের পছন্দসই কাজে রত থাকে এবং আমাদের দেশের ছেলেদের মত tasksএর চাপে নিষ্প্রভ শক্তিশূন্য হইয়া পড়ে না; এবং বাল্যেই জীবনটাকে দুর্ব্বহ বলিয়া ন করে না। সে দেশের অভিভাবকেরা এই বাতিকের অনুসরণে লেদের সাহায্য করেন; আমাদের দেশের প্রবীণ, প্রাচীন প্রবাসীদের ায় বলেন না, 'কি বাজে কাজ কচ্ছিস্—তার চেয়ে দুটো অঙ্ক কর—খানা হাতের লেখা লেখ—আর না হয়, ২ পাতা ট্রান্সলেশান কর—'তে কাজ দেবে।' অবশ্য কাজ তা'তে দেয়—পরীক্ষা পাস করিতে ়মানে যে সব দরকার। কিন্তু মানুষ হইতে কতটা দরকার, তা'ই বেচ্য। আজ বাঙ্গলাদেশ থেকে যত ছেলে পরীক্ষা পাস করিয়া ়, তাদের যদি জীবনসংগ্রামে দাঁড়াইবার শক্তি অর্জ্জন করিয়া যাইতে ়ত, তবে ৩০, টাকার চাকুরির জন্য শত-শত গ্র্যাজুয়েট দ্বার হইতে রান্তরে বিতাড়িত হইত না। দোষ কার? সেই গ্র্যাজুয়েটগণের, না াজের, না শিক্ষা-বিভাগের, না শিক্ষা পদ্ধতির? সেই বিষয়ই বেচ্য।

এই যে প্রত্যেক ছেলের মধ্যেই একটা 'হবি' সৃষ্টি করিবার বাগ দেওয়ার কথা বলিলাম, এ-ও খেলারই অঙ্গ।

এখন একটা কথা উঠিতে পারে যে, যদি ছেলেদের স্বাভাবিক ়গুলির এইরূপ অবাধ প্রশ্রয় দেওয়া যায়,—যদি শুধু, তাদের যা ল লাগে, তাই করিতে দেওয়া হয়, তবে, জীবনে যে একটা গুরুত্ব ়ছে,—একটা দায়িত্ব, অনেক কাজ যে drudgeryরই নামান্তর, তা 'রা বুঝিতে পারিবে না। ফলে হইবে, তারা নিতান্তই 'খেলো' ়ক হইয়া উঠিবে; দৃঢ়তা এবং অধ্যবসায়ের সহিত কষ্টসাধ্য ও ়ভিপ্সিত কার্য্য করিতে তা'রা মোটেই সমর্থ হইবে না। তার ়রে আমার বক্তব্য এই যে, অবশ্যই ছেলেদের জীবনের দায়িত্ব ও ় বুঝাইয়া দিতে হইবে; অবশ্য তাদের এমন সব কাজের মধ্য া চালিত করিতে হইবে, যা'তে তারা কষ্টসহিষ্ণু ও অধ্যবসায়ী হয়। ় সে জন্য সময়ের অপেক্ষা করিতে হইবে। আমরা যেন ছেলে-: miniature adult বলিয়া না ভাবি; অনেক সময়েই ়মরা ভাবি যে, ছেলেদের চিন্তা ও কার্য্য বয়স্কদের মতই হওয়া উচিত; ়ামরা মনে করি, Child is nothing but a man seen ough the wrong end of a telescope। এই খানেই আমাদের ় হয় আমরা ছেলেদের precocious করিয়া ফেলি, অথবা যে আনন্দটুকু শিশুরা, বালকেরা ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ, আমাদের নিকট হইতে দাবী করিতে পারে, সেই আনন্দটুকুর অন্তরায় হইয়া থাকি। মোটের উপর, আমাদের সব সময়েই মনে রাখিতে হইবে যে, ছেলেদের, বিশেষতঃ ছোট ছেলেদের, জীবনযাত্রায় আমরা সব সময়ে একটা Spirit of play যেন প্রবেশ করাইয়া দিতে পারি;—যা'তে তাদের শৈশব-জীবন মধুর, স্ফূর্ত্তিময়, সরল, সুন্দর ও সবল হইয়া উঠিতে পারে।

হিন্দু-ভারতের রাষ্ট্রনীতি

[শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বি এল]

যে কোন জাতির একদিন নিজের রাজ্য ছিল, তাহার একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রনীতিও ছিল। এই নীতিই সে জাতির রাজ্য পালন, রক্ষণ ও বৃদ্ধির স্বতন্ত্র পথ।

রাষ্ট্রনীতি দেশ-বিদেশে নূতন নূতন ভাবে গঠিত হইয়াছে। স্বাধীন রাজ্যে রাজধর্ম্মের কোন চিরন্তন বাঁধা নিয়ম বা গঠন নাই। কাল সহকারে লোক-মতের বিভিন্ন প্রকার উন্মেষের সহিত অথবা সমাজের ক্রমিক জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহা বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। রাজধর্ম্ম সে-সব দেশে একটা সজীব ধর্ম্ম; তাহার গতি, বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন, বিকৃতি সবই আছে। কিন্তু হিন্দু-ভারত এখন পুরাবৃত্ত,—তাহার রাজ-ধর্ম্মও পুরাবৃত্ত। হিন্দু-রাজধর্ম্মও কিন্তু এককালে সজীব ছিল। সেই রাজধর্ম্ম অনুসারে একদিন যবন, পহ্লব, গান্ধার, চীন, শাক, অন্ধ্র প্রভৃতি নানা বিদেশী পরিপূর্ণ হিন্দু-রাজ-শাসিত ভারতের সকলেই শাসিত হইত। সেই নিয়ম অনুসারে দেশী-বিদেশী সৈন্য-সমন্বিত রাজ-গণ রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইতেন। সেই নীতির গুণেই একদিন কোটি কোটি জীব শিক্ষা, দীক্ষা, সুখ, শান্তি, যশঃ, ঐশ্বর্য্য সবই পাইয়াছে। এই নীতিই অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন জগতের মধ্যে হিন্দুরাজাকে একমাত্র জ্ঞানের আলোকে বিভূষিত করিয়া সভ্যতার কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছিল। আজ যদিও ইহা নির্জ্জীব চিত্র মাত্র;—কিন্তু এ চিত্রের নিজের জীবন না থাকিলেও জীবনী সঞ্চারিণী-শক্তি আছে। যে রাজধর্ম্ম একদিন নানা দেশাগত জনপূর্ণ ভারতে সকলকে সুখে শান্তিতে, নির্দ্বন্দ্ব উন্নতিতে জগদ্বিখ্যাত করিয়াছিল, তাহার আলোচনায় শত-ক্লেশ-পীড়িত ভারতবাসীর মনের উন্মেষ হইতে পারে, এই আশায় এই পুরাতন দিনের চিত্র উদ্ঘাটন করিতে উদ্যত হইলাম।

হিন্দু রাষ্ট্রনীতির উৎপত্তি

রাষ্ট্র ও রাজা এই দুইটী কথা এতই পরস্পর সংশ্লিষ্ট যে, রাষ্ট্রনীতির বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, রাজার উৎপত্তি কিরূপে হইল, এই প্রশ্নই সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে মহাভারতে দেখা যায় যে, আদিমমানব-সমাজে রাজার কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রথম অবস্থায় মানুষ আপনা হইতেই ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া

পরস্পরকে রক্ষা করিত। কিন্তু কিছুকাল এইভাবে বসবাসের পর এই রক্ষণা-বেক্ষণ প্রত্যেকেরই কষ্টকর মনে হইতে লাগিল। যতদিন পর্য্যন্ত এই ভার সকলে সানন্দে বহন করিত, ততদিন রাজার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু কষ্টকর মনে হইবামাত্র পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যের উপর তাহাদের দৃষ্টি কমিতে লাগিল; এবং স্বেচ্ছাক্রমে না হইলেও, কর্ত্তব্যের শিথিলতার জন্য পরস্পরের উপর অন্যায় আচরণ আরম্ভ হইল। তৎপরে স্বভাবতঃই স্বেচ্ছায় অন্যের উপর অন্যায় আচরণ আসিল। তাহা হইতে ক্রমে-ক্রমে স্বার্থসিদ্ধি, লোভ, ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত দোষই মানবসমাজে দেখা দিল। তখন শাসনের প্রয়োজন হইল। হিন্দু-সমাজের এই অবস্থা মহাভারতের বহু পূর্ব্বে হইয়াছিল। মহাভারতে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, "আমরা শুনিয়াছি বহু পূর্ব্বে, যখন অরাজকতা ছিল, তখন বড় মৎস্য যেরূপ ছোট মৎস্য সংহার করে, মানুষের মধ্যেও পরস্পর সেইরূপ ব্যবহার করিত। আমরা শুনিয়াছি, তখন তাহাদের মধ্যে কয়েকজন মিলিত হইয়া নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া স্থির করে যে তাহাদের মধ্যে যাহারা কটু বাক্য ব্যবহার করিবে, কিংবা উদ্ধত ভাব দেখাইবে, কি পরস্ত্রীর প্রতি লোভ দেখাইবে বা পরের ধন-সম্পত্তি অপহরণ করিবে, তাহাদিগকে নিজ সমষ্টি হইতে ত্যাগ করিবে।" এই নীতির প্রতি অন্য সকলের সম্মান আনিবার জন্য তাহারা স্বেচ্ছাবশতঃ এই নীতি নিজেরা সর্ব্বাগ্রে পালন করিয়া চলিতে লাগিল।

রাজার সৃষ্টি

কিছুকাল এইরূপে বাস করিবার পরে তাঁহারা রাজা নির্ব্বাচনের জন্য ভগবানের আশ্রিত হইলেন এবং ভগবান শাসন করিবার জন্য মনুকে আজ্ঞা করিলেন।

তাঁহার কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য এই প্রজামণ্ডলী স্বেচ্ছায় রাজকর নির্দ্ধারণ করিয়া রাজকোষে নিয়মমত তাহা প্রেরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বীর, তাঁহাদিগের উপর রাজাকে রক্ষা করিবার ও সাহায্য করিবার ভার দিলেন।

ইহা হইতে দেখা যায় যে, এ দেশে মানবসমাজের প্রথম অবস্থায় যাঁহারা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী, তাঁহারা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া নীতি গঠন করেন ও রাজার শাসনে থাকিতে সম্মত হন। এই সামাজিক চুক্তি (social compact) পাশ্চাত্য ঋষি রুশোর (Rousseau) মতে সমাজনীতি ও রাজসৃষ্টির মূল। মানবসমাজের প্রথম অবস্থায় ব্যক্তিগত স্বত্ব ও তাহার রক্ষার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস ছিল না। মানবের ক্রমিক অবনতি হইতে ব্যক্তিগত স্বত্ব ও তাহার রক্ষার জন্য নিয়ম-বন্ধন-নীতির প্রয়োজন হয়—এই কথা আইন-বিশারদ ব্ল্যাক্‌ষ্টোন (Blackstone) লক্ষ্য করিয়াছেন এবং কিরূপে তাহা হইল, তাহার কারণও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "মানবসমাজের প্রথম অবস্থায় মানব-সংখ্যা অপেক্ষা জমির পরিমাণ খুবই বেশী ছিল। নিজের সুবিধামত যাহার যেরূপ ইচ্ছা তখন জমি অধিকার করে। প্রকৃতিগত নিয়ম অনুসারে তাহারা কলহ না করিয়া জমি ভোগ করিত। একজন নিজের জমি ছাড়িয়া দিলে অন্যে সেই জমি বিনা কলহে দখল করিত। পরে যে পরিমাণে মানব-সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই হিসাবে সুবিধা মত জমির পরিমাণ কমিতে আরম্ভ হইল। প্রথমে জমির বাহুল্য বশতঃ কেহ স্থায়ী অধিকারের জন্য লোলুপ হইত না। কিন্তু জমি যত অপ্রতুল হইতে লাগিল, ততই স্থায়ী ভাবে অধিকারের চেষ্টা আসিল, এবং ব্যক্তিগত স্বত্বের জন্য সকলে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইল।" মহাভারতে লিখিত পরস্পরের প্রতি দ্বেষ, লোভ, ও স্বার্থানুসন্ধানের ইহা একটী প্রকৃষ্ট কারণ বলিয়া মনে হয়। রুশোর মতে, আত্মশক্তি ও যথেচ্ছাচার অনুসারে কার্য্য করিলে শান্তির সহিত বাস করার অসুবিধা হয় দেখিয়া, একজনকে মানিয়া তাহার আজ্ঞা ও বিচার অনুসারে কার্য্য করিতে মানুষ প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

অবশ্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যে—মানব-সমাজের মধ্যে যাহারা অধিকতর জ্ঞানী, তাহাদের নিজেদের মধ্যে চুক্তি বা স্বকৃত সম্মতি হইতে সমাজ-নীতি ও মনোনীত রাজার আজ্ঞা স্বেচ্ছায় পালনের ভাব আসিয়াছে—এ কথা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। তাহা হইলে সমস্ত জগৎ এক ভাবে এক সময়ে সভ্য হইত। অনেক দেশ থাকিতে পারে, যেখানে অধিকতর বলবান কোন ব্যক্তি বা পরিবার, নিজ বলে কোন জনসঙ্ঘের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। অথবা সমাজের অশান্তির সময় যিনি বলবান, দুর্ব্বলেরা নিজেদের শান্তির আশায়, তাঁহারই আশ্রিত হইয়া থাকিতে স্বীকৃত হওয়ায় সমাজে রাজার আবির্ভাব হয়। সভ্য জনসঙ্ঘ কোথাও বা অসভ্য জনসঙ্ঘকে বলের দ্বারা আয়ত্ত করিয়া নিজ সভ্যতা, নিজ নীতি ও নিজ রাজা তাহাদের উপর আরোপিত করে। কোথাও বা অসভ্য প্রপীড়িত জনসঙ্ঘ স্বেচ্ছায় সভ্য-জনসঙ্ঘের আশ্রিত হয়। এইরূপে জগৎ সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়। মূলতঃ, মানব সমাজে নীতির প্রথম আবির্ভাব—মানবের প্রথম অসুবিধা ও তাহা নিবারণের চেষ্টা হইতেই আসে;—সেই আদিম দিনের জ্ঞানিমণ্ডলীই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া প্রতীতি হয়।

হিন্দুনীতির স্বাতন্ত্র্য

শান্তি-পর্ব্ব হইতে দেখা যায় যে, এ দেশের শৈশব অবস্থায় নীতির সৃষ্টি পূর্ব্বে ও রাজার সৃষ্টি পরে; এবং জ্ঞানই নীতি-গঠনের মূল। বিদেশের রাষ্ট্রনীতি রাজ-কপোল-কল্পিত, রাজ-অনুগ্রহ-প্রাপ্ত নীতিও নহে, রাজ-হস্ত হইতে বাহুবলে গৃহীত প্রজাস্বত্বও নহে। শান্তি সহকারে বসবাসের জন্য জ্ঞানিমণ্ডলী এই নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ করেন; এবং সাধারণে যাহাতে ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া স্বেচ্ছায় পালন করে, সেই জন্য জ্ঞানিগণ এই নিয়মাবলী দ্বারা স্বেচ্ছায় আপনাদিগকে সর্ব্বাগ্রে নিবদ্ধ করেন ও সর্ব্বথা তাহা পালন করেন। সমাজের এই প্রথম নীতি বা নূতন প্রথা অবশ্যই কেবল স্থূল বিষয় সম্বন্ধেই ছিল। কেবল যে সমস্ত দোষ ও অন্যায় আচরণ তাঁহাদের চক্ষে অতি স্পষ্ট ভাবে অসঙ্গত বলিয়া মনে হইয়াছিল,

বং সমাজের বিশৃঙ্খলার কারণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল—তাহাই াধ করিবার জন্য এই নীতি-বন্ধনের চুক্তি হয়। কিন্তু ইহারও থষ্ট উপকারিতা ছিল। কারণ অল্প পরিমাণেও স্বার্থত্যাগ করিয়া াতি পালন করিতে যতদিন না শিক্ষা হয়, ততদিন রাজা সমাজের ান উপকারেই লাগে না। যে নীতি, সমাজ নিজের অভাব থিতে পাইয়া তাহার প্রতীকারোদ্দেশ্যে নিজে উদ্ভাবন করে, নিজে তাহা পালন করিতে স্বেচ্ছায় উদ্যত হয়, সেই নীতিই প্রকৃষ্ট াতি; কারণ তাহাই জ্ঞানোন্মেষের সাহায্য করে। যাহা পরহস্ত ইতে অযাচিতভাবে সমাজের উপর আসিয়া পড়ে, তাহা যতই সুনিয়ম উক না কেন, সমাজের তাহা উপলব্ধি হয় না বলিয়া,—সমাজ বিচার ক্তির বিনা ব্যবহারে তাহা পালন করিতে বাধ্য হয় বলিয়া, তাহা াজকে নিয়মে বদ্ধ করে বটে, কিন্তু জ্ঞান দেয় না,—উন্নতির সাহায্য রে না। সেইজন্যই হিন্দুনীতি সমাজের প্রয়োজনমত ক্রমে-ক্রমে দ্ধি লাভ করে। ক্রমে মানবসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই এই নীতিশাস্ত্রভুক্ত া। এই নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে মহাভারতে কথিত আছে যে, ইহা গবানের পূর্ণজ্ঞানপ্রসূত। যখন সেই পুরাতন দিনে সংযত আর্য্য ানী চিন্তাশক্তির প্রকৃষ্ট সাধনার দ্বারা সকলজ্ঞানের আকর শ্রীভগবানের হিত সমস্তরে নিজেকে উত্তোলিত করিতেন ও পূর্ণজ্ঞান সঞ্চার করিয়া ত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তই দিব্যচক্ষে দেখিতেন, তখন এই হিন্দু নীতি-স্ত্র পূর্ণায়তন লাভ করে। তখনই এই শাস্ত্র মনু সঙ্কলিত ধর্ম্মশাস্ত্র প পরিণত হয়। ইহাতে রাজনির্ব্বাচন, শাসনপ্রথা, রাজ্যরক্ষণ, জাপালন, রণনীতি প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতি ও সমূহ সমাজনীতি সঙ্কলিত য়াছে।

লোকমত

সাধারণতঃ অনেকের একটা ধারণা আছে যে, এদেশে লোকমত লইয়া রাষ্ট্রনীতির কোন অঙ্গ ছিল না। প্রজাগণ নিজেরা লোক-র্ব্বাচন করিয়া তাহার উপর কর্ত্তব্যভার দিয়া কখনও কোন কাজ র নাই, অথবা প্রজামত-অনুসারে রাজ্যশাসন কখনও দেখে নাই। াদের ধারণা যে, লোকমতের সাহায্যে রাজ্যশাসন বুঝি পাশ্চাত্য-দের শাসনপ্রথার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা প্রথম শিখিতে আরম্ভ রিয়াছি। অনেকে এতদূরও বলেন যে, এ-দেশ এরূপ শাসনে সম্পূর্ণ নভিজ্ঞ; অতএব লোকমতের সাহায্যে শাসন এ দেশের অনুকূল বে না। কিন্তু এরূপ ধারণা একেবারে ইতিহাসমূলক নহে।

রাজ-সহায়ে শাসন-প্রথার সৃষ্টিকালেই আমরা দেখিয়াছি যে জ্ঞানিগণ াসনের জন্য সম্মিলিত হইয়া রাজা প্রার্থনা করে এবং স্বেচ্ছাক্রমে র্দ্ধারিত রাজস্ব রাজকোষে প্রদান করিতে স্বীকৃত হয়; এবং শূরগণ লিত হইয়া রাজ্যরক্ষণে রাজাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয়। ইহা তে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, হিন্দু-সমাজের সেই প্রথম দিনে, ন-প্রথার সূচনা হইতেই, রাজস্ব নির্দ্ধারণ ও সৈন্য—রাষ্ট্রীয় দুইটী সর্ব্বপ্রধান অঙ্গই সম্পূর্ণরূপে প্রজাগণের ইচ্ছাসাপেক্ষ ছিল। রাজা ইহাদের সৃষ্টি করেন নাই।

রাজ-নির্ব্বাচন

প্রজাগণের জ্ঞানি-সম্মিলনীই যে কেবল রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। মহাভারতে আরও দেখা যায় যে, রাজা নিজেই, শাসন-প্রথার সেই প্রারম্ভে, এই জ্ঞানি সম্মিলনী দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন। ইহা শুনিয়া আমাদের আধুনিক যুবকগণ স্তম্ভিত হইতে পারেন; কিন্তু ইহার প্রমাণ অতি স্পষ্টরূপে ও বহুপরিমাণে প্রাচীন শাস্ত্রে আছে। শান্তিপর্ব্বে ভীষ্মদেব বলিতেছেন—"হে যুধিষ্ঠির, জগতের যাঁহারা মঙ্গলকামনা করেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য সকলের মঙ্গলের জন্য ও রক্ষণের জন্য সর্ব্বাগ্রে রাজা নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করা।" আরও বলিতেছেন—"যিনি উন্নতমনা, প্রজাগতপ্রাণ, মৃদুস্বভাব ও পবিত্র, এবং যিনি কখনও প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা করেন না, প্রজাগণ তাঁহাকেই রাজপদে মনোনীত করেন।" পুনরায় বলিতেছেন, "যিনি জ্ঞানিগণের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আপনার মত পরিত্যাগ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন, প্রজাগণ সেই রাজারই অনুগত হন।" ইহা হইতে কি কি গুণ দেখিয়া রাজনির্ব্বাচন কর্ত্তব্য, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যাইতেছে: এবং লোকমত যে শাসন-প্রণালীর প্রধান অঙ্গ বলিয়া সেই পুরাতন যুগেও গ্রাহ্য ছিল, তাহাও সপ্রমাণ হইয়াছে। হিন্দু-ভারতের প্রথম অবস্থার এই বিবরণে রাজপদ পর্য্যন্ত যে প্রজাগণের নির্ব্বাচনসাপেক্ষ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাভারতের এই বিবরণ হইতে আরও দেখা যাইতেছে যে, এই রাজনির্ব্বাচন-প্রথা বিশেষ রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা হইয়াছিল; তাহা না হইলে গুণাবলী দেখিয়াই যে রাজ-নির্ব্বাচন বিধেয়, এরূপ বিশদভাবে তাহার উল্লেখ থাকিত না। তখন পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রাজগণের রাজপদ অধিকারের প্রথা ছিল না। রাজা স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিও ছিলেন না। রাজ্য তাঁহার স্বকীয় সম্পত্তির ন্যায় বংশপরম্পরায় অধিকৃত হইত না। যে দেশে রাজা নির্ব্বাচিত হইত, সে দেশে এ অভিনব প্রথা অনেক পরে আসাই স্বাভাবিক। হয় ত পরাক্রমশালী, জ্ঞানী ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত রাজগণ তাঁহাদের পুত্রদিগকে রাজপদের উপযুক্ত করিবার জন্য সময়োচিত শিক্ষায় সর্ব্বতোভাবে শিক্ষিত করিতেন; এবং সেইজন্য রাজবৎসল প্রজাগণ গুণী রাজার গুণবান পুত্র বলিয়া শিক্ষিত ও উপযুক্ত পুত্রদিগের মধ্য হইতে রাজা নির্ব্বাচন করিত। এইরূপে ক্রমে রাজবংশের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে তৎসাময়িক রাজবংশের বংশপরম্পরাক্রমে সুশিক্ষা ও সুশাসনের গুণে, অথবা কোথাও বা স্বীয় পরাক্রমের বলে রাজগণ মন্ত্রিসভার আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। ইহা হইতে পরে গুণি-সভার দ্বারা রাজনির্ব্বাচন প্রথা উঠিয়া যায় ও রাজা স্বয়ং নিজরাজ্য উপযুক্ত পুত্রের হস্তে ন্যস্ত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু হিন্দু-ভারতে কখনও স্বেচ্ছাশাসনের প্রথা আসে নাই। স্বেচ্ছাশাসন যে আসিতে পারে নাই, তাহার মূল কারণ দণ্ডনীতির প্রতিষ্ঠা।

দণ্ডনীতি

হিন্দুশাস্ত্রে দণ্ডনীতি রাজকপোলকল্পিত স্বার্থবিষয়ক বিধি নহে—ইহা জ্ঞানের সৃষ্টি ও রাজসৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহা হিন্দুর সাধারণ ধর্ম্মের ন্যায় সনাতন বিধি। পূর্ণজ্ঞানী, সর্ব্বদ্রষ্টা ঋষিগণ এই দণ্ডনীতির সঙ্কলন করেন ও ইহা ভগবৎপ্রদত্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়া নিজেরাও তাহা পালন করেন। রাজাকে শাসনপ্রণালীর শীর্ষস্থানে হিন্দুশাস্ত্র স্থান দেয় নাই। এই দণ্ডনীতি রাজাপ্রজা উভয়ের কর্ত্তব্যের পন্থা, ও রাজাপ্রজা উভয়েরই সমভাবে পালনীয়। জ্ঞানমহিমামণ্ডিত, জগতের মঙ্গলাধ্যায়ী, স্বার্থশূন্য, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ-সঙ্কলিত দণ্ডনীতি হিন্দু রাষ্ট্রনীতির শীর্ষস্থানে অবস্থিত;—রাজপদ তাহার নীচে স্থান পাইয়াছে। শাস্ত্রকার ঋষিগণ দণ্ডনীতিকে এই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়া স্বেচ্ছাশাসনের হাত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

মন্ত্রিসভা

আমেরিকায় যেরূপ শাসনপ্রণালী বা কন্‌ষ্টিটিউশন্ (constitution) রাজশক্তির উপরে, ও বিচারকগণ তাহার ব্যাখ্যাকার,—এ দেশের সনাতন প্রথাতেও সেইরূপ দণ্ডনীতিই সর্ব্বোচ্চে, ও মন্ত্রিসভা তাহার ব্যাখ্যাকার ছিলেন। এই মন্ত্রিগণ বেদবিৎ ও দণ্ডনীতিবিশারদ ছিলেন। সুবিজ্ঞ মন্ত্রিগঠিত মন্ত্রিসভার উপদেশ-অনুসারে রাজাশাসন এই পুরাতন দিনেও এ দেশে প্রচলিত ছিল; এবং এইরূপ শাসনেই দেশীয়গণ অভ্যস্ত—ইহাই এই দেশের সনাতন শাসনপ্রথা।

স্বেচ্ছাবৃত্তি রাজার শাস্তি

মহাভারতে (রাজধর্ম্ম অনুশাসন পর্ব্বে) এই মন্ত্রিসভার নিয়মাবলী বিশদভাবে বর্ণিত আছে। হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও স্বেচ্ছাশাসনের কীর্ত্তন নাই—স্বেচ্ছাবৃত্তি রাজগণকে অতি হেয় ও ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া হিন্দুশাস্ত্র সর্ব্বত্রই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজন্যবর্গ বলদৃপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাবৃত্তি অবলম্বন করিলে, তাঁহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া শাস্ত্রকারগণ শতবার উল্লেখ করিয়াছেন। স্বেচ্ছাচারী স্বার্থান্ধ রাজার প্রত্যাখ্যান কর্ত্তব্য ইহাও অতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি, ক্ষত্রিয়হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার ন্যস্ত হইলেও, এবং তদ্ভিন্ন জাতির জাতি-নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন কর্ম্ম নির্দ্ধারিত থাকিলেও, ইহা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে ক্ষত্রিয় কি অক্ষত্রিয় যে কেহই কুশাসনের সময় ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়া শান্তি ও প্রজাগণের সুখসন্ধানের চেষ্টা করেন, শাস্ত্র তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শান্তিপর্ব্বে স্পষ্টই রহিয়াছে—"যদি কোন ক্ষমতাশালী, ব্যক্তি—তিনি ব্রাহ্মণই হউন বা বৈশ্য কি শূদ্রই হউন,—দণ্ডনীতির সমুচিত প্রয়োগের দ্বারা প্রজাগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন, তিনি সর্ব্বতোভাবে সম্মানের যোগ্য।" জাতিবৃত্তির উপর অতিরিক্ত আস্থার জন্য যাঁহারা আধুনিক জগতে হাস্যাস্পদ, তাঁহারা যে এ বিষয়ে জাতি-বিগর্হিত কার্য্যকে কর্ত্তব্য ও সম্মানার্হ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাতে সম্যক্‌রূপে প্রজাপালন যে কত উচ্চ কর্ত্তব্য বলিয়া হিন্দুগণ দেখিতেন, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। প্রজাপালন না করিলে রাজা আর রাজপদবাচ্য নহেন, এবং তাঁহার প্রত্যাখ্যান একান্ত কর্ত্তব্য। প্রজারক্ষা ও অরাজকতা হইতে দেশরক্ষা তখন আর একমাত্র ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য নহে,—জাতিনির্ব্বিশেষে সমস্ত প্রজাগণের কর্ত্তব্য। নিষ্ঠাবান বেদগতপ্রাণ ব্রাহ্মণ তখন তাঁহার ব্রহ্মণ্যতেজ স্বদেশ রক্ষা ও প্রজা রক্ষার জন্য প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে সমস্ত আহুতি দিবে। বাণিজ্যগতপ্রাণ ঐশ্বর্য্যবান্ বৈশ্য, তাহার অর্থ, বুদ্ধি, কৌশল সমস্তই সেই জাতীয় হোমশিখায় ঢালিয়া দিবেন। সৎসেবক কার্য্যকুশল শূদ্র তাহার সেবাশক্তি দেশসেবায় নিযুক্ত করিবে। ইহাই শাস্ত্রীয় অনুশাসন। স্বেচ্ছাচারী, অবিবেচক রাজা হইতে প্রজাবৃন্দের রক্ষার ভার,—স্বার্থান্ধ বলদৃপ্ত রাজার বিচার ও শাস্তির ভার—প্রজাদিগকে নিশ্চেষ্ট রাখিয়া ভগবানের উপর হিন্দুশাস্ত্র ন্যস্ত করেন নাই। প্রপীড়িত প্রজাগণের উপরেই সে ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। আধুনিক হিন্দুগণ শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করিয়া বলিয়া থাকেন, হিন্দুশাস্ত্রে রাজা ভগবানস্বরূপ, তাঁহার বিচার করিবার আমরা কে? আমাদের উপর যদি পীড়ন হয়, তাহা আমাদের দুরদৃষ্ট,—ভগবানই তাঁহার একমাত্র বিচারকর্ত্তা;—রাজার বিচারক সেই রাজাধিরাজ ভগবান ভিন্ন কেহই হইতে পারে না। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে তাহা কখনও বলেন নাই। হিন্দুশাস্ত্র কর্ত্তব্যভ্রষ্ট রাজা মানে না। কর্ত্তব্যভ্রষ্ট অবিবেচক রাজা যে কতদূর নিষ্প্রয়োজন, তাহা মহাভারতে অতি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। "কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হস্তী যেরূপ, চর্ম্ম নির্ম্মিত হরিণ যেরূপ, মনুষ্যের মধ্যে ঐশ্বর্য্যশূন্য মানুষ যেরূপ, অথবা নপুংসক যেরূপ, ভূমির মধ্যে অনুর্ব্বর নিষ্ফল ক্ষেত্র যেরূপ, বেদশূন্য ব্রাহ্মণ ও প্রজারক্ষণে অপটু রাজাও তদ্রূপ। যে রাজা প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত নন, তাঁহার কি প্রয়োজন?"

যে শাস্ত্র রাজাকে দেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, রাজার মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব, রাজা অগ্নি, আদিত্য, বৈশ্রবণ, মৃত্যু, যম এই পঞ্চদেবতার গুণ সমষ্টি বলিয়াছেন, ধর্ম্ম, অর্থ, শ্রীর আধার বলিয়াছেন, তাহাতেই রাজপ্রত্যাখ্যানের কর্ত্তব্যতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইবার কোনও কারণ নাই। হিন্দুশাস্ত্র রাজাকে ভগবৎস্বরূপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রজার উপর ভগবৎদত্ত কোন স্বত্ব, পাশ্চাত্য Divine Right দেন নাই। রাজসিংহাসনকে স্বত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুশাস্ত্র করেন নাই, কর্ত্তব্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। হিন্দু-রাষ্ট্রনীতির ভিত্তিই দণ্ডনীতি-অনুশাসিত ও জ্ঞানী মন্ত্রিসভা প্রদর্শিত কর্ত্তব্যপালন। প্রজাগণ কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে যেরূপ দণ্ডনীতি অনুসারে দণ্ডনীয়, রাজাও তাঁহার প্রজার উপর কর্ত্তব্যপালনে বিরত হইলে সেই দণ্ডনীতি অনুসারে দণ্ডনীয়। হিন্দু রাষ্ট্রনীতি এ বিষয়ে সভ্য জগতের আদর্শ।

চন্দ্রসেন রাজার শিবলিঙ্গ

[শ্রীগোপালচন্দ্র রায়]

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোট থানার অধীন নিগন গ্রাম। এখন এই গ্রামে বি, কে, রেলওয়ে কোম্পানীর রেলওয়ে ষ্টেসন্ হইয়াছে। এই গ্রামটী বহুকালের পুরাতন গ্রাম। ইহাতে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। একদিন যখন রাঢ় দেশে উজানী নগর শৈবধর্ম্মের কেন্দ্র স্বরূপ হইয়াছিল, এবং বিক্রমশালী মহারাজ বিক্রম-কেশরীর পূর্ব্বপুরুষ চন্দ্রসেন রাজার নিকট অন্যান্য রাজগণ মস্তক অবনত করিয়াছিল, তখন সেই উজানীর গৌরবে রাঢ় প্রদেশস্থ অনেক গ্রাম গৌরবান্বিত হইয়াছিল; তাহার মধ্যে নিগন গ্রাম অন্যতম। নিগন গ্রামের পশ্চিম পাড়াটী জগদীশপুর নামে কথিত। বহুপূর্ব্বে জগদীশপুর বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিল; তাহা প্রাচীন পার্শী ভাষায় লিখিত দলিল হইতে অবগত হওয়া যায়। এই গ্রামের দিকে ব্রহ্মাণী নামে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিতা। উক্ত নদী তীরে মঙ্গলকোট উজানীর গৌরবরবি চন্দ্রসেন রাজার রাজবাটী ছিল। এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। চন্দ্রসেনকে লোকে "চাঁই রাজা" বলিয়া থাকে। চন্দ্রসেন রাজার রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষকে লোকে "চাঁই ডাঙ্গা" বলিয়া থাকে, এবং তাঁহার খোদিত সরোবরকে লোকে 'চাঁই দীঘি' বলিয়া থাকে। উক্ত ডাঙ্গার নিকটে হাটতলা বলিয়া একটী জায়গা আছে—সেইখানে প্রাচীন কালে হাট হইত। উক্ত হাট বর্ত্তমান নিগন ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী "সাতা পুকুর" নামক পুষ্করিণীর পাহাড়ের উপর বসিয়া থাকে। "রজক বেড়," বলিয়া যে জায়গা আছে, সেখানে প্রাচীন-কালে রজকগণ বাস করিত। এখনও গ্রামের ভিতর ও মাঠে অনেক কূপের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। হাটতলা নামক স্থানে এখন বি, কে, রেলওয়ে কোম্পানী ব্রহ্মাণীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

এখন ঐ সকল স্থানের অধিকাংশই ধান্য-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে; কেবল নামগুলি এবং ভগ্ন স্তূপগুলি অতীত গরিমার স্মৃতি চিহ্ন রক্ষা করিতেছে। নিগন গ্রামের গ্রাম্য দেবতা "লিঙ্গেশ্বর শিব"। ইহা একটী অনাদি শিব লিঙ্গ। উক্ত শিব-লিঙ্গের সেবা সেই চন্দ্রসেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে; এবং সেবার জন্য ভূমি দান করিয়া তিনি অতি সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। মঙ্গলকোট উজানীর সকল নরপতিই শৈব ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রসেন অন্যতম। মঙ্গলকোটে এখনও ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডে চন্দ্রসেন রাজার নাম পাওয়া যায়। আমাদের বাটীতে কতকগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে। তাহার একখানির মধ্যে এই নিম্নলিখিত পদ্যটী পাওয়া গিয়াছে। ইহা লিঙ্গেশ্বরের মাহাত্ম্য।

"নত্বা হরপদাম্ভোজং কলিকল্মষনাশনং
লিঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যং হি বর্ণ্যতে শিবশর্ম্মণা॥

সুহ্ম দেশের মধ্যে এক উজানী নগর।
চন্দ্রসেন নামে তথা ছিল নরবর॥
কপিলা মাধবী নামে ছিল এক তাঁর।
দেবপূজা হ'ত প্রতিদিন দুগ্ধে যার॥
দৈবযোগে একদিন দুগ্ধ গাভী হরে।
সকলে ভাবিয়া তাহা জানিতে না পারে॥
তাহা শুনি নৃপবর হ'ল চমৎকৃত।
সর্ব্বলোকে কহে প্রভু একি বিপরীত।
একদিন রাজাদেশে গোপালক তাঁর।
গাভী প্রতি দৃষ্টি রাখি চাহে বার বার॥
চরিতে চরিতে গাভী ছুটে উর্দ্ধমুখে।
পূর্ব্বদিকে ধায় গাভী ভৃত্য পিছে পিছে॥
এইরূপে ভৃত্য ছুটে কাপলা পিছনে।
সরবফ সিংহে প্রবেশে দ্রুত আগমনে॥
জগদীশপুরে (১) যায় ব্রহ্মাণীর তীরে।
নিবিড় গহনে তার ঢুকে ধীরে ধীরে॥
কপিলা ঢুকিয়া তথা ছাড়ে দুগ্ধভার।
চমৎকৃত হ'ল গোপ দেখি বার বার॥
কিসের উপরে গাভী ঢালে দুগ্ধ এরে।
উৎসুক হইল ভৃত্য তাহা দেখিবারে॥
অগ্রসর হয়ে গোপ দেখে বার বার।
প্রস্তর উপরে গাভী দুগ্ধ দিছে আর॥
জ্যোতির্ম্ময় দেখি সেই বনের ভিতর।
অতি ভাগ্যবান্ হয় সেই গোপবর॥
জটিল মণ্ডিত বেশ ভুজঙ্গ শোভিত।
বৃষোপরি বসি আছেন গৌরী সহিত।
বাবার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখি গোপ রায়।
বাক্য নাহি সরে তার মনে বিচারয়॥
একরূপ দেখিয়া গোপ প্রণাম করিল।
শঙ্কর শঙ্করী এবে অদৃশ্য হইল॥
তাহা দেখি উচ্চ স্বরে কপিলায় বলে।
কি দেখালি মোরে আজ কিবা কোন্ স্থলে॥
আজ তোর পুণ্যফলে কপিলা আমার।
দেখাইলি অজ্ঞাতে সংসারের সার॥
অতঃপর কপিলা যায় আপনালয়ে।
গোপবর ছুটে তায় আনন্দ হৃদয়ে॥
নৃপতি সদনে গিয়ে গোপ অতঃপর।
কপিলা বিষয় সব কহিলা বিস্তর॥

(১) রাঢ় প্রদেশে একটী পরগণার নাম সিগনবাটী। জগদীশপুর উক্ত পরগণার অন্তর্গত।

নৃপচন্দ্র যেন শুনি হয় চমৎকৃত।
ভোলা মহেশ্বরে তেঁহ ভাবে অবিরত॥
নিদ্রা যায় চন্দ্রসেন ভাবিয়া ভাবিয়া।
লিঙ্গেশ্বর স্বপ্ন দেন শিয়রে বসিয়া॥
কত নিদ্রা যাও বাপু হয়ে অচেতন।
শঙ্কর আসিছে আজ তোমার ভবন :
লঙ্কা ছাড়ি তোর বাড়ী আগমন মোর।
নিগনেতে আছি রাজা পূজা কর মোর॥
স্বর্ণরেখা নদীর তীরে আছে তোর বাড়ী।
হেথায় পূজিবি মোরে ভক্তি মনে করি॥
ক্ষীর গ্রামেতে লঙ্কার উগ্রচণ্ড দেবী।
তার ভৈরব রূপ আমরা আছি চারি॥
আমার মন্দির তুমি করহ নির্ম্মাণ।
সেবার প্রচার তুমি কর মতিমান॥
দিনমানে একবার মোর পূজা হবে।
আতপ চাউল মিষ্টি আর দুধ দিবে॥
একাদশী দিনে আর শিবরাত্রি তিথে।
উপবাস থাকি আমি শুন এক চিতে॥
বার মাস হইবে মোর সন্ধ্যা আরতি।
এইরূপ কয় রাজা মম পূজা রীতি॥
চৈত্রমাসে চিরকাল হবে মোর পূজা।
তাহার নিয়ম আমি বলি শুন রাজা॥
চৈত্রমাসে ষোড়শ তারিখ হবে যবে।
সেই দিন মোর পূজা আরম্ভ হইবে॥
অতঃপর চতুর্থ দিনে নিশীথ রাতে।
প্রণাম করিবে মোর ভক্তগণ সবে॥
সংক্রান্তি পূর্ব্বে রাত্রে শ্মশান খেলিবে।
সংক্রান্তি প্রাতে সবে অগ্নিক্রিয়া করিবে॥
এইরূপে পূজা মোর চৈত্রের উৎসব।
সমাধা করিবে মোর যত ভক্ত সব॥
এতেক কহিয়া ভোলা সন্ন্যাসীর বেশে।
চন্দ্রসেনে দরশন দিল অবশেষে॥
কটিপরে বাঘছাল শিরে জটাভার।
নয়ন রঞ্জিত চারু সুবেশ তাহার॥
বামহাতে শিঙ্গা আর ত্রিশূল দক্ষিণে।
না পারি রূপের শোভা বিস্তার কথনে॥
রজতগিরির মত রূপ দেখি আর।
অবনত শিরে নমে সেই নৃপবর॥
অতঃপর বৃষধ্বজ ভোলা মহেশ্বর।
অন্তর্ধান হয়ে শীঘ্র গেল নিজঘর॥
লিঙ্গেশ্বরপুর রাজা প্রাতে উঠি গেল।
নির্ম্মাণে আদেশ দিল বিচিত্র দেউল॥
শতবিঘা জমি দিল সেবা করিবারে।
মুনিরাম ধামাচকস্থা বিজ্ঞ ঠাকুরে॥
পূজান্তরে তাহাকে দিলেন জমি কিছু।
বাদ্যকরে মালাকরে কোতোয়ালে পিছু॥
এইরূপে ভক্তিভরে পূজা করিয়া।
মুক্তিলাভ করিলেন চন্দ্রসেন রাজা॥
লিঙ্গেশ্বর মাহাত্ম্য যে করিবে শ্রবণ।
অন্তিমে সে পাইবে মহাদেব চরণ॥
দ্বিজ শিবশর্ম্মা ভণে ভাবি একমনে।
মহাদেব বিনা নাহি অন্য কারে জানে॥
বাৎসবগোত্র কুলোদ্ভবেন শিবচন্দ্রেন শর্ম্মণা।
বর্ণিতে হি মাহাত্ম্যং যৎ শ্রুতং ময়ানুলোকতঃ॥

এই কবিতার লেখক এই নিগন গ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণ, তাঁহার নাম শিবশর্ম্মা। বাৎসব গোত্রের অনেক ব্রাহ্মণ উক্ত গ্রামে বাস করেন। কিন্তু তিনি কাহাদের পূর্ব্বপুরুষ তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই।

আধুনিক সাহিত্যে সমস্যা

[শ্রীগোপাল হালদার]

স্রোতের ফুলের মত সাহিত্য এক ঘাট হইতে আর ঘাটে ভাসিয়া চলিয়াছে,—থমকিয়া সে কোন দিন দাঁড়ায় না। তাই, এই ভাসিয়া চলার মধ্যেই সাহিত্য নব নব দল বিকাশ করিতেছে। অঙ্গ হইতে তাহার ঝরিয়া পড়িয়াছে অনেক দল,—আবার বিকশিত হইয়া উঠিয়াছেও অনেক।

আধুনিক সাহিত্য অতীত ও ভাবী সাহিত্যের একটা সেতু,—সে একটা Compromise; অতীতের মণিমালা তাহার কণ্ঠে দুলিতেছে দোদুল-দোল্,—ভবিষ্যতের বিজয়-কেতন হাতে তাহার রহিয়াছে;—উড়িল বলিয়া। অতীতের শুভ্র নির্ম্মাল্য সে আপনার বুকে চাপিয়া ধরিয়াছে,- ভবিষ্যতের শুভ-নৈবেদ্য সে শুচি-সুন্দর হাতে সাজাইয়া তুলিতেছে।

তাই আজিকার সাহিত্যকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিলে চলিবে না। সে শুধু আজিকার নয়, নিমেষের নয়; সে ভবিষ্যতের, চির-দিবসের। সে ই একদিন মঞ্জরিত, পল্লবিত হইয়া আমাদের দুয়ারে ভাবী সাহিত্যের রূপে আসিয়া দাঁড়াইবে; তাহারি একটি কলিকা হয় ত সেদিনকার 'দখিন হাওয়ায়' জাগিয়া উঠিয়া, গন্ধে আপনাকে মথিত করিয়া তুলিবে; তাহারি নবোৎসারিত উৎস হয় ত ভবিষ্যতে আপনার কলগানে আমাদের কাণে সুধা ঢালিবে।

আধুনিক সাহিত্যে যে নব-নব ভাবের হিল্লোল উঠিয়াছে, তাহার জন্মোৎসব হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-কোঠায় ফরাসী ভূমিতে।



"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে।"—রবীন্দ্রনাথ

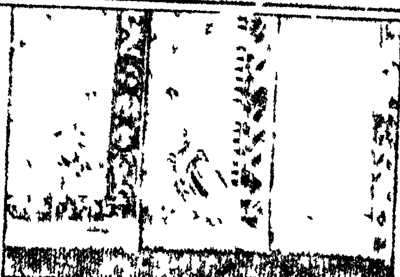
শিল্পী – শ্রীঅরুণকুমার নাগ

Blocks by Bharatvarsha Halftone Works] [Emerald Ptg. Works, Calcutta

শীতের বিপুল আয়োজন

পোষাক বিক্রেতা — [illegible] এণ্ড কোম্পানি — কাপড় বিক্রেতা







উচ্চশ্রেণীর

ইয়ুরোপীয় ধরণের

পোষাক

ও

সকল প্রকার

ধুতি ও শাড়ী

সুলভ মূল্যে

বিক্রয় হয়।

মফঃস্বল বিক্রয়ের

বিশেষ

সুবন্দোবস্ত আছে।





কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

French Revolutionএর "Sturm and drung" (Storm and Stress) রাষ্ট্রে, সমাজে, সাহিত্যে গণতন্ত্রের বীজ ছড়াইয়া দিয়া গেল। এই গণতন্ত্র সাহিত্যে আসিয়া হাজির হইল; তাহার পায়ের বেড়ী খসিয়া পড়িল; তাহার শত-নিষেধের বাঁধা-দেওয়াল ধসিয়া পড়িল। সাহিত্যের ক্ষেত্র তাই আজ আর সঙ্কীর্ণ নয়, সাহিত্য তাই আজ আপনাকে দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া দিতে পারিয়াছে। তাই রাষ্ট্র সমাজ, দর্শন ও বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব, অনেক সমস্যা আজিকার আর্টের মাল-মসলা জোগাইতেছে। তাই কোথাও সাহিত্য-সমাজের কঠোর নিষ্পেষণে নিপীড়িত প্রাণময় Individualএর যুদ্ধটুকু ফুটাইয়া তুলিয়া, কোথাও ধনীর চরণে দলিত অসহায় লক্ষ মূকের বেদনার করুণ কাহিনীতে ভাষা দিয়া, কোথাও বা পতি-পত্নীর প্রেমহীন সুখ-স্বপ্নের মধ্যে বাস্তবের করাল ছায়াটাকে টানিয়া আনিয়া নব-নব রসে মানুষের হৃদয় ভরপুর করিয়া তুলিয়াছে। জীবনের নিতি নতুন সমস্যা—বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ রশ্মি যাহা চোখে আঙুল দিয়া আমাদের দেখাইয়া দিতেছে—সাহিত্যের আজ বড় এক রসদ। জীবনের যে 'Penelope's web' আমরা বুনিতেছি আর ছিঁড়িতেছি,—সাহিত্যে আজ বেশ করিয়া তাহারি আলোচনা। তাই আধুনিক নাট্যের স্বরূপের কথা উল্লেখ করিতে যাইয়া এত বড় ভাব-তন্ময় নাট্যকার Maeterlinckও বলিয়াছেন,—"The modern drama has flung itself with delight into all the problems of contemporary morality and it is fair to assert that at this moment it confines itself almost exclusively to the discussion of the different problems." নাট্যের সম্বন্ধে এ কথাটা বলা হইলেও, আজিকার সমস্ত সাহিত্যের সম্বন্ধেই বলা চলে যে, problem বা সমস্যার আলোচনা তাহার বড় এক কোঠা জুড়িয়া বসিয়াছে।

মানুষের সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের জীবনটাও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। আজিকার মানুষ তা'র আদিম জীবনের ছোট সুখ ও ছোট শান্তি লইয়া আর বসিয়া নাই; তার অভিযানের ভেরী বাজিয়াছে; কাঁটাবনের উপর দিয়া সে এক সীমাহীন যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাই ক্ষত-বিক্ষত-দেহ মানুষের সমস্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে; তাই ক্লান্ত মানবের অন্তহীন পথের বাধা অফুরন্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। সবচেয়ে প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তার আজিকার রাষ্ট্র ও সমাজ-সমস্যা। সেখানে কেহ চাহিতেছেন সমাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, কেহ-বা আন্দোলন করিতেছেন ব্যক্তি তন্ত্রের জন্য। কেহ শাসাইতেছেন, সমাজের নির্মম যন্ত্র পিষিয়া মারিয়া ফেলিবে মানুষের স্বাধীন ব্যক্তিত্বকে; গড়িয়া তুলিবে কতকগুলি 'মেসিন'। সমাজ-তন্ত্র একটা বিরাট 'method of slavery';—তাহার বিস্তারে মানুষ হইবে অলস, শিথিল ও নিরুৎসাহ। আবার কেহ-বা বলেন, Laissez faire' মানুষকে অন্তহীন আবর্তের মধ্যে ডুবাইয়া দিবে, Individualism is another name for anarchism.'

পণ্ডিত-সমাজের এই তর্ক সেখানেই যতি টানিয়া থামিয়া পড়ে নাই;—আধুনিক সাহিত্যিকগণের নাট্যে ও উপন্যাসে তাহা নানা বেশে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। নিজকে সমাজ-তন্ত্রবাদী বলিয়া পরিচিত করিলেও, Ibsenএর নাট্যে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য একটা আবেদন প্রায় সর্ব্বত্রই ছাপাইয়া উঠিয়াছে। অপর দিকে H. G. Wells, এবং Bernard shaw-আদির লেখায় সমাজ তন্ত্রের ছায়ায় মনুষ্যত্বের পূর্ণ-বিকাশের সম্ভাবনার কথা বেশ চতুরতার সহিত বলা হইয়াছে। বাংলা-সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ—"ঘরে-বাইরে"র নিখিলেশ। ব্যক্তি মাত্রেরই ব্যক্তিত্বকে সে শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া চলে; তাহার স্বাধীনতার দাবীর উপর আপনার জবরদস্তি খাটাইতে যায় না। সে Individualism মূর্ত্তিমান। তাহার জীবনের ভিতর এতটুকু বিশৃঙ্খলা, এতটুকু অসামঞ্জস্য নাই,—যাহা Individualismকে ঠেলিয়া আনিয়া anarchismএর পায়ে উৎসর্গ করিতে পারে। যে Individualism 'মানুষের মধ্যে যিনি তাপস, যিনি সুন্দর', তাহার এমন আরতি জুড়িয়া দিতে পারে, তাহার অভিনন্দনে বোধ হয়, "Man and Superman"এর নাট্যকারও আপত্তি করিতে পারিবেন না। সন্দীপ নিখিলেশের ঠিক বিপরীত। Nietzscheএর দর্শন তাহার ভিতরে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। Individualism তাহার মধ্যে অভিশাপ হইয়া বাহির হইয়াছে। চারিদিককার সমস্তকে দলিয়া-পিষিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য মাথা তুলিয়া উঠিতে চায়; ধরুবো, মারবো, ছিঁড়বো তাহার motto. 'Laissez faire' যে anarchism-এর কত কাছে, তাহা সন্দীপে জাজ্বল্যমান। নিখিলেশের ছায়ার মত আরো একটি চরিত্র বাংলায় আছে,—সে "গৃহদাহের" স্বল্পভাষী মহিম। একটা বৃহত্তর আদর্শের ছায়ায় পড়িয়া গেলেও, তাহার স্থান খুব নীচে নয়, বোধ হয়।

বাংলা দেশের সমাজ যেমনি জড়, তেমনি autocrat। "কি" এবং "কেন" তাহার রাজ্য হইতে যেমনি নির্ব্বাসিত, তাহার স্বেচ্ছা-তন্ত্রতাও তেমনি বিরাট। তাই বাংলার নাট্যে, কবিতায় ও উপন্যাসে ব্যক্তির অভিযানটারই সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। "গোরার" চারিদিককার নির্জীব, অনুদ্যম প্রাণযাত্রার মধ্যে, গোরার ব্যক্তিত্ব, তাহার বিরাট চাঞ্চল্য ও অনলস জীবন লইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। "পল্লী-সমাজের" রমেশ চারিদিককার শাঁচে সঙ্কুচিত জীবনের মধ্যে দাবাগ্নির মত আবির্ভূত হইয়াছে। "শ্রীকান্তে" অভয়ার বিদ্রোহী নারীত্ব সমাজের অর্থহীন মিথ্যাকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। বাংলা-সাহিত্যে আমাদের সমাজের সহিত আমাদের ব্যক্তিত্বের মিলনের সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া এরূপে অনেক সুন্দর সুঠাম সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইয়োরোপের চিন্তাকাশে আর-একটা সমস্যা এখন বড়ই ঘন-ঘটা করিয়া আসিয়াছে,—তাহারও মীমাংসার কূল-কিনারা ইয়োরোপ খুঁজিয়া পাইতেছে না। Boss এবং Massএর মাঝে যে অপার সমুদ্র শায়িত, তাহার সেতুর সন্ধান নাই; অথচ সে বিশাল বারিধি দিনে দিনেই বিশালতর হইয়া উঠিয়াছে। Capital ও Labourএর সমস্যা

তীক্ষ্ণ হইয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। Bernard Shaw ও Galsworthyর মধ্য দিয়া এ সমস্যা বেশ ফুটিয়াছে; কিন্তু অমর হইয়া উঠিয়াছে, Houptmannএর "The Weavers"এ। ইহারি মীমাংসার চিন্তায় ঋষি Tolstoiএর "Anna Karenin"এর Levin—তাঁহার আপনারি প্রতিলিপি,—"Resurrection"এর Nehludof অনেক স্থলে ডুবিয়া পড়িয়াছেন। ভারতের আকাশে এখনো তাহার আগমন সূচিত হয় নাই;—কিন্তু সে আসিল বলিয়া। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইহার পরিবর্ত্তে জমিদার ও রায়তের বিরোধ; বিদেশী আমলা তন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বদেশী-ভাবানুপ্রাণিত ব্যক্তি-বিশেষের সমর-যাত্রা ঠাঁই পাইয়াছে। জমিদার ও রায়তের বিচিত্র সম্পর্ক লইয়া রচিত বাংলার নাট্য-উপন্যাসের সংখ্যা অগণ্য। রাশি-রাশি সেই গ্রন্থমালা প্রায়ই "দুই বিঘা জমি"র সেই শিক্ষাটাই সমর্থন করিয়া চলে,—

"এ জগতে হায়! সেই বেশী চায় যার আছে ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি"

আমলা-তন্ত্রের সহিত সমস্ত দেশবাসীর বিরোধও তেমনি আজিকার প্রায় উপন্যাসেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমী-আমল হইতেই বোধ হয় এই তত্ত্বটা আমাদের মনের দুয়ারে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল; কিন্তু তাহার প্রথম পরিষ্কার পরিচয় পাইয়াছি, আমরা খুব সম্ভবতঃ "গোরায়"। "গোরাতে" বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যে গর্জ্জন শোনা যায়, তাহা "মেঘ ও রৌদ্র" আদি গল্পগুলির মধ্যে বেশ তীক্ষ্ণ হইয়াই বাহির হইয়াছে। এই সমস্যাটিকেই ভিত্তি করিয়া "ঘরে-বাইরের" মধুর ছন্দ আরম্ভ হইয়াছে।

আমাদের এই সমস্যা দুইটি আরো একটি দেশের ও সাহিত্যের দুয়ারে এমনি ভাবে উপস্থিত হইয়াছিল। রাশিয়ার জমিদার ও রায়তের সম্পর্ক, আমলা-তন্ত্রের সহিত জন-সাধারণের বিরোধ আংশিক রূপে আমাদের মতই ছিল। তাই, Turganeivএর দীপ্তোজ্জ্বল প্রতিভার বহ্নিতে,- তাঁহার "Virgin Soil," "Fathers and Children" আদির আটের চিরস্থায়ী দীপরাশির আলোক-সম্পাতে,—সেই সমস্যা-মালা জগতের কাছে চিরকালের জন্য অমর হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের সাহিত্য রাশিয়ান্ সাহিত্যের সহিত ছন্দ বজায় রাখিয়া শুধু এইটুকুই অগ্রসর হইয়াছে, তাহা নয়, তাহারা আরো একটি ক্ষেত্রে পৌঁছিয়াছে। স্বাজাত্য-বোধ ও বিশ্বপ্রেমের মিলনের জন্য দুই সাহিত্যই চেষ্টা করিয়াছে। Patriotismএর বিরুদ্ধে ঋষি Tolstoi একদিন অঙ্গুলি তুলিয়াছিলেন, আজ রবীন্দ্রনাথও তেমনি একটি বাণী ধ্বনিত করিয়া চলিয়াছেন। আমাদের যে উগ্র স্বাদেশিকতা আপনার পদাঘাতে অপর সকলের স্বাধীনতার দাবীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া উন্মাদ বেগে ছুটিতে চাহিতেছে, রবীন্দ্রনাথ তাহার রাশ টানিবার জন্য ডাকিতেছেন। "গোরায়" ও "ঘরে-বাইরেতে" এই বিশ্বঘাতী স্বাজাত্যের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য তিনি আমাদের আমন্ত্রণ করিতেছেন।

এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে "ঘরে-বাইরে" Turgeneivএর "Fathers and Children", "Virgin Soil" আদির বীজের পূর্ণ বিকাশ।

আধুনিক সাহিত্যের স্রোত সবচেয়ে বেশী আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে আজিকার নারী সমস্যা। নারী কি শুধু গৃহ-কোণে আপনারে বিলাইয়া দিয়া আপনার মাতৃত্বের মধ্যে নারীত্বের চরম সুষমা খুঁজিয়া পাইবেন; না, জগতের বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে তিনিও পুরুষেরই পার্শ্বে আপনার স্থান বুঝিয়া লইয়া তাহারি মত অভিযানে বাহির হইয়া পড়িবেন? পলিটিক্সে ইহার মীমাংসায় সাফ্রেজেট্‌গণ আপনাদের দাবী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; কিন্তু আজিও অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা বলিতে চান, সত্য-সত্যই নারী যে-দিন আমাদের কেনা-বেচার মধ্যে আসিয়া, পুরুষের মতই দর-দস্তুর লইয়া কষা-কষি আরম্ভ করিবেন, সে-দিন, দুঃখিনী আথেন্স ও রোমের এমনি দুর্দ্দিনে, শিরে তাঁহাদের যেমন সমুদ্যত বজ্র ভৈরব রবে নামিয়াছিল, আমাদের বড় সাধের নন্দন-কাননকে পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়া তেমনি এক অভিশাপ নামিয়া আসিবে। এই কথায় পুরোপুরি সম্মতি না জানাইলেও ভারতবর্ষের মাতৃহৃদয়,—যাহার উপর এখনো পাশ্চাত্যের ঝাড়ো হাওয়ার ঢেউ আসিয়া প্রচণ্ড রূপে পড়ে নাই, রেণু-রেণু করিয়া উড়াইয়া দেয় নাই তাঁহার বহু শতাব্দীর আঁকা আদর্শ নারীকে,—সেই মাতৃহৃদয়, মাতৃত্বেই নারীত্বের চরম ও পরম লাভ, এই কথাটাই যেন প্রকাশ করিতে চায়। তাই বাংলার স্নেহ-শীতল ক্ষেত্রেই সাহিত্যের 'মেডোনা' গড়িয়া উঠিয়াছেন,—"গোরার" আনন্দময়ী বোধ হয় বিশ্ব-সাহিত্যে মাতৃত্বের চরম সৃষ্টি। এই অতুলনীয়, অনবদ্য সুন্দর মূর্ত্তি তাঁহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি লইয়া আমাদের মনের দুয়ারে বসিয়া আছেন বলিয়াই "পল্লী সমাজের" জ্যাঠাইমা একটু ছায়ায় আবৃত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তিনিও তাঁহারি সুযোগ্যা ভগিনী। আসলে, বাংলার মাতৃত্বের উপর জোর খুব বেশী করিয়াই দেওয়া হইয়াছে। তাহার অর্ঘ্য সাজাইতে বাংলার সাহিত্যিক আপনারি প্রতিভার কুসুম ভার অকাতরে ঢালিয়া দিয়াছেন চিরদিনই। গৌরবের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে বাঙ্গালায় মায়ের আসন চিরদিনেরই জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। তাই, "ঘরে বাইরেতে" বিমল যে-দিন অমূল্যের হাতে-তোলা মাতৃত্বের সুধা ভাণ্ডের স্বাদ পাইল, সে দিন ছুটিয়া গেল তা'র 'প্রেয়সী নারীর' সুরা-তরল আবেশ, টুটিয়া গেল তা'র বাধা-বন্ধ-হীন অভিসারিকার বেশ;—নিমেষের মধ্যে বাহির হইয়া আসিলেন শান্ত, শুভ্র, শুচি-সুন্দর নারী;—সে নারী মাতা। "শ্রীকান্তেও" মাতৃত্বেই যে নারীর চরম পরিণতি, তাহা সন্দেহের অতীত বলিয়া বেশ জোর গলাতেই বলা হইয়াছে। সেখানে অন্তরের সমস্ত বিদ্রোহ ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাহার "মা হইবার আকাঙ্ক্ষা"; পিয়ারীর সকল বাসনার সিন্ধুর পারে বাঁশী বাজাইতেছেন সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত মা-টি। তাই, শরৎচন্দ্রের বিন্দু ('বিন্দুর ছেলে') তাহার ছেলের স্নেহ লইয়া অমর; রামের বৌদি' ('রামের সুমতি') তাহার রামকে লইয়া আরাধ্যা; সিদ্ধেশ্বরী

'নিষ্কৃতি') তাহার মাতৃত্বের মহিমায় তুলনাতীত। এই মায়ের রাগই কুসুমের ('পণ্ডিতমশাই') জীবনের সমস্ত বিশৃঙ্খলা ডুবাইয়া দিয়াছে, আর ইহারি অভাবে বোধ হয় তাহারি ভাগিনী রমাকে 'পল্লী-সমাজ') মিলনের সেতুর অভাবে তীর্থের পথে বাহির হইয়া পড়িতে হইয়াছে। বিয়োগ ও বেদনার জ্বালায় জীবনের সমস্ত শান্তি যখন যায়-যায়, তখন পতি পত্নীর অধরের সম্মুখে মিলনের পাত্র লইয়া যে দাঁড়ায়, সে মাতৃত্ব। ইহারি দৃষ্টান্ত Oscar Wildeএর "Lady Windermere's Fan"এ,—যেখানে ব্যর্থ-প্রয়াস Mrs. Erlynne গৃহত্যাগিনী Lady Windermereকে ফিরাইতে পারিলেন তখনি, যখন তিনি তাহার মাতৃত্বের কাছে আবেদন করিলেন। ইহাই আবার Strindebergএর "The connecting Link"এ স্বামী স্ত্রীকে একত্র বাঁধিয়া রাখিয়াছে। "Doll's House"এ কিন্তু এ দিক্‌কার বিপরীত বাণীটিই জ্বালাময়ী ভাষায় ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। সেখানে Nora তাহার মাতৃত্বের মহিমাকে তুচ্ছ করিয়া,—তিন-তিনটি শিশুর জননী Nora,—সজোরে সতেজে বলিয়া গেলেন, "Before all else I am a human being"—"সবার আগে আমি মানুষ",—তার পর তিনি মাতা হইতে পারেন। "Anna Kareninএ"ও প্রেয়সী Annaই জননী Annaকে ডুবাইয়া দিয়া মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে; যদিও সেখানকার সংগ্রাম খুবই তীব্র হইয়াছিল, যদিও দুঃস্বপ্নের মত মায়ের স্নেহ প্রেমিকার কামনাকে অনেক সময়ই ঝাঁকিয়া দিয়া গিয়াছে। মোট কথা, আজিকার Ibsen-পন্থীরা তাঁহাদের প্রতিভার জোরে স্নেহকে প্রায়ই বাসনার দুয়ারে বলি দিয়াছেন। বাংলায় কিন্তু এরূপ বলি কোথাও স্মরণ হয় না; এর কারণ বাংলার জল-বায়ু।

কিন্তু সমাজে নারীর সমস্যা এখানে আসিয়াই শেষ হয় নাই; তাহা নব-নব আকারে আরো রুদ্র হইয়া বাহির হইয়াছে। এরই এক দিকে Sex problem; আর তাহারি চিত্র Bernard Shawএর "Philanderer" এবং Strindbergএর "Countess Julie" আদিতে। বাংলায় আজও এ জাতীয় সাহিত্যের আমদানী হয় নাই; "ঘরে-বাইরেতে" তাহার ছায়াপাত হইয়াছে মাত্র বলা যাইতে পারে। এই সমস্যা একেবারে সকলকে চকিত করিয়া দিয়াছে। মানুষের প্রবৃত্তির খেলায় এই বিসদৃশ সৌন্দর্য্যের দিকে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি পড়িয়াছিল Goetheর;—তাঁহার "Elective affinities"ই তার সাক্ষী।

এ বিরোধের আর একটি দিকে বিবাহ,—তাহার কঠিন নিগড়ের ভালো-মন্দের বিচার; তাহার আধ্যাত্মিকতার যাচাই; মনস্তত্ত্ব,- সমাজনীতি, অর্থনীতি আদি বিজ্ঞানের চোখে তার দর। ইয়োরোপের শত-শত গ্রন্থের পাতায় এ সমস্যার পদচিহ্ন রহিয়াছে,—H. G. Wellsএর "Marriage", Bernard Shawএর "Getting Married", Galsworthyর "The Fugitive", Oscar Wildeএর "The Ideal Husband", Hauptmannএর "Lonely Lives" আদি তাহার প্রমাণ। যে মর্ম্ম-বেদনা বক্ষ চাপিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে, দাম্পত্য জীবনের হর্ম্ম্য-রাজির নীচে, তারি সুর রণিয়া উঠিয়াছে গভীর মূর্চ্ছনায় "স্ত্রীর পত্রে", "Doll's House"এ।" "স্ত্রীর পত্রের" মৃণাল বিধাতার সঙ্গে তার অন্য যে সম্বন্ধটা আছে তাহা যে দিন বুঝিতে পারিল, সে দিন বলিয়া গেল, "এই চিঠিখানি আর তোমাদের মেজ-বৌএর চিঠি নয়।" "Monna Vannaর" Vanna যে দিন আসল প্রেমের খোঁজ পাইলেন, সে দিন বিবাহের বাঁধন ছিঁড়িবার জন্য এক মধুরতর উষার অপেক্ষায় জাগিয়া রহিলেন। "Doll's House"র Nora যেদিন বুঝিতে পারিলেন সত্যিকারের প্রেমের ধারা তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন মধুময় হইয়া উঠে নাই, তখন সে মিথ্যাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সত্যের সদর রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। বিবাহিত জীবনের চারি পাশে যে পাষাণ-প্রাচীর গড়িয়া উঠে, তাহার গায়ে পাখা ঝাপটাইয়া কাঁদিয়া মরে যে মানুষের প্রাণ-পাখী, তাহার দর্শন পাই "নষ্টনীড়ে", "Anna Karenina" (স্বামী ত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত)। কি নির্দ্দয় নিষ্করুণ হইয়া উঠিয়াছিল যে জীবন তাঁহাদের কাছে, তাহারি একটুকু আভাস পাই Bjornsonর "En Hauskeর" নায়িকার মুখে, "You make out that marriage is a great laundry for men. We girls are to stand ready, each at her wash-tub, with her piece of soap." এই নির্ম্মমতাই "শ্রীকান্তের" অভয়াকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। 'একটা ব্যক্তির বিবাহ অনুষ্ঠান, যা স্বামি-স্ত্রী, দুজনের কাছেই স্বপ্নের মত মিথ্যা হ'য়ে গেছে' তাকেই জোর করিয়া সারা জীবন খাড়া না রাখিয়া তিনিও Noraর মত বাহির হইয়া পড়িলেন। তবে দেশটা বাংলা, আর সমাজটা হিন্দু; তাই অভয়াকে Noraর মত বাড়িয়া উঠিতে দেওয়া হয় নাই,—বাধ্য হইয়াই তাহাকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া লওয়া হইয়াছে। অভয়া বাংলার এক উদ্ধত বিদ্রোহী,—নরওয়ের বিদ্রোহী নহেন। তাই স্বামীর কাছে তার অপমান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সতী সাধ্বী হিন্দু ললনারি মত আপনার সকল সুখকে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন; আর যে রোহিণী-দা'র জীবনটাকে তিনি ব্যর্থ পঙ্গু করিতে নারাজ বলিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সে রোহিণী দা'র জীবনের উপর দুঃখের একটা প্রকাণ্ড বোঝা চাপাইয়া দিতেও তাঁহার দ্বিধা ছিল না। এ মাটীর গুণ। নরওয়ের ক্ষেত্রে যে বীজ উগ্র, রুদ্র হইয়া উঠিয়াছে, বাংলার প্রান্তরে সে বীজ অনেকটা ভব্য হইয়া ফলিয়াছে।

বিবাহের মধ্যে যাঁহারা কল্যাণ ও সুন্দরকে দেখেন, তাঁহারা কিন্তু এই নিগড়কে, এই শ্রীহীন মলিনতাকেই চরম বলিয়া মানিয়া লইতে চাহেন না। "ঘরে-বাইরেতে" এই দিক্‌কার বাণীটি বেশ প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে উদার অকপট স্বামী নিখিলেশ ও স্ত্রী বিমলার দাম্পত্য জীবনের স্বচ্ছ আকাশের মধ্যে সন্দীপের যে কালো মেঘ ঘনাইয়া উঠিল, তাহা বিমলকে কাঁপাইয়া দিয়া গেল, এলাইতে পারিল না;—জয়লক্ষ্মী বিজয়মাল্য পরাইলেন নিখিলেশকেই। "ঘরে-বাইরেতে" নিখিলেশের বিজয়লাভ "Candide"র Morrelএর বিজয়লাভেরি অনুরূপ;—দুইজনেই শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া-

ছিলেন স্ত্রী কি বলে তাহা শুনিবার জন্য। আগুনের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া জগতের পণ্যশালায় একজন যখন আরজনকে যাচাই করিয়া লয়, মিলনটাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া অগ্রসর হয়, তখন বিবাহের মধ্যে যে বন্ধনটুকু আছে তাহা ঘুচিয়া যায়,—যাহা শিব, যাহা সুন্দর, যাহা শাশ্বত, তাহা ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া উঠে, ইহাই বোধ হয় Ibsen এর "Lady of the Seas"র মর্ম্মকথা, রবীন্দ্রনাথের "ঘরে-বাইরের" বাণী; আর ইহারি প্রতিধ্বনি উঠিতেছে শরৎচন্দ্রের সৌদামিনীর ("স্বামী") মধ্য দিয়া। Tolstoi কিন্তু তাঁর "Kreutzer Soneta"য় ইহাকেই আদর্শ করিয়া ধরিলেও, অভিশাপের পর অভিশাপে আজিকার নারী-পুরুষের মিলনের উপর একটি তীব্র আগুনের ধারা ঢালিয়া দিয়াছেন। শান্তি ও সংযমের ঋষি অতীতের চিক্র তাপসদের মত গৈরিক-স্রাব উদ্গমন করিয়া বলিয়াছেন, আধ্যাত্মিকতার আড়ম্বরে আজ আমরা যে বিগ্রহের সম্মুখে ধূপ পোড়াইতেছি, সে শিব নয়, সুন্দর নয়,—সে অকল্যাণ, অপদেবতা।

বিজ্ঞানের আলোকে যাঁহারা বিবাহের দর নির্দ্দেশ করিতে বসিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের এই মঙ্গল অনুষ্ঠানটিকে আরো কালো কুৎসিত করিয়া চিত্রিত করেন। মনস্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব আদির চশমা চোখে পরিয়া তাঁহাদেরি একজন (Bernard Shaw) আজ প্রত্যেক পাঁচ বছরে বিবাহটা renew করিয়া লইবার জন্য ডাকিয়াছেন। মোট কথা, আজ যাঁহারা সমস্যার আলোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে জুড়িয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরি মতে বিশাল বিশ্বচক্রে নারীও পুরুষের মত আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া দিবেন। Brieux "Woman on her own"এ, Bernard Shaw "Misalliance"এ, Ibsen "Doll's House"এ এই দিকেই যেন মত দিয়াছেন।

এই সমস্ত সমস্যাই সাহিত্যের দরবারে একটি বিশেষ নামে পরিচিত হইতে পারে;—সে নামটি যেমনি ব্যাপক, তেমনি সুপ্রসিদ্ধ,—বস্তুতন্ত্রতা (Realism)। "Renaissance of Wonder"এর দিনে এক অজানা অপরিচিতের পদচিহ্নে আমাদের সাহিত্য ভরিয়া উঠিয়াছিল। সাদা সিধা প্রত্যক্ষ জীবনের নিগড় ভাঙিয়া বাহির হইবার জন্য একদিন স্বপ্নের পালে সাহিত্যের নৌকা ভাসাইয়া দিয়া আমাদের সাহিত্যিক দল কল্পনার কাজলে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহারা ফিরিয়াছেন,—'স্বর্গ হইতে বিদায়' লইয়া 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলির' জন্য তাঁহারা আজ ক্রন্দন জুড়িয়াছেন। ধরণীর বুকে বহিতেছে যে অশ্রুর ধারা, যে হাসির লহর, খেলিতেছে যে আনন্দের সূর্য্যালোক, ক্রন্দনের নৈশান্ধকার, তাহা আজিকার সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঠাঁই পাইয়াছে। Goethe, Balzac, Meredith হইতে আরম্ভ করিয়া Ibsen, Hauptmann Bernard Shaw, Galsworthy-আদি আজিকার সাহিত্যিকরা প্রায় সকলেই সর্ব্বত্রই বস্তুতন্ত্রতার পূজার আয়োজন করিয়াছেন। Romanticismর কল্পনা-লোকের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়া Realism রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছে;—তাহারি অভিনয় আজিকার সাহিত্যে। ইংরেজী, ফরাসী, ও রাশিয়ান্ সাহিত্যে বাস্তবতা সমভাবে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাংলার বাস্তবতার প্রথম উদয় হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে,—আজো তার মধ্যাহ্নের ময়ূখমালারই মত দীপ্তি, তেমনি তীব্রতা।

ঐ বাস্তবতার একটা দিক, যাহা সাহিত্যে বিজ্ঞানের আলোচনা লইয়া ব্যাপৃত, তাহাকে প্রকৃতি তন্ত্রতা নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতি যে জীবনপটের 'Back-ground' মাত্র নয়—এ সত্য ফরাসী বিপ্লবের যুগের আবিষ্কার। তখনকার Rousseau তাঁহার "Emile" আদিতে প্রকৃতির যে একটা শান্ত, মঙ্গলময় মূর্ত্তির সন্ধান দিলেন, Wordsworth ও Shelley প্রভৃতি কবিরা তাঁহার স্তব গুঞ্জনে একেবারে আপনাদের ডুবাইয়া দিয়া বিভোর হইয়া গেলেন। তার পর আসিয়া পড়িল বিজ্ঞানের বিপ্লব;—মানুষের বহু শতাব্দীর কল্পনা ভাসিয়া গেল, তাহার বিগ্রহ নুইয়া পড়িল। সেদিনকার সাহিত্যিক কল্পনার নৌকা ভাসাইয়া দিয়া ঘাটে বসিয়া রহিলেন না; তিনি বিজ্ঞানের নব-নব রশ্মিপাতে চোখের সম্মুখে যে সত্য দেখিতে পাইলেন, নির্ম্মম, কঠোর,—তাহা আঁকড়িয়া ধরিলেন। মানুষের জীবনের খেয়া এক উদ্দাম, দুর্দ্দান্ত সর্ব্বনাশী স্রোতের বেগে ভাসিয়া চলিয়াছে, বিজ্ঞানের অঙ্গনে সাহিত্যিক যে দিন এই সত্য দেখিতে পাইলেন, আর তাহাকে নাট্যে, উপন্যাসে, কবিতায় ফলাইয়া তুলিলেন, সে-দিন সাহিত্যে একটা আঁধার ও নৈরাশ্যের বান ডাকিল। এই Naturalism আমরা দেখিতে পাই Zola ও Maupassantর মধ্যে। জীবনের কুৎসিত নগ্নতাকে Zola উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন ঠিক বৈজ্ঞানিকের মত চক্ষু লইয়া। "To take man, dissect him and analyse both his flesh and brain" এই হইল Zolaর প্রকৃতিতন্ত্রের formula'. কিন্তু ফরাসী প্রকৃতি-তন্ত্রীরা আসলে একটু উৎকট বস্তুতন্ত্রী। Naturalism পুরোপুরি আরম্ভ হইয়াছে Ibsen হইতে; তাঁহার "Ghost"কে Havelock Ellis 'tragedy of heredity' নামে অভিহিত করিয়াছেন। Ibsenএর পরে Hauptmann তাঁহার "Reconciliation" "Colbague Krampton."-আদি নাট্যগুলিতে এই প্রকৃতি-তন্ত্রের অভ্যর্থনা করেন; Brieux তাঁহার "Damaged Goods" (Syphilis সংক্রান্ত) আদিতে তাহা অপূর্ব্ব সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলেন; Thomas Hardy তাঁর শেষ জীবনের উপন্যাসগুলিতে ইংলণ্ডকে একটা বিষাদের বাতাসে ঝাড়া দিয়া যান, আর আজ Bernard Shaw তাঁহার "Man and Superman" (Evolution সংক্রান্ত) আদি নাট্যসমূহে প্রকৃতিতন্ত্রকেই paradoxএর গাঁথা মালায় সাজাইয়া তার অর্চ্চনা জুড়িয়া দিয়াছেন। এই স্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে ভেরী বাজাইবার লোকের অভাব হয় নাই; কিন্তু প্রকৃতি-পন্থীরা বার-বার বলিয়াছেন, জীবনের নিষ্ঠুর সত্য ও নির্ম্মম-নগ্নতার উপর পর্দ্দা টানিয়া তাহাকে শোভন করিয়া তুলিতে চাহেন যাঁহারা, সত্যের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি তাঁহারা দেখিতে চাহেন না। সত্য উলঙ্গ হউক, তাহা নীতি-বাতিক-গ্রস্তদের কাছে

দূপ, অসহ্য হউক রুচি-বাগীশদের কাছে,—তার বিশ্ব জ্বালানো দীপ্তি। হিত্যের ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য বলিয়া যেই শুচি-বাগীশগণ ইহাকে সাহিত্যের কের বাইরে ফেলিয়া রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর, Goetheর ভাষায় দের জবাব দেওয়া চলে, "No real circumstance is un-etic' so long as the poet knows how to use it." ই, Ibsenএর 'Tragedy of heredity'র মধ্যে, Hauptmann-র সেই 'Heredity and alcoholismএর' খেলার ভিতরে, Oscar ildeএর "Salome"এর 'abnormal psychology চিত্রণে, ieuxএএর "Damaged Goodsএ" Syphilisএর ধ্বংসকীর্ত্তনে,— র আর্ট Bernard Shawএর কথায় Sophoclesএর "Oedipias-" সঙ্গে তুলনীয়,—Dosteiffskyর "The Idiot" ও "Crime d Punishment" আদিতে রোগী ও অপরাধীর অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব লোচনায় যে রস ফলিয়া উঠিয়াছে, সাহিত্যের নিকষ-পাষাণে যাচাই রিয়া তাহাকে আজ আমরা নির্ব্বিবাদে খাঁটি বলিতে পারি।

বাংলার ক্ষেত্রে যদিও বস্তুতন্ত্রতার নামে ঝরিয়া পড়িয়াছে অনেক , বাঙালী তাহার দেউলে পোড়াইয়াছে অনেক ধূপ, তবু প্রকৃতি তার অভ্যর্থনা বড় কোথাও একটা হয় নাই। বাঙালীর কবি ন্দ্রনাথ আমাদের বলিয়াছেন, "মানুষ পদার্থটা যে কেবলমাত্র তত্ত্ব, কিম্বা জীবতত্ত্ব, কিম্বা মনস্তত্ত্ব, কিম্বা বড় জোর সমাজতত্ত্ব নয়, হাই তোমাদের সে কথা ভুলো না।" বাংলার মনের ও বাংলার হাসের ধারা ইহার বিরুদ্ধগামী বলিয়াই বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে turalism এখনো ফুটে নাই। তবে তার 'আগমনী'গান আমাদের ণে আজ ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। প্রতিভাবান্ লেখক শ্রীযুক্ত রশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'মেঘনাদ' আদি গল্পের মধ্য দিয়া তাহারি । সূচিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমস্যার সাহিত্য বস্তুতন্ত্র সাহিত্যেরি এক ঠা;—কারণ, আমাদের সমস্যাগুলি বাস্তব, জীবন্ত। প্রকৃতি এর সাহিত্য কিন্তু আবার এই সমস্যামূলক সাহিত্যের একটি বেশ কোঠা জুড়িয়া রহিয়াছে; কারণ, বিজ্ঞানের যে নব-নব তথ্যগুলি হিত্যের ক্ষেত্রে প্রকৃতিতন্ত্রের আমদানি করিয়াছে, সেগুলি আবার কেগুলি নূতন সমস্যাকেও টানিয়া আনিয়াছে।

Realismএর সাহিত্য বলিতে গেলে এক রকম problemএর হিত্য। অবশ্য এমন নাট্য বা উপন্যাস আমরা পাইতে পারি, যার নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক কোনো প্রকারের সমস্যার লোচনা করিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু সেই সব গ্রন্থ হইতেও মরা সমস্যা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি। তাই, Realistic হিত্যের কথা বলিতে আমাদের আজ-কাল problemএর হিত্যকেই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে; কারণ, বলিতে গেলে, সমস্ত বস্তু-এর সাহিত্যই হয় আর্থিক, নয় নৈতিক, নয় সামাজিক, অথবা রাজ-তিক আদি অন্য কোনো সমস্যা-মূলক সাহিত্যের সীমায় পড়িয়া । Balzacএর "Old Goriot"খানা বিশেষ কোন একটা সমস্যাকে মুক্তি দিবার জন্য লিখিত হয় নাই বোধ হয়; কিন্তু তখনকার সমস্ত "পারী"র জীবনটা তার অগণ্য সমস্যা লইয়া ঐ অমর উপন্যাস-খানায় হাজির হইয়াছে, তাই "Old Goriot"কে Parisian lifeএর Epic বা মহাকাব্য বলা হয়।

পূর্ব্বে যে সকল সমস্যার কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের অনেকগুলিই সামাজিক। মানুষ জাতিটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, আর যাহা কিছু পিছনদিকে টানিতেছে তাহাই ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিতেছে। আমাদের উন্নতির পথে এই সামাজিক বাধাগুলি আজ দেওয়াল হইয়া উঠিয়াছে। বহু শত শতাব্দীর সংস্কার আমাদের পায়ে বেড়ী দিয়া উন্নতির অন্তরায় হইয়া আছে। তাহাদের উপর প্রথম যে প্রচণ্ড আঘাত আসিল, যে বজ্রে ফাটল ধরিল এই Conventionsএর অচলায়তন, সে বজ্র পড়া হইয়াছিল নরওয়ের তুষার-ধবল ক্ষেত্রে। সমাজের মধ্যে যে অন্যায়, অসত্য শুধু প্রথার জোরে চলিয়া আসিতেছে, যে বিরাট মিথ্যার 'স্তম্ভের' ("Pillars of Society") উপর আমাদের এই সমাজ লক্ষ বছর ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যে অর্থহীন অনন্ত প্রেতরূপী সংস্কার-সমূহ, ছায়ার মত আহার-বিহারে আমাদের পিছনে পিছনে ঘুরিতেছে, যে শতাব্দী-সঞ্চিত ধূলি-রাশির নীচে তলাইয়া যাইতেছে লক্ষ-লক্ষ প্রাণবান্ লোকের মনুষ্যত্ব,—নরওয়ের বিদ্রোহী সন্তানই সর্ব্বাগ্রে তাহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। যে নির্ম্মম কঠিন বিদ্রোহের বাণী Ibsen ঘোষণা করেন, ইয়োরোপের জাগ্রত মন তাহাকে বরণ করিয়া লয়। মরণের তুহিন-স্পর্শে তাঁহার শিথিল হাত হইতে সে অগ্নিবীণা খসিয়া পড়িলেও, তাহা নীরব হইয়া যায় নাই। লক্ষ-লক্ষ তাঁহার শিষ্যদল সে বাণী,—সে অভিনব 'mar-sailles' দুনিয়ার বুকে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিলেন। Bernard Shaw, Hauptmann, Sudenman, Strindberg আদি মনস্বী পুরোহিত-দল তাঁহাদের শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া তুলিলেন সাহিত্যের এই রুদ্রের অভ্যর্থনায়। এই বিদ্রোহী দেবতার তাণ্ডব নৃত্য শুধু প্রতীচিরই সমস্ত কণ্ঠ-কোলাহল ডুবাইয়া দেয় নাই,—তাঁহার পিনাক নাদ প্রাচীর কাণেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যে Ibsenism সভ্যতার দীপ্তির মধ্য হইতে এই জ্বলন্ত অঙ্গার খণ্ডগুলি বাহির করিয়া ফেলিল, প্রাচ্যও তাহাকে বরণ করিতে দ্বিধা করে নাই। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র আদির মধ্যে তাহা একটা অসীম করুণাভরা আলোকে মণ্ডিত হইয়া আমাদের আকাশে উঠিয়াছে,—উঠিয়াছে একটা সজল চাহনির মত, একটা করুণ সাহানা তানের মত। বরং, বাংলা সগৌরবে বলিতে পারে আমাদের সুধী সমাজে "স্ত্রীর পত্রের" যেরূপ সম্বর্দ্ধনা হইয়াছে, তেমন সম্বর্দ্ধনা পাশ্চাত্যে "Doll's House"ও পায় নাই। Ibsenism শুকাইয়া বাংলার মাটিতে মরিয়া যায় নাই, বরং সব দেশ হইতে এখানেই সে উপজীব্য পাইয়াছে বেশী। বাংলা সাহিত্যে সবে মাত্র তাহার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে; বাংলার ভাবী সাহিত্যে তাহার বান্ ডাকিবে। কারণ, পাশ্চাত্যের তুলনায় আমাদের সমস্যাগুলি ঢের বেশী তীক্ষ, ঢের বেশী রূঢ়; আর

আমরাও তাহাদের চেয়ে ঢের বেশী জড়। আমাদের সমাজ দেহের প্রতি অঙ্গ ক্ষত, রোগে অকর্ম্মণ্য; তবু ঔষধ সংস্কারের প্রয়োজনটা পর্য্যন্ত আমরা অস্বীকার করি। গল্সওয়ার্দির "The Fugitive"এর অস্পষ্ট পিতার মত, আমরা আমাদের 'মজলিসে'র ("যেনাস্য পিতরো যাতা") ব্রহ্মচর্য্যের নৈতিকথা শুনাইতে বসিয়া যাই, "Pillars of Society"র" মত আমাদের "পল্লী-সমাজ"ও মিথ্যার বেদীতে নৈবেদ্য সাজাইতে মত্ত। বরং পাশ্চাত্যের 'Consul Bernick' সত্যকে পরিণামে বরণ করিতে পারেন; কিন্তু আমাদের 'গোবিন্দ গাঙ্গুলী' সেদিকে ঘেঁসিবেনও না। পাশ্চাত্যের ধর্ষিতা নারী 'Maslova'র ("Resurrection") অভ্যুত্থান সম্ভব হয়, কিন্তু আমাদের 'পতিতারা' আমাদের 'ক্ষীরোদারা' ("বিচারক") আজীবন আমাদের হাতে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনাই উপহার পায়। তাই, Ibsenism ও Shawism আদির বন্যা আমাদের ভাসাইয়া দিবে,—তাহাদের বারিরাশি অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই বাঁধা-ঘাটের পাষাণ সোপান ছাপাইয়া উঠিবে।

এই যে ফেনিল, উচ্ছল, উদ্বেগ, আবর্ত্তময় আমাদের সমস্যার সাহিত্য,—নগ্ন জীবন্ত, দুর্ব্বার,—সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহাকে পরিণত করে আর্ট। সাহিত্যের এই সোণার কাঠি সুপ্তপুরীর সৌন্দর্য্যমহলের সেই ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জাগাইয়া তোলে; এই বিচিত্র কাজল আমাদের চোখের সামনে গড়িয়া তোলে শত শত সৌন্দর্য্যের সৌধমালা। এই যে সমস্ত সমস্যা, তাহারা আপনার দরে বিকী হইলে সাহিত্যের পণ্যশালায় বিকাইত না নিঃসন্দেহ। আর্টের রসে রাঙিয়া উঠে, তবেই তাহাদের সাহিত্যের দরবারে প্রবেশের অনুমতি হয়। শুধু মাত্র তত্ত্ব ও সমস্যা হিসাবে তাহারা সাহিত্যের ভক্তদের কাছে উপেক্ষার জিনিষ। সাহিত্যের "The Ghost" খুব উপভোগ্য; কিন্তু তাই বলিয়া আর্টের পরশপাথরে যাহাকে পবিত্র করা হয় নাই, তেমন কোন Heredityর, সমস্যা-সংক্রান্ত গ্রন্থ সে মজলিসে ঠাঁই পাইবে না। "Man and Superman" বেশ আদর পাইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তার রসলেশস্পর্শশূন্য Evolution-বাদের আদর হইক না। Artএর তুলিকায় "Damaged Goods"কে ডিঙাইয়া না দিলে, তাহা 'ম্যালেরিয়া নাটিকা' বা 'অসুর বধের'ই মত ভাসোদ্দীপক হইয়া দাঁড়াইত। Sex problem লইয়া রচিত গ্রন্থগুলি আর্টের প্রদীপ ভাতিতে আপনাদের জ্বালাইয়া না লইলে Havelock Ellisর গ্রন্থমালার মত হয় ত প্রামাণিক হইতে পারিত; কিন্তু সাহিত্য হইত না,—হইত বিজ্ঞান। "L'art pour l'art" ('Art for art's sake') অবিসংবাদিত সত্য না হইতে পারে; তবে সার্ব্বভৌম মূল্য তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বা সমস্যার মীমাংসার মূল্যের দ্বারা নিরূপিত হয় না, নিশ্চয়। যে সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনার প্রতিভায় সমস্যাকেই সর্ব্বতোভাবে সাজাইয়া শিল্পদেবতার বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তিনি আর যাই গড়ুন, সাহিত্য গড়িতে পারেন না। অত্যাগ্রহে Bernard Shaw প্রভৃতি সাহিত্যের সীমা ছাড়াইয়া pamphleteeringকেই বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাই বলিয়া আজ অনেকে বলিতে চান, সমস্যামূলক সাহিত্যের ধারা 'decadent'। বাংলায় যাঁহারা ভবিষ্যতে সমস্যার সাহিত্য সৃষ্টি করিতে বসিবেন, তাঁহাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যেন নূতন পথে চলিতে কোন দিন তাঁহারা এইরূপে সাহিত্যের মৃত্যুর আয়োজন না করিয়া বসেন। সেই সব নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকরা মনে রাখিবেন, বাণীর চরণযুগল স্থাপিত রহিয়াছে পঙ্কজের উপরে,—পঙ্কের উপরে নয়।

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অসীম শিবির পরিত্যাগ করিয়া সেই নিদাঘ-মধ্যাহ্নে, অনশনে, পাটনা নগরের পথে-পথে উন্মাদের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অপরাহ্ণ সমাগত হইল; মানসিক উত্তেজনা সত্ত্বেও পরিশ্রান্ত দেহ আর উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। অসীম ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অধীর হইয়া এক অশ্বত্থ-বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া পড়িলেন। সেই অশ্বত্থ-তলে একখণ্ড প্রস্তরের উপর বসিয়া জনৈক গৌরবর্ণ পশ্চিমদেশীয় যুবা নিশ্চিন্ত মনে কুটাহা চর্ব্বণ করিতেছিল। সে অসীমের অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বোধ হয় তৃষ্ণা পাইয়াছে। এই ইঁদারার জল বরফের ন্যায় শীতল,—এক লোটা তুলিয়া দিব কি?" অসীম মাত্র মস্তক সঞ্চালন করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। যুবা পিত্তল-পাত্রে গভীর কূপের শীতল জল উঠাইয়া আনিল। অসীম তাহা এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন। দুই পাত্র জল শেষ করিয়া তবে অসীমের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি কহিলেন, "বন্ধু, বড়ই উপকার করিলে। তোমার নাম কি?" যুবা কহিল,

আমার নাম সভাচন্দ্, নিবাস জালন্ধরে। উদরান্নের জন্য তদূরে আসিয়াছি। আপনার নিবাস?" অসীম তাহার দালাপে প্রীত হইয়া কহিলেন, "আমার নিবাস? মুর্শিদা-াদের নিকট ডাহাপাড়া। আমরা জাতিতে কায়স্থ। আমার াম অসীমচন্দ্র রায়। শাহজাদার ফৌজের সহিত মুর্শিদা-াদ হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব তাহা বলিতে পারি া।" সভাচন্দ্ ইত্যবসরে রুমালের ফুটাগুলি শেষ করিয়া ানিয়াছিল। এই সময়ে অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু, ামাকে কিছু খাইতে দিতে পার?". শেষ মুঠাটা বদনে ক্ষেপ করিয়া যুবা বলিয়া উঠিল, "এতক্ষণ বলিতে হয়, াহা হইলে অর্দ্ধেকগুলি দিতাম? এ অঞ্চলে ভদ্রলোকের খাগ্য খাদ্য কিছু পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি ামি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।" যুবা আসন পরিত্যাগ রিয়া উঠিল এবং পথ পার হইয়া এক তাল-বনে প্রবেশ রিল। অসীম অশ্বথ-তলে বসিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ রে সভাচন্দ্ একটি তালপত্রের পাত্রে করিয়া দুই মুষ্টি টাহা এবং কতকগুলি পক্ক মহুয়া লইয়া আসিল। অসীম মৃত মনে করিয়া সেগুলি গলাধঃকরণ করিলেন। আহার শষ হইলে অসীমের মূল্যের কথা স্মরণ হইল। সভাচন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কহিল যে মূল্য দেওয়ার কোনই য়োজন নাই; কারণ, সে এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে উহা াড়িয়া আনিয়াছে এবং সন্ন্যাসী এই মাত্র ভিক্ষায় বাহির ইয়া গেল।

অসীম ও সভাচন্দ্ ধীরে-ধীরে নগরোপকণ্ঠ পরিত্যাগ রিয়া নগরের দিকে ফিরিলেন। পথে আসিতে-আসিতে সীম সহসা দাঁড়াইয়া গেলেন। একখানা রূপার তাঞ্জামে ড়িয়া যথোচিত সজ্জায় সজ্জিত একটি যুবতী সেই পথে যাইতে-ছল;—তাহার পরিচ্ছদ প্রচার করিতেছিল যে, সে বারনারী। বতী তওয়াইফের কায়দায় অসীমকে কুর্ণীশ করিল। সীম তাহা দেখিয়াই দাঁড়াইয়া গেলেন। সভাচন্দ্ কহিল, দাঁড়াইলেন কেন?" অসীম কিন্তু তাহার প্রশ্ন বুঝিতে ারিলেন না। তাঁহার তখন প্রবল হাস্যোদ্রেক হইয়াছিল; বং সে বেগ দমন করিতে না পারিয়া, অনাবৃত প্রকাশ্য াজপথে তিনি অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিলেন। প্রভাত হইতে য দুশ্চিন্তা তাঁহাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাঁহার াভাবিক সদানন্দভাব আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা প্রবল বায়ুর মুখে একখণ্ড মেঘের ন্যায় সহসা বহু দূরে চলিয়া গেল। অকস্মাৎ একজন ধীর, শান্ত পথিককে হাসিতে দেখিয়া, দুই চারিজন পথিকও আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। সভাচন্দ্ এত বিস্মিত হইয়াছিল যে, সে পড়িতে-পড়িতে রহিয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার শরীর কি অসুস্থ বোধ হইয়াছে?" কারণ, তাহার মনে হইল যে, তাহার সঙ্গী অকস্মাৎ উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। দুশ্চিন্তার দুর্ভার দূর হইবামাত্র অসীম প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, কিছু না। তুমি চল ভাই, আমার মাঝে-মাঝে অমন হাসি আসে।" সভাচন্দ্ এই সময়ে আর এক জন পথিককে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঞ্জামে করিয়া গেল—ও স্ত্রীলোকটি কে?" পথিক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি পাটনায় নূতন আসিয়াছ না কি? ঐ স্ত্রীলোকটি রৌশন বাঈয়ের কন্যা বিখ্যাত তওয়াইফ মণিয়াবাঈ।"

কিয়ৎক্ষণ পরে অসীম ও সভাচন্দ্ এক প্রশস্ত উদ্যান-বাটিকার চত্বরে প্রবেশ করিল। সে উদ্যানের মধ্যে অনেক-গুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গৃহ ছিল,—সভাচন্দ্ তাহার একটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসীমকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল; এবং অনেকগুলি শুষ্ক ফল একখানি থালায় সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল। অসীম তাহার শয্যায় বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে আহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

সভাচন্দের ক্ষুদ্র গৃহের নিকটে উদ্যান-মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা ছিল; তাহার প্রস্তর-নির্ম্মিত ঘাটে বসিয়া কতকগুলা মদ্যপ কলহ করিতেছিল। তাহার মধ্যে একজন বারবার বলিতেছিল, "জানিস্—আমার নাম রাজা অসীম রায়।" কথাটা দুই তিনবার শুনিয়া অসীম গৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন; এবং মদ্যপদিগকে দেখিয়া পুনরায় হাসিয়া উঠিলেন। সভাচন্দ্ এবার আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু, এ উদ্যানটি কাহার?" সভাচন্দ্ কহিল, "সুবাদারের দেওয়ানের।" "আমি তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাই।" "তিনি প্রায়ই এখানে আসেন না।" "তবে ইহারা কাহার?" "তাঁহার পুত্র ফরিদ খাঁর সঙ্গী।" "ভাল কথা, ফরিদ্ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে?" "স্বচ্ছন্দে। ফরীদ্ খাঁ খোশ্-মেজাজী লোক,—তাঁহাকে বলিলেই তিনি হয় ত এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

যদি অনুমতি করেন ত দেখিয়া আসি, তিনি এখন আছেন কি না।" অসীম মস্তক সঞ্চালন করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন,—সভাচন্দ্ বাহির হইয়া গেল।

সহসা অসীমের স্মরণ হইল যে, তাঁহার উপদেশ মত শাহ্‌জাদা ফররুখ্‌শিয়র দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য অদ্য হইতেই চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন; এবং তাঁহাকে শিবির পরিত্যাগ করিয়া অধিকক্ষণ বাহিরে থাকিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল যে, তাঁহার বৃদ্ধ অধ্যাপক বলিতেন, কামিনী ও কাঞ্চন জগতের সমস্ত অনর্থের মূল। তিনি যাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া সমস্ত দিন নগরের পথে-পথে ভ্রমণ করিয়াছেন, সে যথারীতি প্রসাধিতা হইয়া সন্ধ্যাগমে নব নায়ক সম্ভাষণে চলিয়াছে। শিবিরে ফিরিয়া যাইবার জন্য অসীম অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে, সভাচন্দ্ ফিরিয়া আসিল; কিন্তু সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু, একটা ঘোড়া যোগাড় করিয়া দিতে পার?" সভাচন্দ্ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার প্রভুপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না?" "এখন নহে, ফিরিয়া আসিয়া। দোস্ত্, হঠাৎ একটা অত্যন্ত জরুরী কাজের কথা মনে হইয়াছে। কথাটা এত জরুরী যে, আবশ্যক হইলে আমি একটা ঘোড়া কিনিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত আছি।" সভাচন্দ্ হাসিয়া কহিল, "পয়সা হইলে দুনিয়ায় হয় না এমন কাজ অতি অল্পই আছে।" তাহার কথা শুনিয়া অসীম দুইখানি মোহর বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিলেন। সভাচন্দ্ তাহা লইয়া পুনরায় বাহিরে চলিয়া গেল। এই সময়ে উদ্যানে মদ্যপ-গণ তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া অসীম আর একবার বাহিরে আসিলেন; এবং দেখিলেন যে, সকলে ঊর্দ্ধ হস্তে 'মণিয়া-মণিয়া' বলিয়া চীৎকার করিতেছে এবং নৃত্য করিতেছে।

এই সময়ে সভাচন্দ্ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মহাশয়, ঘোড়া কিনিতে পারি নাই। তবে একটা ভাড়া পাইয়াছি; কিন্তু যাহার ঘোড়া সে রাতারাতি বড় মানুষ হইতে চাহে। কারণ, এক আশরফীর কম ঘোড়া ছাড়িতে চাহে না।" অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটা ঘোড়ার ভাড়া এক আশরফী কত দিনের জন্য?" "যত দিন ইচ্ছা,—এক দিনই রাখুন, আর এক মাসই রাখুন।" "এক আশরফী দিয়া ঘোড়াটা লইয়া গিয়া যদি ফিরিয়া না আসি?" "দোস্ত, যে এক দিনের জন্য এক আশরফী ঘোড়ার ভাড়া চাহে, সে কি আর তাহার ব্যবস্থা না করিয়াছে?" "কি ব্যবস্থা করিয়াছে?" "নগদ তিন আশরফী জমা না রাখিলে ঘোড়া পাওয়া যাইবে না।"

অসীমের নিকট হইতে আরও দুইটা আশরফী লইয়া সভাচন্দ্ একটা অতি বৃদ্ধ অস্থিচর্ম্মসার অশ্ব আনিয়া উপস্থিত করিল। অসীম তাহাকে দেখিয়া হাসিয়াই অস্থির হইলেন। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি সভাচন্দ্‌কে কহিলেন, "দেখ বন্ধু, এ ঘোড়া যদি পথে মরিয়া যায়, তাহা হইলে কি অশ্বের আশরফী তিনটা মারা যাইবে?" সভাচন্দ্ কহিল, "সে কথাটা জিজ্ঞাসা করি নাই। আপনি ত ফিরিয়া আসিতেছেন, আসিলেই উত্তর পাইবেন।"

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহের সম্মুখে অশ্বত্থতলে কম্বল বিছাইয়া হরিনারায়ণ তামাকু সেবন করিতেছিলেন,—এই সময়ে সরস্বতী বৈষ্ণবী সেই স্থানে আসিয়া অদূরে উপবেশন করিল। হরিনারায়ণ হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সরস্বতী, খবর কি?" সরস্বতী প্রণাম করিয়া কহিল, "খবর আর কি বাবাঠাকুর, আপনার চরণ দর্শন পাইয়া মনে করিয়াছিলাম যে, এই আশ্রয়েই অনেকটা পথ কাটিয়া যাইবে।" "কেন, তুমি কি আমাদের ছাড়িয়া চলিলে না কি?" "কি আর করি বাবা, বৃন্দাবন অনেক দূরের পথ, শীতও পড়িয়া আসিল, বেশী জাড়ে কি পথ চলিতে পারিব? আপনারা ত এক রকম এইখানেই বসিয়া গেলেন।" "সে কি সরস্বতী, বসিয়া গেলাম কি? আমরাও ত শীঘ্রই কাশী যাইব।" "তবে এখানে বিলম্ব করিতেছেন কেন বাবাঠাকুর?"

প্রশ্ন শুনিয়া হরিনারায়ণের সহাস্য বদন গম্ভীর হইয়া উঠিল। সরস্বতী উত্তর পাইবার আশায় দুই একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু কপালে ভ্রূকুটী দেখিয়া মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিল। তখন হরিনারায়ণ ভাবিতেছিলেন যে, তিনি পাটনায় বসিয়া কি করিতেছেন? তাঁহার মন এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারিল না। সে জন্য তাঁহার চিন্তা বাড়িয়া গেল। তিনি অত্যাচার-প্রপীড়িত

ইয়া দেশের বাস উঠাইয়া বারাণসী যাত্রা করিয়াছিলেন; থে অসীম রায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বাদ্‌শাহের ৌত্র পাটনায় আছেন বলিয়া, অসীম ও ভূপেন পাটনায় াছে; কিন্তু তিনি কি জন্য পাটনায় রহিয়াছেন? তাঁহার ন এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারিল না। হরিনারায়ণ বিরক্ত হইলেন,—তাঁহার নিজের মনের উপরে ক্রুদ্ধ ইলেন। পঞ্চাশদ্বর্ষব্যাপী জীবনে তাঁহার মন তাঁহার িকটে কখনও এইরূপ বার-বার অপরাধী হয় নাই। াটনায় আসিয়া বাসা ভাড়া লইয়া এতদিন বাস করিবার ক আবশ্যকতা ছিল? সুদর্শনের সহিত বাদ্‌শাহের পৌত্রের পরিচয় হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার জন্য তাঁহার াটনায় থাকিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। সুদর্শনের দি কোন চাকরী হয়, তাহার জন্য সে থাকিতে পারে; কন্তু তিনি কেন বারাণসী চলিয়া যান নাই? সেই িন তৃতীয়বার হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের মন প্রশ্নের দুত্তর দিতে পারিল না।

সন্দেহ কাণে-কাণে বলিয়া গেল যে, ইহার ভিতরে একটা গুরুতর দুরভিসন্ধি আছে। মন বলিল, "না"; কিন্তু তাহার কথা গ্রাহ্য হইল না; কারণ, সে বারবার তিন-ার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নাই। সুবিধা পাইয়া সন্দেহ াবার কহিল, ইহার ভিতর নিশ্চয় একটা চক্রান্ত াছে। কে তাঁহাকে পাটনায় বাস করিতে পরামর্শ দয়াছিল? সুদর্শন। সুদর্শন তাঁহার পুত্র, কিন্তু সে ়সীমের বন্ধু। সে নির্ব্বোধ নহে, কিন্তু সে সরলচিত্ত; স কি অসীমের পরামর্শে তাঁহাকে পাটনায় বাস করিতে ়নুরোধ করিয়াছিল? অসীমের তাহাতে স্বার্থ কি? ়র্গার জন্য? তবে কি অসীম দুর্গার জার? বৃদ্ধ াহ্মণের মস্তিষ্কমধ্যে তীব্র জ্বালা অনুভূত হইল। কলিকার াগুন নিবিয়া গিয়াছিল,—কাঠকয়লার ছাই হাওয়ায় ়ড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে বেড়াইতেছিল;—তাহা দেখিয়া সরস্বতী িজ্ঞাসা করিল, "আর একটা সাজিয়া আনিব কি াবাঠাকুর?" বিদ্যালঙ্কার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, না।" সরস্বতী ভয়ে জড়সড় হইয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ ়রে বিদ্যালঙ্কার সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ বষ্ণবী, আমি যে কাশী না গিয়া এতদিন কেন বৃথা িলম্ব করিয়াছি, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না।" সরস্বতী কহিল, "হুঁ।" হরিনারায়ণ তখন সরস্বতী বৈষ্ণবীর অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া পুনরায় চিন্তামগ্ন হইলেন। অসীম যদি দুর্গার জার, তাহা হইলে সে নিত্য তাঁহার গৃহে আসে না কেন? দুর্গাও কখন তাহার নাম করে না। হয় ত সুদর্শন বা ভূপেন না জানিয়া দৌত্যকার্য্য সম্পন্ন করে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দুর্গা কথনও সহজে পাটনা পরিত্যাগ করিতে চাহিবে না। সুতরাং তাহাকে প্রশ্ন করিলেই রহস্য সহজেই উদ্ঘাটিত হইবে।

হরিনারায়ণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং কূপ হইতে জল লইয়া মুখ প্রক্ষালন করিলেন। বধূ আসিয়া জানাইল যে, আহ্নিকের আয়োজন প্রস্তুত। তিনি কহিলেন, "মা, আমি গঙ্গাতীরে চলিলাম, আহ্নিক সেইখানেই সারিয়া লইব। তুমি একবার দুর্গাকে ডাকিয়া দাও।" কন্যা আসিলে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমি গঙ্গা-তীরে যাইতেছি,—বাজার হইতে কি কোন জিনিষ আনিতে হইবে?" দুর্গা বলিলেন, "কিছু না বাবা। তবে আমার গঙ্গামাটী ফুরাইয়া গিয়াছে; যদি পার ত একটুখানি হাতে করিয়া আনিও,—কারণ, আমার দুই দিন শিবপূজা বন্ধ আছে।" "ভাল কথা মনে করাইয়া দিলে মা। আমরা ত দেখিতেছি মুরশিদাবাদ ছাড়িয়া পাটনায় বাস করিলাম। বিশ্বনাথ কি তবে বিমুখ হইলেন?" "বাবা, আমিও তোমাকে বলিব-বলিব মনে করিয়া বলিতে পারি নাই। দাদা যদি মেজদাদার কাছে থাকিতে চাহে, তবে চল না কেন, বৌকে পাটনায় রাখিয়া আমরা কাশী চলিয়া যাই?"

উত্তর শুনিয়া হরিনারায়ণ স্তব্ধ হইলেন। অসীম যদি দুর্গার জার, তবে সে কেন স্বচ্ছন্দমনে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহে? সেইদিন চতুর্থবার বিদ্যালঙ্কারের মন প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিল না। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তান্বিত মনে বিদ্যালঙ্কার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গৃহদ্বারে তাঁহার সহিত সুদর্শন ও ভূপেনের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে দেখিয়া সুদর্শন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বাবা, ছোট রায় কি এখানে আসিয়াছে?" বিদ্যালঙ্কার কহিলেন, "না।" ভূপেন কহিল, "ঠাকুর মহাশয়, দাদাকে আর নবা

খানসামাকে সকাল হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। দাদা একবার শাহজাদার দরবারে গিয়াছিল। আফরাশিয়র্ খাঁ কহিল যে, তাঁহার সন্ধ্যাবেলায় দরবারে ফিরিবার কথা আছে; কিন্তু এখনও তাঁহার দেখা নাই।" বিদ্যালঙ্কার তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, সুদর্শনকে কহিলেন, "সুদর্শন, তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। আমি আর তবে গঙ্গাতীরে যাইব না,—তোমার সহিত একটা পরামর্শ আছে।" উদারচিত্ত সুদর্শন কহিল, "বাবা, যতক্ষণ ছোট রায়ের সন্ধান না মিলিতেছে, ততক্ষণ আমার সহিত পরামর্শ করিয়া বিশেষ কোন ফল হইবে না।" বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে সুদর্শন, ছোট রায় তোর কে?" সুদর্শন মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে কহিল, "তাহা এত সহজে বলিতে পারিলাম না বাবা!" "তুই জানিস, আমি কি কারণে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি?" "আপনার বন্ধু হরনারায়ণের জন্য।" "সে অসীমের কে?" "বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং বিষম শত্রু।" "তুই জানিস, অসীম সমস্ত অনর্থের মূল?" সরলচিত্ত সুদর্শন সস্মিত বদনে কহিল, "না।" পুত্রের উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ দ্বিতীয়বার স্তব্ধ হইলেন। মনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগিনীর কলঙ্ককথা শুনিয়াও সুদর্শন কেন অসীমের পক্ষাবলম্বন করে? সে-সময়ে ভূপেন অন্তঃপুরে গিয়াছিল। সুদর্শন তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "ভূপেন, বাহিরে আয়।" দূর হইতে ভূপেন কহিল, "যাই।" সহসা বিদ্যালঙ্কার বলিয়া উঠিলেন, "দেখ সুদর্শন, আমরা আর কেন পাটনায় বসিয়া থাকি; চল, কাশী যাই।" সুদর্শন কাতর হইয়া কহিল, "বাবা, একটা দিন অপেক্ষা করুন,—ছোট রায়ের সন্ধান পাইলেই আমি নৌকা ঠিক করিয়া আসিব।" "তুমি না হয় তোমাকে ও দুর্গাকে লইয়া এইখানে বাস কর,—আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমি একাই বারাণসী যাত্রা করি।" "উহারা এখানে কি করিবে? বরঞ্চ আপনার সঙ্গে থাকিলে আপনার সেবা করিতে পারিবে। আর আমিও ছোট রায়ের সঙ্গে টিকিতে পারিব বলিয়া বোধ হয় না। অনেকক্ষণ তাহার সন্ধান পাই নাই বলিয়া মনটা ব্যাকুল হইয়াছে। সে ফিরিয়া আসিলেই সকলে মিলিয়া যাত্রা করিব।" পুত্রের উত্তর শুনিয়া বিদ্যালঙ্কার তৃতীয় বার স্তব্ধ হইলেন।

সুদর্শন ভূপেনকে ডাকিয়া কহিল, "ওরে কাণা বাঁদ বাড়ীর ভিতর বসিয়া কি করিতেছিস্,—গিলিতে বসিয়াছি বুঝি? আর সে যে সমস্ত দিন অনাহারে আছে।" হরিনারায়ণ বধূকে আহ্নিকের আয়োজন করিতে বলিয়াছেন, সে-কথা বিস্মৃত হইয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সরস্বতী বৈষ্ণবী এতক্ষণ দুয়ারের অন্তরালে লুকাইয়া ছিল;—বিদ্যালঙ্কার গৃহত্যাগ করিলে, সে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

"উদ্যান-বাটিকার মধ্যস্থিত একটি ক্ষুদ্র কক্ষ তামাকুর ধূম, মিষ্ট মদিরার গন্ধ, গণিকার সুকণ্ঠোত্থিত গীতধ্বনি ও মদ্যপের অব্যক্ত কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রজনীর দ্বিতীয় প্রহর শেষ হইয়াছে;—মিষ্ট পারসীক মদিরা তখন গণিকাকণ্ঠেও জড়তা আনয়ন করিয়াছে; সেই সময়ে দুইজন যুবা সেই ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া যাহারা উত্থানশক্তি রহিত হয় নাই, তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল; যাহারা উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছিল,—তাহারা উঠিবার চেষ্টা করিল; এবং গণিকাত্রয় সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। দুইজন নবাগত ব্যক্তির মধ্যে এক-জন যে গণিকা গায়িতেছিল তাহাকে গায়িতে নিষেধ করিয়া অপরাকে কহিল, "মণিয়াজান, ইনি আমার নূতন বন্ধু, নাম গায়েব। তুমি আমাদের পাটনা সহরের বুলবুল। তোমার আওয়াজের মত মিঠা আওয়াজ বোধ হয় কখনও ইঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। একবার মেহেরবানী কর।" মণিয়া উঠিয়া গৃহস্বামীর বন্ধুকে দ্বিতীয়বার অভিবাদন করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "ফরীদ্, তোমার বন্ধুর নামটা কি, গায়েব, না নামটা উপস্থিত গায়েব আছে?" আগন্তুক ঈষৎ হাসিল; কিন্তু উত্তর দিল না। তাহা দেখিয়া মণিয়া কহিল, "গায়িব কি ভাই, আমার মাশুক আর কথা কহিতেছে না।" ফরীদ খাঁ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পীয়ার, আবার কে নূতন মাশুক জুটিল?" মণিয়া কুর্ণীশ করিয়া, কক্ষের কোণে এক বিবস্ত্র মদ্যপকে দেখাইয়া দিল, এবং কহিল, "ইনি রাজা অসীম রায়, বাঙ্গালা মুলুকের আমীর।" নাম শুনিয়া দ্বিতীয় আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া

হল, "সত্য না কি? রাজা অসীম রায়! তাঁহার ত আমার পরিচয় আছে।" তিনি অগ্রসর হইলেন। য়া মণ্ডপের হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইল; এবং কহিল, ণ্ডক, জানি, আমার কলিজা, একটা কথা কও!" প. কহিল, "আমি,——ঠিক — আমি——রাজা ীম রায়।" মণিয়া তাহার মুখের নিকট ঝুঁকিয়া ড়য়া কহিল, "আলবৎ, জরুর। তুমি আলবৎ রাজা ীম রায়। কোন্ দাগাবাজ বলে তুমি অসীম রায় । পিয়ার, তোমার মুলুক হইতে এক দোস্ত্ সিয়াছে—একবার চোখ মেলিয়া দেখ—আমায় এক- : জানি বলিয়া ডাক।" মণিয়ার উত্তেজনায় মণ্ডপ কষ্টে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আগন্তুকের দিকে চাহিল। হাকে দেখিয়াই তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল! সে য়া উঠিল, "বাপ!" মণিয়া কৃত্রিম সোহাগে তাহার ালিঙ্গন করিয়া কহিল, "জানি, কি হইয়াছে জানি?" প চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জড়িত কণ্ঠে কহিল, "না বাবা, মি তোমার জানি না, বাপ! আমি যমের বাড়ী ।" মণিয়া ক্রন্দনের ভান করিয়া বলিয়া উঠিল, ামার জানি কেন এমন করে গো,—তোমরা সকলে খ না গো!"

দ্বিতীয় আগন্তুক অগ্রসর হইয়া মণ্ডপকে ডাকিলেন, বা!" মণ্ডপ জড়িত কণ্ঠে কহিল, "হুজুর!" গৃহস্বামী ীদ খাঁ বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। গন্তুক পুনর্ব্বার মণ্ডপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই ানে কি করিতেছিস নবা?" সে কহিল, "রাজা জিয়াছি হুজুর।" "কেন সাজিলি?" "বেকুবী, হুজুর।" য়া ততক্ষণ তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়াই ছিল। সে বলিয়া ঠল, "জানি, কি বলিতেছ জানি?" নবকৃষ্ণ চক্ষু দ্রিত করিয়াই কহিল, "পয়জার, বাপধন, এখন ড়ে দে।"

গৃহস্বামী ফরীদ খাঁ আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল, দাস্ত, রহস্যটা কি বুঝিতে পারিলাম না।" আগন্তুক ৎ হাসিয়াই কহিলেন, "উহাকেই জিজ্ঞাসা করুন না ন।" ফরীদ খাঁ মণ্ডপের নিকট অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা রিল, "কি দোস্ত, ব্যাপার কি?" মণ্ডপ চক্ষু মুদ্রিত রিয়া ধীরে-ধীরে কহিল, "পয়জার।" "কেন, পয়জার কেন?" "রাজা সাজিয়াছি বলিয়া।" "তুমি কে?" "নবা খানসামা।" তাহার শেষ কথা শুনিয়া সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "খানসামা—কাহার খানসামা?" "রাজা অসীম রায়ের।" মণিয়া কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "জানি, তবে তুমিও দাগাবাজ! তুমি তবে রাজা অসীম রায় নও?"

এই সময়ে আগন্তুক তীব্রস্বরে ডাকিল, "নবা!" মণ্ডপ অধিকতর জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, "হুজুর!" "উঠিয়া আয়।" নবকৃষ্ণ উঠিবার চেষ্টা করিয়া, টাল খাইয়া পড়িয়া গেল। মণিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আগন্তুক ক্রোধে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গৃহস্বামীকে কহিল, "আপনি মেহেরবানী করিয়া ইহাকে বাহির করিয়া দিন, এবং মাথায় দশ মসক জল ঢালাইয়া দিন।" ফরীদ খাঁর আদেশে দুই-তিনজন পরিচারক আসিয়া নবকৃষ্ণকে বাহিরে লইয়া গেল। মজলিস পুনরায় জমিল।

গৃহস্বামীর আদেশে আর দুইজন গণিকা গীত গাহিল; কিন্তু কেহই মণিয়াকে গাওয়াইতে পারিল না। মণিয়া কহিল, "যাহারা গায়েব থাকে, তাহাদের সম্মুখে গাহিতে বড় লজ্জা করে।" ইহা শুনিয়া ফরীদ খাঁ আগন্তুককে কহিল, "দোস্ত, অনুভবে বুঝা গেল যে, এখানে কেবল তুমিই গায়েব আছ। আমাদের পাটনা সহরের বুলবুল বড় দিলখুলসা। তুমি আপনার দিলটা খুলাসা করিয়া প্রকাশ হইয়া পড়,—তাহা হইলেই বুলবুলের মিঠি আওয়াজ শুনিতে পাইবে।" এই সময়ে মণিয়া কৃত্রিম লজ্জায় মস্তকের অবগুণ্ঠন ঈষৎ টানিয়া দিয়া, অপাঙ্গে মনোবিমোহন কটাক্ষ সন্ধান করিল। সে কটাক্ষ ক্ষুদ্র কক্ষে কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিল না,—সকলেই অল্পবিস্তর হাসিল। লজ্জায় আগন্তুকের মুখ রক্তবর্ণ হইল। এক বৃদ্ধ রসিক উঠিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া কহিল, "জনাব, আপনার মত নসীব কয়জনের হয়? মণিয়া ইচ্ছা করিয়া যাহার দিকে অমন করিয়া চাহে, সে খোদার বড়ই প্রিয়পাত্র। কত আমীর-ওমরাহ ঐ গোলাপী চরণে আশ্রয় পাইবার জন্য বাদ্শাহের দৌলৎ লুটাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ যে চাহনি মণিয়াজান বিনামূল্যে তোমার উপর বর্ষণ করিল, তাহার লক্ষ অংশের জন্য কত রাজার রাজ্য গিয়াছে।

দোস্ত, তুমি আমার তুলনায় এখনও বালক, এমন মওকা হেলায় হারাইও না। নিজ নামটি প্রকাশ করিয়া ফেল,—তোমার সহিত আমরাও বেহেস্তে চলিয়া যাই।"

মণিয়া চক্ষুর কোণে হেনার আতর লাগাইয়া দুই-দশ বিন্দু অশ্রুবিসর্জ্জন করিল; এবং সুগন্ধসিক্ত রেশমের রুমাল দিয়া তাহা বারবার মুছিয়া, রক্তবর্ণ করিয়া তুলিল। তাহা দেখিয়া একজন ভাবুক সু বিহ্বল চিত্তে সত্যসত্যই কাঁদিয়া ফেলিল এবং আগন্তুকের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া মদিরা-জড়িত কণ্ঠে মিনতি করিতে লাগিল। আগন্তুক বিরক্ত হইয়া গৃহস্বামীকে কহিলেন, "আমাকে অনুমতি করুন, আমি এখন গৃহে ফিরিয়া যাই।" ফরীদ খাঁ ভদ্রসন্তান,—তিনি সঙ্গিগণের ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আপনার সহিত আমরা বড়ই অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি; আপনি আমাদের মাফ করুন।" আগন্তুক উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "মাফ করিবার কিছুই নাই,—ফূর্ত্তির আসরে এইরূপ হইয়াই থাকে। রাত্রি অধিক হইয়াছে, আমি তবে বিদায় হইলাম।" আগন্তুক কক্ষের দ্বারের দিকে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই, মণিয়া ক্ষিপ্রহস্তে একজন বাদকের নিকট হইতে একটা এস্রাজ ছিনাইয়া লইয়া, সেই কক্ষের একমাত্র প্রবেশপথে বসিয়া গেল, এবং গাহিল :—

* "সখি, হামে ছোড় যাতি বংশীধারী,
নিঠুর কপট শঠ মোহন মুরারী ॥
সারা দিবস রজনী, কহ, কহলো সজনী,
রাধা কাহার ধেয়ানী,
সখি রি চিকণকালা বড়ি অহঙ্কারী ॥
মিছা এ মোহন বেশ চিকণ বিনন কেশ,
আজু সব ভেল শেষ,
চলি যায় শ্যামরায় ছোড়িয়ে পিয়ারী ॥"

গান শেষ করিয়া মণিয়া সত্য-সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। আগন্তুক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরে মণিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুর্ণিস করিল এবং পথ ছাড়িয়া দিল। আগন্তুক কক্ষ পরিত্যাগ করিলে, একজন জিজ্ঞাসা করিল, "মণিয়াজান, এত খাতির করিলে,—লোকটা কে?" মণিয়া গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "যাহার নফরকে এতক্ষণ এত খাতির করিলে এ সেই।" ভাবুক ভাববিহ্বল হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে নাদান, আশ্‌নাইয়ের ফের তুই কি বুঝিবি বল?"

সে রাত্রিতে ফরীদ খাঁর মজলিস আর তেমন করিয়া জমিল না।

* সুর—বেহাগ কাওয়ালী।

পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি

[অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পি-আর-এস]

বিচার-বিভাগ

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে নির্ব্বাসিত হন। পেশবাদিগের রাজ্যচ্যুতির সময় হইতে সাতারার ছত্রপতি প্রতাপসিংহ মহারাজ ইংরেজ সরকারের সামন্ত-নৃপতিরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ছত্রপতি প্রতাপ সিংহ নিজের ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসন-পদ্ধতিকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট আকার দিবার জন্য একখানি 'যাদী' সঙ্কলন করেন। এই যাদীতে মারাঠা-সাম্রাজ্যের শাসন-পদ্ধতি-সম্বন্ধক যাবতীয় নিয়ম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভাস্কর বামন ভট মহাশয় এই যাদীখানি সংগ্রহ করিয়া পুণার 'ভারত-ইতিহাস-সংশোধকমণ্ডলে'র তৃতীয় সম্মিলন বৃত্তে ছাপিয়া দিয়াছেন। এই যাদীর ন্যায়াধীশ-প্রকরণ হইতে মারাঠা-সাম্রাজ্যের বিচার-বিভাগ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে।

ছত্রপতি প্রতাপ সিংহ ন্যায়াধীশ-প্রকরণে বলিতেছেন— "প্রতিবেশীদিগের চেষ্টায় সকল বিবাদের আপোষে মীমাংসাই হইতেছে এই রাজ্যের প্রাচীন প্রথা। আপোষে মীমাংসা

লে তখন পঞ্চায়েৎ ডাকিবে।" তিনি তাঁহার রাজ্যের া, মামলতদার ও শেটে মহাজনদিগকে ছোট-বড় মোকর্দ্দমারই আপোস-মীমাংসার চেষ্টা করিতে উপদেশ ছেন। পক্ষগণকে তিনি ভরসা দিয়াছেন যে আপোষ-শা হইলে আর তাহাদিগকে রাজ-সরকারে 'হরকী' বা -খরচা যোগাইতে হইবে না। তিনি আরও বলিতে যে, সরকারের এই আর্থিক লোকসানের জন্য সাধারণ-ভীত হইবার কারণ নাই;—তাহারা নির্ভয়ে তাহা-প্রতিবেশীদিগের বিবাদের সালিশী করিবেন।

াপোষ-মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, তখন অবশ্য সরকারী নতের আশ্রয় লইতে হইবে। গ্রামের পাটীলই সেখানে বিচার-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী। তাহার উপরে তদার,—তাহার উপর সরসুভেদার; এবং বিচার-গর একেবারে শীর্ষস্থানে রাজা, অথবা তাহার প্রতিনিধি া। পেশবার এত কাম যে, তিনি বিচারকার্য্যের দৃষ্টি দিতে পারিতেন না। তাঁহার পক্ষে বিচার-ীয় যাবতীয় কাম করিতেন পুনার প্রধান ন্যায়াধীশ রাঠা-সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান বিচারপতি। বাছিয়া ন্যায়নিষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে ন্যায়াধীশের পদে নিযুক্ত হইত। প্রথম মাধব রাওয়ের ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রীর বতা ও ন্যায়নিষ্ঠার কাহিনী রবীন্দ্রনাথের তুলিকায় া লাভ করিয়াছে। কিন্তু রামশাস্ত্রীই মারাঠা-জ্যের একমাত্র ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতি নহেন। তাঁহার বর প্রখর জ্যোতিঃতে অপর সকলের গৌরব ম্লান ও, তাঁহারা পাণ্ডিত্যে ও অপক্ষপাত বিচারে কাহারও া কম যোগ্য ছিলেন না। রামশাস্ত্রী হইতে মারাঠা-জ্যের শেষ বিচারপতি বালকৃষ্ণ শাস্ত্রী টোকেকর পর্য্যন্ত ই পণ্ডিত, সকলেই ন্যায়-বিচারক।

ধান বিচারপতি ব্যতীত আরও কতকগুলি ন্যায়াধীশ ,—তাঁহাদের বিচারালয় ছিল বড়-বড় নগরে। ইহারাও ই পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত তখনকার কহ ভাল বিচারক হইতে পারিত না; কারণ, মারাঠা রবগণ এখনকার মত ধারাবদ্ধ ভাবে (codified) আইন সঙ্কলন করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন বিচার হইত মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, বৃহস্পতি, , বৌধায়নের বিধান অনুসারে,—অথবা দেশের আবহ-মান কাল হইতে প্রচলিত প্রাচীন প্রথা অনুসারে। এই সম্পর্কে আর একটা কথা প্রণিধানযোগ্য। পাটীল হইতে পেশবা পর্য্যন্ত কেহই খাঁটি আইনজ্ঞ বিচারক নহেন। এখনকার মত বিচার-বিভাগ ও শাসন-বিভাগের পার্থক্য তখনকার দিনে স্বীকৃত হয় নাই। পেশবা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী প্রধান সেনাপতি ত বটেনই; তাহার উপর আবার তিনি প্রধান বিচারপতিও। পাটীল বেচারার ত কাজের অন্তই নাই; —খাজনার হার নির্দ্ধারণ করিবে সে, খাজনা আদায় করিবে সে,—গ্রামের পুলিশের কর্ত্তা সে,—গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে তাহাকে; তদুপরি, বোঝার উপর শাকের আঁটি—আবার এই বিচারপতিত্বটুকু। সহরের ন্যায়াধীশরা একেবারে আধুনিক হিসাবেও খাঁটি বিচার-বিভাগের লোক। বিচার ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কর্ত্তব্য নাই। শাসন-বিভাগের কোন কাজে তাঁহাদের হাত দিতে হইত না।

গ্রামের মামলা প্রথমে আসিত পাটীলের নিকটে। পাটীল গ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট বটেন, এবং সহরের ম্যাজিষ্ট্রেটের মত তাঁহার বিচার করিবার ক্ষমতাও ছিল না,—কিন্তু তাই বলিয়া কেহই আশা করিত না যে তিনি মামলার বিচার করিবেন। মামলার নিষ্পত্তির চেষ্টা করিয়া তাহা সফল না হইলে, বিচারের জন্য পঞ্চায়েত ডাকিলেই দেওয়ানী মামলায় তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল। পক্ষদিগকে তখন একটা রাজিনামা সহি করিতে হইত যে, পঞ্চায়েতের বিচার তাহারা বিনা আপত্তিতে মানিয়া লইবেন। তার পরে পঞ্চায়েৎ মহাশয়েরা বিচার আরম্ভ করিতেন,—সাক্ষ্য লইতেন, উভয় পক্ষের জবানবন্দীর একটা সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলন করিতেন, তার পর রায় দিতেন। রায়টি অবশ্য মামলতদারের সমর্থন ব্যতীত কার্য্যতঃ পাকা হইত না। পঞ্চায়েতেরা উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা কোন পক্ষের প্রতি পক্ষপাত, বা বিদ্বেষ বশতঃ অন্যায় বিচার করিয়াছেন, এরূপ কোন অভিযোগ না হইলে, অবশ্য মামলতদার বা পেশবা-সরকারকে পঞ্চায়েতের রায় পাকা করিয়া দিতেই হইত। এইরূপ অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হইলে কিন্তু আবার নূতন পঞ্চায়েত নিযুক্ত হইত; নূতন রাজিনামা সহি করিতে হইত; আবার নূতন করিয়া সাক্ষ্য-সাবুদ লইয়া নূতন বিচার হইত।' প্রশ্ন হইতে পারে যে, পাটীল যদি পঞ্চায়েত না ডাকেন, তবে মামলার কি হইবে? সে ক্ষেত্রে বাদী মামলতদারের নিকটে আবেদন

করিতে পারিতেন, এবং মামলতদার পাটীলকে জানাইয়া পঞ্চায়েত নিয়োগ করিয়া দিতে পারিতেন। পক্ষগণ নিজ গ্রামের পঞ্চায়েতে আপত্তি করিলে, ভিন্ন গ্রাম হইতেও পঞ্চায়েত ডাকা হইত। মোট কথা, দেওয়ানী মামলার বিচার পঞ্চায়েত দ্বারাই হইত; এবং পঞ্চায়েত না বসাইয়া কোন পাটীল বা মামলতদার ছোট-বড় কোন মামলার বিচার করিলে, সে বিচার কতকটা বে-আইনী বলিয়া পরিগণিত হইত, এবং উৎকোচের অভিযোগ ব্যতীত পঞ্চায়েতের রায় রদ হইত না।

পঞ্চায়েতের বিচার কতকটা জুরির বিচারের মত; কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। এখনকার জুরিদিগের সহিত একজন জজ থাকেন,—তিনি জুরিদিগকে মামলা বুঝাইয়া দেন, আইন বুঝাইয়া দেন। মামলা সম্বন্ধে আগে হইতে একটা ধারণা লইয়া আসিলে, তাঁহাকে আর জুরির আসনের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হয় না। সেকালের মহারাষ্ট্র পঞ্চায়েতেরা ছিলেন বাদী-প্রতিবাদীদেরই স্বগ্রামবাসী। সুতরাং মামলার সকল কথা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের জানা থাকিত। তদুপরি, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাইত যে তাঁহারা একালের সালিশদিগের মত পক্ষগণের দ্বারাই মনোনীত হইতেন। তখন তাঁহারা যে একটু পক্ষপাতিত্ব একটু ওকালতি না করিতেন, এমন নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সেকালের পঞ্চায়েতেরা জজ, জুরি ও উকিল—এই তিন জনেরই কায করিতেন।

প্রাচীন এথেন্সের নাগরিকেরাও বিচারকের কায করিতেন। তাঁহারা এই কাযের জন্য দৈনিক পারিশ্রমিক পাইতেন। মারাঠা পঞ্চায়েতেরা তাঁহাদের বিচার-সম্পর্কীয় কার্য্যের জন্য কোন পারিশ্রমিক পাইতেন কি না সন্দেহ। এল্‌ফিনষ্টোন বলেন যে, কোন মামলা দীর্ঘকাল চলিলে, পঞ্চায়েতেরা পক্ষগণের নিকট হইতে কিছু পারিশ্রমিক পাইতেন। কিন্তু প্রতাপসিংহ 'মহারাজ' তাঁহার রাজ্যাধীন প্রকরণে পঞ্চায়েতদিগকে কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকারের পারিতোষিক বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পঞ্চায়েতগণকে টাকায় বা অন্য কোন প্রকারে পারিশ্রমিক দিলে, দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই দণ্ডনীয় হইবে।

পঞ্চায়েতেরা বিচারও করিতেন, রায়ও দিতেন, সাক্ষীও ডাকিতেন;—কিন্তু গ্রামবাসিগণকে তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালনে বাধ্য করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নিজেদের ছিল না। অথচ কোন পক্ষের অনুপস্থিতে বিচার হইলে, সে বিচার আইনতঃ শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত না। এইজন্য পক্ষগণকে ও সাক্ষীদিগকে হাজির করিবার জন্য মামলতদার পঞ্চায়েতদিগকে একজন প্যাদা দিতেন। অনুপস্থিত পক্ষের আত্মীয়গণের উপরও মাঝে মাঝে জুলুম করা না হইত এমন নহে। কিন্তু তথাপি সকল সময়ে পক্ষদিগকে হাজির করা যাইত না। বিচার শেষ হইলে পরাজিত পক্ষকে একখান 'যেজিত পত্র' বা জয়পত্র লিখিয়া বিবাদী সম্পত্তির উপর সকল দাবী ত্যাগ করিতে হইত। আর বিজয়ী ঐ সম্পত্তির মূল্যের চতুর্থাংশ রাজসরকারে 'শেরণী' অথবা 'হরকী' স্বরূপ দিতেন। মনে রাখিতে হইবে যে, এখনকার মত তখনকার দিনে মামলা করিবার জন্য গ্রাম হইতে সহরে ছুটিতে হইত না; মামলায় তদ্বির করিবার জন্য উকিল-মোক্তারকে টাকা দিতে হইত না; প্রত্যেক দরখাস্ত ও প্রত্যেক সাক্ষীর জন্য ষ্ট্যাম্পের খরচা ছিল না। এতদ্ব্যতীত, আদালতের ছোট-বড় কর্মচারীদের জানা ও অজানা 'উপরি পাওনার' খলও পক্ষদিগকে পূর্ণ করিতে হইত না। সুতরাং বিবাদীয় সম্পত্তির মূল্যের এক চতুর্থাংশ রাজসরকারে দিতে হইলেও, মামলার খরচ একালের চেয়ে সেকালে মোটের উপর কমই ছিল বলিতে হইবে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে মূল্যের এক-চতুর্থাংশ রাজসরকারে দিতে হইত না। পেশবা-সরকারের রাজস্ব-নীতির আলোচনা কালে আমরা দেখিয়াছি যে, খাজনার হার নির্দ্ধারিত হইত প্রজার আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া। এ ক্ষেত্রেও ঐ নীতিরই অনুসরণ করা হইত। সাধারণ নিয়ম ছিল যে, 'শেরণী' বা 'হরকীর' পরিমাণ হইবে বিবাদী সম্পত্তির মূল্যের এক-চতুর্থের সমান। কিন্তু জেতা পক্ষের আর্থিক স্বচ্ছলতা না হইলে, সরকার হইতে তাহার সাধ্যানুরূপ 'শেরণী' বা হরকী গ্রহণ করা হইত। উৎকোচের অজুহাতে পঞ্চায়েতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা চলিত, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু আপীলে হারিলে আপীলকারীকে 'গুন্হাগারী' বা জরিমানা দিতে হইত। "গুন্হাগারীর" পরিমাণও 'শেরণী' বা 'হরকীর' মত আপীলকারীর আর্থিক অবস্থা অনুসারে স্থির করা

ত। পঞ্চায়েতেরা পক্ষদিগের স্বগ্রামবাসী ও প্রতিবেশী; সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিলে জনসমাজে নিন্দনীয় হইবার আশঙ্কাও ছিল। পঞ্চায়েত-আদালতের রায় মানিয়া চলিবার সর্ত্তে মামলার প্রারম্ভেই, উভয় পক্ষকেই জামিন দিতে হইত।

আপীলের বিচারও হইত পঞ্চায়েতের দ্বারা। মামলতদার, পেশবা-সরকারের অন্য কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বিনা পঞ্চায়েতে আপীলের মামলার বিচার করিতে পারিতেন বটে কিন্তু তাহা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইত। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বলেন,—"Though it rested with him to decide whether or not the case required a Panchayet, yet it was reckoned gross injustice to refuse one on a question at all doubtful, and it was always reckoned as sufficient for ordering a new investigation when there had been no Panchayet." অর্থাৎ, যদিও কোন মামলার জন্য পঞ্চায়েত ডাকা কর্ত্তব্য কি না, তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা রাজকর্ম্মচারীর ছিল তথাপি, সন্দেহস্থলে, পঞ্চায়েত না ডাকা নিতান্ত অবিচারের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত; এবং ইহাই পুনর্বিচারের জন্য পর্য্যাপ্ত কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত।

পঞ্চায়েত-প্রথার জন-সমাজে এই আদর দেখিয়া মনে হয় যে, সাধারণতঃ এই অব্যবসায়ী বিচারকদিগের হাতে বিচার-বিভ্রাট বড় হইত না। তাঁহারা সাধারণতঃ আইনের খুঁটি-নাটির প্রতি দৃষ্টি দিতেন না। তাঁহাদের চেষ্টা ছিল একটা স্থায়ী মীমাংসার জন্য; এবং পক্ষদিগের মধ্যে পুনরায় যাহাতে বাদ-বিসম্বাদ না হয়, তাহার দিকেও তাঁহাদের দৃষ্টি থাকিত। এই নিমিত্ত তাঁহারা কখন-কখনও মামলা নিষ্পত্তি করিবার পরও বাদী বা প্রতিবাদীকে দুই-এক টুকরা জমি দিয়া দিতেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মালোজী বিন শাহাজী ভাঙ্গা বাদী, হিরোজী বিন নরসোজী ভাঙ্গা বিবাদী নামক একটী মামলার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মামলাটি হইয়াছিল একটী পাটীলকী বতনের স্বত্বাধিকার লইয়া। প্রতিবাদী হিরোজী নিজের দাবী প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইলেও, ভবিষ্যৎ শান্তির জন্য, পঞ্চায়েতদিগের অনুরোধে বাদী মালোজী তাহাকে ত্রিশ বিঘা জমি ছাড়িয়া দিয়াছিল।

ইহা হইতে মনে হয় যে, পঞ্চায়েতগণ বোধ হয় সাধারণতঃ উৎকোচ গ্রহণ করিতেন না। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কিন্তু অন্যরূপ বলেন। তাঁহার মতে, পঞ্চায়েতেরা উৎকোচ গ্রহণ এবং অন্যায় পক্ষপাত এই উভয় দোষে দোষী ছিলেন,—"The Panchayets themselves were open to corruption and to partiality." এল্‌ফিন্‌ষ্টোন যে সময়ের কথা তাঁহার রিপোর্টে আলোচনা করিয়াছেন, তখন মারাঠা-সমাজের অতি শোচনীয় দশা উপস্থিত; দেশ অরাজক। তখনকার দুর্বুদ্ধি বাজীরাও রঘুনাথের উৎপাতে মারাঠা দেশের অমন সুন্দর পল্লী-সমাজ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তখনকার কথা মারাঠা দেশের সুখ-সমৃদ্ধির দিনের প্রতি প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। বিশেষতঃ, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব তাঁহার রিপোর্টে, পেশবার নিকট হইতে বিজিত দেশের শাসন-পদ্ধতির সহিত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-পদ্ধতির তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনায় তিনি স্বভাবতঃ কোম্পানীর শাসন প্রথার উৎকর্ষই প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং, বিজিত দেশের শাসন-প্রণালীর অপকর্ষ প্রমাণ করিবার ইচ্ছা দ্বারা তিনি কখনও অজ্ঞাতসারে পরিচালিত হন নাই, একথা মনে করা অনুচিত বা অসঙ্গত নহে। মারাঠা প্রজা পঞ্চায়েতদিগকে 'পঞ্চ মায়বাপ' বলিয়া সম্বোধন করিত। সাধারণের ভাষায় পঞ্চায়েতেরা ছিলেন, "পঞ্চ পরমেশ্বর"। তাঁহাদের অপক্ষপাত বিচারে বিশ্বাস না থাকিলে, তাঁহাদের ন্যায়পরায়ণতায় বিশ্বাস না থাকিলে, তাঁহাদের সততায় বিশ্বাস না থাকিলে, মহারাষ্ট্রের পল্লীবাসিগণ পঞ্চায়েতদিগকে পিতামাতা বলিয়া সম্বোধন করিবে কেন? পরমেশ্বরের আসনে বসাইবে কেন? তাঁহাদের বিচার পরমেশ্বরের বিচার বলিয়া মানিবে কেন?

এখন দেখা যাউক, পঞ্চায়েত নির্ব্বাচিত হইত কাহারা? এই সম্বন্ধে আমরা ভাঙ্গা বনাম ভাঙ্গা নামক একটী মামলার উল্লেখ করিয়াছি। ঐ মামলার বিচার করিয়াছিলেন—দেশমুখ, দেশপাণ্ডে এবং 'গোত'গণ। 'গোত' বলিতে স্বজাতি অথবা কুটুম্বদিগের সমষ্টি বুঝায়। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বলেন যে, সীমানার মামলায় পাটীল, দেশমুখ দেশপাণ্ডে ও মহারদিগকে লইয়া পঞ্চায়েত গঠিত হইত। অন্যান্য মামলার সারাংশ পড়িয়া মনে হয় যে,

বতনের মামলায় নিকটস্থ পল্লীর পাটীলগণ ও পরগণার জমিদারেরাও পঞ্চায়েতে আসন পাইতেন। অর্থাৎ, এমন সকল লোককে বিচার [illegible] দেশের নিয়ম পদ্ধতি, [illegible] জানে। [illegible] হইয়াছে। [illegible] এবং [illegible] জ্ঞানবিশিষ্ট [illegible] অনুসারে [illegible] কেটি [illegible] চল বহুদিন [illegible] জোর [illegible]।

[illegible] আবার [illegible] প্রাচীন [illegible] ক্রিয়ার [illegible] অধুনা [illegible] প্রভৃতির আলোচনা [illegible] দেখা যাউক, [illegible] সেকালের [illegible] কিন্তু [illegible] পড়িলে দেখিয়া [illegible] পল্লীর প্রত্যেক বতনের প্রাচীন ইতিহাস [illegible] সহিত রক্ষিত হইয়াছিল। [illegible] প্রত্যেক কর্মচারী এই ইতিহাস জানিতেন। [illegible] তাঁহারা তাঁহাদের [illegible] নিকট [illegible] ইতিহাস শিখিয়াছিলেন। ঐ [illegible] আবার [illegible] তাঁহাদের জ্যেষ্ঠগণের নিকট [illegible] ইতিহাস [illegible] করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রত্যেক মারাঠা পল্লীর [illegible] পরিবারের সুখ দুঃখের, [illegible] দুর্ভিক্ষের [illegible] ইতিহাস, অজন্মা, অনাবৃষ্টি, অরাজকতা, অত্যাচার, [illegible] বিগ্রহ, অগ্নিদাহ [illegible] কথা, [illegible] লিখিত থাকিয়াও লুপ্ত হইয়া যায় নাই। এইজন্য প্রত্যেক [illegible] বতনের মামলায় [illegible] মামলায় এই সকল পল্লীবদ্ধ পল্লী সমাজের কর্মচারী পাটীল, কুলকর্ণী, অ[illegible], বলুতাগণ সাক্ষ্য দিতে আহূত হইত। এই সাক্ষীদিগের মধ্যে সংখ্যায় বেশী থাকিত বলুতাগণ। প্রাচীন দলীল হইতে [illegible] তিনটি তালিকা উদ্ধৃত করিয়া ইহার প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

১৭৫০ [illegible] সুপা পরগণার অন্তঃপাতী জালগাঁওয়ের [illegible] কর্ণী স্বত্বাধিকার লইয়া মামলা হয়। প্রতিবাদী [illegible] বিচারে সম্মত হইয়া রাজিনামা [illegible] দেন। [illegible] 'গোত্র' বা গ্রামবাসিগণ [illegible] হইয়াছিলেন।

১। [illegible] বিন [illegible] পাটীল।
২। [illegible] বিন মানকাজী পাটীল।
৩। [illegible] বিন [illegible] পাটীল।
৪। [illegible] বিন [illegible] পাটীল।
৫। [illegible] বিন [illegible] কুলকর্ণী।

[illegible]

১। [illegible] বিন মানাক [illegible]।
২। [illegible] বিন [illegible] লোহার।
৩। [illegible] বিন [illegible]।
৪। [illegible]।
৫। [illegible]।
৬। [illegible]।
৭। [illegible] (নাপিত)।
৮। [illegible] বিন [illegible]নাক।
৯। [illegible] বিন [illegible]নাক — মহার।
১০। [illegible] বিন [illegible]নাক। — অঙ্গ।

১৭[illegible] [illegible] পাটীলকী বতনের মামলায় [illegible] সাক্ষ্য [illegible] এক দল এক-এক রকম সাক্ষ্য দিয়াছিল। এইজন্য তাহাদের নামের তালিকা [illegible] অনুসারে [illegible] ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে।

১।

১। [illegible]।
২। [illegible] বিন কোণ্ডাজী [illegible]।
৩। [illegible] বিন বড়গোজী [illegible] (ধুপী)।
৪। রায়নাক বিন [illegible]নাক মহার।
৫। হাসা বিন চাঁদনাক মহার।

২।

১। নিম্বাজী বিন জনোজী সুতার।

২। বদজী বিন বহিরা চাম্ভার।

৩। ... .

৩।

১। সুখমাজী শন্তুমালী।

*এই ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ অন্য সকলের অপেক্ষা গ্রামের প্রাচীন কথা ভাল জানিত বলিয়া বোধ হয়।

৮।

নিকটস্থ গ্রামসমূহের পাটীল।

১। কবজী বিন মালজী পাটীল (আম্বেগাঁও বুদ্রুক)।

২। রকমাজী বিন মালজী মাটে পাটীল (কড়ক বসলে)।

৩। চৈমাজী পাটীল পোলা (ধায়রী)।

৪। য়েসজী বিন গোপজী পাটীল বোরটে (বরজে)।

৫। য়েসজী বিন খেলবোজী পাটীল (নর্হে)।

৬। অমাই বোরটা পাটলীন (হিঙ্গণে বুদ্রুক)।

৫।

১। হরী মহার।

২। লিঙ্গনাক বিন পদমনাক। (নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে যে এ ব্যক্তি জাতিতে মহার)।

৩। রায়া মহার।

৪। তনা মহার।

৬।

১। মোরো নরহর কুলকর্ণী।

২। হরমালী বিন মস্তমালী।

৩। সন্তমালী বিন রাজমালী।

৪। শিবমবলা বিন রাউমবলা।

৫। দজ বরতা।

৬। রায়া বিন রামনাক।

৭। তহনাক বিন সন্তনাক।

বোধ হয় গ্রামের পাটীলকী বতনের পূর্ব্ব ইতিহাস হাদের সকলের সমান জানা ছিল না ; তাই ইহাদের াক্যে এই প্রকার অমিল হইয়াছিল।

আমাদের তৃতীয় তালিকা একটী মামলার সারাংশ ইতে সঙ্কলিত। তরফ নারায়ণ গাঁওয়ের অন্তঃপাতী াদদ গ্রামের লোহারকী ও সুতারকী বতনের স্বত্ব লইয়া বাজী বিন তাহাজী গংয় সহিত সটবাজীর মামলা হয়। উভয় পক্ষই গ্রামাবাসিগণকে সাক্ষী মানিয়া রাজিনামা দস্তখত করে ও জামিন দেয়। তদনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। বতনের পূর্ব্ব-ইতিহাস-সম্পর্কীয় জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে ইহাদিগকে দুইটি দলে ভাগ করা হইয়াছে। এই তালিকায় প্রত্যেক সাক্ষীর বয়সও লেখা আছে। তালিকাটি পড়িলেই দেখা যাইবে যে, সাক্ষীদিগের মধ্যে বয়োবৃদ্ধগণই সংখ্যায় বেশী।

১।

১। খাণ্ডোজী বলদ সুভানজী গাইকবাড, বয়স ৪৫।

২। বহিরজী বলদ বনোজী কুচিলা, „ ৩৪।

৩। রামজী বলদ পদজী ঘরনলা, „ ৬০।

৪। কচু বলদ খণ্ডোজী গাইকবাড, „ ৩৫।

৫। মহাদজী বলদ হরজী য়েবগা, „ ৫০।

৬। গোণ্ডজী বলদ রনোজী রাউত, „ ৫৫।

৭। নিম্বাজী বলদ য়েসাজী কুম্ভার, „ ৬০।

৮। মলহারজী বলদ উমাজী কোলী, „ ৩৫।

৯। হীর বলদ গঙ্গাজী ডবরা, „ ৬০।

১০। লোখা বলদ অমাজী চাম্ভার, „ ৫০।

১১। য়েসজী বলদ তুকাজী মহার, „ ৬০।

১২। উমা বলদ লিঙ্গনাক মহার, „ ৩৫।

১৩। পেমনাক বলদ য়েসনাক মহার, „ ৬০।

১৪। জবজী বলদ সটবা মহার, „ ২৫।

১৫। লুমা বলদ কেরণ মহার, „ ৬০।

২।

১। জাবজী বলদ গঙ্গাজী পাটীল মোরাট, বয়স ৩৪।

২। সখোজী বলদ সটবাজী মুলে, „ ৩৪।

৩। খণ্ডোজী বলদ শেটাজী মুলে, „ ৬০।

৪। গুণ্ডাজী বলদ পিলাজী পাটীল দেটে, „ ৩৫।

৫। হঙ্গোজী বলদ মালজী ধঙ্গলে, „ ৭০।

৬। চদু বলদ মহাদজী পরীত, „ ৩৫।

৭। অমন বলদ লক্ষ্মণ মালা, „ ৫৫।

৮। নাগোজী বলদ মুকদজী মুলে, „ ৩৫।

৯। হরয়া বলদ নামা মঙ্গ, „ ২৫।

১০। নিম্বাজী পনমন বয়স ২০ এবং তাহার মাতা রখমাই বয়স ৬৫।

প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই মামলায় বিজয়ী পক্ষ রাজসরকারে 'হরকী' স্বরূপ ২০০৲ টাকা দিয়াছিল।

নিমেষে জ্বালিয়াছিল অপূর্ব্ব আলোক!
বিশ্ব-লোক,
সেদিন বিস্ময়ে—
বরণ করিয়াছিল বঙ্গের ভুবনজয়ী বেদান্ত কেশরী, স্পন্দিত হৃদয়ে!
তোমার অভয়বাণী পাঞ্চজন্য-শঙ্খ ধ্বনি সম,
দৃপ্ত, অনুপম—
দিকে দিকে উঠেছিল সঘনে ধ্বনিয়া,
শত শত হৃদয় রণিয়া!
নিদ্রিত দেশের এই সহস্র বর্ষের অবরুদ্ধ বাতায়ন-দ্বারে,
আঘাত করিয়া বারে বারে—
ডাকি জনে, জনে
গভীর গর্জ্জনে,
গিয়াছ বলিয়া অবিরত—
"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"
মোহাঞ্জন মুছাইয়া মলিন নয়নে রঞ্জিত করিয়াছিলে জ্ঞানের কজ্জল,
তম নাশি শত চিত্ত সত্ত্ব-জ্যোতিঃ দৃপ্ত, রজঃ-পুঞ্জ প্রভা সমুজ্জ্বল!
মহা উদ্বোধন-মন্ত্রে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলে নিখিল ভারত;
তব জয়-রথ—
বাহিয়া চলিয়া গেছে তুলি যশোধূলি জগতের নব-নব পথ!
দামিনী দমক-দীপ্তবৎ সেই চক্র-রেখা—
আসমুদ্র হিমাদ্রির সুবিস্তৃত বুকে আজও যায় দেখা!

*

প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান সুগভীর,
প্রেম ভক্তি সম্মিলিত মহা কর্ম্মবীর,
নিত্য-সিদ্ধ-শুদ্ধ যোগী, সাধক প্রধান,
হে কৌপিনী, ধন্য ভাগ্যবান!
স্বদেশের যেথা যত পতিত, কাঙাল, নিরাশ্রয়, অন্ন বস্ত্র হীন,
অসহায়, রোগাতুর, নির্য্যাতিত, বুভুক্ষিত, দীন,
তাদের কল্যাণ তরে ভাবিয়াছ তুমি নিরন্তর,
সতত দুঃখীর দুঃখে কাঁদিয়াছে সহৃদয় তোমার অন্তর,
কলুষিত দেশাচার, সমাজের অযথা পীড়ন
আমূল করিতে সংশোধন,
করেছিলে প্রাণান্ত যতন—
প্রাচ্যের প্রাচীন-পথে প্রতীচ্যের প্রেয়-প্রথা কার প্রবর্ত্তন!
অস্পৃশ্য অধম নীচ, পাপী তাপী দরিদ্র ভিখারী, সবারে জানিয়া নারায়ণ,
করেছ' কত না পূজা শ্রদ্ধা প্রেমে সজল-নয়ন!

তোমার সে ব্রহ্ম-নিষ্ঠা—
পরহিতে পরাকাষ্ঠা,
সেবা-ধর্ম্ম, জীবে দয়া, অদ্বৈত আলোকে,
জানে সর্ব্ব লোকে!
গভীর স্বদেশপ্রেম ব্যক্ত হেরি প্রতিবাক্যে প্রতি কার্য্যে তব,
জাতির উন্নতি-কল্পে উন্মেষিত নিশিদিন চিন্তা নব নব!
নরনারী নির্ব্বিশেষে,
দেশে দেশে,
শিক্ষার বিস্তার,
বলিয়া গিয়াছ অনিবার
উন্মুক্ত করিয়া দিবে বিশ্ব-সভাতলে আমাদের প্রবেশ-দুয়ার!
কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসা বিজ্ঞানের বহুল প্রচার—
ঘুচাইবে দেশ-দৈন্য, দুর্ব্বলতা যত অক্ষমের শূন্য হাহাকার,
ভাগ্যহীন ভারতের পূর্ণ করি পুনরায় ষড়ৈশ্বর্য্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।
তোমার সে শুভ ইচ্ছা কল্যাণের শত উপদেশ,
জাগ্রত ভারতে আজি মূর্ত্তি ধরি করিছে প্রবেশ।
হে পরিব্রাজক স্বামী, পত্রাবলী তব,
তন্দ্রাতুর অন্ধগণে দানিয়াছে দেব—দৃষ্টি অভিনব
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তত্ত্ব, হিন্দুধর্ম্ম বিজ্ঞান বারতা,
বর্ত্তমান ভারতের ভাবিবার কথা!
জ্ঞান-কর্ম্ম-রাজ-ভক্তি-যোগ—
নিত্য কত ভ্রান্ত জনে সত্য পথে করিছে নিয়োগ,
বৈরাগ্যের বীরবাণী, সন্ন্যাসীর গান,
মাতাইয়া তোলে আজও প্রাণ!
বরেণ্য বাঞ্ছিত তব শ্রীচরণ চুমি,
এ ভারত-ভূমি,
যুগে-যুগে অবতীর্ণ যেথা ভগবান,
পেয়েছিল ফিরে তার গত-পুণ্য, হৃত-যশোমান।
মহাশক্তি সাধনার প্রভাবে তোমার,
বিশাল এ হিন্দু জাতি—পবিত্র হইয়াছিল আর একবার!
যাহার অশ্রান্ত চেষ্টা জাতির অন্তর হোতে
মন্দাকিনী-স্রোতে—
মুছা'য়ে দিয়াছে কত যুগান্তের ঘন অন্ধকার,
হে মোর স্বদেশবাসী, অবনত শিরে দেশভক্ত সেই বীরে কর নমস্কার!
ভারতের চারিভিতে সঘন নির্ঘোষে, কোটি কণ্ঠ উঠুক ধ্বনিয়া উচ্চে আজ—
জয়তু বিবেকানন্দ! জয় স্বামীজির! জয়, জয়, গুরু মহারাজ!

নিখিল-প্রবাহ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]



মুস্তাফা কেমাল্ পাশা



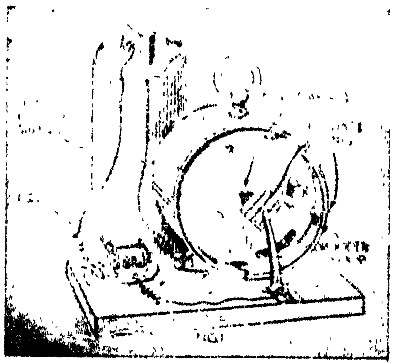
কনষ্টা টাইনের দ্বিতীয় পুত্র.আলেকজান্দার



কনষ্টান্টাইনের কনিষ্ঠপুত্র রাজকুমার পল



বস্ফরাস্ অন্তরীপস্থ রক্ষাদুর্গ



কাজের ঘড়ী

াজ্যের বার্ত্তা।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে তুর্ক-সাম্রাজ্য পারস্যোপ-করিয়া আরব, সিরীয়া, মেসোপটে-মিয়া, আর্মেনিয়া, এসিয়া মাইনর এবং ইয়োরোপে কৃষ্ণসাগর হইতে আড্রিয়াটিক সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর পরাজিত তুরস্কের নিকট হইতে তাহার সাম্রাজ্যের অধিকাংশ কাড়িয়া লইয়া মিত্রশক্তির রাজ্যভুক্ত করা



পকেট টাইপ-রাইটার

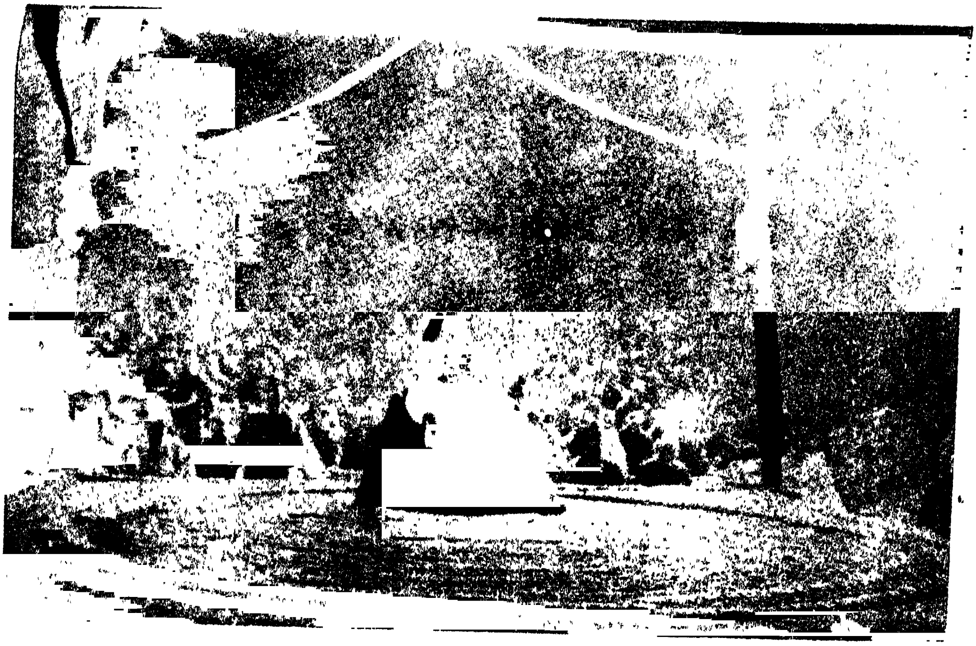


নূতন ট্যাক্সী-মিটার



চোরধরা দোর

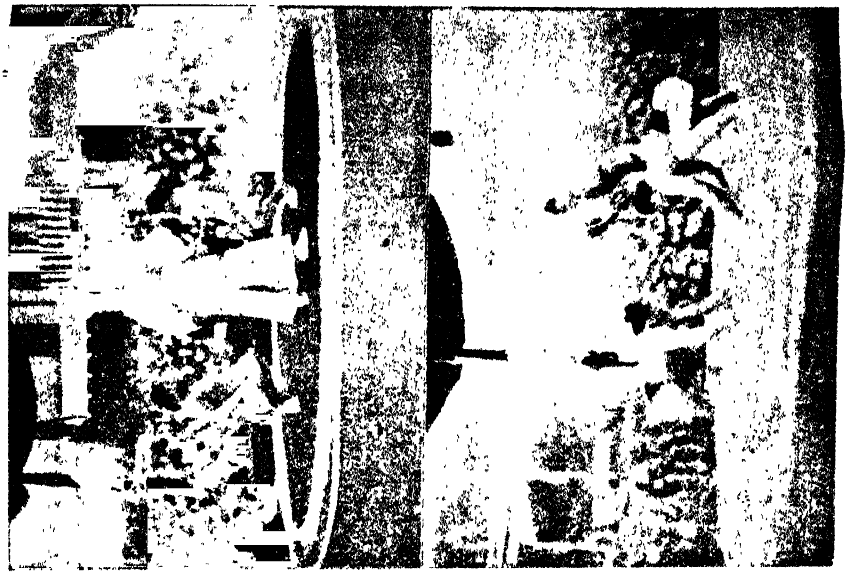
ইয়াছে। আনাতোলিয়া, মাসিডোনিয়া, সালোনিকা ভৃতি গ্রীসের অধিকারে আসিয়াছে; সিরীয়া ও প্যালেইন ফরাসীর করকবলে এবং মেসোপটেমিয়া, আরব ও রস্য উপসাগর ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। আর্মিনিয়া ধীনতা ঘোষণা করিয়াছে; এবং সন্ধিসর্ত্ত অনুযায়ী গালিলি, দার্দেনেলিস্ ও বস্ফরস্-অন্তরীপের যাবতীয় রক্ষার্গ ধ্বংস করিয়া দিয়া সেখানে মিত্রশক্তির আধিপত্য পিত হইয়াছে। উক্ত অন্তরীপে তুরস্ক এক্ষণে সার্ব্বজনীন বাধ নৌপথ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এবং রস্কের সামরিক বিভাগে সৈন্যবল ও রণ-পোত বহর, বিজয়ী ত্রশক্তির ইচ্ছা ও আদেশ মত হ্রাস করিতে হইয়াছে। রবার আপত্তি প্রকাশ করিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও অবশেষে নিরুপায় হইয়া, তুরস্ক-রাজ প্রতিনিধিরা এই অপমানকর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। সন্ধি-সর্ত্ত মত গ্রীকেরা আসিয়া যখন থ্রেস্ ও স্মীর্ণা দখল করিয়া বসিল, এবং ব্রিটিশ নৌবাহিনী যখন দার্দেনেলিসে প্রবেশ করিয়া সমগ্র প্রণালী অধিকার করিল এবং উভয় তীরস্থ রক্ষাদুর্গের তোপ কামান প্রভৃতি ধ্বংস করিতে সুরু করিল, তখন পতিত, পরাজিত, অপমানিত তুরস্কের কেবল একজন বীর মাতৃভূমির লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি মুস্তাফা কেমাল্। এই স্বাধীনচেতা, তেজস্বী, স্বদেশপ্রেমিক মাত্র চল্লিশ হাজার অনুচর লইয়া, দেশবৈরী-নির্য্যাতনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কেবল শত্রু নয়,—দেশের যে শাসক-সম্প্রদায় এই সন্ধি-সর্ত্ত স্বীকার



মল্লভূমি ও বিচারক



য়িওকোজুনা হিতাচিয়ামা ও শিষ্যদ্বয় এবং বিচারক



মল্লযুদ্ধ,—মল্লযুদ্ধের সমাপ্তি



বিচারক ও মল্লদ্বয়,—মল্লযুদ্ধের আরম্ভ

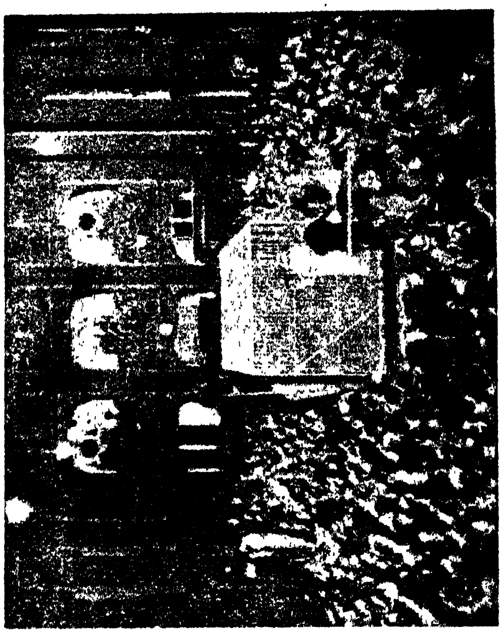
রিয়াছে এবং যাহারাই এই প্রকারের সন্ধির পক্ষপাতী, সই অবনত দেশবাসিগণের বিরুদ্ধেও তিনি অস্ত্রধারণ রিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অল্পসংখ্যক অনুচর শত্রুর বিপুল বাহিনীর নিকট বারবার পরাজিত হইতেছে। তাহার লোকবল ও অর্থবল ক্রমেই ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তথাপি মুস্তাফা কেমাল্ প্রাণপণে সেই সন্ধিপত্রের বরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বদেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা রিতেছেন। (The Current History).

২। গ্রীসের রাজ-বিভ্রাট।

গ্রীসের রাজা কনষ্টান্টাইন্ জার্ম্মেনীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ কাইজারের ভগিনী রাণী সোফিয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেকাজেই, বিগত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে তিনি জার্ম্মেনীরই পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু মিত্রশক্তিগণ তাঁহার মন্ত্রী ভেনিজুলোকে কৌশলে হস্তগত করিয়া, ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে বলপূর্ব্বক কনষ্টান্টাইন্‌কে সিংহাসনচ্যুত করেন।



মটর-লরিতে বিবাহ



সিংহের পিঞ্জরে বিবাহ



ইঞ্জিনে বিবাহ



দ্বিচক্র-যানে বিবাহ

কন্‌ষ্টান্টাইন্ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সুইজারল্যাণ্ড গিয়া বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার ভক্ত ও অনুরক্ত প্রজাগণ মহাসমাদরে তাঁহাকে আবার রাজ্যে ফিরাইয়া আনিয়াছে। তিনি যখন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সুইজারল্যাণ্ডে চলিয়া যান, মিত্রশক্তিবৃন্দ তখন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আলেক্‌জাণ্ডারকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া তাঁহাকেই গ্রীসের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। কন্‌ষ্টান্টাইনের প্রথম পুত্র যুবরাজ জর্জ (ডিউক অফ্ স্পার্টা) ন্যায়তঃ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেও মিত্রশক্তি তাঁহাকে রাজপদে বরণ করিতে সাহস করেন নাই;—কারণ, তিনিও পিতারই মতানুবর্ত্তী ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র আলেক্‌জাণ্ডার দীর্ঘকাল বিলাতে অবস্থান করিয়া অক্সফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া-

লেন ;—এইজন্য মিত্রশক্তিবৃন্দের বিশ্বাস ছিল যে, আলেক্‌-ণ্ডার কথনই মিত্রগণের বিরুদ্ধে যাইবেন না ; কিন্তু তাঁহাকে জ্যতার দিবার পর দেখা গিয়াছিল যে, পিতা বা জ্যেষ্ঠ-তার সহিত তাঁহারও মতের কোনও প্রভেদ নাই। বিশ্বাস-তক মন্ত্রী ভেনিজুলোর সহিত এইজন্য নবীন ভূপতির য়ই বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। অবশেষে আলেক্‌জাণ্ডার রুপায় হইয়া, রাজকার্য্যের ভার মন্ত্রীর উপর সম্পূর্ণরূপে ড়িয়া দিয়া, আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিতে গিলেন। রাজা হইবার পর আলেক্‌জাণ্ডার কোনও নিকের মানস (Manos) নাম্নী এক রূপসী কুমারী



ফাঁসিকাঠে বরক'নে

ন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ লইয়া গ্রীসের ভিজাত্য-সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। নীচবংশোদ্ভবা লিয়া কুমারী মানসকে কেহই রাজার বিবাহিতা পত্নী লিয়া স্বীকার করিতে চাহিল না। তখন লজ্জায়, অপমানে, ভিমানে শ্রীমতী মানস গ্রীস ছাড়িয়া প্যারিতে চলিয়া যান। দিনের মধ্যেই নূতন রাজাও রাণীর অনুসরণ করিয়া রিতে উপস্থিত হন ; এবং উভয়ে তথায় বসবাস করিতে কেন। তার পর রাণীকে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব লইয়া নি আবার রাজ্যে ফিরিয়া আসেন। শ্রীমতী মানসকে নী বলিয়া স্বীকার করা হইবে কি না, এই লইয়া যখন রাজ্যে খুব আন্দোলন চলিতেছে,—অষ্ট্রীয়ার ভূতপূর্ব্ব যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড্‌ ও বুলগেরিয়ার যুবরাজও সাধারণ ঘরের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছেন,—এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আলেক্‌জাণ্ডার যখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন তাঁহার একটী পোষা বানরের দংশনে রক্ত বিষাক্ত হইয়া হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজ-



একশ বছরের বর



সাতাত্তর-বর্ষীয়া বধূ

কুমার 'পল'কে শাসন-পরিষদের পক্ষ হইতে রাজ-পদ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করা হইল। রাজকুমার পলের বয়ঃক্রম সবে উনিশ বৎসর মাত্র। এই বালক তাহার উত্তরে বলিয়াছিল যে, গ্রীসের প্রজা-সাধারণ যদি তাহাকে চায়, এবং তাহার পিতা ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠভ্রাতা যদি ইহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমতি দেন, তবেই সে গ্রীসের রাজসিংহাসন গ্রহণ করিবে, নচেৎ নয়। এই মহানুভব রাজপুত্রের উত্তর শুনিয়া গ্রীসের

সাধারণ তাহাদের ভূতপূর্ব নৃপতি কনষ্টাণ্টাইনকেই ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করে। তিন বৎসর রাজ্যচ্যুত অবস্থায় দেশত্যাগী থাকিয়া নৃপতি কনষ্টাণ্টাইন্ আজ আবার প্রজাবর্গের সাদর আহ্বানে নিজরাজ্যে সগৌরবে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এবং বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী ভেনিজুলো দেশ ছাড়িয়া ফ্রান্সে পলায়ন করিয়াছে।

(The Current History).

৩। কাজের ঘড়ী

নূতন ধরণের এই ঘড়ীটি, কেবল বাবুদের সময় দেখায় নয়, গৃহিণীদের ঘর-সংসারের কাজেও যথেষ্ট সাহায্য করে। উনানে ভাত চড়াইয়া দিয়া গৃহিণী অন্য কাজে ব্যস্ত থাকিলে, ভাত নামাইবার যথা-সময়টি এই ঘড়ী গৃহিণীকে ডাকিয়া জানাইয়া দেয়। রোগীকে ঔষধ খাওয়াইবার ঠিক সময়টিও এই ঘড়িতে গল্পগুজব বা পুস্তক পাঠে নিবিষ্ট শুশ্রূষা-কারিণীকে যথাকালে নির্দ্দেশ করে। মন ভুলো মানুষের আরও নানা প্রয়োজনীয় কাজে এই ঘড়ীটি সতর্ক বন্ধুর মত প্রতি পদে তাহার বিশেষ উপকারে আসে।

ঘড়ীটি এমন কিছু অদ্ভুত কাণ্ড নয়;—একটি সাধারণ 'টাইম-পীস' ও তাহার সহিত একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা কৌশলে সংলগ্ন করিয়া, একখানি ছোট কাঠের তক্তার উপর বসানো আছে। ঘড়ীর পশ্চাৎ দিকে, মিনিটের কাঁটার সঙ্গে-সঙ্গে সমানে ঘুরিতে পারে, এমন একটি ক্ষুদ্র বাহু আছে; এবং বৈদ্যুতিক ঘণ্টার সহিত সংযোগের নিমিত্ত কাঠের তক্তার উপর ঘড়ীর গা ঘেঁসিয়া একটি ছোট দণ্ড খাড়া করা আছে। উক্ত বাহুটি ঘুরিয়া আসিয়া ঐ দণ্ডট স্পর্শ করিলেই, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়া অধিকারীকে তাহার প্রয়োজন স্মরণ করাইয়া দেয়। মালিকের প্রয়োজন অনুসারে ঘড়ীর পশ্চাতের বাহুটি ইচ্ছা-মত যে কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বাজাইবার উপযোগী করিয়া লওয়া যায়।

(Popular Science)

চোর-ধরা দোর

চোর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে জানিয়াও, অনেক বাড়ীওয়ালারা ছোরা-ছুরি বা পিস্তলের গুলির ভয়ে তাকে ধরিতে পারে না। পাছে টেলিফোঁ করিয়া পুলিশে খোঁজ হয়, এই আশঙ্কায় সতর্ক চোর আগে হইতে টেলিফোঁর তার কাটিয়া রাখে। ইয়োরোপের অনেক বড়-বড় ব্যাঙ্কে প্রকাশ্য ভাবে চোর আসিয়া, ক্যাশিয়ারের বুকের কাছে রিভলভার ধরিয়া, বহুবার লোহার সিন্দুক হইতে টাকা বাহির করিয়া লইয়াছে। তাহারা খাত বুঝিয়া ঠিক এমন সময়টিতে আসিয়া ধ'রে, যে, ক্যাশিয়ার বেচারিকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় দাঁড়াইয়া, চোখের সম্মুখে চুরি দেখিতে হয়। চোরকে ধরিবার কোনও উপায়ই তিনি করিতে পারেন না; কারণ, তখন এই উদ্দেশ্যে সামান্য কোনও চেষ্টা করিতে গেলেই, তাঁহার মাথার খুলিটি নিঃসন্দেহ উড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা! সম্প্রতি চোর ধরিবার এক সহজ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কে ক্যাশ-ঘরের জানালা-দরজায় এক প্রকার স্প্রীংয়ের কল্জা লাগানো হইতেছে,—হাতে করিয়া বা পায়ের চাপে একটি বোতাম টিপিয়া ধরিলেই, এক মুহূর্ত্তে ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ হইয়া যাইবে। চাবির সাহায্য ব্যতীত আর কেহ তাহা খুলিতে পারিবে না। নিউইয়র্কের একটি ব্যাঙ্কে সেদিন এই স্প্রীংয়ের দরজার জন্য একদল চোর ধরা পড়িয়াছে। সেখানে বুদ্ধি করিয়া ব্যাঙ্কওয়ালারা লোহার সিন্দুকের হাতোলেই একটি বোতাম বসাইয়া লইয়াছিল। রাত্রে চোরের দল ঢুকিয়া ক্যাশ-ঘরে সিন্দুক খুলিবার চেষ্টা করিতেই, ঘরের দরজা আপনিই বন্ধ হইয়া যায়, এবং চোরেরা সদলে ধরা পড়ে।

(Popular Mechanics)

৫। পকেট টাইপ-রাইটার

সাধারণ টাইপ-রাইটার কল অত্যন্ত ভারি;—বিদেশে বেড়াইতে যাইবার সময় সঙ্গে লইয়া যাওয়া মুস্কিল। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য এক প্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি হাল্কা ও সস্তা দামের টাইপ-রাইটার উদ্ভাবিত হইয়াছে। একজন ফরাসী কারিগর ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। এই টাইপ-রাইটার কলে বড় অফিসের কাজকর্ম্ম করা চলে না। কোনও লোকের নিজস্ব চিঠিপত্র ছাপা চলে। এই কলের হরফ-গুলি একখানি চাক্‌তির তলায় এক লাইনে চক্রাকারে সাজানো আছে; এবং চাবিগুলি চাক্‌তির উপর দিকে প্রত্যেক হরফের মাথায় বসানো। অক্ষরগুলি উপর দিকে বা নীচের দিকে বা পার্শ্বে সরাইবার জন্য যে নূতন ...

নাড়ানী (Shifter) লাগানো আছে, উহা কারিগরের কৌশল ও দক্ষতার পরিচায়ক। হরফগুলি চাক্তির তলায় [illegible] লাইনে চক্রাকারে সাজানো আছে বটে; কিন্তু চাবিগুলি চাক্তির উপরে দুই লাইনে অর্দ্ধচক্রাকারে সজ্জিত। চাক্তির উপর দিকে একটী দু'মুখো কাঁটা লাগানো আছে। উহার এক প্রান্ত সরু ও অপর প্রান্ত মোটা। ইংরাজি ছোট অক্ষর লিখিবার সময় কাঁটার সরু মুখটি চাবির দিকে সরাইয়া দিতে হয়; এবং বড় অক্ষর লিখিবার সময় মোটা মুখটি ঘুরাইয়া দিতে হয়। প্রত্যেক হরফটি ছাপিবার সময়, চাক্তির উপর দিকের কাঁটাটির ঠিক মাঝখানে যে একটি বোতাম আছে, সেটিও টিপিতে হয়; কারণ, ঐ চাপেতেই চিঠির কাগজখানি সরিয়া গিয়া ঠিক পরের অক্ষরটিকে পড়িবার স্থান ছাড়িয়া দেয়।

(Scientific American)

৬। নূতন ট্যাক্সী-মিটার

এখনকার ট্যাক্সী গাড়ীতে যে মিটার লাগানো আছে, উহাতে কেবল মাত্র মাইল ও ভাড়ার হিসাব পাওয়া যায়। উহা দেখিয়া আরোহীকে বিনা বাক্য-ব্যয়ে ভাড়া চুকাইয়া দিতে হয়। ট্যাক্সী চালক ভাড়া পাইয়াও যদি অস্বীকার করে, তাহা হইলে আরোহীকে, [illegible] হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য [illegible] ট্যাক্সী-চালকরা অসৎ উপায়ে [illegible] [illegible]রীহ আরোহীর নিকট হই[illegible] [illegible]ন্যায় ভাড়া আদায় করিয়[illegible] [illegible]সাব-মত সমস্ত ভাড়া চা[illegible] [illegible]ন পান না। এই সব কা[illegible] [illegible]াক্সী-ক্যাব কোম্পানী [illegible] [illegible]তন মিটার বসাইয়াছেন, [illegible] [illegible]রে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে আরো[illegible] [illegible]কখানি রসীদ ছাপিয়া দে[illegible] [illegible]জ্ঞাপন দিয়া, এবং [illegible] [illegible]খে বড়-বড় অক্ষরে [illegible] [illegible]নাইয়া দেন যে, [illegible] [illegible]হেলা না করেন। [illegible] [illegible]রায়, অসৎ চালকে[illegible]

পারে না, এবং মিটারে কোনও চালাকি করিতে গেলে, উক্ত ছাপার কলটি বিগড়াইয়া গিয়া চালকের জুয়াচুরি ধরাইয়া দেয়।

(Scientific American)

৭। জাপানী কুস্তি

কুস্তি বা মল্লযুদ্ধকে জাপানীরা "শুমো" বলে। ভারতবর্ষের ন্যায় জাপানেও পুরাকাল থেকে এই 'শুমো' বা মল্লক্রীড়া প্রচলিত আছে। রাজারাজড়া ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা বরাবর মল্লদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এক একটা মল্লক্রীড়া-প্রদর্শনীতে সম্রাট্ হইতে আরম্ভ করিয়া, স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সম্ভ্রান্ত অভিজাত সম্প্রদায়, বিখ্যাত সেনাপতিগণ, নৌবাহিনীর 'এ্যাডমিরাল্' বা পোত-প্রধানগণ, রাজমন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ, ধনী ব্যবসায়ীরা, বিলাসী বাবুরা, বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ছাত্রবৃন্দ সকলেই দর্শক [illegible] উপস্থিত থাকেন। জাপানে [illegible] প্রতি বৎসর [illegible] [illegible] জাপানী [illegible] ঠিক আ[illegible] পালোয়ানদের মতই [illegible] উদার [illegible] এক[illegible] কস্পান পরিয়া কুস্তি [illegible] মল্লযুদ্ধে [illegible] বাজায় নির্দ্দেশ [illegible] হন—তাঁহাদের উহাই [illegible]রম্পরাগত বৃত্তি। উঁহারা ভিন্ন অপর কেহ বিচারক [illegible] পান না। যে পালোয়ান তাহার সমসাময়িক সমস্ত [illegible]য়ানকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে, তাহাকে [illegible]ওকোজুনা" খেতাব দেওয়া হয়।

কুস্তি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে একজন চীৎকার করিয়া [illegible]নাইয়া দেয়, আজ কাহার সহিত কাহার কুস্তি হইবে। তার পর যিনি বিচারক (Umpire) নির্দ্দিষ্ট থাকেন, তিনি আসিয়া পালোয়ান দুইজনকে আহ্বান করেন। তাঁহার হাতে একখানি 'বিজয়-ব্যজনী' থাকে। যাহার জিৎ হয়, তাহাকে তিনি ঐ পাখাখানি দান করেন। পালোয়ানরা আখড়ার উপর, পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া সমান্তরালে উবু হইয়া বসিয়া থাকে। বিচারক তাহাদিগের নাম ধরিয়া আহ্বান করিবামাত্র, তাহারা ভূমির উপর মুষ্টিবদ্ধ উভয় হস্ত

রাখিয়া, পরস্পরকে মাথা নত করিয়া অভিবাদন করে। তার পর দাঁড়াইয়া উঠিয়া লড়িতে সুরু করে। বিচারক সর্ব্বক্ষণ তাহাদের আশেপাশে থাকিয়া, তাহাদের ক্রীড়া-কৌশল লক্ষ্য করেন। কেহ কোনও অন্যায় বা অসৎ উপায় অবলম্বন করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। আমাদের এখানে যেমন একজন অপরকে চিৎ করিতে পারিলেই জয়ী হয়,—জাপানীদের তেমনি একজন আর একজনকে ভূতলশায়ী করিতে পারিলেই 'বিজয়-ব্যজনী' লাভ করে। কেহ কাহাকেও ফেলিতে না পারিলে, সে ব্যক্তি 'তুল্যমূল্য' (draw) বিবেচিত হয়। থিয়েটার বা রঙ্গালয়ের ন্যায় জাপানে একাধিক স্থায়ী মল্লভূমিও আছে। সেখানে টিকিট বিক্রয় করিয়া প্রতি সপ্তাহে মল্লযুদ্ধ প্রদর্শিত হয়। ওস্তাদকে জাপানীরা "তোশাইয়োরী" বলে। কুস্তি সম্বন্ধে জাপানে অনেকগুলি পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে য়িওকোজুনা হিতাচিয়ামা-রচিত "শুমো" নামক বইখানিরই কাটতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। হিতাচিয়ামা জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ান। ১৯০৯ সালে ইনি দুইজন প্রধান শিষ্য বা সাকরেদকে সঙ্গে করিয়া, এবং একজন বনিয়াদী-বংশের বিচারককে লইয়া, আমেরিকায় কুস্তি দেখাইয়া যশস্বী হইয়া আসিয়াছিলেন। ইনি এক্ষণে মল্লকার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন।

(The Asian Review)

৮। বিবাহে নূতনত্ব।

ইয়োরোপের বর-ক'নেদের শুভ-পরিণয়ে একটা কিছু নূতনত্ব করিবার ঝোঁক ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। গীর্জ্জায় আসিয়া বিবাহ করাটা যেন নিতান্ত সেকেলে হইয়া গিয়াছে। এখন উড়ো-জাহাজে চড়িয়া শূন্যমার্গে 'আকাশ-বিবাহ' হইতেছে। সাবমেরীণে করিয়া সমুদ্রগর্ভে 'জল-বিবাহ' হইতেছে। ষ্টিমারে চড়িয়া 'সাগর-বিবাহ' হইতেছে। রেলগাড়ীতে 'বাষ্পীয়-বিবাহ' হইতেছে। এই সব দেখিয়া-শুনিয়া সম্প্রতি একজন ষ্টিম-রোলার-চালক—তাহার রাস্তা-মেরামত-করা ইঞ্জিনের উপর আপন মনোমত পাত্রীর সহিত পরিণীত হইয়াছে। ইহাদের দেখাদেখি আর এক জোড়া বর-ক'নে একখানি 'মোটর-লরিতে' চড়িয়া বিবাহ করিয়াছে। জার্ম্মেণীর একজন জেল-কর্ম্মচারী, বধ্য-ভূমিতে যে ফাঁসি-মঞ্চ থাকে, তাহারই উপর আসর পাতিয়া নিজের শুভ-বিবাহ সম্পাদন করিয়াছেন। এই বিবাহের আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, জার্ম্মেণীর বিভিন্ন জেলের প্রায় তিনশত জল্লাদ্ বরযাত্রী রূপে উপস্থিত হইয়াছিল। ইটালীর এক দম্পতি একত্র একখানি দ্বি-চক্র-যানে আরোহণ করিয়া পরিণীত হইয়াছেন। আমেরিকার এক দুঃসাহসিক দম্পতি সিংহের পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরস্পরের পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন। এই কৌতুকাবহ বিবাহ-ব্যাপার সন্দর্শন করিবার জন্য সেখানে হাজার-হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। পুরোহিত পাদ্রী-মহাশয় পিঞ্জরের বাহিরে দাঁড়াইয়া মন্ত্র পড়াইয়াছিলেন,—প্রাণভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। বিবাহে এই প্রকার নূতনত্ব করিতে গিয়া সম্প্রতি এক বর-ক'নের বিষম দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বেলুনে চড়িয়া বিবাহ করিতেছিলেন। বেলুনটি খানিক উপরে উঠিতেই ক'নে ভয় পাইয়া বেলুন হইতে নীচেয় পড়িয়া যায়। সৌভাগ্য-ক্রমে মাটিতে না পড়িয়া মেয়েটি নিকটস্থ নদীর জলে আসিয়া পড়ে, তাই প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে। আর একটি অদ্ভুত বিবাহ হইয়াছে সেণ্ট্ জোসেফ্ সহরে। বরের নাম কর্ণেল ওয়ার্টন, বয়স এই সবে একশত বৎসর মাত্র! আর ক'নেটি একটি সাতাত্তর বর্ষীয়া কুমারী। বর-ক'নে উভয়েরই চুল একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে—কিন্তু দাঁত পড়ে নাই। এত বয়সেও উভয়ে বেশ সুস্থ ও সবল আছেন। একটা শতাব্দীর সুদীর্ঘ পরমায়ু ভোগ করিয়াও কর্ণেল ওয়ার্টন এখনও যুবকের মত উৎসাহশীল। তিনি বিগত ইয়োরোপীয় মহা-যুদ্ধেও যোগ দিয়াছিলেন।

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

পলাণ্ডু বা পিঁয়াজ কিছুদিন রাখিলে তাহার খোসা শুকাইয়া যায়, এবং পিঁয়াজগুলি ওজনে কমিয়া যায়। শুষ্ক খোসাগুলিতে আপাত-দৃষ্টিতে কোন কাজ হয় না বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, না,—উহা ফেলিবার জিনিস নয়; উহাকেও কাজে লাগাইতে পারা যায়। একটা সচ্ছিদ্র পাত্রে (ঝাঁজরির মতন) কিছু শুষ্ক পিঁয়াজের খোসা রাখিয়া, তাহাতে ফুটন্ত জল ঢালিতে থাকুন। খোসাগুলি ভিজিয়া, তাহার ভিতর হইতে, ফুটন্ত জলের সঙ্গে এক প্রকার রংয়ের উপাদান বাহির হইয়া আসিবে। এই রংয়ের উপাদান পিঁয়াজের খোসায় শতকরা ১·৩ হিসাবে থাকে। অপর একটা পাত্রে খানিকটা ফটকিরি ভিজাইয়া রাখুন। এখন, একখানি পরিষ্কার সাদা ধবধবে কাপড় (কিম্বা, প্রথমে পরীক্ষার্থ, একখানি পরিষ্কার সাদা রুমাল) ঐ পিঁয়াজ ধোয়া জলে ভিজাইয়া লউন। পরে ঐ ভিজা কাপড়খানিকে ফটকিরির জলে আবার ভিজাইয়া দেখুন; কেমন সুন্দর, উজ্জ্বল হলদে রংয়ে কাপড়খানি ছোপানো হইয়া যাইবে। এই রংটি পাকা। পশম, linen (ক্ষৌম বস্ত্র, শন-নির্ম্মিত সূত্রের বস্ত্র), এবং তুলাজাত বস্ত্র—সমস্ত রকমের কাপড়ই ইহার দ্বারা রঞ্জিত করা যাইতে পারিবে। এখন, কোন একটা বড় পিঁয়াজের আড়তে যথেষ্ট পরিমাণে শুষ্ক পিঁয়াজের খোসা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। ঐগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে, দিব্য একটা লাভজনক কাজে লাগানো যাইতে পারে।

চা আপনারা আজকাল প্রায় সকলেই খাইতেছেন। যে-কোন বাড়ীতে তিনবেলা চা তৈয়ারী হইতেছে। খাইবার পর যে পাতাগুলা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে একটু কাজে লাগাইবেন কি? গরম জলে শুক্‌না চা দিবার পর, দুই তিন চারি মিনিটের মধ্যে যে নির্য্যাসটুকু বাহির হইয়া আসে, উহাই পানীয়। সেইটুকু গ্রহণ করিবার পর, বাকী চায়ের পাতাগুলা একটুখানি জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া লউন। তার পর চায়ের পাতাগুলি একটা ন্যাকড়ার পুঁটুলীর মধ্যে রাখিয়া নিঙড়াইয়া সবটুকু রস বাহির করিয়া একটা চীনা-মাটীর পাত্রে রাখুন। এইবার উহার সহিত একটু হীরাকষ মিশাইয়া লউন দেখি। উহা কি হইল বুঝিতে পারিতেছেন কি? চায়ের রাসায়নিক উপাদানগুলির মধ্যে ট্যানিন আছে। সেই ট্যানিনের সহিত হীরাকষ মিশাইতে কালি হইয়া গেল। মাজুফল, হরীতকী, বহেড়া প্রভৃতি হইতে যে কালি তৈয়ার হয়, চায়ের কষের কালি তত উৎকৃষ্ট নয়। কারণ, ইহাতে ট্যানিক এসিড ছাড়া, আরও অন্য অনেক জিনিস আছে। সেগুলা বাদ দেওয়া হয় নাই বলিয়া কালি তেমন ভাল হইবে না,—তেমন স্থায়ী হইবে না। তবে ইহাতেও কিছু কিছু কাজ হইবে। আমি কিঞ্চিৎ কালি এই উপায়ে তৈয়ার করিয়াছি। তাহার সহিত একটু গঁদ মিশাইয়াছি; একটু ব্লু রংও মিশাইয়াছি। কিন্তু তবু ব্লু ব্ল্যাক কালি হয় নাই। হইয়াছে সবুজ-ব্ল্যাক কালি। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। সেই কালিতেই আমি এখন আপনাদের জন্য "ইঙ্গিতের" কাপি লিখিতেছি। আমার এই কালি একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে কি না, 'ভারতবর্ষের' সম্পাদক মহাশয় এবং ছাপাখানার কম্পোজিটার মহাশয়েরা তাহার বিচার করিবেন। কারণ, আমার এই লেখা এখন কেবল তাঁহারা পড়িবেন। তাঁহারা আমার লেখা পড়িতে পারিলেই আমি সন্তুষ্ট, আমার কালি সার্থক। ইঙ্গিত ছাপা হওয়ার সময় পর্য্যন্ত আমার এই কালি যদি পড়া যায়, তাহা হইলেই যথেষ্ট। কারণ, তাহার পর এই manuscript পড়িবার খুব কমই প্রয়োজন হইবে।

এই অস্থায়ী কালিতে আমার আরও একটা উপকার হইয়াছে। আমার ছেলেমেয়েরা এখন লেখাপড়া শিখিতেছে—স্কুলে পড়িতেছে। হাতের লেখা তৈয়ার করিবার জন্য, অঙ্ক কষিবার জন্য, মানে লিখিবার জন্য তাহাদের কালির দরকার হইতেছে। তাহারা যত লিখুক আর না লিখুক,—কালি ফেলিয়া, ছড়াইয়া, কাপড়ে লাগাইয়া, গা-ময়

মাখাইয়া তাহার দশগুণ কালি নষ্ট করিতেছে। চড়া দামে কেনা কালি এইরূপে নষ্ট হওয়ায় আমার অত্যন্ত লোকসান হইতেছিল, এমন কি, তাহা গায়ে বাজিতেছিল। প্রধানতঃ সেই ক্ষতি নিবারণ করিবার জন্যই আমাকে এই কালি তৈয়ার করিতে হইয়াছে। এখন তাহারা যত ইচ্ছা কালি নষ্ট করুক, সামান্য ব্যয়ে এই কালি তৈয়ার হওয়ায়, উহাতে আর আমার তেমন লোকসান বোধ হইতেছে না। কালি ফুরাইলেই আবার তৈয়ার করিয়া দিতেছি—কত লোকসান করিবে করুক না। আপনাদের মধ্যে কাহার কাহারও অবস্থা হয় ত আমারই মত। তাঁহার বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও হয় ত লিখিবার অজুহাতে এইরূপে অনেক কালি নষ্ট করিয়া থাকে। কালির দাম আগেকার চাইতে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে,—কাজেই লোকসানের পরিমাণও বাড়িয়াছে। এই ক্ষতি তিনিও কতকটা কমাইতে পারেন। আর, আমার অপেক্ষা ধৈর্য্যশীল, উদ্যোগী কোন পাঠক একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া, একটু বুদ্ধি খাটাইয়া, যদি চা-নিঙড়ানো রস হইতে ট্যানিক এসিডটুকু স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাহার সহিত হীরাকস, গঁদ ও রং মিশাইয়া বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী উৎকৃষ্ট কালিও তৈয়ার করিয়া লইতে পারেন। কারণ, কালির প্রধান উপাদান ট্যানিন বা ট্যানিক এসিড চায়ে যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায়। কিন্তু আজ আমি আর ইহার অধিক অগ্রসর হইব না,—আজ আমি কেবল এই ইঙ্গিতটুকু করিয়াই ক্ষান্ত হইব। আজ আমার অন্য অনেক কথা বলিবার আছে। সে কথাগুলি আপনাদিগকে মনোযোগ দিয়া শুনিতে হইবে। মাস দুই তিন বাদে যখন আমের সময় আসিবে, বাজারে কাঁচা আম আমদানী হইবে, তখন হয় ত আর একবার কালির কথা তুলিতে হইবে,—কাঁচা আমের কষি হইতে আমি কিরূপ উৎকৃষ্ট কালি তৈয়ার করিয়াছিলাম, তাহা হয় ত আপনাদিগকে শুনাইতে হইবে। তখন হয় ত আর একবার ভাল করিয়া কালির কথা কহিবার অবসর পাইব।

ঢাকার সবির মহাশয়ের দুগ্ধচূর্ণের কথা প্রকাশিত হইবার পর "ইঙ্গিতের" পাঠকগণের মধ্যে বিলক্ষণ সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় যতটা আশা করা গিয়াছিল, ততটা ফল পাওয়া যায় নাই। তবে সে আলোচনা একেবারে নিষ্ফলও হয় নাই—কোন-কোন পাঠক তাহা হইতে বিশেষ উপকার পাইয়াছেন বলিয়া আমাকে লিখিয়াছেন, এবং সবির মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে dairy সংক্রান্ত কতকগুলি বিষয়ের প্রতি অনেক পাঠকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ঝুমকো ট্যাপারীর সাহায্যে ঠিক বিলাতীর মত দুগ্ধচূর্ণ তৈয়ার না হউক, উহার দ্বারা যে জিনিস প্রস্তুত হইতেছে, তাহা হইতে কেহ কেহ কোন কোন খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া আমাকে লিখিয়াছেন, এবং আমার পরামর্শ চাহিয়াছেন। আমিও যথাসাধ্য পরামর্শ দিয়াছি। তাঁহারা তাঁহাদের চেষ্টার ফলাফল আমাকে জানাইবেন বলিয়াছেন। আমি তাহা জানিতে পারিলেই ইঙ্গিতের পাঠকেরাও তাহা জানিতে পারিবেন। দুগ্ধ ও নারিকেল সংযোগে চোকোলেটের মত কোন খাদ্য তৈয়ার করা যায় কি না, এবং তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় কি না, সেই চেষ্টা হইতেছে, চেষ্টা প্রশংসনীয়। সফল হইলেই তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহাদের উপকার হইবে।

ইহার সঙ্গে আর একটা কথা উঠিয়াছে। রাজপুতানা, আসাম, মালদহ, ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থান হইতে কয়েকটি ভদ্রলোক আমাকে জানাইয়াছেন যে, ঐ সকল স্থলে দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়,—দামও খুব কম—টাকায় ১০—১২ সের হইতে ১৬—১৭ সের পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। দুগ্ধচূর্ণ ছাড়া, দুগ্ধ হইতে আর কি-কি জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারা যায়, সেই পরামর্শ তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের কাহাকে-কাহাকেও দুগ্ধ হইতে ননী তুলিবার পরামর্শ দিয়াছি। ননী হইতে মাখন এবং তাহা হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া চালান দেওয়া যাইতে পারে, এ কথাও তাঁহাদিগকে বলিয়াছি। ননী তুলিবার কল বাজারে পাওয়া যায়। মূল্য বোধ হয় ১২০৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকার মধ্যে হইতে পারে। এই যন্ত্রকে Cream Separator বলে। কেহ-কেহ এই যন্ত্র কিনিয়া সস্তায় দুধ হইতে ননী তুলিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বেশ হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরই একটা শক্ত কথা আসিয়া পড়িয়াছে। আজ সেই কথাটার মীমাংসা করিবার ভার আমার উপর

পড়িয়াছে। আমি যথাসাধ্য তাহার মীমাংসার চেষ্টা করিতেছি।

দুধ হইতে ননী তুলিয়া লইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে ইংরেজীতে skimmed milk বলে। আমাদের চলিত ভাষায় উহার নাম ঘোল। যাঁহারা Cream Separator যন্ত্র ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারা এই দুধটি লইয়া মুস্কিলে পড়িয়া গিয়াছেন,—ইহাকে কিরূপে কাজে লাগাইবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। ইহাই এখনকার প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের যে কয়টি উপায়ের কথা আমার মনে হইতেছে, তাহা আমি যথাসাধ্য বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

কলিকাতার বাজারে condensed milk নামে যে টীনের কৌটায় দুধ কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রধানতঃ এই skimmed milk হইতে তৈয়ার হয়। আমাদের হিসাবে এই ননীতোলা দুধ বা ঘোল কম পুষ্টিকর—কারণ, উহাতে স্নেহজাতীয় (fat) পদার্থের অভাব রহিয়াছে। কিন্তু বিলাতী হিসাবে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মতে, উহা কচিকচি দুগ্ধপোষ্য ছেলেমেয়েদের পক্ষে পরম হিতকর খাদ্য, কারণ, দুগ্ধের স্নেহজাতীয় (fat) পদার্থ কিছু গুরুপাক; আর মাখন-তোলা দুধ খুব লঘুপাক খাদ্য। সে যাহা হউক, সে বিষয়ের মীমাংসা এখানে অনাবশ্যক। মোটের উপর,—ঐ মাখন-তোলা দুধ (skimmed milk) condensed milkএর প্রধান উপাদান। Condensed milk প্রস্তুত করিবার কল বসাইতে পারিলে ঐ ননী-তোলা দুধ বেশ কাজে লাগাইতে পারা যায়, এবং তদ্দারা আর একটী স্বতন্ত্র ব্যবসায়ের পথ খুলিয়া যায়। Condensed milk কেবল কলিকাতায় নহে, পৃথিবীর অনেক স্থলেই ব্যবহৃত হয়। চা প্রস্তুত করিতে, এবং শিশুদের খাদ্যরূপে উহার সর্ব্বত্রই যথেষ্ট ব্যবহার রহিয়াছে। সুতরাং উহার ব্যবসায়ও বেশ চলিতে পারিবে। কিন্তু এই কল বসানো কিছু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। বিলাতী কল বোধ হয় ৪।৫ হাজার টাকার কমে পাওয়া যাইবে না। বায়ু-হীন পাত্রে গরম হাওয়া বা বাষ্পের সাহায্যে দুধের জলীয় অংশ মারিয়া ফেলিয়া condensed milk তৈয়ার করিতে হইবে। এবং সেজন্য power বসাইতে হইবে। ইহাতে বেশ একটু বেশী রকম মূলধন দরকার হইবে।

ঐ skimmed milk হইতেই বিলাতী milk powderও তৈয়ার হইতে পারিবে। Condensed milk তৈয়ার করিতে যতখানি জল মারিয়া ফেলিতে হইবে, তদপেক্ষা আরও বেশী অগ্রসর হইতে হইবে; অর্থাৎ সমস্ত জলটুকু মারিয়া ফেলিয়া, একেবারে শুকাইয়া ফেলিয়া, তার পর গুঁড়া করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে condensed milkএর অপেক্ষা আরও কিছু বেশী কলকব্জা চাই।

এই দুইটী ছাড়া, ননীতোলা দুধ হইতে আরও একটী কাজ হয়। কিন্তু, তাহা সম্পূর্ণরূপে খাদ্য সংক্রান্ত নহে বলিয়া, সে বিষয়ের আলোচনা, করিতে আমি এতদিন ধরিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। কারণ, পৃথিবীতে এখন যেরূপ খাদ্যাভাব উপস্থিত, আমাদের দেশের যেরূপ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অবস্থা, তাহাতে খাদ্যের উপযোগী কোন জিনিসই খাদ্য ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহৃত হইতে দেওয়া উচিত নয়। তবে আজকাল শুনিতেছি, এবার দেশে যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে; এবং বিলাতী তারের সংবাদেও দেখিতেছি, ইয়োরোপ অঞ্চলেও খাদ্যাভাব অনেকটা দূর হইতেছে—খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যও যথেষ্ট পরিমাণে কমিতেছে। তাই আজ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইলাম।

দুগ্ধ হইতে casein নামক একটী পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহা যে একেবারে অখাদ্য তাহা নয়। তবে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ইহা খাদ্য অপেক্ষা অন্য কাজেই বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়;—ইহা হইতে হস্তীদন্তের মত একরকম জিনিষ তৈয়ার হয়। সে জিনিস হইতে ছাতির ও লাঠির বাঁট, বোতাম, এবং অন্য নানারকম সৌখিন জিনিস তৈয়ার হয়। শিল্প-কার্য্যে হাতীর দাঁতের যতরকম ব্যবহার আছে, casein হইতে তাহার বেশী ভাগ কাজ হয়। এইজন্য ইহার অপর এক নাম immitation ivory বা নকল হস্তিদন্ত।

এই casein সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে হইবে। সেইজন্য আজ কেবল উহার নামোল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইলাম। বারান্তরে বিস্তৃত পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

বরাকরের চিঠি

[শ্রীবিনয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী বি-এ]

বরাকর,
৬ই জানুয়ারী।

শ্রীচরণকমলেষু,

দাদাবাবু, এখানে আজ দশদিন এসে তোমাকে তিনখানা চিঠি দিয়েছি, তুমি একখানারও উত্তর দাওনি কেন বল ত? অমন করলে আমিও চিঠি বন্ধ করে দেব। মজাটা টের পাবে। আমি এখানে কেমন খাই, কেমন থাকি, তা' সবই তোমায় লিখেছি;—আজ লিখছি আমার বেড়ানর কথা। এ দেশে বা'র হওয়া বড় সোজা কথা নয়; এত ধূলো যে নাকে হাওয়ার চেয়ে ধূলোই বেশী ঢোকে; ভয় হয় বরাকর নদীর চড়া বুঝি এবার বুকের মধ্যে জমে বসবে। তবু আজ বিকেলে বেরিয়েছিলাম হাওয়া অর্থাৎ ধূলো খেতে। Grand Trunk Road হাওড়া থেকে বেরিয়ে বরাকরের ভেতর দিয়ে বরাবর লাহোর চলে গেছে। পোয়াটেক পথ হেঁটে তা'তে গিয়ে উঠলাম। সেই রাস্তার কোল ঘেঁসে নদীর উপর চারটে শিব-মন্দির আছে। তাদের বলে কল্যাণেশ্বরের মন্দির। সেগুলো এখনকার sand-stone দিয়েই তৈরী, আর সমস্ত গায় বিচিত্র কারু-কার্য্য খোদা। অতি বিচিত্র সূক্ষ্ম কাজ। এদের মধ্যে বড় যে দুটো, তারা বোধ হয় একই সময়কার; অন্য দুটো তার ঢের পরে তৈরী, আর অনেক সংক্ষেপে ও সস্তায়। দেখতে এগুলো অনেকটা পুরীর মন্দিরের মত। কিন্তু কে যে কবে তৈরী করেছে, তা' এখানকার কেউ বলতে পারে না।

মন্দিরের কাছেই দুটো কয়লার খনি আছে। একটাতে আর কয়লা নেই, তাতে লোকজন কেউ থাকে না। তার খাদ জলে ভরে উঠেছে। আর একটাতে এখনও কাজ চলছে। শেষের খনিটা একেবারে নদীর ওপর। তার খাদ বোধ হয় নদীর তলাতেও চলে গেছে। সেই খনিটার কাছে নদীর মধ্যে একটা ছোট দ্বীপের মত আছে; আর তারই উপর একটা ছোট বাঁধান কবর। কার যে কবর, তা কেউ জানে না। যারই হোক্, এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনের পর অমন সুন্দর শান্তিপূর্ণ বিশ্রামের জায়গা পেলে সবারই বোধ হয় মরতে সাধ হয়। শুনে তুমি চটো না। আমার সে ইচ্ছে হয়েছিল। এখন তার চারিদিক্ বালিরাশি ধূ ধূ কচ্ছে—আর তারই মধ্যে দিয়ে নিস্তব্ধ ক্ষীণ বরাকর নদী তির্-তির্ করে বয়ে যাচ্ছে। বর্ষার সময় যখন এই নদী কূলে-কূলে ভরে উঠে ছোট দ্বীপটীকে জননীর মত ব্যগ্র আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে, তখনকার কথা ভাবতে গেলে মনটা যেন কদমফুলের মত শিউরে ওঠে। খনি দেখতে-দেখতে সেখানকার এক বুড়ো জমাদারের সঙ্গে আমার খুব আলাপ জমে গেল। তার কাজ কুলীদের কয়লা মাপা; তা' তখন শেষ হয়ে গেছে। তাই আমি যখন বল্লাম, চল না জমাদার সাহেব, ঐ দ্বীপটা দেখে আসি, তখন সে আর কোন আপত্তি করল না। আমার দেওয়া একটা সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে সঙ্গে চল্ল।

বুড়ো-মানুষ বহুদিন বোধ হয় কোন শ্রোতা পায়নি; তাই আমার কাণে তার দীর্ঘ-জীবনের যত অভিজ্ঞতা, সব ঢেলে দিতে লাগল। সে বল্ল, প্রথমে এদেশে কয়লার-খনি কেউ ছুঁত না; কয়লার দামও ছিল তেম্নি কম। আজ-কাল কয়লার যা দাম হয়েছে, তাতে কালো মাটী হলেই চলে যাচ্ছে। কবে কোন্ বাঙ্গালী-ম্যানেজার তার মনিবকে ফাঁকি দিয়ে নিজে সমস্তটা কিনে নেয়—আজকালই বা তার আয় কত, ইত্যাদি অনেক খবরই সে আমাকে শোনাতে লাগল। আমি শুধু সংক্ষেপে হুঁ-হাঁ দিয়েই সারছি, আর বালি ভেঙ্গে চলেছি।

দ্বীপটার কাছাকাছি যেতেই সূর্য্য ডুবে গেল। শীতের গোধূলি তখন অতি ম্লান-ভাবে নিজেকে সংযত করে নিচ্ছে। সেই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে আমার মনে হ'ল যেন একটা মানুষ চরের উপর ছুটে বেড়াচ্ছে। একবার এদিক যাচ্ছে, আবার ওদিক যাচ্ছে। একটু ভড়্কে গিয়ে সঙ্গীকে বল্লাম, "জমাদার উয়ায় কি বটেক?" (ওখানে ওটা কি?) জমাদার না থেমেই উত্তর দিল, "উয়ায় মাধু বাউরা আছেক"

(ও মাধু পাগল হয়ে গেছে)। কাছে গিয়ে দেখি, হাঁ সত্যিই একটা মানুষ; প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু, খুব কালো রং, মুখে কালো-দাড়ি, গায়ে একটা চটের আলখেল্লা—সেই চরের উপর দৌড়ে বেড়াচ্ছে। যেন অতি ব্যস্ত ভাবে কিছু খুঁজছে—কিন্তু সেটা পাচ্ছে না; অথচ সে ঠিক জানে এই খানেই কোথাও সেটা আছে। একবার এদিকে যাচ্ছে, আবার ওদিক যাচ্ছে, ফিরে আবার হয় ত সেই আগের জায়গাতেই আসছে। নিচু হয়ে বালি খুঁড়ছে—তা ফেলে দিয়ে আবার নূতন দিকে ছুটছে। যেন কিছু ধরি-ধরি ভাব। কি অক্লান্ত অবিরাম তার এই অন্বেষণ। পাশ দিয়ে আমাদের যেতে দেখে সে মুখ তুলে চাইল। জমাদার একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল "কিরা মাধো কিছু পালেক হায়?" (কিরে মাধু কিছু পেলি কি?) উত্তরে শুধু একটা গম্ভীর-স্বরে "নোয় এতিকোনা" (না এখনও না) বলে সে ছুটে চলে গেল। তার কি দাঁড়াবে চলে! জমাদার বল্লে, "বাবুজী, আজ দশ বছর ধরে ও এম্নি ভাবে খুঁজছে, কিন্তু কিছুই পায়নি।"

তখন আমরা দ্বীপের গোড়ায় এসে পড়েছি। বেশ একটু সাবধান হ'য়ে কোন রকমে উপরে ওঠা গেল। আলোও তখন খুব কমে গেছে; পড়ে গেলে মৃত্যু যদিও না হয়, হাত-পা ভেঙ্গে কেটে-কুটে যাবে, এ নিশ্চয়। কাজেই তখন আর ও-বিষয়ে কোন কথা-বার্ত্তা হোল না। উপরে উঠে সমস্ত পরিশ্রম যেন সার্থক হয়ে গেল। তখন সন্ধ্যাটা যে কি সুন্দর হয়েছিল, তা' আর তোমাকে চিঠিতে লিখে কি জানাব! মুখের উপর, সূর্য্য যেখানে ডুবে গেছে, সন্ধ্যা-তারা জ্বল-জ্বল করছে; যেন ছল ছল চোখে সূর্য্যের বিরহের কাতর অভিযোগ জানাচ্ছে। চারিদিকের অস্পষ্ট কোলাহল এখানকার নিস্তব্ধতাকে যেন আরও নিবিড়, জমাট করে তুলেছে। মনে হয় এটা যেন পৃথিবী থেকে অনেক উপরে কোথাও বসান রয়েছে; সংসার দূরে—বহুদূরে পড়ে আছে।

কিছুক্ষণ এই সৌন্দর্য্য দেখে আমি একটা সমান জায়গায় বসে পড়লাম;—জমাদারকে বল্লাম, 'এখন বল সাহেব, কি খুঁজছে ওখানে? জমাদার পাশে বসে বল্লে, "সে অনেক কথা' বাবু! আজ থাক; শুনতে গেলে রাত হয়ে যাবে।" আমি ছাড়লাম না—জেদ করে বল্লাম, "না এখনই বল। আবার কবে আসব তা কে জানে?"

তখন সে বল্লে, "তবে শুনুন বাবু, সে দুঃখের কথা। আপনার কাছে আর সিগারেট থাকে ত একটা দিন।' বুড়ো মানুষ অনেকক্ষণ খাইনি।" আমি তা'কে একটা সিগারেট দিলাম। সেটা ধরিয়ে একটু টেনে বুড়ো বলতে আরম্ভ করে দিল—"বাবুজী, কথাটা পুরানো হলে কি হয়, আজও আমার চোখের উপর সে সব দিন ভাসছে। মনে হয় যেন কালকের কথা। আমার ঘর ছিল লছ্মনপুরে, এখান থেকে পূবে। সবে মাত্র মাস কয়েক হ'ল তখন এদেশে এসেছি। আপনি নিশ্চয়ই ঐ মন্দিরগুলো দেখেছেন। আচ্ছা, ওর উত্তরে ঠিক সীমানার বাইরে একটা সিঁড়ি খাদ আছে, দেখেছেন কি? তাও দেখেছেন। আচ্ছা বেশ। তখন এ অঞ্চলে ঐ একটাই কয়লার খনি ছিল। এখন যেমন কুয়ো খাদ দিয়ে কয়লা তোলে, তখন সে প্রথার বড় চলন ছিল না।

"সাধারণতঃ, ঐ রকম ঢালু সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে কয়লা তুলে আনতে হ'ত। এটাও ছিল তাই। আমি প্রথম চাকুরী নিই ঐ খনিতে। সামান্য লেখা-পড়া জানতাম বলে আমায় আর নীচের গিয়ে কয়লা কাটতে হ'ত না; উপরে বসে কামিনদের (কুলী) আর কয়লার হিসাব রাখতাম। মাধু সেই কুলীদের মধ্যে কাজ করত। তখন ওর বয়স মাত্র বছর তিরিশ; আর শরীরেও অসুরের মত সামর্থ্য ছিল। ঐ শুনছেন, আমাদের খনিতে কুলীরা কয়লার রাখতে রাখতে কেমন বাঁশী বাজাচ্ছে; এ বাঁশী এদেশের বড় পেয়ারের জিনিষ। সৌখীন জোয়ান হলেই তার একটা বাঁশী চাই-ই। মাধুরও অম্নি একটা বাঁশী ছিল। এক-একদিন খাদের ভেতর থেকে সে যখন বাঁশীতে ফুঁ দিত, তখন উপরে সব কাজ বন্ধ হয়ে যেত; মনে হ'ত যেন জননী ধরিত্রী মানুষের অত্যাচারে ব্যথিতা হয়ে তাঁর বেদনার করুণ কাহিনী বুঝি ঐ স্বর্গের আসনের তলায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন। যতক্ষণ বাঁশী বাজত, ততক্ষণ সবাই চুপ করে শুনত; কিন্তু এমন বাঁশী সে রোজ বাজাত না। যেদিন সোহাগী তাকে বড় দাগা দিত, অপমান করত, সেই দিনই তার বুকের যত ব্যথা, যত আকুলতা ঐ ভাবে বাঁশীর সুরে কেঁদে কেঁদে সমস্ত জগৎ ছেয়ে ফেলতো।

কামানাদের মধ্যে সেই ছিল সবচেয়ে রূপসী। বাবুজী, আপনি বোধ হয় জানেন না, এদেশী সাধারণ মেয়েদের মধ্যে ইজ্জৎ বলে কোন জিনিষ নেই। বিয়ের আগে তারা সতীত্বের কোন ধারই ধারে না। বিয়ের পরে অবশ্য অনেকটা সেরে চলে। তাই সোহাগীর বয়স ১৭।১৮ বছর হলেও সে কোন পুরুষের কাছে বাঁধা হয়ে থাকতে চাইত না। আর তার সুযোগও ছিল যথেষ্ট ;—সর্দ্দারের মেয়ে সে—তাকে কিছুই প্রায় করতে হ'ত না। অন্য কুলীরাই তার কাজ করে দিত। আমরা জানতাম সবই, তবু কিছু বলবার উপায় ছিল না। আমাদের সঙ্গে কাজের সম্পর্ক —কাজ বুঝে পেলেই দাম চুকিয়ে দিতে হ'ত।

মাধুর সঙ্গে সোহাগীর বিয়ের সব ঠিক ছিল,—শুধু মেয়েটাই আজ-না-কাল করে সে,দিনকে পিছিয়ে নিচ্ছিল। তিন বচ্ছর ধরে মাধুকে ঘোরাচ্ছে, তবু তাকে সংসারী হতে দেয় নি। এখন যেমন সে ঐ বালির মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখনও ঠিক অম্নি ভাবে মাধু ছায়ার মত সোহাগীর সঙ্গে ফিরত। বোধ হয় তার পায়ে পাথর লাগবার আগে সেই পাথরের উপর নিজের বুক পেতে দিতে পারত। এমন অনেক দিন দেখেছি যে, ও তার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে, কিন্তু সে অন্য পুরুষ-কুলীদের সঙ্গে অম্লান ভাবে গল্প করছে—ওর দিকে ভ্রূক্ষেপও করছে না। ও মুখটা চুণ করে সব শুনে যাচ্ছে। এই মাধুর খোঁজ পড়ত সেদিন, যেদিন তার কোন সখের বায়না মেটাবার জন্যে লোকের দরকার হ'ত। কাজ ফেলে, কামাই মাটী করে, সোহাগীর জিনিষ আনতে আজ রাণীগঞ্জ, কাল ধানবাদ, পর্শু আসানসোল মাধু হামেসাই যাচ্ছে ; কিন্তু একদিনও তার পারিশ্রমিক স্বরূপ একটু হাসি সেই পাষাণীর মুখ থেকে সে পায় নি। তাও সে মুখ বুঁজে সহ্য করত ; শুধু সইতে পারত না, যখন তার মুখের সামনে সোহাগী অন্য পুরুষের সঙ্গে যথেচ্ছা রসের আলাপ করত। তখন দুর্জ্জয় রাগে তার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপত ; যেন তখনি ফেটে পড়বে। বাঘের মত চোখ দুটো জ্বল্-জ্বল্ করে জ্বলত, বুঝি তখনিই তার বাগদত্তাকে সে পাপের সংস্পর্শ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। কিন্তু সোহাগীর এম্নি শাসন যে, সে কিছুই করতে পারত না। সেই দিনই তার বাঁশীর সুর খাদের অতল তল থেকে কেঁদে [illegible] উঠত।

এইটুকু বলে বুড়ো থেমে; পশ্চিম দিগন্তের পানে চেয়ে রইল। অন্ধকারে তার মুখ স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম না, তবু যেন মনে হ'ল দুফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে তার সাদা দাড়িতে মিশে গেল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুরুটটা আবার ধরিয়ে বুড়ো বলতে সুরু করে দিল—"বাবুজী; এখন আর ও-খাদে নামা যায় না ; সব ধ্বসে পড়্‌ছে। কিন্তু নামলে দেখতে পেতেন, মন্দিরের তলায় কাছাকাছি এসে আর ও-দিকে কাজ হয় নি। কয়লা এখনও বহুত আছে ; কিন্তু বড় সাহেবের হুকুম হয়ে গেছে, তা'তে আর কেউ সাবল মার্ত্তে পার্ব্বে না। তার পর শুনুন বাবু, একদিন ঠিক হ'ল যে মন্দিরের তলার কয়লা খুঁড়তে হবে। দেওঘরিয়া (পূজারী) বামন এসে কত মানা করল—বল্ল, যে ওখানে খুঁড়তে যাবে, তার সর্ব্বনাশ হবে। ম্যানেজারের কত হাতে-পায়ে ধরল, কিন্তু সে ছিল দেশী সাহেব ; কিছুতেই শুনল না। কিন্তু কাটতে যাবে কে ? কাজটাতে বিপদ যথেষ্ট ; নূতন করে দেওয়াল খুঁড়ে, খুঁটি দিয়ে এগুতে হবে। তাতে বল-বুদ্ধি দুয়েরই দরকার। মাধু ছিল এ সব কাজে ওস্তাদ। কিন্তু সে তখন গেছে ধানবাদ না কোথায়, সোহাগীর কাঁচের বালা কিন্‌তে। অনেক যুক্তি তর্কের পর ঠিক হ'ল, মাধু এলে সেই এ কাজ করবে,—এখন দু'দিন অন্য দিকে কাজ হবে। সোহাগী এ কথা শুনে জেদ্ ধরল—সে যাবে সেই দেওয়াল কাটতে। তার বাপ ও আমরা সবাই কত মানা করলাম ; তা সে শুন্‌ল না। তার জেদ্, সে যাবেই। আরও তিন জন কুলী ডবল-রোজের লোভে তার সঙ্গে কাট্‌তে রাজি হ'ল। তারা সবাই নেমে গেল ; সাধুরামও গেল মেয়ের সঙ্গে। নূতন লোক কাজে গেছে, আমরা সবাই একটু উৎগ্রীব হয়ে রইলাম। কিন্তু কিছুই হ'ল না—কাজ বেশ নির্বিঘ্নে চলল। মাঝে সর্দ্দার এসে খবর দিয়ে গেল, তারা প্রায় সাত ফুট এগিয়েছে। ঘণ্টা তিনেক পরে তাদের ডাকতে লোক পাঠাচ্ছি, এমন সময়ে খাদের মধ্যে একটা শব্দ হ'ল। সবাই ছুটে গেলাম। খুঁটি দেবার দোষেই হোক্, বা আর যে কারণেই হোক্, উপর থেকে একটা চাপ পড়ে তাদের বেরুনোর রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। পাথরের ওধারে বন্দীদের আওয়াজ খুটখাট করে হচ্ছিল। কিন্তু সে পাথর না কাটলে তাদের মুক্তি নেই। আমরা

দিবারাত্র পরিশ্রম করতে লাগলাম। মাধুও এসে পাগলের মত খাটতে লাগল; তবু তিন দিনের আগে সে পাথর পথ দিল না। বড় বেশী দেরী হয়ে গিয়েছিল বাবু! তখন তাদের কেউ আর বেঁচে ছিল না। বাতাসের অভাবে সবাই দম আটকে মারা গেছে। দেখি পথের সামনে পাঁচটা শব পাশাপাশি পড়ে আছে,—আর সবার আগে তার বাপের কোলে শুয়ে সোহাগী। তার হাতে মাধুর বাঁশীটা; নিজের পেতলের আংটীর বদলে ঐ বাঁশীটা সে মাধুর কাছ থেকে নিয়েছিল। বাঁশীটা দুই হাতে ধ'রে মুখের সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছে—যেন তার সুর এতদিনে তাকে অনন্তের দিকে ডেকে নিয়েছে; মাধুকেও যেন ডাকছে "আয়, আয় আয়।"

বুড়ো একটু থেমে চোখের উপর হাত বুলিয়ে নিল। আমারও গলাটা ধ'রে গিয়েছিল। একটু পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম "তা মাধু ওখানে কি খুঁজছে অমন ক'রে?" জমাদার উত্তর দিল, "বাবুজী, তখন নতুন বর্ষায় নদীতে সবেমাত্র জল উঠতে আরম্ভ করেছে, তাই ঐখানে জলের ধারে সোহাগীকে দাহ করা হয়েছিল।"

চোখ তুলে দেখি কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠেছে। আর তার মৃদু আলোতে মাধু বালির তলায় তার প্রেয়সীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কত ব্যস্ত, কত ব্যাকুল, অথচ কত নিশ্চিন্ত,—সে পাবেই। তার হাতে একটা পেতলের আংটী চাঁদের আলোতে সোনার মত ঝক্‌ঝক্‌ ক'রে উঠছে।

দাদাবাবু, আজ আর অন্য কথা লিখিতে পারিলাম না।

তোমার স্নেহের—বিভূতি।

সঙ্কলন

দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব?

[শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

। শতাব্দী পূর্ব্বে যখন ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বোমা প্রভৃতি আপদ্‌গুলার নও আমরা জানিতাম না, আর, বাহাত্তর সালে কোন্ জন্মে কবে বার আমাদের এই সোণার ভারতে দুর্ভিক্ষের পদধূলি পড়িয়াছিল, রার হৃদয়-বিদারণ আখ্যায়িকা শুনিলে আমাদের মনে হইত— : এখন আমাদের ভয় নাই, এখন আমরা রামরাজ্যে বাস তেছি! যখন, যেদিকে চক্ষু ফিরাইতাম সেই দিকেই দেখিতাম, ন্ন বদনে লক্ষ্মী হাসিতেছেন—সে একদিন ছিল! তখন, আমার ংশের পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে, কুমারসম্ভবও প্রায় শেষ হইয়া য়াছে, ইতিমধ্যে একদিন, মাঘ-ভারবি না জানি কাণ্ডখানা কিরূপ াহা পাতা উল্টাইয়া দেখিতে গিয়া দিব্য একটি পাকা চ'ড়র শ্লোক ার চক্ষে পড়িল। তাহার শেষ চরণটি আজিও আমি ভুলি নাই;

এই:—"হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ—হিতও যেমন, হারিও তেমি, এরূপ বচন দুর্লভ।" ইহার খোলাসা তাৎপর্য্য —অপ্রীতিকর হিতবাক্যও সুলভ, আর, মনস্তুষ্টিকর অহিত বাক্যও ; প্রীতিজনক হিতবাক্যই দুর্লভ। হিতবক্তার তবে তো দেখি-মৌনাবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। তোমার শাস্ত্রে কি লেখে?

২। আমার শাস্ত্রে লেখে এই যে, হিতবাক্য লোকের মনোহারী কি হইবে না তাহা ভাবিবার কোনো প্রয়োজন করে না—চোখ বুজিয়া তাহা বলিয়া ফ্যালাই ভাল; যে শোনে সে শুনিবে, যে না শোনে না শুনিবে; তুমি তো বলিয়া খালাস! তুমি যদি জানিতে পারিয়া থাক যে গঙ্গার ঘাটে কুমীরের আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে, তবে সে কথা সহরময় রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া তোমার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে এটা সত্য যে, জ্ঞানের হিতবাক্য কাহারো প্রাণে সহে না; তাহা এক কাণ দিয়া শ্রোতার মস্তিষ্কসদনে প্রবেশ করে—শুদ্ধ কেবল ভদ্রতার অনুরোধে ভর করিয়া; কিন্তু প্রবেশ করিয়া যখন দেখে যে, হৃদয়দ্বারে কপাট বন্ধ, তখন বসিতে জায়গা না পাইয়া আর এক কাণ দিয়া সুড়্‌সুড় করিয়া বাহির হইয়া যায়। মনস্তুষ্টিকর অহিত বাক্যের কুহকে ভুলিয়া রসাতলের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে এরূপ কৃপাপাত্র আমি কত যে দেখিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই, পরন্তু তাহাদের মধ্যেকার একজনকেও আজ পর্য্যন্ত দেখিলাম না যে, সে কাহারো হিতবাক্য শুনিয়া সংশিক্ষা লাভ করিয়াছে। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী' যে শেখে, সে ঠেকিয়া শেখে! বলিতেছি বটে "ঠেকিয়া শেখে", কিন্তু ঠেকিয়া শেখা বলে কাহাকে তাহা যদি শোনো, তবে তোমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিবে;—ঠেকিয়া শেখার আর এক নাম মৃত্যুমুখে প্রবেশ করা। দশজন স্নানযাত্রী গামছা কাঁধে করিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছে দেখিয়া তুমি তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছ "জলে নামিও না—গঙ্গায় কুমীর দেখা দিয়াছে।" পাঁচজন তোমার সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া এক-বোঁয়ে [illegible]

আর-পাঁচজন তাহাদের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ এক-হাঁটু জলে নাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কোমর-জলের মহারথীরা চকিতের মধ্যেই জলগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল ;—ইহারই নাম ঠেকিয়া শেখা ! হাঁটু-জলের অর্দ্ধরথীরা দ্রুতগতি ডাঙ্গায় উঠিল ; ইহারই নাম দেখিয়া শেখা।

॥ ১ ॥ শুনিয়া শিখিলেই তো আপদ চুকিয়া যায়, তাহা হইলে ঠেকিয়া শিখিতেও হয় না, দেখিয়া শিখিতেও হয় না। শুনিয়া শিখিতে লোকে এত পরাঙ্মুখ হয় কেন ?

॥ ২ ॥ লোকের শুনিয়া শিখিবার বয়স অতীত হইয়া গিয়াছে, তাই তাহারা শুনিয়া শিখিতে পরাঙ্মুখ।

॥ ১ ॥ বেশ যা হো'ক্ তুমি বলিলে ! তুমি কি আর জান না যে, কচি বয়সের মনুষ্যও মনুষ্য, যুবা বয়সের মনুষ্যও মনুষ্য, প্রবীণ বয়সের মনুষ্যও মনুষ্য ? সত্য বলিতে কি—তোমার মতো লোকের মুখে "মনুষ্যের শুনিয়া শিখিবার বয়স অতীত হইয়াছে" এরূপ একটা আগা-পাছতলা রহিত বেথাপ কথা শুনিলে আমার কেমন কেমন ঠ্যাকে !

॥ ২ ॥ বলিলাম অ্যা'ক—শুনিলে আর ! আমি বলিলাম, "লোকের বয়স", তুমি শুনিলে "মনুষ্যের বয়স।"

॥ ১ ॥ আমি তো জানি মনুষ্য নামাই লোক।

॥ ২ ॥ সে দিন তোমার অষ্টম বর্ষীয় বালকটি যখন তোমাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল, যে, "সকালে পড়া মুখস্থ করেছি, বিকালে পড়া মুখস্থ করেছি, আবার এখন রাত্রে পড়া মুখস্থ করিতে বলিতেছ। অতবার ক'রে পড়া মুখস্থ ক'লে লোকে পাগল হ'য়ে যায়," এ কথায় প্রত্যুত্তরে তুমি যাহা তাহাকে বলিলে তাহা তো আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি ! তুমি বলিলে "তোর এখনো গোঁপ-দাড়ি ওঠে নি—তুই আবার লোক হলি কবে ? যা'—পড়্'গে যা'।" লোক শব্দের এইরূপ বিশদ তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা তোমারই মুখে যখন আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তখন আমি কেমন করিয়া জানিব যে, তোমার অভিধানে মনুষ্য নামাই লোক—একটি পঞ্চমবর্ষীয় বালকও লোক !

॥ ১ ॥ তুমি তো ঘর-সন্ধানী (Detective) মন্দ না ! বমাল শুদ্ধ আমাকে পাকড়া করিয়াছ ! তোমার সঙ্গে কথা কহা দেখিতেছি বিপদ ! তুমি যদি, সখে, একটা কাজ কর—বড্ড ভাল হয় ; আশ পাশের ফ্যাকড়া কথায় চুলচেরা ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হইয়া তুমি যদি আমাকে তোমার পেটের কথাটি পরিষ্কার করিয়া খুলিয়া-খালিয়া বল, তাহা হইলেই অবলীলাক্রমে সমস্ত গোল মিটিয়া যায়।

॥ ২ ॥ বলি তবে শোন—এটা তুমি তো জানই যে ঘুম-পাড়ানী মাসী-পিসীরা সেদিনকার ছেলেকে বড় হইয়া টাকা উপার্জ্জন করিতে দেখিলে আঁচলের কোণ দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলেন, "আমি উহাকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি !" ঘোড়া পেট থেকে পড়িয়াই ঘোড়া হয়, গোরু পেট থেকে পড়িয়াই গোরু হয় ; কিন্তু মানুষের এ কি বিপরীত কাণ্ড—অন্যে তাহাকে মানুষ না করিলে সে মানুষ হয় না। [illegible] দ্বারা [illegible] নিকট হইতে এক-মেটে শিক্ষা লাভ করে, তখন সে অর্দ্ধ মানুষ হয় ; তাহার পর পঠদ্দশায় যখন শিক্ষকদিগের নিকট হইতে দোমেটে শিক্ষালাভ করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে চরিয়া খাইতে শেখে, তখনই সে পুরা-মানুষ হয়। কচি-বয়সে গৃহ মনুষ্যের জীবন-ক্ষেত্র ; এই জীবন ক্ষেত্রে মনুষ্য পানাহার করিতে শেখে, পায়ে হাঁটিতে শেখে, বসিতে দাঁড়াইতে শেখে, মাতৃভাষা শেখে, জীবনের যত কিছু মুখ্য-প্রয়োজনীয় ব্যবহার-প্রণালী সমস্তই অবলীলাক্রমে শেখে। মনুষ্যের এইরূপ কচি-বয়সের শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে, কিন্তু, শিক্ষা শব্দের বাচ্য নহে ; কেন না এ বয়সে মনুষ্য-সন্তান শিখিব মনে করিয়া কিছুই শেখে না ; তাহার মাতাপিতা এবং ভ্রাতা ভগ্নীরা যাহা তাহাকে গিলাইয়া দায়, তাহাই সে হাসিয়া খেলিয়া গলাধঃকরণ করে। বাচ্ছা-মনুষ্যের শিক্ষা একপ্রকার অযাচিত দান-গ্রহণ। আদিম জীবন-ক্ষেত্রে মনুষ্য ঐরূপ অযাচিত দান-গ্রহণের পথ দিয়া জীবন-নির্ব্বাহের নানাবিধ অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যবহার-কার্য্যে অশিক্ষিত-পটুতা উপার্জ্জন করে। জীবনক্ষেত্র হইতে মনুষ্য যখন মানস-ক্ষেত্রে ভর্ত্তি হয়, তখনই প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহার শিক্ষার গোড়া পত্তন আরম্ভ হয়। মানস-ক্ষেত্র কি ? না বিদ্যালয়। বিদ্যালয়কে মানস-ক্ষেত্র বলিতেছি এই জন্য—যেহেতু মনোযোগই এ ক্ষেত্রের প্রধানতম শিক্ষা-প্রণালী। মনুষ্যের পঠদ্দশায় শিক্ষকের বাক্য মন-দিয়া না শুনিলে তাহার বিদ্যা-শিক্ষা অন্য কোনো উপায়ে ঘটিয়া উঠা সম্ভবে না। পঠদ্দশার বয়সই প্রধানতঃ মনুষ্যের শুনিয়া শিখিবার বয়স। মনুষ্যের পঠদ্দশার বয়স অতীত হইলেই সেই সঙ্গে তাহার শুনিয়া-শেখার বয়স অতীত হইয়া যায়। মানস-ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকিবার সময় পণ্ডিত মহাশয়ের, তথৈব, অধ্যাপক মহাশয়ের ছাত্রেরা মনোযোগের পথ দিয়া বিদ্যাবুদ্ধি উপার্জ্জন করে। বুদ্ধি পরিস্ফুট হইবার পরে—বুদ্ধি যাহা বলে তাহাই শুনিয়া চলে। বুদ্ধি-বিকাশের পালা সাঙ্গ হইলে মনুষ্য যখন মানস-ক্ষেত্র হইতে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ভর্ত্তি হয়, অথবা যাহা একই কথা—বিদ্যালয় হইতে লোক-সমাজে ভর্ত্তি হয়, তখনই সে লোক হয়। মনুষ্য যত দিন বালক থাকে, তত দিন সে কাহারো নিকট হইতে কোনো কথা শুনিয়া শিখিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হয় না ; পক্ষান্তরে, বুদ্ধির ফুটন্ত অবস্থায় লোক-সমাজের বাতাস গায়ে লাগিয়া বালক যখন লোক হইয়া ওঠে (ডার্বিনের শাস্ত্রানুসারে—বানর যখন নর হইয়া ওঠে) তখন গোঁপ-দাড়ির প্রাদুর্ভাবে তাহার মুখের চেহারাও যেমন ফিরিয়া যায়, পদগৌরবের প্রাদুর্ভাবে তাহার মনের ভাবও তেমি ফিরিয়া যায় ; মন তখন বলে—"অন্যের নিকট হইতে কোনো কথা শুনিয়া শিখিলে আপনার বুদ্ধিকে অপমান করা হয়।" এতগুলা কথা আমার পেটের মধ্যে ছিল, তাই তুমি যখন বলিলে, "শুনিয়া শিখিতে লোকে এত পরাঙ্মুখ কেন," আমি তাহার উত্তর দিলাম এই যে, "লোকের শুনিয়া শিখিবার বয়স অতীত হইয়া গিয়াছে, তাই তাহারা শুনিয়া শিখিতে পরাঙ্মুখ।"

॥ ১ ॥ তুমি যাহা বলিলে—সবই সত্য ; কিন্তু তথাপি ঐ বিষয়টির সম্বন্ধে একটা বিষম প্রশ্ন আমার মনে উপস্থিত হইয়াছে—সেটার

একটা মীমাংসা আশু প্রয়োজনীয়; কথাটা এই:—মনুষ্য যখন বিপথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হয়, তখন, কচি-বয়সে মাতা কিম্বা ধাত্রী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করে; পঠদ্দশায় শিক্ষক তাহাকে সদুপদেশ দিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করে; কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের পরামর্শ শুনিয়া চলিতে ভার বোধ করে, সে ব্যক্তি যদি কুবুদ্ধির পরামর্শ শুনিয়া বিপথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হয়, তবে কে তাহাকে অসিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করিবে?

॥ ২॥ আমাদের দেশের একটি পুরাতন শাস্ত্রবচন এই যে, "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ" ধর্ম্মকে যে রক্ষা করে, ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করে। গৃহক্ষেত্রে পিতামাতা কচি বালকের **জীবনের** নিয়ামক, শিক্ষাক্ষেত্রে গুরু বয়ঃপ্রাপ্ত বালকের **মনের** নিয়ামক, কর্ম্মক্ষেত্রে বুদ্ধি বিষয়ী লোকের **কর্ম্মের** নিয়ামক; এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। এটাও তেমি দেখা চাই যে, কুশিক্ষা যেমন শিক্ষা নামের যোগ্য নহে, কুবুদ্ধি তেমি বুদ্ধি নামের যোগ্য নহে। সুবুদ্ধিই বুদ্ধি, আর, ধর্ম্মবুদ্ধিই সুবুদ্ধির প্রধানতম আদর্শ। **কর্ম্ম,** করিবার বস্তু, **ধর্ম্ম,** ধরিয়া থাকিবার বস্তু; কর্ম্ম, বুদ্ধির **দাঁড়**; ধর্ম্ম, বুদ্ধির **হাল**। কর্ম্ম-ক্ষেত্রের বিষয়ী লোকেরা যখন বিপথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হয়, তখন, তাহারা আসল বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইতে পারে—কেবল যদি তাহারা ধর্ম্ম-বুদ্ধির কথায় কর্ণপাত করে; তাহা যদি না করে, তবে তার নিস্তার নাই।

॥ ১॥ ধর্ম্ম, বুদ্ধির হাল, তাহা তো বুঝিলাম; কিন্তু কর্ণধার হাল ফিরাইবে কোন্ দিক্ বাগে? কূল বাগে অবশ্য। তবেই হইতেছে য, কূলের ঠিকানা-নির্দ্দেশ করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। দাঁড়, তুমি বলিতেছ কর্ম্মকে, হাল বলিতেছ ধর্ম্মকে, ইহা শুনিয়া আমি পরম আনন্দ লাভ করিলাম; কূল তুমি বলিতেছ কাহাকে, সেইটিই এখন জিজ্ঞাস্য।

॥ ২॥ **কূল** আমি বলি, **পুরুষার্থ**। পুরুষার্থ, স্বাধীনতা, স্বারাজ্য, মুক্তি, শব্দ বটে চারিটা—কিন্তু বস্তু একই। মনুষ্য পক্ষী যখন আপন পক্ষে ভর করিয়া উড়িতে শেখে, উড়িতে শিখিয়া আপনি আপনার নেতা হয়; তখন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী ধর্ম্মবুদ্ধি স্বাধীনতার মুক্ত অরণ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে আহ্বান করে; আর, অন্যা পাপ-বুদ্ধি ক্ষণিক সুখের স্বর্ণ পিঞ্জরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে আহ্বান করে। এক শ্রেণীর পক্ষী অধিদেবতার আহ্বান শুনিয়া মুক্তির মুক্ত অরণ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সুপথে চলে, আর এক শ্রেণীর পক্ষী উপদেবতার আহ্বান শুনিয়া ক্ষণিক সুখের পিঞ্জরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিপথে চলে,—মনুষ্য যখন মানসক্ষেত্রে বিদ্যাবুদ্ধি সংগ্রহ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে স্বপদে ভর দিয়া দাঁড়ায়, তখন সে আপনাকে চালাইবার ভার আপন হস্তে টানিয়া লইয়া স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই তো আর স্বাধীন হওয়া যায় না। স্বাধীন হইতে হইলে স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করা চাই। যাঁহারা স্বাধীনতার মুক্ত অরণ্যের প্রতি লক্ষ্য দিয়া সুপথে চলেন, তাঁহারা স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করেন, আর যাঁহারা ক্ষণিক সুখের স্বর্ণপিঞ্জরের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া বিপথে চলেন, তাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া স্বাধীনতার অযোগ্য হইয়া পড়েন। সুপথ-যাত্রীরা প্রাণপণ চেষ্টায় স্বাধীনতার যোগ্যতা উপার্জ্জন করেন, কাজেই তাঁহারা অভীষ্ট ফললাভে কৃতকার্য্য হন। বিপথ-যাত্রীরা গাছে না উঠিতেই এক কাঁদির জন্য আগ্রহান্বিত হন, কাজেই তাঁহারা অভীষ্ট ফলে বঞ্চিত হন। পুরুষার্থের কূলে পৌঁছিতে হইলে তাহার প্রকৃত উপায় কি—তাহা বলি শোন:—

(১) কূলের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া ঠিক পথে হাল বাগাইয়া ধরিয়া থাকিয়া স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করা চাই।

(২) রীতিমত বিদ্যা শিক্ষা এবং কাজ শিক্ষা করিয়া মাঝ পথের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিবার মতো উপযোগ্যতা লাভ করা চাই।

স্বাধীনতাও যা, স্বরাজও তা, একই; তা'র সাক্ষী—স্বাধীন=স্ব+অধীন অর্থাৎ আপনি আপনার অধীন; স্বরাজ=স্ব+রাজ অর্থাৎ আপনি আপনার রাজা; দুয়ের ভাবার্থ অবিকল সমান।

(নারায়ণ)

হিন্দু ডুবিল

[ডাক্তার শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

জাতির মৃত্যু হয় কিসে?

জাতির মৃত্যু বলিলে আমরা কি বুঝিতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা তিনটী বিষয় দেখিতে পাই। যথা:—

(১) যদি কোন জাতির জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু-সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে জাতি অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

(২) যদি কোন জাতির উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের সংখ্যা হ্রাস পায়, তাহা হইলে সে জাতিও ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহা মনে করা উচিত।

(৩) যদি কোন জাতির লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির হার স্বাভাবিক নিয়ম অপেক্ষা (জগতের অন্যান্য জাতির তুলনায়) হ্রাস পায়, তবে সেই জাতিও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে উক্ত তিনটী কারণই বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। সুতরাং বঙ্গীয় হিন্দুগণ যে অচিরে ইহজগৎ হইতে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে, ইহাতে কিছু মাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা বিস্তারিত ভাবে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১। বঙ্গে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক দৃষ্ট হয়। বিগত ১৯১৮ সনে জন্ম সংখ্যা ছিল ১৩,২৭,১৭৩ এবং মৃত্যু-সংখ্যা ১৭,২৭,৬৩১।

অপেক্ষা মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইলে, আমাদের সমাজ যে অচিরেই ডুবিয়া যাইবে, তাহাতে ত আর কোনই সন্দেহ নাই।

২। বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতির সংখ্যা দিন দিনই (প্রত্যেক সেন্সাসেই) হ্রাস পাইতেছে। ১৮৭২ সন হইতে ১৮৮১ সন পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে ব্রাহ্মণগণ শতকরা ১২ হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তৎপরে তাহার পরবর্ত্তী ২০ বৎসরে অর্থাৎ ১৮৮১ সন হইতে ১৯০১ সন পর্য্যন্ত মাত্র ২ জন হিসাবে বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়াছিল। ১৯০১ সন হইতে ১৯১১ সন পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে সেই ২ জনও হ্রাস পাইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু-সংখ্যা অধিক হইয়াছে। এইরূপ কায়স্থগণ ১৮৭২ সন হইতে ১৮৮১ সন পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে ৩জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী সেন্সাসে ১ জন হিসাবে বাড়িয়াছিল মাত্র। তৎপরে ১৮৯১ সন হইতে ১৯০১ সন পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে বৃদ্ধির হার একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া শতকরা ৮ জন হিসাবে ন্যূন হইয়াছে। কি ভীষণ অবস্থা !!

বঙ্গের শিল্পীরাও অর্থাৎ তাঁতি, কর্ম্মকার, বেণে, সদ্গোপ, মালাকার, কুম্ভকার প্রভৃতি মধ্যম শ্রেণীর হিন্দু সন্তানগণও প্রতি দশ দশ বৎসর অন্তর অন্তর ক্রমেই হ্রাসের দিকে নামিয়া যাইতেছে। কেবল নমঃশূদ্র, বাগ্দী, চামার ও মুচী ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ ও বঙ্গের বহু অনার্য্য জাতীয় ব্যক্তিগণের (যাহারা হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে) সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

বঙ্গের নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ নিম্নলিখিত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে।

বর্ণ		১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১
নমঃশূদ্র	...	১৫০৩৩১৮	১৫১৬১৭৬	১৭৬৮১১৯	১৮৬০৯১৪
মালো	...	৯৪১৬	১৯৪৫৪	৮৮৪৪৩	২২৭৯৮৫
বাগদী	...	৬৯৫২১৯	৭৫৩৮৭০	৮০৪৯৬০	১০৩২০৬৩
চামার ও মুচী	...	১১৭৭১৩৪	১৮০৮০৩৭	১৮৯৭২৬৭	১৬২৬৭৩৭

উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের সংখ্যা কিরূপ ভাবে হ্রাস পাইতেছে, তাহাও দেখুন। নিম্নে বঙ্গের কায়স্থদিগের সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

জিলা		সন ১৮৯১	সন ১৯০১
মেদিনীপুর	.	১২৫২৬	৪১৬৮৬
নদীয়া	...	৩৩৬১৪	৩১৫৭৮
যশোহর	...	৫৯৩০৯	৫৫৪০৯
২৪-পরগণা	...	৫৩৪৩৬	৩৪১৭৭
মুরশিদাবাদ	...	১৪৫৬৬	১২৩৮২
হুগলী	...	২৯১৭৭	২৩৬১০
রাজসাহী	...	৬৭৪৭	৬৩৩১
রঙ্গপুর	...	১০০২০	৮৫৬৫
বগুড়া	...	৬৮২৯	৬৮০২
ঢাকা	...	৮৯৫৮৭	৮৫৯৬৩
বাখরগঞ্জ	...	৯৫৯২২	৭৮১৬৮
ময়মনসিংহ	...	৯৭৫০৭	৯০১৮০
চট্টগ্রাম	...	৭৪২০৬	৭১৪২১
নোয়াখালি	...	৪৫২৫১	৩৪০১৮
ত্রিপুরা	...	৭২৫৫৪	৭০৪১৩

এই হারে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ ক্রমাগতই হ্রাস পাইলে, আর দুই শত বৎসরের মধ্যেই বঙ্গের হিন্দুসমাজ অতল জলে ডুবিয়া যাইবে !!

৩। ১৮৮১ সন হইতে ১৮৯১ সন এই দশ বৎসরে বঙ্গের হিন্দু শতকরা ৩ জন মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জগতের অন্যান্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কেবল ভারতের অন্যান্য স্থানের সহিত তুলনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, বঙ্গীয় হিন্দুগণের জন্মের হার নিতান্ত কম।

ইংলণ্ডে শতকরা ১২.৮ জন হিসাবে লোক সংখ্যা (যুদ্ধের পূর্ব্বে) বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইংলণ্ডে হাজার করা ২৫ কি ২৬ জন জন্ম গ্রহণ করিত ও হাজার করা ১৫ জন মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইত। সুতরাং বিলাতে মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা ১১জন বেশী ছিল। আর আমাদের দেশে জন্ম সংখ্যা হাজার করা ৪২ এবং মৃত্যুসংখ্যা হাজার করা ৪০জন। সুতরাং আমাদের দেশে জন্মসংখ্যায় মাত্র ২জন বেশী। এই সংখ্যা হ্রাস পাইয়া এক্ষণে হাজার করা ১.২জন ন্যূন দৃষ্ট হইতেছে। হায়! জগতে সর্ব্বত্রই মৃত্যু অপেক্ষা জন্মসংখ্যা বেশী, আর এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অত্যধিক। মৃত্যুর হার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। (স্বাস্থ্য-সমাচার)

বাঙ্গালী পেট্রিয়টিজম

[শ্রীপ্রমথ চৌধুরী]

বাঙালীর মনের বিশেষত্ব যে কোথায়, তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাক্। এ পরিচয় দেওয়াট একেবারে অসম্ভব নয় ; কেন না, বাঙালীর national self-consciousness কতকটা প্রবুদ্ধ হয়েছে। এই national self consciousness কথাটা আমাদের স্বদেশী যুগে মুখে-মুখে প্রচলিত ছিল। সেকালে অবশ্য দেশের লোক এ কথাটা তার পলিটিক্যাল অর্থেই বুঝত। তখন আত্মজ্ঞান অর্থে আমরা বুঝতুম, আমাদের পরাধীনতা সম্বন্ধে জাতীয় চৈতন্য ও বেদনা। বলা বাহুল্য, এই সংকীর্ণ অর্থে, সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মজ্ঞান ও বাঙলার আত্মজ্ঞান একই বস্তু। কিন্তু ঐ বোঝাটা ভুল বোঝা। কেন না, তা হলে স্বাধীন জাতের পক্ষে—জাতীয় আত্মজ্ঞান বলে কোন জিনিসই নেই। কিন্তু তা যে আছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, ঐ সমস্ত পদটি ইউরোপ থেকে এ দেশে আমদানি করা হয়েছে, ও পদের বিলেতে জন্ম। কথাটা এতই বিলেতি যে, আমাদের কোনও ভাষায় ওটির সঠিক তর্জমা

মানুষমাত্রেই মুখ্যতঃ এক হলেও, সকলের শরীরের চেহারাও যেমন এক নয়, সকলের মনের চেহারাও এক নয়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যেমন প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে, জাতির সঙ্গে জাতিরও তেমনি প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে। আর ব্যক্তিই বল আর জাতিই বল, উভয়েরই উন্নতির মানে হচ্ছে, এই স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত ক'রে তোলা; কেন না, সেই চেষ্টাতেই তার সুখ, সেই চেষ্টাতেই তার মুক্তি। যাতে করে এই স্বাতন্ত্র্য চেপে দেয়, তাই হচ্ছে বন্ধন। জীবনের বন্ধনের চাইতে মনের বন্ধন কম মারাত্মক নয়। আর আমাদের মনের যে একটা বিশেষ ধাত আছে, সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। একটা জানা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। জাতীয় মনের আসল প্রকাশ সাহিত্যে। বর্ত্তমান ভারতবর্ষে বাঙলা সাহিত্যের তুল্য দ্বিতীয় সাহিত্য নেই। ভারতবর্ষের অপর কোন জাতি দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র কিম্বা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদান করতে পারে নি। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, মনোজগতে আমরা বাকী ভারতবর্ষের সঙ্গে এক লোকে বাস করি নে। আমাদের অন্তরে জ্ঞানের ক্ষুধা আছে, কাব্যরসের পিপাসাও আছে। এর ফলে মনোজগতে আমাদের কাছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এবং সেই কারণে ইয়োরোপের সাহিত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা যতটা আত্মসাৎ করেছি, ভারতবর্ষের অপর কোনও জাত তদনুরূপ পারে নি।

ইয়োরোপীয় শিক্ষা যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের স্বরূপ বিস্তর বদল করেছে, এ কথা আমি মানি; কেন না না-মেনে উপায় নেই। আমাদের পলিটিক্যাল মতামত যে 'ক' থেকে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত আগাগোড়া বিলেতি জিনিস, এ ত সবাই জানে। দেশশুদ্ধ লোকের পলিটিক্যাল-আত্মা যে ইয়োরোপের হাতে গড়ে উঠেছে, এ কথা এক পেশাদার ন্যাসনালিষ্ট ছাড়া আর কারো অস্বীকার করবার প্রয়োজন নেই।

তবে অপর ভারতবাসীর সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই যে, আমরা ইয়োরোপের কাছে এক পলিটিক্স ছাড়া আরো কিছু বিদ্যা আদায় করেছি। ইয়োরোপের কাব্য বিজ্ঞানের প্রভাব আমাদের মনের উপর নিতান্ত কম নয়। Lafcadio Hern-এর বইয়ে পড়েছি যে, সেক্স‌পিয়ারের নাটক—জাপানিদের মনের কোনখানে স্পর্শ করে না। অপর পক্ষে সেক্সপিয়ারের কাব্য আমাদের মনের সকল তারে ঘা দেয়। সে কাব্য আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে এবং সে স্পর্শে আমাদের অন্তরাত্মা পুলকিত হয়ে ওঠে।

শুধু কাব্য নয়, ইয়োরোপের বিজ্ঞানও আমাদের অতি প্রিয় সামগ্রী। এ বিশ্ব আমাদের কাছে শুধু জড়জগৎ নয়, ভাবের জগৎও বটে;— ইন্দ্রিয়ের দর্শনের-স্পর্শনের, মনের ধ্যান-ধারণার বস্তু। আমরা জানি, রস খালি কথায় নেই, বিশ্বেও আছে; রূপ খালি আর্টে নেই, প্রকৃতিতেও আছে। এ বিশ্বের অসীমতা ও অসীম বৈচিত্র্য, তার অন্তর্নিহিত শক্তির ছন্দোবদ্ধ লীলা আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। অনেকেরই মনে আছে। তাই না বাঙালী-যুবক Einstein এর নবাবিষ্কৃত আলোক-তত্ত্বের পরিচয় নিতে এত ব্যাকুল; যদিচ তারা সবাই জানে, এই নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব কণ্ঠে জড়িয়ে নেবার আশু সম্ভাবনা নেই। আমাদের জাতীয় মন জ্ঞানমার্গের পথিক বলেই বাঙলা-জগদীশ বসু প্রফুল্ল রায়ের আবির্ভাব হয়েছে। মনোজগতের বস্তুর প্রতি আমাদের এই আন্তরিক অনুরাগ আছে বলেই, বিজ্ঞানের মন্ত্রভাগ আয়ত্ত করবার বাঙালীর এতটা ঝোঁক।

এ সব কথা শুনে অনেকে হয়ত বলবেন যে, বাঙালীর জ্ঞান, জ্ঞানমাত্রই থেকে যায়, তা কোনও কাজে লাগে না। বিজ্ঞানের যন্ত্রভাগ যে বাঙালী ততটা করায়ত্ত করতে পারে নি, এ কথা সত্য। আমার বিশ্বাস, এ অক্ষমতার জন্য যত না দায়ী আমাদের প্রকৃতি, তার চাইতে ঢের বেশি দায়ী আমাদের অবস্থা। কল কারখানা গড়বার শক্তির অভাব সম্ভবতঃ বাঙালীর নেই, অভাব আছে শুধু সুযোগের। সে যাই হোক, যা সত্য ও যা সুন্দর, তার প্রতি বাঙালী মনের এই সহজ আনুকূল্যের প্রশ্রয় দিয়েই তার জাতীয় জীবন সার্থক করে তোলা যেতে পারে। যেমন ব্যক্তিবিশেষের তেমনি জাতিবিশেষের প্রকৃতির উল্টো টান টানতে গেলে তার জীবনের ব্যর্থতার দিকে অগ্রসর করা হয়। আজ ইউরোপীয় শিক্ষা বয়কট করবার যে হুজুগ উঠেছে, তাতে যে বাঙালী সোৎসাহে যোগদান করতে পারছে না, তার কারণ যে-বাঙালীর চিন্তা করবার অভ্যাস আছে, সেই জানে যে উক্ত শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় শক্তি উদ্বোধিত করবার সর্ব্বপ্রধান উপায়। কোনও জাতির পক্ষে স্বধর্ম্ম হারিয়ে স্বরাট হবার চেষ্টাটা বাতুলতা মাত্র। ভারতবাসী যখন স্বরাজ্য লাভ করবে তখন ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশই তার শিক্ষাদীক্ষার উপর অপর কোনও প্রদেশকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না। প্রতি সবল সজ্ঞান জাতির একটা না একটা বিশেষ জাতীয় আদর্শ থাকে এবং সেই আদর্শ অনুসারেই সে জাতি তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। যার নিজস্ব বলে কোনও জিনিস নেই; অথবা সে নিজত্ব যে রক্ষা করতে বিকশিত করতে না চায়, তার পক্ষে স্বাধীনতার কোন প্রয়োজন নেই; শুধু তাই নয়, তার কাছে উক্ত শব্দের কোন অর্থও নেই। স্বত্বসাব্যস্ত করিবার জন্যই ত স্বাধীনতার আবশ্যক।

আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের পুঁথিপড়া মনের সঙ্গেও বাকী ভারতবর্ষের পুঁথিপড়া মনের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। সুতরাং আমাদের পলিটিক্যাল-মনও অন্য প্রদেশের পলিটিক্যাল-মনের ঠিক অনুরূপ নয়। মনে রেখো, মানুষের পলিটিক্যাল-মনটা তার সমগ্রমনের ঠিক বহির্ভূত নয়, তার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতও নয়। অবশ্য একদলের কংগ্রেস-ওয়ালা আছেন যাঁরা এ কথা মানেন না, যদি মানতেন তাহলে তাঁদের দলে টিকিওয়ালা-ডিমোক্রাট-রূপ অদ্ভুত জীবের এতটা প্রাধান্য হত না।

ডিমোক্রাটিক স্বরাজ্য লাভ করতে হলে আমাদের মনের যে বদল আবশ্যক, এ জ্ঞান আমাদের যুবক শ্রেণীর মনে যে প্রবেশ করেছে তার পরিচয় আমি পাঁচজনের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় নিত্যই পাই।

লোককে দাস ও স্ত্রীলোককে দাসী করে রাখব অথচ পৃথিবীর ডিমোক্রাটিক জাতিদের মত রাজনৈতিক জগতে স্বরাট হব, এরূপ মনোভাব যে যুগপৎ লজ্জাকর ও হাস্যকর, এ ধারণা এ যুগের বহু-বাঙালীর মনে জন্মেছে। তবে এ মনোভাব যে আমাদের দৈনিক সংবাদ পত্রে ও বক্তৃতার রঙ্গমঞ্চে গজে ওঠে নি, তার কারণ নিজের বিরুদ্ধে হুজুগ করা চলে না। যে ভাব মনে পোষণ করবার জন্য, যে কাজ করবার জন্য আমরা মনে মনে লজ্জিত হই তা নিয়ে প্রকাশ্য ঢাক পেটানো অসম্ভব, আমরা ঢাক পেটাতে পারি শুধু আমাদের কাল্পনিক আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা নিয়ে। কতকটা শিক্ষার বলে কতকটা পরীক্ষার ফলে আমরা আমাদের প্রকৃতি ও শক্তি দুয়েরই কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করেছি। নিজের ত্রুটির জ্ঞানও আত্মজ্ঞানেরই একাংশ। এবং আত্মজ্ঞান আমাদের মনে জন্মেছে বলে, তারই উপর আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে চাই। আমাদের অন্তরের বল আমরা পুষ্ট পরিপুষ্ট করতে চাই, তাই আমরা শিক্ষার জাতি-বিচার ক'রে তাকে আচরণীয় কিম্বা অনাচরণীয়ের কোঠায় ফেলতে চাই নে, আর আমাদের দুর্ব্বলতা আমরা পরিহার করতে চাই বলে, আমরা লোকের জাতিবিচার ক'রে তাকে আচরণীয় কিম্বা অনাচরণীয় করে রাখা, পেট্রিয়টিক কাজ বলে মনে করি নে। কোন জাতির পক্ষে তার চিরাগত সংস্কার থেকে মুক্তিলাভ ক'রে নবজীবন ও নব-শক্তি লাভ করা সহজসাধ্য নয়, এবং সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করবার সাধন-পদ্ধতির নাম রাজনৈতিক হুজুগ নয়, কেন না, ক্ষণিক উত্তেজনার পিঠ পিঠ আসে স্থায়ী অবসাদ। জাতীয় ঐশ্বর্য্য অবশ্য জাতীয় কৃতিত্বের উপর গড়ে ওঠে। এবং সে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় সাহিত্যে ও সমাজে, দর্শনে ও ধনে, বিজ্ঞানে ও আর্টে। মানুষের পক্ষে কিছু ত্যাগ করা, যথা উপাধি কিম্বা ওকালতি, শুনতে পাই মহা কঠিন; কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি কঠিন, কিছু করা, অর্থাৎ—কৃতী হওয়া। জীবনের কাছ থেকে পালানো সহজ, তার সঙ্গে লড়ে জয়ী হওয়াই কঠিন; কেন না, এ লড়াই চিরজীবন-ব্যাপী,—এক মুহূর্ত্ত তার বিরাম নেই। দেখতে পাচ্ছ, আমি রাজসিক মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছি। একে আমি বৈদিক-তান্ত্রিকসমাজে জন্মগ্রহণ করেছি, তার উপর আবার ইয়োরোপের রাজসিক সভ্যতার আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি; সুতরাং আমার কাছ থেকে তুমি অন্য কোনও মনোভাবের পরিচয় পাবার আশা করতে পার না। রাজসিক মন সাত্ত্বিক মনের চাইতে নিকৃষ্ট কি না বলতে পারি নে; তবে তা যে তামসিক মনের চাইতে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। আর এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, দেশে আজকাল যে সকল মনোভাব সাত্ত্বিক বলে চলছে, সে সব পুরোমাত্রায় তামসিক। সে সবের মূলে আছে অজ্ঞতা আর ঔদাসীন্য,—এক কথায়,মনের জড়তা।

আমি বিশ্বাস করতে ভালবাসি যে, আমার মন এ যুগের বাঙলার মন। যদি তাই হয়, ত, বাঙালীর nationalism-এর আদর্শ যে কি, পরানো আমাদের আদর্শ হ'তে পারে না। আজকের দিনে বাঙালীর যদি কোনও আন্তরিক প্রার্থনা থাকে ত সে এই—

"বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।"

কিন্তু এ প্রার্থনা কোনও বাইরের শক্তির কাছে নয়; নিজের অন্তরনিহিত শক্তির কাছে। কারণ, এ সত্য আমরা আবিষ্কার করেছি যে, বিদ্যা যশ লক্ষ্মী রূপ জয় এ সকলই আত্মবলে অর্জ্জন করতে হয়,—প্রার্থনা বলে নয়। যদি কেউ বলেন যে, এ Ideal-এর মধ্যে ত self-sacrifice এর কথা নেই, তার উত্তর আমি দেব, self-sacrifice কোনও জাতির আদর্শ হতে পারে না,—জাতির পক্ষে একমাত্র আদর্শ হচ্ছে self-realisation. আর তার একমাত্র উপায় হচ্ছে, বহুলোকের পক্ষে self-realisation-এর ব্রত অবলম্বন করা।

আমার শেষ কথা এই যে, যে দেশকে আমি অন্তরের সহিত ভালবাসি, সে বর্ত্তমান বাঙলা নয়, অতীত বাঙলাও নয়,—ভবিষ্যৎ বাঙলা; অর্থাৎ—যে বাঙলা আমাদের হাতে ও মনে গড়ে উঠছে। সুতরাং আমার বাঙালী পেট্রিয়টিজম বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় পেট্রিয়টিজমের বিরোধী নয়। আর এক কথা, যে ন্যাসনালিজম বিদ্বেষবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ন্যাসনালিজমের ফলে শুধু পরের নয়, নিজেরও যে সর্ব্বনাশ হয়, গত ইয়োরোপীয় যুদ্ধ, এই সত্য, যার চোখ আছে, তারই চোখের সুমুখে ধরে দিয়েছে। (সবুজ-পত্র)

জমাখরচ।

[স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর,সি আই-ই]

অনেক ভাবিলাম, কিন্তু তথাপি আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের জন্য একটী শ্রুতিমধুর, প্রাণস্পর্শী ও রসপূর্ণ নাম খুঁজিয়া পাইলাম না। যে দেশের বক্তা ও শ্রোতা, লেখক ও পাঠক সকলেই রসের সমুদ্রে দিবারাত্রি হাবুডুবু খাইতেছে,—যে দেশে পথ্য-পাচন ও কটু-কষায় ঔষধাদির বিজ্ঞাপনেও কাব্যের নবরস উছলিয়া পড়িতেছে, সে দেশে এইরূপ 'নীরস নিঠুর' জমাখরচের কথা যে কাহারই চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিবে না, তাহা আমি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারি। কিন্তু বুঝিয়াও যে নিবৃত্ত হইলাম না, তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। সেই কারণ এই যে,—জমাখরচের কথা বাহিরে যতই কঠোর হউক না কেন, ভিতরে উহা বড় মধুর। যাঁহারা একটুকু ধৈর্য্য, একটুকু সহিষ্ণুতা মাত্র অবলম্বন করিয়া এই বিশ্বব্যাপী গভীর তত্ত্বের বাহিরের আবরণটি অতিক্রম করিতে পারিবেন, আমি শপথপূর্ব্বক বলিতে পারি, তাঁহারা ইহার অভ্যন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় রসের আস্বাদ পাইয়া চরিতার্থ হইবেন। কারণ স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের গতি, সমাজের উন্নতি

এবং এই বিশ্বযন্ত্রের নিত্য বিবর্ত্ত, এই সমস্তই জমাখরচের কথা। আমার এই সিদ্ধান্ত সত্য কি মিথ্যা, এসব ক্রমে ক্রমে আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি।

প্রথমতঃ স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের গতি এই তিনটি দ্বারাই পরীক্ষা করিয়া লও। এই তিন নামতঃ পৃথক্ হইলেও পরস্পর বড় ঘনিষ্ঠ। সুতরাং ইহাদের কথা লইয়া একসঙ্গে বিচার করিলে বিচার শৃঙ্খলার কোনরূপ বিপর্য্যয় হইবার শঙ্কা নাই।

স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের গতি এই তিনের সহিত জমাখরচের কোন সম্পর্ক আছে কি? চিকিৎসক বলিবেন,—আছে। কেন না, তিনি শত সহস্র পরীক্ষায় দেখিয়াছেন যে, যাহার জমা অপেক্ষা খরচ বেশী, সে ঋণগ্রস্ত, সে চিন্তায় জীর্ণ এবং যে চিন্তার আগুনে চির-জীর্ণ, সে ঔষধের অসাধ্য। সুতরাং স্বাস্থ্যভঙ্গের সহিত তাহার সুখ-ভঙ্গ এবং সুখভঙ্গের সহিতই তাহার জীবনের নিত্য কিংবা নৈমিত্তিক গতির ক্রমভঙ্গ। ঘরের গৃহিণীও বলিবেন আছে। কারণ, তিনি দেখিয়াছেন যে, ঘরে যখন খাবার না থাকে,—কোলের শিশু যখন অন্নের জন্য লালায়িত হয়, এবং প্রাপক যখন তাহার খাতাপত্র লইয়া প্রহরীর মত দ্বারে বসিয়া চীৎকার করে, তখন সিদ্ধৌষধ সুবাসিত তিল তৈলেও গাত্রদাহ শীতল হয় না,—রসের কথায়ও মুখে হাসি ফোটে না এবং বসন্তের সমীর, ভ্রমরের গুঞ্জন, অথবা বাসন্তী পূর্ণিমার বিলাসময়ী জ্যোৎস্না ইহার কিছুতেই তখন শরীর কি মন স্নিগ্ধ রাখিতে পারে না। স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের গতির সহিত জমাখরচের যে অতি নিকট সম্পর্ক আছে, আরও অনেকে অনেক প্রকারে এ কথার সাক্ষ্যদান করিতে পারেন। কারণ জমার অঙ্ক খরচ অপেক্ষা অধিক না হইলে, হাতে অর্থ থাকে না। অর্থ না থাকিলে স্বাস্থ্যরক্ষা কিংবা সুখের উপযোগী প্রয়োজনীয় বস্তুও আহরণ হয় না—শরীরে ও মনে সামর্থ্য থাকে না, সমাজ-শক্তির সঞ্চালন বিষয়ে ক্ষমতা রহে না, স্নেহ মমতা ও দয়া প্রভৃতি মনোবৃত্তি-নিচয় ফুটিবার অবকাশ পায় না, এবং জীবনের স্রোত সুনীতির সুখাবহ পথে প্রবাহিত হইতে পারে না। এ সকল কথা সকলেই জানে, সকলেই বুঝে, সকলেই পরকে বুঝায়। কিন্তু স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের সহিত জমাখরচের ইহা অপেক্ষাও নিগূঢ়তর সম্পর্ক আছে। আমি পাঠককে সেইটিই সংক্ষেপে বুঝাইতে যত্নবান হইব।

স্বাস্থ্য কি? বিজ্ঞান বহু শতাব্দীর পরীক্ষায় ইহা জানিতে পারিয়াছে যে, জীবনীশক্তির জমাখরচের সাম্যের নাম স্বাস্থ্য। এবং এ বিষয়ে যাহার জমাখরচে মিল আছে, সেই সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ। যখন ক্ষুধা লাগে, তখন আমরা খাই; যখন তৃষ্ণা বোধ হয়, তখন আমরা পান করি, এবং শরীর যখন নিদ্রার আলস্যে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন আমরা চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকি। কিন্তু কেন আমাদের ক্ষুধা লাগে,—কেন আমরা আহার করি,—কেন তৃষ্ণাতুর হইয়া জলপানে জীবন জুড়াই,—কেন বিশ্বের সকল সুখ ও সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া ছায়াময়ী নিদ্রার ক্রোড়ে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিবার জন্য অধীর হই, তাহা আমরা বুঝি কি? বুঝিলে আমরা প্রতিক্ষণেই অনুভব করিতাম যে, এ সকল কার্য্য জীবনগত জমাখরচের প্রকৃত প্রক্রিয়া, সুতরাং কোন মতেই অবহেলার বিষয় নহে। তুমি হাসিতেছ অথবা কাঁদিতেছ, পায়ের জোরে আস্ফালন করিতেছ; দূর পথ হাঁটিয়া যাইতেছ,—নাচিয়া গাইয়া দিন কাটাইতেছ, অথবা গভীর নিশীথে দীপালোকের সম্মুখে বসিয়া বর্ণের সহিত বর্ণ যোজনা দ্বারা বিনা সূতে হার গাঁথিতেছ। ইহার প্রত্যেক কার্য্যেই তোমার তহবীল হইতে অল্প বা অধিক পরিমাণ খরচ হইতেছে। আবার তুমি বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া শীতল হইতেছ, পানভোজনে পুষ্টিলাভ করিতেছ, অথবা প্রিয়সমাগমে পুলকিত হইয়া জ্যোৎস্নায় বসিয়া প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীল সৌন্দর্য্য ধ্যান করিতেছ। ইহার প্রত্যেক কার্য্যেই তোমার তহবীলে অল্প বা অধিক পরিমাণে জমা হইতেছে। এইরূপে তোমার জীবনের খাতায়ও জমাখরচের কার্য্য প্রতি মুহূর্ত্তে ও প্রতিক্ষণে কিরূপ অবিরত অব্যাহত চলিতেছে তাহা ভাবিয়া দেখ।

প্রাচীনেরা এই সকল কথার অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং এজন্যই তাঁহাদিগের মধ্যে প্রাণায়াম ও কুম্ভকাদি যোগ এবং সংযত জীবনের এত আদর। কিরূপে শরীরের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় এবং মনের প্রত্যেক বৃত্তিকে সংযমের অধীন করিয়া অতিক্রিয়া ও অতিক্ষয় হইতে বিনিবৃত্ত রাখা যায়, তাঁহারা অশেষ প্রকারে ইহার আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ ভাবে দীর্ঘজীবী হইয়া জীবনের চরম সময়েও সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার ও নানাবিধ সারগর্ভ সন্দর্ভ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারাই তাঁহারা তাঁহাদিগের শক্তিসাম্যের পরীক্ষা দিয়াছিলেন। যাঁহারা আধুনিক আয়ুর্ব্বিদ্যার প্রধান অবলম্বন, তাঁহারাও এই তত্ত্ব পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই (moderate living) সংযত সংখ্যা ও নিয়মিত জীবনের ফল ব্যাখ্যায় তাঁহাদিগের এত উৎসাহ ও এত আদর। তাঁহার স্বাস্থ্য সুখ ও জীবন রক্ষা বিষয়ে নানারূপ দৃষ্টান্ত ও নানাবিধ উদাহরণ যোগে যাহা কিছু লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, তাহার সারকথা জমাখরচ। তাঁহারা আমাদিগকে জমাখরচের হিসাব বুঝাইতেই প্রাণপণে প্রয়াসপর রহিয়াছেন। কিন্তু আমরা কদাচিৎ কখনও বুঝিতে বুঝিলেও, কার্য্যতঃ সেই জমাখরচের নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলি কি? আমরা প্রবৃত্তির দুর্ব্বার বেগে এক ঘণ্টায় এক দিনের জীবন এবং সুতরাং একমাসে দুই বৎসরের জীবন অতিবাহিত করিয়া তর তর বেগে ধাইয়া যাইতে ইচ্ছা করি এবং জীবনী শক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণে ও আহারাদির পরিশোধনে আমাদিগের তহবীলে যাহা কিছু উপচয় হয়, আমরা আকাঙ্ক্ষার আবেগে তাহার বিগুণ বল অপচয় করিয়া আমাদিগের জমা অপেক্ষা খরচ বাড়াইয়া অচিরেই ফেইল হইয়া পড়ি। স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের গতির সহিত জমাখরচের যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, বোধ হয় পাঠক এক্ষণে তাহা ভাল রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন।

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, সমাজের উন্নতি ও অবনতিরও সার কথা

জমা ও খরচ। গৃহস্থের যেমন গৃহস্থালী, সমাজের তেমন সামাজিকতা। একজন লইয়া আত্মতত্ত্ব, সমাজ লইয়া সমাজতত্ত্ব। একজনের স্বতন্ত্র জীবনেও যে বিধি ব্যবস্থা, সমাজের সম্মিলিত জীবন লইয়াও আয় ও ব্যয় অথবা সামাজিক শক্তির উপচয় ও অপচয় সম্পর্কে সেই বিধি ব্যবস্থা। সমাজের তহবীলে স্বাস্থ্য চাই, সুখ চাই। ধন-বল, জন-বল, বাহু বল, বুদ্ধি বল, জ্ঞান বল ও ধর্ম্ম বলে নিত্য নূতন সঞ্চয় চাই। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তেই সমাজের এ সমস্ত শক্তির আংশিক অপচয় হইতেছে, সুতরাং প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তই যদি সমাজের তহবীলে এ সমস্ত শক্তির আংশিক উপচয় না হয়, তাহা হইলে ক্রমে সমাজ দুর্ব্বল ও কালে সমাজ দেউলিয়া হইয়া পড়ে এবং যাহারা দেউলিয়া হইয়া পড়ে তাহারা যেমন হয় কাহারও গলগ্রহ হইয়া ঘৃণিত জীবন যাপন করে, না হয় একবারে উচ্ছন্ন যায়, দেউলিয়া সমাজও হয় কোন প্রবলতর সমাজের পদানত হইয়া কোন প্রকারে জীবিত থাকে, না হয় পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে একবারে বিলুপ্ত হয়।

ভারতীয় আর্য্যসমাজের তহবীলে যাহা কিছু বুদ্ধিবল ও বাহুবল ছিল, ভারতপ্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাহা প্রায় নিঃশেষ খরচ হয়। ইহার পরিণাম-ফল বীর-প্রসবিনী ভারত বক্ষে মুসলমানের বিজয় পতাকা। আবার ইংরেজ যখন লালফিতা, লাল সূতা ও লাল রঙ্গের নানাবিধ কাচের সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া এবং হাতে টুপি, কাঁধে ব্যাগ, চোখে মিষ্ট চাহনি এবং মুখে মিষ্ট কথার মধু লইয়া এদেশে বাণিজ্য করিতে আইসে, তখন ভারতবাসী মুসলমান-সমাজ সামাজিক তহবীলের সমস্ত শক্তি ভোগ-বিলাসের রসোল্লাসে লুটাইয়া দিয়া প্রায় ফেইল হইয়া বসিয়া আছে। ইহার পরিণামফল পলাশির যুদ্ধ অথবা পাঁচশত ইংরেজের নিকট পঞ্চাশত সহস্র মুসলমানের পরাভব।

সমাজের পৃথক্ পৃথক অঙ্গ লইয়াও জমাখরচের এই কথা। এ দেশের ব্রাহ্মণ-সমাজের তহবীল যখন জ্ঞানে, গুণে ও ব্রহ্মতেজে পরিপূর্ণ, তখন ব্রাহ্মণই এ দেশের সর্ব্বতঃ প্রতিষ্ঠিত প্রভু এবং সর্ব্বময় কর্ত্তা। তখন বনে রহিয়া বাকল পরিয়া এক আহারে, ব্রাহ্মণ জীবন যাপন করিয়াছে, তথাপি সমগ্র দেশের সামাজিক জীবন তাহারই আদেশে গঠিত, চালিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত হইয়াছে;—রাজা মহারাজ ও মহারাজাধিরাজ রাজেন্দ্র সদৃশ ব্যক্তিরা তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছে, স্বয়ং বাসুদেবের বক্ষ ভৃগু-পদলাঞ্ছনে শোভা পাইয়াছে। এইক্ষণ সেই ব্রাহ্মণ দেউলিয়া পড়িয়া, ব্রহ্মণ্য তহবীলের সকল ধন খোয়াইয়া, কোথাও পাচক, কোথাও ধাবক, কোথাও ভণ্ড স্তুতি-পাঠকের কদর্য্য বৃত্তি অবলম্বনে কষ্টেসৃষ্টে জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে এবং হায় কি ছিলাম,—হায় কি হইয়াছি, ব্রহ্ম-গায়ত্রীর এই নীরব বিলাপে বিষাদ ও কলঙ্কের নীরব গীত গাইতেছে। পক্ষান্তরে হস্তি কর্ত্তৃক পদতলে দলিত হইলেও যাহাদিগের গৃহ প্রবেশ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ছিল, তাহারা ধন-বলে বলীয়ান হইয়া এক্ষণ সমাজের উপর প্রভুত্ব করিতেছে এবং কোন শাস্ত্রে যাহাদিগের অধিকার ছিল না, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার লাভ করিয়া সমাজ-শক্তির উপর সোয়ার হইয়া বসিয়া আছে, সমাজের উপর বিধিব্যবস্থা চালাইতেছে; জমাখরচের নিয়মই এরূপ অনুল্লঙ্ঘনীয়। মধু থাকিলেই মাছি জোটে। যেখানে মধু নাই, মাছির কথা দূরে থাকুক, পিঁপড়াও পদচালনা করে না।

(ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন)

অন্যমনস্ক

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ]

শ্রীমান মনোমোহন বাবু
থাকেন সদাই অন্যমনে।
শুতে চলেন পায়খানাতে,
খেতে চলেন ধুতরো বনে॥
মশারিটায় চাদর বলে'
কাঁধে ফেলে গেলেন চলে'
একদা এক চাঁড়াল-বাড়ী
মেয়ের পাত্র অন্বেষণে।

উল্টে পরেন জুতা-জামা,
হাতেও ভুলে পরেন মোজা;
সারাবাড়ী কলম খোঁজেন,—
কলম কিন্তু কাণে গোঁজা।
মুখে চুরুট নিতে ভুলে
আগুন ধরান গোঁপের চুলে,
টিনচার আইডিন মেখে চলেন
স্নান করিতে ইষ্টেসনে॥

গোঁপ কামাতে কামান ভুরু ;
কাটেন টেরী জুতার ব্রুশে ;
খোসাগুলো গিলে, কলা
ছুঁড়ে ফেলেন চুষে-চুষে।
মাছের মুড়ো মনে করে'
মুখে তুলেন বিড়াল ধরে' ;
ছড়ি ভেবে শাবল হাতে
দুপুর-রাতে যান ভ্রমণে॥
দুপুরবেলা ঘুমিয়ে উঠে
ভাবেন বুঝি হলো ভোর !
নোটগুলো ডাক-বাক্সে ফেলে
খামটা করেন ইনসিওর।

একদা তাঁর লাঠিটিরে
খাটে রেখে শুইয়ে ধীরে,
আপনাকেই লাঠি ভেবে
দাঁড়িয়ে ছিলেন একটা কোণে।
তবলা ভেবে যেদিন তিনি
স্ত্রীয়ের মাথায় মেলেন চাটী,
সেদিন নিজের অবস্থাটা
হঠাৎ বুঝে নিলেন খাঁটী।
জানি নে ঠিক সে দিন ভ্রমে
আপনাকে কোনো ক্রমে
সেতার ভেবেছিলেন কি না
কর্ণ দুটীর বিমর্দ্দনে॥

অভাগিনী

[অধ্যাপক শ্রীহিরণকুমার রায় চৌধুরী বি-এ]

"আর একটু জল দে ফতি"—রোগ কাতর-কণ্ঠে রহমৎ পার্শ্বে উপবিষ্টা পত্নীর নিকট জল চাহিল। ফতেমা সযত্নে রহমৎকে একটু জল দিয়া বলিল, "আর কত জল খাবে ; সারাদিন তোমার উপবাস গেল। এমনি পোড়া অদৃষ্ট যে, আজ দু'দিনের মধ্যে সামান্য পথ্যটুকুও দিতে পাল্লেম না।" যাতনায় হাঁপাইতে-হাঁপাইতে রহমৎ উত্তর করিল, "আর পথ্য ! আজ দু'দিন তুই আমার শিয়রে বসে,—এক মুঠা ভাত, হা আল্লা—" সে আর বলিতে পারিল না। শীর্ণ নয়নপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

পীরপুরে রহমৎ সেখের অবস্থা এক সময়ে বেশ ভালই ছিল। তাহার তিন-চারিখানি লাঙ্গল ও পনের-ষোলো বিঘা জমি ছিল। সংসারে স্ত্রী ব্যতীত তাহার আর কেহই ছিল না। কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না। কয়েক বৎসরের অনাবৃষ্টি ও মড়কে তাহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। এক-এক করিয়া সমস্ত গরু কয়টী তাহার মরিয়া গেল। খাজনা দিতে অসমর্থ হওয়ায় ক্রমশঃ সামান্য দু'-এক বিঘা ব্যতীত, আর সমস্ত জমিই নীলামে বিক্রীত হইল। আজ রহমৎ দরিদ্র, পীড়াগ্রস্ত। অন্নাভাবে ফতেমা দুইদিন অনাহারে—রহমৎও পথ্যবিহীন।

দারিদ্র্য-কবল-নিপীড়িত রহমৎ তাহার বিগত জীবনের ইতিহাস মাঝে-মাঝে স্মরণ করিত। সে একদিন ছিল, অভাব যখন তাহার নিকট সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। জীবনের সেই অম্লান, আঘাত-বেদনাহীন প্রভাতে অসীম উদ্যমে, বিপুল শক্তিতে সে সংসার-পথে অগ্রসর হইয়াছিল। প্রতি দিবসের প্রতি তুচ্ছ ও বৃহৎ ঘটনা তাহাকে নব-শক্তি দান করিত। বৃহৎ আঙিনা তাহার স্বর্ণাভ, সুপক্ক, স্তূপীকৃত ধান্যে পরিপূর্ণ থাকিত। অনশন-ক্লিষ্টা সুন্দরী ফতেমা তখন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীশ্রীর ন্যায় তাহার গৃহমহিমা বর্দ্ধন করিত ; শান্তি ও প্রীতি তাহার দাম্পত্য জীবনে কি মধুরতাই দান করিয়াছিল। আত্মবর্গের সৌহৃদ্যে ও বন্ধুগণের স্নিগ্ধভাষণে তাহার দিনগুলি কি সুখেই অতিবাহিত হইত। কিন্তু কোথায় আজ সেদিন !—কোথায় !

জলপানে সুস্থ হইয়া রহমৎ বলিল, "ফতি, আমার বড় ভাবনা জমিদারের খাজনার জন্য। যে রকম অত্যাচারী সে, তাতে মনে হয় কোন্‌দিন বেইজ্জৎ না করে।" দৃপ্ত কণ্ঠে ফতেমা উত্তর করিল, "বেইজ্জৎ করবে কাকে ? আমাকে ? তুমি নিশ্চিন্ত থাক। জমিদার যত অত্যাচারী হ'ক না কেন, ফতেমার উপর অত্যাচার করে, এ ক্ষমতা

আজও তার হয় নি। খাজনা বাকী—তুমি সেরে ওঠো তার পর মজুরী করে শোধ দিও। জমিদার ত মানুষ—বুঝিয়ে বোল্লে, তোমার এ অবস্থা দেখলে,—নিশ্চয় সে শুনবে।"

ফতেমার আশ্বাসবাণী শুনিয়া রহমতের পাণ্ডুর অধরে ম্লান হাসিরেখা ফুটিয়া উঠিল। ফতেমার হাতখানি নিজ হস্তে লইয়া বলিল, "তোর ওপর অত্যাচার সে করতে পারবে না, তা আমি জানি ফতি। কিন্তু খাজনার কথা সে কখনো শুনবে না। সে ত মানুষ নয়—শয়তান। আমাদের আগের জমিদার ছিল দেবতা,—এ হয়েছে এখন শয়তান। ফতি, আমাদের সুখের দিন চলে গেছে, আর ফিরে আসবে না।"

রোরুদ্যমানা ফতেমা অশ্রু-অন্ধ নয়নে পরম স্নেহভরে রহমতের ললাটে ও মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিল। পত্নীর সেবা ও সান্ত্বনায় রহমৎ ক্রমশঃ আশ্বস্ত হইয়া, শিশুর ন্যায় তাহার অঙ্কে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

অত্যন্ত সন্তর্পণে ফতেমা ধীরে-ধীরে রহমতের মস্তক উপাধানে ন্যস্ত করিয়া মৃদুপদ-সঞ্চারে বাহিরে আসিল; এবং পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিয়া, একটী পেটরা খুলিয়া, কলঙ্কমলিন একযোড়া সুবর্ণ-বলয় বাহির করিয়া, বহুক্ষণ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। তাহাদের সৌভাগ্য-সূর্য্য যখন দীপ্তোজ্জ্বল ছিল, তখন একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে রহমৎ তাহাকে বড় আদরের সহিত এই কঙ্কণদ্বয় উপহার দিয়াছিল। বিহঙ্গমাতা যেরূপ সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝা বা প্রবল বাধার মধ্যে শাবককে পক্ষপুটে আবৃত রাখে, সেও তেমনি একান্ত স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ সর্ব্বশেষ বলয় দুটীকে তাহাদের ভীষণ অভাব হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ইহাদের সহিত তাহার কত সাধ, কত স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। তখন তাহারা নূতন পথের যাত্রী। মোহিনী আশার মাদকতায় বিশাল ধরণী গোলাপবর্ণে অনুরঞ্জিত। প্রেমের অঞ্জনে পৃথিবীর সমস্ত বৈষম্য ও কুটীলতা নয়নসমক্ষে মুছিয়া যাইত। মৃদু পুলক-শিহরণ যেন প্রতিনিয়ত ভিতরে-বাহিরে বহিয়া যাইত। আর আজ জীবনের অনতীত মধ্যাহ্নে ব্যর্থতা মূর্ত্তিমান অভিশাপের মত প্রতিপদে তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। ফতেমার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া কি এক গুরু বেদনা বিপুল বলে পীড়া দিতে লাগিল। অসহ্য যন্ত্রণায় অভাগিনী শরাহত কপোতীর ন্যায় গৃহতলে লুঠাইয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে নিজেকে সংযত করিয়া ফতেমা রহমতের নিকট ফিরিয়া গেল। রহমৎ নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে দেখিয়া, দ্রুতপদে তাহাদের প্রতিবেশী কপিলদ্দি পরামাণিকের স্ত্রীর নিকট বলয় দুইটী বন্ধক রাখিয়া দশটী টাকা লইল এবং স্বামীর জন্য পথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া গৃহে ফিরিল।

রহমৎ তখন নিদ্রাভঙ্গে দ্বারপানে চাহিয়া উৎসুক নেত্রে ফতেমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহাকে পথ্যাদি হস্তে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, সে বিস্মিত হইয়া, কোথা হইতে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিল। ফতেমা যখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনার বর্ণনা করিল, তখন রহমৎ বালকের ন্যায় অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিল। ফতেমা স্নিগ্ধ-নম্র বচনে তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "তুমি পুরুষ মানুষ, অত অস্থির হ'লে চল্‌বে কি ক'রে? ভাল হয়ে ওঠো, আবার আমাদের সব হবে। ও বালা ফিরিয়ে আনতে আর ক'দিন। তুমি ভাল হ'লে, আবার সব আসবে।" রহমৎ অশ্রুজল মার্জ্জনা করিয়া বলিল, "খোদার মর্জ্জি, ফতেমা।"

* * * *

আজ কয়েকদিন বেশ বর্ষা পড়িয়াছে। সমস্ত আকাশ ছাইয়া খণ্ড, ছিন্ন মেঘরাশি বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সন্ধ্যার মসীচ্ছায়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে। রোগ-কৃশ রহমৎ ধীরে-ধীরে পিচ্ছিল গ্রাম্য পথ দিয়া মাঠ হইতে ফিরিতেছিল। কপিলদ্দি পরামাণিকের দুই বিঘা জমি চাষ করিয়া দিবে, এই অঙ্গীকারে সে নিজের দুই বিঘা চাষের জন্য তাহার দুইটী গরু ধার পাইয়াছে। কপিলদ্দির চাষ পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে নিজের চাষ সমাপ্ত করিয়া সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।

অতি প্রত্যুষে দুটী সামান্য পান্তা ভাত খাইয়া সে মাঠে গিয়াছিল। সারাদিনে গুরু পরিশ্রম সত্বেও আর কিছুই জোটে নাই। বলদ দুটীর ন্যায় সেও হাঁপাইতেছে। কুটীর সদনে আসিতেই ফতেমা তাহাকে সযত্নে বারান্দার এক পার্শ্বে "চেটাই" পাতিয়া দিল; এবং এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া কপিলদ্দির গরু দুটী দিয়া আসিল।

আহারের পর রহমৎ যখন নিশ্চিন্ত চিত্তে তামাক টানিতেছিল, ফতেমা তখন তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ধীরে-ধীরে বলিল, "আজ জমিদারের পাইক তোমার সন্ধানে এসেছিল।" চমকিত হইয়া রহমৎ হুঁকা রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ব'লে গেল? আমাকে কি কাছারীতে যেতে হবে?" "তা'রা সে কথা কিছুই বলে নি। খাজনার তাগাদী দিয়ে গেল, আর বল্লে, 'জমিদারের ছেলের ভাত দেওয়া হবে; প্রজারা টাকায় চার আনা করে 'মাথট' দেবে।'"

একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া রহমৎ বলিল, "মাথট? দু'বেলা পেট ভ'রে দু'মুঠা ভাত যোটে না,—সারা বছরের মধ্যে ঘরের চালে দু' আঁটী খড় দেবার ক্ষমতা হ'ল না,—'মাথট' কোথা হ'তে আসবে? 'মাথট' দিতে পাল্লে ত গত সনের খাজনাও দিতে পাত্তাম।"

বিষাদিনী ফতেমা উত্তর করিল, "সবই সত্যি। কিন্তু জমিদার কি তার পাওনা ছাড়বে? খাজনা ত দিতেই হবে,—তার সঙ্গে 'মাথট'ও আদায় কোরবে।" ভগ্ন কণ্ঠে রহমৎ বলিয়া উঠিল, "আর যে কিছু নেই আমাদের, ফতি? সম্পত্তির মধ্যে একটা ছেঁড়া মাদুর, দুখানা সান্‌কি ও একটা ঘটী;—এর বদলে 'মাথটের' টাকা আসবে কোথা থেকে? যে কটা ধান পাওয়া যাবে, তাতে সব দেনা শোধ হবে না।" সান্ত্বনার সুরে ফতেমা বলিল, "যাক্, ও-সব, এখন থেকে ভেবে কি হবে। যেমন ক'রেই হোক্ আল্লা একটা উপায় করে দেবেই দেবে। যিনি জীব দিয়েছেন, তিনিই আহার দেবেন। তুমি আমি ভেবে কি করবো।" হতাশা-নিপীড়িত রহমৎ বলিল, "গরীব-দুঃখীর কষ্ট বোঝবার কেউ নেই বৌ! দুটো অন্ন পেটে গেল কি না,—তা এত বড় দুনিয়াটা,—একবারও চেয়ে দেখে না। আর কি বেইমান এই দুনিয়া। এই কপিলদ্দি পরামাণিককে দেখ, বাপ ছিল না, মা ছিল না—আপনার বোল্‌তে কেউই ছিল না। বাপজান্ কত আদরের সঙ্গে মানুষ করেছে। জমিদারের কাছে সেলামী দিয়ে জমি দিইয়েছে; তবেই তো এখন নয়সার মুখ দেখ্‌ছে। আর তুই সেদিন সকলের শেষ-সম্বল বালা দু গাছা বাঁধা দিয়ে টাকা আনলি, তবে আমাদের খোর-পরিষ্ হোল। একমুঠো চাল চাইলি, তা ধার তার ছেলে গরু দুটো চাইলাম,—বল্লে কি না, 'দু' বিঘে ভুঁই যদি চাষ দিয়ে দিতে পারিস, তা হ'লে দিতে পারি।' আমার এই শরীর, তার ওপর বর্ষা-বাদলা। কি করি,—আর অন্য উপায় ত নেই, কাজেই রাজী হোতে হল। বাপজান যে এত করেছে, তা আমার এই দুঃখের দিনে ওর মনেই এল না। হা আল্লা!—"

প্রগাঢ় দীর্ঘশ্বাসের সহিত ফতেমা উত্তর করিল, "ও সব ভাবতে নেই। সে যেমন ভাল বুঝেছে, করেছে। তোমার কাজ তুমি কর। পাপ-পুণ্যি বিচারের মালিক সেই এক খোদা।" উত্তেজিত কণ্ঠে রহমৎ বলিল, "সবই ঠিক কথা ফতি, কিন্তু মন বোঝে না। দুনিয়াময় শুধু গরিবের ওপর অত্যাচার আর বেইমানি। তখন আমার সাদী হয় নি। এই রকম ঘোর বর্ষা। রাস্তায় একটা কুকুর পর্য্যন্ত নেই। খবর এল, আমাদের চির-শত্রুর মাণিকপুরের জমিদারেরা বাদলার সুবিধে পেয়ে মেছোখালীর বাঁধ কেটে দিয়েছে। মনিবের কথায় বাপজান সেই ঝড়-জল তুচ্ছ ক'রে, নিজের প্রাণের মায়া না রেখে, লাঠি-হাতে পাঁচ কোশ দূরে বাঁধ রাখতে ছুটলো। তাদের হটিয়ে দিয়ে, সারা রাত্তির বিষ্টি মাথায় ক'রে বাঁধ রক্ষা কল্লে। বাঁধ সে রাত্তিরে রক্ষে না হ'লে, সমস্ত মহাল ত ভেসে যেতই; আর তার সঙ্গে জমিদারের বাড়ীও ভাস্‌তো। সব লোক দানার অভাবে ম'রে যেত। মাঠে একটা ঘাসও থাকৃত না। সূর্য্যি উঠলে যখন মনিব বাড়ী এসে বাপজান সেলাম কল্লে, তখন দেবতার মত মনিব দুবিঘে জমির খাজনা চিরদিনকার মত রেহাই দিলেন। এ শয়তান সে উপকার ত ভুলেই গিয়েছে; আর সে দুবিঘের বাকী খাজনাও সব আদায় ক'রে নিয়েছে। বেইমানি আর কাকে বলে, বৌ!"

ম্রিয়মাণা ফতেমা বলিল, "জমিদারকে সব কথা বুঝিয়ে বলো নি কেন?"

অধিকতর উত্তেজিত হইয়া রহমৎ বলিল, "বুঝিয়ে বলার কিছু বাকী ছিল কি? আর, কে না জানে এ কথা? লেখা-পড়া ক'রে দেয় নি তা সত্যি; কিন্তু গাঁয়ের আর 'পাঁচজন মোড়ল ত তার সাক্ষী

সাক্ষ্য দিয়েছিল। কিন্তু কারো কথা মানলে না। সে কি কারো মুখের দিকে চায়? ভিটে-বাড়ীর প্রজা আমি—খাজনা ত দিচ্ছেই,—আবার কত সময় বেগার খেটে দিতে হচ্ছে। কিন্তু মনে ক'রে দেখ, কোন দিন একটা ভাল কথা বলেছে? ছোটবাবুর ব্যারামের সময় কি মেহনংই না করেছি। মাঠ থেকেই ভিন্ গ্রামে ডাক্তার ডাকতে, ওষুধ আনতে গিয়েছি। বাড়ী যখন ফিরেছি, তখন হয় ত দুপড়ো রাত হয়েছে। এত পরিশ্রম, এত কষ্ট—তবুও কি কোন দিন দু'গণ্ডা পয়সা জল খেতে দিয়েছে! হুকুম তামিল কত্তে একটু দেরী হ'লে, বা একটু কসুর হ'লে, কত গা'ল দিয়েছে, কত ——"

উত্তেজনা ও অবসাদবশতঃ রহমৎ আর বলিতে পারিল না। শ্বাসকষ্ট-নিবন্ধন ধীরে ধীরে চেটাইয়ের উপর শুইয়া পড়িল। বেদনা-ব্যথিত ফতেমা অশ্রু-আকুল নয়নে, পরম স্নেহভরে প্রিয়তমের মস্তক নিজ অঙ্কোপরি রাখিয়া, তাহার অযত্ন বিক্ষিপ্ত রুক্ষ কেশ-গুচ্ছ-মধ্যে ধীরে-ধীরে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে করিতে বলিল, "তুমি যা বল্লে, সব বুঝতে পাচ্ছি। জমিদার যখন প্রজার দুঃখ বোঝে না—সুবিধে পেলেই তার ওপর অত্যাচার কোত্তে ছাড়ে না, তখন কিসের মায়ায় আমরা এখানে থাকি? আমার ভাই ত সেদিন এত ক'রে তার কাছে যেতে ব'লে গেল; চল, আমরা সেখানে উঠে যাই। গাঁয়ের মোড়ল সে। জমিদারও তাকে খুব ভালবাসে। নিশ্চয় আমাদের একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবে।" ম্লানমন্দ স্বরে রহমৎ বলিল, "সব বুঝি ফতি! এই গাঁয়েই সাত পুরুষ ধ'রে বাস কচ্ছি, ছেড়ে যেতে মন চায় না। তবে জমিদারের যে ব্যাভার, তাতে এবারে যেতেই হবে। তা না হলে অনাহারে প্রাণ বেরুবে। এবারকার ফসলটা উঠে যাক,—এখানে আর থাকবো না। এ ক'টা মাস মুখ বুঁজে সব অত্যাচার সয়ে কাটিয়ে দিতে হবে।"

* * * * *

মানুষ অন্তর-গুহাতলে যে সুপ্ত ভাবগুলি প্রাণময়ী স্থান পাইত, তাহা হইলে হয় ত সমস্ত দীনতা ও শূন্যতার পরিসমাপ্তি হইয়া যাইত।

সরলপ্রাণ কৃষক-দম্পতি বিগত রজনীতে আশার তুলিকা দিয়া যে ভবিষ্য সুখ-স্বর্গ রচনা করিয়াছিল, শুভ্রহাসিনী ঊষার উদয়ের সহিত, নিয়তির নির্মম পরিহাসে, তাহা এক মেঘময় প্রাসাদের ন্যায়, কোন্ নিঃশব্দ, অনন্ত, উদাস অম্বর-পথে মিলাইয়া গেল।

সুন্দর স্বপনের ন্যায় ম্লান চন্দ্র-রেখা কেবল পশ্চিম-গগন-কোণে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তখনও বিমল ঊষালোক সুপ্ত, নীরব প্রকৃতিতে স্পন্দন জাগাইয়া তোলে নাই। একটা শব্দে বিনিদ্র ফতেমা আগড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। জমিদার-প্রেরিত দুজন লাঠিয়াল তাহাদের আঙিনা-তলে বিপদের অগ্র-দূতের ন্যায় উপবিষ্ট ছিল। ফতেমার মুগ্ধভাব তিরোহিত না হইতেই, তাহারা কর্কশ স্বরে রহমৎকে ডাকিয়া দিতে বলিল। একটা গোলমাল শুনিয়া পূর্ব্বেই রহমতের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে পাইকদিগের কণ্ঠস্বর শ্রবণে বাহিরে আসিয়া, বিশুষ্ক হাস্যে তাহাদের অভ্যর্থনা করিল।

রহমতের প্রাণপণ আপ্যায়ন ও ফতেমার অশ্রুসজল মৌন মিনতি সম্যক্‌ভাবে উপেক্ষা করিয়া, তাহারা তাহাকে কাছারীতে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইবার কঠোর আদেশ জানাইয়া দিয়া তাহাদের সঙ্গী হইতে বলিল। অনন্যোপায় রহমৎ, অশ্রুমুখী ফতেমাকে শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তনের আশা দিয়া, দৃঢ়পদে পাইকদ্বয়ের অনুগামী হইল।

পল্লী-প্রান্তে অবস্থিত জমিদারের বিশাল ভবন তখনও পৌরবর্গের কল-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে নাই। জমিদার মহাশয় আজ কতকগুলি দাগী প্রজাকে অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দিবেন বলিয়া প্রত্যুষেই কাছারী বসিবার আদেশ দিয়াছেন। কর্ম্মচারিবর্গ সকলেই যথাসময়ে উপস্থিত। সকলেই উৎসুক নেত্রে বাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। বেলা যখন প্রায় ন'টা, তখন কর্ম্মচারীদিগকে সন্ত্রস্ত ও নজরবন্দী প্রজাদিগকে সশঙ্কিত করিয়া জমিদার বাবু কাছারীতে পদার্পণ

নলটী প্রভুর হস্তে উঠাইয়া দিল। নলটী ফেলিয়া দিয়া জমিদার বাবু প্রথমেই রহমৎকে মেঘমন্দ্র স্বরে 'মাথট' না দিবার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভয়ার্ত্ত মেষ-শিশুর ন্যায় কাঁপিতে-কাঁপিতে রহমৎ উত্তর করিল, "হুজুর, গরিবের মা-বাপ আপনি, এই দুর্ব্বৎসর, ঘরে এক মুঠো চা'ল নেই। খাজনা ছ'সনের বাকী; 'মাথট' কেমন ক'রে দেব। 'মাথট' দিতে—"

"খাড়া করিয়া দাও," রুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে জমিদার মহাশয়, হতভাগ্যের আবেদন শেষ না হইতেই, দণ্ড-বিধানের আজ্ঞা দিলেন। তাহার অজস্র অশ্রুধারা ও কাতর মিনতি সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল।

পর্য্যায়ক্রমে ধৃত সমস্ত প্রজাবৃন্দের দণ্ডবিধান যখন হইয়া গেল, তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গিয়াছিল। কাছারী পরিত্যাগ করিয়া মন্থর-গমনে জমিদার বাবু যখন প্রকাণ্ড আঙিনা প্রায় অতিক্রম করিয়াছেন, সহসা তখন রহমৎ উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "হুজুর, আমার প্রাণ বেরিয়ে গেল। এবারকার মত মাপ কোত্তে আজ্ঞা হয়।"

একজন সামান্য প্রজার এইরূপ বেয়াদবিতে জমিদার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে সজোরে পদাঘাত করিলেন। অভাগা একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া, ভূপৃষ্ঠে লুঠাইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তকাল সংজ্ঞাহীন রহমতের পানে চাহিয়া জমিদার বাবু তাহাকে চোরাকুঠরীতে আবদ্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

অপরাহ্নে রহমৎকে রক্তবমন করিতে দেখিয়া, সদর নায়েব জমিদারের অনুমতিক্রমে তাহাকে বাড়ী যাইতে আজ্ঞা দিল। সারা আকাশ ভরিয়া মেঘ তখন বর্ষণ প্রতীক্ষায় জমাট হইয়া আছে। ক্ষুধার্ত্ত, তৃষিত রহমৎ ক্লান্ত চরণে, অবসন্ন দেহে, অতি ধীরে কুটীর পানে অগ্রসর হইল। আর সে চলিতে পারে না—সারা দিনের অনশন, অপমান, অবজ্ঞা তাহার দেহ ও মন একেবারে বিমথিত করিয়া দিয়াছে। ভীষণ অভাব ও কঠিন পীড়া যাহাকে হৃতশক্তি করিতে পারে নাই, এই অত্যাচার ও অপমান একদিনেই তাহাকে বলহীন, অকর্ম্মণ্য করিয়াছে। তথাপি ফতেমার বিষণ্ণ করুণ মুখখানি মনে করিয়া, সে যথাসাধ্য দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বিপদ কখনও একলা আসে না। মেঘান্ধকার পথে একটী বৃক্ষমূলে কঠিন আঘাত পাইয়া রহমৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

নিদারুণ উদ্বেগ ও সংশয়-পীড়নে ব্যাকুল অভাগিনী ফতেমার পথ চাহিয়া সারাদিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার মেঘ যখন বিদ্যুৎ-উৎসব লইয়া সুবৃহৎ গ্রামখানিকে ছাইয়া ফেলিল, ফতেমা তখন আত্মহারা হইয়া রহমতের সন্ধানে বাহির হইল। জনহীন গ্রামপথ দিয়া উন্মাদিনী মেঘ-সংঘর্ষ তুচ্ছ করিয়া ছুটিয়া চলিল। দিশাহারা আঁধিয়া প্রতিপদে শত বাধা সৃজন করিতে লাগিল। অবিরল বৃষ্টিধারা ও দুরন্ত বাতাস তাহার কণ্টক-বিচ্ছিন্ন দেহকে নিপীড়িত করিলেও সে স্খলিত পদে অগ্রসর হইতে লাগিল। সহসা বিদ্যুৎশিখা অন্ধকারের বুক চিরিয়া ও কি দৃশ্য তাহার ব্যাকুল নয়ন-পথে উপস্থিত করিল! ওই বুঝি তাহার সব সাধনার ধন,—নারীজীবনের একমাত্র উপাস্য দেবতা—নিস্পন্দ নিঃশ্বাসে তাহারি চরণ-মূলে কর্দ্দমবিলিপ্ত দেহে শায়িত। কম্পিতা, বিবশা নারী পাষাণ প্রতিমার ন্যায় সেই লুণ্ঠিত দেহের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তার পর সহসা বজ্র-পতন শব্দে চমকিত হইয়া ভীষণ অট্টহাস্যে প্রলয়ের কোলে মিশিয়া গেল।

বাসন্তী-গীতি

[শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল]

বয়ে গেছে বসন্তের হাওয়া,
এইবার সুরু হবে কোন্ গান গাওয়া!
এবারে কি মধু-রাতে মধুর জ্যোৎস্না-পাতে
মিলনে নিবিড় ভাবে তারে যাবে পাওয়া?
বয়ে যা, বয়ে যা মধু বসন্তের হাওয়া!

লো কলিকা ফোট্‌লো এবার—
বসন্ত পাগল ঘেরে তোর চারিধার;
তোমায় জাগার তরে সারা বন গান করে,
খোলো গো, খোলো গো, বালা, ঘোমটা তোমার!
তোল, তোল মুখখানি বসন্তে এবার।

দার্শনিক, রাখ হে বিচার,
হোক্ সব মোহ, হোক জগৎ মিছার!
এ কি স্বর্গ উঠে জাগি! এ এক মুহূর্ত্ত লাগি
পারি শুদ্ধ শত বর্ষ দিতে উপহার!
বিবেচনা নাই আজ, নাহিক বিচার।

এ যে আজ ফাগুনের দিন!
কুটীরের ভাঙ্গা দ্বার খুলে দেরে, দীন,
মলয়ে আপন ক'রে নে গন্ধ নিঃশ্বাস-ভ'রে,
কুসুমে কপোলে রেখে নে স্পর্শ নবীন,
বসন্তের, পাগলের, প্রেমিকের দিন।

কখন্ যে বয়ে যাবে তিথি—
আহরণ করে আন্ সব সুখ-স্মৃতি।
কে আপন, কে অপর? রূপের আরতি কর্;
সৌন্দর্য্যে অঞ্জলি দেওয়া আজিকার রীতি!
ব্যথা রয়ে যাবে, যদি বয়ে যায় তিথি।

ওই বাজে বসন্তের বাঁশী!
কার্ চোখে ঝরে জল, কার মুখে হাসি!
কোন্ মাধুরীর দেশে, গান গেল ভেসে ভেসে,
শিহরি ফুটায়ে সারা বনে ফুলরাশি?
"হে প্রিয়—"ডাকিয়া গেল বসন্তের বাঁশী।

বয়ে গেল দখিণা নবীন!
এ জীবনে অল্প আসে অনুকূল দিন।
লো চির রহস্যাবৃতা ও অবগুণ্ঠন বৃথা,
উড়ায়ে, উড়ায়ে দেয় আবরণক্ষীণ
সকল বিধান-ভাঙা দখিণা নবীন।

সম্পাদকের বৈঠক

"ভারতবর্ষের" বহু পাঠক "শ্রীবিশ্বকর্ম্মা" মহাশয়কে প্রত্যহ অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। ইদানীং তাঁত ও চরকা এবং মোটামুটি বস্ত্র ও সূত্রশিল্প সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিবার জন্য অনেক পাঠক তাঁহার নিকটে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। শ্রীবিশ্বকর্ম্মা মহাশয় তাঁহার ল্যাবরেটরিতে এখন কতকগুলি নূতন বিষয়ের পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন; এবং "ইঙ্গিতে" যাহা লিখিতেছেন তাহা ছাড়া, অনেক পত্রলেখককে তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর লিখিয়া পাঠাইতেছেন। কিন্তু ইদানীং তিনি প্রশ্নের ভারে কিছু গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছেন—সকলের সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার অবসর পাইতেছেন না। সেইজন্য প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার কতকটা আমরা আমাদের 'বৈঠকে' আনিয়া ফেলিলাম। অর্থাৎ, আমরা জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলি সাধারণ পাঠকগণের গোচর করিব, এবং এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহা উত্তর দিবেন, তাহাও আমরা যথাসময়ে পত্রস্থ করিব। এবং বিশ্বকর্ম্মা মহাশয়ও যদি কোন প্রশ্নের উত্তর দেন, তাহাও সেইসঙ্গে পত্রস্থ করিব। চরকা ও তাঁত, সূত্র ও বস্ত্রশিল্প বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় বিশেষ ভাবে আমাদিগকে এই স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইতেছে। এই তুলা শিল্প সম্বন্ধে যিনিই যে কোনরূপ প্রশ্ন করিয়া পাঠাইবেন, উপযুক্ত ও আবশ্যক বোধ করিলে

তাহা আমরা ভারতবর্ষে ছাপিব, এবং ঐ সকল প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর পাঠাইলে, তাহাও আমরা মুদ্রিত করিব। এমন কি, তুলা শিল্পের উন্নতিকল্পে যিনি যাহা কিছু করিতেছেন, বা করিবেন,—যেমন, নূতন ধরণের চরকা বা তাঁত উদ্ভাবন, চরকা বা তাঁতের কার্য্য শিক্ষা দিবার স্কুল, গৃহশিল্পের হিসাবে তাঁত ও চরকা চালাইবার আয়োজন, চরকায় কাটা সূতা ও তাঁতে বোনা কাপড় এবং অন্যান্য তুলাজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত প্রভৃতি যে সমুদায় অনুষ্ঠান হইবে, আমরা সুবিধামত বিনামূল্যে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন ছাপিবার জন্য বিজ্ঞাপনস্তম্ভে কিছু স্থান reserved রাখিব। এই প্রসঙ্গে আমরা সাধারণ পাঠকগণের নিকট হইতে তুলাশিল্প-সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তাহাদের উত্তর আহ্বান করিতেছি। 'ভারতবর্ষে'র পাঠকেরা এ পর্য্যন্ত শ্রীবিশ্বকর্ম্মাকে সূত্র ও বস্ত্র, তাঁত ও চরকা সম্বন্ধে যত প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার কতক আমরা এবারেই ছাপিয়া দিলাম।

১। বঙ্গলক্ষ্মী ও মোহিনী মিল ভিন্ন, বাঙ্গালা দেশে দেশীয় পরিচালিত সূতা বা কাপড়ের কল (খাঁটি দেশী কারবার) আর কয়টি আছে? অথবা, আদৌ আছে কি না?

২। এই সকল কলে সূতা প্রস্তুত হয় কি না?

৩। যদি ঐ সমস্ত কলে সূতা কাটার ব্যবস্থা থাকে, তবে সে সূতা কত নম্বরের পর্য্যন্ত হয়?

৪। ঐ সমস্ত কলে যে সকল কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহার সকলগুলিই দেশী সূতায় প্রস্তুত হয়, কিম্বা বিলাতী সূতাও ব্যবহৃত হয়?

৫। সূতা ও কাপড় ছাড়া আর কি কি জিনিস ঐ সকল দেশী কলে প্রস্তুত হয়?

৬। আমাদের দেশে এখন বিস্তৃত ভাবে হাতে-কাটা সূতা তৈয়ার হয় কি না? যদি হয়, তবে কি পরিমাণে, অর্থাৎ দেশের বস্ত্রশিল্পের মুখে যোগান দিবার জন্য কি পরিমাণ হাতে-কাটা সূতা উৎপন্ন হইয়া থাকে?

৭। হাতে-কাটা সূতা বাজারে কোথায় পাওয়া যায়, এবং কত নম্বরের পর্য্যন্ত সূতা তৈয়ার হইয়া থাকে?

৮। তাঁতিরা হাতের তাঁতে যে কাপড় বোনে, সে কাপড়ের জন্য তাহারা, দেশী না বিলাতী, কোন্ সূতা ব্যবহার করে?

৯। তাঁতিদের কার্য্যের জন্য বাঙ্গালায় দেশীয় পরিচালিত কলগুলিতে সূতা কাটিবার ব্যবস্থা আছে কি না,—এবং, থাকিলে, কি পরিমাণে সূতা তাহারা সরবরাহ করিতে পারে?

১০। দেশী ও বিলাতী সূতার দামের পার্থক্য আছে কি না? থাকিলে, কোন্‌টার দাম বেশী? দেশী সূতা, না, বিলাতী সূতা?

১১। কোন্ সূতা মজবুত বেশী? দেশী, না, বিলাতী?

১২। বাঙ্গালার মিলের কাপড় বোম্বাই মিলের কাপড়ের (quality হিসাবে) সমান, না তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট?

১৩। উহাদের দামের পার্থক্যই বা কিরূপ? বাঙ্গালার মিলের কাপড়ের দাম বোম্বাই কপড়ের অপেক্ষা বেশী না কম?

১৪। হাতে-চালানো তাঁত ও চরকা কোথায় পাওয়া যায়? উহাদের প্রকার-ভেদ কিরূপ? কোন্ প্রকারের তাঁত কিরূপ কাজ দেয়, এবং তাহাদের মূল্যই বা কিরূপ?

১৫। ফ্লাই সাটল লুম ব্যবহারে কি কি সুবিধা পাওয়া যায়? তাহাদের দামই বা কত এবং কোথায় পাওয়া যায়?

১৬। উন্নত ধরণের চরকা পাওয়া যায় কি না? এবং কোথায় পাওয়া যায়,—মূল্যই বা কত?

১৭। একখানি দশ-হাতী কাপড় বুনিতে কোন্ তাঁতে কতক্ষণ সময় লাগে, মজুরী কত পড়ে, এবং সর্ব্বপ্রকারে এক এক জোড়া ধুতি বা সাটী বুনিতে কোন্ তাঁতে কিরূপ পড়তা পড়িতে পারে?

১৮। একজন দক্ষ তাঁতী একখানি তাঁত চালাইতে পারে কি না, তাহার মাস মাহিনা বা দৈনিক মজুরী কত পড়ে?

১৯। চরকায় সূতা কাটাইয়া বা বাজার হইতে সূতা কিনিয়া দিয়া তাঁতীদের দ্বারা কাপড় বুনাইয়া লওয়া যায় কি না? এবং তাহাতে কত খরচ পড়িতে পারে? অর্থাৎ বাজার দরের অপেক্ষা সুবিধায় হইতে পারে কি না?

২০। একজন ভাল তাঁতি একটা তাঁতে প্রত্যহ কয় হাত কাপড় বুনিতে পারে, অর্থাৎ কতখানি কাজ করিতে পারে?

প্রশ্নগুলির ধরণ দেখিয়াই পাঠকেরা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন, শ্রীবিশ্বকর্ম্মার উপর কিরূপ গুরুতর চাপ পড়িয়াছে। তবে তিনি উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কয়টির উত্তর আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে ছাপিলাম। এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পাঠকেরাও যে উত্তর দিবেন, তাহা আমরা পরবর্ত্তী মাসে ছাপিব।

উত্তর

১। খুব সম্ভবতঃ কল্যাণ কটন মিলও খাঁটি দেশী কারবার।

২। বঙ্গলক্ষ্মী মিলে সূতা প্রস্তুত হয় বলিয়া শুনিয়াছি। তবে ঐ সূতা ঐ কলেই কাপড় প্রস্তুত করিতেই লাগে। এবং যে পরিমাণ সূতা প্রস্তুত হয়, তাহাতে কুলায় না—কিছু বাজার হইতেও কিনিতে হয়।

৩। অনুমান হয়, ৪০ নম্বরের পর্য্যন্ত সূতা তৈয়ার হয়।

৪। দেশী ও বিলাতী দুইপ্রকার সূতাই ব্যবহৃত হয়।

৫। জামা তৈয়ার করিবার টুইল, বিছানার চাদর প্রভৃতিও হইয়া থাকে।

৬। আমাদের দেশে এখন বিস্তৃত ভাবে দূরের কথা, সামান্য পরিমাণেও হাতে-কাটা সূতা তৈয়ার হয় কি না সন্দেহ। দেশের বস্ত্রশিল্প, বলিতে গেলে, এখন সম্পূর্ণরূপে বিলাতী সূতার উপর নির্ভর করিতেছে।

৭। হাতে-কাটা সূতা যদিই তৈয়ার হয়, তথাপি, বাজারে তাহার ক্রয়বিক্রয় হয় না। কেহ কেহ নিজেদের প্রয়োজন মত সামান্য পরিমাণ সূতা তৈয়ার করিয়া লইতে পারেন। সুতরাং উহা কত 'কাউণ্টে'র সূতা তাহা বলা যায় না।

৮। তাঁতিরাও প্রধানতঃ বিলাতী সূতাই ব্যবহার করে।

৯। নাই।

১০। বাজার বড় অস্থির—দাম ক্রমাগত চড়ে ও নামে; কিছুই ঠিক করিয়া বলা যায় না।

১১। কলের চরকার সূতা—কি দেশী, কি বিলাতী—মজবুত প্রায় একই রূপ হইয়া থাকে।

১২। বাঙ্গালার মিলের কাপড়ের দাম সম্ভবতঃ বোম্বাই মিলের কাপড়ের অপেক্ষা বেশী। ইহার কারণ, প্রধানতঃ তুলা সংগ্রহ করিবার অসুবিধা ও ব্যয়-বাহুল্য। বোম্বাই মিলের পক্ষে মধ্য প্রদেশের তুলার বাজার দাঁড়াও অল্পপথে কোন কোন বাজার খোলা থাকাই সম্ভব। বাঙ্গালায় সে সুবিধা কম।

১৪। বাজারে অনেক রকম পাওয়া যায়। ২৬ নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় বিদ্যাসাগর বাটীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় চরকা তৈয়ার করাইতেছেন। উহা আমাদের সেই চিরন্তন চরকা। উহার মূল্য পাঁচ টাকা করিয়া। বিদ্যারত্ন মহাশয় নিজ বাটীতে চরকা হইতে সূতা কাটা শিখাইবার জন্য একটী স্কুলও স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে দুইটী বিভাগ আছে। এক বিভাগে পুরুষদের জন্য পুরুষ শিক্ষক, এবং অপর বিভাগে মহিলাদের জন্য মহিলা শিক্ষয়িত্রী আছেন। এখানে চরকা চালানো শিখিতে কোন খরচ লাগে না—বিনামূল্যে এই শিক্ষা দেওয়া হয়।

The Hindusthan Industrial Association, ২৭ নং বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, কুমারটুলী, একরকম পায়ে চালানো চরকা প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা চালানো কিন্তু কিছু কঠিন—অনেক দিন ধরিয়া অভ্যাস করিলে তবে হাতের ও পায়ের সঞ্চালনে সামঞ্জস্য রাখিয়া সূতা কাটিতে পারা যায়।

দার্জ্জিলিং সরলা চরকা। ইহাও treadle অর্থাৎ পায়ে চালানো। মূল্য কত জানি না।

ত্রিপুরা কালীকচ্ছ নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয় দেশালায়ের কল প্রস্তুত করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি না কি অতি উত্তম উন্নত ধরণের চরকা ও তাঁত তৈয়ার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা দেখি নাই—কেমন জিনিস বলিতে পারি না। চিঠি লিখিয়া জবাব পাই নাই।

ঢাকাতেও কয়েক রকমের চরকা ও তাঁত তৈয়ার হইয়া চলিতেছে। এখানেও চিঠি লিখিয়া কোন খবর পাওয়া যায় না—বড় দুঃখের বিষয়।

শ্রীযুক্ত পি, এন, দে এম্পোরিয়াম, চুঁচুড়া, উন্নত ধরণের তাঁত প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকেন। এই তাঁত ৫নং মিশন রো, কলিকাতা, ঠিকানায় মেসার্স চারি এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের কাছে পাওয়া যায়।

৪৬ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, দি বেঙ্গল হেল্থ প্রিজার্ভিং এসোসিয়েসনের শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সামন্ত পুরাতন ধরণের চরকা তৈয়ার করাইতেছেন। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

১৫। ফাইসাটল লুম বা ঠকঠকি তাঁত উন্নত ধরণের তাঁত বটে। উহাতে কাজ কিছু শীঘ্র হয়, সুতরাং মজুরী কিছু কম পড়ে। শ্রীরামপুর উইভিং কলেজে উহা পাওয়া যাইতে পারে। অনেক তাঁতি এই তাঁত ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে এবং উপকৃত হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি।

১৬। ১৪ নং উত্তর দ্রষ্টব্য। বিশ্বকর্ম্মা নিজেও এ বিষয়ে একটু আধটু চেষ্টাচরিত্র করিয়াছেন। তাঁহার হাতের কাছে একটী Fret Saw Table ছিল। তাহাতে তিনি একটী ছাতির শিক ভাঙ্গা—মুখ সরু করিয়া বসাইয়া দিয়া এক রকম চলনসই গোছের চরকার মত করিয়াছেন। তাহাতে সূতা কাটা যাইতেছে। কিন্তু ইহাও কিছু অভ্যাস সাপেক্ষ। আর, পুরাতন, অব্যবহার্য্য সেলাইয়ের কলেও (হাতে ও পায়ে চালানো) টাকু বসাইয়া চরকার কাজ করাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। খুব সম্ভবতঃ ইহা বেশ কার্য্যোপযোগী হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। সেলায়ের কল অনেকের ঘরে থাকা সম্ভব। সেগুলা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িলেও তাহা আর পুরানো লোহার দামে লোহাওয়ালাদের বিক্রয় করিতে হইবে না—তাহাকে চরকার মত ব্যবহার করা চলিবে।

বালীগঞ্জে ৪৯ নং ঝাউতলা রোডে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল মহিলাদিগকে বিনা ব্যয়ে চরকায় সূতাকাটা শিখাইতেছেন।

'নির্ব্বংশ শব্দে'র অনুসন্ধান

[শ্রীঅমৃতলাল শীল]

মাঘের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'নির্ব্বংশ শব্দ' নামে একটি সুচিন্তিত লেখ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখের সহিত যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ এমন শব্দ, বোধ হয়, যাহাদের শ্বাস আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও জীবিত। একটু সেবা-শুশ্রূষা পাইলে, হয় ত আবার স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে। কোনও ভাষা হইতে স্বাভাবিক কারণে কোন শব্দের মৃত্যু শীঘ্র ঘটে না। শব্দটি যত অপ্রীতিকর হউক না কেন, তাহাকে আদর করিবার মত ২।৪ টি লোক দেশের কোন না কোন অংশে

পাওয়া যায়। বহুকাল একেবারে ব্যবহার না হইলে তবে তাহার মৃত্যু বলা যাইতে পারে। তালিকার শব্দগুলির মধ্যে যেগুলি রাজনৈতিক, সেগুলি রাজা ইচ্ছা করিলে মারিতে পারেন। রাজার খড়্গাঘাতের পরও কিছুকাল তাহারা সাহিত্যে স্থান পায় বটে, কিন্তু বেশী দিন নহে। তালিকার দেশমুখ, মহাপাত্র, অধিকারী এই জাতীয় শব্দ। এক কালে দেশের রাজা গ্রামে গ্রামে দেশমুখ, পরগণায়-পরগণায় মহাপাত্র, ও জেলায়-জেলায় অধিকারী নিযুক্ত করিতেন; তখন ঐ শব্দগুলি সাধারণের মুখে ও সাহিত্যে শুনিতে পাওয়া যাইত। এখন তাহারা অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়া বংশগত উপাধি হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের সহিত রাজকার্য্যের আর সংশ্রব নাই। তাহাদের পরিবর্ত্তে সবডেপুটি, মুনসিফ ইত্যাদি নানাপ্রকার রাজকর্ম্মচারী দেখিতে পাওয়া যায়।

কতকগুলি শব্দ দেশের অংশ-বিশেষে ব্যবহৃত হয় না বটে, কিন্তু অন্য অংশে সাধারণ লোকের মুখে সদা-সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়; অতএব এক অংশে মৃত হইলেও তাহারা অন্য অংশে মৃত নহে। যেমন চাষ সম্পর্কীয় শব্দগুলি; এবং পল্লীগ্রামে প্রচলিত আরও এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা কলিকাতা নগরবাসী সাহিত্যিক হয়ত জীবনে কখনও শুনেন নাই। কিন্তু কেবল নগরবাসীরা শুনেন নাই বলিয়া তাহাদের কখনই মৃত বলা যায় না, বা বলা উচিত হয় না। তালিকার খিলভূমি, ডাবর, পালি, ধাপঘর, পোতামাঝি, খুরি, সেজ ইত্যাদি এই জাতীয় শব্দ।

সাহিত্যিকদের রুচিভেদে কতকগুলি বিষয় অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। সে সকল বিষয়ে পুস্তক লেখা হয় না বলিয়া ঐ বিষয়ের শব্দগুলি বহুকাল ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু যদি কখনও ঐ বিষয়ে কেহ আলোচনা করেন, তবে ঐ শব্দগুলি বাধ্য হইয়া ব্যবহার করিতে হইবে। এ অবস্থায় শব্দগুলিকে মৃত বলা অন্যায় হইবে, তাহাদের সুষুপ্ত বলিলে অন্যায় হইবে না। তালিকার আখেট, ক্ষাল এই জাতীয় শব্দ। আখেট অর্থে ব্যাধ লেখা হইয়াছে; কিন্তু আখেট এক প্রকার শিকার। আখেট রাজারাই খেলিত খেলিতে পারিত। আখেটের জন্য ৪।৫ মাইল হইতে পাহাড়ের গায়ে বা কোন উচ্চ স্থানে মাচান বাঁধা হইত। শিকারী এই মাচানে বসিতেন। ঘেরা স্থানের এক দিকে পশুদের তাড়াইয়া রাখা হইত। পরে শিকারী আসন গ্রহণ করিলে তাঁহার সম্মুখ দিয়া পশুদের তাড়াইয়া লইয়া যাইত; সেই সময়ে মাচান হইতে শিকারী পশু বধ করিতেন। পৃথ্বীরাজ চোহানের রাজকবি বরদাই চন্দ তাঁহার পৃথ্বীরাজ রাসো নামক গ্রন্থে আখেটের সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। দিল্লীর মুসলমান বাদশাহেরাও আখেট খেলিতেন। আকবরের সময়ে ১৫৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে লাহোরের কাছে এইরূপ শিকারে চল্লিশ ক্রোশের পশু তাড়াইয়া একত্র করা হইয়াছিল। তুর্কি ভাষায় আখেটকে কমরগা অথবা জিরগা বলে। পৃথ্বীরাজ নানারূপ পশু ও পক্ষী লইয়া শিকার খেলিতেন। রাসোতে লিখিত আছে যে, তাঁহার সহিত ৫০ হইতে ১০০ চিতা ও একহাজার বলবান শিক্ষিত কুকুর থাকিত। ইহা ছাড়া নানাপ্রকার শিক্ষিত পক্ষীও থাকিত। আজকাল বাঙ্গালীরা শিকার খেলে না, সাহিত্যিকরাও শিকার বর্ণনা করেন না। কিন্তু যদি তাঁহাদের ঐরূপ শিকার বর্ণনা করিতে হয়, তবে "আখেট" না লিখিয়া আর কি লিখিতে পারেন? তখন ত শ্মশান হইতে মুমূর্ষু "আখেট"কে তুলিয়া আনিয়া, পথ্য দিয়া সজীব করিয়া লইতে হইবে।

কলিকাতা সহরে ধান বিক্রয় হয় না, অন্য শস্যও সের-দরে বিক্রয় হয়; কিন্তু পল্লীগ্রামে পালী মাপই প্রচলিত। পালী শব্দ কেবল বঙ্গদেশে নহে, দাক্ষিণেও ধান ও চাউলের মাপ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যে আর এক প্রকারে প্রাচীন শব্দ রক্ষিত হইতেছে। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে, সিপাহী বিদ্রোহের পর শান্তি স্থাপিত হইলে, বহু বঙ্গবাসী সপরিবারে পশ্চিমে চাকরী করিতে গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অতি অল্পই অবসর গ্রহণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। যাঁহাদের পুত্রেরা তাঁহাদের অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই পশ্চিমে চাকরী পাইয়াছেন, তাঁহারা আর ফিরিতে পারেন নাই। এই প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবার মধ্যে অনেকে, সে সময়ে যে ভাষা আপনাদের সহিত লইয়া গিয়াছিলেন, আপনাদের পুত্র-

ভাষায় কতকগুলি এমন শব্দ আছে, যাহা তাঁহাদের পশ্চিমে যাইবার পর বঙ্গে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ঐ প্রবাসী পরিবারেরা তাহা যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতেছেন। এরূপ শব্দকে নিঃশেষ বা মৃত বলা ঠিক নহে, কেন না, যদিও তাহারা বঙ্গদেশে নিঃশেষ, তথাপি বঙ্গের বাহিরে জীবিত।

তালিকার শব্দগুলির মধ্যে কতকগুলির অর্থ বোধ হয় ঠিক হয় নাই। আমি যেরূপ জানি লিখিতেছি :—

ভাঙ্গড় — ভাঙ্গখোর (হিন্দী ভঙ্গেড়ী)

ঘোড়ারু (পার্সী রু = মুখ) ঘোড়ামুখো

আর্জ্জাস (আদালতের শব্দ) (অরবী অর্জ = বিনয় পূর্ব্বক বলা, বক্তব্য। পার্সী দাশ্‌ত্‌ = রাখিয়াছে) = বক্তব্য। বিনয় পূর্ব্বক বক্তব্য। Application.

বেসাত (অরবী বিসাত = কোনও দ্রব্য ছড়াইয়া রাখিবার বস্ত্র, মাদুর, চাটা ইত্যাদি = সামান্য বণিক যে আপনার সম্মুখে পণ্য-দ্রব্য একখানি কাপড় পাতিয়া তাহার উপর ছড়াইয়া বিক্রয় করে।

আখেট বড় রকম শিকার। বিস্তৃত স্থান ঘিরিয়া মাচানে উপবিষ্ট শিকারীর সম্মুখে পশু আনিয়া পশু হত্যা।

দাঁড়া — কাঁকড়ার দাঁড়া।

দরা — পার্সী শব্দ দররা। দুই পাহাড়ের মধ্যে অল্প খোলা স্থান। দরার প্রতিশব্দ কোন ভারতীয় ভাষায় আছে কি না, জানি না। মরাঠি, কর্ণাটকি ও মলায়ালী ভাষায় থাকা সম্ভব। বাঙ্গালা দেশে দরাও নাই, তাহার শব্দও নাই।

উগ্র = রুদ্র, রাগ।

খরা — রৌদ্র। এখানে বৈশাখের খরা লেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু কৃত্তিবাস যখন রামায়ণ লিখিবার অনুমতি পাইলেন, তখন :—'পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর। মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গোড়েশ্বর।' অতএব খরা গ্রীষ্ম হইতে পারে না।

দেড়িভার। ডবল বা দ্বিগুণ নহে। দেড়া বা ১½ গুণ।

দেশমুখ। মারাঠাদের উপাধি—দেশের বা গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। দক্ষিণে গ্রামের 'দেশমুখ' বাঙ্গালার জমীদারের মত মাননীয়।

পনাহি। জুতা। সংস্কৃত উপানহ। এখানে যে মোজা লেখা আছে উহা আধুনিক সূতার মোজা (stocking) নহে। কেন না, মুচি মোজা, পনাহি ও জিন সেলাই করিতেছে। পার্সীতে মোজা অর্থে জুতার উপর হাঁটু পর্য্যন্ত চামড়ার আবরণ, যাহা অশ্বারোহীরা ব্যবহার করিত। ঐ মোজা হইতে ইয়োরোপীয় গেটর, পরে ওয়েলিংটন বুট।

জোহার report নহে; অভিবাদন। যুক্তপ্রদেশে দুইজনে দেখা হইলে, সমান পদস্থকে রামরাম, সীতারাম ইত্যাদি বলে; কিন্তু সম্মানীয়কে 'জোহার' বলিয়া অভিবাদন করে। "জোহার মহারাজ" প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

ছায়া—শ্রী নহে। অযোধ্যা, মথুরা মায়ার বৈভব তাহার বৈভবের ছায়ার মতও নহে।

যমধর—রাজপুতদের জাতীয় অস্ত্র। ছোট অসি বা বড় ছোরা। পূর্ব্বে 'যমধর' ছাড়া রাজপুত দেখিতে পাওয়া যাইত না।

তাজী—অরব দেশীয় (যে কোনও বস্তু হউক না কেন)। ইরাণে জোহাক তাজী আপন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জোহাক বাবিলোন-দেশীয় ছিলেন; তথাপি ইরাণিরা তাঁহাকে তাজী বলিত।

গোহারি = ডাকা to call.

সগল্লাত। তুর্কী শব্দ সকরলাৎ। এক প্রকার উৎকৃষ্ট পশমী কাপড়, যাহার আধুনিক নাম বনাত Broad cloth. লাল রঙ্গের সকরলাত হইতে scarlet শব্দ। আগে ঐ কাপড় ভারতে শাম (Syria) দেশের হলব (Aleppo) নগর হইতে আসিত। তাহার বদলে ঢাকার মলমল যাইত।

সঞ্চান—এক প্রকার শিকারী পক্ষী। (রাসোতে আছে)।

বকাল। অরবী বক্‌কাল = সামান্য ব্যবসায়ী—যে তরি-তরকারি, শাক-পাত বিক্রয় করে।

[যে মূল্যবান খাদ্য দ্রব্য, শস্য বিক্রয় করে তাহাকে বদ্দাল বলিত]

হতাশ = হত + আশা = আশাশূন্য

সায় করি = মতে মত দেওয়া। পার্সী সাদ করা। মতে মিল হইলে অরবী (ও পার্সী) বর্ণ সাদ লিখিয়া দেওয়া নিয়ম এখনও আছে। উর্দু ভাষায় বলে "মৈঁ আপকে রায় পর সাদ করতো হুঁ" = I concur with your opinion। এই সাদ করা হইতে সায় দেওয়া

হইয়াছে। বাঙ্গালাতে এভাবেও বলে—তুমি যে সকল কথায় সায় দিতেছ? অর্থাৎ কোন বিষয়ে আপনার মত প্রকাশ না করিয়া মতে মত দিতেছ।

লাঘব=হালকা, লঘু, অতএব প্রকারান্তরে অপমান।

থানা=ক্ষুদ্র জলাশয়, ডোবা।

মাহু=সর্প নহে। মাহুর=অতি তেজস্কর বিষ। কেউটে সাপের বিষ। পূর্ব্ব প্রদেশে মাহুর, মাহুরা, মাহুরা প্রচলিত।

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

আমাদের সুহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ দেশের দিকে একবার চাহিয়া দেখুন। দেশের লোকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি-পাত করুন। দেখিয়া বিবেচনা করুন, জাতীয় বা বিজাতীয়—কোন্ ধরণের শিক্ষা লাভ প্রয়োজন। এখন কোন্ ঘাটে তরী ভিড়াইতে হইবে, তাহা আগে ঠিক করিতে হইবে। নারায়ণগঞ্জ বাঙ্গালার অন্যতম পাট প্রধান স্থান, সেখানকার পাট-ব্যবসায়িগণ বর্ত্তমান বঙ্গদেশের কি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, দেখুন—

"দেশে বড় দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে প্রায় পনর আনা লোকেরই মোটা ভাত-কাপড়ের যোগাড় হইতেছে না। কত লোক যে খাইতে না পাইয়া মারা পড়িতেছে, তাহার হিসাব আমরা রাখি না। বৎসর-বৎসর ক্রমশঃই ভাত কাপড়ের দর যেরূপ বাড়িতেছে, এ ভাবে আর কয়েক বৎসর চলিলে দেশের যে কি ভয়ানক দিন আসিবে, তাহা ভাবিয়া আমাদের প্রধান-প্রধান ব্যক্তিগণ ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছেন।"

নায়ক, ০৮।১০।২৭

স্থানে-স্থানে দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। সাতক্ষীরা হইতে একজন পত্রপ্রেরক "খুলনায়" লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

"ঈশ্বরীপুর দুর্ভিক্ষ।—এই অন্ন-কষ্টের চিত্র রাজা প্রজার সম্মুখে খুলিয়া প্রত্যেককে কর্ত্তব্য পালনে সাদর আহ্বান করিয়া "খুলনা" মহৎ কার্য্য করিয়াছেন।"

খুলনা, ৭।১০।২৭

দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্টের সংবাদ অনেক স্থান হইতেই পাওয়া যাইতেছে; এবং সুখের বিষয়, তাহার প্রতিকারেরও অসামান্য চেষ্টা হইতেছে—

"এই দেশব্যাপী দারুণ দুর্ম্মূল্যের দিনে জয়নগর দীন-কুটীর যথানিয়মে মাস মাসিক চাউল বিতরণের পর প্রায় ...০০ খানা কাপড় ও এই ঘোরতর শীতে নিরুপায় দরিদ্রগণকে প্রায় ৫০৫৫ খানা কম্বল বিতরণ করিতে পারিয়াছেন। এই কাপড় ও কম্বল বিতরণ বিষয়ে কলিকাতা-নিবাসী জনৈক মহিলা ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।"

২৪পরগণা বার্ত্তাবহ, ৫।১০।২৭,

অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষের কথা শেষ করিব মনে করিয়াও করিতে পারিতেছি না। মফঃস্বলের সংবাদপত্র খুলিলেই একটা না একটা এরূপ সংবাদ চোখে পড়িতেছেই—

আবার অনাহারে মৃত্যুর ভীষণ সংবাদ আমাদের কর্ণগোচর হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে ... তারিখে খুলনায় গাড়ুরা ইউনিয়নের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ আমরা প্রকাশিত করি। ব্যবস্থাপক সভায় তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিবার জন্য কোনও সহৃদয় দেশহিতৈষী মেম্বরকে আহ্বান করি। কিন্তু কেহই এ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও প্রশ্নাদি করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। তৎকালীন পুলিস সাহেব ফকনার ও অন্যান্য স্থানীয় কর্মচারিগণ আমাদের প্রকাশিত সংবাদ যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাহা বিশেষ অনুসন্ধানে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সেই সময়ে গাড়ুরায় সামান্য সামান্য সাহায্য প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু 'দুর্ভিক্ষ' ঘোষণা করা নিতান্তই অসঙ্গত বলিয়া কর্ত্তাদের মনে হইয়াছিল বোধ হয়। তাই গাড়ুরা ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানসমূহ আজ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। তাই আজ আমাদের সংবাদদাতা শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ মিত্র বিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের চিত্র অপেক্ষাও ভীষণ চিত্র চাক্ষুষ করিয়া আসিয়াছেন। 'লোকে কচুরমুখী মূড়া ও ভাতের ফেন খাইতেছে ষোড়শী যুবতীর অঙ্গে বস্ত্র নাই। ২০ জন লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহাকেও দুর্ভিক্ষ বলা হইবে না যদি গত বৎসর আমরা যখন অনাহারের সংবাদ প্রকাশ করি তখন হইতে কর্ত্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন—যদি তখন তাঁহারা লোহিত হইত—যদি অনাহারে মৃত্যু, ব্যাধিজনিত মৃত্যু বলিয়া এম ধারণা না হইত—যদি গভর্ণমেণ্টের কেহ এ বিষয়ে উপযুক্ত আন্দোলন করিতেন তবে আজ আমাদিগকে পুনরায় এই অপ্রীতিকর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইত না।

* * * *

খুলনার নিতাই, দুঃখের যে, কাউন্সিলে খুলনার দুঃখের কথা বলিবার কেহ ছিল না। সুসংস্কৃত মসনদে মোটা মোটা ...

বিভাগের মন্ত্রিগণ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে দেশীয় মন্ত্রীই ৫ জন; তাঁহারা কেহ কেহ স্বচক্ষে আসিয়া খুলনার দক্ষিণ ভাগের প্রকৃত অবস্থা দেখুন ইহা আমরা দাবী করিতে পারি কি না। তাঁহারা কেহ আসিয়া গত বৎসরের ঝড়ের পর গাড়ুরা ইউনিয়নে অনাহারে মৃত্যু ঘটিবার পর হইতে গভর্ণমেণ্ট কি করিয়াছেন, না করিয়াছেন, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিতে পারিবেন কি? ভীষণ দুর্ভিক্ষ নিবারিত করিবার জন্য ঝড়ের পর হইতে কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল কি? গত বৎসর ৫।৭ জন লোক যে অনাহারে মরিয়াছিল তাহা কেহই অস্বীকার করেন নাই; বেশীও মরিতে পারে। আমাদের ১৮।৩।২০ তারিখের প্রকাশিত সংবাদ ডেলী বেঙ্গলীতে অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর কত জন অনাহারে মরিয়াছে এবং মৃত্যু নিবারণ জন্য কি কি ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এ বিষয়ে ডিরেক্টর অব ইন্‌ফরমেশান আমাদিগকে প্রকৃত সংবাদ দিতে বাধ্য। গভর্ণমেণ্টকে আমরা একটী কম্যুনিক প্রকাশিত করিবার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কোনও কম্যুনিক প্রকাশিত করেন না, কারণ ঘটনার সত্যতা স্থানীয় কর্মচারিগণ চাক্ষুষ করিয়াছিলেন। তথাপি দুর্ভিক্ষ ঘোষিত কেন হইল না এবং পুনরায় অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ আমরা কেন পাইতেছি ইহার উত্তর দিবার কেহ কি আছে? গভর্ণমেণ্ট কিছু না করেন, আমরা রামকৃষ্ণ মিশন ও বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীকে সানুনয়ে অনুরোধ করি তাঁহারা সাতক্ষীরার শ্যামগঞ্জ থানা ও গাড়ুরায় গিয়া গত বৎসর ঝড়ের পর হইতে এযাবৎ লোকে কি অবস্থায় আছে তাহা দেখুন এবং যদি কিছু করণীয় থাকে করুন।"

—খুলনা, ৫।৯।২৭,

আরও আছে—

"অনাহারে মৃত্যু!—কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ ঢাকা জিলায় গত জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর তিন মাসে ৯ জন লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই ৯ জনার মধ্যে ৪ জন ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা করিয়াছে। এই তো গেল 'সমৃদ্ধিশালী' ব্রিটিশ ভারতের একটি জিলায় ৩ মাসের খবর। এখন বিলাতের ব্রিটিশ দ্বীপসমূহে মেকস্‌ইনী ও তাহার অনুচরবর্গ ব্যতীত অপর কয়জন লোক গত বর্ষে অনাহারে মরিয়াছে জানিতে পারিলে একবার তুলনা করিয়া দেখিবার সুবিধা হইত।"

—সারথি, ২১।৯।২৭।

অন্নকষ্টের কথা যথেষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বত্রই এই একঘেয়ে সংবাদ। তার অপেক্ষা বরং একটু-আধটু স্বাস্থ্যের সংবাদ লইলে মন্দ হয় না। এ সময়ে দেশের স্বাস্থ্য প্রায় ভাল থাকে না। কোন না কোন স্থানে কোন না কোন রোগ সংক্রামক ভাবে লাগিয়া আছেই আছে। পাঠকেরা মফঃস্বলের সংবাদপত্র হইতেই তাহার কিছু পরিচয় লউন।

"মজিলপুর, জয়নগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে প্রতি বৎসর শীতের প্রারম্ভে একবার করিয়া কলেরা দেখা দিয়া থাকে। এ বৎসর অনেক পূর্ব্বে, অর্থাৎ ঠিক ৺শারদীয় মহাপূজার দুই চারি দিবস পরেই মজিলপুরে কলেরা দেখা দিয়াছে। মৃত্যু-সংখ্যা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া চলিয়াছে। স্থানীয় "রেটপেয়ার্স এসোসিয়েসন্" কলেরা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ও উপদেশপূর্ণ বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া গ্রামের মধ্যে বিস্তর বিলি করিতেছেন, দুই একটা প্রতিষেধক ঔষধ দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন, এবং ভেজাল খাদ্যদ্রব্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিশুদ্ধ দ্রব্যের আমদানী করিবার মানসে জয়নগর ও মগরাহাট থানার অধিবাসিগণকে লইয়া এক "কোঅপারেটিভ ষ্টোর" খুলিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।" ২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ।

"আমডাঙ্গা ও চাচই গ্রামে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। বাজারের কর্ত্তৃপক্ষ ঐ সমস্ত গ্রামের দুধ, মাছ, বাজারে আনিতে দেওয়া বন্ধ করুন। সাধু সাবধান। এইবার বসন্তের পালা।"

কল্যাণী ৬।১০।২৭।

আবার কোন কোন স্থানের অবস্থা একটু ভালও; যথা,—

"আবহাওয়া।—এই কয়দিন খুব শীত পড়িয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হ্রাস হইয়াছে। সহর ও মফঃস্বলের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল।"

—জ্যোতিঃ ২২।৯।২৭।

রোগে চিকিৎসার অভাব বাঙ্গালার পল্লীর একটা সাধারণ অবস্থা। দুই একটা নমুনা—

"ডাক্তারখানা—এগারসতী পরগণার কালীগঞ্জবাজারে বিশহাজার লোকের মধ্যে একটী দাতব্য চিকিৎসালয়। তাহার যেমন ঔষধ তেমন চিকিৎসা। ভাল ঔষধ নাই বলিলেও চলে, তবুও এরূপ অবস্থায় একটী ডাক্তারখানার কতদূর প্রয়োজন তাহা দেশবাসী মাত্রেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু সদাশয় এসিষ্টেনসাজন না কি বিগত লোকেল-বোর্ড সভায় চিকিৎসালয়টী সরাইয়া দুর্বাগ নিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন।" জনশক্তি ১৩।৯।২৭।

"পানীয় জল বিকৃত, পুষ্করিণীগুলি অসংস্কৃত নদীর জল অধিকাংশ স্থানে লবণাক্ত; পল্লীবাসীর স্বাস্থ্য সুখ শান্তি চিরবিদায় লইতে বসিয়াছে। এই সমস্ত নানা কারণে এবার খুলনা জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়া, কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, আমরক্ত প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাব অধিক হইয়াছে। তালা থানার এলেকায় বহু গ্রামেই এপিডেমিকে লোক মারা যাইতেছে। মাগুরা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ইতি পূর্ব্বে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।"

ইত্যাদি কারণে "খুলনা" (২২।৯।২৭) জেলাবোর্ডে সবসিডাইজ্‌ড্‌ ডিস্‌পেন্‌সারির প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

নবযুগে নূতন ভাবের যে স্রোত দেশের উপর দিয়া

বহিয়া যাইতেছে, তাহার ফলে কয়েকটি সুলক্ষণ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। পাঠকেরাও ইহার অংশ গ্রহণ করুন—

"স্বাবলম্বনশিক্ষা—গত ৮ই পৌষ রবিবার স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চৌধুরী উকীল মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুনামগঞ্জ টাউনহলে সহর ও মফঃস্বলবাসী জনসাধারণের একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করার জন্য ৪৫ জন সভ্য নিয়া একটি মহকুমা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

গৃহীত প্রস্তাব (ক) প্রতিগ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য-সমিতি গঠন করা।

(খ) তুলার চাষ, চরকা দ্বারা সূতা প্রস্তুত ও দেশীয় তাঁতের সাহায্যে কাপড় প্রস্তুত করা সম্বন্ধে গ্রাম্য সমিতিকে শিক্ষা দেওয়া ও সহায়তা করা।

(গ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য-বিরোধ আপোষে মীমাংসা করার জন্য গ্রাম্য সমিতিকে উপদেশ দেওয়া।

(ঘ) গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মভাণ্ডার স্থাপন করা।

মুষ্টিভিক্ষা—চুচুরাই শিদ্দাগ্রামে মৌলবী হাজি আরব আলীর চেষ্টায় পরগণায় একটা মুষ্টিভিক্ষা ফাণ্ড খোলা হইয়াছে। এই ফাণ্ডের টাকার দ্বারা তাঁত প্রচলন করা হইয়াছে। এই ফাণ্ডের টাকার দ্বারা তাঁত প্রচলন করা হইবে এবং খেলাপৎ সভার সাহায্য করা হইবে।"

জনশক্তি ১৩।৯।২৭।

"চরকা বিতরণ।—ত্রিহুত মজঃফরপুর সাহতা গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাবু আউরঙ্গ বিহারী সহায়ের শ্রাদ্ধ দিনে পঞ্চাশটী দরিদ্র বিধবাকে পঞ্চাশটী সূতা কাটিবার চরকা দান করা হইয়াছে।"

এডুকেশন গেজেট, ১৫।১০।২৭।

বাঙ্গলায় পল্লী-অঞ্চলে জলাভাব একটা মস্ত বড় সমস্যা। ইহাতে লোকের কেবল যে কষ্ট হয় তাহা নয়,—স্বাস্থ্য-হানির ইহা অন্যতম কারণ। এই জন্য জল-সংস্থানের সুব্যবস্থার কথা শুনিলে আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারি না—

"জেলা বোর্ডের পুষ্করিণী—কুমিল্লার জেলা বোর্ড এবৎসর ৫০টী পুষ্করিণী খননের সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সদর মহকুমায় ২৫টী, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৫টী এবং চাঁদপুরে ১০টী নূতন পুষ্করিণী খনন করা হইবে; অথবা পুরাতন পুষ্করিণী থাকিলে তাহার সংস্কার করা হইবে।"

এডুকেশন গেজেট ১।১০।২৭।

জলের অভাবে লোকের কিরূপ কষ্ট হইতে পারে, তাহা সকলেই সহজেই অনুমান করিতে পারেন। জলের অভাব কিরূপে এবং কেন হয়, তাহার একটা দৃষ্টান্ত "সময়" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। ভাস্তাড়া হইতে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

"এবার বর্ষা কম হওয়ায় গ্রামের সমস্ত পুকুরগুলির জল কমিয়া ঘোলা হওয়ায় পানীয়ের অযোগ্য হইয়াছে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারি হইতে হুগলী সদর লোকাল বোর্ড কর্ত্তৃক যে কূপটী কাটান হইতেছিল, আজিও তাহার উপরিভাগস্থ গাঁথুনী আদি ঠিকাদার শেষ করিয়া উঠিতে পারে নাই। তথাপি কর্ত্তৃপক্ষের এ সম্বন্ধে কড়া নজর পড়িতেছে না, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। অথচ যে অঞ্চলে কূপ কাটান হইতেছে, তথাকার অধিবাসিগণের জলকষ্টের সীমা থাকিতেছে না। এদিকে হুগলী সদর লোকাল বোর্ডের যিনি সভাপতি, তিনি বঙ্গীয় আইন সভার একজন মেম্বার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যিনি এত বড় উচ্চ সম্মানার্হ পদে অধিষ্ঠিত, তাঁহার কর্ত্তৃত্বে কি একটা সামান্য কূয়া কাটানর কাজ এক বৎসরেও সমাপ্ত হইতে পারে না?"

অবশ্য অন্যান্য রকমেও জলকষ্ট হইতে পারে এবং হইয়া থাকে।

পল্লীবাসের নানা অসুবিধার মধ্যে বন্য-জন্তুর উপদ্রব একটা বড় অসুবিধা। এ সম্বন্ধে পল্লীবাসীরা কিন্তু নিরুপায়—

"বাঘের উপদ্রব।—চাঁদপুর পুলিশ থানার এলেকা ভুক্ত শাকদি গ্রামে একটা বাঘ বড় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। ১০ জন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোককে উহা জখম করিয়াছে। লোকের হাতে বন্দুক নাই, তরোয়াল নাই, কাজেই বাঘে তাহাদের দফা ভাল করিয়াই সারিতেছে! এখন কর্ত্তাদের চোখ পড়িলেই মঙ্গল।"

—সময়, ৯।১০।২৭।

এখন ম্যালেরিয়া বাঙ্গালার অতিবড় শত্রু। ইহাকে কাবু করিবার জন্য বালেশ্বর জেলায় কাজের মত কাজ আরম্ভ হইয়াছে—

"বালেশ্বরে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা—উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বর সহর ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি হইয়াছে। ইহাকে ম্যালেরিয়া-শূন্য করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। যে সব পানা ডোবা মশকে পরিপূর্ণ, সেইগুলি বুজাইয়া দেওয়া হইতেছে; এই রকম ১,৫০০ খানা ডোবা বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মশক ম্যালেরিয়ার বাহন। এইজন্য হাইড্রো কার্ব্বণিক গ্যাস মিশ্রিত কেরোসিন তৈল মশকদের আবাস-ভূমিতে ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে। কেবল ইহাই নয়, পচা পুকুরে ও বদ্ধ জলাশয়ে কৈ, খলিসা প্রভৃতি মৎস্য সরকারী মৎস্য-বিভাগের কর্ত্তারা ছাড়িয়া দিতেছেন; এই সব মাছ মশকের ডিম খাইয়া থাকে। তিন ক্রোশ পরিমিত স্থানের উপর যত ঝোপ জঙ্গল ছিল, মিউনিসিপ্যালিটি সে সব কাটিয়া দিয়াছেন। দেখা যাউক, ইহাতে ম্যালেরিয়া কমে কি না।"

—সময়, ৯।১০।২৭

স্থানভেদে কি রোগের কারণ-ভেদ হয়? জানিতাম, খাদ্যে ভাইটামাইন নামক একটী পুষ্টিকর দ্রব্যের অভাব

হইলে বেরিবেরি রোগ হয়। তার পর শুনিলাম, সরিষার তৈলে "পাকড়া" মিশাইলে সেই তৈল খাইয়া বেরিবেরি হইতে পারে। এখন আবার অনুরূপ কথা শুনিতেছি—

"ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত নিতাড়া গ্রামে বেরিবেরি রোগ দেখা দিয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর হইতে উক্ত গ্রামে পানীয় জল-কষ্ট বিধায় এই রোগের আবির্ভাব।"

—২৪পরগণা বার্ত্তাবহ, ৫।১০।২১।

মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত নন কো-অপারেশন নীতির ফলে কয়েকটি সুফল যে ফলিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তন্মধ্যে একটী -

"নন কো অপারেশনের চমৎকার ফল।—উলবেড়িয়া হইতে হুগলী পর্য্যন্ত যত কল আছে, সমস্ত কলের কুলিবস্তির নিকট এক একটা মদের দোকান ছিল। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, এই কয়দিনে ঐ সকল মদের দোকানে মদ বিক্রয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নন-কো-অপারেশনের মদ্যপান নিবারক প্রচারকগণের কয়েক দিন ব্যাপী চেষ্টার ফলে এই সুফল ফলিয়াছে। নন-কো অপারেশন জনসাধারণের এমন কি শ্রামিক সম্প্রদায়ের অন্তরে কিরূপ প্রভাব বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছে, এই ব্যাপারে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিন সপ্তাহের চেষ্টায় উহারা মদ ছাড়িয়াছে, ইহা অপেক্ষা সুখের সংবাদ কি হইতে পারে।" নায়ক, ১০।১০।২১।

অন্যত্রও এরূপ চেষ্টা চলিতেছে---

"মাদক নিবারণী সভা—বিগত ২রা মাঘ শনিবার অপরাহ্ণ ৩ঘটিকার সময় শ্রীহট্ট হিতসাধন মণ্ডলীর উদ্যোগে স্থানীয় টাউনহলে একটী মাদক নিবারণী সভার অধিবেশন হয়। মিঃ মেরি কেম্পবেল মাদক দ্রব্য ব্যবহারের অপকারিতা চিত্রাদির সাহায্যে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সান্ন্যাল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টে একটী স্থায়ী মাদক নিবারণী সমিতি গঠিত হইয়াছে।" —জনশক্তি, ৫।১০।২১।

আবার—

"শ্রমজীবীদের প্রতিজ্ঞা।—গত পূর্ব্ব রবিবার রিষড়ায় শ্রমজীবীরা এক সভা করিয়াছিল। শ্রমজীবীদের মধ্যে মদ্য-পান নিবারণ করিবার উপদেশ দেওয়াই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। সভায় প্রায় দশ হাজার লোক আসিয়াছিল। সভাপতি পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মদ্য-পানের কুফল সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। সেখানকার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমজীবীরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে তাহারা আর মদ ছুঁইবে না। সে দিন ছুটী থাকা সত্বেও সেখানে মদ বিক্রয় হয় নাই।"

সাধারণ শিক্ষা লাভে ছেলেদের আগ্রহ ত খুবই বেশী। দানীং শিল্প-শিক্ষা-লাভে তাহাদের অতিমাত্র আগ্রহ দেখা যাইতেছে। তাই চারিদিকে চরকায় সূতা-কাটা এবং তাঁতে কাপড় বোনা শিক্ষা দিবার কিছু কিছু ব্যবস্থা হইতেছে। ইহা অবশ্যই আনন্দের বিষয়—

"স্কুলে সূতাকাটা শিক্ষা।—চাঁদপুর ন্যাশন্যাল স্কুলের কর্তৃক সূতা-কাটা শিক্ষা দিবার জন্য একটী শ্রেণী খুলিয়াছেন।"

বরিশাল হিতৈষী, ২১।৯।২১।

"বলা আবশ্যক যে, শীঘ্রই শ্রীহট্ট সহরে একটী বয়ন-বিদ্যালয় খোলার আয়োজন হইতেছে। প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হইলে অন্যান্য শিল্প শিক্ষা দানের জন্যও বিদ্যালয় খোলা হইবে এবং দুস্থ ছাত্রদিগকে উপযুক্ত বৃত্তি দিয়া নানা স্থানে শিল্প শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইবে।"

—জনশক্তি, ১৩।১।২১।

সরকার বাহাদুরও শিক্ষার বিস্তৃতি সাধনে অমনোযোগী নহেন ; প্রমাণ—

"কৃষি বিদ্যালয়।—কৃষক-সন্তানদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য সরকার চুঁচুড়ায় একটি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এই কৃষিবিদ্যালয়ে সাধারণতঃ কৃষক সন্তান দিগকেই শিক্ষা প্রদান করা হইবে। তাহাদিগকে তথায় দুই বৎসরকাল শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয়-সমূহের পঞ্চম ও ষষ্ঠ মান পরীক্ষার জন্য যেরূপ পাঠের ব্যবস্থা আছে, এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সেই সকল পুস্তক পড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বর্ত্তমান কালের উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তাহারও বন্দোবস্ত করা হইবে। ভূমি-কর্ষণ, ভূমিতে সার প্রদান, বীজ বপন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের সঙ্গে কৃষিযন্ত্র নির্ম্মাণ ও তাহা মেরামত করিবার প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। কিন্তু দুই বৎসর কালের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কতটুকু কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিবে তাহাই ভাবিবার বিষয়।" সম্মিলনী, ঢাকা-প্রকাশ।

গৃহশিল্পের হিসাবে চরকা ও তাঁত চালাইয়া সূতা-কাটা ও কাপড় বোনার যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা সুলক্ষণ। এখন যেরূপ উৎসাহ দেখা যাইতেছে, তাহা কিছুদিন স্থায়ী হইলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ, যদি চরকা ও তাঁতের উন্নতি সাধনের চেষ্টা সফল হয়, তাহা হইলে হয় ত গৃহশিল্পজাত সূতা ও বস্ত্র কলের সহিত প্রতিযোগিতাও করিতে পারে—

"বিক্রমপুরে তাঁত প্রতিষ্ঠা—আমাদের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—"বিক্রমপুরান্তর্গত পয়সাগাও একটী গণ্ডগ্রাম; ঐ গ্রামস্থ কতিপয় ভদ্রলোকের উৎসাহে ও উদ্যোগে এক মাসের অধিক কাল যাবৎ তথায়

দুইখানি নূতন ধরণের কাপড়ের তাঁত বা কল প্রতিষ্ঠিত হইয়া কার্য্য চলিতেছে। ভদ্রলোকের ছেলেরাই এই কলের কর্ম্মকর্ত্তা; ইতিমধ্যেই তাঁহারা কয়েক জোড়া জাম শাড়ী প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া কর্ম্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক তাঁতে ১০ ঘণ্টা কাল বয়নকার্য্য চলিলে, ১খানা ৪৪ ইঞ্চি ১০ হাত কাপড় প্রস্তুত হয়; কাপড়ের মূল্যও বাজার-দর অপেক্ষা কম পড়ে। সুতরাং গ্রামে গ্রামে যদি এইরূপ তাঁতের প্রচলন হয়, তবে বর্ত্তমান বস্ত্রসঙ্কটকালে অনেক উপকার হইতে পারে। এই তাঁতের দৃঢ়তর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাই আমরা ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি।"

ঢাকাপ্রকাশ, ৮।১।২১।

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী

তৃতীয় পর্ব্ব

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

সাধু জিজ্ঞাসা করিল, গঙ্গামাটি কি তোমাদের জমিদারী দিদি?

রাজলক্ষ্মী একটু হাসিয়া কহিল, দেখ্‌চ কি ভাই, আমরা একটা মস্ত জমিদার।

এবার উত্তর দিতে গিয়া সাধুও একটুখানি হাসিয়া ফেলিল। বলিল, মস্ত জমিদারী কিন্তু মস্ত সৌভাগ্য নয় দিদি। তাহার কথায় তাহার পার্থিব অবস্থা সম্বন্ধে আমার একপ্রকার সন্দেহ জন্মিল, কিন্তু রাজলক্ষ্মী সে দিক দিয়া গেলনা। সে সরল ভাবে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া লইয়া কহিল, সে কথা সত্যি ঠাকুরপো। ও-সব যত দূর হয়ে যায় ততই ভাল।

আচ্ছা দিদি, উনি ভাল হয়ে গেলেই তোমরা আবার সহরে ফিরে যাবে?

ফিরে যাবো? কিন্তু আজ সে তো অনেক দূরের কথা আনন্দ!

সাধু কহিল, পারো ত আর ফিরোনা দিদি। এই সব দরিদ্র দুর্ভাগাগুলোকে তোমরা ফেলে চলে গেছ বলেই এদের দুঃখ কষ্ট এমন চতুর্গুণ হয়ে উঠেছে। যখন ছিলে, তখনও যে এদের কষ্ট তোমরা দাওনি তা নয়, কিন্তু দূরে থেকে এমন নিছক দুঃখ তাদের দিতে পারোনি। তখন দুঃখ যেমন দিয়েচ, দুঃখের ভাগও তেমনি নিয়েচ। দিদি, দেশের রাজা যদি দেশেই বাস করে, দেশের দুঃখ দৈন্য বোধ করি এমন কাণায়-কাণায় ভর্ত্তি হয়ে ওঠে না। আর এই কাণায় কাণায় বল্‌তে যে কি বুঝায়, তোমাদের সহর-বাসের সর্ব্ব-প্রকার আহার-বিহারের যোগান দেবার অভাব এবং অপব্যয়টা যে কি, এ যদি একবার চোখ-মেলে দেখ্‌তে পারো দিদি—

হাঁ আনন্দ, বাড়ীর জন্যে তোমার মন কেমন করেনা?

সাধু সংক্ষেপে কহিল, না। সে বেচারা বুঝিল না, কিন্তু আমি বুঝিলাম রাজলক্ষ্মী প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া ফেলিল কেবল সহিতে পারিতেছিল না বলিয়াই।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া রাজলক্ষ্মী ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ীতে তোমার কে কে আছেন?

সাধু কহিল, কিন্তু বাড়ী ত এখন আর আমার নেই দিদি।

রাজলক্ষ্মী আবার অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, আচ্ছা আনন্দ, এই বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে কি তুমি শান্তি পেয়েছ?

সাধু হাসিয়া কহিল, ওরে বাসরে! সন্ন্যাসীর অত লোভ! না দিদি, আমি কেবল পরের দুঃখের ভার নিতে একটু চেয়েচি, তাই শুধু পেয়েচি।

রাজলক্ষ্মী আবার নীরব হইয়া রহিল। সাধু কহিল, উনি বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছেন, কিন্তু এইবার একটু তাঁর গাড়ীতে গিয়ে বসি গে। আচ্ছা দিদি, কখনো যদি দু'চার দিন তোমাদের অতিথি হই উনি কি রাগ করবেন?

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, উনি-টি কে? তোমার দাদা?

সাধুজীও মৃদু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, না হয় তাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আর আমি রাগ কোরব কি না জিজ্ঞেসা করলে না? আচ্ছা, চল ত একবার গঙ্গামাটিতে, তার পরে তার বিচার হবে।

সাধুজী কি বলিলেন, শুনিতে পাইলাম না, বোধ করি কিছুই বলিলেন না। ক্ষণেক পরে আমার গাড়ীতে উঠিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন, দাদা, আপনি কি জেগে আছেন?

আমি জাগিয়াই ছিলাম, কিন্তু সাড়া দিলাম না। তখন আমারই পাশে সাধুজী একটুখানি স্থান করিয়া লইয়া তাঁহার ছেঁড়া কম্বলখানি গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িলেন। একবার ইচ্ছা হইল একটুখানি সরিয়া গিয়া বেচারাকে আর একটু যায়গা দিই, কিন্তু পাছে নড়া-চড়া করিতে গেলে, তাঁহার সন্দেহ জন্মে আমি জাগিয়া আছি, কিম্বা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেছে এবং এই গভীর নিশীথে আর এক দফা দেশের সুগভীর সমস্যা আলোড়িত হইয়া উঠে, এই ভয়ে করুণা প্রকাশের চেষ্টা মাত্র করিলাম না।

গঙ্গামাটিতে গাড়ী কখন প্রবেশ করিল আমি জানিতে পারি নাই, জানিলাম যখন গাড়ী থামিল আসিয়া আমাদের নূতন বাটীর দ্বারপ্রান্তে। তখন সকাল হইয়াছে। গোটা চারেক গো যানের বিবিধ এবং বিচিত্র কোলাহলে চতুষ্পার্শ্বে ভিড় বড় কম জমে নাই। রতনের কল্যাণে পূর্ব্বাহ্নেই শুনিয়াছিলাম এটা নাকি মুখ্যতঃ ছোট-জাতির গ্রাম। দেখিলাম, রাগ করিয়া কথাটা সে নিতান্ত মিথ্যা কহে নাই। এই শীতের ভোরেও পঞ্চাশ-ষাটটি নানা বয়সের ছেলে মেয়ে উলঙ্গ এবং অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় বোধ করি এইমাত্র ঘুম ভাঙিয়া তামাসা দেখিতে জমা হইয়াছে। পশ্চাতে বাপ মায়ের দলও যথা-যোগ্য ভাবে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে। ইহাদের আকৃতি ও পোসাক-পরিচ্ছদে ইহাদের কৌলীন্য সম্বন্ধে আর যাহার মনে যাহাই থাক্, রতনের মনের মধ্যে বোধ হয় সংশয়ের বাষ্পও রহিল না। তাহার ঘুম-ভাঙা-মুখ এক নিমিষেই বিরক্তি ও ক্রোধে ভীমরুলের চাকের মত ভীষণ হইয়া উঠিল। কর্ত্রীকে দর্শন করিবার অতি-ব্যগ্রতায় গোটা কয়েক ছেলে-মেয়ে কিঞ্চিৎ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ঘেঁষিয়া আসিয়াছিল, রতন এমন একটা বিকট ভঙ্গী করিয়া তাহাদের তাড়া করিল যে রাজলক্ষ্মীর সমুখে না থাকিলে সেইখানেই একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিত। রতন কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করিল না। আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, যত সব ছোট-জেতের মরণ! দেখ্চেন বাবু ছোট্‌লোক ব্যাটাদের আস্পদ্দা —যেন রথ-দোল্ দেখ্‌তে এসেচে! আমাদের সব ভদ্দর-লোক কি এখানে থাক্‌তে পারে বাবু? এখুনি সব ছোঁয়া-চুঁয়ি কোরে একাকার করে দেবে।

'ছোঁয়া চুঁয়ি' কথাটা সর্ব্বাগ্রে কানে গেল রাজলক্ষ্মীর। তাহার মুখখানি যেন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

সাধুজী নিজের বাক্স নামাইতে ব্যস্ত ছিলেন, কাজটা সমাধা করিয়া তিনি এক লোটা বাহির করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন, এবং কাছাকাছি যে ছেলেটাকে পাইলেন অকস্মাৎ তাহারই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, ওরে ছেলে, যা তো ভাই, এখানে কোথা ভাল পুকুর-টুকুর আছে—এক ঘটি জল নিয়ে আয়,—চা খেতে হবে। বলিয়া পাত্রটা তাহার হাতে ধরাইয়া দিয়া সমুখের একজন প্রৌঢ়-গোছের লোককে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, মোড়লের পো, কাছা-কাছি কার গরু আছে দেখিয়ে দাও ত দাদা, এক ছটাক দুধ চেয়ে আনি। গাঁয়ের টাট্‌কা খাঁটি জিনিস,—চায়ের রংটা যা দাঁড়াবে দিদি,—বলিয়া তিনি একবার আমার ও একবার তাঁহার দিদির মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দিদি কিন্তু এ উৎসাহে কিছুমাত্র যোগ দিলেন না। অপ্রসন্ন মুখে একটু হাসিয়া কহিলেন, রতন, যা তো বাবা ঘটিটা মেজে একটু জল নিয়ে আয়।

রতনের মেজাজের খবরটা ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছি। তার উপর এই শীতের সকালে যখন কে-একটা অচেনা সাধুর জন্য কোথাকার একটা নিরুদ্দেশ জলাশয় উদ্দেশ করিয়া জল আনিবার ভার পড়িল, তখন আর সে আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিল না। এক মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল তাহার চেয়েও যে ছোট, সেই হতভাগ্য বালকটার উপর। তাহাকে সে একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়া কহিয়া উঠিল, নচ্ছার পাজি ব্যাটা! ঘটি ছুঁলি কেন তুই? চল্ হারামজাদা, ঘটি মেজে জলে ডুবিয়ে দিবি! বলিয়া সে কেবল চোখ-মুখের ভঙ্গিতেই ছেলেটাকে যেন গলা-ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া লইয়া গেল।

তাহার কাণ্ড দেখিয়া সাধু হাসিল, আমিও হাসিলাম। রাজলক্ষ্মী নিজেও একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল, আমাটা

যে তোল-পাড় করে তুল্‌লে আনন্দ! সাধুদের বুঝি রাত না পোয়াতেই চা চাই?

সাধু বলিল, গৃহীদের রাত পোহায়নি বলে বুঝি আমাদেরও পোহাবে না? বেশ ত! কিন্তু দুধের যোগাড় যে করা চাই। আচ্ছা, বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে দেখা যাক্‌ কাঠ-কুটো, উনুন-টুনুন আছে কিনা! ওহে, কত্তা, চল না দাদা, কার ঘরে গরু আছে একটু দেখিয়ে দেবে। দিদি, কালকের সেই হাঁড়িটায় বর্ফি কিছু ছিল না? না, গাড়ীর মধ্যে অন্ধকারে তাকে শেষ করেছেন?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, পাড়ার যে দু চার জন মেয়েরা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, তাহারাও মুখ ফিরাইল।

এমন সময়ে গমস্তা কাশীরাম কুশারী মহাশয় হন্তদন্ত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে তাঁহার তিন চার জন লোক, কাহারো মাথায় ঝুড়ি-ভরা শাক্‌-সব্‌জী ও তরকারি, কাহারো হাতে ঘটি-ভরা দুধ, কাহারো হাতে দধির ভাণ্ড, কাহারো হাতে একটা বৃহদায়তন রোহিত-মৎস্য। রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি আশীর্ব্বাদের সঙ্গে-সঙ্গে এই সামান্য একটু বিলম্বের জন্য বহুবিধ কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন। লোকটিকে আমার ভাল বলিয়াই মনে হইল। বয়স পঞ্চাশের উপরে গিয়াছে। কিছু কৃশ, দাড়ি-গোঁফ কামানো,—রঙ্‌টি ফর্সার দিকেই। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, তিনিও প্রতি-নমস্কার করিলেন। কিন্তু সাধুজী এ সকল প্রচলিত ভদ্রতার ধার দিয়াও গেলেন না। তিনি তরকারির ঝুড়িটা স্বহস্তে নামাইয়া লইয়া তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিলেন, দুধ যে খাঁটি সে বিষয়ে নিঃসংশয় মত দিলেন, এবং মৎস্যটির ওজন কত তাহা অনুমান করিয়া ইহার আস্বাদ-সম্বন্ধে উপস্থিত সকলকেই আশান্বিত করিয়া তুলিলেন।

এই সাধু মহারাজের শুভাগমন সম্বন্ধে গমস্তা মহাশয় পূর্ব্বাহ্নে কোন সম্বাদ পান নাই, তিনি কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। রাজলক্ষ্মী কহিল, সন্ন্যাসী দেখে ভয় পাবেন না কুশারী মশাই, ওটি আমার ভাই। একটু হাসিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, আর বারবার গেরুয়া ছাড়ানো যেন আমার একটা কাজ হয়ে উঠেছে।

কথাটা সাধুজীর কাণে গেল। কহিলেন, এ কাজটা অত সহজ হবেনা দিদি! বলিয়া আমার প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া তিনি একটুখানি হাসিলেন। ইহার অর্থ আমিও বুঝিলাম, রাজলক্ষ্মীও বুঝিল। সে কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেবল একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, সে দেখা যাবে।

বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল কুশারী-মহাশয় বন্দোবস্ত বড় মন্দ করেন নাই। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বলিয়া তিনি নিজে সরিয়া গিয়া পুরাতন কাছারি-গৃহটিকেই কিছু-কিছু সংস্কার এবং পরিবর্ত্তন করিয়া দিব্য বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। ভিতরে রান্না এবং ভাঁড়ার ঘর ছাড়া শোবার ঘর দু'টি। ঘরগুলি মাটির, খড় দিয়া ছাওয়া, কিন্তু বেশ উঁচু এবং বড়। বাহিরে বসিবার ঘর-খানিও চমৎকার পরিপাটি। প্রাঙ্গণ প্রশস্ত, পরিষ্কার এবং মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা। এক ধারে একটি ছোট কূপ, এবং তাহারই অদূরে গোটা দুই তিন টগর ও শেফালি বৃক্ষ। আর একদিকে অনেকগুলি ছোট বড় তুলসী গাছের সারি, এবং গোটা চারেক জুঁই ও মল্লিকা ফুলের ঝাড়। সব শুদ্ধ যায়গাটা দেখিয়া যেন তৃপ্তি-বোধ হইল।

সকলের চেয়ে উৎসাহ দেখা গেল, সন্ন্যাসী-ভায়ার। যাহা কিছু তাঁহার চোখে পড়িল, তাহাতেই উচ্চকণ্ঠে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—যেন এমন আর কখনও দেখেন নাই। আমি কলরব না তুলিলেও মনে-মনে খুসিই হইয়া-ছিলাম। রাজলক্ষ্মী তাহার ভাইয়ের জন্য রান্না-ঘরে চা তৈরি করিতেছিল, অতএব মুখের ভাব তাহার চোখে দেখা গেলনা বটে, কিন্তু মনের ভাব তাহার কাহারও কাছে অবিদিত ছিলনা। কেবল দলে ভিড়িল না রতন। সে মুখখানা তেম্‌নি ভারি করিয়াই একটা খুঁটি ঠেস দিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

চা প্রস্তুত হইল। সাধুজী কল্যকার অবশিষ্ট মিষ্টান্ন-যোগে পেয়ালা দুই চা নিঃশেষে পান করিয়া উঠিলেন। এবং আমাকে কহিলেন, চলুন না গ্রামখানা একবার দেখে আসা যাক্‌। বাঁধটাও দূরে নয়, অম্‌নি স্নানটাও সেরে আসা যাবে। দিদি, আসুন না জমিদারী পরিদর্শন কোরে আস্‌বেন। বোধ হয় ভদ্রলোক বড় কেউ নেই,—লজ্জা করবার বিশেষ আবশ্যক হবে না। সম্পত্তিটি ভাল, দেখে লোভ হচ্চে।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, তা' জানি। সন্ন্যাসীদের স্বভাবই ওই।

আমাদের সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ এবং আরও একজন চাকর আসিয়াছিল, তাহারা রন্ধনের আয়োজন করিতেছিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, না মহারাজ, অমন টাট্‌কা মাছের মুড়ো তোমাকে দিয়ে ভরসা হয় না, নেয়ে এসে রান্নাটা আমিই চড়িয়ে দেব। এই বলিয়া সে আমাদের সঙ্গে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত রতন কোন কথায় বা কাজে যোগ দান করে নাই। আমরা বাহির হইতেছি, এমন সময়ে সে অত্যন্ত ধীর গম্ভীর স্বরে কহিল, মা, ঐ যে বাঁধ না পুকুর কি একটা পোড়া দেশের লোকে বলে ওতে যেন আপনি নাব্‌বেন না। ভয়ানক জোঁক আছে,—এক একটা না কি এক হাত কোরে।

মুহূর্তে রাজলক্ষ্মীর মুখ ভয়ে পাণ্ডুর হইয়া গেল,—বলিস্‌ কি রতন, এদিকে কি বড্ড জোঁক না কি?

রতন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ, তাই ত শুনে এলুম।

সাধু তাড়া দিয়া উঠিলেন,—আজ্ঞে হাঁ, শুনে এলে বৈ কি! ব্যাটা নাপ্‌তে ভেবে ভেবে আচ্ছা ফন্দি বার করেছে! ইহার মনের ভাব এবং জাতির পরিচয় সাধু পূর্ব্বাহ্নেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন; হাসিয়া কহিলেন, দিদি, ওর কথা শুনবেন না, আসুন। জোঁক আছে কি না সে পরীক্ষা না হয় আমাদের দিয়েই হয়ে যাবে।

তাঁহার দিদি কিন্তু আর এক পা অগ্রসর হইলেন না, জোঁকের নামে একেবারে অচল হইয়া কহিলেন, আমি বলি আজ না হয় থাক্‌ আনন্দ। নতুন যায়গা, বেশ না জেনে শুনে অমন দুঃসাহস করা ভাল হবেনা। রতন, তুই না হয় ওঠ্‌ বাবা, এইখানেই দু-ঘড়া জল কুয়ো থেকে তুলে দে। আমাকে আদেশ হইল,—তুমি রোগা মানুষ, তুমি যেন আর কোথাকার কোন জলে নেয়ে এসো না! বাড়ীতেই দু-ঘটি জল মাথায় দিয়ে আজকের মত নিরস্ত হও।

সাধু হাসিয়া বলিলেন, আর আমিই কি এত অবহেলার দিদি, যে আমাকেই কেবল সেই জোঁকের পুকুরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন?

কথাটা বেশি কিছু না, কিন্তু এইটুকুতেই রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু যেন হঠাৎ ছলছল্‌ করিয়া আসিল। সে ক্ষণকাল নীরবে স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে যেন অভিষিক্ত করিয়া কহিল, তুমি যে ভাই মানুষের হাতের বাইরে। যে বাপ-মায়ের কথা শোনেনি, সে কি একটা কোথাকার অজানা-অচেনা বোনেরই কথা রাখ্‌বে?

সাধু প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়া সহসা একটু থামিয়া কহিলেন, এই অজানা-অচেনা কথাটি বল্‌বেন না দিদি। আপনাদের সবাইকে চিন্‌বো বলেই ত ঘর ছেড়ে আসা, নইলে আমার কি দরকার ছিল বলুন ত? এই বলিয়া তিনি একটু দ্রুত পদেই বাহির হইয়া গেলেন, এবং আমিও পিছু পিছু তাঁহার সঙ্গ লইলাম।

দুইজনে এইবার বেশ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া গ্রামখানিকে দেখিয়া লইলাম। গ্রামখানি ছোট, এবং আমরা যাহাদের ছোট জাত বলি তাহাদেরই। বস্তুতঃ, ঘর দুই বারুজীবী এবং এক ঘর কর্ম্মকার ব্যতীত গঙ্গামাটিতে জলাচরণীয় কেহ নাই। সমস্তই ডোম এবং বাউরিদের বাস। বাউরিরা বেতের কাজ এবং মজুরি করে, এবং ডোমেরা চাঙ্গারি, কুলা, চুপ্‌ড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া পোড়ামাটি গ্রামে বিক্রয় করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। গ্রামের উত্তর দিকে যে জল-নিকাশের বড় নালা আছে তাহারই ও-পারে পোড়ামাটি। শোনা গেল ও-গ্রামখানা বড়, এবং উহাতে অনেক ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির বাস আছে। আমাদের কুশারী মহাশয়ের বাটীও ওই পোড়ামাটিতেই। কিন্তু পরের কথা পরে হইবে, আপাততঃ নিজেদের গ্রামের যে অবস্থা চোখে দেখা গেল তাহাতে চোখের দৃষ্টি জলে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। বেচারীরা ঘরগুলিকে প্রাণপণে ছোট করিতে ত্রুটি করে নাই, তথাপি এত ক্ষুদ্র গৃহও যথেষ্ট খড় দিয়া ছাইবার মত খড় এই সোনার বাঙ্‌লা দেশে তাহাদের ভাগ্যে জুটে নাই। এক ছটাক জমি-যায়গা প্রায় কাহারও নাই, কেবল মাত্র চাঙ্গারি চুপ্‌ড়ি হাতে বুনিয়া এবং জলের দামে গ্রামান্তরের সৎ গৃহস্থের দ্বারে বিক্রয় করিয়া কি করিয়া যে ইহাদের দিনপাত হয় আমি ত ভাবিয়া পাইলাম না। তবুও এমনি করিয়াই এই অশুচি-অস্পৃশ্যদের দিন চলিতেছে এবং হয় ত এমনি করিয়াই ইহাদের চিরদিন চলিয়া গেছে, কিন্তু, কোন দিন কেহ খেয়াল মাত্র করে নাই। পথের কুকুর যেমন জন্মিয়া গোটা কয়েক বৎসর যেমন-তেমন

ভাবে জীবিত থাকিয়া কোথায় কি করিয়া মরে, তাহার যেমন কোন হিসাব কেহ কখন রাখে না, এই হতভাগা মানুষগুলারও ইহার অধিক দেশের কাছে এক বিন্দু দাবী-দাওয়া নাই। ইহাদের দুঃখ, ইহাদের দৈন্য, ইহাদের সর্ব্ববিধ হীনতা আপনার এবং পরের চক্ষে এমন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে মানুষের পাশে মানুষের এত বড় লাঞ্ছনায় কোথায় কাহারও মনে লজ্জার কণা মাত্র নাই। কিন্তু সাধু যে আমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন আমি জানিতাম না। তিনি হঠাৎ কহিলেন, দাদা, এই হচ্চে দেশের সত্যিকার ছবি। কিন্তু মনঃক্ষুণ্ণ করবার দরকার নেই। আপনি ভাবচেন এ সব বুঝি এদের অহরহ দুঃখ দেয়, কিন্তু তা' মোটেই নয়।

আমি ক্ষুব্ধ এবং অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলাম, এটা কি রকম কথা হ'ল সাধুজী?

সাধুজী বলিলেন, আমাদের মত যদি সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াতেন দাদা, তা'হলে বুঝতেন আমি প্রায় সত্যি কথাটাই বলেচি। দুঃখটা বাস্তবিক কে ভোগ করে দাদা? মন ত? কিন্তু সে বালাই কি আমরা আর এদের রেখেচি? বহুদিনের অবিশ্রাম চাপে একেবারে নিঙড়ে বার করে দিয়েচি। এর বেশি চাওয়াটাকে এখন নিজেরাই এরা অন্যায় স্পর্দ্ধা বলে মনে করে। বাঃ রে বাঃ! কি কলই না বাপ-পিতমরা আমাদের ভেবে ভেবে আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন! এই বলিয়া সাধু নিতান্ত নিষ্ঠুরের মতই হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতেও পারিলাম না; এবং, তাঁহার কথাটারও ঠিক অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠিলাম।

এ বৎসর ফসল ভাল হয় নাই, জলের অভাবে হেমন্তের ধানটা প্রায় আট-আনা রকম শুকাইয়া গিয়া ইতিমধ্যেই অভাবের হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছিল। সাধু কহিলেন, দাদা, যে ছলেই হোক্ ভগবান যখন আপনাকে আপনার প্রজাদের মধ্যে ঠেলে পাঠিয়েছেন, তখন হঠাৎ আর পালাবেন না, অন্ততঃ এ বছরটা কাটিয়ে যাবেন। বিশেষ কিছু যে করতে পারবেন, তা ভাবিনে, তবে চোখ দিয়েও প্রজার দুঃখের ভাগ নেওয়া ভাল, তাতে জমিদারী করার পাপের বোঝাটা কতক হাল্কা হয়।

আমি মনে মনে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, জমিদারী এবং প্রজা আমারই বটে! কিন্তু পূর্ব্বেও যেমন জবাব দিই নাই, এবারও তেমনি নীরব হইয়া রহিলাম।

ক্ষুদ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া স্নান সারিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গেছে। কাল অপরাহ্নের মত আজও আমাদের উভয়কে খাইতে দিয়া রাজলক্ষ্মী একপাশে বসিল। সমস্ত রান্না সে নিজে রাঁধিয়াছে, সুতরাং মাছের মুড়া ও দধির সর সাধুর পাতেই পড়িল। সাধুজী বৈরাগী মানুষ, কিন্তু সাত্ত্বিক এবং অসাত্ত্বিক, নিরামিষ এবং আমিষ কিছুতেই তাঁহার কিছুমাত্র বিরাগ দেখা গেল না, বরঞ্চ, এরূপ উদ্দাম অনুরাগের পরিচয় দিলেন যাহা ঘোর সাংসারিকের পক্ষেও দুর্লভ। রান্নার ভাল-মন্দের সমজদার ব্যক্তি বলিয়াও যেমন আমার খ্যাতি ছিল না, আমাকে বুঝাইবার দিকেও রাঁধুনীর কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ পাইল না।

সাধুর তাড়া নাই, অত্যন্ত ধীরে সুস্থে আহার করেন,—চর্ব্বন করিতে করিতে কহিলেন, দিদি, সম্পত্তিটি সত্যিই ভাল, ছেড়ে যেতে মায়া হয়।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ছেড়ে যেতে ত তোমাকে আমরা সাধ্‌ছিনে ভাই।

সাধু হাসিয়া কহিলেন, সন্ন্যাসী-ফকিরকে কখনো এত প্রশ্রয় দেবেন না দিদি,—ঠক্‌বেন। তা সে যাই হোক্, গ্রামটি বেশ, কোথাও একজন এমন চোখে পড়ল না যার জল ছোঁয়া যায়। এমন একটা ঘর দেখ্‌লাম না যার চালে এক আঁটি আস্ত খড় আছে,—যেন ঋষিদের আশ্রম।

আশ্রমের সহিত এই অস্পৃশ্য গৃহগুলির একদিক দিয়া যে উৎকট সাদৃশ্য ছিল, সেই কথা মনে করিয়া রাজলক্ষ্মী একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া আমাকে বলিল, শুনলুম সত্যিই না কি এ গাঁয়ে কেবল ছোট জাতের বাস,—এক ঘটি জলের প্রত্যাশাও কারও নেই। বেশি দিন দেখ্‌ছি থাকা চল্‌বে না।

সাধু একটু হাসিলেন, আমি কিন্তু নীরব হইয়া রহিলাম। কারণ, রাজলক্ষ্মীর মত করুণাময়ীও কোন্ সংস্কারের মধ্যে দিয়া এত বড় লজ্জার কথা উচ্চারণ করিতে পারিল আমি তাহা জানিতাম।

বিদ্ধ করিল না। তাই, কথা কহিলাম না সত্য, তথাপি আমার মন ওই রাজলক্ষ্মীকেই উদ্দেশ করিয়া ভিতরে ভিতরে বলিতে লাগিল, লক্ষ্মী, মানুষের কর্ম্মই কেবল অস্পৃশ্য ও অশুচি হয়, মানুষ হয় না। না হইলে পিয়ারী কিছুতেই আজ আবার লক্ষ্মীর আসনে ফিরিয়া আসিয়া বসিতে পারিত না। আর সে কেবল সম্ভব হইয়াছে এইজন্য যে মানুষকে কেবলমাত্র মানুষের দেহ বলিয়া আমি কোন দিন ভুল করি নাই। সে পরীক্ষা আমার ছেলেবেলা হইতে বহুবার হইয়া গেছে। অথচ, এ সকল কথা মুখ ফুটিয়া তাহাকে বলিবারও যো নাই,—বলিবার প্রবৃত্তিও আর আমার নাই।

উভয়ে আহার সমাধা করিয়া উঠিলাম। রাজলক্ষ্মী আমাদের পান দিয়া বোধ করি নিজেও কিছু খাইতে গেল। কিন্তু আন্দাজ ঘণ্টা খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া সে নিজেও যেমন সাধুজীকে দেখিয়া আকাশ হইতে পড়িল, আমিও তেম্‌নি বিস্মিত হইলাম। দেখি, ইতিমধ্যে কখন্ তিনি বাহিরে গিয়া একটা লোক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন এবং ঔষধের সেই ভারি বাক্সটা তাহার মাথায় তুলিয়া দিয়া নিজেও প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

কাল এই কথাই ছিল বটে, কিন্তু আজ তাহা আমরা একেবারেই ভুলিয়াছিলাম। মনেও করি নাই এই প্রবাসে রাজলক্ষ্মীর এত আদর যত্ন উপেক্ষা করিয়া সাধুজী অনিশ্চয় অজানার জন্য এমন সত্বর উন্মুখ হইয়া উঠিবেন। স্নেহের শৃঙ্খল এত সহজে কাটিবার নয়, রাজলক্ষ্মীর নিভৃত মনের মধ্যে বোধ হয় এই আশাই ছিল,—সে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি কি যাচ্চো না কি আনন্দ?

সাধু বলিলেন, হাঁ দিদি, যাই। এখন না বেরুলে পৌছুতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

সেখানে কোথায় থাবে, কোথায় শোবে? আপনার লোক যে সেখানে কেউ নেই?

আগে ত গিয়ে পৌছই দিদি।

কবে ফিরবে?

সে তো এখন বলা যায়না দিদি। কাজের ভিড়ে যদি না এগিয়ে যাই ত একদিন ফিরতেও পারি।

রাজলক্ষ্মীর মুখখানি প্রথমে ফ্যাকাশে হইল, তারপরে সে মাথার একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, একদিন ফির্‌তেও পারো? না সে কিছুতেই হবেনা!

কি হবেনা তাহা বুঝা গেল, তাই সাধু প্রত্যুত্তরে শুধু একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিলেন, যাবার হেতু ত আপনাকে বলেচি দিদি।

বলেচ? আচ্ছা, তবে যাও—এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া সবেগে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। ক্ষণকালের নিমিত্ত সাধুজী স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তারপরে আমার প্রতি চাহিয়া লজ্জিত মুখে কহিলেন, আমার যাওয়া বড় দরকার।

আমি ঘাড় নাড়িয়া কেবলমাত্র বলিলাম, জানি। ইহার অধিক আর কিছু বলিবার ছিল না। কারণ, আমি অনেক দেখিয়া জানিয়াছি স্নেহের গভীরতা কিছুতেই কালের স্বল্পতা দিয়া মাপা যায়না। এবং এই বস্তুটা কাব্যের জন্য কবিরা কেবল শূন্য কল্পনাই করেন নাই,—সংসারে ইহা যথার্থই ঘটে। তাই, একের যাওয়ার প্রয়োজনও যতখানি সত্য, অপরের আকুল কণ্ঠের একান্ত নিষেধটাও ঠিক ততখানি সত্য কিনা, এ লইয়া আমার মনের মধ্যে বিন্দু পরিমাণও সংশয়ের উদয় হইল না। আমি অত্যন্ত সহজেই বুঝিলাম এই লইয়া রাজলক্ষ্মীকে হয় ত অনেক ব্যথাই ভোগ করিতে হইবে।

সাধুজী কহিলেন, আমি চোল্‌লাম। ওদিকের কাজ যদি মেটে ত হয় ত আবার আস্‌বো, কিন্তু এখন এ কথা জানাবার আবশ্যক নেই।

আমি স্বীকার করিয়া বলিলাম, তাই হবে।

সাধুজী কি একটা বলিতে গিয়া ঘরের দিকে চাহিয়া হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু হাসিলেন; তার পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, আশ্চর্য্য দেশ এই বাঙ্‌লা দেশটা। এর পথে ঘাটে মা-বোন্, সাধ্য কি এঁদের এড়িয়ে যাই! এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেলেন।

কথাটা শুনিয়া আমারও দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। মনে হইল তাই বটে! দেশের সমস্ত মা-বোনের বেদনা যাহাকে টান্ দিয়া ঘরের বাহির করিয়াছে, তাহাকে একটিমাত্র ভগিনীর স্নেহ, দধির সর এবং মাছের মুড়া দিয়া ধরিয়া রাখিবে কি করিয়া? (ক্রমশঃ)

স্ত্রী-শিক্ষা।

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্, এম্, এস্]

এই "ভারতবর্ষ" পত্রিকায়, ধারাবাহিকরূপে, "বাঙ্গালীর কথা" আলোচনা করিবার মানসে, কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। সেগুলি এই এই :—

বাঙ্গালীর শিক্ষা (১৩২৫, শ্রাবণ, ভাদ্র)
বাঙ্গালীর খাদ্য (১৩২৫, মাঘ, ফাল্গুন)
বাঙ্গালীর ছেলে (১৩২৬, বৈশাখ)
বাঙ্গালীর মেয়ে (১৩২৬, জ্যৈষ্ঠ)
ছেলে মানুষকরা (১৩২৬, শ্রাবণ)
মানুষ-গড়ার কথা (১৩২৬, অগ্রহায়ণ)

এই প্রবন্ধও, সেই "বাঙ্গালীর কথার" অংশ বিশেষ—স্বতন্ত্র নিবন্ধ নহে। এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমি এ প্রবন্ধে যাহা বলিব, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধগুলিতে যে ভাবে "বাঙ্গালীর কথা" আলোচনা করিয়াছি, সেই ভাবেই আলোচিত হইবে। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে, দেশকাল পাত্রোপযোগী আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।

অতীত কোন্ যুগে, এদেশে স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধীয় কি ব্যবস্থা ছিল, সে কথার আলোচনা করিব না। আমরা অত্যন্তই অতীত-মুখাপেক্ষী, বর্ত্তমানে উদাসীন, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধ। সেই কারণেই, বর্ত্তমানে কি আছে, ও কি নাই, এবং কি চাই, সেই দিক দিয়াই স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা করিব। তথাকথিত "ইতর" জাতির মধ্যে কি ভাবে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত হওয়া উচিত, স্বতন্ত্রভাবে তাহার বর্ণনার প্রয়োজন হইবে না। আমি সাধারণভাবে "শিক্ষিত" ও "ভদ্র" বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েদের শিক্ষার কথাই বলিব। এবং আশা করি, স্ত্রীশিক্ষার জন্য যে আয়োজন হইবে, তাহা ইতর-ভদ্র নির্ব্বিশেষে হইবে,—কেন না, কোনও সমাজে এক পক্ষ অন্ধকার রাখা নিরাপদ নহে।

বাঙ্গালীর ঘরে দুই রকমের স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া যায়—সধবা ও বিধবা। ধর্ম্মপরায়ণতা বা ধর্ম্মের নামে দেশাচার-পরায়ণতা ও স্বজনের সেবা, উভয়েরই প্রধান ব্রত। নিজে দেহের আরাম, দেহের যত্ন ও আহারের বিষয়ে চেষ্টা উভয়েরই মধ্যে বিরল—যদিও সহরে, বেশবিন্যাসের ঘটার অভাব নাই। সধবারা বহু সন্তানের জননী হইয়া, নানারূপ সুখ-দুঃখের মধ্যে থাকিয়া, স্বল্পায়ুঃ হন; ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবে, সাধারণতঃ পরের সংসারে দুঃখেরই মধ্যে মানুষ হইয়াও, বিধবারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ুঃ। সধবারা স্বামী-পুত্রের অর্থে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন; কিন্তু অনেকস্থলে বিধবারা একান্তই পরমুখাপেক্ষিণী, নিঃসহায়া; তাঁহারাই বাঙ্গালা-দেশে reserve force—ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা।

এক্ষণে দেখা যাউক, উভয়ের শিক্ষার কি ব্যবস্থা আমাদের সমাজে বর্ত্তমান কালে আছে। আমাদের মতে, উভয়েরই শিক্ষা একই হওয়া উচিত—সধবার ও বিধবার শিক্ষার বিষয়ে তারতম্য ঘটিবার কোনও হেতু দেখি না; তবে কোন অর্থকরী বিদ্যা বিধবাদিগকে শিক্ষা দিলে বড়ই ভাল হয়।

আমাদের এদেশে রীতিই এই যে, নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই, তাহার বিবাহ হইতেই হইবে, এবং তাহা ১২।১৪ বৎসরের মধ্যে হইলেই ভাল হয়। বংশ রক্ষা করা বিবাহের উদ্দেশ্য। যে বা যাহারা বংশধর হইবে, দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক—সকল দিক দিয়াই তাহারা বংশের গৌরবস্থল হইবে, এইটাই পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাঞ্ছনীয়;—কিন্তু, আমাদের এদেশে, সে জন্য বিশেষ আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও, কাজে ফল দাঁড়ায় অন্য রকমের। অর্থাৎ, ছেলে মানুষ করায় জ্ঞান আমাদের জননীকুলের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে যথেষ্ট আছে বলিয়া মনে হয় না। এ পৃথিবীতে এত কাণ্ডজ্ঞান-হীনা কোন রমণী নাই—সন্তানবতী জননীদের কথা দূরে থাকুক—যিনি ইচ্ছা করেন না যে, তাঁহার সন্তানের সর্ব্বাংশে উন্নতি হউক এবং সেই সঙ্গে তাহাদের কার্য্যকলাপও সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হউক। কিন্তু ইচ্ছা এক জিনিষ এবং চেষ্টা স্বতন্ত্র জিনিষ। "ইচ্ছা" ও "চেষ্টার" সুবর্ণ-সম্মিলনের সঙ্গে, "জ্ঞানের" যোগাযোগ না ঘটিলে, কাজ ফলবতী হয় না, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরও হয় না। আমাদের দেশে মাতৃকুলের মধ্যে

ইচ্ছাটা আছে, সামান্য চেষ্টাও আছে—কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে উৎকট অজ্ঞান বর্ত্তমান ও প্রেরণার অভাব। কাজেই বাঙ্গালীর মাতা ছেঁড়া কাঁথাও ঘুচাইবার চেষ্টা করেন না—অথচ লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিবার প্রলোভনও ত্যাগ করেন না—তাঁহারা গতানুগতিকে অনুসারিণী। আমিই যদি আমার কর্ত্তব্য না করি, তবে আর কাহার মাথাব্যথা?

কেন আমাদের ছেঁড়া কাঁথা ঘুচে না, কেন আমাদের লাখ টাকার স্বপ্ন ফলে না, এ কথা অদৃষ্টবাদী, তমোনিদ্রাবৃত, চাকুরী-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালার পুরুষেরাও ভাবেন না—স্ত্রীলোকদিগের কথা দূরে থাকুক। কোনও কালে অনাফেরাই নূতন পন্থার পথপ্রদর্শক—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দেখা যায়—কিন্তু "সত্বগুণ" বলিয়া ব্যাখ্যাত প্রকৃত তমোগুণের আধিক্য-বশতঃ এদেশে প্রাণের অত্যন্ত-অভাব হইয়া পড়িয়াছে।

কাযেই, যখন সন্তান প্রসব ও সন্তানের যথার্থ লালন-পালন করা এদেশের প্রত্যেক নারীরই কর্ত্তব্য, তখন আমাদের দেশে নারী-শিক্ষার প্রথম-শিক্ষার বিষয় হওয়া উচিত—দেহতত্ত্ব, মাতৃতত্ত্ব, সন্তানপালন শিক্ষা। কিন্তু শুধু সন্তান লইয়াই সংসার নহে—জগৎ ত নহে-ই। কাযেই, ঐ সঙ্গে সংসার করাও শিক্ষণীয় এবং সমস্ত জগতের সম-সাময়িক অবস্থার সহিত, নিজ-নিজ অবস্থার সামঞ্জস্য ঘটানর বিষয়ও শিক্ষণীয়। এ বিরাট জগতে কোথায় কি হইতেছে, জগৎ কোন্ পথে ধাবিত হইতেছে, জগতে কি করণীয়, আমরা তাহা হইতে কত পিছাইয়া আছি, এ সকল তথ্যই, পুরাঙ্গনা হইলেও, রমণীর অবশ্য আলোচ্য। পুরুষেরা সংবাদ-পত্র পাঠ করিয়া, সকল বিষয়ে অবহিত বা ওয়াকিব-হাল হইবেন, আর রমণীরা অন্তঃপুরচারিণী বলিয়া, অন্তঃপুরের বাহিরে সমস্ত জগৎটাতে নিশিদিনই অমাবস্যার ঘনান্ধকারের ছায়া দেখিবেন—এ ব্যবস্থা অত্যন্ত একদেশদর্শী এবং উন্নতির অন্তরায়। কালধর্ম্ম বা যুগধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করা অনেকস্থলে অন্যায় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত, কালধর্ম্মবশে, বর্ত্তমান সময়ে, ঘোর আর্থিক অভাব চতুর্দ্দিকেই সপ্রকাশ। "অর্থের" যতই "অনর্থ" ঘটাইবার ক্ষমতা থাকুক না কেন, কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, লোকসমাজে অর্থ না হইলে, এক পা চলিবার ক্ষমতা থাকে না। পুরুষেরা যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাতে সকলের সংসার চলে না। এমন অবস্থায়, রমণীরা যদি ঘরে বসিয়া অর্থোপার্জ্জনের উপযোগী কিছু-কিছু বিদ্যা শিক্ষা করেন, তাহা পৌরষভাব ব্যঞ্জক নহে—বরং সংসারের পক্ষে ভাল কথা।

অন্যায় ও অবিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যে রকমে, দিন-দিন, রমণীগণকে সকল বিষয়ে অযথা পরাধীনা অথচ বিলাসিনী এবং পরমুখাপেক্ষিণী করিয়া তুলিতেছি, তাহারই ফলে, পথে-ঘাটে, রেলে-ষ্টীমারে, স্ত্রীলোক লইয়া যাতায়াত করা দিন-দিন বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছে। যে অভিভাবক বা যে সমাজের দলপতি এ সকল দেখিয়া-শুনিয়াও নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকেন, তিনি সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব;—তিনি অত্যন্ত অদূরদর্শী। আত্মরক্ষা করার অধিকার সকলেরই আছে;—কাহারও অধিকার নাই, অপরকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা। আমার কথা শুনিয়া হয় ত অনেকে উপহাস করিয়া বলিবেন,—"তবে কি রমণীরা মল্লযুদ্ধ শিখিবেন?" আমি তাহার উত্তরে বলি—ক্ষতি কি? মল্লযুদ্ধ শিক্ষা দান করা আমার অভিপ্রেত নহে—দেহ সুগঠিত ও কর্ম্মঠ করা এবং সেই সঙ্গে আত্মরক্ষা-কৌশল শিক্ষা করানই উদ্দেশ্য। মল্লযুদ্ধ শিক্ষা, ব্যায়াম-কৌশল শিক্ষা, "কসরৎ" প্রভৃতি ত মাতৃত্বের বিরোধী নহে; এবং উহাদের ফলে দেহের লাবণ্য ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায় বৈ কমে না। তবে কেন তাহাতে বাঙ্গালীরা বিমুখ? যদি কেহ মনে করেন যে, ঐ সকল করিলে স্ত্রীদেহের লাবণ্যের হানি হয়, তবে তিনি ভ্রান্ত।

এ দেশে, দুই পুরুষ পূর্ব্বে, রমণীরা দুগ্ধ হইতে নানা জাতীয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে জানিতেন। তাঁহারা সূতা কাটিতে জানিতেন, কেহ-কেহ সলমা চুমকির কাযও করিতে জানিতেন; কন্থার উপরে নানারূপ সুচারু চিত্র-করা বিদ্যাও কাহারও থাকিত। তাঁহারা ভেষজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা রাখিতেন, কেহ-কেহ বা নাড়ীজ্ঞানে দক্ষা হইতেন। রন্ধনে, রোগী পরিচর্য্যায়, অনাথ বা আতুর সেবায় অনেকেরই সুনাম থাকিত। গৃহস্থালীর সুবন্দোবস্তের জন্য অনেকেরই যশঃসৌরভে দিক্‌দিগন্ত আমোদিত হইত। এ সকল কথা বলিবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, কেতাবতী বিদ্যায় দক্ষা না হইলেও, কি একালে, কি দুই পুরুষ পূর্ব্বে, রমণীদিগের পক্ষেও কোন-না-কোন অর্থকরী বা অর্থক্ষয়-নিবারণকারী বিদ্যা বা শিল্পশিক্ষা করা অবশ্য-

কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। তবে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালীর দেহে প্রাণ ছিল, মনে স্ফূর্ত্তি ছিল, এবং বাঙ্গালায় বিলাসিতার পূতিগন্ধ ছিল না। তাই, সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনে বাঙ্গালী সন্তুষ্ট থাকিতেন এবং বর্ত্তমান কালের পাশ্চাত্য প্রথা মত "নার্স" বা শুশ্রূষাকারিণী রাখা, পাচক রাখা, বা ক্রয় করিয়া ভোজনের বন্দোবস্ত করা এবং দান-ধ্যানের জন্য বা পরসেবার জন্য "হিত-সাধক সভা" করিয়া সামাজিক কর্ত্তব্য পালন করিবার প্রয়োজন হইত না। সমাজে, তৎকালের উপযোগী গোঁড়ামী ও "আচার"-নিষ্ঠা যথেষ্টই ছিল; সেইটুকুও উন্নতির প্রতিবন্ধক বড় কম ছিল না; কিন্তু তখন জাত্যভিমানী হইলেও, হিন্দু, মুসলমানকে "দাদা, খুড়া" বলিতেন এবং প্রেম-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতেন; এব যে কোনও বিপদ বা বিপাকের কথা শুনিলে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালী বুক দিয়া পড়িয়া তাহাকে উদ্ধার করিলেন। কারণ, তখন বাঙ্গালী পল্লীবাসী ছিলেন—এখন বাঙ্গালী সহরবাসী। এখন বাঙ্গালীর সমাজ (সঙ্ঘবদ্ধভাব) নাই, সমপ্রাণতা নাই, দেহের বল, মনের স্ফূর্ত্তি, সংসারে শান্তি সকলই গিয়াছে—এখন চারিদিকে বিশৃঙ্খলা এবং তাহার প্রশমনার্থ একমাত্র পয়সার বড়ই মাহাত্ম্য জাগিয়াছে।

এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া, আমাদিগকে কথা বলিতে হইবে। একদিকে, বহুবর্ষের জমাট দেশাচার ও বিদ্যাশূন্য-ভট্টাচার্য্য-মহাশয় ও বৃদ্ধদিগের পুরাতনে সনাতনত্বের আরোপ ও প্রগাঢ় বিশ্বাস; অপর দিকে, বর্ত্তমান যুগের কাণ্ডাকাণ্ড-বিবেচনাহীন কালাপাহাড়ী নীতি—এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হইবে। শুধু আমাদের দেশে কেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্রই, পুরাতনে অনেক সময়ে অযথা-প্রীতি দৃষ্ট হয়। কয়েকজন করিয়া লোক সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালেই থাকেন, যাঁহারা তৎকাল-প্রচলিত রীতিকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন; এবং এই হেতুবাদ দর্শান যে, সেই রীতিই বহুবর্ষের অনুমোদিত, অতএব অবর্জ্জনীয় এবং অনুপমেয়। পুরাতনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করিতে হইলে, মানসিক এবং সময়ে-সময়ে, যে দৈহিক ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাঁহারা তাহা করিতে অনিচ্ছুক। এই দেশেই এবং অধিকাংশ স্থলে, স্বার্থের খাতিরে, বহুযুগের পুরাতন, এবং হয় ত জীর্ণ, সংস্কার তাঁহারা ত্যাগ করিতে চাহেন না। আমি প্রাচীনদিগের কথাই বলিতেছি। কিন্তু, দুর্ভাগ্য বশতঃ, এই বাঙ্গালাদেশে, তথাকথিত পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত মহোদয়দিগের মধ্যেও এ জাতীয় লোক বিরল নহেন। এদেশে, প্রাচীনা এবং স্ত্রীলোক মাত্রেই ও অশিক্ষিত পুরুষেরা যে সকল রকম নূতনত্বের বিরোধী হইবেন, তাহাতে বিচিত্রতা নাই;—কিন্তু কি কারণে যে "শিক্ষিতেরা"ও সেই স্রোতে গা ভাসান দেন, তাহা খুঁজিয়া পাই না। শিক্ষিতেরা সকল কথার ভালমন্দ বিচার করিয়া, তবে তাহাকে গ্রহণ করিবেন বা ত্যাগ করিবেন, এইটাই আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু, বড়ই পরিতাপের বিষয়, যে আমরা এতদূর স্বার্থপর, ভোগবিলাসী ও ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব হইয়াছি যে, আমাদের দেশে শিক্ষিত পুরুষেরাও স্বাধীন ভাবে চিন্তা করাকে ভয় করেন, দৃঢ়তার সহিত স্বমত গঠন করিতে কুণ্ঠিত হন, স্বীয় বিশ্বাসের মত কার্য করিতে সাহসী হন না। অথচ, তাঁহারা এরকম কাপুরুষতা করিলে, স্বার্থকে এত বড় করিয়া দেখিলে, কি করিয়া দেশে অনুকূল পবন বহিবে, তাহা বুঝিতে পারি না। সকল বলের উপরে চরিত্রবল। সে বল আমাদিগের নাই। চরিত্রবল লাভ করিতে হইলে, সংযম, মনের বলের প্রয়োজন আগে। পুরুষদিগের মধ্যে তাহারও চেষ্টা কই? পাখী কখনো একপক্ষে ভর করিয়া উড়িতে পারে না। কোনও দেশে, কোনও কালে, রমণীগণকে "বেণের পুঁটুলির" মত নির্বীর্য্য, নিরক্ষর, জড়ভরত করিয়া রাখিয়া, কোনও জাতি জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারে নাই—আমরাও হইব না। এখনো "মনের বল" বলিয়া যে জিনিষটা আছে, এদেশে সেটা রমণীদিগের মধ্যেই আছে, পুরুষদিগের মধ্যে নাই। ধর্ম্মের উন্মাদনায় স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করা, কেরোসিন তৈল দ্বারা দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে পুড়িয়া মরা—"অবলা" রমণীরাই করিয়া থাকেন। আমি এ সকল কাজের আদৌ অনুমোদন করিতেছি না—শুধু কোন্ দিক দিয়া মনের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহারই ইঙ্গিত করিতেছি। যাহাদিগের মনের বল এত, তাহাদিগকে শিক্ষিত করিলে কত লাভ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

"এমন জমী রৈল পড়ে, আবাদ ক'রলে ফলত সোণা।"

এই রমণীর শিক্ষার জন্য দেশের সকলকেই [illegible]

হইতে হইবে। সে শিক্ষা কোন্ পথ দিয়া যাইবে, ও কি উদ্দেশ্যে আচরিত হইবে, তৎসম্বন্ধে বেশী কথা বলিবার আমার অধিকার নাই। বিশেষজ্ঞেরা তাহার মীমাংসা করুন। তবে আমার নিজের যে কয়েকটি বক্তব্য, তাহা এ স্থলে বলিব।

বর্ত্তমান কালে, "শিক্ষা" বলিলেই, স্কুল বা কলেজে যে বিদ্যা দান করা হয়, তাহাকেই বুঝায়। এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বম্ভর চাপে আমরা এতটা মৌলিক চিন্তার ধারা হারাইয়াছি যে, আমরা কিছুতেই মনে ধারণাও করিতে পারি না যে, শিক্ষার অপর আকার বা প্রকার থাকিতে পারে; অথচ, সুচতুর ইংরাজ বুঝিয়াছেন যে, একমাত্র কেতাবতী শিক্ষায় কি ছাত্রের, কি শিক্ষকের, অযথা মানসিক অপচয়ই ঘটিয়া থাকে; তাই তাঁহারা "স্কুল-ফাইনাল" সার্টিফিকেট দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালীকে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, দেহকে ননীর পুতুলকারী ও মনকে কূপমণ্ডুককারী স্কুল-কলেজের শিক্ষাই চরম ও পরম শিক্ষা নহে। যে শিক্ষার ফলে মনের শান্তি, দেহের সৌষ্ঠব ও সুখ এবং সাংসারিক ও সামাজিক স্বচ্ছন্দতা আসে, সেই প্রকৃত শিক্ষা। সে শিক্ষা শুধু পুস্তক পাঠে পাওয়া যায় না। সে শিক্ষার জন্য ঘরে বা বিদ্যালয়ে পাঠলাভ করিতে হয়, উপযুক্ত গুরুর মুখে উপদেশ গ্রহণ করিতে হয় এবং কঠোর নির্জ্জন তপস্যার দ্বারা আত্মশক্তির বিকাশ ঘটাইয়া, সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হয়;—তবে এক সঙ্গে দেহ, মন ও চিত্তবৃত্তির সম্যক পরিস্ফুটতা হয়। সে শিক্ষা ইংরাজ এদেশে দেয় নাই; সে শিক্ষা আজকাল সমাজও দেয় না, যেহেতু সমাজ আজ শব। পূর্ব্বে যে শিক্ষা এদেশের টোলে পাওয়া যাইত—সে শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা ছিল। জাতির চেষ্টা না থাকিলে, সমষ্টির একপ্রাণতা না ঘটিলে, দেশের ছেলেমেয়েদের প্রকৃত শিক্ষা অসম্ভব। পৃথিবীর মধ্যে যতগুলি শিক্ষাকেন্দ্র এপর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই জাতীয় চেষ্টার ফলে, গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে নহে। সদা গবর্ণমেণ্ট-মুখাপেক্ষী বাঙ্গালী আজ দয়া করিয়া এ কথা ভাবিবেন কি, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, স্যালার্নো, বুলন্, পাডুয়া, নদীয়া প্রভৃতির ইউনিভারসিটিতে তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের কত কপর্দ্দক আছে?

আজ এক যুগের উপর হইল, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যে সকল শিক্ষাসম্বন্ধীয় যুগান্তর ঘটিয়াছে—আজ একযুগ পরেও এদেশে সে সকল কথার নাম গন্ধও নাই। কারণ, এটি (ভারতবর্ষ) যে কুম্ভকর্ণের দেশের (লঙ্কা) প্রতিবেশী। পাশ্চাত্যজগতে সর্ব্বত্রই "শিক্ষাকে" সংসারের ও সমাজের সুবিধার উপযোগী করিয়া লওয়া হয়;—সে শিক্ষার ফলে, চিত্তের-না হউক অন্ততঃ দেহের, মনের সম্যক বিকাশ ঘটিয়া থাকে—তাহারা অনেকাংশে মনুষ্যত্বলাভ করিয়া থাকে। এদেশে "শিক্ষার" ফলে, দেহ পঙ্গু হয়, মানসিক স্বাভাবিক বৃত্তির লোপ হইয়া কতকটা অধীত বিদ্যার যন্ত্রবৎ স্ফুরণ হয় মাত্র এবং চিত্তবৃত্তির সঙ্কোচ ঘটিয়া থাকে। ইহার জন্য যে শিক্ষা-পদ্ধতির দোষ ষোল আনা—এমন কথা বলা চলে না। শিক্ষা-পদ্ধতির দোষ ত আছেই—তৎসঙ্গে গৃহে শিক্ষার যে অংশটুকু অভিভাবকগণের দেবার কথা, সেটুকুর অত্যন্ত অভাব ঘটিয়া থাকে। সমাজের ও গৃহস্থদের, প্রত্যেকেরই শিক্ষাদান করিবার অধিকার ও চরিত্র ও স্বাস্থ্যগঠন করিবার "দায়িত্ব" আছে;—সমাজ বা গৃহস্থ সে কর্ত্তব্য ও অধিকার পালনে আজ পরাঙ্মুখ—তাই আজ শিক্ষাও চমৎকার ফল প্রদান করিতেছে! শিক্ষার জন্য টেক্সই দিই, আর শিক্ষকের জন্য বেতনই দি, আমাদিগের ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে শিক্ষাদান কার্য্যের জন্য যে গুরুতম দায়িত্ব আছে—তাহা আজও আছে, কালও থাকিবে;—সে কথা ভুলিলে চলিবে না।

বর্ত্তমানে, পুরুষদিগকে যে আদর্শে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, স্ত্রী-শিক্ষাও সেই আদর্শে হইতেছে;—সেটা সম্পূর্ণ কেতাবতী শিক্ষা, পূর্ণ বিদেশী ঢঙে, বিদেশী মাপে, এবং বিদেশীয়দিগের ইঙ্গিতে, সমাজের প্রতি কতকটা প্রকাশ্য বিদ্রোহাচরণের সঙ্গে সঙ্গে, দেওয়া হইতেছে। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে নিজের প্রতি, নিজ দেশের প্রতি, নিজ সমাজের প্রতি, নিজ ভাষার প্রতি এবং শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধার সম্বন্ধ অত্যন্ত বেশী। শিক্ষাটা সমাজের ও কালের স্বপক্ষ ও অনুকূল হওয়াই বাঞ্ছনীয়;—এবং সমাজের "সংস্কার" এক জিনিষ, আর "সমাজ-দ্রোহ" স্বতন্ত্র জিনিষ। আমাদের সমাজে আচারের আবর্জ্জনা ও বিড়ম্বনা খুব বেশী, তাহা সকলেই জানেন; সে আবর্জ্জনাকে ঘৃণা করিয়া, দূরে দাঁড়াইয়া, বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিলে চলিবে না—নিজের চরিত্রবল, এবং তৎসঙ্গে বিদ্যার বল—সহানুভূতি সহকারে

উভয়ের প্রয়োগের ফলে, সে আবর্জ্জনা ক্রমশঃই অপনীত হইবে। কিন্তু কেমন যে বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার গুণ, যে মহিলাই "শিক্ষা" লাভ করেন, তিনিই তাঁহার সমাজকে, তাঁহার "অশিক্ষিতা" ভগ্নীকে এবং এ হতভাগ্য দেশের ভাষাকে ও সকল প্রথাকেই অত্যন্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে শেখেন। ধর্ম্ম-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান বিবর্জ্জিত শিক্ষা বলিয়াই কি এই ভাব দাঁড়ায়?

যে কারণেই বা দোষেই বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী বিড়ম্বিত হউক না কেন, ইহা স্থির যে, বর্ত্তমান প্রণালী-মত শিক্ষার দ্বারা রমণীদিগের উপকারের সম্ভাবনা কম। এখন সবটাকেই ঢালিয়া সাজিতে হইবে। যখন এদেশে প্রথমে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, তখনকার ইংরাজদের সকল কাযেরই ধারা ছিল এই যে, রাজপুরুষেরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও খোস-খেয়ালের বশে একটা একটা কায আরম্ভ করিয়া দিতেন, আর কলে চলার মত সেই কায চলিয়া যাইত; অর্থাৎ খাইব আমি, কিন্তু পাচকঠাকুর নিজ সুবিধা, নিজ ইচ্ছা ও নিজ ক্ষুধার অনুযায়ী অন্নব্যঞ্জন আমার সম্মুখে ধরিয়া দিবেন;—আর আমি, প্রথম-ভাগের গোপালের ন্যায় সুবোধ হইয়া, অথবা সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় নির্ব্বিকার হইয়া, অথবা কাঙালী-ভোজনের পাংক্তেয় "নিমন্ত্রিতের" ন্যায়, হৃষ্টচিত্তে তাহা সবই গলাধঃকরণ করিতে থাকিব! আর এখন সেদিন নাই! আমরা দুগ্ধপোষ্য শিশু নহি—আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে নিজ পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা জন্মাইলেও আমরা কেমন যে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি—একবারও সাহস করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টাও করি না—পাছে পড়িয়া যাই!!! না পড়িলে কেহ কি দাঁড়াইতে শিখে?

বাঙ্গালী-চরিত্র বর্ণনা করিবার সময়ে, আমরা মুখে সত্ত্ব-ভাবেরই দাবী অত্যন্ত বাড়াবাড়ি সহকারে করিয়াছি, কিন্তু, বাঙ্গালী কার্য্যতঃ প্রকৃত তমোভাবের সঙ্গে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ আছে। সত্ত্বভাবাপন্ন ব্যক্তিও বাহ্যিক নিষ্ক্রিয়—তমো-ভাবাপন্ন ব্যক্তিও তাই; কিন্তু, অন্তরে, উভয়ের মধ্যে, অনেক প্রভেদ। আজ আমরা ঘোর তামসিক নিষ্ক্রিয়তা পল্বলে হাবুডুবু খাইতেছি—সত্ত্বভাব কোথায় চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু, আর ত তাহা করিলে চলিবে না! এখন যে পৃথিবীর তোলপাড় হইতেছে! আমরা তামসিক নিদ্রায় বিঘোর থাকিলে, মৃত্যুই আমাদিগের চরম হইবে! আজ এই জগৎজোড়া জাগরণের দিনে, আমাদিগকে জাগিতেই হইবে, আমাদিগকে কাযে লাগিতেই হইবে। কায করিতে হইলে, অনেক বিষয়ে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়; কায করিতে হইলে, অনেকাংশে সুখস্বচ্ছন্দকে বাদ দিতে হয়; কায করিতে হইলে, কোন কোন স্থলে, পুরাতনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করিতে হয়। এই সকল ভাবিয়া, অনেকেই কায করিতে পশ্চাৎপদ হন। কিন্তু আর তাহা করিলে চলিবে না। আজ কাযকেই ধর্ম্মজ্ঞান করিয়া রমণীকুলকে সেই ধর্ম্মের সঙ্গী করিয়া চলিতে হইবে।

আজ আমাদিগের কায আমাদিগকেই করিতে হইবে। ঘোড়া বা গরু যেমন নিজ আহার্য্য স্বপৃষ্ঠে বহন করিয়া আনিয়া, আস্তাবলে বা গোয়ালে তাহাকে উপভোগ করে—আজ আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। কোনও স্বনাম ধন্য ব্যবসায়ীর সম্বন্ধে এই গল্পটি শুনিয়াছি;—যখন তিনি নূতন দোকান করেন, তখন দোকানে বসিয়া, মনিব সাজিয়া, অপর ব্যবসায়ীকে মাল সরবরাহ করিবার জন্য, ছাপান কাগজে চিঠি লিখিতেন। সেই চিঠি খামে মুড়িয়া, কাপড়টি মালকোঁচা করিয়া পরিয়া, গায়ে কুর্ত্তা ও মাথায় পাগড়ি চড়াইয়া, পরচুলার গোঁফ ও গালপাট্টা লাগাইয়া, পিত্তল-বাঁধান লগুড় হস্তে করিয়া, স্বয়ং মালিকই দ্বারবান সাজিয়া মাল লইয়া আসিতেন;—এবং স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, যে নিরীহ বাঙ্গালী মালিক, সেই মালিক সাজিয়া বসিতেন। আবশ্যক হইলে আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে। জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ আমাদিগকেই করিতে হইবে।

এখন পূর্ব্বেকার শিক্ষা-প্রথা বন্ধ করিয়া, ন্যায্য প্রথার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। এখন আর বিদেশীয়, বিজাতীয় ইংরাজ-কর্ত্তার খোসখেয়ালে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির বন্দোবস্ত হইবে না। * কিন্তু আমরা যদি নিজ কর্ত্তব্যের দায়িত্ব গ্রহণ না করি, তবে কি রাজসরকার নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবেন? কখনই নহে। এখন প্রত্যেক বাঙ্গালীকে —নিজ নিজ অভাব কি, তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

* [illegible]

আমার কি অভাব ও কোন্ পথে তাহা যথার্থরূপে ও যথেষ্ট রূপে পূর্ণ হইবে, তাহা আমাকেই বলিয়া দিতে হইবে, এমন কি "উপর পড়া" হইয়াও রাজপুরুষদিগকে শুনাইয়া দিতে হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক, আমাদের দেশের অবস্থা কি, এবং অভাব কোথায়?

আমাদের দেশ অত্যন্ত দরিদ্র। আমাদের দেশে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত। আমাদের দেশে বিধবার পুনরায় বিবাহ হয় না। এ দেশে লোকাচার ও সামাজিক সংস্কার বড়ই প্রবল। ব্যারাম এদেশে জন্ম হইতে সঙ্গের সাথী। এখানে স্ত্রীলোকেরা অঙ্গচালনা ও অর্থোপার্জনের পথের বাহিরে থাকেন। বাঙ্গালায় স্ত্রীলোকেরা সকল বিষয়েই পুরুষদিগের "করুণেষ্ মন্ত্রী"। এই সকল কথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

সকল দেশে এবং সকল সভ্য সমাজেই স্ত্রীলোকের স্থান অতি উচ্চে। কাগজে-পত্রে আমাদের সমাজেও তাই —কার্য্যতঃ যাহাই হউক। সকল সমাজেই—স্ত্রীলোক পুরুষের বল, বুদ্ধি, ভরসা, সহায়; আমাদের দেশে তাঁহারা পুরুষদিগের সম্পত্তি। কিন্তু যে দেশে যাহাই হউক স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকই—পুরুষের সকল কার্য্যে স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করা যায় না! আমি এমন কথা বলি না যে, স্ত্রীলোককে পুরুষদিগের কার্য্য করিতে দিলে, তাঁহারা সে কার্য্য করিতে অক্ষম হইবেন,—আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, বহুজন্মার্জ্জিত যে সংস্কার স্ত্রীলোকদিগের ধাতু ও মজ্জাগত হইয়াছে, সেই রমণী উচিত সংস্কারকে ধ্বংস করিয়া, আমাদিগের লাভ কি? রমণীর ও পুরুষের দেহাভ্যন্তরস্থ কতকগুলি এমন যন্ত্র-বিশেষ আছে (endocrine glands), যাহার ফলে, পরস্পরের ধাতুগত পার্থক্য থাকা অবশ্যম্ভাবী। কর্ম্মবিনিময়ে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিনিময়ে সে স্বাভাবিক ধর্ম্মের অপচয় হইয়া থাকে; তাহা বুদ্ধিমানের কায নয়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে কোনও কায কর—প্রকৃতি তাহা ভুলে না, তাহাকে ক্ষমাও করে না—কোনও না কোন দিন, নির্ম্মম ভাবে সুদে-আসলে প্রকৃতির পরিশোধ হইয়া থাকে।

এখন যদি প্রশ্ন উঠে, তবে কি ভাবে স্ত্রী-শিক্ষা দিতে হইবে, তাহার উত্তরে আমি বলিব—(১) স্ত্রীজাতির দৈহিক (৪) সাধারণ জ্ঞানোন্নতি;—এই কয়টি দিক্ দিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ স্বাস্থ্য-কথা। কি রমণী, কি পুরুষ, সকলেরই পক্ষে অবশ্য শিক্ষার বিষয় হওয়া উচিত—দেহতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব। সর্ব্ব নিম্নশ্রেণী হইতে বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত, প্রত্যেক শ্রেণীতেই, এই দুইটি বিষয়ের ধারাবাহিক রূপে নিত্যই শিক্ষা হওয়া আবশ্যক। প্রথম-প্রথম, এই দুইটি বিষয়ে শিক্ষাদান করিবার জন্য, চিকিৎসকদিগকেই আহ্বান করিতে হইবে এবং এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইলে, কিছু ব্যয়ও আছে। এতদ্ব্যতীত, এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইলে, হাতে-কলমে অনেক জিনিষ করিতে শিখিতে হয়। কাযেই, আড়ষ্ট ভাবে, ভদ্রবেশে, সুখে বেঞ্চে বসিয়া, এ সকল বিষয় সুধু পড়িলে চলিবে না;—যখন তখন হাত-পা নাড়িয়া শিক্ষা করিতে হইবে। দেহ ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব, পড়ান-বুলির মত আবৃত্তি করিয়া গেলে, অত্যন্ত নীরস বোধ হয়। যিনি স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দান করিবেন, তিনি স্বয়ং ঐ বিষয়ে নিজ দেহে এবং নিজের কাযে, জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইবেন—নতুবা পড়ান বুলির আবৃত্তি করা ভিন্ন অন্য কায হইবে না। যে ছাত্র বা ছাত্রী স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষাকালীন, ঐ বিজ্ঞানের নিয়মভঙ্গ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার উপরে শিক্ষকের দৃষ্টি পড়া উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক ময়লা-কাপড়-পরিহিতা ছাত্রীকে, বিদ্যালয়েই সাবান দিয়া নিজ ময়লা কাপড় কাচিতে ও শুকাইতে বাধ্য করা হইবে। সুধু তাহাই নহে—যিনি ছাত্রীদিগকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিখাইবেন, তিনি মধ্যে মধ্যে ছাত্রীদিগের বাটী যাইয়া, কোন্ কাযটি স্বাস্থ্যানুমোদিত, কোন্টি তৎবিরুদ্ধ, এই সকল লক্ষ্য করিবেন এবং ছাত্রীগণকে তৎ তৎ বিষয়ে অবহিত হইতে বলিবেন। ফল কথা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী, বিজ্ঞান-শিক্ষয়িত্রীর মত জীবন্ত ভাবে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবেন;—কি কর্ত্তব্য তাহা শিখাইবার সময়ে, কি অকর্ত্তব্য তাহাও শিখাইবেন। তিনি ছাত্রীদের পরম আত্মীয় হইয়া, তাহাদিগের মধ্যে স্বচ্ছন্দে ও সরল ভাবে মেলামেশা ও যাতায়াত করিবেন। তবে তাঁহার শিক্ষা ফলোপধায়ক হইবে; নতুবা শিক্ষার নামে উৎকট ভণ্ডামীর লীলা

স্বাস্থ্য-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম-চর্চার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঁটনা-বাঁটা, জলতোলা, রন্ধন ও পরিবেশন করা, কাপড়-কাচা, বিছানা তোলা-পাড়া প্রভৃতিতে যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম হয় বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা দেহের ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা নাই। দৌড়াদৌড়ি করিয়া খোলা যায়গায় খেলা করা, সন্তরণ শিক্ষা করা, এই দুইটিতে শরীরের বেশ উন্নতি হয় বটে, কিন্তু তাহাতেও ঐ একই দোষ—দেহের ক্রমশঃ উন্নতি হয় না। এইজন্য, প্রত্যেক বালিকা-বিদ্যালয়ে, খেলিবার জন্য খোলা মাঠ ত রাখিতেই হইবে, পরন্তু তৎসঙ্গে, ক্রম-হিসাবে, রীতিমত অঙ্গ-চালনার ব্যবস্থাও করিয়া দিতে হইবে। যাঁহারা মনে করেন যে, ব্যায়াম করিলে, রমণীদেহের কমনীয়তা চলিয়া যাইবে, তাঁহারা ভ্রান্ত। নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়, গাত্রচর্ম্মের মসৃণতা আইসে, অযথা মেদবৃদ্ধি ঘটিতে পায় না এবং সর্ব্বপ্রকারের লাবণ্য ফুটিয়া উঠে। ভগবান সুধু পুরুষদিগের ব্যবহারের জন্য আকাশ ও বাতাস দেন নাই; ভগবান সুধু পুরুষের দেহেই মাংসপেশী সৃজন করেন নাই; তিনি উভয়েরই জন্য একই নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন। ইদানীন্তন দেখা যায়, যে শ্রমকাতরা, সুখাতুরা রমণীরাই প্রসব করিতে যাইয়া কত না কষ্ট পান; কিন্তু কৃষী-রমণীরা, শৌচপ্রস্রাব ত্যাগের ন্যায়, অতি স্বচ্ছন্দেই প্রসবকার্য্য প্রাকৃতিক উপায়েই সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার মূলে,—নিত্য-পরিশ্রম ভিন্ন আর কিছুই নাই। শিক্ষার প্রথমেই দেহ রক্ষা করিতে শিক্ষা করা চাই,—তদ্ব্যতীত সকল শিক্ষাই নিরর্থক। এ সম্বন্ধে, আমার "বাঙ্গালীর শিক্ষা" প্রবন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে—সে কথার আর পুনরাবৃত্তি করিব না। আমি আবার বলি, এবং যতদিন জীবিত থাকিব ততদিনই বলিব,—বাঙ্গালী রমণীদিগকে রীতিমত ব্যায়াম শিখান অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে অন্যায় লজ্জা বা অন্যায় কুণ্ঠা করা আত্মহত্যারই সমতুল্য। যাঁহারা বালিকা-বয়স হইতে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুবিধা পাইবেন, বিদ্যালয়েই তাঁহারা দেহতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও ব্যায়াম শিক্ষার সুযোগ পাইবেন। কিন্তু পুরনারীরা কি করিবেন? তাঁহারা প্রত্যহ অবকাশ মত, ডাম্বেল ভাঁজিতে পারেন এবং অবস্থাপন্না হইলে, ডেভেলপার ব্যবহার করিতে পারেন। এ কথায় হাসিবার বা শিহরিয়া উঠিবার হেতু নাই; যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিতেই হইবে। যে গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় নাই, সেখানে বালিকা-বিদ্যালয় সত্বরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই; বালিকা-বিদ্যালয় সৌখীন জিনিষ নহে, আজ ইহা অত্যাবশ্যক জিনিষ—ইহা চাই। গ্রামের জমীদার মহাশয়েরা, নিজ নিজ এলাকার মধ্যে, ছোটখাট খেলার মাঠ করিয়া দিয়া, নিজেরা চেষ্টা করিয়া পাড়ার দরিদ্র ও "ইতর" লোকেদের ছেলেমেয়েদের অঙ্গচালনার উন্নতি সাধন করিতে পারেন। এখন এমন দিন আসিয়াছে—যে, "ইতর" বলিয়া কাহাকেও পশ্চাতে ফেলিয়া রাখা চলিবে না। সকলকেই সকলের সাহায্য করা উচিত;—নিজের কর্ত্তব্য নিজে নির্দ্ধারণ করিয়া কাযে নামা উচিত। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এখন সমস্ত দেশটাকেই শিখাইয়া তোলা উচিত।

স্ত্রী-শিক্ষার দ্বিতীয় বিষয়—মাতৃত্ব। নিজ দেহের গঠন ও তাহার বিশেষত্ব কি, তাহা প্রত্যেক রমণীরই ভাল করিয়া জানা উচিত। জননী হইতে হইলে কি কি কর্ত্তব্য, তাহা রমণীর বিশিষ্টরূপে জানা থাকা চাই। সুধু সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা ও প্রসব করিয়া, যা-তা করিয়া, বড় করা, এইরূপ করিলে চলিবে না। কি খাইলে, কি পরিলে, কিরূপভাবে চলিলে গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গল হয়; গর্ভাবস্থায় কি করিতে হয়, বা কি লক্ষণ হইলে অমঙ্গলের আশঙ্কা করা যায়; এ সকল তত্ত্বই বেশ করিয়া শিখান উচিত। শিশুর দৈহিক গঠনের বিশেষত্ব কি, এবং তাহার দেহের কার্য্যের পার্থক্য কোথায়; শিশুকে কোন্ বয়সে, কতটা, কি খাদ্য খাওয়ান উচিত; শিশুর কাপড়-চোপড় কি ভাবে পরাইতে হয়; তাহার নিদ্রা ও মলত্যাগ কি রকম হওয়া উচিত; শিশুর ক্রন্দনের অর্থ কখন কি বিকাশক; তাহার দন্তোদ্গমের সময়ে কি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়; তাহার ব্যায়াম কি কি এবং তাহা সাধারণতঃ কি ভাবে হইয়া থাকে; এ সকল কথা সকল স্ত্রীলোকেরই খুব ভাল রকম করিয়া জানিয়া রাখা প্রয়োজন। এদেশের কতকগুলি কদর্য্য অভ্যাস বা আচার আছে; তাহাদের অপকারিতা সম্পূর্ণরূপে সকল রমণীকেই অনুভব করা চাই। আঁতুড়-ঘর কেমন হওয়া উচিত নয়; প্রসবান্তে "ঝাল-তাপ" দেওয়া উচিত কি উচিত নয়; প্রসবান্তে ব্রাণ্ডি, পোর্টওয়াইন বা "ভাইব্রোণা" সেবনের অপকারিতা কি; গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়াক্রান্তা হইলে কি কর্ত্তব্য—প্রভৃতি সকল বিষয়ই

প্রত্যেক স্ত্রীলোকের শিক্ষা করা চাই। এটি ডাক্তারি কথা, ওটি ধাত্রীবিদ্যার কথা,—এ কথা বলিলে চলিবে না। যে কথা যাহারই হউক না কেন, যতক্ষণ সে কথা রমণীর দেহরক্ষার পরিপন্থী ও শিশুর মঙ্গলের হেতু, ততক্ষণ সে কথা রমণীদিগকে শিখাইতেই হইবে। যে রমণীরা সন্তানের মঙ্গল কামনা করিয়া, সংপরোনাস্তি ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেন, সে রমণীকুল এই সামান্য জ্ঞানার্জ্জন করিতে আদৌ দ্বিধা করিবেন না। সুধু আমাদিগকে চেষ্টা করিয়া সেই সেই বিষয়গুলিকে স্ত্রী শিক্ষার অঙ্গীভূত করিলেই হইবে; এবং সেই বিষয়গুলি সরল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে।

এ দেশে, অপরিষ্কার ধাত্রীদিগের প্রতি সকলেরই অসীম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। সে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যে কতটা অহেতুক, তাহা "বাঙ্গালীর মেয়ে" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। ধাত্রী প্রসব-সহায়িনী ও রোগী-পরিচারিকা;—তাহার কার্য্য সকল রমণীরই জানা কর্ত্তব্য। প্রসব-সহায়িনী ধাত্রীর কার্য্য শিখিতে গেলে, ডাক্তারীতে যাহাকে aseptic surgery (বা পচন-নিবারক বিধি) কহে, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়া থাকে। সে পরিচয় যথেষ্ট ও আন্তরিক ভাবে হওয়া আবশ্যক। গৃহিণীরা যদি aseptic (এসেপটিক্) ব্যবস্থায় দক্ষা হন, তাহা হইলে সকল রোগের আকর ধাত্রীদের আবশ্যক হইবে না—এবং যদি কোথাও হয়, তবে ধাত্রীরা কথনো ময়লা অবস্থায় কায করিতে সাহসী হইবে না। বর্ত্তমান কালে ধাত্রী দ্বারা প্রসব করানর যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহাতে দোষের ভাগই বেশী। বর্ত্তমানে, ময়লার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হইয়া, দেশী "ধাই" সকল গৃহস্থের ঘরে যাতায়াত করে; তাহার ফলে, "পেঁচোয় পাওয়া" (ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধি) প্রভৃতি কত মারাত্মক রোগ এদেশে প্রবল। আবার, সহরে যেখানে "পরীক্ষোত্তীর্ণা" ধাত্রী মহোদয়ারা আছেন, সেখানে তাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া গৃহস্থের সকল জিনিষ এবং সকল কাজকেই ঘৃণার চক্ষে দেখেন। বস্তুতঃ, কিন্তু চাই নিরাপদ প্রসব—সে কার্য্যের একমাত্র সহায় পরিষ্কার অবস্থা। গৃহস্থ যদি শিক্ষিত হন, তাহা হইলে, সকল দিকই বজায় থাকে;—নতুবা পয়সার শ্রাদ্ধ হয়, গোলযোগের চূড়ান্ত হয়, বিপদের বাহুল্য হয়। ধাত্রীরা প্রগলভা, কাণ্ডজ্ঞানহীনা। যাহারা বর্ষীয়সী অথবা "পরীক্ষোত্তীর্ণা", তাহারা রীতিমত মুখরা। প্রসব-কার্য্যের কৌশল জানে, এমন ধাত্রী দেখি নাই; তবে নিত্য হাতে-কলমে কায করিয়া, কতকটা হস্তের কৌশল আপনিই আসিয়া পড়ে। সেইটুকু তথাকথিত অভিজ্ঞতার দর্পে ধাত্রীরা মাটিতে পা দেয় না। যাহাকে এসেপটিক্ বিধি বলে, সে বিষয়ের মূল তথ্য কোথায়, তাহাও ধাত্রীরা জানে না; এখানেও নিত্য চক্ষে দেখিয়া ও হাতে-কলমে কায করিয়া যেটুকু জ্ঞান জন্মে—তাহাই যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু স্বল্প বিদ্যা যদি কোথাও ভয়ঙ্করী হয়, তবে তাহা ডাক্তারীতে। যদি নিজ কলিকাতায় ধাত্রীদের এমন অবস্থা, তবে পল্লী-গ্রামের ধাত্রীদের যে কি ভীষণ অবস্থা, তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। সেইজন্যই এত করিয়া গৃহস্থের মেয়েদিগকে এ সব কায শিখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

রমণীর তৃতীয় শিক্ষার বিষয়—উত্তম গৃহিণীপনা। সে শিক্ষা পুস্তক পাঠে হয় না। সে শিক্ষালাভ কতকটা ঐ উদ্দেশ্যযুক্ত বিদ্যালয়ে, কতকটা গৃহস্থের সংসারে হইতে পারে। সুগৃহিণীর তত্ত্বাবধানে গৃহস্থের সংসারে সে শিক্ষা যেমন উত্তমরূপে হইতে পারে, অন্যত্র তত ভাল করিয়া হয় না। সুগৃহিণীকে একাই একশত হইয়া, শতচক্ষু-বিশিষ্টা, ধৈর্য্যের পাগড় সাজিয়া সংসারে থাকিতে হইবে। সমস্ত সংসারের ভিতরে তিনি নিজেকে ছড়াইয়া দিবেন; কিন্তু তদবস্থাতেই নিজেকে স্বস্থ রাখিবেন। ব্যাপকতা, সহানুভূতি, লক্ষ্মী-স্থৈর্য্য এক দিকে; অপর দিকে চৈতন্যময়ী, জ্ঞান-ময়ী, প্রাণময়ী—এই ভাবে থাকিতে হইবে। এক দিকে সংসারে অর্থ সঞ্চয় করিতে হইবে, অপর দিকে তেমনি অতিথি-আশ্রিতের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। সংসারে জিনিষ-পত্রের সুশৃঙ্খলার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ঝগড়া-বিবাদের মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে, সকলকেই ভালবাসার শাসনে সংযত রাখিতে হইবে। সকলের প্রতি সম-দৃষ্টি হইতে হইবে। রোগে সেবা, বিপদে সাহায্য, দুঃখে সান্ত্বনা দিতে হইবে। সুকুমার-মতি বালক-বালিকাদিগের খাওয়া-পরা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চরিত্র—সকল দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দাসদাসীগণকে পুত্র-কন্যা-নির্ব্বিশেষে পালন করিতে হইবে— তাহাদিগের দুঃখ-কষ্ট নিবারণ ত করিতেই হইবে; সুধু তাহাই নহে—তাহারা কিসে একটু সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, তাহাও করিতে হইবে। প্রতিবেশীর

সহিত সদ্ভাব রাখিতে হইবে এবং তাঁহাদিগের সুখে-দুঃখে সমব্যথী ও সমভাগিনী হইতে হইবে; শুধু মৌখিক দুঃখ প্রকাশের কপট লীলা করিলে চলিবে না। গৃহ-পালিত জীব-জন্তুর সেবা স্বহস্তে করাই উচিত। সংসারের হিসাব-নিকাশ রাখা, বাড়ী-ঘর সুমেরামতে ও সুবন্দোবস্তে রাখা, সাংসারিক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পূর্ব্বাহ্ণেই সংগ্রহ করিয়া রাখা, খাদ্য দ্রব্যের প্রত্যেকটির উপরে খর-দৃষ্টি রাখা, যাহাতে উহা কোনও রকমে দূষিত না হইতে পায় এবং সমভাবে সকলের মধ্যে বন্টিত হয় এ সকলও সু-গৃহিণীর নিত্য কর্ত্তব্য। লোক-লৌকিকতা, মান-মর্য্যাদা, তত্ত্ব-তল্লাস সকলই তাঁহার কর্ত্তব্যের গণ্ডীর মধ্যে। এই যে নানামুখী কর্ত্তব্য, নানা-বিষয়িণী চিন্তা, নানা-আকারের কার্য্য—ইহার মধ্যে পড়িয়া মনের অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষাই হইয়া থাকে;—যিনি ধর্ম্মতঃ ন্যায্য পথে থাকেন, তিনি দেশ-পূজ্য, আদর্শ গৃহিণী হইয়া থাকেন।

স্ত্রীলোকের চতুর্থ শিক্ষার বিষয়-কেতাবতী বিদ্যা। কতকটা ভূগোল, কতকটা দেশের প্রকৃত ইতিহাস, কতকটা সাহিত্য ও অঙ্ক, একটু সামান্য পদার্থ-বিদ্যার জ্ঞান, একটু রাষ্ট্র-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান, একটু সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়ে একটু করিয়া হাতে খড়ি হওয়া চাই। রন্ধন কার্য্য, সীবন-কার্য্য, একটু গীত-বাদ্যের ও অপর কলাবিদ্যার চর্চ্চা, এগুলি বিদ্যালয়েও হইতে পারে, ঘরে-ঘরেও হইতে পারে। ভূগোল ও রাষ্ট্রজ্ঞান বিশিষ্টরূপে শিখান চাই। সুবিধা হইলে দেশ-বিদেশে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা চাই। রমণীদিগের শিক্ষার জন্য যে সকল মাসিক পত্র আছে, তাহাতে এই দুই বিষয়ের নাম গন্ধও থাকে না—কেন, জানি না। শুনিয়াছি, বেদপাঠে রমণীদিগের অধিকার নাই। এই বিংশ শতাব্দীতেও কোন-কোন বিষয় রমণীদের পড়িতে নাই কি? একে ত অনেক মাসিক-পত্রিকা বিলাতী ঢংয়ের গল্পের আঁস্তাকুড় খুলিয়া বসিয়াছেন; তাহার উপরে এত বিষয় বাছাবাছি করিলে চলিবে কেন? মাসিক-পত্রিকাগুলিকে শিক্ষার কেন্দ্র বলিয়া মনে করি; কিন্তু সে উচ্চ আদর্শ কয়জনে বজায় রাখিয়াছেন?

ফলকথা; স্ত্রী-শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান অঙ্গ হওয়া চাই দেহতত্ত্ব, মাতৃ-তত্ত্ব, সন্তান-তত্ত্ব, গৃহিণীপনা। তাহার পর যত ইচ্ছা পাটীগণিত, বীজগণিত শিখাইও; অথবা না শিখাইও।

এক্ষণে কথা হইতেছে—শিক্ষার কি ব্যবস্থা হওয়া উচিত? আমার মতে শিক্ষার যে ব্যবস্থাই হউক না কেন, দেশের লোকের ষোল-আনা মত লইয়া, তবে যেন স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শুধু তাহাই নহে—দেশের-লোকের সাহচর্য্যও অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের কায আমাদিগকেই করিতে হইবে। যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে বা হইবে, তাহাতে শিক্ষার ব্যবস্থা পূর্ব্ব-বর্ণিত রূপে হওয়াই চাই! শুধু স্তোত্র পাঠ শিক্ষা ও রন্ধন শিক্ষা দিলেও চলিবে না; অথবা শুধু হিষ্ট্রি-লজিক পড়াইলেও চলিবে না। যাহার জন্য শিক্ষার আয়োজন,—দেশ, কাল, পাত্রভেদে, তাহার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন কি, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তবে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে ব্যবস্থা রাজসরকার করিবেন—কিন্তু সম্পূর্ণ দেশের লোকমত ও সাহচর্য্য লইয়া। এ পর্য্যন্ত গেল সাধারণ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা।

যাঁহারা পর্দ্দানসীন, তাঁহাদিগের জন্য কি ব্যবস্থা হইতে পারে? তাঁহাদিগকে তিন উপায়ে শিক্ষাদান করা যায়। প্রথমতঃ, প্রত্যেক সংসারে অভিভাবক, পিতা, স্বামী বা ভ্রাতাকে নিজ-নিজ পরিবারস্থ রমণীগণের শিক্ষার ভার লইতে হইবে। ধর্ম্ম চর্চ্চা (কিন্তু "আচার" পূজা নহে) রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির পাঠ বা আবৃত্তি এবং ব্যায়াম-চর্চ্চা—এগুলি স্ত্রীশিক্ষার বাধ্যতামূলক অঙ্গ হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী তহবিল হইতে বা সাধারণের চাঁদার সাহায্যে, গ্রামে-গ্রামে পুস্তকালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। এই সকল পুস্তকাগার হইতে, যৎসামান্য মাসিক চাঁদা লইয়া, প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে পুস্তক পাঠাইতে হইবে। তজ্জন্য মহিলা শিক্ষয়িত্রীর সাহায্য প্রার্থনীয়। পুস্তকালয়ে নাটক-নভেলের হুঙ্কারজনক আধিক্য থাকিবে না—সৎ-সাহিত্য, ও সুবিধা হয় ত বাঙ্গালীর জীবনের যাহা কিছু ভাবিবার, জানিবার বা জানাইবার আছে, তৎসম্বন্ধীয় পুস্তকই বেশীর ভাগ থাকা চাই। এতদ্ব্যতীত, এখানে ভাল মানচিত্র, এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তক ও চিত্র যথেষ্ট পাওয়া চাই। তৃতীয় উপায়টি—কথকতা, ছায়াচিত্র প্রদর্শন, লেকচার বা বক্তৃতা দান, সহজে স্থানান্তরিত করা যায় এমন প্রদর্শনী বা একজিবিসন্, সহজ ভাষায় লিখিত পুস্তিকা বিতরণ, মাটির বা অপর জিনিষের তৈয়ারি পুতুল প্রভৃতির সাহায্যে গ্রামে-

গ্রামে মাঝে-মাঝে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা চাই। এতদর্থে প্রত্যেক জেলাবোর্ডকে অবহিত হইতে হইবে। জেলার যে যেখানে আছেন, প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে (বিশেষতঃ চিকিৎসকগণকে) কতকটা নিঃস্বার্থ ভাবে গ্রামে গ্রামে নিজ-নিজ অভিজ্ঞতানুসারে ঐ ভাবে বিদ্যাদান করিয়া আসিতে হইবে। এই তিনটি উপায় অবলম্বন করিলে তবে এ দেশে শিক্ষার সাড়া পড়িয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট, জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি এবং সেই সঙ্গে দেশের সকল শিক্ষিত লোককেই সচেষ্ট ও প্রচেষ্ট হইতে হইবে; ইহার কমে কিছুই হইবে না। গৃহস্থের ঘরে একদিন দাস-দাসী বা পাচক না আসিলে যেমন কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট-ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত সাহায্য করিয়া, হাতাহাতি করিয়া সংসারের সমস্ত কায চালাইয়া দেয়, আজ সমাজকে আমাদের ঠিক সেই ভাবে চালাইতে হইবে। কবে গবর্ণমেণ্ট বা জেলা-বোর্ড কিছু করিবেন কি না, তাহার অপেক্ষা করিয়া থাকিলে চলিবে না। আর গবর্ণমেণ্ট যতই করুন, আমার স্ত্রী, ভগ্নীর শিক্ষার জন্য আমিই যদি রীতিমত মাতিয়া না যাই, তবে সুগৃহিণীর সংসারের সুখের ভাত ছাড়িয়া, দাসদাসীর অনুগ্রহে মেসের ভাত খাওয়ার মত কষ্ট পাইতে হইবে। বর্ত্তমান কালে এ দেশে শিক্ষার অভাবই প্রধান অভাব। অর্থের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, উদ্যমের অভাব,—সকল অভাবের মূলে বিদ্যার অভাব।

এ দেশে বিদ্যা-চর্চ্চার যথেষ্ট প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে সকল দিকেই উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে। তবে যেন মনে থাকে যে, ধর্ম্মজ্ঞান-বিবর্জ্জিত শিক্ষা কুশিক্ষা না হইলেও, অশিক্ষা; এবং ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কতকগুলা আচারের ঢিপি দেবতার বেদী হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক দিকে যেমন অযথা পুরাতনে প্রীতি ভাল নহে, অন্য দিকে তেমনি কালাপাহাড়ী চালও ভাল নয়। সব পুরাতন জিনিষ বিদায় কর, আর ষোল-আনা বিলাতী রং আমদানী কর—এ কথা বলা চলে না।

নন-কো-অপারেসন

বিগত শেষ বি-এল পরীক্ষার্থীদিগের প্রবেশ পথ-রোধের দৃশ্য



কলিকাতা সিনেট হলের সম্মুখের দৃশ্য



কলিকাতা দ্বারভাঙ্গা ভবনের সম্মুখের দৃশ্য

সৈনিকের আত্মকথা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বি-এ ও সুবেদার ফণিভূষণ দত্ত।

মরিয়ম খুবই সুন্দরী ছিল। কেন যে সে এই কালো চেহারাকে ভাল বেসেছিল, তা' এখনও বুঝে উঠ্‌তে পারি না। তুর্কীদের মধ্যে তার মত অনবদ্য সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী ইচ্ছা করলেই অনায়াসে দস্তুর-মত বড় ঘরে বিয়ে করতে পারতো।

জেনারেল টাউনসণ্ডের সঙ্গে তুর্কীদের বন্দী হয়ে আমরা কুট-এল-আমারা হতে যখন বোগদাদে পৌছি, তখন তার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। তারা সব মজা দেখতে দল বেঁধে আমাদের তাঁবুতে এসেছিল। মনে হল, এরাই বসোরার প্রস্ফুটিত গোলাপ—নইলে মরুভূমিতে সত্যি গোলাপ ত' একটাও দেখলেম না। দেব বাঞ্ছিত ইন্দ্রের নর্ত্তকীদের মতন কেউ বা উর্ব্বশী, কেউ বা বুঝি তিলোত্তমা! সবাই তারা ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে কোনও সুন্দরী বলে উঠ্‌লেন,—'দেখছিস্‌, এরা কি কালো!' তিনি একটু রসিকা। তিনি বললেন,—'কালো না হলে আমাদের এ ফর্সা রাজ্যে ফর্সা হতে আসবে কেন?' সবাই হেসে উঠলো। মরিয়ম একপাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ আমাদের দেখছিল। তার মুখখানা একটু সহানুভূতি-ব্যঞ্জক। সে সবাইকে ধমক দিয়ে বললে,—'তোরা যে কি করিস তার কিছুই ঠিক নেই। সব জায়গায়ই ঠাট্টা। দেখ ত' ভাই জুলি, এরা দেশের জন্য প্রাণ দিতে এসে, আত্মীয় পরিজনদের ছেড়ে শেষে আমাদের বন্দী হ'ল, কি কষ্ট এদের। এরা সত্যি খুব করুণার পাত্র।' জুলি কিন্তু একটু ব্যঙ্গ করবার লোভ সামলাতে না পেরে বলে ফেললে—'মরি, দেখিস্‌ আবার প্রেমে পড়িস না।' হাসির রোলে তাঁবুটা ভরে উঠ্‌লো। আমরাও খুব হাসতে লাগলেম।

সেই থেকে মরিয়ম আমাকে ভালবাসতে সুরু করলে। বন্দীদের গতি ছিল অব্যাহত, তবে সহরের বাইরে যাবার হুকুম ছিল না। তুর্কীরা, যে যাই বলুন না কেন—আমাদের সুখ সাচ্ছন্দ্যতার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতো। আমরা নিজেদের কাজকর্ম্ম সেরে প্রায়ই দল বেঁধে বাজার-হাট দেখে আসতেম। একদিন একাকাই বেরিয়ে পড়ে ভারী বিপদে পড়েছিলেম। একটা খেজুর বনের মধ্যে দেখি কে যেন মরিয়মের উপর অত্যাচার করচে। মরিয়ম বলচে,—'বাঙ্গালী হাজার হোক্‌ তোমার মতন অপদার্থের চেয়ে অনেক ভালো।' আনন্দে আমার প্রাণটা নৃত্য করে উঠলো। আমি মুহূর্ত্তে সেই তুর্কীটার পিঠে খুব কয়েকটা ঘুসি মেরে ফেললাম। তুর্কীও ছাড়বার পাত্র নয়। কিন্তু মরিয়ম মধ্যস্থ হয়ে বিবাদ মিটিয়ে দিলে। বললে—'দিলদার, বন্দীদের গায়ে হাত তুললে আমি সেনাপতি আনোয়ার পাশাকে তোমার সমস্ত কথা ব্যক্ত করবো।' দিলদার পাশা যেন এই একটা কথায়ই কেঁচোর মত মুখ নীচু করে থাকলো। মরিয়ম আমাকে তাঁবুতে পৌছে দিয়ে গেল;- কিন্তু তার সঙ্গিটীর দিকে চেয়ে যেন মনে হল, সে মরিয়মের এই ব্যবহার বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখলো না। তার বক্র দৃষ্টি একখানা ছোরা শানাচ্ছিল।

দিলদার পাশা মরিয়মেরই প্রতিবেশী। ছেলেবেলা হতে সে নাকি মরিয়মকে ভালবাসে। কিন্তু সে তাকে চ'চক্ষে দেখ্‌তে পারতো না, কারণ, তার স্বভাবটা ছিল ভয়ানক খারাপ, মেজাজটাও ততোধিক রুক্ষ। আমাদের এই আলাপ-পরিচয়ে, প্রীতি সম্বন্ধে সে খুবই হিংসা করতে লাগলো। কিসে আমার সর্ব্বনাশ সাধন করবে, এই-ই হ'ল তার প্রধান চিন্তা!

তাঁবুতে সন্ধ্যাবেলা ব'সে আমার দুরদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করচি। মুক্তির কোনও আশা নেই। জগৎটা যেমন ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হচ্চে, আমার মনটাও তেমনি বিষাদভরে কেঁপে উঠতে লাগলো। শুনলেম, ইংরেজের জয়ের আশা কম। পাহাড়ের উপর থেকে তুর্কী সেপাইরা খুব যুদ্ধ করচে। দেশের মুখ আর দেখবো না—এই চিন্তা করতে-করতে জানি না, কখন আমার অজ্ঞাতসারে সর্ব্ব-

সন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবী এসে সমস্ত ব্যথা মুছিয়ে দিয়ে আমাকে বিস্মৃতির কোলে টেনে নিলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মনে হল কে যেন আমার হাত ধরে টানচে। অন্ধকারে তার মুখখানি না দেখতে পারলেও, শুনেই বুঝলেম যে, সে আর কেউ-ই নয়,—মরিয়ম। তার গলা কাঁপচে—যেন একটা অব্যক্ত আর্ত্তনাদের মত সে সুর আমার কাণে বেজে উঠে আমার হৃদয়তন্ত্রীগুলোকে বেসুরো করে ফেললে।

"ওঠো পালাও, দিলদার তোমায় হত্যা করবার ফন্দীতে ঘুরচে। ইংরেজ এইমাত্র মেসোপটেমিয়া দখল করেচে। তুমি বাগামে (নৌকা) উঠে তাদের আশ্রয় নাও। এক মুহূর্ত্তও এখানে থাক্‌লে বিপদে পড়বে।" এই কথাগুলি বল্‌তে-বল্‌তেই সে কেঁদে ফেললে। তার তপ্ত অশ্রু আমার বুকের উপর যেন অগ্নিময় গোলকের আঘাতের মত মনে হ'ল। তন্দ্রাঘোরে আমি নৌকায় উঠলেম। সে পূর্ব্বেই সমস্ত তৈরী করে রেখেছিল। তার পর, যখন নদীর মাঝে গিয়ে পড়েছি, তখন তীরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে যা' দেখলেম, তা' আর এ জন্মে ভুলবো না। দিলদার তাকে—প্রাণের মরিয়মকে, নিষ্ঠুরের মত ছুরিকাঘাত করচে—আর সে নির্ব্বিকার।

এখনও সে কথা মনে হলে বুক কেঁপে ওঠে! আর কার আকুল আর্ত্তনাদের সঙ্গে-সঙ্গে 'পালাও, পালাও' রব কাণে বাজে!

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রণীত নূতন উপন্যাস "ঘোল আনি" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১।৽ টাকা।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন নাটক 'সেকেন্দার শাহ' প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১।৽ টাকা।

শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বাসবদত্তা" নাটক প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "ভাস্কর-তনয়া" ও "রহস্যের রঙ্গমহল" প্রকাশিত হইয়াছে, প্রত্যেকের মূল্য বার আনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সচিত্র সংস্করণ "রজনী" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১।৽ সিকা।

আট আনা সংস্করণের ৬০নং গ্রন্থ শ্রীনদীরাম দেবশর্ম্মা প্রণীত "হারান ধন" প্রকাশিত হইল, মূল্য ৷৷৽ আনা।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.



বৈশাখ, ১৩২৭

দ্বিতীয় খণ্ড] সপ্তম বর্ষ [পঞ্চম সংখ্যা

অভিব্যক্তির ধারা

[অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ]

অভিব্যক্তিবাদ বা ক্রমবিকাশ তত্ত্ব অন্য অনেক সনাতন সত্যের মত বিজ্ঞানের পুরাতন দপ্তরখানায় স্থায়ী ভাবে অবস্থিতি করিতে চলিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে যদিও ইহা কবি ও দার্শনিকের কল্পনা ও স্বীকার্য্যমাত্রের ন্যায় মানবের মনে সময়ে-সময়ে প্রতিভাত হইত; তথাপি বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসাবে ইহার পরমায়ু এক শতাব্দীও নহে। কিন্তু এই নবীন যুগের নবীন মন্ত্রটি এমন ভাবে আমাদের আয়ত্ত হইয়া গিয়াছে যে, ইহার সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে চাহিলে, সেটা নিতান্তই অনাবশ্যক ও অবান্তর মনে হওয়াও বিচিত্র নহে। এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিকল্প ডারউইন্ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই এই মহান্ সত্যটিকে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহার শত শাখা বিস্তৃত হইয়া জ্ঞানরাজ্যের নানা বিভাগকে আক্রমণ করিয়াছে। ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, জৈববিদ্যা, চারিত্রনীতি, অর্থনীতি, এমন কি তত্ত্ববিদ্যায় পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব সংক্রমিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই আমরা একটী গতি বা অভিব্যক্তির ধারা অন্বেষণ করি; এবং যতক্ষণ ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে সেই গতিশীলতা, বা ক্রমোন্নতি দেখিতে না পাই, ততক্ষণ জ্ঞানের একাংশ অন্ধকার রহিয়া গেল বলিয়া গণনা করি।

তাহার কারণ এই যে, বিশ্বের অন্তরতম সত্তা সর্ব্বদা গতিশীল। গতিশীল বলিয়াই বিশ্বের নাম জগৎ। যন্ত্র-বদ্ধতা ইহার প্রকৃতি নহে। যন্ত্র এক ভাবেই থাকে। যে ভাবে তাহাকে চালাইয়া দেও, সেই ভাবেই সে চলে। তাহার ব্যতিক্রম নাই, বিরাম নাই। যন্ত্রের ভিতর এমন কোনও শক্তি নাই, যাহা তাহাকে তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষ হইতে একটুও নড়াইতে পারে। বিশ্ব যন্ত্র নহে, কেন না বিশ্বে নিয়মের পার্শ্বে ব্যতিক্রম আছে। সে রেলগাড়ীর মত লৌহবর্ত্মে অবিরাম চলে না; বা চলা বন্ধ হইলে, চিরদিনের মত স্তব্ধ, অসাড়, লৌহপঞ্জরের মত পড়িয়া থাকে না। পরন্তু একটা বিরাট বটবৃক্ষের ন্যায় নানা দিকে নানা ভাবে শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত করিয়া নিয়ম-

ব্যতিক্রমের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। এইরূপ সংসরণশীল বলিয়াই এই বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির নাম সংসার।

অভিব্যক্তিবাদের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, জগৎ-সংসারের অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের মধ্যে ইহা ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই যে সমস্ত ভেদের মধ্যে অভেদ কল্পনা,—ইহা সত্যই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। বিশ্ব চরাচরের যেখানে যাহা কিছু আছে, গ্রহ-চন্দ্র-তারকা হইতে আরম্ভ করিয়া কীট কীটাণু পর্য্যন্ত সমস্তই একই নিয়মের সুবর্ণ সূত্রে শৃঙ্খলিত। এক দিকে জড়জগৎ, অপর দিকে জীব-জগৎ; আপাত দৃষ্টিতে এ দু'য়ের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য দেখা যায় না। মনে হয় যেন, বিশাল জড়-বিশ্ব চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের চৈনিক প্রাচীর তুলিয়া দিয়া, জীব জগৎকে ঠেলিয়া পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। নিঃসাড়, নিস্পন্দ, বধির জড়-পদার্থ-নিবহ জীবনের অশেষবিধ বিকাশের বহু দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জীবনের ভোজে তাহাদের স্থান নাই। কিন্তু অভিব্যক্তির ধারা জীবনের সহিত জড়কে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। বিজ্ঞান এক দিকে জড়-জগৎকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া দেখাইতেছে যে, তাহাদের মধ্যে একটা সুন্দর বংশগত সাদৃশ্য আছে। এই বংশগত সাম্য হইতে অনুমান করা যায় যে, বিভিন্ন ভূতসমূহ একই মৌলিক উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তাহারা একই বংশসম্ভূত বিভিন্ন শাখার ন্যায় আকার ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যবিশিষ্ট। আমরা স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকে ৭০ কি ৮০টি মূল ভূতের বা Elementsএর কথা পড়িয়াছি। কিন্তু এই মূল ভূতগুলি যে প্রকৃত মৌলিক তাহা কেহ শপথ করিয়া বলিতে পারে না। আজ যাহা মৌলিক বলিয়া বোধ হইতেছে, কাল তাহা বিশ্লেষণ-যন্ত্রে পড়িয়া যৌগিক পদার্থ প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। কয়লা ও হীরকের মধ্যে যেমন বংশগত সাদৃশ্য রহিয়াছে, সমস্ত জড় পদার্থের মধ্যে তেমনই একটা মৌলিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে,—ইহাই জড়-বিজ্ঞানের মুখ্য প্রতিপাদ্য। জড়-দ্রব্যের ন্যায় জড়-শক্তির মধ্যেও এইরূপ গোত্রীয় সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। হার্ৎজ্ যখন তাড়িতের ক্রিয়ার সুন্দর ব্যাখ্যা প্রচারিত করিলেন, তখন ফ্যারাডের কল্পনা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল যে, আলোক ও তাপ, তাড়িত ও চুম্বক একই শক্তিপুঞ্জের ভিন্ন-ভিন্ন ক্রিয়া-মাত্র। এক প্রকারের শক্তি অন্য প্রকারের শক্তিতে সহজেই রূপান্তরিত হইতে পারে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে এই অনুমানই স্বাভাবিক যে, সমস্ত জড়তত্ত্বের মূলে এক প্রকার অণু বা ধূলিকণা আছে, যাহার সংহতিতে নিখিল জড়বস্তু উৎপন্ন হইতেছে,—একই মূল প্রকৃতি অবস্থাভেদে রূপান্তরিত হইয়া জগদ্-বৈচিত্র্য সাধন করিতেছে;—ইহাই জড়ের অভিব্যক্তির ধারা।

প্রাণী-জগতের মধ্যে এই অভিব্যক্তির ক্রিয়া আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জড়ের মধ্যে যাহা অব্যক্ত, বা অল্প ব্যক্ত—প্রাণীর মধ্যে তাহা সত্যই অভিব্যক্ত। জড়ের সম্বন্ধে 'ক্রম-বিকাশ' বা 'উন্নতি' কথাটি আমরা এখনও প্রয়োগ করিয়া উঠিতে পারি না; কিন্তু উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর সম্বন্ধে আমরা একটুও সন্দিহান নহি। জড়বস্তু অন্ধভাবে ক্রিয়া করিয়া যায়, শক্তির প্রয়োগ হইলেই আমরা তাহার বিশেষ ফল দেখিতে পাই। লৌহে যে মরিচা পড়ে, তাহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, লৌহের উপর বাতাসের ক্রিয়ায় এইরূপ একটী পরিবর্ত্তন ঘটে। পালে জোর হাওয়া লাগিলে নৌকা এইরূপ জোরে চলে, এই মাত্র। ইহার মধ্যে বিশেষ ব্যতিক্রম নাই, সুতরাং বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু প্রাণী জগতে যে কার্য্যপরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ব্যতিক্রমের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলার মধ্যে ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে কার্য্য-কারণ-প্রবাহ, ইহাতে অন্ধ বাধ্যতা নাই। প্রাণী-জগতের কার্য্য-কলাপে এমন একটী সূক্ষ্ম, অনবচ্ছিন্ন ধারা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সমস্ত নিয়মের সহিত ছন্দ রক্ষা করিয়াও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে। একটা মাকড়সার ক্রিয়া লক্ষ্য করিলেই এই বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে। মাকড়সা অনেকবার অকৃতকার্য্য হইয়াও তাহার অভীষ্ট স্থানে জালের প্রান্ত বাঁধিয়া দিল, এবং অনেকবার দোল খাইয়া-খাইয়া অপর প্রান্তও আট্‌কাইল। তার পরে ধীরে-সুস্থে বৃহৎ একটী জাল বুনিয়া ফেলিল। আরও লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, মাকড়সা নিশ্চিন্ত ভাবে জালের কেন্দ্রভাগে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতে-করিতে নিবিষ্ট মনে শুনিতেছে, মাছির গুঞ্জন। তারপর কোন এক মুহূর্ত্তে একটী মাছি উড়িয়া আসিয়া জালের সুতার সঙ্গে জড়াইয়া গেল। মাকড়সা যেন চোখের কোণে একটু হাসির ভাব

লইয়া মুক্তির জন্য মাছির নানা ব্যর্থ চেষ্টা লক্ষ্য করিতেছে। তার পর মাছিটি যখন ছাড়াইতে গিয়া আরও জড়াইয়া পড়িল, তখন সতর্ক পদক্ষেপে মাকড়সা তাহার শিকারের নিকটে গেল এবং আঘাতে-আঘাতে তাহাকে মৃতপ্রায় করিয়া রাখিয়া দিল। অবসর-মত তাহার ভোজ নিষ্পন্ন করিতে পারিবে, এই আশ্বাস হৃদয়ে লইয়া সে সুস্থ চিত্তে বিশ্রাম করিতে গেল। এই ধারাবাহিক ক্রিয়া-কলাপ যে কোনও একটী উদ্দেশ্যের অভিমুখে নিয়োজিত হইতেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। এই উদ্দেশ্যানুকূল ক্রিয়ার পারম্পর্যাই জীব-জগতের বৈশিষ্ট্য। এমন কি, উদ্ভিদ্-রাজ্যেও এইরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। তবে উদ্ভিদ্ ভূমিতে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ, বাতাস ও বৃষ্টি অনায়াসে তাহার খাদ্য জোগায়; এই জন্য উদ্ভিদের ক্রিয়ায় বড় একটা বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উদ্ভিদেরও সাড়ায় বৈচিত্র্য আছে। আমরা জানি, বৃক্ষলতা আলোক চাহে। অঙ্কুর হইতে বাহির হইয়া তাহারা আলোকের দিকে মাথা তুলে; অন্ধকারের দিকে ফিরাইয়া দিলেও, তাহারা আলোর সন্ধানে ফিরে। আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, সমস্ত জীবনী-শক্তি দিয়া একটু মুক্ত বাতাসের আস্বাদ পাইতে ব্যগ্র হয়। বৃক্ষলতাও প্রাণীদের মত ঘুমাইয়া পড়ে, আলোকে ও আঁধারে তাহাদের জীবনী শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, বিষ প্রয়োগে তাহারাও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। মদ্য বা অহিফেন সেবনে তাহাদেরও নেশা হয়, আঘাত পাইলে তাহারাও কাতর হয় এবং অল্পে-অল্পে আঘাতের ক্ষত শুকাইয়া গেলেও তাহাদের দেহে দাগ থাকে। এই সমস্তই প্রাণের ক্রিয়া। অবস্থার ব্যতিক্রমে ক্রিয়ার ব্যতিক্রম এবং উদ্দেশ্যের সহিত ক্রিয়ার সামঞ্জস্য—ইহাই মোটামুটি প্রাণের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে দেখিলে, আমরা প্রাণী ও উদ্ভিদ্ এই বৃহৎ পরিবারদ্বয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না।

আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদিগের মধ্যে যে অনুক্রমিকতার ধারা রহিয়াছে, জড়-জগতে তাহা নাই। একখণ্ড লৌহ বা একখণ্ড হীরক জগতের সমস্ত লৌহ বা হীরকের অংশমাত্র। লৌহ হইতে লৌহের বা হীরক হইতে হীরকের উৎপত্তি হয় না। সিন্দুকের মধ্যে সহস্র-সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা অনন্ত কাল আবদ্ধ থাকিলেও, তাহা হইতে আর একটী মুদ্রাও জন্মগ্রহণ করে না। জীবজগতে অল্প হইতে বহু জন্মলাভ করে—ইহারই নাম বংশ-বিস্তৃতি। একটী জীব হইতে অপর একটী জীব জন্মলাভ করে। এইরূপে জগতে বিশাল জীব-প্রবাহ চলিয়াছে। এই জীব-প্রবাহের একটী সাধারণ নিয়ম এই যে, এক প্রকার জীব হইতে সেই প্রকারের জীবই জন্ম লাভ করে। মনুষ্য হইতেই মনুষ্য হয়, অশ্ব হইতেই অশ্ব হয়, মনুষ্য হইতে অশ্ব বা অশ্ব হইতে গর্দ্দভ জন্মলাভ করে না। গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করা যায় না, জীব তত্ত্ববিদেরা এই জনশ্রুতির সমর্থন করেন। কিন্তু মানুষের ছেলে সময়ে-সময়ে যে কিরূপে বানর হইয়া যায়, এ সমস্যা শিক্ষক, অভিভাবক ও জীবতত্ত্ববিদ্ সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করে।

পূর্ব্বে যে সাধারণ নিয়মের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সাদৃশ্যাত্মক; অর্থাৎ মানুষে-মানুষে, গরুতে-গরুতে, কুকুরে-কুকুরে, অথবা লেবুতে-লেবুতে যে সাদৃশ্য আছে, তাহা বংশগত সাদৃশ্য। একই বংশে যে সকল তরুলতা, বা যে সকল প্রাণী জন্মগ্রহণ করে, তাহারা ইতর বিলক্ষণ গুণসম্পন্ন এবং সমান শ্রেণীর বা সমান বংশের সহিত সাদৃশ্যবিশিষ্ট। পূর্ব্ব বংশের গুণ উত্তর-বংশীয় জীবে সংক্রমিত হয়। সন্তান পিতৃ পিতামহের ধারা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই ধারা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে একই রকমের জীব পুনঃ-পুনঃ অবিকল অনুবৃত্ত হইয়া পৃথিবীকে নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন বা একঘেয়ে করিয়া তোলে। প্রকৃতি এই একঘেয়ে, বৈচিত্র্যবর্জ্জিত অবস্থা পছন্দ করেন না। তাঁহার অফুরন্ত ভাণ্ডার অনন্ত-কাল ধরিয়া বিবিধ রূপ, বিবিধ মূর্ত্তি যোগাইলেও শেষ হয় না। তাই যেখানে সাদৃশ্য, সেখানেই কিছু-না কিছু বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের সন্তান মানুষ হয় বটে, সুন্দর পিতামাতার সন্তান সুন্দর হয় বটে, কিন্তু সন্তান সব বিষয়ে পিতামাতার অনুরূপ হয় না। একই পিতামাতার সকলগুলি সন্তানও একই রূপ হয় না। ইহাই জীব-জগতের অপর সাধারণ নিয়ম। প্রথম নিয়মের নাম বংশানুক্রম; দ্বিতীয় নিয়মের নাম ক্রম-বিপর্য্যয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, পূর্ব্বপুরুষের সহিত

উভয় পুরুষের সাদৃশ্যই বা কতখানি এবং বৈষম্যই বা কতখানি হইতে পারে? অর্থাৎ পিতামাতার গুণ সন্তানে কতখানি বর্তিতে পারে? জীব কতকগুলি গুণ বংশ-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হয়; আর কতকগুলি গুণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার গতিকে তাহাকে অর্জন করিতে হয়। জীবনের উপর অবস্থার প্রভাব প্রত্যক্ষ বর্তমান রহিয়াছে। অবস্থার প্রভাবেই জীবন গঠিত হয়। প্রত্যেক জন্তুকে পারিপার্শ্বিক ঘটনার সহিত বনাইয়া চলিতে হয়; অবস্থার সহিত না বনাইতে পারিলে, জীবন ধ্বংসের অভিমুখে প্রেরিত হয়। যে সকল জীব অবস্থার সহিত সমতাভাবে আপনাকে মিলাইয়া বনাইয়া লইতে অক্ষম হইয়াছে, তাহারা কালের স্রোতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে এমন কত জীব দল অবস্থার ফেরে বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে,—সাক্ষী আছে কেবল তাহাদের কঙ্কাল; এই যে অবস্থার সহিত পারিপার্শ্বিক ঘটনার সহিত বনাইয়া চলিবার অবিরাম চেষ্টা, ইহাকেই জীবন সংগ্রাম বলে। অনাদিকাল হইতে জীবজগতে একটা মহা বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা চলিতেছে, যাহার ফলে লক্ষ লক্ষ জীব ঝরিয়া, খসিয়া, মুছিয়া যাইতেছে, আবার লক্ষ-লক্ষ প্রাণী বাঁচিবার মত, টিকিয়া থাকিবার মত শক্তিলাভ করিতেছে। এইরূপে প্রকৃতির নির্বাচন-প্রণালী যোগ্যতমের উদ্বর্তন সাধন করিতেছে। এইরূপে উদ্বৃত্ত জীবসমূহের মধ্যে আবার যাহারা দায়াধিকার-সূত্রে পিতামাতার অর্জিত যোগ্যতা লাভ করিতে পারিতেছে না, তাহারাও অযোগ্য সাব্যস্ত হইয়া মহাপ্রস্থান করিতেছে। পিতামাতা কর্তৃক অর্জিত, দৈব-লব্ধ যোগ্যতা শুধু যে সন্তানে বর্তে, তাহা নহে; সে সকল গুণের পরিণতি ও উন্নতি সন্তান পরম্পরায় সম্ভাবিত হয়। এই জন্যই পুত্রের বৈদিক অর্থ—যে পূরণ করে, অর্থাৎ পিতার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে। চিল এইরূপে দূরদৃষ্টি লাভ করিয়াছে; মাছরাঙা জলের ভিতর মাছ দেখিয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে তাহাকে ধরিবার শক্তি লাভ করিয়াছে। জিরাফের গলা বৃক্ষের ফল পাড়িতে-পাড়িতে লম্বা হইয়া গিয়াছে; গো-মহিষের শৃঙ্গ গুঁতাগুঁতি করিতে-করিতে গজাইয়াছে। যাহাদের এরূপ সুবিধা হয় নাই, তাহারা ভবধাম হইতে চিরবিদায় লইয়াছে। যাহাদের প্রয়োজনের অনুরূপ এই সকল সুবিধা হইয়াছে, তাহারাই উদ্বৃত্ত হইয়াছে, রহিয়া গিয়াছে।

তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে, আমরা বর্তমান কালে যে সকল জীব দেখিতেছি, তাহারা অনেক ব্যর্থ চেষ্টার মধ্য দিয়া জন্ম লাভ করিয়াছে। পরিণতির পথে অগণিত জীব ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক নির্বাচন। ইহার একদিকে সৃষ্টি, অপর দিকে সংহার। সৃষ্টি বা স্থিতি এবং সংহার একই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক্ মাত্র। রাত্রি এবং দিনের মত ইহারা পরস্পর গলাগলি করিয়া রহিয়াছে। যে অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মে যোগ্যতমের উদ্বর্তন সাধিত হইতেছে, সেই নিয়মের ফলেই যত অযোগ্য, যত শিথিলাঙ্গ জীব, তাহারা ঝরিয়া পড়িতেছে। জীব-জগতের এই উত্থান পতন চক্রনেমির মত পরিবর্তিত হইতেছে।

হিসাব নিকাশের সুদীর্ঘ যোগবিয়োগ অঙ্কে যেমন আমরা শুধু দেনা বা পাওনা মোট কত দাঁড়াইল, তাহাই জানিতে পারি; তেমনি অনাদিকালের এই নির্বাচন প্রণালীতে যুগযুগান্তর ধরিয়া যে ধ্বংস-নাটিকা অভিনীত হইতেছে, তাহারই শেষ অঙ্কটি মাত্র আমরা দেখিতে পাইতেছি। যাহা অতীত, তাহার চিহ্ন বর্তমানের ললাটে অঙ্কিত রহিয়াছে; সেই জন্যই আমরা এই সুদূর অতীতের ইতিহাস সংকলন করিতে সমর্থ হই। বর্তমান জীব অতীতের ধারা রক্ষা করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যে সকল গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা লক্ষ-লক্ষ বর্ষব্যাপী জীবন-সংগ্রামের ফলে অর্জিত হইয়াছে। একই পরিবারের বা শ্রেণীর বিভিন্ন জীব বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে অবস্থান করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন গুণগ্রাম লাভ করিয়াছে। গুণভেদ দেখিয়া আমরা জাতিভেদ কল্পনা করিয়া বসি। বাদুড় উড়িতে পারে বলিয়াই যে সে পক্ষী-জাতিভুক্ত হইবে, এরূপ নহে। বাদুড় স্তন্যপায়ী জীবের অন্তর্গত; কিন্তু ক্রমাগত উড়িবার চেষ্টা করিয়া-করিয়া, তাহারা একরূপ পক্ষ উদ্ভাবিত করিয়া লইয়াছে। এক-প্রকার কাঠবিড়ালীও উড়িয়া এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাইতে পারে। হাঁস অন্যান্য পক্ষীরই মত। একপ্রকার হাঁস সারি বাঁধিয়া আকাশ-পথে উড়িয়া চলে। 'মানসং যান্তি—হংসাঃ' ইহা প্রাচীন কবিপ্রসিদ্ধি। কিন্তু সন্তরণ করিবার প্রবল চেষ্টা হইতে তাহাদের পায়ের আঙুল জোড়া লাগিয়া গিয়াছে; ইহাতে তাহাদের সন্তরণের সুবিধা হয়।

পক্ষান্তরে, পক্ষের অব্যবহার হেতু, গৃহপালিত হংস উড়িবার শক্তি হারাইয়াছে; এখন তাহাদের বিস্তৃত পক্ষ বোঝা মাত্রে দাঁড়াইয়াছে, হয় ত কালে ইহাদের পক্ষ লোপ পাইবে। মৎস্য জলে থাকিয়া থাকিয়া যে ডানা গজাইয়া লইয়াছে, তাহাই বাতাসের সাহায্যে পক্ষীর পক্ষদ্বয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। তিমি মাছ জলে থাকিয়া মৎস্যের অনেকগুলি স্বভাব পাইয়াছে, কিন্তু তথাপি তিমি মৎস্যের জাতি নহে। ইহারা স্তন্যপায়ীদিগের জাতি। এই সকল তথ্য পুরাতন কাহিনীতে দাঁড়াইয়াছে; ইহাদের বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমার এই প্রবন্ধের জন্য এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, আমরা আপাত দৃষ্টিতে যে সকল প্রভেদ দেখিয়া জীবসমূহের মধ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি বা শ্রেণীর কল্পনা করিয়া থাকি, তাহা হয় ত কোনও স্থায়ী বা অপরিবর্ত্তনীয় পার্থক্য নহে। একই মনুষ্য পরিবারের শাখা যেমন ভৌগোলিক সংস্থানের বিশেষত্বে শ্বেত, পীত, কৃষ্ণবর্ণ হয়, কেহ বিড়ালাক্ষ, কেহ হনুমুখ এবং কেহ বা বক্রনাসিক হয়, তেমনি একই পূর্ব্বপুরুষের বা আদিম [illegible] শ্রেণীর জীবগণ অবস্থার পার্থক্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন গুণের আশ্রয়ভূত হইয়া ভিন্ন-ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাই অভি-বিকাশবাদের প্রতিপাদ্য। পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক-পৃথক ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া কল্পিত হইত; ডারুইন প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, অল্প-সংখ্যক বা একইমাত্র মূল জাতি হইতে সমস্ত জাতি সৃষ্ট হইয়াছে। জীবন-সংগ্রাম ও স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের ফলে নূতন নূতন গুণের উদ্ভব হওয়ায়, সেগুলি জাতিগত পার্থক্যে পরিণত হইয়াছে; এবং আমরা তাহাদের জন্ম কথা ভুলিয়া গিয়া, জাতি-বৈষম্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া দিয়া, জীবকে জীব হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছি। বস্তুতঃ, তাহারা একই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাখামাত্র।

এক্ষণে সমস্যা হইতেছে এই যে, বিড়াল ও ব্যাঘ্র, শৃগাল ও নেকড়ে, গাধা ও ঘোড়াতে, গোরিলা ও ওরাঙ্গকে আমরা এক পরিবারভুক্ত বলিয়া গণনা করিতেও পারি; কিন্তু সমস্ত পশুজাতির মধ্যে ত এমন একটা সুস্পষ্ট জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাই না। তাহার উত্তরে জীবতত্ত্ববিদ্ বলিবেন যে, আমরা প্রথমতঃ পৃথিবীর যাবতীয় জন্তুকে শ্রেণী-বদ্ধভাবে সাজাইয়া দেখিলে, এই ঐক্যের সূত্রটি দেখিতে পাই। বিড়ালকে রূপকথায় বাঘের খুব নিকট কুটুম্ব বলিয়া প্রচার করিলেও, আমরা তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্যের একটু আভাসমাত্র বই আর কিছুই পাই না। মানুষ ও সাধারণ বানরে যে সাম্য, সে শুধু তিরস্কারের সময়ে আমাদিগকে যথেষ্ট সন্তাপিত করে; তাহাদের পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার বিষয় বুঝিতে সাহায্য করে না। কিন্তু যদি বিড়ালের পাশে স্তরে স্তরে বন্য বিড়ালগুলিকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া যায়, এবং তার পরেই ঠিক রয়েল বেঙ্গল জাতীয় বাঘ না আনিয়া, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগুলিকে পর-পর সাজাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের বুঝিতে বাকী থাকে না যে, কেমন করিয়া এই সমস্ত জীব এক বৃহৎ বিড়াল পরিবারে স্থান পাইতে পারে। সেইরূপ বানর জাতীয় জীব যত প্রকার আছে, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকার হইতে আরম্ভ করিয়া, পর পর শিম্পাঞ্জি, ওরাং, ও গোরিলাকে দাঁড় করাইয়া তাহার পাশে একেবারে পার্লামেন্টের মেম্বরকে স্থাপন না করিয়া, যদি নিম্নস্তরের বনমানুষ বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগকে দাঁড় করিয়া দেওয়া যায়, এবং পর পর নিগ্রো, রেড ইণ্ডিয়ান, মোঙ্গোলিয়ান ও আর্য্যগণকে সাজাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বোধ হয় অনেক আপত্তির মীমাংসা সহজেই হইয়া যায়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে [illegible] জীবদিগকে সাজাইতে পারি না। অনেক সময়ে শ্রেণী সাজাইবার মধ্যে মধ্যে ফাঁক থাকিয়া যায়। পূর্ব্বে যে স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের কথা বলিয়াছি, তাহাই আমাদিগকে এই ফাঁকগুলি পূরণ করিবার পক্ষে সহায়তা করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের ফলে অযোগ্য জীবগুলি বিনাশপ্রাপ্ত ও কালে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। যে সকল জীব জাতিদের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিত, তাহারা লোপ পাইয়াছে, কাজেই আমাদের শ্রেণী-বিভাগের পারম্পর্য্যে ফাঁক দেখা যায়। ইহা যে কল্পনা-মাত্র, তাহা নহে। ইতিহাসের একটা বিস্তৃত অধ্যায় হইতে আমরা ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাই যে, সকল জীব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কঙ্কাল ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে। সেই সকল জীর্ণ কঙ্কাল আমাদের সমস্যাপূরণে সহায়তা করে। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সব সময়ে পৃথিবী কঙ্কাল জোগাইয়া আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন না। তাহার

কারণ, কোটী-কোটী বৎসরে যে সমস্ত প্রাকৃতিক বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহাতে অনেক চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। শুধু শ্রেণী-বিভাগ হইতেই যে আমরা জাতিত্বের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, তাহা নহে। প্রত্যেক জীবেরই একটী আদিম অবস্থা আছে, এবং সেই আদিম অবস্থায়, অর্থাৎ গর্ভস্থ ভ্রূণের অবস্থায় সমস্ত জীবেরই আকৃতি প্রায় একরূপ। পরে যত সে ভ্রূণ অভিব্যক্তি লাভ করে, ততই তাহার বিশেষ বিশেষ জাতীয় গুণ প্রকাশিত হইতে থাকে। অপেক্ষাকৃত প্রাথমিক অবস্থায় যে সকল গুণ অন্তর্নিহিত থাকে, তাহাই পরে পরিস্ফুট হইয়া উঠার নামই অভিব্যক্তি।

জীবজন্তুদিগকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাজাইয়া আমরা অল্প কয়েকটি জাতিতে উপনীত হই, যেমন স্তন্যপায়ী জীব, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য ও উভচর। সমস্ত মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট জীবকে এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এই সকল শ্রেণী এক একটি বৃহৎ পরিবার; এবং ইহাদের মধ্যে যে সমতা দেখা যায়, তাহা রক্তের সম্বন্ধ বা সমানগোত্রে জনিত। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, এক পরিবারের যাবতীয় জন্তুর মধ্যে যে আকৃতি, বর্ণ ও অভ্যাস বিষয়ে নানা বৈষম্য রহিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া জীবতাত্ত্বিক তাহাদের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন যে, ইহারা একই মূল বংশ হইতে বা একই পিতামাতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়ে, জীবন-সংগ্রামের অল্পাধিক তীব্রতার ফলে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা স্বভাব প্রাপ্ত হইলেও ইহাদের মূলগত প্রকৃতি এক। অবস্থার সংকলনে এই যে বৈচিত্র্য সাধিত হইতেছে, ইহার একটী নির্দ্দিষ্ট ধারা বা পন্থা আছে, যাহাকে ক্রম বিকাশ বলা যায়। ক্রম-বিকাশ অর্থে জীবতত্ত্বে ইহাই বুঝায় যে, জৈব পদার্থ ক্রমশঃ সরলতা হইতে জটিলতায়, একরূপতা হইতে বিবিধ রূপতায়, সাজাত্য হইতে বৈজাত্যে উপনীত হয়। পূর্ব্বে জীবের আদিম অবস্থার প্রসঙ্গে গর্ভস্থ ভ্রূণের কথা বলিয়াছি। ভ্রূণ প্রথম অবস্থায় অনির্দিষ্ট পিণ্ডের মত আগাগোড়াই একরূপ অবয়ববিশিষ্ট থাকে; পরে হস্ত, পদ, মস্তক আবির্ভূত হইয়া তাহাকে ক্রমশঃ জটিল করিয়া তুলে। গর্ভস্থ ভ্রূণের সম্বন্ধে যে অবিসংবাদী নিয়ম খাটে, সমস্ত জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধেও সে নিয়ম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। একটি বা কয়েকটি মৌলিক-জীবপ্রকৃতি হইতে সমস্ত জীব-নিবহ উদ্ভূত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হই। অর্থাৎ মার্জ্জার যদি অভিব্যক্ত হইয়া ব্যাঘ্রে পরিণত হইয়া থাকে, বানর যদি বিবর্ত্তন-ফলে মানুষে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে ইহা মোটেই বিচিত্র নহে যে, মৎস্য সরীসৃপে, সরীসৃপ পক্ষীতে, এবং পক্ষী চতুষ্পদে ও চতুষ্পদ ক্রমে দ্বিপদ ও দ্বিভুজ জীবে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। বংশানুক্রমিকতার ফলে সমস্ত জীবনিচয়ের মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই সাদৃশ্যের ক্রিয়া ক্রমবিপর্য্যয়ের দ্বারা বাধিত হয়। মৌলিক জীবোপাদান হইতে যেমন একটী সাদৃশ্যের ধারা অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তেমনই বিপর্য্যয় বা বৈচিত্র্যের দিকেও জীবের যথেষ্ট ঝোঁক রহিয়াছে। স্বাভাবিক নির্ব্বাচনে যে সকল বৈচিত্র্য বা বিপর্য্যয় জীবের সুবিধাজনক হইয়াছে, তাহারাই স্থিতিলাভ করিয়াছে। এই সত্যটি আমরা কার্য্যতঃও দেখিতে পাই। মানুষ ইচ্ছা করিয়াও জীবদেহে কতকটা বৈচিত্র্যের সংঘটন করিতে পারে। পশুপালক এবং কৃষক জানে যে, বাছিয়া-বাছিয়া পশু-পক্ষী, বৃক্ষ লতার সংমিশ্রণ সাধন করিলে নূতন-নূতন প্রকারের বর্ণ, আকৃতি ও প্রকৃতি দেখা গিয়া থাকে। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে যৌন-সম্মিলন ঘটাইয়া, বিভিন্ন বৃক্ষলতার কলম একত্র রোপণ করিয়া অদ্ভুত রকমের বৈচিত্র্য পাওয়া গিয়াছে। মানুষ যাহা অল্প পরিমাণে সাধন করে, প্রকৃতির বিশাল পরীক্ষাশালায় তাহা বহু পরিমাণে সাধিত হইতেছে,—ইহাই বিজ্ঞানবিদ্‌গণের স্বাভাবিক নির্ব্বাচন।

এই মতবাদ যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন তাহার প্রথম শত্রু ছিল জগতের ধর্ম্মমতসমূহ। অনেক ধর্ম্ম বলে যে, ভগবান পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জীব-সম্প্রদায় বা জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং এই সকল প্রাণী, জাতি অপরিবর্ত্তনীয়; অর্থাৎ এক জাতির জীব অপর জাতিতে কোনও কালে বিবর্ত্তিত হইতে পারে না। কিন্তু, এক্ষণে সমস্ত তর্ক নিরস্ত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মমত সকলও বুঝিয়াছে যে, পৃথক্ ভাবে পশুপক্ষী সৃজন করা অপেক্ষা একটি মূল বীজ সৃজন করায় ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য সমধিক প্রকাশিত হয়। মনু বহুপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন:

অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।

ভগবান স্বয়ম্ভু পূর্ব্বে জল সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে বীজ আরোপণ করিলেন।

এই বীজে প্রাণী-জনক সমস্ত শক্তিই অন্তর্নিহিত আছে। কেন না যাহা আছে, তাহাই সময় ও সুবিধা পাইলে অভিব্যক্ত হয়; যাহা নাই, তাহা কোনও কালেই আসিতে পারে না। সুতরাং বংশানুক্রম সিদ্ধ হইতে হইলে, বীজাণুতে সমস্ত শক্তির বীজ নিহিত আছে স্বীকার করিতে হয়। এবং তাহা স্বীকার করিলেই আমরা বুঝিতে পারি, কেন পূর্ব্বপুরুষের দ্বারা অর্জ্জিত কোন-কোন গুণ উত্তর-পুরুষে সংক্রমিত হয়। প্রত্যেক জীবকণা বা জীবপঙ্ক প্রথম হইতেই এরূপ ভাবে গঠিত যে, পরে যে সকল গুণ বা লক্ষণ তত্তদ্ জীবদেহে আবির্ভূত হইবে, তাহার অঙ্কুর সেই জীবপঙ্কেই নিহিত থাকে। সুতরাং যদি কোনও অর্জ্জিত গুণ আদিম জীবকণাকে আংশিক রূপেও রূপান্তরিত করিতে পারে, তাহা হইলে সেই গুণ শুক্রশোণিতের সাহায্যে সংক্রমিত ও পরিপুষ্ট হইয়া সন্তানে বর্ত্তে। যাহা এই মৌলিক জৈব উপাদানের উপর কোনও রূপ প্রভাব বিস্তার করে নাই, তাহা সন্তানে সংক্রমিত হয় না। ইহাই ভাইসম্যানের Germ Plasm Theory বা জীবাঙ্কুর বা জীবাঙ্কুর-বাদ। ডারুইনের Gemmules, স্পেন্সারের Ids এবং ভাইসম্যানের Germ-plasm এই একই মূল জৈব উপাদানের বিভিন্ন নাম মাত্র। ভাইসম্যানের মতের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা বংশানুক্রমিকতার সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করে। কেন যে একটা গুণ সন্তানে সংক্রমিত হইবে এবং অপর একটা গুণ কেন যে হইবে না, তাহা বীজাঙ্কুরের প্রকৃতি প্রথম হইতেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। একজন আজীবন সঙ্গীতকলার চর্চ্চা করিয়া যশস্বী হইল, সন্তান এ স্থলে পিতার ধারা মোটেই পাইল না, কিন্তু অপর এক ব্যক্তি একটু তোতলা, তাহার সন্তান সে গুণটি উত্তরাধিকার-সূত্রে অবিকল প্রাপ্ত হইল। ইহার কারণ এই যে, সঙ্গীত-কলার অনুশীলন তাহার মূল ধাতুর উপর একটুও ছাপ দিয়া দিতে পারে নাই; অথচ তোতলার তোতলামি তাহার মূল ধাতুকে এমন ভাবে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছে যে, তাহার সন্তান-সন্ততিতেও সেই ধাতু অভিব্যক্ত হয়। এইরূপে অনেক ব্যাধি পূর্ব্বপুরুষ হইতে উত্তরপুরুষে সংক্রমিত হয়, এবং অনেক ব্যাধি হয় না। চরকও এই প্রশ্নের মীমাংসায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন; এবং তাঁহার মীমাংসা অনেকটা আধুনিক মতের পরিপোষক।

তত্র চেৎ ইষ্ট মেতৎ যস্মাৎ মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভবঃ, তস্মাদেব মনুষ্য বিগ্রহেণ জায়তে, যথা গৌর্গোপ্রভবঃ যথা চাশ্বঃ অশ্বপ্রভবঃ ইত্যেবং যদুক্তং অগ্রে সমুদায়াত্মক ইতি তদযুক্তং।… …যচ্চোক্তং যদি চ মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভবঃ কস্মাৎ জড়াদিভ্যো জাতাঃ পিতৃসদৃশরূপা ন ভবন্তীতি তত্রোচ্যতে যস্য যস্য হি অঙ্গাবয়বস্য বীজে বীজভাব উপতপ্তো ভবতি তস্য তস্য অঙ্গাবয়বস্য বিকৃতিঃ উপজায়তে।

অর্থাৎ মনুষ্যদেহ হইতে যে মানুষ, গো-দেহ হইতে যে গো উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ, পিতার সমুদায় দেহ-যন্ত্র তাহার বীজে অনুস্যূত হইয়া থাকে। কিন্তু পিতা যদি জড় বা মূক বা বামন হয়েন, তাহা হইলে ঐ সকল দোষ সন্তানে না বর্ত্তিতেও পারে। দৈবগতিকে কখন কখনও পিতৃ-বীজে এই সকল দোষ উপতপ্ত হইলে, সন্তানও তদনুসারী হয়।

। দম্পত্যোঃ কুষ্ঠবাহুল্যাৎ দুষ্টশোণিতশুক্রয়োঃ। যদপত্যং তয়োর্জাতং জ্ঞেয়ং তদপি কুষ্ঠিতং। ইত্যাদি

(শারীর-স্থান)

এক বীজাঙ্কুর হইতে যেমন সমস্ত প্রাণি জগতের বৈচিত্র্য বুঝিতে চেষ্টা করা যায়, জড়জগতেরও তেমনি একটা মূল কারণ কল্পনা করিয়া লওয়া হয়। উভয় ক্ষেত্রেই এক হইতে বহুর আবির্ভাব সিদ্ধ হয়। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, জড় ও জীব এই উভয়াত্মিকা পৃথিবীর দুইটি বিভিন্ন ধারা হওয়া সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সমস্ত চরাচর বিশ্ব এত বৈচিত্র্য, বৈষম্য, বিপর্য্যয় লইয়াও অদ্ভুত সামঞ্জস্যের সহিত ক্রিয়া করিতেছে। মানবের শ্রেষ্ঠ কলা কৌশল-প্রসূত যন্ত্রও মাঝে মাঝে বিকল হইয়া যায়; কিন্তু এই আবহমান কাল হইতে চলিষ্ণু বিশ্বযন্ত্রের মধ্যে কোথাও এতটুকু অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, একই প্রণালী জীব ও জড়াত্মক ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। স্থাবর, জঙ্গম একই নিয়মে চলিতেছে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে একই অভিব্যক্তির ধারা জীব ও জড়কে একসূত্রে গাঁথিয়া দিয়াছে। একই ধূলিকণা বা বাষ্পপুঞ্জ হইতে জড়ের বহুবিধ রূপ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। মেঘে যাহা ধূমের আকারে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, জলে তাহাই নীলিমার ছ্যতি কলায়। বরফের আকারে যাহা প্রস্তর-কঠিন, বাষ্পের আকারে

তাহাই স্বাদ ও স্পর্শের অতীত। সমস্ত জড়পদার্থের মধ্যে এই যে অন্তরঙ্গ ভাব আছে, তাহাই অতীতের কোনও অখ্যাত দিবসে হয় ত প্রাণের রূপে প্রথম দেখা দিয়াছিল। সেই হইতে এই অবিরত জীব প্রবাহের আরম্ভ হইল। পাষাণের বক্ষ ফাটিয়া কবে একটুকু ঘাম বাহির হইয়াছিল, আর তাহারই বিন্দু বিন্দু নগ-নগান্তর ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া এক পুণ্য প্রবাহিনীর সৃষ্টি করিল, যাহার পূত ধারা ধরার বক্ষ সরস করিয়া দিল।

অনেকে মনে করেন, জীব হইতেই জীব জন্মে, অজীব পদার্থ বা জড় হইতে জীবের জন্ম হয় না। এই জন্য কোনও আদিম জীবপঙ্ক বা Germ plasm-এর কল্পনা করিতে হয়। বৃক্ষ শুকাইয়া পচিয়া ভস্মের অঙ্গারে পরিণত হয়, জীবদেহ পরিণামে পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়; কিন্তু অঙ্গার কখনও একটী দূর্ব্বাদলও উৎপন্ন করিতে পারে না এবং পঞ্চভূত কখনও প্রাণের সৃষ্টি করিতে পারে না। প্রাণের সৃষ্টি প্রাণ হইতেই হয়, প্রাণহীন জড় হইতে হয় না। অথচ এই জড় না হইলে আবার প্রাণের চলে না। প্রাণের সাড়া আছে সত্য, কিন্তু জড় পদার্থ না থাকিলে সে সাড়া কোন কালে বন্ধ হইয়া যাইত। বৃক্ষ, লতা জড় পদার্থ হইতেই রস সংগ্রহ করে, বাতাস হইতে কার্ব্বন বা অঙ্গারক গ্রহণ করিয়া বাঁচে। জড় মৃত্তিকা যদি তাহাদের আশ্রয় না দেয়, বৃষ্টি বা জলসেচনের দ্বারা যদি তাহাদের রস-সঞ্চার না হয়, বাতাস, আলো ও তাপ যদি তাহাদের খাদ্য না যোগায়, তবে উদ্ভিজ্জের পরমায়ু সেইখানেই শেষ হয়। আর উদ্ভিদ্ যদি না থাকে, তবে প্রাণী জগতের পুষ্টিসাধন হয় কিরূপে? জড়ের দ্বারা উদ্ভিদের পুষ্টি, উদ্ভিদের দ্বারা এবং উদ্ভিদ্ ও জীব উভয়ের দ্বারা প্রাণীর পুষ্টি, ইহাই ত প্রকৃতির নিয়ম। তবুও প্রকৃত জড়, অন্ধ, নিঃসাড়। জড় বা খনিজ পদার্থের ও উদ্ভিজ্জের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা একটী অস্পষ্টরেখায় পর্য্যবসিত হয়; এবং উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া মিলাইয়া যায়। তথাপি আমরা জড় ও জীবকে পৃথক্ করিয়া দিয়া, তাহাদের সম্পর্ককে জটিল ও রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, জড় হইতে জীবের উদ্ভব এ পর্য্যন্ত কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। কোনও পরীক্ষাগারে এ পর্য্যন্ত জীবনের দানা একটীও প্রস্তুত হয় নাই। চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া যেমন একটা নূতন রঙ প্রস্তুত হয়, প্রাণকে সেরূপভাবে উৎপন্ন হইতে আমরা দেখি নাই।

ন খলু চূর্ণ হরিদ্রা সংযোগ জন্মারুণগণ-
স্তয়োরণ্যতরাভাবে ভবিতুমহতি।
— ভামতী।

প্রাণের রহস্য সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। এই জন্যই প্রাণকে একটা স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা এতক্ষণ যে পারম্পর্য্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, ইহা অন্ততঃ কতকটা আশা করি যে, প্রকৃতির মধ্যে কোথাও ফাঁক নাই, স্তরের পর স্তর, স্তরের পর স্তর এইরূপ ভাবে সামান্য অণু-পরমাণু হইতে ক্রমান্বয়ে জীব সৃষ্টির মুকুটমণি মানবাত্মা পর্য্যন্ত একই ধারায় চলিয়া আসিয়াছে।

জড়ে যে শক্তি, যে উপাদানের যে বন্ধন রহিয়াছে, তাহাই জীব জগতের ধারক ও পরিপোষক। যে আলোক গ্রহনক্ষত্রে দীপ্ত হয়, তাহাই হীরক মাণিক্য স্ববর্ণে রঙ্গীন্ হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাই পত্রপুষ্পের অফুরন্ত শোভায় বিকশিত হইয়াছে। যে জল মেঘের বাষ্পকণায় পুঞ্জীভূত হইয়া রহে, তাহাই পৃথিবীতে বর্ষিত হইয়া বনৌষধির প্রাণে সঞ্চারিত হয়, আবার তাহাই জীব-দেহের পরিপুষ্টি সাধন করে।

এই ক্রম-বিকাশের ধারা স্বীকার করিলে জড়বাদী হইতে হয়, ইহা আমি স্বীকার করি না। কারণ, এই যে উন্নতির স্তর লীলায়িত পন্থা, ইহা দৈবের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। দৈব শক্তি বা chance এই জগৎ-প্রপঞ্চের কারণ হইলে এত সামঞ্জস্য, এমন শৃঙ্খলা, এমন একনিষ্ঠ ধারা সম্ভব হইত না; জড়পদার্থ এমন ভাবে জীবের প্রয়োজন সাধন করিত না। জীবকে প্রস্তুত করিবার জন্যই যেন জড়-বিগ্রহ। সমস্ত বিশ্বের মধ্যে যেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠার একটী বিরাট উদ্যোগ পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইতেছে। সমস্ত জগৎ যেন প্রাণের স্পন্দনে মুকুলিত হইয়া উঠিতেছে। নদী অমৃত-ধারা বহন করিতেছে, বাতাস অম্লজান অঙ্গারক যোগাইতেছে, তরু-লতা পত্রপুষ্পের সম্ভার উন্মুক্ত করিয়া

দিতেছে, সূর্য্য আলোক ও তাপ দিতেছেন,—এ কি কেবল একটা অন্ধ প্ররোচনা মাত্র? জীবাঙ্কুর কি কীট-পতঙ্গ গো-অশ্বের মধ্য দিয়া নিরর্থক মানুষে পরিণত হইতেছে? এই যে অভিব্যক্তির ধারা ইহা কি অর্থশূন্য দৈবায়ত্ত ঘটনা-পরম্পরায় অন্ধ আবর্ত্তন? এই প্রশ্নই মানবের দর্শনে, ইতিহাসে, কবিতায় ও বিজ্ঞানে, যোগে ও উপনিষদে অনন্তকাল ধরিয়া জিজ্ঞাসিত হইয়া আসিতেছে। সময়ে-সময়ে মনে হয়, বুঝি বা আমরা এ রহস্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছি; কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাল অতিক্রম করিয়া প্রাণের রহস্য, আত্মার রহস্য, আবার দূর হইতে আমাদিগকে উপহাস করে, বৈজ্ঞানিকের মত আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয়,—

"The question of questions for mankind—the problem which underlies all others and is more deeply interesting than any other—is the ascertainment of the place which man occupies in nature and of his relations to the universe of things. Whence our race has come; what are the limits of our power over nature, and of nature's power over us; to what goal we are tending; are the problems which present themselves anew and with undiminished interest to every man born into the world."

ছান্দোগ্য উপনিষদে শালাবতের পুত্র শিলক নামে ঋষি প্রবাহণ জৈবলিকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

অস্য লোকস্য কা গতিঃ

এই লোকের গতি কি?

আকাশ ইতি হোবাচ; সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যা-কাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যোঃ জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।

প্রবাহণ বলিলেন, আকাশ অর্থাৎ পরমাত্মাই এই পৃথিবী লোকের গতি। সমস্ত স্থাবর, জঙ্গম এই পরমাত্মা হইতেই সমুৎপন্ন হয় এবং এই পরমাত্মাতেই অস্তগমন করে অর্থাৎ লীন হয়। এই পরমাত্মাই ভূতসমূহ হইতে মহান্। অতএব অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই পরমাত্মা সকল ভূতের পরম গতি বা চরম আশ্রয়।

তপোবনের শান্তশীতলচ্ছায়ায় বসিয়া সৌম্যকান্ত ঋষিগণ ধীরে স্বস্থ, সমাহিত চিত্তে চিন্তা করিতেছিলেন "ইহ লোকের গতি কি?" মন্ত্রের আশ্রয়স্থল স্বর, স্বরের আশ্রয় প্রাণ; প্রাণের আশ্রয় অন্ন; অন্নের আশ্রয় জল, কেন না জল নহিলে অন্ন উৎপন্ন হয় না; জলের আশ্রয় স্বর্গ; কেন না স্বর্গ হইতে বৃষ্টি পতিত হয়; স্বর্গের আশ্রয় পৃথিবী এবং পৃথিবীর আশ্রয় আকাশ। আকাশ অর্থে ভূতাকাশ বা নভোমণ্ডল নহে, পরমাত্মা। পরমাত্মা হইতেই সমস্ত উৎপত্তি লাভ করিয়াছে; পরমাত্মাই সমস্তভূতের আশ্রয়। এই পরমাত্মাকে জানিলে জীবন ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীর ইহা ভিন্ন আর গতি নাই।

অভিব্যক্তির ধারা এই পরমাত্মায় আসিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছে। ইতিহাসের মধ্য দিয়া মানবীয় দর্শন পরিপূর্ণতা লাভ করিতেছে। সমস্ত জগৎ, সমস্ত জড় ও জীব পরমাত্মার বিকাশে পরিণতি লাভ করে। দেহের উপাদান জড়; মনের পাত্র দেহ; প্রাণের আশ্রয় অন্ন; মনও অন্নময়, অন্নময়ং হি মনঃ; মনের আশ্রয় আত্মা; আত্মার চরম আশ্রয় পরমাত্মা। অভিব্যক্তির উদ্দেশ্য পরমাত্মায় পর্য্যবসিত হয়, ইহাই প্রাচীন ঋষিদিগের অভিমত।

অগ্নি-সংস্কার

[ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি এল্]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সন্তোষের কয়েকটা বন্ধু একদিন তাহাকে সম্বর্দ্ধনার জন্য একটা পার্টি দিল। এরা সন্তোষের সাবেক বন্ধু, তাহার ছাত্র জীবনের সঙ্গী। সন্তোষের অদৃষ্টক্রমে সে এখন যে দলে আসিয়া পড়িয়াছে, এ সব বন্ধু সে দলের নয়। ইহাদের মধ্যে কেউ উকীল, কেউ কেরাণী, কেউ মাষ্টার, কেউ প্রফেসার, কেউ বা জমীদার; কিন্তু সকলেই বাঙ্গালী অর্থাৎ বিলাতফেরত সমাজেরও নয়, সে সমাজের সঙ্গে বড় সম্পর্কও নাই। আর তাহারা সকলেই এখনো জীবন-সংগ্রামের প্রথম ধাপে, এখনো সন্তোষের মত কেউ মাথা ঝাড়া দিয়া ওঠে নাই।

সন্তোষের এ দিনটা বড় আনন্দে কাটিল। সে বন্ধুদের সঙ্গে অনেক দিনের পর প্রাণ খুলিয়া একটু আনন্দ করিবার অবসর পাইল। যে সমাজের ভিতর সে পড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বড় একটা জুটে নাই, আর বেশীর ভাগ লোকের উপর তো তার বিশেষ শ্রদ্ধাই ছিল না। কাজেই প্রাণ-খোলা আনন্দ সে সমাজে সে পাইত না। তা' ছাড়া, সে সমাজের সবার ভিতর এবং সকল জিনিসেরই মধ্যে সন্তোষ এমন একটা অস্বাভাবিক ভাব দেখিতে পাইত, এমনি একটা আড়ষ্ট-গোছের চলন-চালন, কথাবার্ত্তা দেখিত যে, তাহার মনে হইত ঠিক যেন সবাই মুখোস পরিয়া ষ্টিল্টে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাই তাহার বড় বাধ বাধ ঠেকিত, সেও মুখোস পরিয়া ষ্টিল্টে চড়িয়া থাকিত। কিন্তু এখানে আজ তার অনেক দিন পরে মনে হইল যেন সে মাটীতে পা ফেলিয়া মানুষের সঙ্গে ঘোরা ফেরা করিতেছে;—তাহার মুখোস পরিবার যেন আর কোনও দরকার নাই।

খুব উৎফুল্ল হৃদয়ে সে বাড়ী ফিরিল; খুব আনন্দের সঙ্গে শিষ্ কাটিতে-কাটিতে ঘরে ঢুকিল। তখন বেশ রাত্রি হইয়াছে। ইলা ড্রইং-রুমে তার রাইটিং-টেবিলের কাছে বসিয়া কি যেন লিখিতেছে। সন্তোষ এক রকম নাচিতে-নাচিতে আসিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া ফেলিল। স্বামীর অনেক দিন পরে এমনি হাসিমুখ দেখিয়া ইলাও হাসিল, তার যেন হাসির একটা ছোঁয়াচ্ লাগিয়া গেল। খানিকক্ষণ হাসি-তামাসা রঙ্গরস হইলে ইলা কপট ক্রোধভরে তার বড়-বড় ডগ্‌ডগে চোখ দুটা ঘুরাইয়া বলিল, "যাও, তুমি বড় কাজ নষ্ট ক'রতে পার! আমি যে ভারি ব্যস্ত আছি দেখছো না!"

"তাই না কি! তবে মাথার উপর একটা লেবেল মেরে রাখনি কেন 'ব্যস্ত'। আমরা আফিসে কারখানায় কাজ করি; সেখানে সব জিনিসে লেবেল মারা থাকে; তা না হ'লে আমরা কিছু বুঝি না। যাক্, কাগজখানা কি জানতে পাবি কি?"

ইলা বলিল, "না জেনে আর এখন উপায় কি। আমি কিন্তু ভেবেছিলাম যে, এটা একেবারে শেষ না ক'রে তোমাকে জানাব না। তোমাকে surprise করবো।"

"তাই না কি? আচ্ছা, আমি দেখবো না! কিন্তু আমি guess করি। আচ্ছা, এই আমার আজকের party থেকে এটা তোমার মনে হ'য়েছে? না?"

ইলা স্বীকার করিল।

তা'র পর সন্তোষ অনেকক্ষণ ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে-ভাবিতে তা'র চক্ষু বারবার ইলার হাতে-চাপা কাগজখানির উপর পড়িতে লাগিল এবং একবার সে একটু লেখা দেখিতে পাইল;—তা'র পর যেন কিছু দেখে নাই, এইরূপ ভাবে সে বলিল, "ইচ্ছা, একটা পার্টি দেবার প্রস্তাব হ'চ্ছে, Mrs Mukherjee at Home—না?"

ইলা হাসিয়া তাহার হাতের কাগজখানা খুলিয়া দেখাইল,—সেখানা একখানা নিমন্ত্রণের কার্ডের খসড়া। তাহার বন্ধুদিগকে বাড়ীতে আনিয়া সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ইলার এই আগ্রহ দেখিয়া সন্তোষ ভারি খুসী হইল। সে বলিল, "খুব ভাল কথা, কিন্তু দেখ, এসব at Home-

টোমে ওরা বড় আমোদ পাবে না, আমার মতে এটা একটা পূরাপূরি ডিনার করাই উচিত।"

ইলা এতটা করিতে ভরসা করে নাই; তাহার স্বামী যে তাহার প্রস্তাব মোটে পছন্দ করিবেন কি না, সে সম্বন্ধেও তাহার একেবারে সন্দেহ ছিল না এমন নয়। কাজেই সে খুব আনন্দের সহিত সম্মত হইল।

সতোশ বলিল, "ডিনার দেশীভাবে—একেবারে ঠাই ক'রে খাওয়া, সেই ভাল হ'বে; তা'র পর after-dinner party হবে।"

দেশীভাবে খাওয়াইতে ইলার কোনও আপত্তি ছিল না; কেন না সে নিজে অনেকগুলি দেশী রান্নার বিশেষ পক্ষপাতী ছিল। ঠাই করিয়া খাওয়াইতেও তাহার অন্য কোনও আপত্তি ছিল না, কিন্তু টেবিলে বসিয়া খানা খাইলে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু মজলিশ করা যায়, ঠাই করিয়া খাইলে তেমনটি হয় না বলিয়া ইলার মন সরিতেছিল না। সে একটু মৃদু আপত্তি করিল। সতোশ সব আপত্তি ভাসাইয়া দিল। সে সত্যসত্যই উৎসাহিত হইয়া উঠিলে তাহার ... সামনে কেহ কখনও দাঁড়াইতে পারিত না। ইলার ...র আপত্তি খণ্ডন করিয়া ইলার সম্মতি আদায় করিবার পর শেষে সতোশ বলিল "তা' ছাড়া, ওদের মধ্যে অনেক হয় তো কাঁটা চামচে ব্যবহার ক'রতেই জানে না।"

ইলা প্রথমে কথাটা বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিতেছিল, তা'র বিলাত ফেরত বন্ধুদের কথা; আর সতোশ ভাবিতেছিল তা'র দেশী বন্ধুদের কথা। তাই ইলা না বুঝিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সতোশের মুখের দিকে ফিরাইল; পর মুহূর্ত্তে সে বুঝিয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল, "হাঁ তা বটে।" সে যে একটু অপ্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহার বিরত ভাবটা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে, সতোশ তাহা দেখিতে পাইল। চট্ করিয়া তাহারও সত্য কথাটা তৎক্ষণে খেয়াল হইল। সে ধরিয়া লইয়াছিল যে, ইলা তাহার দেশী বন্ধুদের পার্টির রিটার্ণ দিবার জন্য ব্যস্ত। সেটা যে সম্পূর্ণ ভুল এবং ইলা যে তাহাদের কথা মোটেই ভাবে নাই, এই মুহূর্ত্তে তাহার সে সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। ইলার প্রতি প্রীতির যে উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছিল, তাহা এখন প্রায় বিরাগে পরিণত হইল। সে যথাসম্ভব মনোভাব গোপন করিয়া বলিল, "নিমন্ত্রিতদের লিষ্ট ক'রেছ ?"

ইলা একটু স্পষ্ট ভাবেই লাল হইয়া উঠিল। সে মিথ্যা কথা বলিতে পারিত না, বলিতে গেলে মিথ্যাটা খুব স্পষ্ট-ভাবেই ধরা পড়িত। সে আমতা-আমতা করিয়া বলিল, "হাঁ কতক কতক নাম লিখেছি," বলিয়া ডেস্কের এক পাশে রাখা একখানা কাগজের দিকে সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় হাত বাড়াইল। সতোশ চট্ করিয়া সেই কাগজখানা তুলিয়া লইয়া দেখিল। তাহাতে ইলা তাহার সুন্দর মুক্তার মত হরপে খুব পরিচ্ছন্ন করিয়া একটি লিষ্ট প্রস্তুত করিয়াছে। লিষ্টের শেষে সে বেশ একটু কারিগরি করিয়া দাগ টানিয়া দিয়াছে—স্পষ্টই বুঝা যায় যে তার মতে এই লিষ্ট সম্পূর্ণ হইয়াছে। সতোশ দেখিল যে, তাহার বাড়ীতে যে সকল বিলাতী বন্ধুর যাতায়াত আছে, তাহার কারখানায় এবং আফিসে মার্কিন ও বাঙ্গালী যত বড় কর্ম্মচারী আছে, তাহাদের কেহ বাদ যায় নাই; কিন্তু গোড়ায়, মধ্যে বা শেষে কোথাও তাহার দেশী বন্ধুদের নাম নাই। অথচ ইলা নিজে স্বীকার করিয়াছে যে, আজকার পার্টীর কথায়ই তাহার একটা পার্টীর কল্পনা হইয়াছিল। তাহার পরিচিত বন্ধুদের সম্বন্ধে ইলার এই তাচ্ছিল্য সতোশের বুকে আঘাত করিল। সে কিছু প্রকাশ করিল না, শুধু বলিল "তা' বেশ, এ তো সম্পূর্ণই হ'য়েছে।"

সতোশের হাসি ও উৎসাহ মিলাইয়া গিয়াছিল। ইলা বুঝিয়াছিল, কিসের জন্য। সে একটু লজ্জিত ও একটু শঙ্কিত হইয়া বলিল, "না, এটা সম্পূর্ণ নয়, তোমার আজকের পার্টীর বন্ধুদের নামের লিষ্টটা তুমি ক'রে দেবে ব'লে রেখে দিয়েছি।"

সতোশ এ বঞ্চনায় বঞ্চিত হইল না। সে বলিল, "না, এ দলে তা'রা ঠিক মিশ খাবে না, এরা এমনি থাক।"

ইলার বুক কাঁপিয়া উঠিল, সে হাসির অভিনয় করিয়া বলিল, "বাঃ, তা'দের পার্টীর রিটার্ণের জন্যেই পার্টী, আর তাদেরই বাদ দেবে ?"

সতোশ এই ব্যর্থ বঞ্চনার চেষ্টায় একটু হাসিল, কিন্তু ইহা লইয়া আর গোলোযোগ করা সঙ্গত মনে করিল না। "আচ্ছা কাল সকালে দেব" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় ছাড়িতে গেল।

কাজেকাজেই সতোশের বিরাট পার্টীতে তাহার নিরেট বাঙ্গালী বন্ধুদেরও নিমন্ত্রণ হইল। কিন্তু নিমন্ত্রণের রাত্রি

শেষ হইবার পূর্ব্বেই সত্যেশ হাড়ে হাড়ে বুঝিল যে, ইহাদের নিমন্ত্রণ না হইলেই ছিল ভাল।

সেদিন রাত্রি ৮টার সময় হইতে দলে দলে নিমন্ত্রিতেরা আসিতে লাগিল। লীলা, ইলা ও সত্যেশ তাহাদিগকে গাড়ী-বারান্দা হইতে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইতে লাগিল। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী ক্লাব হইতে তাঁহার একটি পুরাতন এটর্ণি বন্ধুকে লইয়া সর্ব্বাগ্রে পৌঁছিলেন। সত্যেশ তাঁহাদিগকে লইয়া ড্রইং-রুমে বসাইয়া দিল এবং খানিকক্ষণ বসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল।

সত্যেশ বসিয়া গল্প করিতে-করিতে ইলাদের কয়েকজন ছোকরা বন্ধু ও মহিলা আসিলে ইলা ও লীলা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। তাহারা সিঁড়িতে পা দেওয়ার পর হইতেই একটা হাসির ফোয়ারা ছুটিয়া গেল, ইলা ও লীলা এই বন্ধুদের সঙ্গে একেবারে হাসি তামাসা ও গল্পে যেন ডুবিয়া গেল। ইহারা সিঁড়ির মাথায়ই দাঁড়াইয়া রহিল, ড্রইং-রুমের ভিতর গিয়া বসিল না। তাহাতে অভ্যর্থনা ব্যাপারটা খুব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সহায়তা হইল না। দেখিয়া সত্যেশ উঠিয়া একবার সিঁড়ির কাছে গেল, ইচ্ছা ইহাদিগকে আনিয়া ঘরের ভিতর বসায়। সত্যেশ যখন দরজার কাছে, ঠিক তখনি বুড়ো ব্যানার্জ্জী প্রমুখ একদল ছোকরা আসিয়া জুটিল। ইলা অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেই ব্যানার্জ্জী বলিলেন, "I say, you look charming! ওহে সত্যেশ, তুমি কাজটা ভাল করছো না। তুমি যদি ইলাকে haremএ না রাখ, তা' হ'লে শীঘ্র একটা কাণ্ড কারখানা হ'য়ে যাবে।" ইলা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল; তাহার মুখখানা একটা টকটকে গোলাপের মত লাল হইয়া উঠিল।

সত্যেশ কিছু না বলিয়া হাস্যমুখে তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে ঘরে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। [illegible] কার্য্য সহজ হইল না। দলের প্রত্যেকে [illegible]তে ঘোরা ফেরা করি[illegible]কসঙ্গে, ইলা ও লীলার সঙ্গে অনেকক্ষণ [illegible]ার কোনও দরকার না[illegible]এই অভ্যর্থনা-লীলার একটা অত্যজ্ঞা খুব উৎফুল্ল হৃদয়ে সে ব[illegible] করিল। ফলে সেই অল্প-[illegible]য় কাটিতে-কাটিতে ঘরে একটা ভিড় অনেকক্ষণ জমিয়া হইয়াছে। ইলা ড্রইং-রুমে [illegible]ইলা ও লীলাকে ঘিরিয়া চক্রবৎ [illegible]ণ পর ব্যানার্জ্জী বলিলেন,

"ওহে সত্যেশ, তোমাকে public nuisance করার জন্য prosecute ক'রতে হয়।"

সত্যেশ বলিল "অপরাধ?"

ব্যানার্জ্জী। এই দেখছো না, পাব্লিকের গমনা-গমনের রাস্তা এমন ক'রে বন্ধ ক'রেছ।

সত্যেশ। মন্দ নয়, আপনারা করেন nuisance, আর আমায় ক'রবেন prosecute, এ আপনার কোন্ আইনে বলে?

ব্যানার্জ্জী। বলে হে বলে, ধারাটা আমার এখন ঠিক মনে হ'চ্ছে না; কিন্তু সে ধারায় তোমাকে প্রসিকিউট্ করা চলে। আমি যখন প্র্যাক্‌টিস ক'রতাম, তখন একটা ঢুলিকে ধ'রে কোথাকার এক হাকিম জেলে পূরেছিল। আমি তা'র মোশন করি হাইকোর্টে। জজ সাহেবদের বিচারে দাঁড়াল এই যে, আমার মক্কেল নিজে যে খুব দোষী তা' নয়, তবে সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঢেঁটরা দিচ্ছিল, এবং তা'তে চার-দিককার লোকজন তা'কে ঘিরে রাস্তা বন্ধ ক'রেছিল—সেইজন্য তা'র শাস্তি বহাল রইল। আর এমন তো আকছার হ'চ্ছে। তুমি যদি পথের মধ্যে বাঁদর নাচান আরম্ভ ক'রে দাও, আর তা'তে যদি লোক জুটে রাস্তায় চলাচল বন্ধ করে, তবে তোমাকে prosecute ক'রবে না? ভাল চাও তো তোমার ওই ছুঁড়ীটাকে সরাও, নইলে এ ছোকরাগুলো এখান থেকে নড়বে না।

ইলা এ কথায় বড় লজ্জিত হইল; ছোকরাদের মধ্যে হাসির গর্‌রা পড়িয়া গেল; কিন্তু ভিড় ক্রমশঃ ঘরের দিকে যাইতে আরম্ভ করিল; লীলা তাহাদের লইয়া ঘরে ঢুকিল।

তখন তিন গাড়ী বোঝাই করিয়া দল বাঁধিয়া সত্যেশের দেশী বন্ধুরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সকলে ফটকের বাহিরে নামিয়া গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া একজোট হইয়া ম্যাসিডোনিয়ান ফ্যালাংসের মত একসঙ্গে আসিয়া সিঁড়ির উপর উপস্থিত হইল। সত্যেশ অর্দ্ধেক সিঁড়ি নামিয়া গিয়া তাহাদের অভিবাদন করিল; তা'র পর একে-একে সকলকে ইলার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিল। ইলা সকলের সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল; বন্ধুরাও সব অত্যন্ত লজ্জিত, আড়ষ্টভাবে কোনও মতে এই অনভ্যস্ত নারী-সম্ভাষণ ব্যাপার সমাধা করিয়া সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইল। দেখিয়া সত্যেশ তাহাদিগকে ঘরের ভিতর

লইয়া বসাইল। তাহারা সবাই খুব ঠেসাঠেসি করিয়া ঘরের এক কোণ জুড়িয়া বসিল। সত্যোশের বিলাতী বাবুদের মধ্যে কেহ এই দলের সঙ্গে শিষ্টালাপ করিতে অগ্রসর হইলেন না দেখিয়া সত্যেশ নিজেই তাহাদের মধ্যে বসিয়া তাহাদিগের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু বাবুরা কেহই বড় স্বস্তি বোধ করিতেছিল না। তাহাদের কথার উৎস যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যে সব চেয়ে রসিক, যে তাহাদিগকে আট-দশ ঘণ্টা সমানে হাসির ফোয়ারায় স্নান করাইতে পারিত, সেও সম্পূর্ণ স্তব্ধ ও নীরব হইয়া রহিল; মৃদুস্বরে দু' একটা পরিহাসের চেষ্টা করিয়া দেখিল সুবিধা হইতেছে না। হাস্যরসের ধারা আপনি যদি বন্ধ হয়, তবে চেষ্টা করিয়া তাহার সৃষ্টি অসম্ভব। তাই সে চুপ করিয়া গেল।

সত্যোশের এই বাবুদের হংসমধ্যে বকের মত বোধ হইতেছিল। তাহারা অনুভব করিতেছিল যে, এই যে সমাজের ভিতর তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে, ইহার ভিতর যেন তা'রা অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছে; আবও, এই সমাজের লোক যাহারা, তাহারাও যে সেই রকমই মনে করিতেছিল, তাহা, তাহারা কোনও কথা না বলিলেও, তাহারা সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতেছিল। সত্যোশ সাধ্য-মত তাহাদের এই ভাব দূর করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সেও তাহাদের এই অস্বস্তিটা বেশ অনুভব করিতেছিল বলিয়াই তাহার কথা-বার্ত্তাও খুব জমিয়া উঠিতে পারিল না। তা'র পর যখন দরজার দিকে চাহিয়া সে দেখিল যে, ইলা, লীলা ও তাহাদের কয়েকটি যুবক বন্ধু তাহাদের দিকেই চাহিয়া বেশ স্পষ্টভাবেই হাসা-হাসি করিতেছে, তখন লজ্জায়, বিরক্তিতে তাহার মনের স্থিতিস্থাপকতা একেবারে ওলট-পালট হইয়া গেল। সে তাহার বন্ধুদিগের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল: তাহাদের মধ্যেও অনেকে তাহা দেখিতেছে। লজ্জায় ঘৃণায় সত্যোশের মুখচোখ লাল হইয়া উঠিল। ইহার পর কথা-বার্ত্তা চালান প্রায় অসম্ভব হইল। সত্যোশ উঠিয়া ইলার কাছে গেল। তখনও তাহাদের কথা-বার্ত্তা চলিতেছে; লীলা বলিতেছে, "ওরা হ'চ্ছে সত্যেশ as he was. তা'র সঙ্গে আমার যেদিন প্রথম আলাপ হয়, সেদিন সেও অমনি জুজুর মতন ঘাড় নীচু ক'রে ব'সে ছিল।" সত্যোশ পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া ইলাকে টানিয়া লইল, তাহার ক্র কুঞ্চিত! সে তাড়াতাড়ি খাওয়ার উদ্যোগ করিয়া সবাইকে খাইবার ঘরে লইয়া গেল।

আহারের পর ড্রইং-রুমে সত্যোশের বন্ধুরা আর বেশী-ক্ষণ অপেক্ষা করিল না; একটা গান হইতেই তাহারা বিদায় হইল, কেন না, তাহাদের ট্রাম ধরিবার ইচ্ছা ছিল। যেমন সঙ্কুচিত-ভাবে তাহারা আসিয়াছিল, তেমনি সঙ্কুচিত-ভাবেই তাহারা বিদায় হইল। ইলাকে প্রথমে তাহারা দূর হইতে সবাই নমস্কার করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক জনের বিলাতী কায়দা কানুন একটু পড়া ছিল, সে অগ্রসর হইয়া ইলার কাছে বিদায় চাহিল; সঙ্গে সঙ্গে আর সকলে অগ্রসর হইয়া আসিয়া যেন তেন-প্রকারেন ঠেলাঠেলি করিয়া বিদায়টা সারিয়া ফেলিল। সত্যোশ তাহাদের সঙ্গে-সঙ্গে ফটক পর্য্যন্ত গিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিল। ফটকে দাঁড়াইয়াও অনেকক্ষণ তাহাদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা হইল।

যখন তাহারা চলিয়া গেল, তখন সত্যোশ ঘরে না ঢুকিয়া বাগানের একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। সে দিন অমাবস্যা; আকাশে তারাগুলি ঝলমল করিতেছে। রাস্তা-গুলি অনেকটা নির্জ্জন হইয়া আসিয়াছে। তার ভিতর গ্যাসের আলোগুলি যেন আকাশের তারার সঙ্গে পাল্লা দিয়াই ঝলমল করিতেছে। গাছগুলি নীরব গাম্ভীর্য্যে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে; কেবল তাহাদের মধ্য দিয়া মাঝে-মাঝে অতি সন্তর্পণে পাতাটি নাড়িয়া একটু মৃদু বায় সামান্য জীবনের সাড়া দিতেছে। সত্যোশ উপরের হট্টগোলের মধ্যে বিরক্তির পাত্র পূর্ণ করিয়া আসিয়া এই নীরব গাম্ভীর্য্যের ক্রোড়ে মুহূর্ত্তের জন্য আশ্রয় লইল। তাহার মনের ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল; ইলার উপর রাগ হইতেছিল; তার আত্মীয়দিগকে সে অভিশাপ দিতেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ এই শান্তভাবের মধ্যে বসিতেই তাহার ক্রোধ বিষাদে পরিণত হইতে লাগিল; তাহার সমস্ত ক্রোধকে আচ্ছন্ন করিয়া একটা ব্যর্থতার বিষাদ তাহার হৃদয়কে পরিপূর্ণ রূপে আবৃত করিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল, সে প্রথম জীবনে একটা প্রকাণ্ড ভুল করিয়া সমস্ত জীবনের সুখ-শান্তি জন্মের মত বিসর্জ্জন করিয়া বসিয়াছে। এই স্ত্রী লইয়া, এই সমাজ লইয়া জীবন তাহার কাছে একটা ব্যর্থ বোঝার ভার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহার জীবনটা একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি, একটা গাধার

বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সুন্দর মাধবী লতাকে সে আনন্দ করিয়া, আশা করিয়া বুকে জড়াইয়া লইয়াছিল, তাহা আজ কালসর্প হইয়া তাহার হৃদয়ের রক্ত বিষে ভরিয়া দিয়াছে। হা অদৃষ্ট! কেন রূপ দেখিয়া মজিয়াছিল সে, কেন সে নিজের সমাজের ভূমি ছাড়িয়া একটা অদ্ভুত দো-আঁসলা সমাজের ভিতর শিকড় গাড়িতে গিয়াছিল!

ভাবিয়া-ভাবিয়া সতোশের মনের ক্ষোভের তীব্রতা শান্ত বিষাদে পর্য্যবসিত হইল। সে ভাবিল, সুখের জন্য তাহার জগতে আসা হয় নাই; দুঃখের বোঝা মাথায় করিয়াই তাহাকে জীবন কাটাইয়া দিতে হইবে, ইহাই ভগবানের ইচ্ছা। এই ভাবিয়া সে মনটাকে শান্ত করিল। তাহার লম্বা-লম্বা চুলের ভিতর দিয়া আঙ্গুলগুলি চালাইয়া দিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার সম্মুখের কেশ আকর্ষণ করিয়া দন্তে অধর দংশন করিয়া সে তাহার জীবনের এই martyrdom আরম্ভ করিল, তার পর অপেক্ষাকৃত শান্তচিত্তে সে ঘরে ঢুকিল। কিন্তু সেখানে যে আনন্দের মেলা চলিতে লাগিল, তাহাতে সে যোগদান করিতে পারিল না। তাহার ভাবান্তর কেহ লক্ষ্য করিল কি না, সে বুঝিতে পারিল না। যখন ক্রমে সভা ভঙ্গ হইল, তখন একে একে সবাই বিদায় গ্রহণ করিল। সতোশের নিকট সবাই সংক্ষেপে বিদায় লইল, কেবল চাটার্জ্জী সাহেব তাহার হাত জোরে চাপিয়া বেশ আবেগের সহিত বিদায় লইতে গিয়া বলিলেন, "তোমার চেহারা ভাল দেখাচ্ছে না, তোমার অসুখ করেছে কি?"

সতোশ "না" বলিয়া একটু হাসিল। চাটার্জ্জী তাহার হাত ধরিয়া খুব জোরে ঝাঁকি দিয়া বলিলেন, "Buck up old boy! মুশড়ে যেও না, বীর হও। সংসার সংগ্রামে বীর হওয়া বড় সোজা কথা নয়।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কথাটা সতোশের কাণে বাজিতে লাগিল, তা'কে বীর হইতে হইবে! সহিবার জন্য, মরিবার জন্য তাহার বীর হইতে হইবে! কিন্তু এ কি অবিচার! আর দশ-জনে কেবল প্রজাপতির মত আনন্দ করিয়া বেড়াইবে, সে কেবল পুড়িয়াই যাইবে, ইহার কি অর্থ আছে?

ক্রমে সকল অতিথি চলিয়া গেল। শেষ অতিথিকে বিদায় দিতে সতোশ বাগানের ফটক পর্য্যন্ত গেল; তার পর বাগানে খানিক পায়চারী করিয়া ফিরিল। তখনও তাহার মুখ মেঘাচ্ছন্ন।

ইলা সমস্ত দিনের পরিশ্রম ও চিন্তার ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া ড্রইং-রুমের একটি সোফায় গা ছাড়িয়া শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার সুগঠিত, নবনীত-কোমল বাহু দুটি হাতা-কাটা জামার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া সমস্ত মুখটাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সে চক্ষু মুদিত করিয়া ইলেকট্রিক পাখার তলে হাওয়া খাইতেছে। যখন সুন্দরী যুবতী তাহার শরীর ও মনের সমস্ত বন্ধন এলাইয়া দিয়া আপনাকে আলস্যের কোড়ে ছাড়িয়া দেয়, তখন সে ছবি বড় সুন্দর হয়। সতোশ বহুদিন এইরূপ ছবি কল্পনা করিয়া আনন্দ বোধ করিয়াছে, ইলার এই মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আজ যেন ইলাকে এইরূপে দেখিয়া তাহার মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল,—এ যেন অলস বিলাসের, হৃদয়শক্তিশূন্য চিত্তের, অন্তঃসারশূন্য মেকী রূপের ফানুস! সতোশ কিছু না বলিয়া তা'র ড্রেসিং-রুমের দিকে চলিল, কিন্তু একটু অগ্রসর হইয়াই থামিল। ভাবিল "নাঃ, আর চলে না।" আজ একবার মন খুলিয়া দুটো কথা না শুনাইলে তাহার অশান্ত মন কিছুতেই বাগ মানিতে চায় না। যাহাকে লইয়া চিরদিন ঘর করিতে হইবে, তা'র সঙ্গে একটা বোঝাপড়া দরকার। এই মনে করিয়া সে একখানি চেয়ার লইয়া ইলার সামনে বসিল। ইলা তাহার হাত দু-খানা সতোশের কোলের উপর রাখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। সে চাহনি অলস বিলাসের নহে, তাহা অন্তঃসারশূন্য লঘু হৃদয়ের নহে; তাহা করুণায় ভরা, নির্ভরশীল স্নেহে পরিপূর্ণ। এই চাহনিতে সতোশের প্রস্তাবিত কথাগুলো ওলোট-পালোট হইয়া গেল। খানিক-ক্ষণ সে কিছু বলিতে পারিল না। যে সকল কথা তাহার মনে আসিতে লাগিল, সেগুলি অত্যন্ত চড়া চড়া; কিন্তু এখন আর ইলাকে আঘাত করিতে তা'র মন সরিতেছিল না। কথাগুলি একটু মোলায়েম করিয়া বলিবার ইচ্ছায় সে মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতে লাগিল।

ইলাও কিছু বলিতে পারিল না। তারও মনের ভিতর একটা অপ্রিয় কথা উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল; সেও সে কথাটা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল। আজ ইলার ব্যবহার সতোশের চক্ষে যেমন বিসদৃশ ঠেকিয়াছে, সতোশের ব্যব-

হারও ইলার বন্ধুদের কাছে ঠিক সেইরকম বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল ;—কাজেই ইলার কাছেও কতকটা অন্যায় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। সতোশ তার দেশী বন্ধুদিগকে খুশী রাখিতে যাইয়া তাহার বিলাতী বন্ধুদিগের দিকে একেবারে নজর দেয় নাই। সেজন্য লীলা ও তাহার বন্ধুরা বেশ একটু রাগ করিয়াছে এবং সতোশকে যেটা বলিয়াছে, তাহা ইলা শুনিয়াছে। সতোশের অসামাজিকতাকে ঢাকিয়া তা'কে সমাজে চালাইয়া লওয়া ইলার জীবনের একটা প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল। স্বামীর সকল দোষ-ত্রুটি যথাসম্ভব লুকাইয়া এবং নিজের সৌজন্যের আতিশয্যে সকলকে খুশী করিয়া সমাজে স্বামীর প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিত। কিন্তু সতোশ আজ যে রকম রূঢ়ভাবে সকলকে যেন বিশেষভাবে দেখাইবার জন্যই তাহার অসামাজিকতার প্রচার করিয়াছে, তাহাতে ইলার সকল চেষ্টাই বৃথা হইয়াছে, তাহা সে বুঝিল। সতোশ যদি এমন করিয়া সকলকে ঘা' দেয়, তবে ইলা কেমন করিয়া বঙ্গ-সমাজে তাহাকে প্রিয় করিবে। তাই আজ ইলা স্বামীকে এই কথাটা বলিতে চাহিতেছিল। কিন্তু অপ্রিয় কথা বলা তাহার কোষ্ঠীতে লেখে নাই; সে কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, কি রকম করিয়া কথাটা পাড়া যায়।

দুইজনেরই মনের ভিতর এই অবস্থা, কাজেই কেউ একটা বাজে কথাও বলিয়া উঠিতে পারিল না। অনেকক্ষণ ঐরূপ নীরব অভিনয়ের পর ইলার মনে হইল যে, চুপ করিয়া থাকাটা ভাল দেখায় না। কিন্তু কি বলিবে তাও তাই খুঁজিয়া পাইল না। যতই ভাবিল, ততই এই নীরবতার অশোভনতা তাহার কাছে বেশী অন্যায় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাই সে শেষে ধপ্ করিয়া বলিয়া ফেলল, "দিদি আজ তোমাকে বড়—এই—এই ঠাট্টা ক'রছিল।" "নিন্দা ক'রছিল"—কথাটা তাহার জিভের গোড়ায় আসিয়াছিল, সে শেষ মুহূর্ত্তে তাহা সম্বরণ করিল।

গরম তেলে বেগুন পড়িল। লীলার নামেই সতোশ জ্বলিয়া উঠিত, আজ তো উঠিবেই। ইলা স্বামীর আঘাত বাঁচাইবার চেষ্টায় কথা খুঁজিয়া-খুঁজিয়া অবশেষে যে কথাটী বলিল, তাহাতে তার হৃদয়ের ভিতর যে ঘা, তাহাতে কঠোর আঘাত করিল। সতোশ তাহার উদ্গত ক্রোধ কষ্টে চাপিয়া বলিল, "অপরাধ?"

কথাটা বলিয়াই ইলার মনে হইতেছিল যে, আজ কথাটা না তুলিলেই ছিল ভাল। কিন্তু যখন উঠিয়া পড়িয়াছে, তখন আর না বলিয়া তাহার উপায় রহিল না। সতোশ যে আজ তার বিলাতী বন্ধুদের রীতিমত অবহেলা করিয়াছে, সেইজন্য লীলা রাগ করিয়াছে, এ কথা তাহার স্বীকার করিতে হইল।

সতোশের বুকের ভিতর ঝড় বহিতে লাগিল। এক রাশ খুব চোখা চোখা কথা তাহার বুক ঠেলিয়া এক-সঙ্গে বাহির হইবার জন্য মনের ভিতর হুড়াহুড়ি করিতে লাগিল। সতোশ বলিল, "আমি তোমার বন্ধুদের অবহেলা ক'রেছি—কিন্তু তুমি কি ক'রেছ ভেবে দেখেছ কি?"

কথার সুরে ইলার সন্দেহ করিবার কোনও কারণ রহিল না যে, ইহা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের প্রথম উচ্ছ্বাস মাত্র। সে তাহার বিষাদপূর্ণ চক্ষু দুটি সতোশের মুখের উপর রাখিয়া শঙ্কিত চিত্তে অগ্নিবর্ষণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সতোশের রক্ত মাথায় উঠিয়া গিয়াছিল। সে বলিয়া গেল, "তুমি আর তোমার বন্ধুরা, বিশেষ তুমি, যে ব্যবহার ক'রেছ, বিলাত হ'লে লোকে এর জন্য তোমার গায়ে থুথু দিত। আমার বন্ধুদের সেধে পড়ে নেমন্তন্ন ক'রে এনে অপমান ক'রবার তোমার কি দরকার ছিল? কি অধিকার ছিল তোমার তাদের অপমান ক'রবার? তুমি তা'দের নগণ্য বলে' অগ্রাহ্য তো করেইছো, আর তা'র পর তাদের সঙ্গে অশিষ্টতার এক শেষ ক'রছো।"

সতোশ থামিল। ইলার হাতখানা সতোশের কোল হইতে পড়িয়া গেল। ইলা আড়ষ্ট জড়ের মত কেবল স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একবার শুধু বলিল, "আমি কি ক'রেছি?"

"কি ক'রেছ? হায় রে! এমনি তোমার শিক্ষা সংসর্গ যে, তোমাকে এ কথাও বুঝিয়ে দিতে হয়! তোমরা কয়জন যে তফাৎ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখে-দেখে ফিস ফিস ক'রছিলে, আর হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছিলে, সেটা কোন্ দেশী ভব্যতা? কোথাকার এ শিষ্টাচার? তুমি তা'দের hostess, তারা তোমারই নিমন্ত্রিত,—আর

তুমি স্বচ্ছন্দে, তা'দের চোখের উপর দাঁড়িয়ে, লজ্জার মাথা খেয়ে, এমনি ক'রে তাদের নিয়ে তামাসা ক'রতে পারলে? একটু কি লজ্জা হ'ল না?"

ইলা কথা কহিল না, মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। সে বলিল না যে, অপরাধ তাহার নহে, তাহার দিদির। সে বরঞ্চ স্বামীর বন্ধুদের পক্ষেই দু'চারটা কথা বলিয়াছিল। কিন্তু তা'র দিদি এবং মিষ্টার বোস এমন ভয়ানক হাসির কথা সব বলিতেছিলেন যে, সে একটু না হাসিয়া পারে নাই। সে জন্য সে তখনই অনুতপ্ত হইয়াছে। এ সব সে বলিতে পারিত, কিন্তু বলিল না।

সন্তোষ বলিয়া গেল, "আর কেবল তোমার অতিথিদের নয়, তোমার স্বামীর পর্য্যন্ত নিন্দা হ'চ্ছিল, আর সেই নিন্দায় তুমি অবাধে হেসে এই বন্ধুদের উৎসাহ বৰ্দ্ধন ক'রছিলে। ভদ্রতা, শিষ্টতা তো শেখই নি, আমার প্রতি একটু শ্রদ্ধাও কি তোমার নেই, যাতে ক'রে তুমি আমার নিন্দা শুনতে কষ্ট পেতে পার?

"আর, তা'দের অপরাধটা কি, যে, তাদের তুমি এমন অপমান ক'রলে? কি না, তারা তোমাদের মত রং করা পুতুল নয়, তোমাদের মত টকটক করে পাখনা উড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় না, পটপট ক'রে অন্তঃসারশূন্য কথা কয় না। কিন্তু জান কি, যাদের চোখ আছে, তারা কি মনে করে? তোমাদের এ-যবনামী ভড়ংও তাদের চোখে ধুলো লাগে না। তাদের কাছে তোমরা কেবল রং করা খেলার পুতুল। আর ওরা মানুষ। ওদের একটা প্রাণ আছে, মনুষ্যত্ব আছে! ওরা মানুষ! এই বাঙ্গালা দেশের মানুষ,—ওরাই বাঙ্গালী। আর নকলনবীশ মেকি ফিরিঙ্গি তোমরা;—তোমরা এ দেশের কেউ নও, কোনও দেশেরই কেউ নও। তোমরা মাথা উঁচু ক'রে ফেরো, আর যে তোমাদের মত নয়, তাকে ঘৃণা কর,—এমনি তোমাদের অহঙ্কার! কিন্তু যদি চোখ থাকতো, তবে দেখতে পেতে যে, ঘৃণার পাত্র, দয়ার পাত্র যদি কেউ থাকে, সে তোমরা—তোমাদের ঐ চাঁচা-ছোলা কথা, আর পালিস-করা চাল-চলনের ভিতর তোমাদের যত দৈন্য, এত দৈন্য বুঝি কোথাও নাই।"

ইলা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল,—কোনও কথা কহিল না। সন্তোষের মাথায় খুন চাপিয়া গিয়াছিল; সে থামিল না। সে বলিল, "তুমি বুদ্ধিশূন্য, হৃদয়শূন্য! ফ্যাসানের দাসী! তুমি দিন দিন তিল তিল ক'রে আমার মনের ভিতর যে তুষানল জ্বেলে আসছো, আজ কেবল তাতে পূর্ণাহুতি দিয়েছ?" বলিয়া সে খুব চোখা চোখা ভাষায় ইলার সমস্ত দোষ খুঁটিনাটি করিয়া বর্ণনা করিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের কন্দরে-কন্দরে যত লুকান বেদনা ছিল, সব সে ইলার ঘাড়ে ঝাড়িয়া ফেলিল। ইলা আড়ষ্ট হইয়া শুনিল। সমস্ত কথা শেষ করিয়া সে বলিল, "মূর্খ আমি, তাই তোমার হাতে ধরা প'ড়েছিলাম। রূপকথায় শুনেছি যে, রাজারা ডাইনী-রাক্ষসী বিয়ে ক'রতেন, আমি এখন হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছি যে, আমি ঠিক তাই ক'রেছি—এতদিনে তোমার ভিতরকার খাঁটি মূর্ত্তিটা বেরিয়েছে।" বলিয়া সে উঠিয়া বেগে তাহার ড্রেসিং-রুমে প্রবেশ করিল।

ইলা সেইখানে পড়িয়া রহিল,—কেবল কুশনের ভিতর মুখ চাপিয়া পড়িয়া রহিল। আয়া আসিয়া ডাকিল; ইলা মুখ না তুলিয়াই বলিল, "তুম যাও, হম আপনে যায়েঙ্গে।" আয়া বেয়ারা সব কাজ-কর্ম্ম সারিয়া চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ

[শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ি, বি-এ]

গান্তরকারী জার্ম্মাণ দার্শনিক হেগেল যেমন একদিন লিয়াছিলেন যে, জানা ও অজানা এই দুইয়ের সম্মিলনে ম্পূর্ণ জ্ঞান, স্থিতি ও অস্থিতি এই দুইয়ের মিলনে পূর্ণ- স্তিত্ব, জড়জগৎ ও আত্মা এই দুইয়ের পূর্ণবিকাশ ব্রহ্মে ;— ইরূপ রামপ্রসাদও জগজ্জনকে শিখাইয়াছিলেন যে, সুখ দুঃখ, আশা ও নিরাশা, জীবন ও মরণ, আলোক ও ন্ধকার এ সকলের সঙ্গমস্থল এক,—যাহা সুখ ও দুঃখ, াশা ও নিরাশা, জীবন ও মরণ, আলোক ও অন্ধকার ইতে ভিন্ন অথচ এক। পারিধি হইতে সকল ব্যাসার্দ্ধ ন্দ্রে গিয়া সম্মিলিত হয়। কেন্দ্রসকল ব্যাসার্দ্ধের মস্থল, অথচ কেন্দ্র ব্যাসার্দ্ধ নহে। শাক্তচূড়ামণি মপ্রসাদ দিব্য চক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, জগতের সকল ক্তির কেন্দ্রস্থল এক মহাশক্তি - জগজ্জননী আদ্যাশক্তি। ীভূত অনন্ত তেজোময়ী সনাতনী আদ্যাশক্তি হইতে গতের সকল শক্তি রশ্মির মত শত ধারায় পরিস্ফুরিত তেছে। রামপ্রসাদ তেজোবহুত্বের মাঝে চির একত্বের ান পাইয়াছিলেন ; শক্তি-বিভিন্নতা-মাঝে সাম্যের দিব্য াম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সত্যের দুই দিক খিতেন এবং এই দুইয়ের ; মিলনস্থল কোথায়, তাহাও খিতেন। তাই রামপ্রসাদ গাহিতেন,

"অশুচি শুচিকে লয়ে দিব্য ঘরে শুয়ে রবি,
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে তখন শ্যামা মাকে পাবি।"

। কি ঠিক হেগেলের কথা নহে? তিনি বলিয়াছেন, ানে thesis, সেখানে তাহার antithesis আছেই আছে; র এতদুভয়ের যেটী synthesis সেটী higher truth ; ৎ যেখানে একটী নির্দ্দিষ্ট ভাবের বিকাশ দেখিতে য়া যায়, সেখানে সেই ভাবের বিরোধভাব আছেই ছ ; আর এই দুই ভাবের যেটী সমবায়, সেটী এতদুভয় ক্ষা "উচ্চ সত্য।" রামপ্রসাদ ঠিক যেন এই সত্যের রূপ স্বরূপ বলিতেছেন যে, যেখানে শুচি, সেখানে অশুচি ই আছে। আর এই শুচি অশুচি দুটী সতীন। দুই সতীনের পরস্পরের প্রতি যেমন বিরোধ ভাব, এই দুইয়ের মধ্যেও ঠিক তেমন। কিন্তু এই দুইয়ের মিলন কোথায়? এই দুইয়ের মিলন শ্যামা মার চিরশান্তি- নিকেতনে। ইহাদের মিলন কখন দেখা যায়? মানব! তুমি ইহাদের মিলন দেখিবে তখন, যখন তুমি শুচি এবং অশুচির মধ্য দিয়া গিয়া, তাহাদের পরপারে মহাসত্যের উচ্চ অধিত্যকায় উঠিয়া দাঁড়াইবে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ জীবনের শত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও বিষাদ পরস্পরের সহিত চিরবন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ। যেখানে সুখ সেখানে দুঃখ, যেখানে হর্ষ সেখানে বিষাদ। ভিত্তি ছাড়া যেমন প্রাসাদ দাঁড়াইতে পারে না, দুঃখ ছাড়া সুখও ঠিক তেমনি দাঁড়াইতে পারে না। দুঃখ সুখের হাত ধরিয়া চিরদিনই আসিয়া থাকে। কোকিল যেমন বসন্তের দূত, দুঃখও তেমনি সুখের দূত। কোকিল দেখিতে কাল, কিন্তু তাহার গান মধুর ; এবং সে গানে সে বলিয়া দেয় যে, ঋতুরাজ বসন্ত ফুল্লফুলরাশি ও সুখস্পর্শ সমীর লইয়া কুঞ্জকাননের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে,—উৎসবের আর বেশী দেরী নাই। দুঃখও ঠিক সেইরূপ কদাকার ; কিন্তু যে অভিজ্ঞতাটুকু সে দেয়, তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, সুখ হাসি, হর্ষ ও নৃত্য লইয়া কুটীরের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে,—উৎসবের আর বেশী দেরী নাই। অভিজ্ঞতার এ মধুর আশ্বাস রামপ্রসাদ সতর্ক-শ্রবণে শুনিয়াছিলেন ; তাই তিনি গাহিতেন —

"আমি কি দুখেরে ডরাই?
সুখ পেয়ে লোকে গর্ব্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই।"

তিনি দুঃখের বড়াই করিতেন। দুঃখের ললাটে যে বিধি- লিখন লেখা আছে, তাহা তিনি সম্যক্ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, দুঃখের সহিত আলাপ করিতে পারিলে সুখের অঙ্কে বসিতে পাইবেন। কারণ, সুখ দুঃখ দুই

ভাই। যাহারা হর্ষে অঙ্গোৎফুল্ল হইয়া পড়িত, এবং বিষাদের কথা শুনিলে যাহারা ক্রোধে আঁখি দুইটী জবাফুলের মত রক্তবর্ণ করিয়া ফেলিত,—রামপ্রসাদ তাহাদের বুঝাইবার জন্য গাহিতেন—

"হরিষে বিষাদ আছে মন, কোরোনা এ কথায় গোসা,
ওকে সুখেই দুখ, দুখেই সুখ, ডাকের কথা, আছে ভাষা।"

এই ত প্রকৃত সাধকের কথা। এইরূপ সাধকের বিপদাপদ নাই, নিরানন্দ নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন

"যে জন সাধক বটে তার কি দুঃখ ঘটে?
* * * * * *
শ্রীরামপ্রসাদ দাসে আনন্দ সাগরে ভাসে
সাধকের কি আছে জঞ্জাল!"

এক্ষণে দেখা যাউক, পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে রামপ্রসাদের কি মত। তিনি কি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রতিমার পূজা করিতেন? তাঁহার সকল ধ্যান-ধারণা কি শ্যামা মার মৃত্তিকানির্ম্মিত মূর্ত্তিটাতে পর্য্যবসিত ছিল? তিনি কি করালবদনীর শুধু করাল বদন ও চতুর্হস্ত, লোলজিহ্বা ও নরমুণ্ডমালা, আলুলায়িত কেশরাশি ও চরণতলে মহেশ্বরকে দেখিতেন? তিনি কি রণরঙ্গিনীর শুধু ভৈরব মূর্ত্তিখানির পূজা করিতেন—যে মূর্ত্তি সুপটু পটুয়া গড়িয়া থাকে? তিনি কি তাঁহার অনাবিলা ভক্তি শুধু কর্দ্দম বিনির্ম্মিত জড় প্রতিমার তুলিকারঞ্জিত চরণে ঢালিয়া দিতেন? তিনি কি তাঁহার পূজার উপকরণ দন্তবিহীন, পাকস্থলীবিহীন, পরিপাকশক্তিবিহীন, প্রাণহীন মৃত্তিকাস্তূপের ভোজনের জন্য মূঢ়ের মত চিরদিন উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। তথাপি যতদূর সংক্ষেপে বলা যায়, বলিবার চেষ্টা করিতেছি। রামপ্রসাদ এরূপ ভাবে পূজা করিতেন না। তিনি প্রতিমার পূজা করিতেন সত্য, কিন্তু তিনি প্রতিমার মধ্য দিয়া অতি দূরে দৃষ্টি চালাইতেন। তাঁহার দৃষ্টি প্রতিমার আয়তন-টুকুতে আবদ্ধ ছিল না। তিনি করালবদনীর চতুর্হস্তের মধ্য দিয়া শক্তির পরিস্ফুরণ দেখিতেন; রণরঙ্গিনীর রণরঙ্গের মধ্যে মহাশক্তির অপূর্ব্ব লীলা দেখিতেন। তিনি জড়বাদীর মত অন্ধ ছিলেন না। তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড জড়পদার্থের সমষ্টি বলিয়া ধরিতেন না। তিনি যাহা কিছু দেখিতেন, তাহা শক্তির মূর্ত্তি; যাহা কিছু শুনিতেন, তাহা শক্তির গান। তিনি নাম লইতেন, অথচ নামের পূজা করিতেন না; প্রতিমার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিতেন অথচ তিনি প্রতিমার মধ্য দিয়া অনেক দূরে গিয়া পড়িতেন। তিনি সাকার দেবতা-পূজা-করা-রূপ সোপান দিয়া আধ্যাত্মিকতার শিখরে উঠিয়াছিলেন। ইহাই রাম-প্রসাদের পৌত্তলিকতা, ইহাই হিন্দুদের পৌত্তলিকতা। এইরূপ পৌত্তলিকতার মধ্য দিয়া গিয়া তিনি নিরাকারের ধ্যান-ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন এবং মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন যে, আদ্যাশক্তি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী ও নিরাকারা। তাই তিনি গাহিতেন—

"তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে।"

রামপ্রসাদ বিশ্বমাতৃত্বের পূজা করিতেন। জননী যেমন তাঁহার শিশু পুত্রগণকে স্তন্য পান করাইয়া জীবিত রাখেন, তেমনি সমগ্র পৃথিবীর পুত্রগণকে বাঁচাইবার জন্য এক জননী আছেন, তাঁহাকে বিশ্বজননী বলা যায়। তিনি তাঁহার শক্তিরাশি জীবনীশক্তি রূপে জগতের শস্যে, ফলে, জলে, অনলে, অনিলে লুকাইয়া রাখিয়াছেন—যাহারা জগৎ জনগণকে চিরদিন বাঁচাইয়া রাখে। এই যে বিশ্ব জননী, যাঁহার এত অনুকম্পা, তাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতে মূর্ত্তিমান ভক্তের স্বভাবতঃই অভিলাষ হয়। এই জন্য মানব বিশ্বজননীর এক প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে; এবং সেই জননী-প্রতিমার সন্তুষ্টি-সাধনের জন্য নিজেরা যে অন্ন ভক্ষণ করে, সেই অন্নের নৈবেদ্য করিয়া উৎসর্গ করে। মানব মনে করে যে, বিশ্বজননী এ নৈবেদ্য ভক্ষণ করেন ও তিনি প্রীত হন। মানব নিজে যেরূপে সন্তুষ্ট হয়, সে সেইরূপে তাহার দেবতার সন্তুষ্টি সাধন করে। ভক্তের এ আচরণ যে অনেকটা বালকের মত, তাহা রামপ্রসাদ জানিতেন। তাই তিনি বলিতেন

"জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা;
ওরে, কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তায়
আলোচাল আর বুট্ ভিজানা।"

কিন্তু এই বালকত্বের মধ্যে যদি সরলত্বের অমৃতধারা ও ভক্তির স্বর্গীয় সুধা মাখান থাকে, তাহা হইলে দেবতা প্রীত হন কি না কে বলিতে পারে? শুধু জাঁকজমক করিয়া পূজার আয়োজন করিলে চলিবে না; ঢাক-ঢোল

বাজাইয়া লোক জমা করিয়া পূজা করিলেই যে ভগবান্ ধরা পড়িলেন, এমন কোন কথা নাই। দু'দশ হাজার ছাগবলি দিয়া. রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করিয়া দিলে—যেমন তৈমুরলঙ্গ একদিন দিল্লীনগরে নরবলি দিয়া করিয়াছিল—যে শ্যামা মা পরম প্রীতা হইলেন, এমন কোন কথা নাই। নীরস আহ্বানে দু'দশ হাজার ব্রাহ্মণ আহূত করিয়া সাধ্যাতীত ভক্ষণে বাধ্য করিলেই যে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইলেন, এমন কোনও কথা নাই। বরং এরূপ পূজায়, এরূপ পূজার আয়োজনে, এরূপ পূজার আড়ম্বরে ও এরূপ ব্রাহ্মণ-ভোজনে জগজ্জননী বিরূপা হন। সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন যে, যদি. প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া পূজার আয়োজন করিলেই ভগবানকে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে ধনী ইচ্ছা করিলে ভগবানকে ক্রীতদাস করিতে পারিত; আর নির্ধন কোন দিন ভগবানের অনুকম্পা, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ পাইত না। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন

"জাঁকজমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে;

তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা জানবে না রে জগজ্জনে।"

বাস্তবিক জাঁকজমক্ করিয়া পূজা করিলেই মনে-মনে অহঙ্কার হয়; আর এক কলসী দুগ্ধে এক ফোঁটা গো-মূত্রের মত ঐ একটু অহঙ্কার বিরাট্ একটা ক্রিয়ার ফল পণ্ড করিয়া দেয়। ভগবানের পূজার সিংহাসন—সরল, নির্ম্মল হৃদয়; নৈবেদ্য—একমাত্র অনাবিলা ভক্তি; পুরোহিত—শান্তিময়ী তন্ময়তা।

"আলোচাল আর পাকা কলা কাজ কিরে তোর আয়োজনে;

তুমি ভক্তিসুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্ত কর আপন মনে।"

এই ত পূজা। এই পূজাতে জগদম্বা তুষ্টিলাভ করেন। দু'দশ মণ আলো চালের গাদা ও দু' পাঁচ কাঁদি পাকা কলাতে ভগবান্ ভুলেন না। তাঁহাকে নির্জ্জনে ভক্তিসুধা খাওয়াইতে হইবে, তবে তিনি প্রীত হইবেন। আর এই ভক্তিসুধা আপন মনে খাওয়াইতে হইবে—পাড়ার পাঁচজন মুরুব্বিকে ডাকিয়া নয়। ভগবান্ ভক্তাধীন। ধনী ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ, উচ্চ ও নীচ, উত্তম ও অধম যে যেমন ভক্তির অধিকারী, সে তেমন ভাবে ভগবানকে পায়। যে যতটুকু ভক্তিরস ভগবানকে দিতে পারে, সে ততটুকু ভগবচ্চিন্তার মধুর রসের আস্বাদন পায়।

রামপ্রসাদ শক্তির উপাসক ছিলেন। অনেকের ধারণা, শক্তির উপাসনা করিতে গেলেই মদ্যপান করিতে হয়। শুনিতে পাওয়া যায় যে, কুমারহট্টনিবাসী অধ্যাপক বলরাম তর্কভূষণও না কি একদিন রামপ্রসাদকে মাতাল বলিয়া ঘৃণা করিতেন। এতদ্ব্যতীত, পানাসক্ত অনেক ভক্ত নিজেদের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য, রামপ্রসাদ সুরা-পান করিতেন, এইরূপ প্রচার করেন। কারণ, এইরূপ প্রচার করিতে পারিলে সাত খুন মাপ! কেহ কিছু বলিলে, তাঁহারা তর্ক করিবেন, "রামপ্রসাদ সুরাপান করিতেন; অতএব আমরা কেন না করিব?" তাঁহারা দেখান যে, রামপ্রসাদের একটা গানের মধ্যে আছে—

"মাতাল হলে বোতল পাবি, বৈতালী করিবে কোলে।"

আরও বলেন যে, সুরাপান সম্বন্ধে রামপ্রসাদকে বলায় তিনি উত্তর দেন—

"সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই কুতূহলে।"

তিনি সুরাপান করিয়া বলেন যে সুধা খাই। আর ভক্তেরা সুরাপান করিয়া এইরূপ উত্তর দিলে, তাঁহাদিগকে ভণ্ড বলিয়া তিরস্কার করা হয়। পানাসক্ত ভক্তগণের এইরূপ যুক্তি। ইহা অপেক্ষা মূর্খতার পাণ্ডিত্য আর কতদূর হইতে পারে? গানটাকে কি অর্থ হইতে কি অর্থে লইয়া যাওয়া হইল! পরের কথা কয়টা দেখা যাউক—

"আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,

মোদো মাতালে মাতাল বলে।"

এই ছত্র দুইটার কি অর্থ তাঁহারা করিবেন করুন। আর এক কথা। স্বীকার করিলাম, তিনি মদ্যপান করিতেন। কিন্তু পানাসক্ত ভক্তবৃন্দ আপনারা একবার রামপ্রসাদের বোতলের লেবেলটা পড়িয়া দেখুন। সন্ধান করিয়া জানুন, কি মসলার চোলাই করিয়া এ মদ্য বাহির করা হইয়াছে। আর এ মদ্যের ভাটীই বা কোথায়। তবে শুনুন—

"গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা,

আমার জ্ঞান শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাটী, পান করে মোর মন মাতালে।

মূল-মন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি বলে তারা মা;

রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে।"

শুনলেন মদ চোলায়ের তালিকা? বুঝিলেন এ কি মদ? এ মদ সাহাকোম্পানীর দোকানে পাওয়া যায় না। এ মদ খাইলে পায়ের তলায় ধরণী টলে না। এ মদ রসার

ডিষ্টিলারীতে চোলাই করিতে পারে না। এ মদ খাইলে চতুর্ব্বর্গ মেলে। পানাসক্ত ভক্ত, পার ত শাক্ত-চূড়ামণি রামপ্রসাদের এই মদ খাও, আর তা যদি না পার, সাহা-কোম্পানীর দোকানের মদ খেয়ে চতুর্ব্বর্গ হারাও! এই ত সাধনা! আর পার ত এই সাধনার শতমুখে গর্ব্ব কর!!

কর্ম্মসম্বন্ধে রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

"সত্ত্বে ধর্ম্ম, তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় মন রজো মিশালে।" এ কথাটীর অর্থ কি? পূর্ব্বোক্ত পানাসক্ত ভক্তগণ এ কথাটীর এইরূপ অর্থ করেন যে, রজো মিশালে অর্থাৎ মদ্য পান করিলে কর্ম্মে আসক্তি আসে। মদ্য পান করিলে মানুষ শরীরে বল পায় এবং বল পাইয়া কর্ম্মে উন্মত্ত হয়। অর্থাৎ এক কথায়, মদ্যপান করিলে মানুষ কর্ম্মী হয়। সুন্দর ব্যাখ্যা! ইহা লইয়া আর অধিক বাক্যব্যয় না করাই ভাল। এক্ষণে রামপ্রসাদ কিরূপ অর্থ করিয়াছেন, দেখা যাউক। সত্বরজস্তমঃ এই ত্রিগুণের ধর্ম্ম কি, বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, কর্ম্ম কখন হয়। সত্বগুণের লক্ষণ ধর্ম্মে আসক্তি। সত্বগুণপ্রধান ব্যক্তি দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সৌজন্য প্রভৃতি গুণের অধিকারী। কিন্তু দয়া ইত্যাদি থাকিলেই যে দয়ার কার্য্য হইল তাহা নহে। এইজন্য রামপ্রসাদ বলিতেছেন তমে মর্ম্ম—আসল জিনিস তমে অর্থাৎ শক্তি চালনে। সত্ব আমাদিগকে জানাইয়া দেয়, আর তমঃ সেই কার্য্য করিতে আমাদিগের শক্তির নিয়োগ করে। কিন্তু কি কার্য্য করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া তৎসাধনে আমরা নিযুক্ত হইতে পারি না, যদি আমাদের তৎসাধনে কামনা না থাকে। তাই রামপ্রসাদ বলিতেছেন "কর্ম্ম হয় মন রজঃ মিশালে"। আর রজঃ গুণের বিশেষ ধর্ম্মই এই যে, সে ইচ্ছা বা অভিলাষ, বাসনা বা কামনা প্রদান করে। এই অভিলাষ না থাকিলে কার্য্যে আসক্তি বা অনুরাগ আসে না। অনুরাগ না থাকিলে শক্তিচালনা অসম্ভব। কার্য্য হয় তখন, যখন অভিলাষ থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কার্য্যের তিনটী পর্য্যায়। প্রথম, যে কার্য্য করিব তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা; দ্বিতীয়, অভিলাষ থাকা; তৃতীয় শক্তি পরিচালনা—হস্ত, পদ, ইত্যাদির কার্য্যে নিয়োগ। রাম-প্রসাদ, সত্বরজস্তমঃ এই ত্রিগুণ যে প্রকৃতির ধর্ম্ম, ও সেই ধর্ম্ম যে কিরূপে কার্য্য করে, তাহা বিশেষরূপে জানিতেন। তিনি জ্ঞানীর চক্ষে ও দার্শনিকের ধ্যানে কর্ম্মের বিকাশ দেখিতেন।

"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" এ কথা রামপ্রসাদ জানিতেন। তিনি গাহিতেন—

"যার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, কর্ম্মফলে ফল ফলেছে।"

তিনি কতবার মাকে পাইয়াছেন; আবার কর্ম্মদোষে তাঁহাকে হারাইয়াছেন। তাই এখন বলিতেছেন—

"যেমন অন্ধজনে হারাধন পুনঃ পেলে ধরে এঁটে;
আমি তেমনি মত ধরতে চাই মা
কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে।"

তিনি কর্ম্মের দ্বারা উদ্‌ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; এজন্য তিনি কর্ম্মও চান না, কর্ম্মের ফলও চান না। তাই তিনি পরেই বলিতেছেন—

"প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী কর্ম্মডুরি দে মা কেটে।"

তিনি কাঁদিয়া বলিতেছেন, "মা গো, কর্ম্মের ডুরি কাটিয়া দাও।" মা যদি একবার কর্ম্মের ডুরি কাটিয়া দেন, তাহা হইলে এ মর জগতে আর আসিতে হইবে না, আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। বুঝি ইহাই তাঁহার কামনা—

"ইহজন্ম পরজন্ম বহুজন্ম পরে
প্রসাদ বলে আর জন্ম হবে না জঠরে।"

অনেক জন্ম হইয়াছে। কে জানে আর কত জন্ম হইবে! কিন্তু এক দিন আসিবে, যে দিন কর্ম্মের জের শেষ হইয়া যাইবেই যাইবে,—জন্ম আর হইবে না। সাধক রাম-প্রসাদ আর জন্ম চান না। তবে কি চান? তিনি কি চান, তিনি নিজেই জানেন না—

"ক্ষিত্যপ্‌তেজঃমরুৎ ব্যোম্ বোঝাই আছে নায়ের খোলে;
* * * * *
যখন পাঁচে পাঁচ মিশিয়ে যাবে
কি হবে তাই প্রসাদ বলে।"

সে দিন কি হইবে, তাহাই ভক্ত ভাবিতেছেন, যে দিন পঞ্চভূত পঞ্চভূতে বিলীন হইবে। সে দিনের সে প্রহেলিকার অর্থ কি, সে দিনের সে নিগূঢ় রহস্যের অভি-ব্যক্তি কি, তাহা সাধক কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না! আর এই ঠিক করিতে না-পারারই মধ্যে ইহার অর্থ! এই খুঁজিয়া না-পাওয়ার মধ্যেই ইহার সন্ধান!

তিনি কর্ম্মের ডুরি কাটিতে চাহেন, জঠরে জন্মগ্রহণ

করিতে তাঁহার আর বাসনা নাই। তবে কি তিনি কর্ম্মের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে চান? মর জগতের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইতে কামনা করেন? তিনি কি বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে চিরদিনের মত অভিনয় শেষ করিতে চাহেন? অর্থাৎ তিনি কি মুক্তির অভিলাষী? তিনি কি শুধু মোক্ষের জন্য তপস্যা করিয়াছেন? তিনি কি নির্ব্বাণ চাহেন? না,—আমরা জানি, তিনি এ সকল চান না। আমরা জানি, তিনি নির্ব্বাণের অভিলাষী ন'ন। আমরা তাঁহার প্রাণের বাণী

"নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে। চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।"

তিনি মুক্তির পূর্ণচন্দ্রতলে, চিরশান্তির অনন্তের সুবাসে প্রফুল্ল হইতে চান না। তিনি চান কম্মক্ষেত্রের প্রখর কিরণতলে' ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সিদ্ধির বিল্বপত্র মালা গলে পরিতে। তিনি জগজ্জননীর পোষ্যপুত্র। তিনি কি জননীর রীতি, জননীর ধারা পাইবেন না? আদ্যাশক্তি ব্রহ্মময়ী সনাতনী যে নিজে মুক্তি চান না। তিনি কখনো হস্তে অসি লইয়া গলে নরমুণ্ডমালা পরিয়া, কেশদাম আলুলায়িত করিয়া উলঙ্গিনী হইয়া রণরঙ্গিণী সাঙ্গনাদনে অট্টহাসে মেদিনী কাঁপাইয়া অসুরকুল সংহারে উন্মাদিনী;—চরণতলে প্রমথাধিপ ভোলানাথ পড়িয়া আছেন, ভ্রূক্ষেপ নাই,—করাল-বদনী তাঁহার বক্ষোপরি নাচিতেছেন! আবার কখনো বাঁশী লইয়া, গলে কদম্বফুলমালা পরিয়া, কেশদাম চূড়া করিয়া বাঁধিয়া, প্রেমময় শ্রীমাধব রমণীরমণ বেশে শ্রীরাধাকে বামে লইয়া যমুনাতীরে কদম্বতলে বিহার করিতেছেন! একদিকে সংহারের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, আর একদিকে প্রেমের মনোমোহন বেশ! "ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিবরাম—সকল আমার এলোকেশী।" মা ব্রহ্মময়ীর অনন্তলীলা! শ্রীরামপ্রসাদ মায়ের ধারা পাইয়াছেন। তাই লীলাময়ী জননীর প্রিয় পুত্র লীলা হইতে অবসর পাইতে ইচ্ছা করেন না। আবার বলি, জলে জল হইয়া মিশিতে রামপ্রসাদের ইচ্ছা ছিল না। তিনি নির্ব্বাণ চাহিতেন না।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত রামপ্রসাদের দার্শনিকতা ও ধর্ম্মপ্রবণতার বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এতক্ষণ রামপ্রসাদকে ধর্ম্মোপদেষ্টা স্বরূপে দেখিয়াছি; সুখ ও দুঃখ, মৃত্যু ও জন্ম, মোক্ষ ও নির্ব্বাণ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জানিয়াছি। দেখিয়াছি, দার্শনিক ও উপদেষ্টা হিসাবে তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে। এক্ষণে কবি হিসাবে বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায়, তাহার আলোচনা করা যাউক।

কবির জন্মভূমি ও আবাসভূমি কুমারহট্ট গ্রাম গঙ্গাতীরে অবস্থিত। কবিরঞ্জন আশৈশব গঙ্গাতীরে বেড়াইয়াছেন, গঙ্গানীরে স্নান করিয়াছেন। তিনি জীবনে কখনো নদীর উল্লাস, নদীর বিষাদ, নদীর হাসি, নদীর কান্না ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার গানে ও কবিতার মধ্যে নদীর ও তরণীর প্রচুর উপমা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালের বিপুলবক্ষা, পুলকস্পন্দিতা, চঞ্চলা নদীর আকৃতি দেখিয়া তিনি সাগরের মূর্ত্তি অনুমান করিয়া লইতেন। তনুকে তরণীর সহিত তুলনা করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"এ তনু তরণী ভব সাগরে ভাসায়ে"

পরেই বলিতেছেন

"আমার তুফানে তরী নবী আমি মজিলাম।"

অন্যত্র দেখিতে পাই, তিনি গর্ব্বভরে বলিতেছেন—

"এ কি পেয়েছ আনাড়ী দাঁড়ী, তুফানে ডরাবে।"

আর একস্থলে বলিতেছেন—

"মাঝিকের সুখ হল না বলে, ঢেউ দেখে কি নাও ডুবাবে।"

কুসঙ্গে জীবন নষ্ট করিয়াছে,—এই কথা সুন্দর ভাবে বলিলেন—

"ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত্ন মধ্যে তরী ডুবাইলি।"

এইরূপ উদাহরণ আরও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"এ তনু তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে
ভবের ভাবনা কিবা মনকে কর নেয়ে।"

পুনরায়,—

"প্রসাদ বলে থাক বসি' ভবার্ণবে ভাসাইয়ে ভেলা,
যখন জোয়ার আসবে উজিয়ে যাবে,
ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা।"

অন্যত্র,—

"সামাল ভবে ডুবে তরী (তরী ডুবে যায় জনমের মত)
জীর্ণ তরী তুফান ভারী,
বইতে নারি, ভয়ে মরি,
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু
এবার তারাই করছে দাগাদারী।"

শেষে কবি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—

"দীন রামপ্রসাদ বলে এবার কার্য্য কি করিলি,
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা লাভে-মূলে সব ডুবালি।"

জীবনকে তরণীর সহিত, ভবসংসারকে নদী বা সাগরের সহিত, মনকে কর্ণধারের সহিত ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে দাঁড়ীর সহিত তুলনা করিয়া, রামপ্রসাদ ছাড়া আর কেহ এত সহজে সংসার সাগর পার হইতে পারেন নাই। বঙ্গসাহিত্যে রামপ্রসাদের পূর্ব্বে এরূপ নিখুঁত ও সুবোধ্য উপমা এত বেশীভাবে কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। রামপ্রসাদের পরে অনেক কবিওয়ালা, অনেক গীতিরচয়িতা, ছন্দরচয়িতা রামপ্রসাদের অনুগ্রহ-প্রসাদ পাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু যেটুকু প্রসাদ পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের যশের উদর ভালরূপ পূর্ণ হয় নাই; রামপ্রসাদের এই উপমার অনুকরণ করিতে গিয়া অনেক সময় তাঁহারা উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাম্য বা সাদৃশ্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। ফলে এমন অনেক খঞ্জ, বধির, অন্ধ উপমার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহারা ভাল চলিতে পারে না, শুনিতে পায় না, দেখিতে পায় না। প্রতিভার সহিত শিক্ষার পার্থক্য। শিক্ষিত বা বিদ্বান্ হইলেই যে কবি হইবে, এমন কোন কথা নাই। তাই সকল যুগে, সকল দেশে যুগপ্রবর্ত্তনকারী প্রতিভাবান্ কবির সহিত তাঁহার শিক্ষিত শিষ্যগণের বা পণ্ডিত শত্রুগণের বা চতুর অনুকরণ-কারীদিগের এত পার্থক্য।

কুমারহট্ট গ্রামের আশে-পাশে অনেক চাষের জমি ছিল। রামপ্রসাদ অনেক চাষের কাজ দেখিয়াছেন। শরতের সূর্য্যকরোজ্জ্বল ক্ষেতে শ্যামল ধান্যের বিপুল পুলকনৃত্য দেখিয়া তিনি কত হাসিয়াছেন, কত গাহিয়াছেন। তাই নদী বা সাগরের সহিত সংসার ও জীবনের তুলনা করার পর আমরা দেখি যে, তিনি দেহকে জমির সহিত তুলনা করিতেছেন।

"দেহ জমীন্ জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি তায় সকল চষি;
হৃদয় মধ্যেতে আছে পাপরূপ তৃণরাশি;
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত করগো মুক্তকেশী।
কাম আদি ছটা বলদ বহিতে পারে অহর্নিশ,
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে শস্য পাব রাশিরাশি।"

অন্যত্র এই কৃষিকার্য্যের তুলনা অবলম্বনে মনকে ধিক্কার দিয়া অতি সুন্দরভাবে তিনি বলিতেছেন—

"মন রে কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব-জমীন্ রইল পতিত,
আবাদ্ করলে ফলতো সোনা।"
কালীনামে দাও রে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না;
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছে যম ঘেঁসে না।
অদ্য অব্দ শতান্তে বা বাজাপ্ত হবে তা জান না;
এখন আপন ভেবে যতন কর চুটিয়ে ফসল কেটে নে না।
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তিবারি তায় সেঁচ না;
ওরে, একা যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।"

রামপ্রসাদ খুব দক্ষ চাষী ছিলেন। তিনি বড়-গলা করিয়া বলিতেছেন "ওরে একা যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।" যাহা হউক এরূপ আধ্যাত্মিক চাষের বিস্তৃত বিবরণ রামপ্রসাদের পূর্ব্বে আর কোন কবি দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অন্য কোন দেশের কবি দিয়াছেন কি না জানি না।

মৃত্যু অনিবার্য্য। এ মর-সংসারে সকল স্থানেই মৃত্যুর অবাধ অধিকার। মানব মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না, যদি সে শমনভয়বারিণী শ্যামা-মাকে প্রাণের সহিত না ডাকে। তাই রামপ্রসাদ মৃত্যুকে অতি সুন্দরভাবে জেলের সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছেন,—

"জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে।
অগাধ জলে মীনের ঘর, জাল ছেয়েছে ভুবন ভিতর,
যখন যারে মনে করে, তখন তারে ধরে কেশে।
পালাবার পথ নাই কোন কালে,
পালাবি কোথায় ঘিরেছে জালে,
প্রসাদ বলে মাকে ডাক, শমন দমন করিবে সে।"

যম-জেলে এমন বিস্তৃত মজবুত জাল ফেলিয়াছে যে, সংসার-সাগরের মীন পর্য্যন্ত পলাইতে পারিবে না। এক্ষণে উপায়? উপায়—শুধু শ্যামা মাকে ডাক, যদি কালকে জয় করিতে চাও। ভয় করিও না। ভয় করিবার কিছুই নাই,—

"প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তাই হবিরে নিদান কালে;
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।"

রামপ্রসাদ পাশা, সতরঞ্চ প্রভৃতি খেলাও জানিতেন। এই সকল খেলার তুলনা দিয়াও তিনি গান গাহিতেন।

উদাহরণ স্বরূপ দুইটী গান দেওয়া গেল। পাশা খেলার তুলনা দিয়া বলিতেছেন,—

"ভবে আসা খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল,
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঞ্জুরী পলো।
পো বার, আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল,
শেষে কচে বার পেয়ে মাগো পাঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হ'লো।"

পাশাপুটু, ভক্ত-ভাবুক রামপ্রসাদের ভাব-মাধুর্য্যের আস্বাদ করুন। আবার সতরঞ্চ খেলার তুলনা দিয়া গাহিতেছেন,—

"এবার বাজী ভোর হ'লো,
মন, কি খেলা খেলাবি বল।
সতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল,
এবার বেড়ার ঘর, কোরে ভর মন্ত্রীটী বিপাকে ম'লো।
দুটা অশ্ব, দুটা গজ, ঘরে বসে কাল কাটাল,
তারা চলতে পারে সকল ঘরে, তবে কেন অচল হ'লো।"

রামপ্রসাদের উপমা সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ দেওয়া হইল। এগুলি সামান্য কথার উপমা নহে, সামান্য ভাবের উপমা নহে—একটী বিষয়ের উপমা লইয়া একটী গীত রচিত এবং প্রতি ভাবের, প্রতি কথার সাম্য সুন্দর ভাবে রক্ষিত। আর একটী উদাহরণ দিব। সেটী এই,—

"শ্যামা-মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি (ভবসংসার মাঝে)
ঐ যে মন ঘুড়ি, আশা বায় বাধা, তাহে মায়া দড়ি।"
ইত্যাদি।

এ গানটীর উল্লেখ করিতে গেলেই নরেশচন্দ্রের সেই গানটী মনে পড়ে,—

"শ্যামাপদ আকাশেতে, মন ঘুড়িখানি উড়্‌তেছিল,
কলুষের কু-বাতাস পেয়ে গোত্তা মেরে পড়ে গেল।"
ইত্যাদি।

নরেশচন্দ্র রামপ্রসাদের কাছে এই "মন-ঘুড়ি" "শ্যামাপদ আকাশেতে" উড়াইতে শিখিয়াছিলেন কি না, এ বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন নাই। কে কাহার নিকট ঋণী, তাহার বিচারের প্রয়োজন নাই।

রামপ্রসাদ খেলা-ধূলার, এমন কি ঘুড়ি উড়ানর উপমারূপ কাঠাম লইয়া শব্দের বিচালী জড়াইয়া, তাহার উপর যতি ও শব্দমিলনের মাটী দিয়া, শেষে সুর-রঙ্ চড়াইয়া, অতি উচ্চ, অতি উদার, অতি মহৎ ভাবের প্রতিমার মোহিনী-মূর্ত্তি গড়িতে অদ্বিতীয় কারিগর।

রামপ্রসাদ জীবনের শেষভাগে যে গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। পদলালিত্যে ও ভাবগাম্ভীর্য্যে, অনুপ্রাসে ও গীতিতে সে গানগুলি রামপ্রসাদের পরিপক্ব রচনা-চাতুর্য্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতেছে। তিনি হরহৃদে রণোন্মাদিনী এলোকেশী শ্যামাকে দেখিয়া বিস্ময়ে গাহিতেছেন :—

"কে হরহৃদে বিহরে!
তনুরুচির সজল ঘন নিন্দিত চরণে উদিত বিধু নখরে॥
নীল-কমল দল শ্রীমুখ-মণ্ডল শ্রমজল শোভে শরীরে।
মরকত-মুকুরে মধু মুকুতাফল রচিত কিবা শোভা
মরি মরি রে॥
গলিত চিকুরঘটা নব-জলধর ছটা ঝাপল
দশদিশি তিমিরে।
গুরুতর পদ-ভর কমঠ-ভুজগবর কাতর মূর্চ্ছিত মহীরে॥
ঘোর বিষয়ে মজি' কাগা দে না ভজি' সুধা ত্যজি'
বিষপান করিরে।
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈব বিড়ম্বন, বিফলে মানব
দেহ ধরি রে॥"

"মরকত মুকুরে মধু মুকুতাফল রচিত কিবা শোভা মরি-মরি রে" এই ছত্র বলিতে গেলে অমনি তাঁহার আর একটী ছত্র মনে পড়ে,—"মরকত-মুকুর বিমল-মুখ-মণ্ডল নূতন জলধর বরণা।" রামপ্রসাদ কোন্ সৌন্দর্য্য-চক্ষে শ্যামা মার মুখমণ্ডল দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত সৌন্দর্য্য-পিপাসু ভক্ত উপাসক কবিই জানেন। অপরে তাহা কি করিয়া জানিবে? অপরের পক্ষে তাহা জানা অসম্ভব। উপরিউক্ত গানে রামপ্রসাদের পদলালিত্য, ভাষার স্বাভাবিক সুন্দর গতি প্রত্যেক সাহিত্যিকের দেখিবার কথা, বুঝিবার কথা। এ গানটীর ছত্রে-ছত্রে যেন জয়দেবের বীণার ঝঙ্কার, যেন চণ্ডীদাসের, জ্ঞানদাসের মধুর প্রফুল্লতার বিকাশ। "অমল কমল দল, বিমল চরণ-তল, হিমকরনিকর রাজিত নখরে" এটী কি ঠিক জয়দেবের "মধুর কোমল-কান্ত" পদ বলিয়া মনে হয় না? আর একটী গান দেখিতে পাই—

"নখর নিকর হিমকরবর রঞ্জিত মন তনু মুখহিমধামা,
নব-নব সঙ্গিনী নব-নব রঙ্গিনী হাসত ভাসত নাচত বামা।"

এই গানের শেষে বলিতেছেন,—

"ভবভয়ভঞ্জন হেতু কবি রঞ্জন মুদ্রিত করম সুনামা,
তব গুণ শ্রবণে, সতত মম মনে, নাহি ভবে
পুনরপি গমন বিরামা।

কি অদ্ভুত রচনা শক্তি! যাঁহাদের সৌন্দর্য্যপিপাসা, সুনিপুণ শ্রবণ আছে, তাঁহারা এই পদ গুলি পাঠ করুন ও তাহাদের মাধুর্য্য উপভোগ করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে রামপ্রসাদের রচনা প্রণালীর দক্ষতা দেখিয়া বিস্মিত হউন। পাঠকালে প্রতি ছন্দ প্রতি শব্দ তালে তালে [illegible] নাচিতেছে, হঠাৎ পড়িয়া যাইতেছে এমন কোনও পদ নাই। পাঠক ও পাঠিকার আনন্দের জন্য তাঁহার আর একটী সুললিত গান উদ্ধৃত করিলেম,

"ও কে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত কেশ
বসন বিহীনা কে রে সমরে।
মদন মথন উরসি বিহরসি হাসি হাসি বামা বিহরে।
প্রলয়কালীন জলদ [illegible],
জন মনোহরা শমন [illegible] পদ যুগ কর
অঙ্গে শস্ত্রে প্রহার দাগ, প্রথম বয়স বিজলী শিখা,
কুঞ্জ নয়নে [illegible] শমন নারে।
কলয়তি প্রসাদ [illegible]
সমর বেশ [illegible], [illegible] বিঘূর্ণিত রবে।"

উপরিউক্ত গানগুলির মধ্যে রামপ্রসাদের অনুপ্রাসের অনেক সুদক্ষ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া উদাহরণ দিতে গেলে বলা যায়

"রূপসী শিবসি শশী সরোবরে এলোকেশী
মুখখানা যেন সুনীল কমলখানা নাচিছে।
দ্রুত চলে ধরা টলে বাহুবলে দৈত্যদল,
ডাকে শিবা যাব কেবা শিবা নেশা করেছে।"

রামপ্রসাদ আধুনিক কষ্টকবির মত চেষ্টা করিয়া "অনুপ্রাসের অট্টহাসের' মধুর বিকটধ্বনি কবিতায় প্রকটিত করিতে প্রয়াস পান নাই। রচনা-প্রণালী পরিপক্ক হইলে অনুপ্রাস আপনা আপনি ঘটিয়া থাকে। একই প্রকমের বর্ণ-সংযোজিত শব্দের একত্র বিন্যাস করিয়া অনুপ্রাসের জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। রামপ্রসাদের প্রধান লক্ষ্য অনুপ্রাসের উপর বা কবিতার এরূপ কোন বাহ্য সৌন্দর্য্যের উপর ছিল না। তাঁহার লক্ষ্য ছিল ভাবের উপর, কবিতার প্রাণের প্রতি। তিনি কতকগুলি কথার চাকচিক্যে প্রাণহীন কবিতাকে কমনীয় করিয়া তুলিয়া বাহ্য-সৌন্দর্য্য-প্রিয় মূঢ় জন-সাধারণকে আপাততঃ সুখে বিমোহিত করিয়া চতুরের মত ঠকাইতেন না। তিনি তদানীন্তন জাতীয় চিন্তার স্রোত বিপথ হইতে নির্ম্মল পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সফলও হইয়াছিলেন। নীচতায় ও হীনতায় জাতির মজ্জা পর্য্যন্ত বিকৃত হইতেছিল, এমন সময়ে রামপ্রসাদ মহৎ ও উদার ভাবের স্রোত দিয়া, সকল পাপ দূর করিয়া জাতিকে শুদ্ধ ও পবিত্র করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সকল মহাপুরুষ জাতিকে পুনর্বার সচেতন করিয়া ও বাহির অন্ধ জাতিকে দৃষ্টিদানরূপ মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি অর্দ্ধমৃত মৃতপ্রায় জাতির দেহ গড়িয়া দিয়া [illegible] উদার ভাবরূপ প্রাণ [illegible] দিয়াছিলেন। জ্ঞানহীন, দুর্বল জাতিকে [illegible] শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের শক্তিমান করিতে অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার গানে গাথায় পদে পদে দীনতা নাই, বাহুবল নাই, আছে শুধু [illegible] সাধনের উপদেশ।

রামপ্রসাদ কোথাও এমন ভাষার ব্যবহার করিতেন, যাহার শব্দ [illegible] প্রতিফলিত হয়, অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে [illegible] বলে, তাহা রামপ্রসাদের গানের কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে তাঁহার বাক্যবিন্যাস এমন স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতা দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার কোন গাথার শব্দ [illegible] পদের পর পদ উচ্চারণ করিলে সামান্য শ্রোতারও মনের সম্মুখে সেই ভাবের ছবি উপস্থিত হয়, যাহার জন্য তিনি শব্দযোজনা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,—

'ধা ধা ধা গুড় গুড় বাজিছে দামামা।"

অথবা—

"নিগম সা গা মা গণ গণ গণ অবয়ব বর মণ্ডন ভাল,
তাথৈ থেই থেই দ্রিমিকি দ্রিমিকি, ধা ধা ডম্বরুবাদ্য রসাল।"

পুনরপি, পাগলা ভোলা শিঙ্গা বাজাইয়া ও গাল বাজাইয়া ফিরিতেছেন। তাই রামপ্রসাদ বলিতেছেন,—

"শিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম ভো ভোঁ ভোঁ ববম্ ববম্
বব বম্ বব বম্,
গাল বাজাইয়া মত্ত হইয়া শঙ্কর ফিরিছে।"

কথাগুলির রণেই যেন মানসনয়নের সম্মুখে শিঙ্গা ও গাল বাজাইয়া মত্ত শঙ্করকে তালে-তালে নৃত্য করিয়া ফিরিতে দেখিতেছি। অন্যত্র, বৃষভারূঢ়, হরিগানে প্রমত্ত শিবকে ঠিক এমনি ভাবে বর্ণনা করিতেছেন,—

"বৃষভ চলিছে থিমিকি থিমিকি
বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি
ধরত তাল দ্রিমিকি দ্রিমিকি
হরি গানে হর নাচিয়া।
বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল
শিরে দ্রবময়ী করে টল টল
লহরী উঠিছে কল কল কল
জটাজুট মাঝে থাকিয়া॥"

এইরূপ রচনা কম দক্ষতার কার্য্য নহে। প্রতিভাবান্ সুদক্ষ কবিই শুধু এইরূপ রচনা করিতে পারেন। তাই ইংরাজী সাহিত্যে সেক্স্পীয়ার, মিল্‌টন্ ও টেনিসনের রচনায়, সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস, ভবভূতি ও জয়দেবের কবিতায় এইরূপ রচনা চাতুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের "বিদ্যাসুন্দর" সাধারণের নিকট অপরিচিত। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" রামপ্রসাদের "বিদ্যাসুন্দর"কে ম্লান করিয়া দিয়াছে। ভারতচন্দ্রের নায়ক-নায়িকা আদিরসের অবতার, রামপ্রসাদের নায়ক-নায়িকা যেন মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম ও মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা। ভারতচন্দ্রের কাব্য সৌন্দর্য্যের আধার, মাধুর্য্যের খনি। রামপ্রসাদের কাব্য আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ;—এইজন্য ইহা সাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ্য;—দুর্ব্বোধ্য না হইলেও আনন্দপ্রদ নহে। যাহা হউক, পণ্ডিত ও মূর্খ সকল বঙ্গবাসীই রামপ্রসাদের কালী-কীর্ত্তন ও শ্যামা সঙ্গীতের সহিত পরিচিত। রামপ্রসাদের নাম তাঁহার গানে। "এ দেশের সাহিত্যে কাব্য অপেক্ষা গীতিই প্রশংসনীয়; কারণ এখানে কর্ম্ম অপেক্ষা ভক্তিই অধিক কার্য্যকরী।" রামপ্রসাদকে আমরা তাঁহার গানের মধ্য দিয়াই চিনি; তাই তাঁহার গানের বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা কর্ত্তব্য এবং সাধারণের অজ্ঞাত তাঁহার "বিদ্যাসুন্দর" লইয়া প্রবন্ধের কলেবর পুষ্ট করা যুক্তিযুক্ত নহে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ভাব ও ভাষা দুইয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি জানিতেন ভাবের পরিশুদ্ধি যেরূপ আবশ্যক, ভাষার পরিশুদ্ধিও সেইরূপ আবশ্যক। ভাষা ভাবের বাহিকা মাত্র; ভাষা ভাবের স্পন্দন। ভাষা যদি ক্ষীণা ও দুর্ব্বলা হয়, তবে সে কখন উচ্চ ভাবের গুরুভার বহন করিতে পারে না। ভাষার মধ্য দিয়াই ভাবের বিকাশ। ভাষা যদি কৃত্রিম হয়, ভাবও কৃত্রিম হইবে। ভাষা যদি সরল ও উদার হয়, ভাবও সরল ও উদার হইবে। পদ্যেরই হউক বা গদ্যেরই হউক, ভাব প্রাণ, আর ভাষা এই প্রাণধারণকারী অবয়ব মাত্র। দেহের সঙ্গে প্রাণের বা মনের যেমন সম্বন্ধ, ভাষার সঙ্গে ভাবেরও ঠিক তেমনি সম্বন্ধ। দেহে যদি ব্যাধি থাকে, মনে শান্তি থাকে না; মন যদি নিরানন্দ থাকে, আঁখি সৌন্দর্য্যের দিকে দেখে না, অধর হাসে না, কণ্ঠ আনন্দের গান গাহে না। ভাষা ও ভাবের মধ্যেও ঠিক এই সম্বন্ধ। নীচ ভাষা বা কদর্য্য ভাষা উচ্চ বা সুন্দর ভাবের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিতে পারে না। আবার উচ্চ বা সুন্দর ভাব নীচ ও কদর্য্য ভাষার আবরণে উচ্চতা ও সৌন্দর্য্য হারাইয়া ফেলে।

রামপ্রসাদ পবিত্রতার প্রতি প্রধানতর লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, তাই তাঁহার ভাবে পবিত্রতার বিকাশ; এবং ভাবের এই পবিত্রতা বিকাশের জন্য তিনি উপযুক্ত ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। তা ছাড়া, গানের সম্বল সুর। এই সুর রামপ্রসাদ এমন সুন্দরভাবে দিতেন যে, অতি-বড় পাষাণও শুনিলে গলিয়া যাইত। একটা কথা আছে, Science teaches; Art moves। এখানে Art অর্থে "সাহিত্য" ধরিয়া লই। বাস্তবিকই বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়, এবং সাহিত্য আমাদের নিদ্রিত হৃদয়কে ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া তুলে। রামপ্রসাদের এক-একটা গান এক একটী আদর্শ সাহিত্য। ভাব ও ভাষার যেমন মিল, তেমনই তাহাদের মোহন ঐক্যতান। রামপ্রসাদের ভাব, ভাষা ও সুর এই তিনে মিলিয়া ঘুমন্ত হৃদয়কে জাগাইয়া তুলে, অন্ধকে দৃষ্টিদান করে, পাষাণকে গলাইয়া দেয়, বৃক্ষ, তরু, লতা, পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, সকলকে বিমোহিত করে,—সকলকে শক্তির স্পন্দনে স্পন্দিত করে, সকলকে শক্তি-বীজ-মন্ত্রে দীক্ষিত করে। একটা উদাস উল্লাস, একটা অপরিমেয় সুখানুভূতি জীবনটাকে যেন ভাসাইয়া লইয়া যায়। ছত্রের পর ছত্র গান গাহিবার সঙ্গে-সঙ্গে এই উল্লাস এবং এই উল্লাসের অনুভূতি বাড়িতে থাকে। তখন জগতের জ্বালা, দুর্দ্দিনের ব্যথা, দৈন্যের পীড়ন,

শোকের করুণ হাহাকার—সকল ভুলিয়া যাই। মনে হয়, গানই সত্য, আর সব মিথ্যা; মনে হয়, জগতের সব যাহারা আমাদের আপনার, তাহারা স্বপ্ন-রাজ্যের অধিবাসী; মনে হয়, সংসারের ক্ষণিকের সুখ জলের বুদ্‌বুদ। মনে হয়, স্বার্থের জন্য ছুটাছুটি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যাকুল ব্যস্ততা সব দারুণ ভ্রান্তি। যে সব প্রহেলিকাও প্রশ্নের উত্তর কখন দিতে পারি নাই, যে সব জটিল সমস্যার মধ্য হইতে কোন দিন বাহির হইতে পারি নাই, সে সব প্রহেলিকার উত্তর তখন আপনি মনে পড়ে, সে সব সমস্যার মধ্য হইতে এক প্রশস্ত রাজপথ বাহির হইয়াছে দেখিতে পাই। জীবনের ও মৃত্যুর, আলোকের ও আঁধারের, জ্ঞানের ও অজ্ঞানের সকল সত্য মূর্ত্তি ধরিয়া নয়নের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন আমি কোন জগতে, তখন আমি কোন গগনচন্দ্রাতপ তলে, তখন আমি জীবনের কোন উচ্চ শিখরে, তাহা বুঝিতে পারি না। শুনিতে শুনিতে সাধক কবির ভাব, ভাষা, সুর আমায় উন্মাদ করিয়া তুলে। ভাব, ভাষা, সুরের ত্রিতন্ত্রীর তারে ঘা দিয়া গায়ক যখন বিমল আনন্দোচ্ছ্বাস তুলেন, তখন স্রোতের জলের মত আমি ভাসিয়া ভাসিয়া কোন প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়া পড়ি! শত প্রার্থনায়, শত উপাসনায় যাহা পাই নাই, তাহা রামপ্রসাদের নিখুঁত গান শ্রবণ করিয়া পাই। সূর্য্য যাহার কণা তেজঃ পাইয়া তেজোময়, তাঁহার অনন্ত তেজোময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাই! সুধাংশু যাহার কণা সুধা পাইয়া সুধাময়, তাঁহার অনন্ত সুধার ক্ষণিক আস্বাদ পাই! আকাশ ও সাগর যাহার কণা গাম্ভীর্য্য পাইয়া গুরুগম্ভীর, অসীম, সুনীল, তাঁহার অনন্ত গাম্ভীর্য্য-মাধুর্য্যের তিল আভাষ পাই! যখন গান থামিয়া যায়, তখনও প্রাণের মাঝে সুর থামে না। ধ্বনি থামিয়া যাবার পরেও প্রতিধ্বনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শুনিতে পাই। কিন্তু এই প্রতিধ্বনিও যখন থামিয়া যায়, তখন আবার ব্যস্ততা, আবার ব্যাকুলতা, আবার গান শুনিবার তীব্র বাসনা!

রামপ্রসাদের গানের সুর একবার শুনিলে আর ভুলিতে পারা যায় না। একবার একজন গায়ককে বলিতে শুনিয়াছিলাম, "আমের মধ্যে যেমন ন্যাংড়া আম, সুরের মধ্যে তেমনি প্রসাদী সুর।" কথাটা নেহাৎ মন্দ হয় নাই। আম অনেক রকমের আছে; সুরও অসংখ্য। বিভিন্ন রকমের আমের বিভিন্ন তার; বিভিন্ন সুরের মাধুর্য্যও বিভিন্ন। ন্যাংড়া আম আম বটে, কিন্তু ইহার আস্বাদে এমন কিছু আছে, যাহা ইহাকে অন্য আম হইতে পৃথক্ বলিয়া জানায়। প্রসাদী সুর সুর বটে; কিন্তু ইহার মধ্যে এমন কিছু মোহিনী শক্তি আছে, যাহা শ্রোতাকে বড় বেশী মুগ্ধ করে। অনেকে আপত্তি করেন এই বলিয়া যে, রাম প্রসাদের অনেক সুর একরকমের, বড় একঘেয়ে। এ কথা সত্য, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, "প্রসাদী সুর" সব এক রকম—ইহা জানিয়াও যখনি রামপ্রসাদের প্রসাদী সুরের কোন গান শুনি, তখনি মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি না। এই ক্ষমতাটাই "প্রসাদী সুরের" বিশেষত্ব। এক সুরে অনেক গান শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সবগুলি মর্ম্মস্পর্শী হয় না। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের "জন্মভূমি"র সুরে অনেক গীতি রচিত হইয়াছে; কিন্তু তাহারা "জন্মভূমি"র মত মর্ম্মস্পর্শী হয় নাই। ইহার কারণ এই, সুরের সঙ্গে ভাষার তত ভাব হয় নাই—ভাবের অভাব,—অভাব না হইলেও, দৈন্য। ভাষা জোর করিয়া সুরের ছাঁচে ঢালা হইয়াছে; কাজেই, যে প্রতিমা হইয়াছে, তাহা নিখুঁত নয়; স্বাভাবিক সুরের সহিত কৃত্রিম ভাষার মিলন সুন্দর হয় না। তাই, যত চেষ্টা করিয়াই হউক, যত সুন্দর কথা বাছিয়াই হউক, তুমি "জন্মভূমির" সুরে গান রচনা কর না কেন, তাহা "জন্মভূমি" গানের মত মর্ম্মস্পর্শী ও আনন্দদায়ক হইবে না। অনুকরণ কখন আদর্শকে হারাইতে পারে না; যখন পারে, তখন জানিতে হইবে যে, সে আদর্শ আদর্শই নহে। "প্রসাদী সুরে" কত কবি কত গান রচনা করিয়াছেন; কিন্তু সেগুলি রামপ্রসাদী গানের মত হইয়াছে, বা তাহাকে হারাইয়াছে, ইহা কখনই বলা যায় না। "প্রসাদী সুরে" প্রসাদী গানই ভাল লাগে, অর্থাৎ "প্রসাদী সুরে" রামপ্রসাদের মত পবিত্র চিন্তাপ্রসূত গান বা সাধনসঙ্গীত সুন্দর লাগে। গোঁফ-দাড়ীওলা বেটাছেলেকে মেয়ে-মানুষ সাজাইলে যেমন বিশ্রী দেখায়, "প্রসাদী সুরে" টপ্পা গান ঠিক তেমনি বিশ্রী শুনায়। "প্রসাদী সুরে" পবিত্র ভাব অতি সুন্দর ভাবে প্রকটিত হয়। এই জন্য রামপ্রসাদের গান "রামপ্রসাদী সুরে" গাহিলে এত ভাল শুনায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, ভাবে ও ভাষায়, ছন্দে ও

সুরে রামপ্রসাদ কম দক্ষতার পরিচয় দেন নাই। দার্শনিক ও উপদেষ্টা হিসাবে রামপ্রসাদ যেমন পূজনীয়, কবি ও গায়ক হিসাবেও তেমনি বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি। শক্তি-সাধনার অতি নির্ম্মল ভাব, অতি সুন্দর ভাবে বঙ্গসাহিত্যে তিনি প্রথম দিয়া গিয়াছেন। বিশ্বমাতৃত্বের মোহিনীমূর্ত্তি তিনিই প্রথম বঙ্গসাহিত্যে - গানে ও গাথায়— অঙ্কিত করেন। বঙ্গসাহিত্যোদ্যানে ভক্তিবারি সেচনে তিনি যে অতুলনীয় গীতিকুসুমরাজি প্রস্ফুটিত করিয়াছেন, তাহা সৌরভে চিরদিন বঙ্গভাষীর প্রাণ মাতাইবে; সৌন্দর্য্যে বাঙ্গালীর চিত্ত মুগ্ধ করিবে। রামপ্রসাদ যে স্রোত বঙ্গসাহিত্যে প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহার গতি চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে; নানা কালে, নানা কারণে সে স্রোত কখন বাতাহত সমুদ্রের মত আলোড়িত ও তরঙ্গায়িত, কখনো বা প্রশান্ত মহাসাগরের মত শান্ত ও গর্জ্জনবিহীন হইতে পারে সত্য; তথাপি তাহার গতি চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বিপদে ও দুঃখে, পীড়ায় ও যন্ত্রণায়, বিপদে ও দুর্দ্দিনে যখন মনের অন্ধকার জীবনের লক্ষ্যকে রাহুর মত গ্রাস করে, যখন মানব অধঃপতনের পথে উন্মাদের মত ছুটিতে থাকে, যখন অধর্ম্ম, অসত্য ও পাপের পঙ্কিল স্পর্শে দেহ মন-প্রাণ কলুষিত ও দূষিত হইয়া উঠে,—যখন মনে হয়, এ জীবন শুধু যন্ত্রণা, এ সংসার শুধু প্রতারণা, ঈশ্বর শুধু মূর্ত্তিমান্ অত্যাচার, তখন ভক্ত সাধক শ্রীকবিরঞ্জন রামপ্রসাদের অমর গান ও সুরের ধারা অমৃত-ধারার মত শ্রবণে বর্ষিত হইয়া, জীবনকে তৃপ্ত ও শীতল করিয়া তুলে; উজ্জ্বল আলোকের মত পতিত হইয়া সকল অন্ধকার দূর করে—আবার জীবনের লক্ষ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়; আবার মনে হয়, এ জীবন সুখের ভাণ্ডার, এ সংসার শান্তিনিকেতন, ভগবান্ আমাদের প্রিয়তম, জীবন-দেবতা! ভক্ত কবির গানের এই ক্ষমতা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যতদিন বঙ্গসাহিত্য জীবিত থাকিবে ততদিন রামপ্রসাদের গানগুলি বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবে, যতদিন বাঙ্গালী জীবিত থাকিবে, ততদিন অদ্বিতীয় কবি বলিয়া রামপ্রসাদের উদ্দেশে প্রণাম করিবে।

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(৪১)

সেই যে মনোরমা সে-দিন নিজের সমস্ত ইতিহাসটা শুনাইয়া দিয়া অবশেষে বলিয়াছিল, "এখন সবই তো তুমি জান্‌তে পারলে, লোকের কথায় নিজের মনকে আর খারাপ হ'তে দিও না। অন্যের পক্ষে যাই হোক, তুমি যার ছেলে, তাঁর ছেলের পক্ষে বাপের উপর একবিন্দু বিরুদ্ধ ভাব মনের কোণে আস্‌তে দেওয়াও অপরাধ। তিনি বাপের হুকুমে নিজেকে যে কতখানি সইয়েছেন অজু! আজ তুমি ছেলেমানুষ, বুঝবে না। কিন্তু আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি বাবা,—বাঁচিয়ে রেখে ঈশ্বর তোমায় ছেলের বাপ হ'তে দিন, তখন বুঝতে পারবে, এ কি ভীষণ ত্যাগ।" সেই-যে অজিতের মনের মধ্যে দেব-নির্ম্মাল্য-ধোয়া শান্তিজল ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, মনের সমস্ত অভিমানের কালী তাহার সেই জলের ধারায় ধুইয়া গিয়া তাহা যেন শিশির-ধৌত শতদলের মতই মুহূর্ত্তে বিকশিত ও সুবাসিত হইয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে একটা মধুর আবেগে অজিতের হৃদয় মন পূর্ণ হইয়া গেল। দিনান্তের স্বর্ণালোক তাহার ভবিষ্যতের আশাটাকে যেন স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া তুলিল। কি সুন্দর পৃথিবী, কি আলোকোজ্জ্বল আকাশ-বাতাস; যেন সুগন্ধি বাসরের মত দেহ-মনের সকল ক্লান্তি হরণ করিয়া লইয়া গেল রে! এত শোভা এত দিন কোথায় লুকাইয়া ছিল?

যে মুসলমান ফকিরটা প্রায় প্রতিদিন ভিক্ষা করিতে আসে, নিজের বাঁধা বুলি, "আল্লাকে নামকো চাউল, মহম্মদকো নামকো পয়সা, খোদাকো নামকো রোটি—দিলা দেগা, ভালা হোগা"—বলিতে-বলিতে দ্বারে আসিয়া

দাঁড়াইতেই অজিত কোথা হইতে তিন লাফে আসিয়া তাহাকে একটা সিকি ফেলিয়া দিয়া, আশীর্ব্বাদের সঙ্গে-সঙ্গে সমান ওজনে গাল ভরা হাসি লইয়া ফিরিয়া গেল।

ভক্তি এতদিন শুধু উপদেশের বাণীতেই নিবদ্ধ ছিল, আজ সে বাস্তব সত্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, তাই সমুদয় জগৎ সংসারের উপর হইতেও যেন আবরণ খসিয়া গিয়াছে। চিরপরিচিত পৃথিবীর সমস্ত তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা অন্তর্হিত হইয়া গিয়া, পশু পক্ষী, গাছপালা, পথের জনতা, সকলই আজ আবার পূর্ব্বের মতই—কি তদপেক্ষাও অভিনবত্বে অপরূপ হইয়া উঠিল। এই বিশ্ব ব্যাপী সৌন্দর্য্য-সাগরে সে যেন ডুবিয়া বিভোর হইয়া রহিল, এবং উচ্চ আশার রাগিণীতে বাঁধা তাহার মনোযন্ত্রের সমস্ত তার-গুলা খুব উচু সুরেই ঝঙ্কৃত হইতে থাকিল। এই ভাবাবেশে মধুমণি গাইকে ও তাহার 'বুধী' বাছুরকে অনেক দিনের পরে সে খুব একচোট আদর করিয়া তাহাদের ইংরেজী কবিতায় মধকটা আদ্যোপান্ত শুনাইয়া দিয়া আসিল। রামুদা' মরিয়া গেলে যে পাচু কৃষাণ তাহার স্থলে কাজে বাহাল হইয়াছে, তাহার সঙ্গে খানিকটা হিন্দী সম্বন্ধে আপন মনে বকিয়া, অনেক দিনের অনাদৃত চন্দনাটার ল্যাজ ধরিয়া টানিয়া তাহাকে 'গোপীকৃষ্ণ কহো' বলাইয়া, এমন কি, গম্ভীর-প্রকৃতি দিদিমাকে শুদ্ধ যা তা বলিয়া হাসাইয়া যেন এত দিনকার অকারণ গাম্ভীর্য্যের শোধ তুলিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই সঙ্গে নীরবতার নৈঠুর্য্যে হানা বাড়ীর মত থমথমে সমস্ত বাড়ীখানার ঘনীভূত বিষাদ যেন এক মুহূর্ত্তে শরৎকালের লঘুগতি পুঞ্জ মেঘের মত কোথায় উড়িয়া চলিয়া গিয়া, তাহারই দিকে পুলকোচ্ছ্বসিত শিশু কণ্ঠের স্বর্ণবীণার অলোকিক সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সে দিনের সমস্ত পড়াশোনায়, আহার নিদ্রায় কি অসীম আগ্রহ, কি মধুর শান্তিই বর্ষিত হইতে লাগিল। তার পর বায়, কেবল আগ্রহ উদ্দীপনার ভিতরে ভিতরে বুকের মধ্যে শুনিবার তীব্র বাসনা। আত্মগ্লানি প্রবাহিত হইতেছিল,

রামপ্রসাদের গানের সুর ধরিয়া বিচার করিয়া দেখিতে পারা যায় না। একবার এসমস্ত প্রাণটা তাহার যেন শুনিয়াছিলাম, "আমের মধ্যে যেমন এত-খানি মহত্ত্বকে মধ্যে তেমনি প্রসাদী সুর।" কথাটা নিকদর্য্য, কত খানি আম অনেক রকমের আছে, সুরওয়ালা লজ্জায়, ঘৃণায়, সে যেন মরিয়া যাইতে লাগিল; এবং যে মা তাহাকে এই অধঃপতনের পথ হইতে ফিরাইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে সে বারম্বার প্রণাম করিল। রাত্রে বিছানায় শয়ন করিতে গিয়া, মাকে পূর্ব্বের মত একবার জড়াইয়া ধরিয়া, তাঁহার বুকের ভিতর ঢুকিয়া শুইল। ছেলের মনের ভাব বুঝিয়া মনোরমা শান্ত চিত্তে একটু হাসিল এবং তাহার বক্ষ মথিত করিয়া একটি দীর্ঘ তপ্তশ্বাস উত্থিত হইল।

(৪২)

বাজ পড়া তালগাছ যেমন বাহিরে স্থির থাকিয়া নিঃশব্দে পুড়িয়া যায়, প্রবল অভিমানের আগুন বুকের মধ্যে জ্বালাইয়া লইয়া ব্রজরাণীও ঠিক তেমনি করিয়া রহিল। এ অভিমান কাহার উপর? এ প্রশ্নের উত্তর করিলে সে নিজেই বোধ করি সব-চেয়ে বিপদে পড়িত। মনের এই যে নৈরাশ্য ও বেদনা, এবং ইহার ফলে প্রসূত এই যে দুর্জ্জয় অভিমান, ইহার লক্ষ্য যে কে, সে কথা হয় তো সে নিজেও ভাবিয়া দেখে নাই। তবে খুব সম্ভব, ভৃগু-ঋষিই ইহার মূল। তাঁহার ব্যবস্থাপত্রখানা ফিরিয়া ফিরিয়া যতবারই পড়িল, ততবারই যেন সেখান হইতে হাজারটা ভীমরুল উড়িয়া আসিয়া সহস্রটা বিষাক্ত হুল ফুটাইয়া দিয়া, তীব্র বিষের যন্ত্রণায় তাহার শরীর মনকে বিষাক্ত করিয়া দিল।

নিজের নিঃসহায় অবস্থায় অস্থির হইয়া পড়িয়া ব্রজরাণী স্বামীর কাছে দিনে অমন পঁচিশ বারও নিষ্ফল নালিস করিয়া-করিয়া তাহার মুখের বিপুল ঔদাস্যে এতটু মাত্র পরিবর্ত্তনের রেখা বদল করিতে না পারিয়া রাগিয়া অভিমানে অধীর হইল। এবার কিন্তু নিজের নিঃসঙ্গাবস্থাতে কতকটা শান্তি লাভ করিয়া সে নিজের ঘরের বিছানা এমন করিয়া দখল করিল যে, যে অরবিন্দের মনটাকে দুই হাতে ধরিয়া নাড়া দিলেও তাহা নড়ে কি না বলিয়া সন্দেহ জন্মে, সেই মানুষেরও হঠাৎ একদিন এই নির্লিপ্ততা নজরে ঠেকিয়া গেল। বাহিরের ঘরে হয় বন্ধুবান্ধব লইয়া তাস-পাশার আড্ডা চালান, অথবা খবরের কাগজ ও বইয়ের গাদা লইয়া তন্মধ্যে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া থাকা, ইহাই অরবিন্দের জীবন-যাত্রার চিরাভ্যস্ত পদ্ধতি। এখানে বন্ধুর সংখ্যা বেশী নয়। পড়সী দু' তিনটি ক্রমে-ক্রমে আসিয়া জড় হইতেছিল। বেশীর ভাগই তাহারা দশাশ্বমেধে ভাগবৎ-কথা শুনিতে যায়। দৈবাৎ কোন দিন সন্ধ্যার পর

তাসের আড্ডা বসে। এখানে বই-কাগজই এক মাত্র সঙ্গী। এঁদের আশ্রিতবর্গের সঙ্গীহীনতা কখনই উপলব্ধি হয় না। নিজ-নিজ রুচি-প্রবৃত্তি অনুসারে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিলে, সৎ-অসৎ, হাস্যরসিক, গাম্ভীর প্রকৃতিক, নাস্তিক, আস্তিক সর্ব্বপ্রকারেরই সহচর পাওয়া যায়। তথাপি ইহারই ফাঁকে-ফাঁকে হঠাৎ দৈবক্রমে মানুষের মন কোন একটা সময় হয়ত জীবন্ত একটা অতি সাধারণ মানুষের বিচিত্রতাবিহীন একটু সাহচর্য্যের লোভে এমন চঞ্চল হইয়া উঠিতে পারে, যখন স্বদেশীয় অথবা বৈদেশিক মহামহোপাধ্যায়গণের আশ্চর্য্য গুণগরিমা তাহার সেই শিক্ষিত চিত্তকে বাঁধিতে পারে না।

অরবিন্দের হঠাৎ সেদিন মনটা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। বই ফেলিয়া একা বসিয়া বসিয়া শরতের কথাই সে ভাবিতেছিল। তাহাকে মনে করিতে মনের মধ্যটা সুখের আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছিল। আবার তাহার সহিত এই বিচ্ছেদের স্মৃতি মনে জাগিয়া পীড়িত এবং ব্যথিত করিয়াও তুলিতেছিল। একটি-একটি করিয়া কত দিনের কত কথাই মনে আসিল। যেদিন নিতাইএর সঙ্গে কনে দেখিতে সে বর্দ্ধমানে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া শরতের শ্বশুরবাড়ী গিয়া দেখা করিয়া বলে, "ঐ মেয়েটী যদি তোদের বউ হয়, তোর নিশ্চয় খুব পছন্দ হবে। অমন কখ্‌খন আর পাবিনে, তা আমি তোকে ব'লে দিচ্চি।"

শরৎ দুষ্টু-দুষ্টু হাসি হাসিয়া, মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিয়াছিল, "বউএর উপর যদি তোমার চাইতে আমার দাবী বেশি ক'রে করিয়ে দাও, তা হ'লেই আমি ঘটকালী করি।"

অরবিন্দ অবশ্য তখনই এই সর্ত্ত আগ্রহের সহিতই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল,—বিশেষ কিছু না ভাবিয়াই। কিন্তু তাহাদের জীবনে এ অঙ্গীকারকে তাহাদের অন্তর্যামী যে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই কথাটাই শুধু আজ বলিয়া নয়, অনেকবারই অরবিন্দের স্মরণে আসিয়াছে। আজ আবার তাহাই মনে করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পতিত হইল। আর একটা দিনের কথা;—ব্রজরাণীকে বিবাহ করার পর, দ্বিতীয় বৎসরের প্রারম্ভে, তৃতীয়বার একজামিনে ফেল করিয়া, সে যখন পিতার আদেশে পড়া ছাড়িয়া চাকরী আরম্ভ করিল, এবং বধূকে লইয়া হাবড়ার বাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করিয়া দিল, তখনকার তাহাদের কি একটা ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া, শরৎ একদিন কঠিন কণ্ঠে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল, "তার সেই দুর্দ্দশা ক'রে একে যে এমন মাথায় তুলে নাচাচ্চো, জিজ্ঞাসা করি, অধর্ম্মেরও কি একটা ভয় হয় না?" অরু তখন হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, "তা হ'লে তোর মতে, তার যখন দুর্দ্দশা করেচি, অতএব এরও তাই করা উচিত,—এই না? আরব্য উপন্যাসের বাদশার মতই দেখছি তোর মনটা! সে ভদ্রলোক তার সব ক'টা বউএরই এক দশা করেছিল;—রাত্রে বিয়ে এবং সকালে খুন! এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানোর চাইতেও একটুখানি বেশি।" শরৎ বলে, "না, তা আমি বলছিনে যে, একেও তুমি তার মতন ত্যাগ করো। কিন্তু তা ব'লে একে তুমি যদি এমন করেই মাথায় তোলো;—তা হ'লে তার প্রতি তোমার ব্যবহারটাকে ইচ্ছাকৃত,—অতএব মনুষ্যত্বের বিরোধী বলে—লোকের মনে সন্দেহ আসবে যে!" অরবিন্দ সে কথার কণ্টকটুকু স্বীকার করিয়া লইয়া প্রতিপ্রশ্ন করিল "একে আমি পায়ে ফেলে রাখলে, তার দুঃখের এককণাও কি তফাৎ হবে?" "তা হবে না, কিন্তু—" "তা হ'লে অনর্থক আমার পুণ্যের ভরাখানা ভরিয়ে তোলায় লাভ?"

এই পর্য্যন্ত আলোচনার পর শরৎ হঠাৎ গভীর উচ্ছ্বাসে "দাদা গো, তোমার পায়ে পড়ি, অন্ততঃ আমায় দেখিয়েও তুমি ওকে একটুখানি কম ভালবেসো;—আমি যে কিছুতেই সইতে পারি নে—" এই কথা বলিয়াই কাঁদিয়া উঠিয়া, মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজিতে-গুঁজিতে ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সে কথাও অনেকবারের মত আবার ফিরিয়া মনে আসিল। আরও কত দিনের কত কথা। এমনি করিয়া শরতের স্নেহময়ী স্মৃতি বুকের মধ্যে ভরিয়া লইয়া, তাহাকেই নাড়িয়া-চাড়িয়া সে অনেকখানি সময় কাটাইয়া দেয়। স্মৃতির মধ্যে তন্ময় হইয়া থাকা তাহার তো আজিকার অভ্যাস নয়। এই করিয়াই তো জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলা—যেগুলা শুধু বাস্তবেরই প্রধান উপভোগ্য—সেই গুলাই কাটিয়া গিয়াছে। আজ তো তবু তাহার পুরাতন খাতার খালি পৃষ্ঠাগুলা সমস্তই প্রায় ভরা।

শীতের দিনের মেঘলা বড় ক্লান্তিকর,—অস্বস্তিতে শরীরের সঙ্গে মনটাকেও সে যেন ঝাপ্‌সা করিয়া রাখে। ঘরের মধ্যে আলোর অভাব ক্ষণে-ক্ষণেই ঘটিতেছিল, এই বয়সেই

ক্ষীণদৃষ্টি, শিরঃপীড়াগ্রস্ত অরবিন্দের নজর বইএর লেখায় বাধিত হইতে লাগিল। চিন্তাও ক্রমে গুরুভারগ্রস্ত বোধ হইল। বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই, বৃষ্টি অধ্যুষিত রাজপথ ও পথিপার্শ্বের কেদাক্ত আর্দ্রতা তাহার ভারাক্রান্ত চিত্তটার উপর যেন গো যান চক্রের মথিত কর্দ্দমের ন্যায় ছিট্‌কাইয়া আসিয়া পড়িল। দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া, ঘরে ফিরিয়া ঢুকিতে গিয়া হঠাৎ মনে হইল, আজ ভোরবেলা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসার পর হইতে ব্রজরাণীকে সে আর একবারও দেখিতে পায় নাই। ব্রজরাণীকে দেখিবার জন্য সে যে কিছু ব্যস্ত ব্যাকুল থাকে, এমন সন্দেহও তাহার মনের মধ্যে কোনদিনই ছিল না, অথবা সে সন্দেহোদয়ের অবসরও কোনদিন ঘটে নাই। অপ্রাপ্য বা আয়াসলব্ধ বস্তুতেই মানুষ লব্ধ হয়। কিন্তু অরবিন্দের এই দ্বিতীয়া বধূটি তাহার পক্ষে প্রাংশুলভ্য ফল নহেন,—নিতান্তই অনায়াস-প্রাপ্ত ঘাড়ের বোঝারূপেই সে ইহাকে ঘরে আনিয়াছিল। তার পর সেই মাথার মোটকে সে যে সহনীয় এবং বহনীয় করিয়া লইতে পারিয়াছে, সে কেবল তাহার অনন্যসাধারণ ধৈর্য্য-সহায়েই। যাই হোক্, গুণপনা ইহাতে যাহারই থাক্, মোট কথা, অরবিন্দ এই স্ত্রীটিকে যত বেশি আদরে করিয়া তুলিয়াছিল, তত বেশি আদর করিবার প্রয়োজন তাহার কোনদিনই হয় নাই। এক-একজন মানুষ যেমন কেবল মানুষ চরাইবার জন্যই জন্মায়, ব্রজরাণীও জন্মগত সেই রকম কর্ত্তৃত্বের একটা শক্তি লইয়া আসিয়াছিল। কেহ তাহাকে সে অধিকার দিক না দিক্, সে লোককে চালাইবার ন্যায্য অধিকার নিজের জোরে দখল করিয়া বসিবেই বসিবে, —ঠেকাইতে কেহ পারিবে না। অতএব, ইহার সহিত বিদ্রোহ না করিয়া সান্ধতে কাটানই শ্রেয়ঃ।

অরবিন্দ স্ত্রীকে চিনিয়া এই নীতির আশ্রয়েই এতদিন কাটাইল। সে দেখিল, ব্রজরাণী তাহার আদর-অনাদর কোন কিছুরই প্রত্যাশা না রাখিয়া, নিজের অপ্রতিহত শক্তিতে, নিজের অধিকার অনধিকার নির্ব্বিচারে যেমন সবার উপর, তেমনি তাহার উপরেও দখল লইয়া বসিল। এ লইয়া চেঁচামেচি করিতে গেলেই যে সে, তাহার হক্-সীমানা বলিয়া যেটাকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া দিবে, এমন কোন প্রমাণ তাহার কোন আচরণেই প্রমাণ হয় নাই। সে বিনা বাধায় তাহার আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইল। মেয়েরা অন্তঃপুরে গালে হাত দিয়া এবং পুরুষেরা সদরে গলা ছাড়িয়া, উচ্চকণ্ঠে তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—"একেবারে ভেড়া বনে গ্যাছে!" "এতটা যে বিদ্যে বুদ্ধি, সবই কি না ঐ রাতুল চরণে ডালি দিলে!—অরবিন্দ এ করলে কি!" এই বলিয়া কোন-কোন হিতৈষী আক্ষেপও করিতে লাগিলেন।

অরবিন্দ শুনিয়া তাহার কোন এক বন্ধুর কাছে কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিল,—"আর একদিন ঐ উনিই আবার বলেছিলেন যে, এতটা বিদ্যে শিখে নিজের ধর্ম্মপত্নীটাকে কি না অমন ক'রে বিদায় ক'রে দিলে,—অরবিন্দটা এত বড় পাষণ্ড! ওঁদের যখন ক্ষণে ক্ষণে এমন মত বদলায়, তখন এর উপায় তো আমি কিছুই দেখ্‌তে পাইনে।"

তা, এই নতুন গৃহিণীর কর্ত্তৃত্ব তাহার এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, কোন দিন তাহার সঙ্গলিপ্সা মনে জাগাইবার প্রয়োজনই উপস্থিত হয় নাই। ব্রজরাণীই যে উদয়াস্ত তাহার পিছনে ছায়ার মত ঘুরিতেছে। বরং কত সময়ে, ইহার দৃষ্টি এড়াইয়া একটুখানি নিঃসঙ্গ হইবার জন্য নিরালার সন্ধানে সে আস্থির হইয়াছে।

আজ শীতশীর্ণ গাছপালার উপর, কর্দ্দমাক্ত পথপানে, জলকণা বিশোভিত বারান্দার দিকে চাহিয়া, যখন তাহার মেঘাচ্ছন্ন চিত্ত অধিকতর বিমর্ষতায় ভরিয়া উঠিল, তখন এই বাড়ীরই আর একটি নিঃসঙ্গ জীবের কথা তাহার সহসাই স্মরণ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, দিনের মধ্যে না হোক পাঁচ-সাতবারও যে অন্দর ও বাহিরের ঘরকে এক ক'রে, সে আজ একটিবারও তো তাহার তত্ত্ব লইতে আসে নাই। তখন মনে পড়িল, আজকাল কিছুদিন হইতেই সে আসে না। আবার এও মনে হইল, প্রায় দিন চার পাঁচ তাহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তাও কই বড় একটা হয় নাই। কোন কিছু লইয়া ঝগড়া হইয়াছিল কি? স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলেও স্মরণে আসিল না। তবে একবার খবর লওয়া উচিত তো।

ব্রজরাণী ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, বোধ করি কড়িকাঠই গুণিতেছিল, কি, কি! অরবিন্দ ঘরে ঢুকিয়া তাহার দিকে চাহিতে, ঊর্দ্ধ দৃষ্টি অধঃ নামাইয়া আনিয়া, সে ক্লান্তভাবে একটুখানি হাসিল। সেই হাসিটুকুর মাঝখান দিয়া অরবিন্দ সাশ্চর্য্যে দেখিল, উহার ভিতরটা

যেন তাহা অপেক্ষাও পরিশ্রান্ত, অবসন্ন। অবসাদের চরম গহ্বরে গড়াইয়া না পড়িলে মানুষের ঠোঁট দিয়া অমন হাসি ব্যক্ত হইতে পারে না। বিশেষ যারা রূপৈশ্বর্যের মহামানে মণ্ডিত এবং যৌবন নিজের প্রখর জ্যোতিঃ যাহাদের শরীর মনে সহস্র ধারায় ঢালিয়া দিয়া, দীপ্ত শিখায় সূর্যের মত জ্বালাইয়া রাখিয়াছে! অরবিন্দ অগ্রসর হইয়া ডাকিল, "কি রাণি, এমন সময় শুয়ে যে!"

ব্রজরাণী কহিল, "আমার আবার সময় অসময় কি?" "অসুখ-বিসুখ তো করে নি?" "আমি রাজা-রাজা মানুষ, আমার আবার অসুখ কি করবে?" "তবে অবেলায় চুপটি ক'রে শুয়ে আছ কেন?" শ্রান্ত স্বরে রাণী জবাব দিল—"কাজ কই?"

অরবিন্দ একটা চৌকি টানিয়া বসিয়া বলিল, "কাজের আবার অভাব কি? সেই যে কি সব শলমার কাজ-টাজ করছিলে, সে সব হ'য়ে গেছে?"

ব্রজরাণী ক্লান্তভাবে চোখের উপর একটা হাত চাপা দিয়া উত্তর করিল—"কি হবে সে সব ক'রে?"

অরবিন্দ বলিল, "কি হবে কেন? বালিগঞ্জের নতুন বাড়ী সাজাবে না?"

ব্রজরাণী অদৃষ্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনশ্চ জবাব দিল, "কি দরকার? আমার কিছু দরকার নেই। মরে গেলে যার পিছনে চাইবার কেউ কোথাও নেই, তার আবার—" কথাটা শেষ না করিয়াই সে বক্ষোত্থিত দীর্ঘ নিশ্বাসটাকে চাপা দিতে গিয়া, নড়িয়া চড়িয়া কপালটা টিপিয়া ধরিয়া, একটু চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়া সেটাকে শেষ করিয়া দিল। স্বামীকে আপন ভাবিয়া আপনার এই অপ্রতিবিধেয় দুঃখের অংশ সে ভাগ করিয়া লইতে কুণ্ঠিতই হইত। স্বামী তো তাহার একার নহেন! বিশেষ ব্রজরাণীর দুঃখের সহিত সহানুভূতি তাঁহার কিসের? নিজে তিনি অপত্যবান্। তাহার এ দুঃখ তিনি কখন বুঝিতে পারেন? বরং হয় ত তাহার এই নিঃসঙ্গ মাতৃবক্ষের ব্যাকুল বেদনা অনুভব করিয়া মনে-মনে একটা বিদ্বেষের সুখানুভবে বিদ্রূপের হাসিই হাসিবেন, এই মনে করিতেই তাহার মনের ইন্ধনে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নিজের প্রকাশমান দুর্ব্বলতায় সে মর্মান্তিক রূপে নিজের উপরেই চটিয়া, দশনে অধর চাপিল।

অরবিন্দর মনে কিন্তু সে সময় প্রতিশোধ-স্পৃহা বিন্দুমাত্র জাগে নাই; বরঞ্চ, ইহার এই সঙ্গাহীন, নৈরাশ্য-ব্যথিত জীবনের ভারটা তাহার অন্তরে যেন কতকটা চাপিয়া ধরিয়া, ইহার প্রতি তাহাকে সহানুভূতিসম্পন্নই করিয়াছিল। সরল মনেই তাই সে প্রসঙ্গান্তর আনিয়া ফেলিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তোমার ভৃগুসংহিতা আমায় দেখালে না যে!" উত্তর না পাইয়া এবার রঙ্গ করিবার জন্যই হাসিতে-হাসিতে কহিল, "তা, না দেখাও গে,—আমি সব শুনে নিয়েছি। আর জন্মে তুমি রাণী ছিলে, আর আমি ছিলুম রাজা,—এই তো? আমি রাজা থাকি আর না থাকি, তুমি যে রাণী ছিলে তাতে ভৃগু প্রভৃতি কেন, আমারও সন্দেহ নাস্তি। রাণী ব'লে রাণী!—মহারাণী!"

তখন সেই আষাঢ় মেঘের মত ব্যথা-ভারাতুর চিত্ত চিরিয়া বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় শ্লেষের হাস্য প্রকাশিত হইল। সলজ্জ, সপ্রেম দৃষ্টি স্বামীর মুখে স্থাপন করিয়া, কৃত্রিম কোপে রাণী সবেগে কহিয়া উঠিল, "আ, কি যে তুমি বলো? তুমি রাজা ছিলে না, আর আমি ছিলুম রাণী, তাই না কি আবার হয়। সে তা হলে বোধ করি চাকরাণী কি মেথরাণীই না হবে।"

অরবিন্দের হৃৎপিণ্ডটা কে যেন বিপুল বলে টানিয়া ধরিল। ঠিক এই কথা কথাই সে আর এক রকম ভাষায়, আর এক দিন, আর একজনের মুখে সে শুনিয়াছিল।

(৪১)

ভৃগুসংহিতার ব্যবস্থামত যাগযজ্ঞের কোন উদ্যোগ আয়োজন করিতে ব্রজরাণীর আগ্রহ দেখা গেল না। বরঞ্চ, তাহার বাপের বাড়ীর পুরোহিত কালীঘাটে কি সব হোম-যাগ করিতেছিলেন,—তাঁহাকে পত্র দিয়া এই কথা লিখিল যে, "ভাবিয়া দেখিলাম, বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে লড়াই না করাই ভাল। অতএব ও সকলে প্রয়োজন নাই।" ভৃগুসংহিতাখানা কাপড়ের টাঙ্কের মধ্যে রক্ষিত ছিল, খুলিতেই চোখে পড়িল। সাভিমানে চোখ ফিরাইয়া বোধ করি ভৃগুঋষিকেই শুনাইয়া বলিল, "কাজ নেই আমার এত সৃষ্টি করে, একটিবারের জন্য মা হয়ে। আমার পোড়া কপাল আমারই থাক। আমি আর কারু দয়া চাই নে।"

একদিন কোথাও কিছু নাই,—অকস্মাৎ ঝড়ের মত বাহিরের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া ব্রজরাণী কহিয়া উঠিল,

"ওগো, শীগ্‌গির করে ঠাকুর-জামাইকে একখানা তার করে দাও। বেলার বড্ড অসুখ করেচে।"

অরবিন্দ চমকাইয়া উঠিল, "কি হয়েছে তার?"

"জ্বর। ওগো, বড্ড জ্বর তার।"

"টেম্‌পারেচার নিয়েছিলে? কত উঠ্‌লো?"

ব্রজরাণী কহিল, "সে তেমন বেশি নয়;—তবে বেশি হ'তে কতক্ষণ।"

অরবিন্দ বলিল, "তবু কতটা হলো শুনিই না।"

"এই। নিরেনব্বুই পয়েণ্ট ছয়। সর্দ্দিও খুব আছে,—একটু-একটু কাসচেও।"

অরবিন্দ। এই? আমি বলি না জানি কি! তা এর জন্য জগদিন্দ্রকে তার না করে, সোজাসুজি ঈশান ডাক্তারকে ডাকতে পাঠালেই তো চুকে যায়।"

ব্রজরাণী নির্ব্বন্ধ সহকারে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, "ওগো, না-না, রোগকে তুমি অত সোজা মনে করো না। পরের মেয়ে নিয়ে এসেছি,—একটাকে তো মেরেই ফেলেছি, শেষকালে কি হ'তে কি হয়ে যাবে। তুমি বাবু ওর বাপকে খবর দিয়ে দাও।"

সেদিন ঈশান ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিয়া, তাঁহার মুখে সামান্য সর্দ্দি-জ্বরমাত্র খবর শুনিয়া, অরবিন্দ বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল বটে, কিন্তু নিষ্কৃতি পাইল না। মধ্য রাত্রে ঘুম ভাঙ্গাইয়া ব্রজরাণী কাঁদো-কাঁদো গলায় বলিল, "অত করে বল্লুম—তুমি আমার কথা তখন শুনলে না,—এখন জ্বর যে এই বাড়চে, কি আমি করি? কেনই যে মরতে পরের মেয়ে নিয়ে এলুম। ঠেকেও শিখলুম না। আমার যেমন মরণ নেই!" অরবিন্দ ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া, চোক রগড়াইতে-রগড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল, "জ্বর কি বড্ড বেশি বেড়েচে? কি করচে সে? ছটফট করচে কি বেশি?"

ব্রজরাণী অধীর হইয়া কহিল, "ছট্‌ফট করবে কেন, একেবারে নিঝুম হয়ে রয়েছে। জ্বরও খুব বেশি বলে মনে হচ্চে,—তুমি একবার দেখতেই এসো না।" এই বলিয়া স্বামীকে পাশের ঘরে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। সেখানে নেয়ারের খাটে বেলা অঘোরে ঘুমাইতেছিল,—তাহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সহজ এবং স্বাভাবিক। মেঝের বিছানায় তাহার ঝি গভীর নিদ্রামগ্না। শুধু ব্রজরাণীর শয্যাটিই খালি। সে সমানে সন্ধ্যা হইতে ইহার মুখ চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া, পৌষ-রাত্রির দুর্জ্জয় শীত ভোগ করিয়াছে। অরবিন্দ ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভাগিনেয়ীর ললাটের তাপ পরীক্ষা করিল, নাড়ীর গতি দেখিল; তার পর উঠিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিল, "তুমি একটী আস্ত পাগল! কোথায় জ্বর বাড়চে? জ্বর তো নেই বল্লেই হয়। অমন স্থির হয়ে ঘুমুচ্চে, কেন মিথ্যে ওকে হেঁচড়া-হেঁচড়ি করচো। তার চাইতে চুপটি করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো দেখি। ওরও ভাল, আর তোমারও ভাল।"

"বলো কি তুমি! আমার চক্ষে আজ না কি ঘুম আসবে?" "তবে বসে শীতে হিহি করো,—আমি শুতে যাই।" এই বলিয়া অরবিন্দ চলিয়া গেল। নিজের বিছানা হইতে আর একবার ধম্‌কডাক দিয়া তাহাকে শুইতে বলিয়া, অনতিবিলম্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। ব্রজরাণী কিন্তু কোন যুক্তিই কাণে তুলিল না। গায়ে একখানা শাল জড়াইয়া, সে রোগীর সুপ্তিমগ্ন মুখের দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া বসিয়া, মনের মধ্যে অশেষবিধ অশান্তি উপভোগ করিতে করিতে প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল, যে, সকালে উঠিয়াই সে স্বামীকে না জানাইয়া, সকলের পূর্ব্বে টেলিগ্রাফ করিয়া জগদিন্দ্রকে আসিতে অনুরোধ করিবে এবং ঠাকুরদেবতার কাছে মনে-মনে নাকে কাণে খত দিয়া কাতর অনুনয়ে বারম্বার করিয়া বলিল, যে, এইবার তাঁহারা মেয়েটীকে বাঁচাইয়া দিন, নিশ্চিত সে ইহাকে ইহার বাপের কাছে ফিরাইয়া দিবে এবং আর কখনও এমন করিয়া পরের ছেলে-মেয়ের উপর লোভ করিতে যাইবে না। এই কথা তিন সত্য করিয়া বলিল, তাহার গায়ের বাতাসে যখন পরের ছেলের শুদ্ধ ক্ষতি লেখা আছে, তখন জানিয়া-শুনিয়া কেন সে এমন কর্ম্ম করিল? কেন, যে দিন এ খবর পাইয়াছিল, সেই দিনেই ইহাকে ফিরাইয়া দিল না? এত বড় কুমতি তাহার কেন, কেমন করিয়া হইয়াছিল, এই আশ্চর্য্য কথাটা আজ সে এই নিদ্রাহীন মধ্যরাত্রে মনের অজস্র আত্মগ্লানির মধ্য হইতে খুঁজিয়া পাইল না।

ফাল্গুন মাসে সরলার বিবাহোপলক্ষে সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ-পত্র আসিল। অরবিন্দ কোন কথাই কহিল না দেখিয়া, ব্রজরাণী নিজে-হইতেই বলিল, "বেলাকে নিয়ে তুমি যাও, আমি এখানে থাকি।"

অরু কহিল, "আমার এখন যাবার সুবিধে হবে না।" "তা হলে বেলাকে কে নিয়ে যাবে?" "সে ব্যবস্থা তারা কি আর না করবে?" অসীমার বিবাহের কাণ্ড মনে করিয়া ব্রজরাণী ভাল-মন্দ আর কোন কথাই কহিল না। কিন্তু তথাপি তাহাদের যাইতে হইল। জগদিন্দ্র যখন নিজে আসিয়া উপস্থিত হইয়া, সরলার মাতৃহীনতার দোহাই পাড়িল, তখন ব্রজরাণী আর 'না' বলিতে পারিল না। যাত্রার উদ্যোগ করিতে বসিয়া গেল। ইহা দেখিয়া অরবিন্দ আসিয়া বলিল, "তুমি যে ক' দিন থাকবে না, তারি মত সব বন্দোবস্ত করে রেখে যাও। আমি ও সব পেরে উঠবো না।"

ব্রজরাণী বিস্মিত হইয়া ট্রাঙ্কের কাপড়চোপড় হইতে চোক তুলিল, "সে কি! তুমি কি যাবে না?" অরবিন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না।" "কারণ?" "অনিচ্ছা।" হাসিমুখ আঁধার করিয়া রাণী গম্ভীর মুখে কহিল, "সেবারের কথা মনে করে যে তুমি আমায় দুঃখ দেবার জন্যে যেতে চাইচো না, সে আমি জানি। কিন্তু সেই জন্যেই এবার আমার যেতেই হবে সরলার যে মা নেই!"

অরু কহিল, "আমি তো তোমায় যেতে বারণ করচিনে।" স্বামীর শান্ত উদাসীনতার মধ্যে যে কত বড় বজ্রবল লুকান আছে, সে খবর ব্রজরাণী যত জানিত, অরবিন্দের অপর কোন আত্মীয়, পর, এমন কি তাহার গর্ভধারিণী জননী নিজেও ততটা জানিতেন কি না সন্দেহ। সে লজ্জিত, কুণ্ঠিত, বিরক্ত এবং এমন কি, ক্রুদ্ধ হইয়াই, মনের মধ্যে আপনাকে আপনি ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তুলিলেও, বাহিরে আর একটি কথাও ইঁহাকে বলিতে পারিল না; জানিত যে, বলিলে জবাব পর্য্যন্ত পাইবে না। এম্নি তাহার মান-অভিমানকে ওদাস্যের মৃদুমন্দ হাস্যে তুচ্ছ করিয়া দিয়া, হয় ত সারনাথ না হয় চুণার—এম্নি কোথাও একটা চলিয়া গিয়া, দিন দুই সেখানে কাটাইয়া আসিবে বৈ তো নয়।

যে ব্রজরাণী স্বামীকে ছাড়িয়া এক রাত্রির বেশী দুই রাত্রি বাপের বাড়ীতেও থাকিতে পারে না, সেই ব্রজরাণী যখন নন্দাইএর সঙ্গে তাহার বাটীতে নিমন্ত্রণ রাখিতে স্বামীকে ছাড়িয়া আসিল, তখন আর দশজনের মত নিজেও সে কম আশ্চর্য্য হয় নাই। কিন্তু যখন আসিবার দু'এক দিনের মধ্যেই সে জানিতে পারিল যে, তাহার এই আগমনের উদ্দেশ্য শুধুই মাতৃহীনা সরলার প্রতি সহানুভূতিই সবটা নয়, আরও একটা কারণ,—যদিও অত্যন্ত সঙ্গোপনে এবং হয় ত বা নিজেরও অজ্ঞাতেই—কখন কেমন করিয়া বলা যায় না,—মনের কোণে আশ্রয় লইয়া বসিয়া আছে—তখন ভীষণ লজ্জার তাড়নে সে অবশ্য নিজের কাছে নিজের এই দুর্ব্বলতাটুকু স্বীকার পর্য্যন্ত করিতে চাহিল না। অথচ এ লইয়া মনের মধ্যেও কোন আন্দোলন না তুলিয়াই, নিঃশব্দ ধৈর্য্যে শুধু উৎকর্ণ হইয়া, কাণ পাতিয়া, এবং উন্মুখ হইয়া চোখ মেলিয়া, যেখানে যেখানে ছোট ছেলেপুলের ভিড় দেখে, সেইদিকেই সব ফেলিয়া ছুটিয়া যায়। কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি চক্ষু, কর্ণাশ্রয়ী করিয়াও, উতলা বিমনা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াও, সেই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হইল না। সে যাহা শুনিতে এবং দেখিতে চাহিয়াছিল, সে নাম তো কই কাহাকেও লইতে শোনা গেল না; এবং দুই বৎসর পূর্ব্বের এমনি আর এক দিনের অন্তরীক্ষে দেখা একখানি মুখ,—এতদিন এত দেশে-বিদেশে ঘুরিয়াও ব্রজরাণী যে মুখের আর একখানি যোড়া পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই,—সেখানি তো কই তাহার পুলকিত দৃষ্টি পথে আর তেমনি করিয়া ভাসিয়া উঠিল না! সেই যে স্পর্শটুকু ছোট একটি পাখীর গায়ের পালকের মত গভীর অনিচ্ছা অবহেলার সর্ব্ব-প্রযত্ন চেষ্টাকে পরাভূত করিয়া আজও তাহার সমস্ত দেহ-মনকে রোমাঞ্চিত করিয়া আছে, আজও আবার যদি ঠিক তেমনি করিয়া সেইটুকু সে ফিরিয়া পাইত! অথচ এই সম্ভাবনাটা তাহার উন্মুখ চিত্তকে কতবারই না বিমুখ করিতেও ছাড়ে নাই।

অবশেষে থাকিতে না পারিয়া সে অসীমাকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁারে, বৰ্দ্ধমানে এবারে যে বলা হয় নি?" অসীমা বলিল, "হয়েছিল বই কি, মামী-মা! বাবা যে সব আগে নিজে বৰ্দ্ধমানে গিয়েছিলেন। তা বড় মামী-মা বল্লেন, 'অজিতের এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা—কি করে সে যাবে? আর তিনি নিজে তো আসতে ভালবাসেন না,—রাজী হলেন না'।"

শুনিয়া একদিক দিয়া ব্রজরাণীর মন যেন কি এক রকম তীব্র নৈরাশ্যে ফাঁক হইয়া গেল। মনে হইল, তাহার

আসার উদ্দেশ্যই যেন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে ; আর একদিক দিয়া নন্দায়ের উপর একটা অভিমানও আসিয়া পৌছিল।

তাই বটে! বড়-গিন্নির কাছে আমোল পান্ নি বলে, তখনই—এই ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো—আমার কথা মনে পড়েছে!

বিবাহের পরদিন বর-কন্যা বিদায় লইলে, বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়া ভাইকে বলিল, "দাদা, আমায় কাশী পৌঁছে দেবে চল।" মা বলিলেন, "সে কি রে রাণী! এই তো মোটে চারটি দিন এসেছিস। আমরা তোকে একদিন তো চোখ দিয়ে দেখ্‌লুমও না,—এরই মধ্যে তুই ফিরে চল্লি কি রে?" মিনতি করিয়া সে বলিল, "মা, আমায় যেতে মত দাও। আমার মন মোটে ভাল নেই। সেখানে ভারি কষ্ট হচ্চে যে!"

মা আর আপত্তি তুলিলেন না, দুঃখিত হইয়া নীরবে রহিলেন। দাদা একটু চিন্তিতভাবে একটা খটকা বাহির করিলেন, "আজই যাবি, তা'হলে রিজার্ভের কি করা যায়!" অধৈর্য্য হইয়া সে ইহাও খণ্ডন করিয়া দিল, "নাই বা গাড়ী রিজার্ভ হ'লো। তুমি আমায় অমনি নিয়ে চলো।"

অরবিন্দ উহাদের কাশীতে হঠাৎ দেখিয়া এতটুকুও বিস্ময় প্রকাশ করিল না, নিজের খেয়ালী স্ত্রীটিকে সে কাহারও চাইতে কম চিনিত না।

(৪৪)

বৈশাখ মাসে বালীগঞ্জের নূতন বাড়ী সম্পূর্ণ হইয়া গেলে গৃহ-প্রবেশ করিবার জন্য অরবিন্দকে কাশীর বাসা উঠাইয়া আসিতে হইল। প্রকাণ্ড একটি জমি লইয়া অরবিন্দের নূতন বাড়ী। সাম্‌নে সবুজ তৃণমণ্ডিত সমচতুষ্কোণ ভূমিখণ্ডের চারি পাশে বিবিধ বর্ণখচিত ফুলের বাগান, পিছনেও তাহাই এবং ইহার একদিকে সুন্দর একটা দীর্ঘিকা। এ ভিন্ন, বাটী ও পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি হইতে দূরে বৃহৎ-বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণী, নানাবিধ দেশ হইতে সংগৃহীত উপাদেয় ও দুর্ল্লভ-দুর্ল্লভ ফলকর বৃক্ষেরও অভাব ছিল না। অট্টালিকাটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে গঠিত, এবং সেইভাবেই সুচারুরূপে সজ্জিত। এই সুরম্য গৃহের গৃহকর্ত্রী রূপে, ইহার সবচেয়ে সুসজ্জিত অপূর্ব্ব চাকচিক্যময়, আলোকে-ঐশ্বর্য্যে উদ্ভাসিত দ্বিতলের বৈঠকখানা ঘরে দাঁড়াইয়া, ব্রজরাণীর দুই চোক জ্বালা করিয়া, তাহার বুকের ভিতরটা অকস্মাৎ যেন শূন্যতায় হা হা করিয়া উঠিল। অনেক সাধ করিয়া, এবং বিস্তর সাধ্যসাধনায় স্বামীকে সম্মত করাইয়া, একদিন সে এই বাড়ী তৈরি করাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু আজ এ সফলতার দিনে, ইন্দ্রপুরীতুল্য সাজান বাড়ীতে দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইল, ইহার কিছুমাত্র প্রয়োজন তাহার ছিল না। একেবারে অনাবশ্যক আড়ম্বরে সে যে অনর্থক অজস্র অর্থ অপব্যয় করিল, শুধু তাই নয়,—নিজেকেও সে এই সঙ্গে অনেকখানি বদ্ধ করিয়া ফেলিল। এই যে এখানে সে এই রাজৈশ্বর্য্যের সমাবেশ করিয়া তুলিয়াছে, এদের লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া জীবনের দিন কয়টা কাটাইয়া দিয়া সে পাইবে কি? কাহার জন্য এ সকল আয়োজন? যেদিন ভবের হাটে পাওনা দেনা মিটাইয়া দিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে, সেদিন এই পুঁজির রাশি কোথায় ফেলিয়া সে চোখ বুজিবে? এমন একটা দিনের ছবি তাহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল, যে দিনে সে বাঁচিয়া নাই। সে দিনও অবশ্য আর কাহারা তাহার এই সাধের নিকুঞ্জে নিবাস করিতেছে : কিন্তু ব্রজরাণীর নাম ইহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। ব্রজরাণীর রক্ত তাহার শিরা-ধমনীতে কাটিয়া কুচাইয়া দিলেও এক ফোঁটা বাহির করা যাইবে না। এই তো?

বাড়ীখানা তাহার যেন অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। স্বামীকে গিয়া বলিল, "এখন দিনকতক আমরা আমাদের হাবড়ার বাড়ীতে গিয়ে থাকিগে চলো।"

অরবিন্দ আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাঃ! এত খরচপত্র করে বাড়ী করলুম, এখানে না থেকে এখন হাবড়ার বাড়ীতে গিয়ে থাকবো কোন্ দুঃখে? হাবড়ার বাড়ী আমি ইস্কুলকে ভাড়া দেবার বন্দোবস্ত করে ফেলেছি।"

ব্রজরাণী বলিল, "না—না, তা করো না, বরং এইটেই যদি কেউ ভাড়া নেয় তো বরং—"

অরবিন্দ কহিল, "সে আর হয় না রাণি! আমার কথা আর ফেরে না।"—এই বলিয়াই সে চলিয়া গেল। ব্রজরাণীর পক্ষটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে কি? সে তো কই এলাইয়া কাঁদিতে বসিল না! (ক্রমশঃ)

মহীশূর—শ্রবণ-বেলগোলা

[শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি-সি-ই]

(২)

সোজা পথে চেন্নরায়পাট্‌না হইয়া শ্রবণ-বেলগোলা যাইতে হইলে অনেক সময় লাগে; পথটি কিকেরি বাহুল্যে হইতে দৈর্ঘ্যে ২১ মাইল। আর উষর, বন্ধুর, পার্ব্বত্য পথ দিয়া যাইতে অল্প সময় লাগে; ইহা দৈর্ঘ্যে ৮ মাইল মাত্র। শকটচালক এই পথ দিয়া যাইতে চাহিল। আমার কোন আপত্তি ছিল না; কেন না, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পৌছিতে পারা যাইবে। কিন্তু যদি জানিতাম যে, এই পথে যাওয়া, আর তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র-বক্ষের উপর গো শকটে যাওয়া একই প্রকার, এবং এই পথে যাওয়ার জন্য অস্থিপঞ্জরের ব্যথা মরিতে কিছু সময় লাগে, তাহা হইলে আমি এ পথে যাত্রায় কিছুতেই স্বীকৃত হইতাম না। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাইবে? বিহার প্রবাস-কালে অনেকবার "বিঘোরে" একা চড়িয়াছি; কিন্তু সে কষ্টে আর এ কষ্টে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সে কষ্টভোগের পর যখন আম, শিশু ও তালবৃক্ষের ছায়া-শীতল কুঞ্জে সন্নিবেশিত শিবির বা তাম্বুর মধ্যে আমার দেহযষ্টি অপেক্ষা ক্ষুদ্র চারপাইয়ের উপর শায়িত হইয়া প্রভুভক্ত উড়িয়া ভৃত্য ও অজাতশত্রু ব্রাহ্মণ বালক বা "মহারাজ"-কুমারের সহিত আপনার সুখদুঃখের গল্পে বিভোর হইতাম, কিম্বা প্রত্যহ ভাত ও অড়হর ডালে অনভ্যস্ত জিহ্বাকে বিশ্রাম দিবার বৃথা পরামর্শ করিতাম, তখন গাত্র-বেদনা কোথায় পলাইত। কিন্তু এ যাত্রার বেদনা দূর করিতে, সেই বিহারের প্রভুভক্ত উড়িয়া ভৃত্যটি সহযাত্রীস্বরূপ থাকিলেও, বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

কিয়দ্দূর যাইতে-না-যাইতেই বুঝিতে পারিলাম যে, এ পথে আসিয়া বিষম ভ্রম করা হইয়াছে। মাঠের উপর দিয়া শকট চলিতেছিল; যে বর্ত্মে ইহা চলিতেছিল, তাহাকে পথ বলা যায় না। কখন উচ্চে যাইতেছে, কখন নিম্নে চলিতেছে, কখন বা ইতস্ততঃ অবস্থিত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড প্রস্তরের উপর বা পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় শকটটা উল্টাইয়া যাইবার মত হইতেছে। আমার ত পঞ্জরাস্থিগুলি ভাঙ্গিয়া যাইবার মত বোধ হইতে লাগিল; এবং উদরে বিষম বেদনা বোধ করিতে লাগিলাম। একবার ত বাক্স, তোরঙ্গ, বিছানা-পত্র সমস্ত গায়ের উপর আসিয়া পড়াতে, বিষম বেদনা পাইলাম। এ স্থানটী সৃজন করিবার সময় বোধ হয় প্রকৃতিদেবী বিশেষ অন্যমনস্কা ছিলেন; নয়নাভিরাম ত কিছুই দেখিলাম না। অনেকক্ষণ যাইবার পর দূরে দিগ্‌বলয়ে নীলাভ অস্পষ্ট পদার্থ দেখিয়া অনুমান করিলাম যে, পর্ব্বত না হইয়া যায় না; ক্রমে অনুমান সত্যে পরিণত হইল। দূরবীক্ষণ-যন্ত্র বাহির করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া, বিফল-মনোরথ হইতে হইল। সে প্রকার নড়াচড়ার মধ্যে সাধ্য কি যে যন্ত্রটিকে ঠিক রাখিতে পারি। চারিদিকে ধূসর ক্ষেত্র,— বন্ধুর, কঙ্করময়; শ্যামলতার চিহ্নও দেখিলাম না। মাঝে-মাঝে রাখাল-বালক মেষ চরাইতেছে। কোনও স্থানে কতিপয় বালক একত্র হইয়া ক্রীড়া কিম্বা বিশ্রাম-কৌতুকে সময় কাটাইতেছে; এবং আমাদের মত অপরিচিত বিদেশী যাত্রী এ ভীষণ পথে কোথায় যাইতেছে ভাবিয়া, নির্নিমেষ নেত্রে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে।

এ প্রকার বৈচিত্র্যবিহীন দৃশ্য আমার আদৌ ভাল লাগিতেছিল না। সুখের বিষয়, পর্ব্বত বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল; এবং কিয়ৎক্ষণ পরে এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তির মত এক অস্পষ্ট পদার্থ দেখিতে পাইলাম। পর্ব্বতটির গাত্র নগ্ন,—বৃক্ষলতাদির চিহ্ন নাই। পূর্ব্বে জানা ছিল যে, পর্ব্বতের উপর গোমতেশ্বরের বিরাট মূর্ত্তিটি বহুদূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বোধ হয়, ইহাই সেই মূর্ত্তি হইবে। শকটকে স্থির করাইয়া, দূরবীক্ষণ-যন্ত্র সহকারে দেখিয়া লইলাম। একবার দূরবীক্ষণের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া লইবার পর, শকট চলিলেও, মূর্ত্তিটিকে দৃষ্টিপথ হইতে হারাইয়া ফেলি নাই। গোমতেশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ের যে ভাব হইয়াছিল, আমি তাহার বর্ণনা করিতে অক্ষম। কতদিনের কামনা আজ চরিতার্থ হইবে ভাবিয়া পুলকে আবিষ্ট হইলাম। বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আমিই যে এ-স্থানে আসিতে সমর্থ

হইলাম, সে চিন্তায় হর্ষগর্ব্বভরে হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; পথশ্রমের সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। তখন হৃদয়ে যে আনন্দের অমৃতধারা বহিতেছিল, তাহাতে বোধ হইতেছিল—

"দিখিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত; বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটি' এ পাষাণ বন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধকারাগার,—হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকীরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া, আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে।"

আনন্দে অধীর হইয়া যখন এপাশ-ওপাশ ফিরিয়া মূর্ত্তিটি দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, তখন শকটচালক মহাব্যস্ত হইয়া পড়িল;—এ প্রকার নড়াচড়ায় বৃষদ্বয়ের কষ্ট হইতেছিল। ক্রমে-ক্রমে কঙ্করময়, আবাসহীন পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রম করিয়া মনুষ্যালয়ে প্রবেশ করা গেল,—চেন্নরায় পাটনার পথে আসিয়া পড়িলাম। শকট এখন সোজা পথে চলিতে লাগিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই এক সরোবরের তীরে আসিয়া পৌঁছিলাম। ইহার কথা পরে বলিব। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, এখানে থাকিবার জন্য সুন্দর জৈন ধর্ম্মশালা বা ছত্র আছে। খুঁজিয়া-পুঁছিয়া শকট লইয়া সেই ধর্ম্মশালার দিকে চলিলাম। ইহা একটি দ্বিতল বাটী এবং এখানে সে সময়ে অন্যান্য জৈন যাত্রী ছিল। যে প্রকোষ্ঠে থাকা নিরাপদ, তাহার চাবি পাওয়া যাইতেছিল না বলিয়া, আমি সে গ্রামের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তির নিকট গমন করিলাম। ইঁহার নাম পদ্মনাভাইয়া। পূর্ব্বে তাঁহার জামাতা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারা আমার সংবাদ বৃদ্ধকে দিতে গিয়াছিলেন; এদিকে তিনিও আমার দিকে আসিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়াই, কি জানি কেন, নিতান্ত স্নেহপরবশ হইয়া বলিলেন, ছত্রে গিয়া কাজ নাই,—সেখানে থাকা বিপদশূন্য নহে। তাঁহার নূতন দ্বিতল বাটী তৈয়ার হইয়াছে; সেইখানে যাইয়া থাকিতে বলিলেন। সে বাটীর একাংশের এখনও সমস্ত নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয় নাই এবং স্বয়ং বৃদ্ধ সেখানে বাস করেন; সুতরাং স্ত্রীলোক-সঙ্গ-বিহীন বলিয়া আমার থাকিতে বিশেষ সুবিধা হইবে। আমি অনিচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও, আমায় ধরিয়া লইয়া গেলেন। আমার জিনিস-পত্র দ্বিতলস্থ তাঁহার নিজের গৃহে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কার্য্যক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন। এই প্রকার পর্ব্বতময় অজানা দেশে যে এমন থাকিবার স্থান মিলিবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। ইহাতে আমার নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া পড়িল। ইঁহাদের ভাষা আমার ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; ইঁহারা জাতিতে কানাড়ি; এ দেশ আমার জন্মভূমি হইতে কতদূরে,—তথাপি আমাকে অবিশ্বাস না করিয়া যে একেবারে দ্বিতলস্থ আপন শয়নগৃহ ছাড়িয়া দিলেন, ইহা ভগবানের অপার মহিমা ভিন্ন আর কি হইতে পারে। বৃদ্ধের শয়ন-গৃহটি বিশেষ ভাবে সজ্জিত ও অনেক মূল্যবান্ পদার্থে পূর্ণ। বাহিরে বসিবার জন্য একটা হল-ঘর রহিয়াছে। আমি ত সেই ঘরে বিছানা পাতিয়া বসিলাম; আমার মনে বিশেষ লজ্জা ও ভয় হইতেছিল যে, এত বড় নির্জ্জন বাটীতে বৃদ্ধের মূল্যবান্ দ্রব্যে পূর্ণ ও তাঁহার টাকাকড়ির সিন্ধুকযুক্ত গৃহে কি করিয়া থাকা যায়। বৃদ্ধের জামাতা ও পুত্র প্রভৃতি সকলে আমার বিছানা ধরাধরি করিয়া শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন। তাঁহারা আমার সহিত কত পরিচিত আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়া, কৌশলে জানিয়া লইলেন যে আমি ব্রাহ্মণ। তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন যে, তাঁহাদের দেশে ব্রাহ্মণ জৈন কর্ত্তৃক প্রস্তুত খাদ্য স্পর্শ করে না। আমিও পাছে গ্রহণ না করি এই আশঙ্কায় ঘৃত, আটা, চাউল, ডাউল, তরকারি প্রভৃতি পূর্ণ এক প্রকাণ্ড সিধা পাঠাইয়া দিলেন। আমি ত দেখিয়া অবাক্। আহার্য্যাদি-পূর্ণ বাক্স সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকে। এ সব ফিরাইয়া লইয়া যাইতে বলাতে তাঁহারা সকলে বিশেষ সম্মান ও কুণ্ঠার সহিত বলিলেন যে, আমি যখন তাঁহাদের অতিথি হইয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছি, তখন তাঁহাদের সিধা গ্রহণ করিতেই হইবে; ইহা না করিলে তাঁহাদের ধর্ম্মস্খলন হইবে। এই বিংশ শতাব্দীতে মানুষ এতটা অতিথি-পরায়ণ ও ধার্ম্মিক হয় দেখিয়া আমি ত বিস্মিত হইলাম। আমি প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু, কি হিন্দু-সমাজ, কি মুসলমান সমাজ, কি শিখ বা পঞ্জাবী-সমাজ, কি স্বদেশী বাঙ্গালী-সমাজ—কোথাও এরূপ হৃদয়ভরা আতিথেয়তা দর্শন করি নাই। আমায় প্রত্যহ এইরূপ ৩।৪ জনের খাইবার মত সিধা পাঠাইতেন। যখন আমি শ্রবণ-

বেলগোলা গ্রামে পৌছি, তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ইঁহারা তখন আপন-আপন কর্ম্ম শেষ করিয়া আসিয়াছেন; নির্ভাবনায় আমার সহিত গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইঁহারা সকলেই অল্পবিস্তর ইংরাজী কহিতে পারেন; এবং আমার সহিত এই ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন। আমি কি জন্য আসিয়াছি, কোথায়-কোথায় ভ্রমণ করা হইয়াছে, এবং কোথায়-কোথায় যাইব, শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের চিফ্ সেক্রেটারী মহাশয় আমাকে লাট সাহেবের পরিচয়-পত্র হিসাবে যে পত্রখানি দিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের দেখাইলে, তাঁহারা বিশেষ ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিলেন; এবং আমি যে এই কারণে একজন সম্মানিত ব্যক্তি, এইরূপ ভাব দেখাইলেন। গল্প করিতে-করিতে আমারও আহার্য্য প্রস্তুত হইয়া গেল; আহারের সময় বলিয়া ও সন্ধ্যা আগতপ্রায় বলিয়া, তাঁহারা সে রাত্রির জন্য বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন; কেন না, জৈনেরা সন্ধ্যার পরে আর আহার করেন না। এ স্থানটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২৮০০ ফিট উচ্চ; এবং পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত বলিয়া সেপ্টেম্বর মাসে ঠিক নবেম্বর বা ডিসেম্বর মাসের ন্যায় শীত বোধ হইতে লাগিল। সামান্য একটু বৃষ্টি হওয়ায় শীত বেশ জমিয়া উঠিল; এবং এই কারণে রীতিমত উষ্ণ বস্ত্র ও লেপ ব্যবহার করিতে হইল। বৃদ্ধ আসিবার পূর্ব্বেই আমি শয়ন করিলাম; কেন না, অন্ধকার শকটযানে আমার সর্ব্বাঙ্গে, ব্যথা ধরিয়াছিল। পরদিন প্রত্যূষে বৃদ্ধ শয্যা হইতে উঠিয়া, আমায় সাদর সম্ভাষণ করিয়া, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কেমন আছি এবং আমার কোন অসুবিধা হইতেছে কি না। কুশল প্রশ্নাদির পর, তিনি কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন; এবং তাঁহার জামাতা, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি অনেকে গোমতেশ্বরের মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য আমায় লইতে আসিলেন।

গোমতেশ্বরের মূর্ত্তির বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমি যাঁহাদের অতিথি ও যে গ্রামে আসিয়াছি, তাহার সামান্য পরিচয় দেওয়া উচিত মনে করি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের আশ্রয়ে আমি অতিথি স্বরূপ আছি, তাঁহার নাম পদ্মনাভাইয়া। ইনি একজন পিত্তলব্যবসায়ী। এ গ্রামটি মহীশূর রাজ্যের মধ্যে পিতলের বাসন তৈয়ার করিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ। পিত্তল পিটিবার শব্দে এ গ্রামটি সর্ব্বদা মুখরিত। পদ্মনাভাইয়া গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ও সম্ভ্রান্ত। ইনি মহীশূর ইকনমিক কন্‌ফারেন্সের সভ্য। ইঁহার জামাতার নাম দেবরাজাইয়া; ইনিও পিত্তল ব্যবসায়ী; পূর্ব্বে ইনি শিক্ষক ছিলেন। ইঁহার যত্ন আমি কোন কালে ভুলিতে পারিব না। সে সব কথা ক্রমশঃ বলিব। পদ্মনাভাইয়ার পুত্রের নাম সন্তরাজাইয়া; ইনিও পিতার সঙ্গে ব্যবসা চালাইতেছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রবণবেলগোলা গ্রামে প্রবেশ করিয়া এক সরোবরের তীরে আমাদের শকট থামিয়াছিল। এই সরোবরের নাম হইতে গ্রামটির নামকরণ হইয়াছে। শ্রবণ শব্দটি শ্রমণ শব্দের অপভ্রংশ; এবং বেলগোলার অর্থ শ্বেত-সরোবর। হালে কানাড়ি ভাষায় বেল শব্দের অর্থ শ্বেত, এবং কোলা শব্দ সরোবরবাচক, "গোলা" শব্দটি "কোলা" শব্দের অপভ্রংশ। তাহা হইলে "শ্রবণবেলগোলা"র অর্থ দাঁড়াইল যে, শ্রমণদিগের নিমিত্ত শ্বেত সরোবর। এস্থানে আর দুটি বেলগোলা আছে। এটি শ্রমণদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল বলিয়া সে দুটা হইতে বিভিন্ন। গ্রামটি মহীশূর রাজ্যান্তর্গত হাসান জেলায় চেন্নরায় পাটনা তালুকে অবস্থিত। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটি পর্ব্বত, অথবা ইহাকে পর্ব্বতদ্বয়ের পাদদেশের মধ্যে স্থিত বলা যাইতে পারে। দক্ষিণদিকের পর্ব্বতটির নাম বিন্ধ্যগিরি ও উত্তরদিকেরটির নাম চন্দ্রগিরি। বিন্ধ্যগিরি পর্ব্বতে গোমতেশ্বরের বিরাট মূর্ত্তি অবস্থিত; কিন্তু ঐতিহাসিক হিসাবে ও তীর্থ হিসাবে চন্দ্রগিরির মূল্য নাই। সে সব কথা ক্রমশঃ বলিতেছি। স্থানীয় ভাষায় বিন্ধ্যগিরিকে "দোড্ডা বেট্টা" বা বৃহৎ গিরি এবং চন্দ্রগিরিকে "চিক্কা বেট্টা" বা ক্ষুদ্র গিরি বলে; ইহার কারণ, বিন্ধ্যগিরি চন্দ্রগিরি হইতে অধিকতর উচ্চ। পূর্ব্বোক্তটির উচ্চতা শেষোক্তটির হইতে প্রায় ৩০০ ফিট অধিক। বিন্ধ্যগিরি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৩৪৭ ফিট এবং গ্রামটি অপেক্ষা প্রায় ৪৭০ ফিট উচ্চ। চন্দ্রগিরির ইতিহাসের কথা বলিবার পূর্ব্বে বিন্ধ্যগিরির কথা বলিয়া রাখি; কেন না, এইটিই সর্ব্বপ্রথমে দর্শন করি।

প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে দেখি যে, পদ্মনাভাইয়ার জামাতা, পুত্র, আত্মীয় ও গ্রামের অনেকে আমাকে বিন্ধ্যগিরিতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত যাত্রা করা গেল। উপরে উঠিতে ৬৫০টি

সিঁড়ি আছে। পর্ব্বতটি গ্রাণাইট্ প্রস্তরের। ইহার গাত্র কাটিয়া তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য সিঁড়ি তৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছে। ছই মাস ধরিয়া প্রায় অনশনে বা অর্দ্ধাশনে নানা গ্রাম, অরণ্য, পর্ব্বত প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়াছি; ইহাতে আমার শরীর বিষম দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। বিশ্রাম না করিয়া প্রায় অনবরত ভ্রমণ করা যাইতেছে; এবং ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যাইতেছে। এ কারণে, শরীরও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য রৌদ্রে পর্ব্বতের উপর উঠিতে কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। আমার সহযাত্রীরা অবলীলা ক্রমে উঠিতেছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতপদে উঠিতেছিল পদ্মনাভাইয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র বালক স্বধর্ম্মাইয়া। সে মৃগের মত লাফাইয়া লাফাইয়া সিঁড়ি ছাড়িয়া দিয়া, পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া উঠিতেছিল। ক্লান্তিতে আমার বিশেষ লজ্জা হইল। সহযাত্রিগণ আমাকে বিশ্রাম না করিয়া উপরে উঠিতে নিরস্ত করিলেন। পাছে আমি লজ্জায় সঙ্কুচিত হই, এই আশঙ্কায় স্তোক বাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন, "আপনি এতদিন ধরিয়া কষ্ট সহ্য করিয়া শরীর নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন; আর বোধ হয় আপনাদের দেশে পর্ব্বত নাই বলিয়া, পর্ব্বতারোহণে তত অভ্যস্ত নহেন এই জন্যই সামান্য কষ্ট হইতেছে।" পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রাতে কিছু আহার করিয়া বাহির হইয়াছেন কি?" "না" বলাতে তাঁহারা সকলে বলিয়া উঠিলেন, তবে ত কিছু না খাইয়া উঠিতেই দেওয়া হইবে না। তাঁহাদের অন্তঃকরণ জননীর ন্যায় কোমল দেখিয়া, আমার সকল কষ্ট দূর হইয়া গেল। বালক স্বধর্ম্মাইয়া বিদ্যুতের বেগে নীচে নামিয়া গেল; এবং প্রায় পনর মিনিট বা অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল পরে কমণ্ডলুর ন্যায় রজত পাত্রে সুগন্ধ কফি ও অনেকগুলি ঘৃত-ভর্জ্জিত কচুরী বা পুরি লইয়া আসিল। এ সকল আহার করিয়া শরীরে বিশেষ বল পাইলাম: এবং দ্বিগুণ উৎসাহে উপরে উঠিতে লাগিলাম। উপরে উঠিয়া, গোমতেশ্বরের মূর্ত্তিটি যে মন্দির মধ্যে অবস্থিত, তাহার মধ্যে প্রবেশ করা গেল। মন্দিরটির চারি ধারে গৃহ ও অঙ্গন; মধ্যে বিরাট মূর্ত্তি পর্ব্বতের গাত্র কাটিয়া খোদিত করা হইয়াছে। মূর্ত্তিটির উচ্চতা প্রায় ৫৭ ফিট। এ পরিমাণটি আনুমানিক; কেন না, যখন মূর্ত্তিটির মাপ করা হইয়াছিল, তখন পাদদেশ হইতে কর্ণমূলের উপরে মাপিবার সুবিধা পাওয়া যায় নাই। ইহার ভিন্নাংশের উচ্চতা নিম্নে দেওয়া গেল।

পাদদেশ হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত	...	৫০	ফিট
পাদদ্বয়ের দৈর্ঘ্য	...	৯	
„ „ প্রস্থ	...	৪′-৬″	
বৃদ্ধাঙ্গুলি (ঐ) দৈর্ঘ্য	...	২′-৯″	
পাদগ্রন্থির অর্দ্ধ-পরিধি	...	৬′-৪″	
উরুদেশের অর্দ্ধ-পরিধি	...	১০′	
কটিদেশ হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত	...	১৭′	
কটিদেশের প্রস্থ	...	১৩′	
স্কন্ধের নিকট প্রস্থ	...	২৬′	
তর্জ্জনীর দৈর্ঘ্য	...	৩′-৬″	
মধ্যাঙ্গুলীর দৈর্ঘ্য	...	৫′-৩′	

উপরিউক্ত পরিমাণগুলি হইতে বুঝা গেল যে, মূর্ত্তিটি কি বিশাল। সহস্র বৎসর রৌদ্র বৃষ্টি ভোগ করিয়াও মূর্ত্তিটি সম্প্রতি খোদিত করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহা উত্তরমুখী এবং নগ্ন। উরুদেশের উপরে মূর্ত্তিটির রক্ষার জন্য কোন "ঠেশের" বন্দোবস্ত নাই। এরূপ ভাবে ক্ষোদিত করা হইয়াছে, যেন মূর্ত্তিটি উরুদেশ পর্য্যন্ত উচ্চ বল্মীক বা স্তূপের মধ্যে দণ্ডায়মান। এক প্রকারের লতা যেন ইহার পদ ও বাহুদ্বয়কে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে;—লতাপল্লবের শিরা-উপশিরাগুলি পর্য্যন্ত পরিষ্কার রূপে দেখা যাইতেছে। উহার মুখদেশ আয়ত নয়ন ও সমুন্নত নাসিকা দ্বারা সুন্দর দেখাইতেছে, এবং বেশ গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক। ভাস্কর গলদেশের রেখাগুলি খোদিত করিতে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েন নাই। মূর্ত্তিটির কেশগুলি গুচ্ছাকারে আবর্ত্তিত। বৌদ্ধ ও জৈন মূর্ত্তির মস্তকে যেরূপ কেশাবর্ত্ত লক্ষিত হয়, এগুলি সেইরূপ ও তাহাদের কর্ণের ন্যায় এ মূর্ত্তিটির কর্ণদ্বয় আলম্বিত।

গোমতেশ্বরের মূর্ত্তির কথা ত বলিলাম; কিন্তু আমার বিশ্বাস ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধিৎসুদিগের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন ব্যক্তি জানেন না যে, গোমতেশ্বর কে এবং কি জন্য জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রে ইঁহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই কারণে ইঁহার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। জৈনদিগের চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করের আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পুত্রের নাম গোমতেশ্বর স্বামী বা গোমুতেশ্বর। ইনি তীর্থঙ্করের ন্যায় সমান সম্মান ও পূজা পাইয়া থাকেন।

দক্ষিণ কানাড়া জেলাস্থ য়েণুর (Yenur) গ্রামের গোমতেশ্বর মূর্ত্তির অনুশাসনে ইঁহাকে "জীন" আখ্যায়

অভিহিত করা হইয়াছে—"অস্থাপরত প্রতিষ্টাপ্য ভুজবল্যাখ্যায়কম্ জীনম্।"

বার্গেশ (Dr. Burgess) বলেন, দিগম্বর-শাখাভুক্ত জৈনেরা ঋষভদেবের পুত্রকে গোমতেশ্বর নামে এবং শ্বেতাম্বরীয় জৈনেরা তাঁহাকে বাহুবলী বা ভুজবলী নামে অভিহিত করেন।* আমার বোধ হয় বার্গেশের এই উক্তিটি ভ্রমাত্মক; কেন না, আমি স্থানীয় দিগম্বরী জৈনদিগকে এই নামদ্বয় ব্যবহার করিতে শুনিয়াছি। পুনশ্চ, দক্ষিণ কানাড়া জেলার যে দুইটি গোমতেশ্বরের মূর্ত্তির অনুশাসন ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকোয়েরি † পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহাতেও ভুজবলী নাম দৃষ্ট হয়। এ দুইটী মূর্ত্তি যে স্থানে অবস্থিত, তাহা কোন কালে শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায়ের বসতি ছিল না এবং এক্ষণেও ইহারা দিগম্বরী জৈনদিগেরই বিশেষ তীর্থস্থান।

গোমতেশ্বরের সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত। তিনি তাঁহার বিমাতা পুত্র রাজা ভরতের একচ্ছত্রত্ব অস্বীকার করিয়া তাঁহার রাজ্যের বাহিরে তপশ্চরণের জন্য যাত্রা করিলেন। কিন্তু যেখানেই যান, সেখানেই দেখেন ভরতের রাজ্য; কিছুতেই তাঁহার রাজ্যের বাহিরে স্থান মিলিল না। ইহা দেখিয়া এক যক্ষের মনে কৃপার সঞ্চার হইল। গোমতেশ্বরের দাঁড়াইবার স্থান স্বরূপ তিনি সর্পরূপে আপনার মস্তক পাতিয়া দিলেন। এ মূর্ত্তিটি কিন্তু সর্পের উপর দণ্ডায়মান নহে। দক্ষিণ কানাড়া জেলায় যে এই প্রকারের আর দুইটী মূর্ত্তি বর্ত্তমান, তাহাদিগকেও সর্প-মস্তকে দণ্ডায়মান রূপে খোদিত করা হয় নাই।

মূর্ত্তিটির চারিদিকে যে প্রকার মণ্ডপের কথা বলিয়াছি, তাহাতে জলপীঠের উপর দণ্ডায়মান জৈন তীর্থঙ্করগুলির মূর্ত্তি রহিয়াছে। প্রত্যেক মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে তাহার আপন আপন যক্ষ ও যক্ষীর মূর্ত্তি বিদ্যমান। তীর্থঙ্করগুলির বৈশিষ্ট্যদ্যোতক লাঞ্ছন বা চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। ইহাতে বিস্মিত হইলাম; কেন না, এরূপ প্রায়ই দেখা যায় না। সাধারণ পাঠকের জন্য কল্পিত না হইলেও, একটি কথা বলিয়া রাখি;—পূর্ব্বোক্ত প্রাকার মণ্ডপের পোতায় পল্লবস্থাপত্যের চিহ্ন স্পষ্টভাবে রহিয়াছে দেখিলাম।

সকলে মিলিয়া একবার মণ্ডপের শীর্ষদেশে উঠিলাম; তথা হইতে গোমতেশ্বরের বিরাট মূর্ত্তিকে স্পর্শ করিতে পারা যায়। আমি মাপিবার জন্য স্পর্শ করিতে গেলে, সকলে নিষেধ করিয়া উঠিলেন। তখন আমার স্মরণে আসিল যে, জৈনেরা পুরোহিত ভিন্ন কাহাকেও তাঁহাদের মূর্ত্তি স্পর্শ করিতে দেন না; তাঁহারা নিজেরাও স্পর্শ করিতে পান না; এমন কি, গর্ভগৃহেও প্রবেশাধিকার নাই; এবং দ্বারপাল বা যক্ষ-যক্ষীর মূর্ত্তি স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। হিন্দু-জৈন-নির্বিশেষে দাক্ষিণাত্যের বা দ্রাবিড় দেশের সর্ব্বত্রই এই নিয়ম।

গোমতেশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া নামিবার সময়ে সম্মুখে একটি মনোহর কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। প্রস্তরের উপর এমন সুন্দর কারুকার্য্য আমি কুত্রাপি দর্শন করি নাই। বোধ হইল, ঠিক যেন কাষ্ঠের উপর কারুকার্য্য করা হইয়াছে। এই স্তম্ভের উপরে ব্রহ্মদেবের মূর্ত্তি রহিয়াছে। দশম তীর্থঙ্কর শীতলনাথের যক্ষের নাম ব্রহ্মদেব এবং যক্ষীর নাম মানবী। এই স্তম্ভটির নাম "ত্যাগদ ব্রহ্মদেবের স্তম্ভ"। আমার সংযাত্রীরা "ত্যাগদ" কথার তাৎপর্য্য কি বুঝাইতে পারিলেন না। ব্রহ্মদেবের অনুগ্রহে মানব মনে ত্যাগ-বৃত্তি উত্তেজিত হয় বলিয়াই কি ত্যাগদ নাম প্রদত্ত হইয়াছে?

ব্রহ্মদেব স্তম্ভ দেখিয়া যে মন্দিরটি দেখিলাম, তাহার নাম "ভড়েগল্ল বসতি"। ইহা উত্তরমুখী। "ভদেকল্"র অর্থ চাড়া বা strut; "ভদেকল" হইতে "ভড়েগল্ল"র উৎপত্তি। এ মন্দিরটি পর্ব্বতের পূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া প্রস্তরের "চাড়া" দ্বারা রক্ষিত; শ্রবণ বেলগোলার জৈনেরা মন্দির অর্থে বসতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন; ইহা অনেক শতাব্দী হইতে চলিতেছে।

ভড়েগল্ল বসতি চালুক্য রীতিতে নির্ম্মিত; কিন্তু ইহার পোতায় পল্লবস্থাপত্যের চিহ্ন বর্ত্তমান। উত্তর চালুক্য রীতির যাহাতে বৈশিষ্ট্য, সেই তিনটী গর্ভগৃহের সকল এই মন্দিরে বর্ত্তমান। মধ্যস্থিত গর্ভগৃহে আদিনাথ বা ঋষভদেবের মূর্ত্তি রহিয়াছে, এবং ইহার বামে ও দক্ষিণে যথাক্রমে ষোড়শ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ ও একবিংশতি তীর্থঙ্কর নিমি

---

* Digambara Jaina Iconography by James Burgess (পৃ ৩)।

† Indian Antiquary, vols. II and V.

বা নমিনাথের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। সম্পূর্ণ মন্দিরের অঙ্গ-চতুষ্টয় এ মন্দিরে বর্ত্তমান ; অর্থাৎ গর্ভগৃহে অন্তরাল, অর্দ্ধমণ্ডপ, ও মহামণ্ডপের সমষ্টি লইয়া মন্দিরটি গঠিত। এখানে দেখিলাম মহামণ্ডপকে নবরঙ্গ বলে। পশ্চিমদিক ছাড়িয়া দিলে মহামণ্ডপ ও এইটি গর্ভগৃহের পরিমাণ সমান, ইহা দ্বারা জ্যামিতিক সামঞ্জস্য সুন্দর ভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

ভণ্ডেগল্ বসতির পর চন্দনবসতি বা অষ্টম তীর্থঙ্কর চন্দ্রপ্রভ দেবের মন্দির দর্শন করা গেল। ইহার সম্মুখস্থ স্তম্ভটি উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় ভাষায় ইহার নাম মানস্তম্ভ। ইহা দর্শন করিলে দর্শকের মনে গর্ব্ব ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। এগুলি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জৈন মন্দিরের দীপদানস্বরূপ এবং বৈষ্ণব-মন্দিরের সম্মুখস্থ গরুড়স্তম্ভের সহিত ইহাদের তুলনা করা যাইতে পারে।

বিন্ধ্যগিরির আর আর যাহা দ্রষ্টব্য, সমস্তই দেখিলাম ; বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া গেল বলিয়া, পর্ব্বত হইতে অবতরণ করা গেল। অবতরণ করিবার সময় বৃদ্ধ পদ্মনাভাইয়া ও তাহার মৃত ভ্রাতা ধরণাইয়া নির্ম্মিত পর্ব্বতগাত্রস্থ পার্শ্বনাথজীর মন্দির দেখা গেল। ইহা আধুনিক পদ্ধতিতে নির্ম্মিত। এ স্থানের মন্দিরগুলির নিয়ম এই যে, দাক্ষিণাত্যস্থ হিন্দু-মন্দিরের অচল মূর্ত্তির ন্যায় একটি মূর্ত্তি সর্ব্বপশ্চাতে থাকে, এবং সম্মুখে তাহারই অনুকরণে নির্ম্মিত আর একটি মূর্ত্তি থাকে ; এবং উহার দুইপার্শ্বে তাহার যক্ষ যক্ষী ও অন্যান্য তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি বিদ্যমান। এ মন্দিরস্থ গ্রাণাইট প্রস্তরের পার্শ্বনাথ মূর্ত্তিটি বড়ই সুন্দর। ইহার সম্মুখে মার্ব্বেল-প্রস্তর-নির্ম্মিত পার্শ্বনাথজীর একটি আসীন মূর্ত্তি অবস্থিত।

ইমানদার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

যাহাই হউক—বিজ্ঞ চিকিৎসকের সুনির্ব্বাচিত ঔষধ মাহাত্ম্যেই হউক, বা পরিপূর্ণ সেবার সুনিয়মেই হউক, বা ফৈজুর পিতার ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের ফলেই হউক, টিয়া দিন-কতকের মধ্যে—সেই আশু প্রাণসঙ্কটের আশঙ্কা হইতে মুক্তিলাভ করিল। কিন্তু দৌর্ব্বল্য ও অন্য কতকগুলি উপসর্গ সারিল না। চিকিৎসক আশ্বাস দিয়া বলিলেন, এগুলির জন্য ভয় নাই।—সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহা সারিয়া যাইবে।

অনুতাপ-পীড়িত হৃদয় মনকে যখন একটুখানি আশা ও আশ্বাসের ছায়ায় শান্ত সংযত করিয়া ফৈজু হাঁপ ছাড়িবার মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী—খন হঠাৎ সংবাদ আসিল,—সুমতি দেবীর বলিলেন। সেউ কি একটু গোলযোগ বাধিবার সম্ভাবনা শেষ হয় নাই এবাধ্যতর ফৈজু মণ্ডলকে গিয়া ধরিল। মণ্ডল স্ত্রীলোক-সঙ্গ-বিহীনে পারিল না,—ফৈজুকে এখানকার হইবে। আমি অনিংে মিত্র মহাশয় ও সুমতিদেবীর অনুমতি লইয়া, জয়দেবপুরে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে চলিয়া গেল।

শ্যামল জয়দেবপুর হইতে ফিরিয়া, ফৈজু মামুর সহিত সে রাত্রের সুখময় পথ-ভ্রমণে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখে, সুমতি দেবীর কাছে অনেক আক্ষেপ ও অনুযোগ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, এবার সে কখনই ফৈজুর সঙ্গ ছাড়িবে না। কিন্তু ফৈজুর অনুরোধে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া, মোড়ল মশাইয়ের সুবিধার জন্য তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেল।

ফৈজু মিত্র মহাশয়ের সহকারীত্বে নিযুক্ত হইয়া এখানকার কাজ দেখিতে লাগিল। কিন্তু মণ্ডল মশাই সেখানে গিয়া বিশেষ কিছুই সুবিধা করিতে পারিল না। প্রজাদের মধ্যে দলাদলির উত্তেজনা জাগিয়া উঠিল ;—কারণ, পলাতক আসামী হরিহর না কি জয়দেবপুরের কোন দূর সম্পর্কীয় কুটুম্ব-বাড়ীতে লুকাইয়া আছে, বলিয়া কে একজন পুলিশে মিথ্যা খবর দিয়াছিল। পুলিশ দল বাঁধিয়া আসিয়া কতক-

গুলা বাড়ী ঘেরাও এবং খানাতল্লাসী করিয়া যায় ;—ইহাতেই প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠে। মণ্ডল বহু চেষ্টায় প্রজাদের অসন্তোষ দূর করিতে পারিল না। উল্টা সে চেষ্টার ফলে নিরীহ মণ্ডল প্রজাদের কোপ দৃষ্টিতে পড়িল। বিপন্ন হইয়া সত্বর ফৈজুকে লইয়া যাইবার জন্য সে লোক পাঠাইল। ফৈজু আর ঠেকাইতে পারিল না, চলিয়া গেল। টিয়ুকে বলিয়া গেল, যেমন করিয়া হউক, এবার শীঘ্রই সে ফিরিয়া আসিবে।

কিন্তু, এবারকার বিশৃঙ্খলতা দূর করিতে গিয়া, ফৈজু দেখিল - তাহার নিজের মন ও মস্তিষ্কে ততোঽধিক শোচনীয় বিশৃঙ্খলতার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সমস্ত ব্যাপারই বিষম কঠিন ঠেকিতে লাগিল। কিসে যে কি ঘটিয়াছে, সহস্র চেষ্টাতেও ফৈজু তাহা বুঝিতে পারিল না। উদ্বেগ-আকুল চিত্তটা অন্য চিন্তায় এমনি ব্যস্ত-বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, যে, এদিককার ব্যাপারে তাহাকে কিছুতেই ফিরাইতে পারা গেল না। পরস্পর-বিরোধী চিন্তার দ্বন্দ্বে উৎকট রকমে মাথা খাটাইয়া,—শেষে তাক্ত বিরক্ত চিত্তে সে এই "বদ্‌মাইস প্রজাগুলির গুণ্ডামী মতলবের" উপর হাড়ে-হাড়ে চটিয়া উঠিল! মাথা চুলকাইয়া মণ্ডলকে বলিল, "না ভাই, এ বড় গোলযোগের কাণ্ড! দিদিমণি ঠিকই বলেছেন, এ বিষয় ছেড়ে দেওয়াই ভাল ; আমি তো আর পেরে উঠ্‌ছি না!"

মণ্ডল সুযোগ পাইয়া খুব এক চোট বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়া বলিল, "হাঁ—হাঁ, তুমি যে আর কিছুই পেরে উঠ্‌বে না, আমি তো সেটা বহুদিন থেকেই জানি!"

ফৈজু হাসিল, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিল না। মনের কোনখানেই এমন এতটুকু সত্য জোর খুঁজিয়া পাইল না, যাহার বলে আজ সে ইহাকে অস্বীকার করে! নিজের দুর্ব্বলতায় সে নিজেই বিরক্ত হইয়া উঠিল। নিজের বিবাহিত জীবনের উপর এক-এক সময়ে তীব্র বিতৃষ্ণার উদয় হইতে লাগিল,—কেনই যে মানুষ সাধ করিয়া এমন দুর্ব্বহ ভার কাঁধে তুলিয়া লয়! অবস্থা-সঙ্কট-পীড়িত ফৈজু আজ নিজের মধ্যে বিস্তর প্রশ্ন-তর্ক করিয়া সে সমস্যার কোনই মীমাংসা পাইল না! বিবাহ না হইলে আজ সে নিশ্চিন্ত শান্তিতে সংসারের সকল সঙ্কটের সঙ্গে যুঝিতে পারিত,—এই তত্ত্বই বার-বার মনে পড়িতে লাগিল।

কিন্তু যাহাদের মঙ্গলের জন্য খাটিতে হইবে, তাহাদের অমঙ্গল-আশঙ্কায় বেদনাহত চিত্তে অকর্ম্মণ্যের মত বসিয়া থাকা,—সে দুর্ব্বলতাও মহাপাপ! প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে সংযত করিয়া ফৈজু আবার নবীন উদ্যমে কাজে লাগিল। দেহ-মনের সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করিয়া সে কায করিবে, মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিবে, মঙ্গল আসে ভালই, না হইলে হে জগদীশ্বর, শক্তি দিও,—সমস্ত অমঙ্গলের আঘাত যেন তোমার হাতের দান বলিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে সে মাথায় তুলিয়া লইতে পারে! চেষ্টা সফল হউক, আর নাই হউক, সে যেন পরিপূর্ণ চেষ্টায় কর্ত্তব্যপালন করিয়া যাইতে পারে। তাহার কর্ত্তব্য অবহেলার ত্রুটিতে যে কোন অমঙ্গল ঘটিল,—এ আক্ষেপ হইতে তাহাকে পরিত্রাণ দাও!

চেষ্টা চেষ্টা—অবিশ্রাম চেষ্টা। ফৈজুর অসীম ধৈর্য্য, অক্লান্ত শ্রমচর্য্যা দেখিয়া মণ্ডল এবার নিজেই বিস্মিত হইল। নায়েবজী যে কেমন স্নেহময়, আত্মীয়তাপূর্ণ মন লইয়া সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন—প্রজারা আবার সেটা বুঝিল। বিদ্রোহিতা ছাড়িয়া তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিল।

মণ্ডল হাঁপ ছাড়িয়া তেজপুর প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিল। ফৈজু অনুনয় করিয়া বলিল, "দাঁড়াও দাদা, এতটা মেহেরবাণী যখন করেছ, তখন আর একটু কর,—আর দুটো দিন সবুর কর,—আমি চট্‌ করে একবার বাড়ী থেকে ঘুরে আসি!"

বাড়ী ঘর ছাড়িয়া এই বিদেশে আসিয়া বাস করিতে একেই মণ্ডলের প্রাণ আণ্‌চাণ্‌ করিতেছিল ;—ফৈজুর এই প্রস্তাবে সে অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল "তুমি দুদিনের নাম করে গিয়ে দশদিন দেরী করবে তো।"

ফৈজু দৃঢ়স্বরে বলিল, "নেহাৎ দায়ে না ঠেক্‌লে খামকা আমি কথার খেলাপ করি না, ভাই, সে তুমি জানো? আমি যেতে-আসতে শুধু দুটো দিন ছুটি চাই, এর বেশী তোমার কোন অসুবিধা আমি হতে দেব না।"

মণ্ডল ভাবিয়া-চিন্তিয়া করুণার্দ্র চিত্তে বলিল, "না, অতটা কষ্ট কোরো না,—যাচ্ছই যখন, তখন বাড়ীতে দুটো দিন জিরিয়ে এস।"

ফৈজু হাসিয়া বলিল, "না দাদা, তুমি যা দয়া করেছ, এই ঢের,—আমি বেইমানি করব না, যত শীগ্‌গী পারি, চলে আসব।"

সমস্ত দিন পথ হাঁটিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফৈজু আসিয়া গ্রামে ঢুকিল। তার পর জমিদার-বাড়ী যাইয়া, সুমতি দেবীকে অভিবাদন করিয়া, জয়দেবপুরের সংবাদ জানাইল। সুমতি দেবী সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু 'রোজা' রাখিয়া উপবাস-ক্লান্ত দেহে ফৈজু সারাদিন পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে বলিয়া, ভৎসনাও কিঞ্চিৎ করিলেন। ফৈজু হাসিমুখে কৈফিয়ৎ দিল,—বর্ষাকালের দিনে উপবাস করিয়া পথ হাঁটিতে কিছুই কষ্ট হয় নাই, সেইজন্য সে মিছামিছি গরুর গাড়ীর ভাড়া খরচ করে নাই!

তার পর তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িল। শ্যামল তাহার সহিত আসিবার জন্য কেমন করিয়া নাচিয়াছিল, এবং সে কল-কৌশলে তাহাকে ভুলাইয়া নিরস্ত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ নিবেদনে উদ্যত হইতেই, সুমতি দেবী অন্য কাযের অছিলায় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি এখন বাড়ী যাও ফৈজু, কাল সকালে তোমার গল্প শুনব।"

ফৈজু উঠিয়া সেলাম করিয়া সবিনয়ে বলিল, "আমি ভোর থাক্‌তে বেরিয়ে পড়্‌ব দিদিমণি, মোড়ল মশাইকে কথা দিয়ে এসেছি।"

পিসিমা এতক্ষণ যদি বা ফৈজুকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, এবার আর ক্ষমা করিতে পারিলেন না। এমন দুঃসাহসী, গোঁয়ার ছেলে তিনি যে পৃথিবীতে দুটা দেখেন নাই, সেজন্য বিস্তর আক্ষেপ জুড়িয়া দিলেন! সুমতি দেবীও অপ্রসন্ন ভাবে কি বলিতে যাইতেছেন দেখিয়া,—ফৈজু আর দাঁড়াইল না। গোলমাল করিয়া অন্যান্য কথা কহিয়া, তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

নিজের বাড়ীতে আসিয়া ফৈজু দেখিল, পিতা বাড়ীতে নাই,—রহিমারও কোন সাড়া পাইল না,—জুতা খুলিয়া নিঃশব্দে আসিয়া স্ত্রীর ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, দুয়ারের সামনে শয্যায় শুইয়া, টিয়া প্রদীপের দিকে চাহিয়া চুপচাপ পড়িয়া ছিল,—তাহার শীর্ণ-শান্ত মুখে আজ কোন যন্ত্রণার চিহ্ন নাই।

মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ ভাবে দুয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া, নিঃশব্দেই একটা সুগভীর আশ্বাসপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ধীরে—একটু শব্দ করিয়া—ফৈজু ঘরে ঢুকিল। চাহিয়া দেখিয়া টিয়া সন্ত্রস্ত ভাবে মাথায় কাপড় টানিল। ফৈজুও থতমত খাইয়া দাঁড়াইল, দেখিল—দুয়ারের পাশে কোণ ঘেঁসিয়া বসিয়া রহিমা প্রদীপের সামনে হেঁট হইয়া ঘুনসী বিনাইতেছে! আর অগ্রসর হওয়া চলিল না, তাড়াতাড়ি মাথা হেঁট করিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। এত রোগ-দুঃখ-বিপদের মাঝেও সে এরূপ স্থলে পিতা ও ভ্রাতৃজায়াকে সসম্ভ্রমে সমীহ করিয়া চলিবার অভ্যাস ছাড়ে নাই।

রহিমা মাথা তুলিয়া চাহিয়া বলিল "ও কি! ও কি! এসেই তাড়াতাড়ি চোরের মত পালাচ্ছ কেন? শোন, শোন,—"

ফৈজু বাহির হইতেই স্নিগ্ধ হাস্যে উত্তর দিল, "তুমি যে আর কিছুই বাকী রাখ্‌ছ না খলিফা, চোর ডাকাত যা মুখে আস্‌ছে, সবই যে বলে যাচ্ছ!"

রহিমা হাসিতে হাসিতে বলিল "বলব না? যা তোমার আক্কেল! ঘরে এস, ঘরে এস,—কখন এলে বল—কেমন আছ?"

ফৈজু দুয়ারের কাছে একটু সরিয়া আসিয়া বলিল "ভাল আছি, অনেকক্ষণই আসছি,—এখানকার দেশলাইটা কোথা গেল খলিফা? বারেণ্ডার আলোটা জালব!"

রহিমা বলিল "ঐ জানালায় আছে দ্যাখো!—"

ফৈজু দিয়াশলাই লইয়া আলো জ্বালিল। তার পর ধুনাচি আনিয়া টিকা ধরাইয়া আগুনে বাতাস করিতে বসিল। রহিমা বাহিরে আসিয়া তাহার 'বাও দেখিয়া' তিরস্কার করিল,—ঘরগুলায় এখনি ধুনার ধোঁয়া না দিলে কি চলিত না?

ফৈজু সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল "আমি যে সেই ঝি রাখবার ঠিক করে গিয়েছিলুম, তার কি কর্‌লে খলিফা? একলাটি সমস্ত কায কর্‌তে তোমার যে বড়ই কষ্ট হচ্ছে!"

প্রতিবাদের স্বরে রহিমা বলিল "হ্যা হচ্ছে! তোমাদের ঐ এক বুলী! ও-ও পড়ে-পড়ে ধুক্‌ছে, আর বল্‌ছে, 'দিদি একলা তুমি কত কষ্ট পাচ্ছ,—আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে!'—কিন্তু কষ্ট যে কি, তা তো আমি কিছুই বুঝি না। তোমরা রাতদিন ও রকম করে বোল না ফৈজু।" ফৈজু হাসিয়া বলিল "ধমক দাও তো আমি নাচার! কিন্তু মানুষের শরীর তো,—এত খেটে তোমার যদি এই সময় অসুখ হয়, তা'হলেই যে মাথায় পাহাড় ভেঙ্গে পড়্‌বে! না

—না, ঝি একটি রাখো খলিফা,—না হলে, শেষে এই অল্প সাশ্রয় করতে গিয়ে অনেক লোকসানের দায়ে ঠেকতে হবে।”

ফৈজু আরো অনেকগুলি কথা বলিল। রহিমাও অনেক তর্ক করিল,—ঝি রাখিতে তাহার আপত্তি নাই,—কিন্তু তাহাদের মত গরীবের ঘরে,—ঝি চাকর পোষা যে এক মহাপাপ! সাধারণ ঝি চাকরেরা—বড়লোক মনীবের ঘরে অকাতরে অনেক অসুবিধা সহ্য করিতে পারে,—কিন্তু গরীব মনীবের ঘরে তাহারা এতটুকু ত্রুটির ছল পাইলেই একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতে চায়! পয়সা দিয়া লোক রাখিয়া সেরূপ অবজ্ঞা ঝঙ্কার সহিতে রহিমা আদৌ প্রস্তুত নয়! তার চেয়ে সে নিজে সংসারের সব কাজ করিবে, সেই ভাল!

ফৈজু অনেক অনুনয় করিয়া, অবশেষে রহিমাকে সম্মত করাইল, যে, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য একটা ঝি রাখা হইবে, এবং আগামী কল্য হইতেই লোক বাহাল হইবে। আরো এদিক-ওদিক দুই চারিটা কথার পর, রহিমা ফৈজুর আহারাদির তত্ত্ব লইয়া—সে উপবাস করিয়া আছে, এতক্ষণ সে কথা বলে নাই কেন—এবং হঠাৎ তাহার এ সব কেশকর ধর্মানুষ্ঠানের হুড়োহুড়ি বাড়িয়া উঠিয়াছে কেন,—সেজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া কতকগুলা তিরস্কার করিল! ফৈজু অপ্রস্তুতে পড়িয়া ব্যস্তসমস্তভাবে বুক পকেট হইতে কতকগুলা প্রসাদী নির্ম্মাল্য বাহির করিয়া রহিমার হাতে দিয়া জানাইল, পথে আসিতে কোন এক মসজিদে নামাজ পড়িয়া পীরের দরগায় পূজা দিয়া, প্রসাদী নির্ম্মাল্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। রহিমা শশব্যস্তে নির্ম্মাল্য লইয়া টিয়ার ঘরে ছুটিল। তার পর রান্নাঘরে গিয়া আহার্য্য প্রস্তুত করিতে বসিল।

এঘরে-ওঘরে ধুনা দিয়া, ফৈজু টিয়ার ঘরে আসিয়া ধুনাচি একপাশে রাখিল; পকেট হইতে একটু ধূপ বাহির করিয়া আগুনের উপর ছাড়িয়া দিল; সুগন্ধে ছোট ঘরখানি আমোদিত হইয়া উঠিল।—স্ত্রীর শয্যার কাছে সরিয়া গিয়া, হেঁট হইয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া স্নেহময় স্বরে বলিল “কেমন, আজকাল বেশ ভাল বোধ হচ্ছে না?”

টিয়া এতক্ষণ পড়িয়া পড়িয়া তাহাদের সমস্ত কথাই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। এইবার অনুযোগ ব্যথিত দৃষ্টি তুলিয়া ক্ষুণ্ণভাবে বলিল “কেন এমন কষ্ট করে ছুটে এলে বল দেখি? আমি তো সত্যিই এখন বেশ ভাল আছি।”

পাশে বসিয়া পড়িয়া—শান্ত কোমল কণ্ঠে ফৈজু বলিল, “আমি এটুকুই শুনে যাবার জন্যে এসেছি। এতে আমার কিছুই কষ্ট হয় নি।”

টিয়া সানুরাগে বলিল “তুমি তো কখনই মুখোমুখি কষ্ট স্বীকার করতে পার না, কিন্তু এমনি করেই শরীরটা কি ভেঙে ফেলবে?”

ফৈজু হাসিয়া বলিল “এ শরীর সহজে ভাঙবার নয়! তুমি তার জন্যে কিছু ভেবো না—”তারপর সে কথা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িল। টিয়ার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল।

অন্যান্য কথার পর টিয়া বলিল “নফর সাহেবদের বিপদের কথা শুনেছ?”

ফৈজু বিস্মিত হইয়া বলিল “কই না, কি হয়েছে?”

টিয়া ব্যথিত করুণ কণ্ঠে সংক্ষেপে যাহা বলিয়া গেল, তাহার অর্থ এই—নজিরুদ্দীনের প্রথম পুত্রটি বহুদিন ধরিয়া জ্বরাতিসারে ভুগিয়া, বিনা চিকিৎসায়, অতি সম্প্রতি মারা গিয়াছে। তার পর দ্বিতীয়টি অল্পদিন পূর্ব্বে সহসা ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছে। নফরের স্ত্রী তখন সূতিকাগারে অথচ অনিয়মে দারুণ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—পুত্রশোকে সেও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বাকী আছে সদ্যোজাত শিশুটি। নানী তাহাকে আনিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অবস্থা ভাল নয়,—শিশুর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যে দুধের প্রয়োজন, তার পয়সা তিনি কোথায় পাইবেন? নজিরুদ্দীন থিয়েটারের হুজুগে উন্মাদ হইয়া আড্ডা বাড়ীতে পড়িয়া পড়িয়া মদ খাইতেছে। সেইখান হইতেই সে লম্বা চালে হুকুম দিয়া পাঠাইয়াছে,—‘সাপুড়ের পোয়ের খরচে সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে,—এখন ঐ এক ফোঁটা ছেলেকে বাঁচাইবার জন্য আর পয়সা খরচ করিতে পারে না! যে কদিন ঐ হতভাগা শিশুটা না মরে, সে কদিন জল বার্লি খাওয়াইয়া উহার ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিয়া রাখা হউক!’

ফৈজু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া সমস্ত শুনিয়া গেল; একটিও শোক, দুঃখ, বা ক্ষোভসূচক শব্দ উচ্চারণ করিল না! এমন শোচনীয় হতশ্রদ্ধায় যাহাদের প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রাণের জন্য শোক প্রকাশ করিলে

শোকের স্বর্গ-শুচিতার অপমান করা হয় যে!—ফৈজু বাহিরে চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তাহার অন্তরাত্মাটা কি এক অব্যক্ত বেদনায়, ক্ষোভে আপনা-আপনি যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল! নজিরুদ্দীনের উপর তাহার মনের ভাবটা তখন যে কিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল,—সেটা লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া দেখিতে ফৈজুর নিজেরই ভয় হইতে লাগিল। কিন্তু তবুও সে বুঝিল—শুধু এই একটি মাত্র—মুখ-চেনা নজিরুদ্দীনের উপর রাগ করিলেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না; ঘরে ঘরে এমন কত নজিরুদ্দীনের কত মূর্খতার নজীর জাজ্বল্যমান,—কে তাহার হিসাব রাখে? সাধারণের পক্ষে,—এগুলা তো নিতান্ত সহজ-স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এ মূর্খতার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলিতে বা ভাবিতে যাওয়া মহামূর্খতা মাত্র। ইহারা বিবাহ করে সহজেই,—কিন্তু বিবাহিত জীবনের কঠিন দায়িত্ব বহনের সময় হাত-পা ছাড়িয়া এলাইয়া পড়ে, ততোধিক সহজেই!

বিদ্যুদ্বেগে তাহার মনের মধ্যে কত চিন্তা বহিয়া গেল, তাহার ইয়ত্তা নাই! একটা অধীর-কাতরতায় হৃৎপিণ্ডটা বুকের মধ্যে সশব্দে লাফাইতে লাগিল। ফৈজু প্রাণপণে সংযত হইয়া নিঃশব্দে আত্মদমনের চেষ্টা করিতে লাগিল;—পাছে টিয়া তাহার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া কোনরূপ উত্তেজনা-চঞ্চল হইয়া উঠে, সেই ভয়ে তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

ফৈজু নিঝুম মারিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া, টিয়াও খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। তার পর ধীরে-ধীরে স্বামীর হাতটি টানিয়া লইয়া বলিল, "শোন—"

দৃষ্টি ফিরাইয়া অত্যন্ত শান্তভাবে ফৈজু বলিল, "কি?" একটু ইতস্ততঃ করিয়া টিয়া বলিল "এই কথার কথা বলছি,—যদি আমিও ওম্নি করে মরে যাই—"

ফৈজুর কণ্ঠ শুকাইয়া গেল! অস্থিরভাবে শয্যা ত্যাগ করিয়া রুদ্ধ-দ্রুত স্বরে বলিল, "পাগলামী কোর না, থাম—"

নির্ব্বাণোন্মুখ ধুনাচির উপর সজোরে বায়ু-সঞ্চালন করিয়া আগুনটা জাগাইবার চেষ্টা করিতে করিতে—ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া, একটু পরিহাস মিশ্রিত ভৎসনার স্বরে বলিল, "পড়ে-পড়ে ঐ সবই হচ্ছে, না? ডাক্তার বুঝি তোমায় ঐ সব ভাবনায় মাথা ঘামাতে বলে গেছেন?"

অপ্রস্তুতে পড়িয়া টিয়া অনুনয় করিয়া বলিল, "না, তা নয়,—তুমি কাউকে বলে দিও না ওটা,—ও আমি শুধু তোমাকেই বলছি—দিদিকে বোল না কিছু—"

ফৈজু উঠিয়া আসিয়া আবার নিকটে বসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া—খুব সহজভাবেই বলিল, "আমার পকেটে কিছু আছে,—নানীর সঙ্গে দেখা করে ছেলেটির জন্যে একটু দুধের বন্দোবস্ত করে দিয়ে আসি,—কি বল?"

একটু বিচলিত ভাবে দৃষ্টি তুলিয়া টিয়া বলিল, "আমায় জিজ্ঞাসা করছ? কেন?"

অপ্রতিভ হইয়া ফৈজু বলিল, "কিছু না,—এইখান থেকেই উঠে যাচ্ছি,—তাই মতলবটা তোমায় জানিয়ে যাচ্ছি।"

"তাই বল"—বলিয়া সুগভীর তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া টিয়া চুপ করিয়া রহিল। ফৈজু দুর্ব্বোধ্য বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "কেন? যদি তোমাকেই জিজ্ঞাসা করতুম, তা হলে কি হোত?"

শুষ্কভাবে একটু হাসিয়া টিয়া বলিল "শুধু অপরাধের ভাগী করা! তোমার মত মানুষের মনকে চিনতে হলে যেটুকু বুদ্ধি থাকার দরকার, আমার যে সেটুকু নাই।" কথাটা বলিতে গিয়া, অজ্ঞাতেই টিয়া আবার গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়িল। একটু থামিয়া বলিল "আমি কিছুই বুঝতে পারি না,—যখন-তখন যা-তা বলে তোমায় বড়ই জ্বালাতন করি,—ভারী ভোগাই, না?"

ফৈজু স্মিত-কোমল-হাস্য রঞ্জিত মুখে তাহার পানে শুধু একবার চাহিল, কোন উত্তর দিল না, সস্নেহে কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। টিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর ধীরে-ধীরে বলিল "সংসারে পয়সার অভাবে গরীব হয়ে অনেকেই থাকে, কিন্তু তার মাঝেও—মন যার বড় হয়—"

টিয়া কি বলিতে চায়, ফৈজু সেটা বুঝিল। বাধা দিয়া বলিল, "ঐ খলিফা আসছে, আমি উঠি তা হলে? তুমি কাহিল মানুষ, বেশী রাত জেগো না,—যা খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়,—আসি তবে?"

টিয়া একটু চঞ্চল হইয়া বলিল "তুমি কাল ভোরেই উঠে চলে যাবে? যাবার আগে আমার সঙ্গে আর একবার দেখা কোরো।"

ফৈজু উঠিতেছিল, আবার বসিল। স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া বলিল "কিছু বল্‌বার আছে? বল, তা'হলে আমি এখনি শুনে যাই।"

টিয়া বলিল, "না, বল্‌বার কিছু নাই,—চলে যাচ্ছ, কত দিনের মত, তাই বলছি,—আর একবার দেখা দিয়ে যেও—যাবার সময় আর একবার এখানে এস।"

একটু হাসিয়া ইতস্ততঃ করিয়া ফৈজু বলিল, "থলিয়া থাকবে যে তোমার কাছে।" তার পর একটু থামিয়া, দৃষ্টি নত করিয়া, মৃদুস্বরে বলিল "এই তো দেখা হোল, আবার কি?—আমি দিন পনের পরে আবার তো আসছি, কেন মন খারাপ করছ।"

অনুরোধের স্বরে টিয়া বলিল, "তা হোক, তুমি আর একবার দেখা দিয়ে যেও।"

খুব কৌতুকের সহিত হাসিয়া ফৈজু বলিল, 'নেহাৎ ছেলে-মানুষী!"—তার পর থামিয়া, কি ভাবিয়া আবার একটু হাসিল। নিজের মাথা হইতে টুপিটা খুলিয়া বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নাও, এইটে তোমার কাছে জমা রেখে চলম, যাবার সময় এসে নিয়ে যাব, কেমন?" ফৈজুর দৃষ্টি স্নিগ্ধ কৌতুকে পূর্ণোজ্জ্বল হইয়া উঠিল! যেন—যেন একটা খুব অদ্ভুত হাস্যোদ্দীপক ছেলেমানুষী করিয়া ফেলিল! টিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া, একটু হাসিয়া—সাবধানে, মৃদু নিঃশ্বাস ছাড়িল!

উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কাঁধের উপর হইতে চাদরখানা টানিয়া লইয়া, ক্ষিপ্রহস্তে মাথায় পাগড়ী জড়াইতে-জড়াইতে, হাসি-মুখে ফৈজু বলিল, "আমি চলুম তা'হলে,—মন খারাপ কোর না,—সাবধানে থেকো।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পথে বাহির হইয়া, এলোমেলো ধরণের চিন্তায় ফৈজুর মন ভরিয়া গেল। যে হতভাগা জীব জন্মিবামাত্র পিতার হৃদয়কে স্নেহ-বিমুখ করিয়া তুলিবে, মাতার কোল জন্মের মত হারাইবে,—সে যে কেনই পৃথিবীতে জন্মায়, আর কেনই সে বাঁচিয়া থাকিতে চায়, সে সম্বন্ধে দর্শন-বিজ্ঞানের জটিল সূত্রসম্মত কোন বড় ভাবনাকে ফৈজু ভাবিতে পারিল না;—সে, তাহার সহজ বুদ্ধিতে যতটুকু কুলায়, ততটুকু ভাবনাই ভাবিল। নিজে যথাসাধ্য দিয়া শিশুর আ'জকার অভাব মিটাইলেই তো সব চুকিয়া যাইবে না,—তাহার ভবিষ্যতের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা কি করিতে পারিবে, সেইটা ফৈজুর মহৎ ভাবনা হইল।

নানীর বাড়ী গিয়া, শিশুটির অবস্থা দেখিয়া, ফৈজুর অন্তর্নিহিত ক্ষোভ চারগুণ বাড়িয়া গেল। পাকাটির মত সরু, ক্ষীণ হাত পা—উদর অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত,—শিশুর মূর্ত্তি দেখিলেই ভয় হয়! সমস্ত অনাচার, অত্যাচার, অনিয়ম, অবহেলার জীবন্ত প্রতিক্রিয়ার মত সে যেন সংসারে আবির্ভূত হইয়াছে! বিরক্তির আক্রোশে সে ক্রমাগতই চীৎকার করিতেছে। তাহার ক্ষুধা কিছুতেই মিটিতেছে না। উদরে স্থান নাই, তবুও ক্ষুধার জ্বালা তাহার কাছে—অশ্রান্ত, অনির্ব্বাণ! শ্রেষ্ঠ খাদ্য মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হতভাগা বালক কৃত্রিম খাদ্যে পরিতৃপ্ত হইতে কোন মতেই ইচ্ছুক নয়

তার পর, এই সব নিঃসম্বল দরিদ্র গৃহে এমন সব মাতৃহীন শিশু পালনের জন্য যে প্রথা পদ্ধতি সাধা আছে, তাহার চমৎকারিতা বড় সুন্দর! সে সৌন্দর্য্য যিনি দু'চোখ ভরিয়া দেখিতে পারিয়াছেন, তিনি যতবড় ধৈর্য্যশীল মানুষই হউন,—তিনিও মানব জীবনকে সর্ব্বান্তরে ধিক্কার দিবেন! একটা মোটা 'গড়ের নলে' অপরিষ্কার কাপড়ের টুকরা জড়াইয়া, কৃত্রিম উপায়ে শিশুকে দুধ খাওয়ান হইতে-ছিল। তাহার দিকে চাহিয়া, ক্ষোভে ফৈজুর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল!

নজিরুদ্দীনের উদ্দেশে অনেকগুলা বিষাক্ত অভিসম্পাৎ বর্ষণ করিয়া নানী কাঁদিয়া-কাটিয়া জানাইল, দানশীলা সুমতি ঠাকুরাণীর সদয় করুণার দানে শিশুটি এখনও বাঁচিয়া আছে। তিনি গত কল্য হইতে সংবাদ পাইয়া, কর্ম্মচারীদের মারফৎ সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিতে-ছেন,—শিশুর দুধ খাইবার কাঁচের বোতল কাল পাঠাই-বেন। কিন্তু নজিরুদ্দীন—হায়!

নিজের পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া নানীর হাতে দিয়া, শিশুর খাদ্যের সুব্যবস্থা করিতে বলিয়া মর্ম্মাহত ফৈজু নজিরুদ্দীনের সন্ধানে চলিল!—তাহাকে বুঝাইয়া বলিয়া কহিয়া যদি মন ফিরাইতে পারে!—যদি শিশুর ভবিষ্যতের

অন্য কিছু ব্যবস্থা করিতে পারে! কিন্তু ভাল'র জন্য চেষ্টা করার ফল এ ক্ষেত্রে ভাল হওয়া—বড়ই সন্দেহ-জনক।

সমস্ত দিনের পর, এইবার পথ চলিতে কৈজুর বেশ একটু ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল। চলিতে-চলিতে এক-একবার মনে হইতে লাগিল, এই নিষ্ফল উদ্যমে আর কায নাই, নজিরুদ্দীন তো ভাই বলিয়া তাহাকে গ্রাহ্য করিবেই না, বন্ধু বলিয়াও তাহার উপদেশে কর্ণপাত করিতে চাহিবে না; এরূপ স্থলে তাহার শিশুর জন্য দয়া ভিক্ষা চাহিতে যাওয়া, সে মিছামিছি একটা হেঁতা মাত্র!

কথাটা কৈজু যতই ভাবিতে লাগিল, তাহার গতি ততই মন্থর হইয়া আসিতে লাগিল! কৈজুর বড় আক্ষেপ হইতে লাগিল যে সাধারণ স্বার্থপর বুদ্ধিমানদের দলে মিশিয়া, সেও অনর্থক অভাব সৃষ্টির জন্য, নিজেও একটা সংসার পাতিয়া ফেলিয়াছে। আজ নিজের অভাবের ভারে তাহার নিজের ঘাড় ভাঙ্গিয়া না পড়িলে,—সে যে স্বচ্ছন্দে অন্যের কত সাহায্য করিয়া কৃতার্থ প্রসন্নতায় ধন্য হইয়া যাইত! এমন ভিক্ষাই বা করিত কেন?

অভাবগ্রস্ত দরিদ্রের সামনে দাঁড়াইয়া, যখনই সে নিজের দারিদ্র্য-দগ্ধ হাত দুটি গুটাইয়া লইতে বাধ্য হইত, তখনই তাহার মনে ঐ আক্ষেপ, ঐ বিরক্তিটা জাগিয়া উঠিত। নয়—অভাব-পীড়িত দরিদ্রের পক্ষে এই যে অভাব বৃদ্ধির উদ্যম,—কি নৃশংস অবিবেচনা ইহা।

নানা কথা ভাবিতে-ভাবিতে, কৈজুর মনের মধ্যে ভারী একটা বিক্ষিপ্তের গোলমাল জমিয়া উঠিল। অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে চলিতে কখন যে সে ঠাকুরবাড়ীর নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, ঠিক করিতে পারে নাই!—হঠাৎ চমক ভাঙ্গিতেই শুনিতে পাইল, ঠাকুরবাড়ী ঢুকিবার চন্দন ঘরটায় কে একজন গুন-গুন করিয়া গান গাহিতেছে—

"আহা এমন সোণার দেশ
হেথা নাইক সুখের লেশ—"

চলিতে-চলিতেই অনাবশ্যক কৌতূহলে কৈজু একবার ঘরখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিল; দেখিল, একজন গৈরিক-আলখাল্লাধারী বাউল পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, দেওয়ালের প্রজ্বলিত 'ওয়াল-ল্যাম্পটা' একবার কমাইতেছে, একবার বাড়াইতেছে,—আর, তারই মাঝে ঘন ঘন, সতর্ক নয়নে এদিক ওদিক চাহিয়া, ভিতরের দুয়ারের পাশে আড়ে-আড়ে চাহিয়া, কাহাকে যেন লক্ষ্য করিতেছে।

লোকটা যদি স্পষ্ট চোখে কাহাকেও লক্ষ্য করিত, তবে কৈজু তাহার আচরণে দৃক্‌পাতও করিত না;—কিন্তু ঐ বিশ্রী বাঁকা চাহনীতে তাহার মনে কেমন একটা খট্‌কা বাধিয়া গেল! হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল!—নজিরুদ্দীনের কথা ভুলিয়া গেল!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আর একজন ভিতর হইতে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বাহিরে আসিলেন;—তাঁহার নাকে সোণা-বাঁধান স্টী-এর চশমা-আঁটা, গায়ে গরদের চাদর, গলায় প্রকাণ্ড ফুলের মালা! লোকটাকে দেখিয়া কৈজু হতভম্ব হইয়া গেল! প্রথমটা চিনিতেই পারিল না; পরে চিনিল,—ইনি সেই প্রসিদ্ধ মোহন্ত মশাই!

মোহন্ত মশাই আসিতে-আসিতে যেন ভক্তির আবেগে উন্মত্ত হইয়াই, বিরাট হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "গোবিন্দ হে প্রাণবল্লভ! জয় গোরাচাঁদের জয়!"

তৎক্ষণাৎ বাউলটিও চট্‌পট ভুলিয়া অস্বাভাবিক ভক্তি-গদগদকণ্ঠে হাঁকিল 'জয় গোরাচাঁদের জয়!'

মোহন্ত ছুটিয়া আসিয়া, হাত মুখ নাড়িয়া, চুপি-চুপি বাউলের কাণে কাণে কি বলিলেন। বাউল তা' শুনিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। মোহন্ত আবার তেমনি ব্যস্তভাবে ছুটিয়া ভিতর দিকে চলিলেন। চৌকাঠ পর্য্যন্ত গিয়াও মুখ ফিরাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, "আলোটা কমিয়ে দাও, কমিয়ে দাও,—হুঁসিয়ার হয়ে এইখেনে পাহারা দাও,—হঠাৎ কেউ না আসে।" তিনি চলিয়া গেলেন।

বাউল মহাশয় আলোটা খুব কমাইয়া দিলেন, এত কম যে ঘর প্রায় অন্ধকার বলিলেই চলে! তার পর সন্তর্পণে ভিতর দিকে আবার উঁকি মারিয়া, একটু সরিয়া আসিয়া হঠাৎ উচ্ছ্বাসভরে অন্য গান ধরিলেন। সে গান, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভক্তি-যোগ-প্রণালী সাধনের কিছুমাত্র অনুকূল নয়,—তার সম্পূর্ণই বিপরীত।

কৈজুর সংশয় ক্রমে শঙ্কায় পরিণত হইল। মোহন্ত মহাশয়ের অশেষ গুণের সুখ্যাতি বেশ জানা-শোনা আছে; কিন্তু আজ এখনকার এই ছুটাছুটি, লুকাচুরির অর্থ কি? সেটার সন্ধান লইতে যাওয়া কৈজুর পক্ষে বড়ই অশোভন

স্পর্দ্ধা প্রকাশ করা হইবে। কিন্তু তবুও……! ফৈজু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

নিরুপায় হইয়া চারিদিকে চাহিল,—কেহ নাই। দূরে-দূরে পল্লীর মুদীখানার দোকানগুলার ঝাঁপ বন্ধ হইবার উদ্যোগ হইতেছে। কাছাকাছি যে কয়খানা ভদ্র গৃহস্থ বাড়ী আছে, সেখানে সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু বর্ষাকালের দিন বলিয়া সন্ধ্যার পরেই পুরুষেরা সবাই বাড়ীর ভিতর আশ্রয় লইয়াছেন। রাস্তায় এমন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না, যাহাকে ঠাকুরবাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া, একটু সন্ধান লইয়া নিশ্চিন্ত হয়!

হঠাৎ ফৈজুর মাথায় এক ফন্দী আসিল। ঠাকুরবাড়ীর চলন-ঘরে সকলের প্রবেশাধিকার আছে,—ফৈজু এক লাফে সিঁড়ি ডিঙাইয়া অকস্মাৎ চলন-ঘরের ভিতর ঢুকিল,—ব্যস্ত ভাবে বলিল, "নাজিরুদ্দীন সাহেব কি এখন থিয়েটারের আড্ডা বাড়ীতে আছে, জানেন?"

ফৈজুর কণ্ঠস্বরে বাউল মহাশয় হঠাৎ ভয়ঙ্কর চমকিয়া উঠিলেন। উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত থামিয়া গেল। মাথা হেঁট করিয়া কাঁধের পাশ হইতে মুখ ফিরাইয়া, কেমন এক রকম 'চোর চোখে' চাহনীতে, নিতান্ত ভীতভাবে ফৈজুর দিকে বক্রকটাক্ষ-ক্ষেপ করিয়া, অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলিলেন, "জানি না, আমি নূতন অভ্যাগত বৈষ্ণব—" পরক্ষণেই তিনি ভিতরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইলেন।

ফৈজুও চমকিল! সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও, এ মানুষটা যে চেনা চেনা ঠেকিতেছে! লোকটাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তৎক্ষণাৎ সেও সঙ্গে-সঙ্গে অগ্রসর হইয়া বলিল, "দাঁড়ান ঠাকুর, মেহেরবাণী করে একটা কায করুন,—ঠাকুরবাড়ীর ভেতর দিক দিয়ে আড্ডা-বাড়ীতে যাবার ঐ যে দুয়ারটা আছে, ঐখান থেকে একবার খোঁজ নিয়ে দেখুন, আমি এদিকের রাস্তা দিয়ে তা হ'লে—"

ফৈজুর মুখের কথা মুখে রহিল—কি একটা অস্ফুট উক্তি করিয়া, ঠাকুর ততক্ষণে চৌকাঠ ডিঙাইয়া ভিতরে অদৃশ্য হইলেন। ফৈজু স্তব্ধ হইয়া গেল!

অকস্মাৎ ভিতরের অন্ধকার হইতে, ব্যগ্র-বিকম্পিত কণ্ঠে কে ডাকিল, "ফৈজু তুমি!"

কাহার কণ্ঠস্বর ফৈজু বুঝিতে পারিল না;—কিন্তু বুঝিল, নারী-কণ্ঠ! তৎক্ষণাৎ অন্ধকার চৌকাঠের সামনে ছুটিয়া গিয়া, বিনা দ্বিধায় বলিল, "হাঁ মা, আমি ফৈজু,—আপনি?"

"তোমাদের দিদিমণি—" বলিয়া অবগুণ্ঠনবতী সুমতি দেবী অন্ধকারের ভিতর হইতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

"দিদিমণি!" ফৈজু স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেখিল, তিনি একাকিনী। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, সেই পলায়িত বাউলটার রহস্যময় চাহনী ও বিসদৃশ সঙ্গীত! ফৈজু আত্ম-দমন করিতে পারিল না—রুক্ষ বিরক্তিতে শঙ্কিত করিয়া বলিল, "আপনি! একলা এখানে অন্ধকারে! ঠাকুর প্রণাম করতে এসেছিলেন বুঝি? পিসিমা কই?"

কম্পিত কণ্ঠে সুমতি দেবী বলিলেন, "পিসিমা আসতে পারেন নি—শরীর খারাপ হয়েছে। আমি, মোক্ষদা দিদি আর ঝিকে সঙ্গে করে ঠাকুর দর্শনে এসেছিলুম—কিন্তু…" দারুণ ক্ষোভ-মিশ্রিত গলার স্বরে বলিলেন, "খুব শিক্ষা হয়েছে আমার! আর আমার ঠাকুর দর্শনে কায নাই,—আমি এইখান থেকেই প্রণাম করে যাচ্ছি। তুমি আমায় বাড়ী পৌঁছে দেবে চল ফৈজু!" সুমতি দেবী হেঁট হইয়া গলবস্ত্রে চৌকাঠের উপর মাথা ঠেকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ফৈজু হতবাক্ হইয়া বলিল, এখনো "ঠাকুর দর্শন হয় নি? তবে? তারা কোথা?"

তীব্র-বিরক্তির সহিত সুমতি দেবী বলিলেন, "চুলোয় গেছে! ঠাকুরবাড়ী ঢুকে আমায় বলে, 'দিদি দাঁড়াও, পূজারী ঠাকুরকে ডেকে আনি, স্নান জল দেবেন,—' বলে মোক্ষদা গেলেন। তার আসতে দেরী দেখে ঝি বল্লে, 'দিদি দাঁড়াও, এইখান থেকে একটু এগিয়ে দেখি'। তার পর কোথায় কে গেল, আর খোঁজ নাই। একলা আমি মহা বিপদে পড়েছি, ফৈজু—" বলিয়াই একটু থামিয়া ক্ষোভোত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "কথাটা ঠিক, যে, সৎ'এর সঙ্গে নরকে যাওয়াও ভাল, কিন্তু বদ'এর সঙ্গে স্বর্গে যাওয়াও উচিত নয়! বাড়ী চল—"

ফৈজুর বিরক্তি উদ্ধত চিত্ত, সহসা মন্ত্রমুগ্ধের মত নত হইয়া পড়িল! সেও যে বড় দুঃখে ঐ কথাই ভাবিতেছিল! ফৈজুর মনের গ্লানি এক মুহূর্ত্তে পরিষ্কার হইয়া গেল! নম্র শান্ত স্বরে বলিল, "ঠাকুর-দর্শনে এসে অমনি ফিরবেন? কেন খুঁৎ রাখবেন দিদিমণি!—আমি এইখানে দাঁড়াচ্ছি, আপনি

একটু এগিয়ে গিয়ে নাটমন্দির থেকে দর্শন করে আসুন না,—ওখানে লোকজনের ভিড় তো নাই।”

মাথা নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে সুমতি দেবী বলিলেন, “এ ভিড়ের ভয়েই সন্ধ্যাবেলা আরতির সময় আসি নি,—ভিড় সরে যাবার পর এসেছি। কিন্তু এখানে অতিথি অভ্যাগত, সাধু-সন্ন্যাসী যেগুলি জুটেছেন, তাদের ছুটোছুটি, হটোপাটির ধুম দেখে আমার হাড় জলে গেছে,—আর নয় ফৈজু, চল এখান থেকে।”

মোহন্ত মশাই এতক্ষণ কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন, কে জানে,—এই সময় হঠাৎ ধুপ ধুপ শব্দে মাটী কাঁপাইয়া, আচম্বিতে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, “কে এখানে—কেগো তোমরা আঃ!” পরক্ষণেই শশব্যস্তে বলিলেন, “দিদি ঠাকরুণ নয়? হ্যাঁ, তাই তো, এ কি! চলে যাচ্ছেন কেন? আসুন, আসুন,—ঠাকুর দর্শন করে যান।”

ফৈজু থমকিয়া দাঁড়াইয়া সুমতি দেবীর পানে চাহিল। সুমতি দেবী মাথা নাড়িলেন। ফৈজু মোহন্ত মশাইয়ের দিকে চাহিয়া ধীরভাবে বলিল “উনি এইখান থেকে প্রণাম করে যাচ্ছেন।”

মোহন্ত মশাই অধিকতর ব্যস্ত হইয়া, ভড়্‌বড়্ করিয়া বলিলেন, “কেন, কেন,—ঠাকুর দর্শন করবেন না? সঙ্গে কে এসেছে? পিসি ঠাকরুণ কই?”

সুমতি দেবী তাহাদের বাক্যালাপের অবসর দিবার জন্য দাঁড়াইলেন না,—অগত্যা ফৈজুও ফিরিল। সুমতি দেবীর পিছু পিছু চলিয়া যাইতে যাইতে সংক্ষেপে উত্তর দিল, “তিনি আজ আসেন নি, শরীর ভাল নাই—” তাহারা চত্বর-ঘর পার হইয়া রাস্তায় নামিল। মোহন্ত মশাই কেমন একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্কে অভিভূত হইয়া, নিস্পন্দ ভাবে সেই-খানে দাঁড়াইয়া রহিলেন;—না পারিলেন নড়িতে—না পারিলেন আর কিছু বলিতে!

রাস্তায় অত্যন্ত অন্ধকার। কয়েক পদ গিয়া, ফৈজু একটু ইতস্ততঃ করিয়া, কুণ্ঠিতভাবে বলিল—“বড় অন্ধকার দিদিমণি. বর্ষাকাল আওলের দিন,—যদি একটু দাঁড়ান, তা হ'লে মোহন্ত মশাইয়ের কাছে একটা আলো চেয়ে নিই।”

ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবে সুমতি দেবী বলিলেন, “মোহন্তর কাছে? না ফৈজু, দরকার নাই, চলে এস, তোমার পায়ে জুতো আছে তো—”

দুঃখিত ভাবে হাসিয়া ফৈজু বলিল “আমার জন্যে কি ভাবছি দিদিমণি, আপনার পা যে খালি—”

“তা হোক, ভগবান আমার ওপর এত সদয় হন নি যে আমি সাপের ঘাড়ে পা দেব। তোমাদের দিদিমণি কি অত সহজে মরবার মত পুণ্য করেছে ফৈজু, কিছু ভেবো না।” বলিয়া সুমতি দেবী দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। ফৈজু হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিল; কিন্তু মনে মনে বুঝিল, কথাটা শুধুমাত্র উপহাস নয়—সুমতি দেবীর অন্তর্নিহিত কি একটা তিক্ততার ঝাঁজ তাহাতে মিশ্রিত আছে! তিনি ভিতরে-ভিতরে আজ একটু অতিরিক্ত মাত্রায় বিরক্তি-বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন!

সদর রাস্তা পার হইয়া, জমিদার বাড়ীর কাছাকাছি হইয়া, গলি-রাস্তায় ঢুকিয়া, ফৈজু নিম্নকণ্ঠে বলিল “মহন্ত মশাই আমার সঙ্গে সেই খিটিমিটিটুকু হয়ে যাবার পর মোহন্তগিরি ছেড়ে দেবেন বলে একবার খুব হৈ চৈ করে লাফিয়েছিলেন,—তার পর কিসের জন্যে যে দয়া করে সে মতলব ছেড়ে দিলেন, কিছু বুঝতে পারলাম না,—আজ আপনার খাতিরে আমার সঙ্গে কথাও কয়ে ফেল্লেন দেখলুম।”

তীব্র ঘৃণা-ভরা বিরক্তির সহিত সুমতি দেবী বলিলেন, “ও লাফালাফির সার! ভক্তি বড় নিঃশব্দেই থাকে,—কিন্তু খালি কলসীর বক্‌বকানির চোটেই মানুষের কাণ ঝালাপালা হয়ে যায়! ছাখো ফৈজু, আমার মন এত নীচু নয় যে, রাতদিন পরের ছুতো খুঁজে বেড়াব, বা তাই নিয়ে ভজন পূজন করে সময় কাটাব। মানুষের দোষ-ত্রুটি যা আমার চোখে পড়ে, আমি যতক্ষণ পারি নিজের চোখ নীচু করে, সাধ্যপক্ষে সেগুলো এড়িয়ে যেতে চাই; কেন না, আমি মানুষকে মানুষ বলেই খাতির করতে ভালবাসি,—ইতর জানোয়ার বলে ভাবতে আমার নিজের প্রাণে ঘা লাগে! কিন্তু ক্রমশঃ বুঝছি ফৈজু, মানুষের স্বভাব যাই হোক, কিন্তু ছারপোকার স্বভাব,—সে ছারপোকাই থাকবে। পিঠের জোরে তাকে যতই চাপ দাও, কিন্তু সে সেই চাপের নীচেই গুটি-সুটি মেরে বসে রক্ত শুষতে চাইবে! আর রক্ত যত সে শুষতে পারুক না পারুক, কামড়ের জ্বালায় নিরীহের শান্তির ঘুমটা সে হিংসা করে ভাঙাবেই ভাঙাবে,—এই তার অভ্যাস।”

ফৈজুর ধমনীর রক্ত স্রোতে ধিকি-ধিকি করিয়া আবার আগুনের শিখা জ্বলিয়া উঠিল ? চির-সংযত-স্বভাবা সুমতি দেবীর মানসিক দৃঢ়তা যে আজ কত বড় অসহনীয় ক্ষোভের আঘাতে এতখানি বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, সেটা বুঝিতে তাহার মস্তিষ্কের ভিতর বজ্রঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল ! সুমতি দেবীকে ঠাকুরবাড়ীতে সেই নিতান্ত অপ্রত্যাশিত অবস্থার মধ্যে হঠাৎ দেখিয়া, গোড়াতেই তাহার ধৈর্য্য টলিয়া গিয়াছিল। তবু সে জোরের উপর আত্মদমন করিয়া সে প্রসঙ্গে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিল !

সুমতি দেবীর অসতর্কতা ক্রটি সসম্মানে এড়াইয়া চলিবার জন্যই সে, সেই বাউলটার অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতাও, অবহেলা ভরে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে ; তবু আবার সেই প্রসঙ্গই উঠিয়া পড়িল !

ফৈজু আত্ম-দমন করিতে পারিল না,—তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিয়া উঠিল, "শুধু পিঠের জোরে চাপ দিলেই ছারপোকা শাসন করা যায় না দিদিমণি,—তাকে শাসন করতে হ'লে নির্দ্দয় ভাবে নোখে টিপে রগড়ে পিষে ফেলাই দরকার !"

পরক্ষণেই ফৈজু আপনাকে সবলে সংযত করিয়া লইল। একটু থামিয়া, ধীর কণ্ঠে বলিল, "কিছু মনে করবেন না দিদিমণি ! আমার মা যদি বেঁচে থাকতেন, তা'হলে তাঁকে আজ এমন অবস্থায় আমার যে কথা বলা উচিত ছিল, আপনাকেও সেই কথাটা—" ফৈজু থামিল।

সুমতি দেবী সহসা স্থির হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বেশ দৃঢ় অথচ শান্ত কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "থাম্‌লে কেন ফৈজু, বল।—হাঁ, আমার আজ উপযুক্ত সন্তান থাক্‌লে, সে আমায় আজ. এস্থলে যা বল্‌তে পার্‌ত, তুমিও তাই বল। সাহস করে যে সত্যি কথা বল্‌তে পারে,—সে আমার মাথায় দশ ঘা মেরেও যদি সুৎপরামর্শ দেয়, আমি তার কথা মাথায় করে নিই ফৈজু—" সহসা গভীর আবেগে সুমতি দেবীর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষণিকের জন্য নীরব থাকিয়া, গাঢ়স্বরে বলিলেন, "ফৈজু, আমার পয়সা নিয়ে তুমি খাট্‌ছ বলে নয়, তোমার চরিত্রের জন্যই আমি তোমায় বেশী স্নেহ করি। অসৎ স্বভাব আত্মীয়ের চেয়ে একজন সৎস্বভাব মানুষকে—সে আমার যতবড়ই নিঃসম্পর্কীয় লোক হোক,—আমি বেশী শ্রদ্ধা করি, বেশী বিশ্বাস করি। মা নিজের গর্ভজাত সন্তানকে যেমন ভাবে ভালবাস্‌তে পারেন, তাকেও তেম্‌নি ভাবে ভালবাসতে আমার ইচ্ছা হয়।"

ফৈজুর বুক ভরিয়া গেল।—আত্মশ্লাঘার গর্ব্বে নয়, একটি মহৎ প্রাণের উদার মহত্ত্ব উজ্জ্বল আনন্দ-জ্যোতিঃ স্পর্শে ! সহসা নত হইয়া উদ্বেলিত কণ্ঠে সে বলিল, "দাঁড়ান দিদিমণি, দাঁড়ান ;—আর একটু—"

অন্ধকারেই সুমতি দেবী যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার সামনের মাটীটুক স্পর্শ করিয়া ফৈজু মাথা নোয়াইয়া শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন করিল। সুমতি দেবী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর, কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "ভগবান মঙ্গল করুন !"

মাথা তুলিয়া, প্রসন্নোজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া ফৈজু বলিল, "বাড়ী চলুন দিদিমণি, আর রাস্তায় কেন ?"

সুমতি দেবী মুহূর্ত্তের জন্য একটু কুণ্ঠিত হইয়া, ইতস্ততঃ করিয়া স্নেহময় কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি যা বলতে চাইছিলে, সেটা কি আর বল্‌বে না ফৈজু ?"

ফৈজুর মন তখন সমস্ত সঙ্কোচ মুক্তির আনন্দে পরিপূর্ণ, স্বাচ্ছন্দ্য-ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত ! সহসা বালকের মত সরল উচ্ছ্বাসে, মুক্ত কণ্ঠে হাসিয়া ফৈজু বলিল, "না দিদিমণি, আর নয়, আমায় মাপ করুন। এর পর আর কি বলবার থাকবে ?"

"থাক"- বলিয়া সুমতি দেবী অগ্রসর হইলেন।

সহসা সামনে হইতে সুতীব্র আলোকচ্ছটা আসিয়া উভয়ের উপর আপতিত হইল ! সঙ্গে সঙ্গে পরুষ কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "কে ওখানে হাসে ?"

ফৈজু অন্তরে-অন্তরে চমকাইত হইয়া গেল। চিনিল, সেটা পিতার কণ্ঠস্বর ! আর বুঝিল, সেই প্রশ্নটা অত্যন্ত উগ্র-রূঢ়তায় পরিপূর্ণ ! ফৈজু হাসিয়াছে, পিতা সেইটুকুই শুনিলেন ;—প্রাণের কি বিমল তৃপ্তির আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সে বালকের মত অসঙ্কোচে হাসিয়াছে, সেটা তিনি জানিলেন না, জানিতে চাহিবেনও না। তিনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই, ফৈজুর প্রতি কঠোর বিচারকের দৃষ্টি স্থাপন করিবেন !

সুমতি দেবীর দিকে চাহিয়া, অন্ধকারেই ফৈজুর মুখ পাংশু হইয়া গেল ! সে পিতার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল

না। সুমতি দেবী ততক্ষণে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "সর্দ্দার, তোমার কৈজু এসেছে বাবা, শুনেছ?"

"শুনেছি, এই যে—" বলিয়া বৃদ্ধ, আগমনশীল পুত্রের দিকে গম্ভীরভাবে চাহিয়া রহিলেন। কৈজু সাম্‌নে আসিয়া নীরবে অভিবাদন করিল।

কেমন আছে, কখন আসিয়াছে, ইত্যাদি চিরপ্রচলিত স্নেহ-সম্ভাষণের এক বর্ণও উচ্চারণ না করিয়া, বৃদ্ধ শুধু তীক্ষ্ণ সংশয়ের দৃষ্টিতে পুত্রের আপাদ-মস্তক বিদ্ধ করিয়া ক্ষণেকের জন্য নীরব রহিলেন। তার পর সুমতি দেবীর পানে চাহিয়া অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে যারা গিয়েছিল, তারা কই? তারা যে এলো না?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সুমতি দেবী সংক্ষেপে বলিলেন, "তারা ঠাকুরবাড়ীতে রয়েছে।"

বৃদ্ধের মুখ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। (ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

বেদ

(সংগ্রহ-আলোচনা)

[শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী]

"ভারতবর্ষের অথবা হিন্দুর গর্ব্ব করিবার এবং নিজস্ব বলিয়া অহঙ্কার করিবার মত একটা অতুল্য সামগ্রী আছে, তাহা বেদ।

ইহার বিষয়ে বহু আলোচনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ভারতবর্ষীয় অধ্যাপক-সমাজ যাহাকে নির্দ্ধারিত ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সে বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, অপর দেশের অপর জাতি ইহাকে কি চক্ষে দেখিয়াছেন, প্রথমতঃ আমরা সেই বিষয়ের আলোচনা করিব। কারণ, গৃহের সামগ্রীর বিষয়ে গৃহের মতামত গৃহেই আছে; কিন্তু সেই বস্তু অপরের নিকট, কি-ভাবে উপস্থিত হইয়াছে, কতটুকু সম্মান, কতটুকু আদর পাইয়াছে ও পাইতেছে, তাহা দেখিতে, তাহা বুঝিতে আনন্দ অধিক।

য়ুরোপের প্রধান প্রধান জ্ঞানী, আচার্য্য ও অধ্যাপক সমাজ, বেদের প্রচার কাল, ও বিষয়ের তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে গিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, খৃষ্টের জন্মের হাজার হইতে দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ই ইহার যথার্থ প্রচারের সময়। পক্ষান্তরে, উঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও অভিমত, ইহা খৃষ্ট জন্মের দুই হাজার বৎসরের পূর্ব্বেকার সময়ে প্রথম হস্তাক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। ভাষাকে অক্ষর দ্বারা আবদ্ধ করার সূত্রের, এই বেদ লিখন কার্য্য হইতেই না কি আরম্ভ।

তৎপূর্ব্বে,—ইহা গুরু হইতে শিষ্যোবাচনিক-শ্রবণে, ও তাহা ধারণার মধ্যে রক্ষা করিবার প্রথায়, প্রচলিত ছিল। এই জন্যই ইহার প্রসিদ্ধ নাম শ্রুতি।

পাশ্চাত্য এই সকল পণ্ডিতবর্গ বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া সিদ্ধান্ত না করিলেও, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, "মানবের দ্বারা আবিষ্কৃত, বেদ-উপনিষদ্ ব্যতীত অপর কোনও পুরাতন গ্রন্থে ভগবানের 'অসীম' "অনন্ত" (infinite) নাম আমরা কুত্রাপি দেখি না।" আর একটা বিষয় তাঁহারা বলেন,—তাহা তাঁহাদের ভাষায় অবিকল উদ্ধৃত করিতেছে:—

"Who can deny that the *Veda* (I know) is the oldest monument of Aryan speech and Aryan thought of which we possess?

ইঁনি আর্য্যজাতি (Aryan nation) বলিতে জগতের কোন্ কোন্ জাতিকে বুঝিতেছেন, এবং আপনাকেও আর্য্য (Aryan) বলিতেছেন কি না, এ সকল বিষয়ে বিচার করা এক্ষেত্রে আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। আমাদিগের উদ্দেশ্য, উক্ত অধ্যাপকগণ 'বেদ'কে কোন্ আসনে বসাইতেছেন তাহাই প্রদর্শন করা।

বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য জগতের ভাষাতত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, পুরাতত্ত্ববিদ, এবং তদনুশীলনকারিগণের নিকটে সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া চর্চ্চা করিবার একমাত্র বস্তু 'বেদ',—ইহা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন।

ভাষান্তরিত হইবার বিষয়ে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিলে দেখা যায়, বেদের আংশিক অনুবাদ প্রথমে চীনজাতি দ্বারা হইয়াছে; এবং চীনই প্রথমে "বেদ"কে স্বীয় ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া য়ুরোপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

মুসলমান-কুল-তিলক সম্রাট আকবর তাঁহাদের ব্যাবহারিক ভাষায় বেদের অনুবাদ করান। কিন্তু তাহাও অংশতঃ হইয়াছিল। এ বিষয়ের যথার্থ মীমাংসা করিবার মত গ্রন্থ এবং সুযোগ আমাদিগের নাই। যাহা পাই, তাহা দ্বারা জ্ঞাত হই, সম্রাট আকবর

অথর্ব্ববেদ এবং অপর-বেদের আংশিক অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার সময় হইতে একশত বৎসর পরে সাজাহান পুত্র ভাগ্যহীন দারা কেবল বেদ অধ্যয়ন এবং তাহার অনুবাদ করিবার মানসেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব আমরা প্রাপ্ত হই না।

তবে দারার চেষ্টা ইহাই বুঝাইতেছে যে, পার্শী বা অপর কোন ভাষায় তাঁহার পূর্ব্বে বেদের অনুবাদে আর কেহ পূর্ণকাম হয়েন নাই।

এই পার্শী-ভাষার অনুবাদ অবলম্বনে ১৮০৫ খৃঃ লাটিন ভাষায় বেদের অনুবাদ করা হয়।

তাহার পর হইতেই য়ুরোপের পণ্ডিতবর্গ ইহার চর্চ্চা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন। তাহা হইতেই অনেক দর্শন-বিষয়ক আলোচনা হয়।

"—which inspired Schopenhauer and furnished to him—as he himself declares,—the fundamental principle of his own philosophy,"

যদিও নিতান্ত সংক্ষেপে, তথাপি ইহা দ্বারা, সভ্য-জগতের মানব-সমাজ কোথায় কি ভাবে 'বেদ'কে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতেছে। অতঃপর আমরা বেদের সংবাদের আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষীয় আলোচনার সার পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, 'বেদ' অনন্ত কাল হইতে প্রচলিত। ইনি অপৌরুষেয়—"ন কেন চিদপি পুরুষেণ প্রণীতো বেদঃ।" অতএব ইহা ঈশ্বর-বাক্য।

দ্বাপর যুগের শেষ সময়ে ভগবান বেদব্যাস সমস্ত বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন। সেই চারি বেদের নাম,—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব। বেদমাত্রই মন্ত্রাত্মক ও ব্রাহ্মণাত্মক। স্তুতিভূত অংশ মন্ত্রাত্মক; যজ্ঞাদি কর্ম্মে মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। ব্যাখ্যাত্মক অংশ—ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ—অর্থাৎ মন্ত্রের ব্যাখ্যা।

প্রত্যেক 'বেদ'ই—কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান—এই তিন কাণ্ডে বিভূষিত।

১ম। **ঋক্‌বেদের**—যে সকল মন্ত্র একপাদ বা অর্দ্ধপাদরূপে পঠিত হয়, এবং যাহা হোতৃ বিহিত কার্য্যোপযোগী, তাহাকেই মন্ত্র কহে। ভাবোদ্দেশ্যজ্ঞাপক বেদাংশই ব্রাহ্মণ ভাগ।

২য়। **যজুর্ব্বেদ** ছন্দোগান বৰ্জ্জিত, কর্ম্ম-সম্পাদক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ।

৩য়। **সামবেদ**—গেয় মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ।

৪র্থ। **অথর্ব্ববেদ** উপাঙ্গ ও উপাসনাত্মক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। (পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন অথর্ব্ববেদ পরবর্ত্তী সময়ে রচিত)।

কেহ-কেহ মতান্তরে বলেন—"ত্রয়ী" শব্দে ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিন বেদকে বুঝায়। কিন্তু বিচারে স্থির হইয়াছে, "ত্রয়ীই" বেদ। মন্ত্রসমূহের রচনার ক্রম অনুসারে "ত্রয়ী" নামের উৎপত্তি। প্রচলিত মন্ত্রকে "ত্রয়ী" বলা হয়। এ বিষয়ে মাধবাচার্য্য অধিকরণমালার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, মন্ত্রভাগাংশের ব্রাহ্মণাংশের ব্যবহারিক ভাবে "ত্রয়ী" পদবাচ্য।

বেদ শব্দের প্রসিদ্ধ নামান্তর শ্রুতি। "শ্রূয়তে ইতি শ্রুতিঃ", কারণ "বেদ" চিরদিনই গুরু-পরম্পরায় শ্রুত। এ জন্যই ইহার প্রণয়নকাল-নির্ণয় বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হইতে যে কোনও সিদ্ধান্তেই উপনীত হউন, আমরা বিশেষ জোর করিয়াই বলিব, ইহা 'অনাদি ও অপৌরুষেয়'। "ছন্দাংসি ছাদনাৎ" (যাস্ক) প্রভৃতি হইতে জ্ঞাত হই, বেদের অপর নাম 'ছন্দ'।

এই চারি বেদান্তর্গত উপবেদসকলে বহু মতান্তর থাকিলেও সার কথায় বলিতে হইলে বলা যায়, চারি বেদের চারিটি উপবেদ আছে।

১ম—ঋক। উপবেদ—**আয়ুর্ব্বেদ**। কর্ত্তা ব্রহ্মা, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরি। কামশাস্ত্রও আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত।

২য়। **ধনুর্ব্বেদ** - যজুর্ব্বেদের উপবেদ। কর্ত্তা ব্রহ্মা, প্রজাপতি। বিশ্বামিত্র, ইহার প্রকাশক।

৩য়। **গন্ধর্ব্ববেদ** - সামবেদের উপবেদ। ভরত ইহার প্রকাশক। সঙ্গীত ইহার প্রতিপাদ্য।

৪র্থ। **অর্থবেদ** - অথর্ব্ববেদের উপবেদ। অর্থনীতি, শস্ত্র-শিল্প, ইহার প্রতিপাদ্য।

বেদোক্ত যজ্ঞ কর্ম্মবিধানে—অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা এই চারিজন ঋত্বিকের প্রয়োজন। অধ্বর্য্যুর কার্য্য বেদী-নির্ম্মাণ প্রভৃতির অনুষ্ঠান। যজুর্ব্বেদোক্ত ইঁহার এই কার্য্যকে অধ্বর্য্য-ক্রিয়া বলা হয়। হোতার কার্য্য হোমাদি কর্ম্ম সম্পাদন। ঋগ্বেদোক্ত হোমের কার্য্যকে হোতৃক্রিয়া কহে। উদ্গাতা সামবেদোক্ত গান। শাস্ত্রবিধান স্বরণাদি উক্ত গানে সম্পাদন ইঁহার কর্ম্ম। ইঁহার নাম ঔদ্গাত্র ক্রিয়া।

ব্রহ্মা। ইনি সকল বেদজ্ঞ। ঐ যজ্ঞীয় কার্য্য পরিদর্শক। ইঁহার কার্য্যকে ব্রহ্ম-কর্ম্ম বলে। বেদোক্ত কর্ম্ম সম্পাদনে এই চারিজন ঋত্বিকের প্রত্যেকের তিনজন করিয়া সহকারী থাকেন। প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, উন্নেতা, এই তিনজন অধ্বর্য্যুর সহকারী। মৈত্রাবরুণঃ অচ্ছাবাক্, গ্রাবস্তোতা, এই তিনজন হোতার সহকারী। প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা, সুব্রহ্মণ্য, উদ্গাতার সহকারী। ব্রহ্মার সহকারী ব্রাহ্মণাচ্ছংসি, আগ্নীধ্র, পোতা।

বহু বিস্তার, এবং বহু মতান্তর থাকিলেও সংক্ষেপে,—ঋক্ বেদের ব্রাহ্মণ একটা; তাহার নাম ঐতরেয়। যজুর্ব্বেদের দুইটি ব্রাহ্মণ; তৈত্তিরীয় ও শতপথ। সামবেদের একটি ব্রাহ্মণ, তাহার নাম তাণ্ড্য। অথর্ব্ববেদের একটি ব্রাহ্মণ, উহাকে গোপথ নামে জ্ঞাত হওয়া যায়।

ঐ মন্ত্র-ব্রাহ্মণের যে যে অংশে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহাকে উপনিষৎ বলা হয়। অতি সংক্ষেপে উপনিষৎ শব্দের অর্থ উপ নি পূর্ব্বক সদ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা হয়।

সদ্ অর্থাৎ সাংসারিক বুদ্ধিবৃত্তিকে শিথিল করিয়া পরব্রহ্মের প্রাপ্তি বিষয়ক সাফল্য প্রদান যিনি করেন, তিনিই উপনিষদ্।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে 'বেদ' অপৌরুষেয়। (হিন্দু মাত্রেই ইহা স্বীকার

করেন) পরমেশ্বর করুণাময়; তিনি জড়-উপাধি বিশিষ্ট জীবের নিবৃত্তির কারণ; সাধনা আবশ্যক ও তাহা উপদেশ সাপেক্ষ বোধে এই "বেদ"রূপ বাণী দ্বারা উপদেশ প্রদান করেন। ইহার বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন, এবং অধিকারী, বিষয়ে সংক্ষেপে বলিলে, বলা যায় ইহার বিষয়—সাধনা, ইহার সম্বন্ধ—উপায় পালিত পদ নির্দ্দেশ; ইহার প্রয়োজন—(মুখ্য) ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার; (গৌণ) পাপক্ষয় ক্ষয়; ইহার অধিকারী—যথার্থ জিজ্ঞাসু বা শঙ্কা; ব্যক্তি। ইহার ক্রম ভোগ-তৃষ্ণার অবস্থায়,—সকাম কর্ম্ম প্রতিপাদ্য বেদ; অভিমুখ ভোগ তৃষ্ণায়, নিষ্কাম প্রতিপাদক বেদ। চিত্তের শুদ্ধি অবস্থায় জ্ঞান প্রতিপাদক 'বেদ'। তৎ অনুশীলনে মোক্ষেচ্ছার বিনিবৃত্তিতে ভক্তি প্রতিপাদক বেদ।

বেদোক্ত সাধন দ্বারা সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে অভিমুখ বুদ্ধির উদয় দ্বারা মোক্ষাভিনিবেশের উদয় হইবার পর, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্ত নিমগ্ন হয়। অনাদি অনন্ত, অপৌরুষেয়—বেদ এই সকলের সাধন পন্থা সকল ও ক্রম নির্দ্দেশে দেখাইয়া থাকেন।

উপবীত-রহস্য

(বৈদিক প্রত্নতত্ত্ব)

[অধ্যাপক শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ]

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় উপনয়নে উপবীত গ্রহণ করিয়াই দ্বিজত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উপবীত-গ্রহণে তাঁহাদিগের যেমন একদিকে বেদ গ্রহণ দ্বারা বিদ্যার্জ্জনের পন্থা উন্মুক্ত হয়, তেমনই অপর দিকে বৈদিক কার্য্যানুষ্ঠানের অধিকার লাভ দ্বারা ধর্ম্মবিষয়েও দাবী জন্মিয়া থাকে। উপবীত ধারণ দ্বারা এত পবিত্র ও গৌরবের অধিকার হইতেই যেন ইহার সম্ভ্রম রূপ কল্পিত হইয়াছে। "সূত্র" শব্দের ঘটনা দ্বারা বা পরম্পরা অর্থ "পরবর্ত্তী" শব্দের বিচারে অনেক সন্নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। উপবীতের রূপ সম্বন্ধে যেরূপ রহস্যের আভাস আমরা পাইতেছি, ইহার নির্ম্মাণ ও ধারণের সম্বন্ধেও তদ্রূপ রহস্যোদ্ঘাটনের আশাতেই আমরা বর্ত্তমান অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

উপবীতের "যজ্ঞোপবীত" "যজ্ঞসূত্র" ও "পবিত্র" এই কয়টী নামই বিশেষরূপে প্রচলিত দেখা যায়। "যজ্ঞোপবীত" ও "যজ্ঞসূত্র" নামের দ্বারা ইহার সহিত যজ্ঞের সম্পর্ক স্পষ্টরূপেই প্রকাশিত হয়। যজ্ঞকার্য্য দ্বারা উপবীত গৃহীত হয় বলিয়া, ইহার যে যজ্ঞোপবীত ও যজ্ঞসূত্র নাম হইয়াছে, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়; এবং পবিত্রভাবে ইহার ধারণ করিতে হয় বলিয়াই যে ইহার নাম 'পবিত্র' হইয়াছে, তাহাও সহজেই প্রতীত হয়। "পৈতা" শব্দ এই পবিত্র শব্দেরই অপভ্রংশ।

"যজ্ঞোপবীত" ও "যজ্ঞসূত্র" নাম যজ্ঞের দ্বারা উপবীত গৃহীত হওয়াতে যেমন হইয়াছে, তেমনই উপবীত গ্রহণের পর নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠান হইতেও হইয়াছে। অমরকোষ অভিধানের "যজ্ঞসূত্র" শব্দের টীকায় ভট্টোজি দীক্ষিত উভয় প্রকার ব্যাখ্যাই প্রদান করিয়াছেন; যথা, "যজ্ঞস্য সূত্রং। যজ্ঞার্থং ধৃতং সূত্রং বা। শাকপার্থিবাদিঃ।"

উপনয়নের পর ব্রহ্মচারীর যজ্ঞসূত্র যে সমস্ত উপাদানে নির্ম্মিত হইত, তৎসম্বন্ধে মনুতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"মৌঞ্জী ত্রিবৃৎ সমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বী জ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী॥" ৪২

মনুসংহিতা—২য় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণদিগের সমান গুণত্রয়ে নির্ম্মিত সুস্পৃশ্য মুঞ্জময়ী মেখলা করিতে হয়, ক্ষত্রিয়দিগের মুর্ব্বাময়ী ধনুকের ছিলার ন্যায় ত্রিগুণিত এবং বৈশ্যের শণতন্তু নির্ম্মিত ত্রিগুণিত মেখলা করিতে হয়। ইহা লিখিয়াই, এই সমস্তের অভাব হইলে, তৎপরিবর্ত্তে কিরূপ উপাদান ব্যবহৃত হইবে তৎসম্বন্ধেও মনু লিখিতেছেন :—

"মুঞ্জালাভে তু কর্ত্তব্যাঃ কুশাশ্মন্তকবল্বজৈঃ।" ৪৩

মনুসংহিতা—২য় অধ্যায়।

"মুঞ্জাদির অপ্রাপ্তিপক্ষে ব্রাহ্মণের কুশের মেখলা করিবেন, ক্ষত্রিয়েরা অশ্মন্তক নামক তৃণবিশেষের এবং বৈশ্যেরা বল্বজ তৃণের মেখলা করিবে।"

পূর্ব্বোক্ত বিকল্প কল্পনার তাৎপর্য্য ইহা বলিয়াই বোধ হয় যে, আর্য্যগণ ক্রমে তাঁহাদের আদি-নিবাস হইতে সরিয়া আসিলে, সেই আদি-নিবাসের উদ্ভিদাদি তাঁহাদের নূতন বাসস্থানে অপ্রাপ্য হওয়াতেই, তাঁহারা নূতন স্থানের উদ্ভিদাদিই তাঁহাদের উপবীতের উপাদান রূপে কল্পনা করিতে বাধ্য হইলেন। বর্ত্তমান সময়ের ভূগোলে আমরা উত্তর মেরুর উদ্ভিজ্জের বর্ণনায় যে ক্ষুদ্র গুল্ম ও অপুষ্প উদ্ভিদের উল্লেখ প্রাপ্ত হই, তৎসমস্ত আমাদের নিকট মনুসংহিতায় বর্ণিত তৃণজাতীয় উদ্ভিদের সজাতীয় বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং আর্য্যগণের প্রথম উপবীত গ্রহণের সময় উত্তর মেরুতে বাস করিবার প্রমাণই আমরা এখানে প্রাপ্ত হইতেছি বলিয়া মনে করি।

উপবীতে তিনটী করিয়া সূত্র ও একটী করিয়া গ্রন্থি থাকার নিয়ম। তিনটী করিয়া সূত্র থাকায়, ইহার নাম "ত্রিবৃৎ" হইয়াছে। মনুতে উপবীতের সূত্র ও গ্রন্থি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :—

"ত্রিবৃতা গ্রন্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা।" ৪৩—২য় অধ্যায়।

"ত্রিগুণা মেখলা এক তিন অথবা পঞ্চগুণিত গ্রন্থিদ্বারা বদ্ধ করিবে॥"

তিনটী সূত্র একগ্রন্থিতে আবদ্ধ হইয়া উপবীত নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই সূত্রের প্রত্যেকটীতে আবার তিনটী করিয়া গুণ থাকাতে ইহা নবগুণযুক্ত হইয়া থাকে। কুল্লুকভট্ট মনুসংহিতার টীকায় ইহা এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন; যথা :—

"ত্রিবৃতং চোপবীতং স্যাত্তস্যৈকোগ্রন্থিরিষ্যতে।
দেবলোঽপ্যাহ যজ্ঞোপবীতং কুর্বীত সূত্রাণি নবতন্তবঃ॥"

আমরা পৈতার যে "নগুণ" নাম সাধারণ ভাষায় প্রাপ্ত হই, তাহা ইহার নবতন্তু বা নবগুণ দ্বারা নির্ম্মাণ হইতেই হইয়াছে।

এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত উপবীতের তিন সূত্র ও এক, তিন বা

* "The World with fuller treatment of India. Longmans, Green & Co. 1-51.

পঞ্চ গ্রন্থির প্রকৃত অর্থ কি? তাহাই আমরা বিচার করিয়া দেখিব।

গ্রন্থি সম্বন্ধে শব্দকল্পদ্রুমের উপনয়ন-বিধিতে আমরা এইরূপ উল্লেখ প্রাপ্ত হই—"ততঃ প্রবর সংখ্যয়া পঞ্চ বা ত্রয়ো বা মেখলা যজ্ঞোপবীত কার্য্যা গ্রন্থয়ঃ কর্ত্তব্যাঃ॥" ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে স্ব স্ব বংশের প্রবর সংখ্যানুসারেই গ্রন্থির সংখ্যা কল্পিত হইয়াছে। বংশোজ্জ্বলকারী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণই "প্রবর" নামে খ্যাত। ইহাদের নামানুসারে উপবীতের গ্রন্থিবন্ধন দ্বারা ইহাদের উন্নত প্রভাবের স্মৃতি চিরকাল সংরক্ষণই গ্রন্থির প্রকৃত উদ্দেশ্য।

দিনে তিনবার যজ্ঞ-সম্পাদনের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশের জন্যই উপবীতের ত্রিগুণ কল্পিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। যজ্ঞোপবীত ও যজ্ঞসূত্র নামের অর্থ হইতেও আমরা এই মর্ম্মই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। ইতঃপূর্ব্বেই আমরা এ সম্বন্ধে ভট্টোজি দীক্ষিতের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছি। যজ্ঞোপবীত গ্রহণের মন্ত্রে এই ভাব আরও বিশদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা দেখিতে পাই; যথা—

'যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতেনোপনহ্যামি।'

"তুমি যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞের উপবীত দ্বারা তোমার বন্ধন (গ্রহণ) করিতেছি॥"

দিনে তিনবার যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম সম্বন্ধে বেদে যে আভাষ পাওয়া যায়, তাহা আমরা নিম্নোক্ত মন্ত্রটির অর্থ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব—

"স সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ পরিব্যত তন্তুং তন্বানস্ত্রিবৃতং যথা বিদে॥" ৩২

ঋগ্বেদ ৯ম মণ্ডল ৮৬ সূক্ত।

"এই সোম যেন সূর্য্যকিরণের পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছেন আমার বোধ হয় তিনি ত্রিগুণসূত্র টানিতেছেন। (অর্থাৎ দিনের মধ্যে তিনবার যজ্ঞ হয়।)" রমেশবাবুর অনুবাদ। মন্ত্রে আমরা যজ্ঞোপবীতের যে "ত্রিবৃৎ" বিশেষণ পাইয়াছি, তাহা যেন অবিকল বেদের ঐ শ্লোকের "ত্রিবৃৎ" হইতেই গৃহীত। যজ্ঞসূত্রের—সূত্রের কল্পনাটিও যেন বেদের "তন্তু" হইতেই পরিগৃহীত। ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা যে দিনে তিনবার যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা হইতে তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে।

উপবীতের এক নাম ত্রিদণ্ডীও অভিধানে স্বীকৃত হইয়াছে। এই নামে ব্রহ্মচর্য্য সংযমের অতি আশ্চর্য্য আভাসই প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপবীত ধারণের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের যে নিষ্ঠা আমাদের অবশ্য-পালনীয় হয়, উপনয়নের "ত্রিদণ্ডী" নাম তাহারই জ্ঞাপক বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমাদের কায়, মন ও বাক্য এই ত্রিবিধ প্রকৃতির উপর উপবীতের দ্বারা শাসন-দণ্ড পরিচালিত হয় বলিয়াই ইহার যে "ত্রিদণ্ডী" নাম হইয়াছে, ইহাই ত্রিদণ্ডী নামের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। শব্দকল্পদ্রুমে ত্রিদণ্ডী শব্দের যে নিরুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই আমাদের বক্তব্যের যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যাইবে—"ত্রিদণ্ডী—ত্রিদণ্ডধারি যতিঃ। কায়বাঙ্মনোদণ্ডযুক্তঃ। [illegible]। যজ্ঞোপবীতম্॥"

এতক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, উপবীতের দ্বারা প্রথম যজ্ঞ-সম্পাদনের অধিকার অর্জিত হইত বলিয়াই, ইহার যজ্ঞোপবীত নাম হইয়াছিল। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া প্রথম ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ হইত বলিয়াই ইহা দ্বিজত্বের বা নবজন্মলাভের চিহ্ন হইয়াছে। তাহাতেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।" "প্রথমে সকলেই শূদ্র হয়; পরে সংস্কার দ্বারা দ্বিজনামে কথিত হইয়া থাকে।"

আমাদের আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, উপনয়নের যুগময় উপবীতের উপাদানের সহিত আর্য্যদিগের প্রথম যুগের জীবনের পবিত্র স্মৃতি যেমন বিজড়িত রহিয়াছে, তেমনি নিত্য-ব্যবহার্য্য উপবীতের গ্রন্থিতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবময় স্মৃতি সংগ্রথিত রহিয়াছে। ইহার ত্রিবৃৎ রূপে আমাদের দৈনিক ত্রিসন্ধ্যার নির্দ্দেশ রহিয়াছে; এবং ইহার ত্রিদণ্ডী নামে আমাদের সংযম-নিষ্ঠার ভাব নিহিত রহিয়াছে। এইরূপে উপবীতের মধ্যে আর্য্য-জীবনের একটি সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত আলেখ্য যে ঐতিহাসিক ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাই সহজে আমরা জানিতে পারিতেছি।

ওমর খৈয়াম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

[শ্রীমোহাম্মদ আবদুর রসিদ, বি এ]

বাহির ভেতরকার শান্তি, শান্তি বিনষ্ট করিয়া বসিয়া যখন য়ুরোপ আস্তিকতা ছাড়িয়া নাস্তিকতার কুহকে পড়িয়া চারি দিক দেখিতে পাইল যে, আধ্যাত্মিক পরিণতি বার্থ প্রতিকূলে দাঁড়াইতেছে, তখন য়ুরোপের অন্তরাত্মা হইতে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইল, "আর ভাল লাগে না!" ঠিক সেই সময়ে ফিটজেরাল্ড ওমর খৈয়ামের কবিতাকে ইংরাজিতে প্রকাশিত করিলেন। আলিবাবার খোজা-প্রাপ্ত লুক্কায়িত বিপুল ধনের অধিকারী চল্লিশ জন দস্যু যেমন দলপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "এই যে আমাদের জীবন মরণ তুচ্ছ করিয়া, হাড়-ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া, ধন সঞ্চয় করিতেছি, ইহা কাহার ভোগের জন্য?" য়ুরোপের কর্ম্মবীর জীবনও তেমনি একটা প্রশ্ন করিতে লাগিল। দস্যু দলপতি যেমন তাহাদের প্রশ্নের বিশেষ মীমাংসা না করিয়া কেবল বলিয়াছিল, "কাহার ভোগের জন্য, এ প্রশ্ন করিও না; সঞ্চয় কর! আন, আর সঞ্চয় কর!!" য়ুরোপের শাসক-সম্প্রদায় সেইরূপ একটা উত্তর ছাড়া আর কোন উত্তরই দিতে পারিতেছিলেন না। এমনি সময় ফিটজেরাল্ড ওমর খৈয়ামের কবিতা প্রকাশ করিলেন:—

"জুড়াই প্রাণিক বঁধু এস মোর শীতল ছায়ায়!"

কর্ম্মক্লান্ত ও সর্ব্বশক্তিমানের অস্তিত্বে ও ক্ষমতায় আস্থাহীন য়ুরোপ ওমর খৈয়ামের কবিতা-রস বিভোর হইয়া পান করিতে লাগিলেন।

এই ওমর খেয়ামের কবিতার আলোচনা করা আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমার বক্তব্য এই যে, যদিও তাঁহার কবিতা পড়িয়া মনে হয় যে, তিনি অনাস্থার নৈরাশ্যকে দ্রাক্ষারসে ডুবাইতে চাহিয়াছিলেন, এবং যদিও উচ্চাকাঙ্ক্ষার অর্থ্যকে মদ বলিয়া তুচ্ছ করিয়া বর্ত্তমানরূপ জীবন্ত মুহূর্তে জীবন সাধনার স্থান নির্দেশ করিতে চাহিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কর্ত্তব্যকে একেবারে ভুলিতে পারেন নাই।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সেলজুক নামক তুর্কীজাতি এসিয়ায় প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। তখন আরব সাম্রাজ্য ও বাগদাদের খেলাফতের গৌরব ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছিল। সর্বত্র সর্ববিষয়ে তখন তুর্কীজাতির প্রাধান্য স্থাপিত হইয়া আসিতেছিল।

সোলতান জালালুদ্দিন মালিক শাহ সেলজুক বংশের তৃতীয় পরাক্রান্ত সম্রাট। ১০৭২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পিতা আল আরসালান (সাহসী কেশরী) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ২০ বৎসর রাজত্বের পর মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে মালিক শাহের মৃত্যু হয়। মালিক শাহের রাজত্ব ঐশ্বর্য্যে, সুশাসনে, পরাক্রমে ও বিদ্যালোচনায় রোম কিংবা আরব রাজত্বের সর্বোৎকৃষ্ট অংশের সহিত তুলনা হইবার যোগ্য। তাঁহার রাজত্বে বাণিজ্যের ও শিল্পকলার চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এসিয়ার যাবৎ নগরেই বিদ্যালয়, উপাসনালয়, পুস্তকালয় ও চিকিৎসালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইঁহার গৌরবময় রাজত্বের কথা এখনো অম্লান রয়।

ওমর খৈয়াম, নিজাম উলমুল্ক ও হাসান বিন সাবা মুসলমান ইতিহাসের এই তিন বিখ্যাত ব্যক্তি বাল্যকালে খোরাসানের সহপাঠী। নিশাপুর বিদ্যালয়ে একসঙ্গে অধ্যয়ন করিতেন। একদিন তাহাদের শিক্ষক কোনও কার্য্যোপলক্ষে শিক্ষাগৃহের বাহিরে গেলে, তাহারা তিন জনে এক অভিনব প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন। প্রতিজ্ঞাটী এই যে, তাঁহারা তিন জনের মধ্যে যে কেহ ভবিষ্যতে উচ্চ পদে আরূঢ় হইবেন, তিনি অপর দুইজনকেও সম্পদে পৌঁছাইয়া দিবেন।

যাহা হউক, কয়েক বৎসর পরে সহসা নিজাম উলমুল্ক রাজ্যের মধ্যে সর্বপ্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি আল আরসালানের মন্ত্রীত্ব করিয়া এত খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন যে, মুসলমান ইতিহাসে তাঁহার মত কার্য্যদক্ষ একটীও মন্ত্রীর আর উল্লেখ নাই। আল্প-আরসালানের মৃত্যুর পর তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত পুত্র মালিক শাহও ইঁহাকে মন্ত্রীত্বে নিয়োজিত রাখেন। মালিক শাহের বিস্তৃত রাজত্ব চীনের প্রান্ত হইতে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত এবং উত্তরে জর্জিয়া (বর্ত্তমান ককেশাস) হইতে দক্ষিণে আরবের ইমেন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নিজাম-উলমুল্ক প্রজাপুঞ্জের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার মানসে ও রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধানার্থ এই বিস্তৃত রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, দ্বাদশ বার পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, নিজাম-উলমুল্ক ঐশ্বর্য্যে ও সম্পদে পৌঁছিবার পর ওমর খেয়াম ও হাসান উভয়েই উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন। নিজাম-উল্‌মুল্ক হাসানকে মাজেন্দ্রান নামক পার্ব্বত্য প্রদেশের উপর আধিপত্য করিতে দিলেন। ওমর খৈয়াম হাসানের মত কিছুই প্রার্থনা না করিয়া কেবল জীবিকা-নির্ব্বাহ হইতে পারে এমন বন্দোবস্ত চাহিলেন। নিজাম উল্‌মুল্‌ক তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার জীবনোপায়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বস্তুতঃ বিজ্ঞানানুশীলন ও জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণা ছাড়া ওমর খৈয়ামের হৃদয়ে আর কোন উচ্চাভিলাষ স্থান পায় নাই।

মোসলেম ইতিহাসের এই তিন ব্যক্তি তিন দিক দিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। নিজাম-উলমুল্কের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ওমর খেয়াম সোলতান মালিক শাহ কর্ত্তৃক তৎকালের প্রচলিত পঞ্জিকার সংস্কার সাধন করিতে নিযুক্ত হন। তিনি আরও কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে লইয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত পঞ্জিকা সম্বন্ধে গিবন বলিয়াছেন, "সময়-গণনা করিবার এই প্রণালী জুলীয়ান প্রবর্ত্তিত প্রণালী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট এবং সঠিকতায় গ্রেগরী প্রবর্ত্তিত প্রণালীর প্রায় সমকক্ষ।" যে সময়ে সূর্য্য রাশিচক্রের মেষে প্রবেশ করে, সেই সময় হইতে ওমর খেয়াম বৎসরের প্রথম দিন নির্ণয় করেন। ইতঃপূর্ব্বে সূর্য্যের মীনে প্রবেশ করা হইতে বৎসরের প্রথম দিন গণনা করা হইত। তদ্ব্যতীত ওমর খেয়াম আরও বহুবিধ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বীজগণিত প্যারীর লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

হাসান বিন সাবা মুসলমান রাজ্যের নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইনি সেলজুক সাম্রাজ্যে নিজের প্রভাব স্থাপন করিতে বিফল মনোরথ হইয়া পদস্থ লোকদিগকে ও রাজপুরুষগণকে গুপ্ত আঘাত দ্বারা হত্যা করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। হাসান তাঁহার দলস্থ লোকদিগকে দৃঢ়চিত্ত, কঠোর ও বদ্ধপরিকর করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে এক অভিনব জাগরণ আনয়ন করিলেন। এই ঘৃণিত নরহত্যাকারী সম্প্রদায় নরহত্যাকে তাহাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিত। হাসান তাহাদিগের মনে এইরূপ ভাব বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহারা বিশ্বাস করিত যে, ধর্ম্ম তাহাদের কার্য্য সমর্থন করে। ইহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা—"দয়িছ" যাহাদিগকে গুপ্ত মন্ত্রণার সকল খবরই বিশ্বাস করিয়া বলা হইত; "রফিক" যাহাদিগকে কিছু কিছু গোপনীয় বিষয় জানিতে দেওয়া হইত; "ফিদাই" যাহারা দলপতি হইতে কোন আদেশ প্রাপ্ত হওয়ামাত্র জীবনের মমতা না করিয়া সেই আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত।

এই ঘৃণিত নরহত্যাকারী দলের নেতার উপাধি ছিল "সৈয়েদেনা" বা "আমাদের প্রভু"। এই দলপতি "পার্ব্বত্য বৃদ্ধ" আখ্যায় অভিহিত হইয়া তৎকালীন জন সমাজে এক মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করে। অবশেষে হাসানের উপকারী নিজাম-উলমুলকও ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। হাসান-প্রেরিত গুপ্ত ঘাতকের হস্তে তিনি ১০৯১ খৃষ্টাব্দে

(১) ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসেও একজন নিজাম উলমুল্ক নামীয় নরপতি ছিলেন।

নিহত হইলেন। ইংরেজী শব্দ "এসেসিন" এই 'হাসান' নরহন্তার নাম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সময়েই খৃষ্টান জগতের সহিত মুসলমান জগতের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ক্রুসেডারগণ দ্বারা হাসানের লোমহর্ষণ কার্যাবলী য়ুরোপে প্রচারিত হয়; এবং তাহার পর হইতেই য়ুরোপে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

মালিক শাহ তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে এই দলের উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনিও উহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ওমর খৈয়াম, নিজাম উলমুল্ক ও হাসান বিন সাবা তিন বিভিন্ন দিক দিয়া অমরত্ব লাভ করেন। নিজাম উলমুল্কের রচিত "সিয়াসৎনামা" বা "রাজ্যশাসন প্রণালী" অদ্যাবধি মুসলমান সমাজে আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে; এবং উহা একটী মূল্যবান পুরাতন তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ, একমাত্র উহাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিতে পারিত।

ভাষা-বিজ্ঞান ও প্রাকৃত-বিজ্ঞান

[শ্রীজয়মঙ্গল সাহা বি-এল, এম্-আর্-এ-এস, (লণ্ডন)]

ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, আমরা এখনও এ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে পারি না। কেহ বলেন, ভাষা প্রাকৃতিক; কেহ বলেন, ইহা ঈশ্বর-দত্ত; আবার কেহ বা বলেন, ইহা মানবীয় শিল্পের চূড়ান্ত নিদর্শন। ভাষা-বিজ্ঞানের সঙ্গে এ শ্রেণীর অন্য কোনও বিজ্ঞানের তুলনা হইতে পারে না। ভাষা ভাবের পবিত্র আধার। এই আধারেরও একটু বিশেষত্ব আছে,—ঘটি যেমন জলের আধার, ভাষা ভাবের তেমন আধার নয়। পুষ্পের সঙ্গে গন্ধের যে সম্পর্ক, ভাষার সঙ্গে ভাবের সেই সম্পর্ক।

জগতের ইতিহাসে ভাষা-বিজ্ঞান এখনও নাবালক,—ভাষা-বিজ্ঞানের বয়স মাত্র একশত বৎসরের কিছু উপর হইবে। যৌবন-দশায় উপনীত হইয়া, নিজ ক্ষমতা-বলে, জগতের বিজ্ঞান সঙ্ঘে (League of Science) যোগদান করিতে ভাষা-বিজ্ঞানের এখনও বহুকাল বিলম্ব আছে। ভাষা-বিজ্ঞানের সে শুভদিন কবে আসিবে,—ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ভাষা-বিজ্ঞানের নাম-করণ লইয়া পণ্ডিত-সমাজে একটু মতদ্বৈধ চলিয়াছে। Comparative Philology, Scientific Etymology, Phonology, Glosology,—এই সকলই ভাষা-বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন নাম। নামের বিভিন্নতা ভাষা-বিজ্ঞান-তত্ত্বানুসন্ধানের প্রতিকূল হইবে, এরূপ মনে হয় না। ফুলকে পুষ্পই বল, আর কুসুমই বল, সকলেই ফুলকে ভালবাসিবে, এবং অনেকেই তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিবে। অবশ্য ফুলকে 'কদলী' বলিলে গোলমালের সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে।

অনুমানমূলক বিজ্ঞানসমূহের (Inductive Sciences) জীবন-বৃত্তান্ত বা ইতিহাসে এক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই সকল বিজ্ঞানের প্রায় সকলেরই জীবনে তিনটি যুগ বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হয়:—প্রারম্ভ যুগ (The Period of Origin), বর্দ্ধনযুগ (The Period of Progress), ও পরিণতি-যুগ (The Period of Failure or Success)।

প্রথমে প্রারম্ভ যুগের কথাই বলিব। ইংরেজীতে একটী সুন্দর কথা আছে,

"Necessity is the mother of invention."—অভাবই আবিষ্ক্রিয়ার প্রসূতি। প্রায় সকল বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মূলেই কোনও প্রয়োজনীয় প্রশ্ন সমাধানের, বা কোনও অজ্ঞাত শক্তির অভাব দূর হইয়া থাকে। যখন কোনও স্থান বা পথের পরিমাণ করিবার আবশ্যক বোধ হইল, তখনই জ্যামিতির আবশ্য। যখন অকূল সমুদ্রে নাবিক চন্দ্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া জাহাজ চালাইতে অসমর্থ হইল, তখনই জ্যোতিষশাস্ত্রের (Astronomy) সৃষ্টি।

যদি কোনও বিজ্ঞান শাস্ত্র কোনও সমাজের অভাব সম্পাদনে, কোনও না কোনও প্রকারে, সহায়তা করিতে না পারিত, তবে জগতে সে শাস্ত্রের অস্তিত্ব টিকিয়া থাকা দায় হইত। যদি ভূতত্ত্ব (Geology), খগোল বিজ্ঞান (Astronomy), রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry), কেবল জগতের আমোদ যোগাইয়া দিত কিন্তু কাহারও উপকারে না আসিত, তবে তাহাদিগকে অপ-রসায়ন বিদ্যা (Alchemy) বা ফলিত জ্যোতিষের (Astrology) দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইত। নিকৃষ্ট ধাতু স্বর্ণে পরিণত করার, কিম্বা সর্ব্বরোগের একমাত্র ঔষধ প্রস্তুত করার রাসায়নিক চেষ্টা বা বিদ্যাকে অপরসায়ন বিদ্যা বলে। এই বিদ্যা এককালে বিলাত দেশে বেশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল, ধাতুর স্বর্ণে পরিণতি, বা সর্ব্বরোগের একমাত্র ঔষধ প্রস্তুত-করণের চেষ্টা সফলকাম হইবার নয়, তখন সে বিদ্যা আস্তে-আস্তে সে দেশ হইতে অপসারিত হইল। সমাজের উপকার সাধনে ফলিত-জ্যোতিষের তেমন কোনও কার্যকারিতা দেখা যায় না। সেই জন্য ভারতে এই বিদ্যার আলোচনা ও প্রসার দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তবেই দেখা গেল, বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি সমাজে তাহার কার্যকারিতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

সকল বিজ্ঞানেরই কোনও একটি অভিপ্রায় আছে। সেই অভিপ্রায়-সম্পাদনই সেই বিজ্ঞানের ধ্যান—সেই বিজ্ঞানের সাধনা। কিন্তু ভাষা-বিজ্ঞানের তেমন কোনও কার্য্যগত অভিপ্রায় আছে বলিয়া মনে হয় না। ভাষা-বিজ্ঞান ভাষা শিক্ষার পথ সুগম ও সহজ করিবার ভান করে না, এবং ভবিষ্যতে কোনও বিশ্বজনীন ভাষা-বিস্তারের ধারণাও লোকের মনে জাগাইয়া তুলে না। ভাষা-বিজ্ঞানের একমাত্র কার্য্য,—ভাষা কি তাহা শিখাইয়া দেওয়া এবং প্রতিভাষা, প্রতি শব্দ বিশ্লেষ করিয়া দেখাইয়া দেওয়া।

একদল ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা নানা দেশের নানা শব্দের বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন, যে, জগতের সকল ভাষারই মূল এক;—সুতরাং যত্ন করিলে কালক্রমে জগতে এক ভাষার

প্রবর্ত্তন অসাধ্য কার্য্য নয়; অন্ততঃ পক্ষে কোনও একটী বিশিষ্ট ভাষার সকল দেশে প্রাধান্য-স্থাপন খুবই সম্ভব নহে। আবার আমেরিকাতে একদল শব্দ-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা কোমর বাঁধিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, সকল জাতি এবং সকল ভাষার মূল কিছুতেই এক হইতে পারে না। সুতরাং বিশ্বপ্রসারী একভাষা স্থাপনের, অথবা সকল দেশে এক ভাষার প্রাধান্য স্থাপনের কল্পনা আকাশে রাজবাটী নির্ম্মাণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পশুরাজ্য ও নর রাজ্যের সীমা লইয়া ভাষাতত্ত্বজ্ঞদিগের মধ্যে একটা প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তাঁহারা বলেন, মানব ও পশুর প্রভেদ ভাষা যতটা বুঝাইতে পারে, এতটা আর কিছুতেই পারে না। এ পর্য্যন্ত পশুজাতি কোনও ভাষার সৃষ্টি করিতে পারে নাই, মানব পারিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত লক্ (Locke) বলেন, পশুদিগের মধ্যে কোনও ব্যাপক অর্থ বোধক শব্দের বা ইঙ্গিতের ব্যবহার নাই। "লতা"—এই শব্দটা উচ্চারণ করিলে, মানব বিশেষভাবে কোনও একটা লতাকে বুঝিলেও সাধারণ ভাবে আরও বহু ও ভিন্ন-ভিন্ন প্রকার লতার ধারণা তাহার মনের মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে জাগিয়া উঠে; কিন্তু পশু সেরূপ ব্যাপক অর্থবোধ পরিশূন্য। এইখানেই মানবে ও পশুতে প্রভেদ।

এখন আমরা বিজ্ঞানের 'বর্গনির্ণয়' বা শ্রেণীবন্ধনযুগের (Classificatory Age) কথা বলিব। বিজ্ঞানের প্রকৃত কার্য্য শ্রেণীবন্ধন। বৈজ্ঞানিক প্রথমতঃ পর্য্যবেক্ষণবলে ঘটনাবলী সংগ্রহ করেন, তৎপরে তুলনা দ্বারা সংগৃহীত ঘটনাবলীর পশ্চাতে এক সাধারণ নীতির আবিষ্কার চেষ্টা করেন। শ্রেণীবন্ধনের উদ্দেশ্য, পর্য্যবেক্ষণ এবং তুলনা করণ—এই দুইটীই বৈজ্ঞানিকের কাজ।

বিষয়টী আরও পরিষ্কার করিয়া বলানো দরকার। আমরা বস্তু বা বস্তুবিশেষকে, কেবল তাহাদের জাতির মনোযোগ সহকারে বিচার বিবেচনা করি না। আমরা পর্য্যবেক্ষণশক্তির অধিকার উত্তরোত্তর বাড়াইয়া বাড়াইয়া তন্মধ্যে কোনও সাধারণ ধর্ম্ম আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করি। সাধারণ ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইলে, বস্তুগুলিকে এক শ্রেণীর বলিয়া গণ্য করি। পুনরায়, এই শ্রেণী, এবং অন্যান্য আরও অনেক শ্রেণী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই শ্রেণীগুলির মধ্যে কোনও সাধারণ ধর্ম্ম বাহির করিবার প্রয়াস পাই। সফলকাম হইলে, এই শ্রেণীগুলিকে কোনও এক উচ্চতর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করি। এইরূপ বহু শ্রেণী হইতে এক শ্রেণীতে উন্নীত হইতে হইতে, অবশেষে আমরা এমন এক শ্রেণীতে যাইয়া উপস্থিত হই, যেখানে আমাদের ক্ষুদ্র মানব-জ্ঞান, কূল কিনারা না পাইয়া, মস্তক অবনত করে;—যাহার উপরে, অন্য শ্রেণীর আবিষ্কার করা আমাদের নগণ্য শক্তিতে আর কুলায় না। তখন আমরা বুঝিতে পারি, সমস্ত প্রকৃতিরাজ্য ব্যাপিয়া, একটি ভাব, একটি নিয়ম, একটি মহৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে; তখন আমরা অনুভব করিতে পারি, এই অন্ধ জড়-জগৎ চেতনা শক্তির ধ্যানে অনুপ্রাণিত! Aristotle বলিয়াছেন "There is in nature nothing interpolated or without connection, as in a bad tragedy!" শ্রেণীবন্ধন-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে, আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, প্রকৃতি রাজ্যে কোনও ব্যাপারই দৈবক্রমে সম্পাদিত হইতে পারে না,—কোনও জিনিসেরই দৈবক্রমে উৎপত্তি সম্ভবপর নয়। প্রত্যেক জিনিসই কোনও জাতির অন্তর্ভুক্ত, এবং প্রত্যেক জাতিই পুনঃ এক পরাজাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতিরাজ্যে সৃষ্ট জিনিসগুলির মধ্যে দৃষ্টতঃ স্বাধীনতা ও প্রকারভেদ থাকিলেও, এই স্বাধীনতা ও প্রকারভেদের অন্তরালে, কতকগুলি নৈসর্গিক বিধানের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই বিধানগুলি, সৃষ্টি সম্বন্ধে, সৃষ্টিকর্ত্তার মনে এক রহস্যময় অভিপ্রায়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে।

বিজ্ঞান-রাজ্যে Induction-এর (বিশেষ হইতে সামান্য সিদ্ধান্ত) কার্য্য বড়ই প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানবিদ কল্পনার মশাল জ্বালিয়া অন্ধকারপূর্ণ বিজ্ঞান রাজ্যে সত্যের সন্ধানে প্রবেশ করেন। দুই-চারিটি ঘটনা সংগ্রহ করিয়া, ইহাদের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক 'জ্ঞাত' হইতে 'অজ্ঞাতে' পঁহুছিতে চেষ্টা করেন। অনেকে সফলমনোরথ হইয়া থাকেন, কেহ-কেহ বা অর্দ্ধপথে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন। 'জ্ঞাত' হইতে 'অজ্ঞাতে' যাইতে, অন্ধকারে সত্যের অনুসন্ধান করিতে, Inductionই বৈজ্ঞানিকের একমাত্র সহায়।

আমরা এতক্ষণে দেখিতে পাইলাম, পর্য্যবেক্ষণ (Observation), তুলনামূলক শ্রেণীবন্ধন (Comparison and classification), এবং অনুমান, বা বিশেষ হইতে সামান্য সিদ্ধান্ত, (Induction) এই তিনটী প্রণালী বৈজ্ঞানিকের অবলম্বনীয়। এই তিনটির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সহজে সত্যের রাজ্যে আক্রমণ করেন, তথা হইতে অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করেন, এবং জগৎকে সেই সকল রত্ন দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন।

ভাষাবিজ্ঞান সাধারণতঃ Comparative Philology নামে পরিচিত। ইহা প্রাকৃত বিজ্ঞান-সমূহের শ্রেণীভুক্ত; সুতরাং উদ্ভিদ্-তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, শারীর-বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রাকৃত-বিজ্ঞান সমূহের তত্ত্বানুসন্ধানে যে সকল পন্থা অবলম্বন করিতে হয়, ভাষাবিজ্ঞানের অনুশীলনেও সেই সকল পন্থাই অবলম্বনীয়।

মানুষের জ্ঞানকে বিষয়ভেদে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক। প্রাকৃতিক জ্ঞানের বিষয়—ঐশ্বরিক বা প্রাকৃতিক কার্য্যাবলী, এবং ঐতিহাসিক জ্ঞানের বিষয়—মানবীয় কার্য্যাবলী। নাম দ্বারা বিচার করিলে ভাষাতত্ত্বকে প্রাকৃত বিজ্ঞান না বলিয়া ঐতিহাসিক বিজ্ঞান বলিলে অধিকতর সুসঙ্গত হয় বলিয়া মনে হয়। কলা-বিজ্ঞান, আইন, রাজনীতি প্রভৃতির ইতিহাস যে শ্রেণীর অন্তর্গত, ভাষাবিজ্ঞানও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া ধারণা জন্মে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে, ভাষাবিজ্ঞান প্রাকৃত বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; সুতরাং কেবল নাম দ্বারা যেন ভ্রান্তির বশবর্ত্তী না হই,—সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এতক্ষণ আমরা তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের (Comparative Philology) কথাই বলিতেছিলাম। এক্ষণে, Philology এবং

Comparative Philology. এই দুই বিজ্ঞানের প্রভেদের আলোচনা আবশ্যক। Philology ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত কিন্তু Comparative Philology প্রাকৃত বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। Philologyতেও ভাষার আলোচনা হয়, Comparative Philologyতেও ভাষার আলোচনা হয়;—তবে এই দুই আলোচনায় একটু প্রভেদ আছে। Philologyতে ভাষাকে মাত্র উপায়-স্বরূপ গ্রহণ করা হয়। Philologyতে আমরা ভাষার অনুশীলন করি, ব্যাকরণ ও শব্দকোষের আলোচনা করি, কিন্তু ইহাদের খাতিরে নয়, এই সকলকে উপায় করিয়া এই সকলের আশ্রয় লইয়া, যাহাতে সমাজ বিশেষের কিম্বা জাতি বিশেষের উৎকৃষ্ট সাহিত্য রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য। কিন্তু Comparative Philologyতে বিষয়টী স্বতন্ত্র। সেখানে ভাষাকে উপায় স্বরূপ গ্রহণ করা হয় না। সেখানে ভাষা নিজেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একমাত্র বিষয়। যে সকল প্রদেশীয় ভাষাতে এখনও কোনও প্রকার সুসাহিত্যের উৎপত্তি হয় নাই, যে সকল অস্পষ্ট অপভাষা এখনও পাহাড়ে বর্ব্বর-সমাজে আবদ্ধ,—সেই সকল ভাষাও Comparative Philologistদিগের নিকট অত্যন্ত আদরণীয়। হোমারের বা কালিদাসের ললিত পদ, সিসেরো বা কালীপ্রসন্নের মার্জ্জিত ভাষা, তাঁহারা যে চক্ষে দেখেন, এই সকল প্রদেশীয় ভাষা বা অপভাষাকে তাহা অপেক্ষা হীন চক্ষে দেখেন না। Comparative Philologyর উদ্দেশ্য কি, একটু ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। Comparative Philologist বা ভাষাবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতে জ্ঞানলাভ করিতে চাহেন না,—মাত্র ভাষা কি, জানিতে চাহেন; ভাব কিরূপে ভাষার অন্তর্গত হয়; কিরূপে ভাষার উৎপত্তি হইল, ইহার প্রকৃতি কি, ইহা কোন্ কোন্ সামান্য বা বিশেষ বিধি দ্বারা শাসিত—ইত্যাদি বিষয় Comparative Philologyর আলোচ্য, এবং এই সকল সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যরাজ্যে পঁহুছিবার জন্য, ভাষা-বিজ্ঞানবিদেরা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা, ভাষার বিভিন্ন তত্ত্ব সংগ্রহ করেন, তুলনা-দ্বারা এই সকল তত্ত্বের শ্রেণীবন্ধন করেন, এবং অনুমান দ্বারা এই সকল তত্ত্ব হইতে নূতন তত্ত্ব—নূতন সত্যের অনুসন্ধানে ধাবিত হন।

যে ব্যক্তি অনেক ভাষা জানেন ও অনেক ভাষায় কথা কহিতে পারেন, তাঁহাকে ইংরেজীতে Linguist বলা হয়। ভাষাবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণকে অবশ্যই Linguist হইতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। ভাষা-বিজ্ঞানবিদ্ ভাষাবিজ্ঞানের খাতিরে যে সকল ভাষার ব্যবহার করেন, সেই সকল ভাষাতেই তাঁহার ব্যবহারিক জ্ঞান থাকিবে এমনটী অসম্ভব। তিনি বিদেশী ভাষা জানিতে বা ঐ ভাষায় কথা কহিতে ইচ্ছুক হইতে নাও পারেন; ঐ ভাষার ব্যাকরণ, ঐ ভাষার শব্দ-কোষই তাঁহার একমাত্র অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়।

ভাষা-বিজ্ঞানবিদ্ ভিন্ন-ভিন্ন ভাষার ভিন্ন-ভিন্ন শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া, সতর্কতা সহকারে উপাদানগুলির পরীক্ষা করেন। সুসাহিত্যে কখনও ব্যবহৃত হয় নাই, এরূপ শব্দাবলীর সুদীর্ঘ তালিকা দ্বারা তিনি কখনও স্মৃতি-শক্তির পীড়া উৎপাদন করেন না। কোনও ভাষাতে অধিকার-লাভ করিতে হইলে, ঐ ভাষার ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য পাঠ করিতে হয়; কিন্তু ভাষা-বিজ্ঞানবিদকে সে আকাঙ্ক্ষায় সে চেষ্টা করিতেই হইবে এমন নয়। তিনি ব্যাকরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালিকা লইয়া পর্য্যবেক্ষণ, তুলনা ও অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে বিচার করিয়া পরীক্ষা করেন। শারীর বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ যেমন প্রাগৈতিহাসিক স্তরে-স্তরে প্রাপ্ত প্রস্তরীভূত খণ্ড খণ্ড অস্থি পরীক্ষা করিয়া, অথবা বহু দূরদেশ হইতে আনীত, অস্পষ্ট বিকৃত ছবি দর্শন করিয়া, শারীর বিজ্ঞানের অনেক নূতন সত্যের আবিষ্কার করেন, ভাষা-বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতও ব্যাকরণের ক্ষুদ্র অংশবিশেষ, বা শব্দাবলীর ক্ষুদ্র তালিকা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ভাষা-বিজ্ঞানের অনেক নূতন সত্যের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হন। যদি জগতের সকল ভাষাতে ভাষা-বিজ্ঞানবিদের পক্ষে ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করিতে হইত, তাহা হইলে ভাষা-বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব জগতে সম্ভবপর হইত না; কারণ, জগতের ভাষাসমূহের প্রকৃত সংখ্যা নির্দ্ধারণ করাই অসম্ভব, সেইগুলিকে আয়ত্ত করা ত দূরের কথা। ভাষার সংখ্যার মোটামুটি যে হিসাব পাওয়া যায়, তাহাও নয় শতের কম নয়।

পাটলীপুত্র এবং জগৎশেঠ বংশ

[২]

[শ্রীরামলাল সিংহ, বি এল]

৩। মাণিকচাঁদ সাহ।

জীবানন্দ সাহের সাত পুত্র—গোবিন্দ সাহ, সদানন্দ সাহ, [illegible] সাহ, [illegible] সাহ, [illegible] সাহ, [illegible] সাহ এবং মাণিকচাঁদ সাহ। জীবানন্দ সাহ নিজ জীবদ্দশায় ভারতের নানা স্থানে কুঠি স্থাপন করিয়া পুত্রগণকে মহাজনী ব্যবসায় শিক্ষা দিয়াছিলেন। জীবানন্দ সাহের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্রগণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়া পিতার ন্যায় মহাজনী ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন।

মাণিকচাঁদ সাহ জীবানন্দ সাহের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি তৎকালীন মুসলমান-বঙ্গের রাজধানী ঢাকানগরে থাকিয়া মহাজনী ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে যখন ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুশ্বান্ ঢাকায় বাঙ্গালার সুবাদার, সেই সময়ে ঔরঙ্গজেব ইস্পাহান দেশীয় মুসলমান বণিক্-পালিত, মুর্শিদকুলী খাঁ নামধারী দক্ষিণ দেশীয় ব্রাহ্মণ তনয়কে বাঙ্গালার দেওয়ানী-পদে নিযুক্ত করেন (১)। মুর্শিদকুলী খাঁর রাজস্ব বিভাগের সহিত সম্পর্ক থাকাতে, ধনকুবের মাণিকচাঁদের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ গাঢ়তর হইল; এবং অচিরে মাণিকচাঁদ সাহ মুর্শিদকুলী খাঁর দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ১৭০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে আজিমুশ্বানের সহিত মুর্শিদকুলী খাঁর মনোমালিন্য ঘটিল। মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকা নগর পরিত্যাগ করিয়া মুখসুদাবাদ নামে পরিচিত মৌজায় আপন

(১) ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গালার ইতিহাস পৃ ৩২৮।

প্রাসাদ, দেওয়ানখানা ও অন্যান্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, মুর্শিদাবাদ নগরের প্রতিষ্ঠা করেন (২)। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে আজিমুশ্বান ঢাকা নগর পরিত্যাগ করিয়া পাটনায় আসিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করিলে, মুর্শিদকুলী খাঁ খালসা দপ্তর অর্থাৎ রাজস্ব-বিভাগও মুর্শিদাবাদে তুলিয়া আনিলেন। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে মাণিকচাঁদও ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে মহিমাপুর নামক স্থানে আপনার আবাস স্থাপন করিলেন। (৩)

কিছুদিন পরে মাণিকচাঁদের পরামর্শ অনুসারে মুর্শিদাবাদে নূতন টাঁকশাল স্থাপিত হইলে মাণিকচাঁদ সেই টাঁকশালের তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হন। এই সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ এক নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন যে, জমিদার এবং অন্যান্য রাজস্ব আদায়কারিগণকে রাজস্ব মাসে-মাসে জমা দিতে হইবে। এই রাজস্ব আদায়ের ভার মাণিকচাঁদের উপর ন্যস্ত হইল। মাণিকচাঁদ রীতিমত রাজস্ব আদায় করিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। মাণিকচাঁদ দিল্লীতে নগদ টাকা না পাঠাইয়া হুণ্ডী পাঠাইতেন। সেই হুণ্ডী দিল্লীতে মাণিকচাঁদের শাখার কুঠিতে ভাঙ্গান হইত। এই কারণে বঙ্গের রাজস্বের আদায়ী সমস্ত নগদ টাকা মাণিকচাঁদের কুঠিতেই জমা থাকিত। কাজেই মাণিকচাঁদের ক্ষমতা অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর ফররোখ শেয়র মাণিক-চাঁদকে "শেঠ" উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মাণিকচাঁদের মৃত্যু হয়। মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে দহাবাগে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ অনেকদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে ভাগীরথী তাহাকে নিজগর্ভে স্থান দান করিয়াছেন (৪)।

পাটনায় মাণিকচাঁদের স্মৃতি চিহ্ন

বাঁকিপুরে "মাণিকচাঁদ কি তালাও" নামে একটি বৃহৎ এবং প্রাচীন পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বাঁকিপুর বা বর্ত্তমান পাটনা জংশন রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে সাড়ে তিন মাইল পশ্চিমে পাটনা খগোল নামক রাজপথের দক্ষিণ ধারে অবস্থিত। এই পুষ্করিণীটি দীর্ঘায়তন এবং গভীর। ইহার জল অতি অনাবৃষ্টির সময়েও শুকাইতে দেখা যায় নাই। পুষ্করিণীর চারিধার ইষ্টক দ্বারা বাঁধান। চারিদিকে চারিটি বাঁধান ঘাট ছিল। এখনও তিন দিকের বাঁধান ঘাট বর্ত্তমান। পূর্ব্বদিকের ঘাটটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। এই পুষ্করিণীর পরিমাণফল ৮.২৭ একর বা বিহারের মাপ অনুসারে ১৪ বিঘা ৭ কাঠা এবং বাঙ্গালা দেশের মাপ অনুসারে প্রায় ২৬ বিঘা হইবে। ইহাকে দীর্ঘিকা বা ত্রিশত ধনু পরিমিত জলাশয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে রাজপথের ধারে এই পুষ্করিণী অবস্থিত, উহা অতি প্রাচীন রাজপথ। উহা অধুনা শেরশাহের সময়ের পথ বলিয়া বিদিত; ফলতঃ উহা বৌদ্ধ যুগ হইতে পাটলীপুত্র হইতে পশ্চিম প্রদেশে গমন করিবার পথ। শেরসাহ এই পথের জীর্ণসংস্কার মাত্র করেন। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে এই পথ দিয়া লোকে পাটনা হইতে দিল্লী প্রভৃতি পশ্চিমদেশে যাতায়াত করিত।

(২) কালীপ্রসন্নের বাঙ্গালার ইতিহাস পৃ ৩৭।
(৩) মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃঃ (৫২)।
(৪) মুঃ কাঃ পৃ ৫৪ ।

এই পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্প প্রচলিত আছে। একদিন মাণিকচাঁদ বর্ত্তমান পুষ্করিণীর সন্নিকটস্থ স্থানে সপরিবারে পটমণ্ডপে অবস্থিতি করিতেছিলেন; এমন সময়ে একজন তৃষ্ণাতুর পথিক সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, পাটনায় এত বড়-বড় ধনী লোকের বাস থাকিতে, পথিকদিগের জলকষ্ট নিবারণের জন্য এই বিস্তৃত রাজপথের ধারে একটিও জলাশয় নাই। মাণিকচাঁদ এই কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অনুমতি করিলেন যে, যেখানে দাঁড়াইয়া এ পথিক ঐ কথাগুলি বলিল, সেইখানেই একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করা হউক। মাণিকচাঁদের আজ্ঞামাত্র লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে বর্ত্তমান পুষ্করিণীটি খনন করান হইল। আজকাল উপরিউক্ত পুষ্করিণীর অর্দ্ধাংশের স্বত্বাধিকারী কলিকাতার জয়মিত্রের লেনবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এবং অন্য অর্দ্ধাংশের স্বত্বাধিকারী পুষ্করিণীর নিকটস্থ চিৎকোহরা (চৈতা কোড়ওা) গ্রামবাসী অনেক মুসলমান জমিদার। নগেন্দ্র বাবু পাটনায় অবস্থানকালে ঐ পুষ্করিণীর অর্দ্ধাংশ রামপ্রসাদ নামক জনৈক বিহারী কায়স্থ ভদ্রলোকের নিকট হইতে অতি অল্প মূল্যে ক্রয় করেন।

রামপ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পুত্রগণ এখনও বর্ত্তমান। তাহারা বলেন, মাণিকচাঁদের তালাও কেন মাণিকচাঁদের প্রতিষ্ঠিত নয়। উহা রামপ্রসাদের অতিবৃদ্ধ পিতামহ দেওয়ান মাণিকচাঁদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তাহারা নিজেদের নিম্নলিখিত বংশাবলী প্রদান করিয়া থাকেন:—

- দেওয়ান মাণিকচাঁদ
  - ফুলচাঁদ
    - কীরতচাঁদ
    - বাঙ্গালীরাম
      - দুর্গাপ্রসাদ
        - রামপ্রসাদ
          - বংশীলাল
          - ভুবনলাল

রামপ্রসাদের পুত্রগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান মাণিকচাঁদ সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব গল্প বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, দেওয়ান মাণিকচাঁদ পাটনার এক অতি দরিদ্র কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্য-কালে উর্দ্দু এবং পারসী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অসহায় মাণিকচাঁদ উদরান্নের দায়ে 'আরাকশের' অর্থাৎ বড়-বড় কাঠ চিরিবার ব্যবসায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। একদিন মাণিকচাঁদ পাটনার গঙ্গার তীরে কাঠ চিরিতেছিলেন, এমন সময়ে ইংরাজদিগের একখানি বজরা ঘাটে আসিয়া লাগিল। বজরাস্থিত জনৈক ইংরাজ একখানি পারসী চিঠি পড়িবার জন্য একজন লোককে ডাকিতে বলিলেন। সাহেবের লোক ঘাটে উঠিয়া মাণিকচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিল, পারসী পড়িতে পারে এমন কোন লোক নিকটে আছে কি? মাণিকচাঁদ বলিলেন, আমি পারসী পড়িতে পারি; সাহেব যদি আজ্ঞা করেন, তাহা

হইলে আমি যাইতে পারি। সাহেবের লোক বজরায় ফিরিয়া গিয়া সাহেবকে বলিল যে একজন হিন্দু ঘাটের উপরে কাঠ চিরিতেছে ;— সে বলিল যে সে পারসী পড়িতে জানে। তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব ? সাহেব বলিলেন, আরাকশের ন্যায় নিম্নশ্রেণীর হিন্দু আবার পারসী চিঠি কি পড়িবে ? কোন মুসলমান মৌলবীকে ডাকিয়া আন। সাহেবের লোক তার পর তিন চারিজন মৌলবীকে ডাকিয়া আনিল। কিন্তু তাহারা কেহই চিঠিখানির মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সাহেবকে বলাইয়া দিতে পারিল না। তখন সাহেব ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, ঐ হিন্দু 'আরাকশ'কেই ডাকিয়া আন। মাণিকচাঁদ আসিলেন, তিনি সুন্দর ভাবে পারসী চিঠিখানি পড়িয়া দিলেন, এবং উহার সকল কথা সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন। সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া মাণিকচাঁদকে ৩০ টাকা বেতনে মুহুরী নিযুক্ত করিয়া রঙ্গপুরে লইয়া গেলেন। রঙ্গপুরে থাকিতে-থাকিতে মাণিকচাঁদ দেওয়ানী পদে উন্নীত হন। সাহেবও রঙ্গপুরে অতি উচ্চপদ প্রাপ্ত হন। একদিন ইংরাজ কোম্পানির কলিকাতার হেড আফিস্ হইতে হঠাৎ চিঠি আসিল যে, অচিরে তিন লক্ষ টাকা পাঠাইতে হইবে। তখন রঙ্গপুরের কাটির ধনাগার শূন্য। সাহেব ভাবিয়া অস্থির। মাণিকচাঁদকে ডাকিলেন। মাণিকচাঁদ বলিলেন ভাবিবার কোন কারণ নাই। রঙ্গপুরের দুইটি জমিদারের প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। আপনি যদি উহাদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করাইতে পারেন, তাহা হইলে তিন লক্ষ টাকা এখনই সংগৃহীত হইতে পারে। সাহেব বলিলেন, আমি জমিদারগণের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখিলাম। কলিকাতা হইতে উহাদের মুক্তির আদেশ শীঘ্রই আনাইয়া দিতেছি, তুমি টাকার যোগাড় কর। মাণিকচাঁদ জমিদারদ্বয়ের আত্মীয়গণকে ডাকাইয়া বলিলেন, যদি তোমরা অচিরে তিন লক্ষ টাকা যোগাড় করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে দুইজনেরই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত হইতে পারে। জমিদারগণের আত্মীয়েরা তিন লক্ষ টাকা আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কিছুদিন পরে জমিদারগণ মুক্তিলাভ করিলেন, এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মাণিকচাঁদকে একলক্ষ টাকা উপহার দিলেন। মাণিকচাঁদ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি একদিন পাটনা হইতে পুনপুন্ গ্রামের নিকটে নিজ জমিদারী দেখিতে যাইতেছিলেন ; তিনি বর্ত্তমান পুষ্করিণীর নিকটস্থ স্থানে আসিয়া পথিকদিগের জলকষ্ট দেখিয়া, তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে ঐ স্থানে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিতে বলেন। উক্ত পুষ্করিণী খনন করিতে, ঘাট বাঁধাইতে এবং শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

উপরিউক্ত গল্পের মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। পুষ্করিণীর উত্তর পারে অবস্থিত শুভ্র শিব-মন্দিরটি যে হিন্দু-কীর্ত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু উহা পুষ্করিণী খননের সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয় না। পুষ্করিণী যেরূপ বৃহৎ, মন্দিরটি তাহার উপযুক্ত নয়। আমাদের বোধ হয় পুষ্করিণী খননের বহুকাল পরে যখন কোন শৈব হিন্দু উহার স্বত্বাধিকারী হন, তখন তিনি উহার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। আমাদের বিশ্বাস, এই পুষ্করিণীটি শেঠ মাণিকচাঁদেরই কীর্ত্তি।

নিখিলবাবু তাঁহার মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে লিখিয়াছেন যে "এরূপ কথিত আছে যে, কোন শেঠবংশীয় পত্নীর সন্তোষার্থ [illegible]টি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। কাহার সময়ে সে পুষ্করিণীগুলি খনন করা হয়, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। আমাদের বিবেচনায় সে সকল গোলাপচাঁদেরই হওয়া সম্ভব।" ([illegible])

আমাদের মনে হয়, পাটনার 'মাণিকচাঁদের তালাও' উপরিউক্ত [illegible]টি পুষ্করিণীর অন্যতম। সম্ভবতঃ শেঠ মাণিকচাঁদই তাঁহার পত্নীর সন্তোষার্থ [illegible]টি পুষ্করিণী খনন করাইয়া থাকিবেন।

শেঠ মাণিকচাঁদের সমসাময়িক ঘটনাবলী। [illegible] খৃষ্টাব্দ মুর্শিদকুলি খাঁ দপ্তর বা দেওয়ানী [illegible] মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করিলে, মাণিকচাঁদ ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে মহিমাপুরে বাস ভবন নির্ম্মাণ করেন।

[illegible] খৃঃ। মুর্শিদাবাদে থাকিতে নবাবের টাঁকশালে নিজের মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া লইবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া ইংরাজ কোম্পানী মুর্শিদকুলি খাঁকে [illegible] টাকা উপঢৌকন প্রদান করেন, এবং কাশিমবাজারে কুঠি নির্ম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ([illegible])

[illegible] ফেব্রুয়ারী [illegible]। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু। ([illegible])

[illegible] ফেব্রুয়ারী। ঔরঙ্গজেবের মধ্যম পুত্র আজিম শাহের দিল্লী অভিমুখে যাত্রা এবং সিংহাসনারোহণ। ([illegible])

জুন [illegible] খৃঃ। আজিমশাহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহ আলম কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিহত হন। শাহ আলম দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করেন এবং বাহাদুর শাহ নাম গ্রহণ করেন। ([illegible])

ফররোখশেয়রের ঢাকা নগর পরিত্যাগ এবং মুর্শিদাবাদে, লালবাগে বাসভবন নির্ম্মাণ, বাহাদুর শাহ কর্ত্তৃক আজিমুশ্বানকে বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যার সুবাদারী পদ পুনঃ প্রদান। আজিমুশ্বান সুবাদারী পদ প্রাপ্তি সত্ত্বেও পিতার নিকট আগ্রায় বাস করাতে শেখ গোলেন আলীখাঁ বেহারের সুবেদারী পদে নিযুক্ত হন। ([illegible])

[illegible] খৃঃ। বাহাদুর শাহের মৃত্যু। [illegible] জাহান্দার শাহের সিংহাসনারোহণ। ([illegible]) আজিমুশ্বানের মধ্যম পুত্র ফররোখশেয়রের মুর্শিদাবাদ

([illegible]) মুঃ কাঃ পৃঃ [illegible]।

(৬) রিঃ বাঃ ইঃ পৃঃ [illegible]। কালীপ্রসন্নবাবু বলেন, [illegible] টাকা দিয়া সনন্দ লইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল মাত্র, আরঙ্গজেবের মৃত্যু হওয়াতে টাকা হস্তান্তরিত হয় নাই। বাঃ ইঃ পৃঃ [illegible]।

([illegible]) রিঃ ইঃ পৃঃ [illegible]।

(৮) রিঃ ইঃ পৃঃ [illegible]।

([illegible]) রিঃ ইঃ পৃঃ [illegible]।

(১০) রিঃ ইঃ পৃঃ [illegible]।

(১১) রিঃ ইঃ পৃঃ [illegible]।

পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা। পাটনার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া পাটনার পূর্ব্ব উপকণ্ঠস্থ "বাগজাফরখাঁ" নামক বাগানে অবস্থিতি এবং সুবেদার হোসেন আলীর (১১) নিকট সাহায্য প্রার্থনা। ফররোখ্‌-শেয়রের পাটনা নগরমধ্যে প্রবেশ। পরদিন হিন্দুস্থানের সম্রাটরূপে অভিষেক। হোসেন আলী কর্ত্তৃক ফররোখশেয়রের জন্য পাটনার মহাজনগণের নিকট হইতে ঋণ এবং ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে সৈন্যগণের ব্যবহার্য্য সামগ্রী গ্রহণ। এলাহাবাদের সুবাদার অবদুল্লাখাঁকে ফররোখশেয়রকে সাহায্য করিবার জন্য হোসেন আলী কর্ত্তৃক অনুরোধপত্র প্রদান। সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া ফররোখশেয়রের পাটনা হইতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা। বারাণসীতে নগর শেঠ এবং অন্যান্য মহাজনের নিকট হইতে সাহায্য। ঋণ দিয়া এক কোটি টাকা কর্জ্জ গ্রহণ এবং সৈন্য সংগ্রহ। (১২)

জানুয়ারী ১৭১৩ খৃঃ। জাঁহাদার শাহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। (১৩) ফররোখশেয়রের সিংহাসনারোহণ। (১৪)

১৭১৩ খৃঃ। মুর্শিদকুলীখাঁর নাজিম বা সুবেদারী এবং দেওয়ানী উভয় পদ প্রাপ্তি। (১৫) মুর্শিদকুলীখাঁ কর্ত্তৃক আজ্ঞা প্রচার যে, অতঃপর ইংরাজ বণিকগণকে ৩০০০ টাকা পেশকশের পরিবর্ত্তে হিন্দুগণ যে হারে শুল্ক প্রদান করেন, সেই হারে কর প্রদান এবং তাঁহাকে এবং তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীদিগকে সময়-সময় উপঢৌকন প্রদান করিতে হইবে।

উদ্বিগ্নচিত্ত অবস্থায় ইংরাজ বণিক্ পরিচালকবর্গ কর্ত্তৃক ডিরেক্টর-গণের নিকট বিলাতে অনুরোধপত্র প্রেরণ এবং দিল্লীশ্বরের নিকট দূত প্রেরণের অনুমতি প্রার্থনা। ডিরেক্টরগণের সম্মতি প্রদান এবং মান্দ্রাজ ও বম্বের গভর্ণরগণের প্রতি আদেশ যে, বঙ্গের দরখাস্তে নিজ নিজ দেশ সম্বন্ধীয় অভিযোগ সন্নিবেশিত করিয়া দিবেন। ইংরাজ কোম্পানীর কলিকাতার এজেন্ট হেজেস্ সাহেব কর্ত্তৃক মিষ্টার জন্ সুরমান, এডওয়ার্ড ষ্টিফেন্‌সন্ এবং আর্ম্মানী বণিক্ খোজা সেরহদ্দ দিল্লীর দৌত্য কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হন। মিষ্টার উইলিয়াম্ হামিলটন্ দূতগণের সহযাত্রী ডাক্তার নির্ব্বাচিত হন। পরে তিনলক্ষ টাকা মূল্যের কাচের দ্রব্যাদি, ঘড়ি, জরির কাপড়, পশমী এবং রেশমী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি উপঢৌকন লইয়া কলিকাতা হইতে ইংরাজ দূতগণের দিল্লী অভিমুখে যাত্রা। দূতগণের পাটনায় আগমন। পাটনা হইতে স্থলপথে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা। ৪ঠা জুলাই তিনমাসের পর দিল্লীতে উপস্থিতি, (১৭) এবং ডাক্তার হামিলটন কর্ত্তৃক ফররোখ্‌শেয়রের ব্যাধি মুক্তি। (১৮)

(১১) এই বাগান এখনও বর্ত্তমান।

(১২) রিয়াজুস সলাতীন্।

(১৩) ষ্টুঃ বাঃ ইঃ পৃঃ ৯৯০

(১৪) ষ্টুঃ ইঃ পৃঃ ৪৯৩।

(১৬) ষ্টুঃ ইঃ পৃঃ ৪০৫।

(১৭) ষ্টুঃ ইঃ পৃঃ ৪১৭-৪১৮।

(১৮) ষ্টুঃ ইঃ পৃঃ ৪২০।

১৭১৫ খৃষ্টাব্দঃ—দিল্লীশ্বরের নিকট মাণিকচাঁদের "শেঠ" উপাধি প্রাপ্তি।

জানুয়ারী ১৭১৬ খৃষ্টাব্দ। বাণিজ্যাধিকার পাইবার জন্য দূতগণের দিল্লীশ্বরের নিকট দরখাস্ত প্রদান। (১৯)

১৭১৭ খৃষ্টাব্দ। ইংরাজগণের ফর্ম্মান্ প্রাপ্তি। মুর্শিদকুলী খাঁ মর্ম্মাহত।

১৭১৯ খৃষ্টাব্দ। ফররোখ্‌শেয়রের পরলোক গমন। (২০)

১৭২২ খৃষ্টাব্দ। শেঠ মাণিক্‌চাঁদ সাহেব মৃত্যু।

বহুরূপী তারা-পর্য্যবেক্ষক সমিতি

[শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র]

আমেরিকার হার্ভার্ড কলেজ মানমন্দিরের অধ্যক্ষগণ বহুরূপী তারা (Variable stars) আবিষ্কার, তাহাদের জ্যোতির হ্রাস ও বৃদ্ধির পরিমাণ এবং ঐ হ্রাস ও বৃদ্ধির কাল পরিমাণ নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে "বহুরূপী তারা পর্য্যবেক্ষক আমেরিকান সমিতি (American Association of variable star observers) নামে একটী সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কেবল মাত্র সাত জন সদস্য লইয়া এই সমিতি প্রথম গঠিত হয়। এক্ষণে ইহার সদস্য-সংখ্যা একশত একষট্টি জন। এই সমিতির সদস্যগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা সারাজীবনের জন্য সদস্য (Life member) হইবেন তাঁহাদিগকে এককালীন ২৫ ডলার, ও যাঁহারা কার্য্যকরী সদস্য (Active member) হইবেন; তাঁহাদিগকে বার্ষিক ২ ডলার চাঁদা দিতে হয়। আর যাঁহারা এই সমিতির প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতাদি করিবেন, ও বহুরূপী তারার আবিষ্কার ও পর্য্যবেক্ষণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবেন, তাঁহারা মাননীয় সদস্য (Honorary members) বলিয়া গণ্য হইবেন, তাঁহাদিগকে কোন চাঁদা দিতে হয় না। সারাজীবন সদস্যগণের প্রদত্ত চাঁদার ½ অংশ লইয়া দূরবীক্ষণ ভাণ্ডার (Telescope fund.) স্থাপিত হইয়াছে। এই ভাণ্ডারে সঞ্চিত অর্থ হইতে ভাল-ভাল দূরবীক্ষণ ক্রয় করিয়া উপযুক্ত সদস্যগণকে বহুরূপী তারা পর্য্যবেক্ষণের জন্য দেওয়া হয়। অবশ্য উহা সমিতির সম্পত্তি থাকিবে। সদস্যগণের দূরবীক্ষণ 'মেরামত' ও দূরবীক্ষণ সম্পর্কীয় অপর যন্ত্রাদির 'মেরামত' কার্য্য এই ভাণ্ডারের অর্থ হইতে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অবশিষ্ট ½ অংশ লইয়া একটী স্থায়ী ধন ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। এই ভাণ্ডারের উৎপন্ন আয় এবং কার্য্যকরী সদস্যগণের প্রদত্ত চাঁদা দ্বারা সমিতির সর্ব্বপ্রকার ব্যয় সঙ্কুলান করা হয়।

পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন দেশ হইতে বহুরূপী তারা পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ সংগ্রহ করিবার মানসে তাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, ভারতবর্ষ, জাপান, চীনদেশ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড এবং স্যাণ্ডউইচ দ্বীপের

(১৯) ষ্টুঃ ইঃ পৃঃ ৪৫২।

(২০) ষ্টুঃ ইঃ পৃঃ ৪৫২।

জ্যোতিষামোদী ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের সমিতির সদস্য হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। এই সকল দেশে বহু সৌখিন জ্যোতিষামোদী ব্যক্তি আছেন, এবং হয় ত অনেকেরই দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে। তাঁহারা কেবল আমোদ-উপভোগের জন্য অসম্বদ্ধ ভাবে চন্দ্র ও প্রধান গ্রহগুলি এবং কদাচিৎ দুই চারিটা নীহারিকা ও যুগল নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া থাকেন। হার্ভার্ড মানমন্দিরের অধ্যক্ষগণ মনে করেন যে, ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহাদের সমিতির সদস্য হইলে, তাঁহাদের মূল্যবান যন্ত্রের সদ্ব্যবহার হইবে,—নিরানন্দ এবং কর্ম্মহীন সময় আনন্দে অতিবাহিত হইবে, অথচ তাঁহারা জগতের একটী শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান, জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতির অংশ-ভাগী হইবেন। পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন দেশে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে পর্য্যবেক্ষক আহ্বান করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহাদের দেশে যখন দিনমান, আমাদের দেশে সে সময়ে রাত্রিকাল। তার পর একদেশের আকাশে মেঘ থাকিলে অন্য দেশের আকাশ নির্ম্মল থাকা সম্ভব। সুতরাং নানা স্থান হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দিবা বা রাত্রি সকল সময়েরই পর্য্যবেক্ষণের ফল পাওয়া যাইবে।

হার্ভার্ড মানমন্দিরের অধ্যক্ষগণ পঁচিশ বৎসর কাল নিয়ত যত্ন করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন সময়ের নভোমণ্ডলের দুই লক্ষাধিক ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই, যে জ্যোতিষতত্ত্ববিদ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল ফটোগ্রাফ বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তাঁহারা [illegible] খানি তারা চিত্র সম্বলিত সমগ্র নভোমণ্ডলের একখানি 'য়্যাটলাস্' বা নভোচিত্রাবলী প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ চিত্রাবলীতে ১০ম শ্রেণীর তারা অপেক্ষা উজ্জ্বল দশলক্ষ পঞ্চাশ হাজার তারার অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা দুইশত বহুরূপী তারার ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ সকল ফটোগ্রাফ তাঁহারা সমিতির সদস্যগণের ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে দিয়া থাকেন। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শনের জন্য জ্যোতিষ্কের এবং হার্ভার্ড মানমন্দিরের গৃহ ও যন্ত্রপাতির অসংখ্য স্লাইড প্রস্তুত করিয়াছেন। সদস্যগণ ঐ সকল স্লাইড লইয়া নিজেদের দেশের জন-সাধারণকে দেখাইয়া, জ্যোতিষ্কের ও জ্যোতিষশাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে পারেন। ঐ সকল স্লাইড সদস্যগণ বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন; কিন্তু উহা মানমন্দিরের সম্পত্তিই থাকিবে, এবং আবশ্যক মত তাঁহারা উহা ফেরত লইবেন। কেবল আসা ও যাওয়ার খরচা সদস্যগণকে দিতে হয়।

"দন্ত ও দন্তের যত্ন" বিষয়ে দুটি কথা

[শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ]

বিগত শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত রফিদ্দিন আমেদ মহাশয় "দন্ত ও দন্তের যত্ন" সম্বন্ধে যে সুন্দর প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপলক্ষে দন্তসংরক্ষণ বিষয়ে দু'চারিটি কথার আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে সাহসী হইলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি দন্তরোগের যন্ত্রণায় ভুক্তভোগী; কয়েক বৎসর ধরিয়া দন্তরোগে অত্যধিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শেষে দন্তগুলি উৎপাটন করাইয়া কতকটা শান্তিলাভ করিয়াছি। প্রথমে যখন দন্ত খারাপ হইতে আরম্ভ হয় সে সময়ে দাঁতের উপেক্ষা করিয়াছিলাম,—বিশেষ কোন প্রতিকারের চেষ্টা করি নাই। তাহার ফলে পরিণামে অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছি। "দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না" আমাদের দেশের লোক এ কথাটী [illegible]। সুতরাং যাঁহাদের দন্ত এখনও সুস্থ আছে, তাঁহারা [illegible] একটু বিশেষ মনোযোগ করিলে, ভবিষ্যতে আমার মত কষ্ট পাইতে হইবে না।

[illegible] অপরিষ্কার রাখার [illegible], এ কথা খুব সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তবে কতকগুলি রোগের ফলে এবং পারদঘটিত ঔষধাদির অপব্যবহারের ফলে দন্তমূল শিথিল হইয়া দন্তরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা আমরা [illegible]।

লেখক মহাশয় দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা দন্ত পরীক্ষা করাইবার এবং তাঁহাদের দ্বারা দন্তরোগের চিকিৎসা করাইবার বিষয়ে যে সৎ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমার নিবেদন এই যে, ঐরূপ [illegible] দেশে [illegible] দেশের জন-সাধারণের [illegible] উপযুক্ত চিকিৎসা [illegible], তার পর পল্লীগ্রামে বা ছোট ছোট সহরে দন্ত-চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দুষ্প্রাপ্য। যে ব্যবস্থা সহজে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইতে না পারে, সে ব্যবস্থা দেশের উপযোগী হইতে পারে না; মুষ্টিমেয় ধনীদিগের উপকার হইতে পারে মাত্র। Tooth pick or floss silk এর নাম আজ কয় লোকের জানা আছে, ব্যবহার করা ত দূরের কথা। স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি দ্বারা দন্তের গর্ত্ত বন্ধ করিবার সামর্থ্যও আমাদের দেশের কয় লোকের আছে। 'ভারতবর্ষের' পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে কয়জন ঐরূপ ব্যবস্থামত দন্তরক্ষণের বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, জানি না, তবে বোধ হয় তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী হইবে না।

আমি ঠিক বলিতে পারি না, তবে আমার বোধ হয় যে, অনুপাত হিসাবে ধরিয়া দেখিলে, আমাদের দেশের লোকদিগের দন্ত য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদিগের দন্ত অপেক্ষা বেশী সুস্থ। বিলাত আদি দেশে কৃত্রিম দন্তের ব্যবহার আমাদের দেশ অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক, এ কথা বোধ হয় অবিসম্বাদী সত্য। আমাদের বঙ্গদেশ অপেক্ষা বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশবাসিগণের দন্ত বেশী দৃঢ় এবং স্থায়ী হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। এ বিষয়ে একজন প্রাচীন বাঙ্গালী ডাক্তার মহাশয়ের সঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "বহুকাল হইতে দন্ত দ্বারা শক্ত জিনিষ খাওয়ার বেশ অভ্যাস থাকিলে, সে দন্ত বেশী দিন কার্য্যক্ষম থাকে। এক সময় পশ্চিম দেশের লোকে ছানা,

ভুট্টা প্রভৃতি শক্ত জিনিস চর্ব্বণ করিয়া আহার করে, এ জন্য তাহাদের দাঁত বেশী শক্ত থাকে। আর আমরা এরূপ শক্ত জিনিস খুব কমই ব্যবহার করি। ছোলা, চিঁড়া প্রভৃতিও আমরা বেশীর ভাগ ভিজাইয়া নরম করিয়াই খাই। সুতরাং প্রকৃতি মনে করেন যে, ইহাদের দাঁত আর শক্ত রাখিয়া কি হইবে। এ কথাটা নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না; ইহার মধ্যে সত্য আছে বলিয়া আমি মনে করি। আমাদের হিন্দুর ধর্ম্মের অনেকগুলি প্রাচীন প্রথার মধ্যেও এ দন্তরক্ষণ উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আহারান্তে খড়িকা খাওয়ার প্রথাই তাহার প্রমাণ। খড়িকা আমাদের toothpick এরই কাজ পূর্ব্বে নিখরচাতে সম্পাদন করিত।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই মধ্যে 'দাঁতনকুল্লা' করিবার প্রথাটি খুব ব্যাপকভাবে এখনও প্রচলিত আছে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অনেকক্ষণ ধরিয়া দন্ত-কাষ্ঠ দ্বারা বেশ করিয়া বাহির ভিতর উভয় দিকে দাঁত মাজিয়া, তার পর সেই দাঁতন চিরিয়া তদ্দ্বারা জিহ্বা মার্জ্জন করে, তৎপরে "কুল্লা" করিয়া থাকে। এই 'দাঁতন-কুল্লা' করিবার পূর্ব্বে তাহারা কখন কিছু আহার করে না। রেলপথে ভ্রমণ করিতেছ, যে ষ্টেসনে প্রাতঃকাল হয়, সেখানে ষ্টেসনের পানিপাঁড়ের নিকট হইতে দাঁতন লইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে বসিয়া 'দাঁতন কুল্লা' করে; তার পর "পানিপিনা" অর্থাৎ সাথে কিছু একটু মিষ্ট দ্রব্য মুখে দিয়া জলপান করে।

এইরূপ দাঁতন কুল্লার প্রচলন থাকায়, এবং নিম্নশ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অতিরিক্ত পান খাইবার প্রথা প্রচলিত না থাকায়, ইহাদের দন্তগুলি বেশ পরিষ্কার থাকে, এবং দন্তের রোগও অনেক কম হয়, শীঘ্র ইহাদের দাঁতও পড়ে না। কঠিন বস্তু চর্ব্বণ এবং এইরূপ দন্ত মার্জ্জন করাই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। দাঁতন করা আমাদের দেশেও পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; এখন অনেকেই তাহা বর্জ্জন করিয়া, টুথ্ ব্রাসের ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। হিন্দু-শাস্ত্রে প্রাতঃকালের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাবলীর মধ্যে দন্ত ধাবন একটি প্রধান কার্য্য। কোন্ কোন্ কাষ্ঠ দন্ত-কাষ্ঠ রূপে ব্যবহার করা হইবে, আয়ুর্ব্বেদে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আস্‌সেওড়া, আম, বকুল প্রভৃতি অনেক বৃক্ষের সরল ডালের দ্বারা দন্ত-মার্জ্জন করিবার বিধি আছে। আপামার্গ বা আপাংএর মূল দ্বারা দন্ত-মার্জ্জন করিলে, দন্তমূল দৃঢ় হয় এবং দন্ত রোগ হইতে পারে না—এ কথাও আয়ুর্ব্বেদে স্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে। আমার একজন বন্ধু নিয়মিত ভাবে আপামার্গের মূল দ্বারা দন্তমার্জ্জনা করিয়া বেশ ফল লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি।

খুব ভাল এঁটেল মাটি সম্যক ভাবে চূর্ণ করিয়া, তাহা ছাঁকিয়া, জলে দিয়া, ভাল করিয়া মিশাইয়া লইয়া, অর্থাৎ যাহাতে তাহার মধ্যে শক্ত কঙ্করাদি না থাকে, এরূপ করিয়া লইয়া, তাহার দ্বারা দন্ত-মার্জ্জনা করিলেও দন্ত-রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

আহারান্তে খড়িকা দ্বারা দাঁত খুঁটিয়া, দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে যে সব খাদ্যাদির কণা জমিয়া থাকে, তাহা বাহির করিয়া ফেলিয়া, পুনরায় ভাল করিয়া কুলকুচি করিয়া ফেলা বড়ই উপকারক। আমাদের হিন্দু-পরিবারে এই প্রথা বহুলরূপেই প্রচলিত ছিল। এখন সে সব বিষয়ে আমাদের অনাস্থা জন্মিয়াছে। সকলের মধ্যেই আমরা কুসংস্কারের ভীতিপ্রদ চিহ্ন দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, সুতরাং খড়িকা খাওয়াটাও বুঝি অসভ্যতার চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

আরও একটি প্রথা আমরা বাল্যকালে আমাদের গুরুজনের মধ্যে দেখিয়াছি। তাহা এই যে, দুই বেলাই আহারান্তে ভুক্তাবশিষ্ট লবণ দ্বারা দন্তমার্জ্জনা করা। ভোজন পাত্র ত্যাগ করিয়া উঠিবার সময়ে পাতে যে লবণ অবশিষ্ট থাকে, তাহা অঙ্গুলিতে করিয়া লইয়া বেশ করিয়া তাহা দ্বারা তাঁহারা দাঁত মাজিয়া ফেলিতেন; তার পর মুখ প্রক্ষালনাদি করিতেন। একজন ডাক্তার আমাকে বলিয়াছিলেন যে এইরূপ লবণ দ্বারা আহারের পর দন্ত-মার্জ্জনা করা দন্ত-ক্ষয় নিবারণ পক্ষে বৈজ্ঞানিক হিসাবেই বিশেষ সহায়তা করে। ভুক্ত দ্রব্যের কণা প্রভৃতি দাঁতের ফাঁকে-ফাঁকে থাকিয়া, ক্রমে পচিয়া অম্ল উৎপাদন করে। লবণ দ্বারা সেই দোষ দূরীভূত হয়। আমাদের দেশে যে "খাইতে তিতা দাঁতে নুন পেট ভরবে তিন গুণ" ইত্যাদি প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে দাঁতে নুন দিয়া মাজনা করা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

সকাল বেলা সরিষার তেল এবং লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বারা দন্ত-মার্জ্জন করাও দন্তের পক্ষে হিতকর।

যোগনিষ্ঠ একজন ব্যক্তি আমাকে আর একটি মুষ্টিযোগ বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা এই যে, প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই মুখে এককোষ শীতল জল লইয়া কিছুক্ষণ মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া, তার পর কুলকুচি করিয়া ফেলা; আর মলমূত্র ত্যাগকালে দাঁতে-দাঁতে একটু জোরে চাপিয়া মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে হইবে,—মুখ খুলিবে না। তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই প্রক্রিয়া প্রত্যহ নিয়মমত করিলে, দাঁত নিশ্চয় ভাল থাকিবে। দুঃখের বিষয় এই যে আমার দাঁত তৎপূর্ব্ব হইতেই খারাপ হইয়া গিয়াছিল,—আমি ঐ প্রক্রিয়া নিজে রীতিমত নিয়মিতভাবে করিতে পারি নাই। অতিরিক্ত পান খাওয়াতেও দাঁতের পীড়া জন্মিয়া থাকে। বিশেষতঃ, পান খাইয়া মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার না করিলে ঐ সব কুচি মুখের মধ্যে থাকিয়া গিয়া দাঁতের পীড়া উৎপাদন করে।

লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, মুখ গহ্বর পরিষ্কার রাখা দাঁতের রোগ হইতে মুক্তি পাইবার প্রধান উপায়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের লোক (হিন্দু-মুসলমান উভয়েই) দিনের মধ্যে অনেকবারই মুখগহ্বর ধৌত করিয়া থাকেন। উভয় জাতিরই ধর্ম্মকার্য্যেও জলের ব্যবহারের বেশী প্রয়োজন হয়। হিন্দুর পূজা-আহ্নিক এবং মুসলমানের নমাজের সময়েও মুখ-গহ্বর ধৌত করা এবং হস্তপদাদি প্রক্ষালন করা অবশ্য কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। এই কারণেও বোধ হয় আমাদের দেশের লোকে পাশ্চাত্য দেশীয়গণের অপেক্ষা দন্ত পীড়া অনেক কম ভোগ করেন।

আমি নিজে অনেকগুলি ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের আলোচনা করিয়া

দেখিয়াছি যে, আমাদের দেশের প্রাচীন লোকদের মধ্যে দন্তরোগ আরও অনেক কম ছিল বলিয়া বোধ হয়। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণের মধ্যে অনেকেই বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত চাল কলাই ভাজা আহার করিয়াছেন দেখিয়াছি। কোন কোন বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার ৮০।৯০ বৎসর বয়স পর্য্যন্তও দন্ত অবিকৃত থাকার বিষয় জ্ঞাত আছি। এই সব কারণে আমার বোধ হয় যে, যখন আমাদের দেশে দন্তচিকিৎসায় এবং দন্ত পীড়ার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তেমন সুলভ নহে, এবং কথায়-কথায় দন্ত-চিকিৎসককে দেখানও আমাদের দেশের সাধারণ লোকদের সহজ নহে, তখন যে সমুদয় উপায় ও প্রক্রিয়ার অবলম্বনে কোনও খরচ নাই, কেবল নিজের ইচ্ছার আবশ্যকতা মাত্র, অথচ যাহার দ্বারা বিশেষ সুফল পাইবার প্রত্যাশা আছে, সেই সবগুলির দিকে সুদৃঢ় প্রধান হইতে মনোযোগ দিলে, দন্তরক্ষণ বিষয়ে অনেক সাহায্য হইতে পারে। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে বালক-বালিকাদিগের দন্ত পরীক্ষার ব্যবস্থার কল্পনা যে সুন্দর তাহা ঠিক, প্রত্যেক সহরে সেরূপ ব্যবস্থার বহুকাল বিলম্ব আছে। আর আমার বোধ হয় সরকার হইতে সেরূপ ব্যবস্থার প্রচলন হইলেও তাহার দ্বারা চিকিৎসক পোষণ ব্যতীত আর বেশী কিছু হইবে না। তাহাতে প্রাচীন সত্যের কোন প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কারণ আমার বিশ্বাস এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে দন্তরোগটা ম্যালেরিয়ার মত বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। বিলাত আদি প্রদেশের ন্যায় প্রমাণ দেখি।

আমি উপরে যে সমুদয় সহজ এবং ব্যয়বাহুল্যহীন উপায়গুলির কথা বলিলাম, এগুলি অতি দরিদ্র ব্যক্তিও অনায়াসেই ব্যবহার করিতে পারেন এবং নিয়মিত ব্যবহারে ইহার দ্বারা সুফল লাভও নিশ্চয়ই করা যাইবে।

লেখক মহাশয় প্রথম হইতে সন্তানের দন্তের সুস্থতা সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিবার জন্য পিতামাতাকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা অতি সমীচীন, সে কথা বলাই বাহুল্য। দুধে দাঁত বলিয়া প্রথম হইতে অবহেলা করিলে শেষে অনেক সময় দন্তরোগ দূর করা কঠিন হইয়া পড়ে। ছেলেবেলা "দাঁতে পোকা" লাগিয়া অনেক সময় দাঁত এমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় যে, আজীবন সেইরূপ দাঁত লইয়াই কাহাকে কাহাকে কাটাইতে হয়। অতএব সময় থাকিতে সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সকল পরিবারেই এটা প্রধান লক্ষ্য-স্থল হওয়া উচিত যে বালক বালিকাগণ সকালে উঠিয়া ভাল করিয়া দন্ত-মার্জ্জন করে এবং প্রত্যেকবার আহারান্তে বেশ ভাল করিয়া বারবার জোরে কুলকুচি করিয়া মুখ ধৌত করে। মাংসাদি আহারের পর দাঁতের ফাঁকের মধ্যে মাংসের আঁশ বা অন্য কোন খাদ্যাংশ না থাকে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

রাত্রিকালে আহারাদির পর শয়নের পূর্ব্বে একবার ভাল করিয়া দন্ত-মার্জ্জনা পূর্ব্বক মুখ ধৌত করা দন্তের পক্ষে বড়ই উপকারী। আর কোন কারণে মুখ দুর্গন্ধ হইলে একটা লবণ দিয়া আরাম পাওয়া যায়, তাহা যাঁহারা চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দন্ত পরীক্ষাগার স্থাপন করা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে অসম্ভব হইলেও প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সাধারণ স্বাস্থ্য ভঙ্গের মত সত্যগুলি শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দন্তের প্রতি যত্ন করিবার উপকারিতা প্রত্যহ দন্ত-মার্জ্জনা ও আহারান্তে মুখ ধৌত করিবার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কঠিনও নহে, অথচ বালক-বালিকাগণের পক্ষে পরম হিতকর।

আমাদের বাল্যকালে "সরল শরীর পালনে" দন্ত মার্জ্জনের যে উপদেশ দেওয়া ছিল তাহা উৎসাহের সঙ্গেই পালন করিতাম, বেশ মনে আছে। ছাত্রগণ প্রত্যহ দাঁত মাজে ও দন্ত পরিষ্কার করে কি না, তাহাদের মুখে দুর্গন্ধ পাওয়া যায় কি না ইত্যাদি বিষয় শিক্ষকগণের পর্য্যবেক্ষণের অন্তর্গত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। দন্তের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ, দন্ত অসুস্থ হইলে শরীরের পোষণের ব্যাঘাত এবং নানা রোগ জন্মিবার আশঙ্কা, ইত্যাদি সহজ ভাষায় শিশুগণকে বুঝাইয়া দিলে অনেক সুফলের আশা করা যায়। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এবং শিক্ষকগণের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

লেখক মহাশয় বিদেশী দন্তের যত্ন সম্বন্ধে আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকের পক্ষে সহজ এবং সুকর না হইলেও দন্তের যত্ন করা যে আবশ্যক, এ কথা সর্ব্বসম্মত, সন্দেহ নাই। লেখক মহাশয় এ দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আমি ঐ উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের দেশের সকলেরই পক্ষে সমান উপযোগী কয়েকটি বিধানের উল্লেখ এখানে করিয়া এই-দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম মাত্র।

মাষ্টার মশায়

[শ্রীপ্রতিভা দেবী]

স্কুলের নূতন মাষ্টার সমীর বোস এই দুই দিন দিব্য স্বচ্ছন্দ-চিত্তে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছিল ; কিন্তু অদৃষ্টের ভোগ যাইবে কোথায়! আজ [illegible] থার্ড ক্লাসের [illegible] তাহার [illegible] পরিচিত [illegible] চাহিয়া উঠিল।

[illegible]

[illegible] এমন কি, [illegible] একটি [illegible] হয়, যেন একটি সদ্য ফোটা নিটোল রজনীগন্ধা! সমীর চশমার ভিতর হইতে কয়েকবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখখানার দিকে চাহিয়া লইল।

মনে-মনে একটু বিস্ময় বোধ করিলেও, তাহার মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল। অবশেষে যে এইরূপে দেখা হইয়া যাইবে, কে জানিত!

দেখিয়া বোধ হইতেছে, শোভনা তাহাকে চিনিতে পারে নাই ; দুই বৎসর পূর্ব্বে মাত্র কয়েক ঘণ্টার দেখাতে সে সমীরের মুখ মনে রাখিতে পারে নাই।

ইহাতে সমীর অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

পড়াইতে-পড়াইতে সে কথাচ্ছলে একবার শোভনার পার্শ্ববর্ত্তিনী মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা থেকে আস?" মেয়েটি উত্তরটা সম্পূর্ণ করিতে না করিতে সমীর শোভনাকে বলিল, "তুমি?" "আমি আসি গ্রে ষ্ট্রীট্ থেকে।" "ও:, তুমি গ্রে ষ্ট্রীট্ থেকে আস। তোমার বাবার নাম কি?" শোভনা আগ্রহের সহিত বলিল, "বাবার নাম ব্রজলাল মিত্র। আপনি কি তাঁকে চেনেন?" মনে-মনে নিঃসংশয় প্রমাণ পাইয়া সমীর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না:, আমি যাঁকে চিনি, তাঁর তো ও নাম নয়।"

পিছনের বেঞ্চের একটি শ্যামবর্ণা মেয়ে যেন বিস্মিতের ভাবে শোভনাকে বলিল, "আমি তো জেনেছিলুম, তুমি আজকাল শ্যামবাজার থেকে আস।" এই ছোট প্রশ্ন-[illegible] সুন্দর [illegible] মেয়েটির দিকে সকৌতুক [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রমোদের সহিত দেখা [illegible] তাহার [illegible] উপকার দিতে কিছুমাত্র বিলম্ব [illegible]।

শুনিয়াই প্রমোদ একটা বড় রকমের "হাঁ" করিয়া, চোখ-দুইটা যথাসম্ভব বিস্তারিত করিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই হাসির ফোয়ারাটা এমন অদ্ভুত ভাবে খুলিয়া দিল যে, সমীর ব্যস্ত হইয়া "চেঁচাসনে প্রমোদ," "আ:, থাম্ না", "কি করিস," ইত্যাদিরূপ কাকুতি-মিনতি করিয়া বিব্রত হইতে থাকিল। প্রমোদ হাসি থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোর ভুল হয় নি ত?" "না,—না, সে আমি কথায়-কথায় তার বাপের নাম-টাম সব জেনেছি।" প্রমোদ বন্ধুর পিঠটা চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "সাবাস্!" তার পরে তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া, অতি নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "দেখতে বেশ সুন্দর,—নয় রে?" সমীর শিহরিয়া চাপা গলায় উত্তর করিল, "হাঁ।" তাহার মুখে লজ্জা-আনন্দের দীপ্তিটুকু প্রমোদের দৃষ্টিকে এড়াইতে পারিল না।

সমীরের পিতা কৃপণ বৈবাহিককে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে বধূর মুখদর্শন করিবেন না বলিলে কি হইবে ;—এ দিকে অদৃষ্টদেবী তাঁহাকেই পরাজিত করিবার মতলবে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। পিতা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাঁহার পুত্র প্রত্যহই পরিত্যক্তা বধূর নিষিদ্ধ সুকুমার মুখখানা,—শুধু চোখে নয়, বেশ একটু প্রীতির চোখেই দেখিতেছে।

কিন্তু কোন দিন সে শোভনার নিবিড় কালো চুলের মধ্যে সিন্দূরের রক্তরাগটুকু দেখিতে পায় নাই। সমীর বুঝিল, শোভনা বিদ্রোহী হইয়া, বাঁকা-সিঁথি কাটিয়া, বিবাহটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে।

সেদিন টিফিন-ঘণ্টায় কি-একটা প্রয়োজনে সমীর বারান্দা দিয়া যাইতে-যাইতে একেবারে লুকোচুরি খেলায় মত্তা শোভনার উদ্দাম গতির সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। সহসা সামনে বাধা পাইয়া শোভনা স্পন্দিত বক্ষে থমকিয়া দাঁড়াইল,—আবার তৎক্ষণাৎ পাশ কাটাইয়া ছুটিল; তাহার ঘর্ম্মাক্ত রক্তিম মুখশ্রী দেখিয়া সমীরের হাসি আসিল। পিছন ফিরিয়া আবার একটু দেখিয়া লইবার লোভ সে ভদ্রতার খাতিরে সংবরণ করিয়া লইল।

পড়াইবার সময় চঞ্চলা ছাত্রীটিকে অনেকবার শাসন করিতে হইত। গ্রহবৈগুণ্যে শ্বশুর-বাটীর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শোভনার স্বভাবসিদ্ধ চপলতা স্বাধীনতার হাওয়ায় আরো বাড়িয়া উঠিয়াছিল; সুযোগ পাইলে মাষ্টার মহাশয়দেরও সে জ্বালাতন করিতে ছাড়িত না। ইংলিশের মাষ্টার সমীর বাবু একটু ভালমানুষ বলিয়া সে তাঁহাকে দয়া করিয়া চলিত।

তবুও অভ্যাসের বশে যদি কোন দিন সে শিক্ষকের আদেশের উল্‌টা কাজ করিত, তখন অগত্যা সমীরকে কৃত্রিম কোপে গার্জ্জেনের কথা তুলিতে হইত। অমনি পিছনের বেঞ্চের অপর্ণা বলিয়া উঠিত, "ওর গার্জ্জেনের ঠিকানা হচ্ছে, ১২ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।"

শোভনা একটা জ্বলন্ত রোষ-কটাক্ষ অপর্ণার উদ্দেশে পাঠাইয়া, মাষ্টার মশায়কে তর্ক করিয়া বুঝাইত, সে তাঁহার আদেশ যথারীতি পালন করিতেছে। ছাত্রীটির দুষ্টামীতে সমীর বিরক্ত হইত কি আনন্দিত হইত, ঠিক করিয়া বলা শক্ত; তবে তাহার শ্বশুর-বাড়ী শ্যামবাজারের নামটায় পর্য্যন্ত তাহার বিতৃষ্ণা দেখিয়া একটু আহত হইত।

এতদিন পরে এই আঘাত এখন কেন বাজিয়া উঠিত, তাহা বুঝিতে বুদ্ধিমান সমীরের বাকী ছিল না।

আরো একবার এই রকম ব্যথা সে অনুভব করিয়াছিল, যখন অসুখ হইয়াছিল বলিয়া শোভনা দিন-কতক স্কুলে আসে নাই।

স্কুল-হলে ঢুকিয়াই তাহার চোখ দুটী থার্ড-ক্লাসের পরিচিত বেঞ্চখানার দিকে চাহিয়াই নিরাশার ব্যথায় ভরিয়া উঠিত। অসুখের পরে প্রথম যে-দিন শোভনা ক্লাসে আসিয়া বসিল, সেদিন তাহার শুষ্ক মুখখানির দিকে চাহিয়া সমীরের চোখ দুইটা সজল হইয়া উঠিয়াছিল।

বর্ষাকাল শেষ হইয়া গেলেও, বৃষ্টির কিছুমাত্র শেষ হয় নাই। সারাদিন টিপ টিপ করিয়া ঝরিয়া, বৈকালে বৃষ্টিটা যেন আকুল আগ্রহে পৃথিবীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তখন সবে মাত্র স্কুলের ছুট হইয়াছে। সেই বৃষ্টিধারায় [illegible] লম্বা লম্বা [illegible] গাড়ীগুলা কতকগুলি [illegible] অবশিষ্ট [illegible] করিয়া [illegible] দিল; [illegible] নিক্ষেপমাত্র নাই। [illegible] সমীর [illegible] পাশ হইয়া [illegible] ছাতা [illegible] একটি [illegible] নিকটের বেঞ্চখানি অধিকার করিবার আশায় আসিতেছিল; কিন্তু ভিজা বারান্দায় সাধের উঁচু হিলের জুতা শুদ্ধ পা ফস্‌কাইয়া যাওয়ায় বেচারা বই-খাতাগুলির মায়া ত্যাগ করিয়া, তাড়াতাড়ি বেঞ্চের হাতাটা ধরিয়া সাম্‌লাইয়া লইল। এ হেন বিপদে আবার মাষ্টার সমীর বাবুকে দেখিয়া সে লজ্জায় মরিয়া গেল। ছাতাটা ফেলিয়া, ছড়ান বই খাতাগুলা ক্ষিপ্রহস্তে কুড়াইয়া, সমীর বেঞ্চের উপর রাখিয়া দিল। তার পর হঠাৎ শোভনার মুখের দিকে চাহিয়াই সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। পড়িয়া যাওয়ার লজ্জা হইতে রক্ষা পাইলেও, শোভনা তখনো দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। তাহার কোমল কালো চুলে ঘেরা ছোট কপালখানির নীচে ঘন-পল্লব, নত চোখ-দুটি, আর লজ্জারুণ তরুণ মুখের সুষমা সমীরের দুই চক্ষুকে মুগ্ধ করিয়া দিল,—অনিমেষ অবাক্ দৃষ্টি স্থান-কাল ভুলিয়া গেল। এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া, শোভনা সবলে মাথা নাড়িয়া, লজ্জাটাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল, "কি মুস্কিল! শুধু-শুধু আপনাকে কষ্ট দিলুম। আপনিও বুঝি বৃষ্টির জন্যে আটকে

আছেন ?" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিটা শিক্ষকের মুখে পড়িতে, সেও অবাক্ হইয়া গেল। কি উজ্জ্বল দৃষ্টি! আর সেটা তাহারি মুখের উপর নিবদ্ধ! সমীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, মুখ ফিরাইয়া, ছাতাটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। বিস্মিতা ছাত্রীর গভীর দৃষ্টিটুকু তাহার অনুসরণ করিল।

বাড়ী ফিরিয়া সন্ধ্যার পরে একটা উজ্জ্বল আলো সম্মুখে রাখিয়া, সমীর যখন এলোমেলো মনটাকে গুছাইয়া লইবার জন্য খবরের কাগজখানা পড়িতেছিল, তখন সহসা পিছন হইতে কে টপ করিয়া কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া, রহস্য ভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মনটা অন্য জায়গায় পাঠিয়ে, মিছে কেন এখানা দেখিয়ে লোককে ঠকাচ্ছিস্!" সমীর ফিরিয়া বন্ধুর হাস্য-প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল। পাঁচ লাইন লেখা সে যে আধ ঘণ্টা ধরিয়া পড়িতেছে, এ কথা মনে মনে স্বীকার করিয়া লইল।

প্রমোদ বন্ধুকে নীরব দেখিয়া, মস্তক হেলাইয়া, চশমার ভিতর হইতে চক্ষু দুইটার দীপ্ত দৃষ্টি যেন সার্চ্চ্‌লাইটের মত সমীরের মুখের উপর ধরিয়া, থিয়েটারি স্বরে বলিল, "সখি, তুমি মরেছ!" সমীর রক্তিম মুখে তাহার বাহু ধরিয়া একটা প্রবল নাড়া দিয়া বলিল, "থাম্।" নিকটস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া, প্রমোদ হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "নাঃ, আর কোন আশা নাই।" সমীর বিরক্তিভরে বলিল, "সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না প্রমোদ!" প্রমোদ সোজা হইয়া বসিয়া চড়াসুরে বলিল, "ঠাট্টা কি? তুই কি বলতে চাস যে -" সমীর ব্যস্ত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া বলিল, "আমি কিছু বলতে চাই না,—তুই থাম।"

প্রমোদের কৌতুক দীপ্ত মুখখানা স্নেহে কোমল হইয়া উঠিল। সে নীচু হইয়া সমীরের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমাকেও লুকোবি সমীর!" সমীরের মুখের রক্তাভাটুকু তখন কোথায় উবিয়া গিয়াছে। সে ম্লান, বিবর্ণ মুখে শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, 'টিচারিটা ছেড়ে দেব প্রমোদ!" প্রমোদ কি একটা বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু সামনের দরজাটা খুলিয়া সমীরের মা আসিয়া দাঁড়াইতে, সে সংযত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সমীরের মা শ্যামবর্ণা, মুখখানি বুদ্ধির শ্রীতে দীপ্ত; চোখ দুটি স্নেহার্দ্র, দেখিলেই 'মা' বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হয়।

প্রমোদ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আজ আমি নীগ্‌গীর আসিনি মাসিমা?" প্রত্যুৎপন্ন-বুদ্ধি সমীর নিজের ব্যথা লুকাইয়া চট করিয়া জবাব দিল, "খা'বার কথা থাকলে কবেই বা তোমার আসতে দেরী হয়?" মা হাসিয়া বলিলেন, "ও কি কথা সমীর!" প্রমোদ সমীরের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "ওটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!" ভিতরে আসিয়া খোলা বারান্দায় পাশাপাশি দুই বন্ধুতে খাইতে বসিল। কতক্ষণ পরে সমীর যখন আহার শেষ করিয়া উঠিল, প্রমোদ তখনো খাইতেছে। "প্রমোদটা বেহদ্দ পেটুক, কুড়ে" ইত্যাদি নানারকম দোষারোপ করিতে-করিতে সে বাহিরে চলিয়া গেল। খোলা জানালার কাছে একখানা চৌকি টানিয়া বসিয়া, বাহিরের বৃষ্টিসিক্ত রাস্তাটার দিকে চাহিয়া, সে একখানি লজ্জারক্ত নবীন মুখের ধ্যানে মগ্ন হইয়া গেল।

মাষ্টারি কাজটা ছাঁড়ি ছাড়ি করিয়াও যখন সমীর আটকাইয়া রহিয়া গেল, তখন একদিন তাহার পিতা তাহাকে এই দুর্দ্দৈব হইতে মুক্তি দিয়া বলিলেন, "তোমায় আর প্রাইভেট পড়াতে হবে না,—আমি খরচ দেব, তুমি টিচারি ছেড়ে দাও।" সমীর বিস্মিত হইয়া বলিল, "প্রাইভেট পড়াতে হবে না?" সমীরের পিতা দৃষ্টিকৃপণ লোক; সুতরাং তিনি 'কৃপণ' শব্দটার আঁচও সহিতে পারিতেন না। সমীরের বিস্ময়-মূঢ় ভাব দেখিয়া তিনি বলিলেন, "হাঁ—হাঁ, প্রাইভেট পড়াতে হবে না,—এতে এত অবাক্ হবার কি আছে! পূজার ছুটি কবে?" সমীর মাথা নীচু করিয়া বলিল, "দিন পাঁচেক দেরি আছে এখনো।" "ছুটির পর আর যেও না তা'হলে।" উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। সমীর পিতার এই হঠাৎ মত-পরিবর্ত্তনের কোনও কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া অবাক্ হইয়া গেল। সে তো তাঁহারি আদেশে স্কুলের মাষ্টারি যোগাড় করিয়া লইয়াছিল। সে নিজে কাজটা ছাড়িবে বলিলেও, আজ সত্যই ছাড়িতে হইবে দেখিয়া, তাহার মনটা খারাপ হইয়া গেল; বোধ হইল, কে যেন তাহার সুখ-সম্পদ সমস্ত কাড়িয়া লইতেছে। মনের চোখে শোভনার হাসিভরা মুখখানা কেবলি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সমীর আজ ভাল করিয়া বুঝিল, সে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। আহত হৃদয়ের ব্যথা চাপিয়া, সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল। স্কুলে পৌঁছিয়া আজ সে চঞ্চল চোখ-দুইটার রাশ

চাপিয়া ধরিল। আর না, যথেষ্ট বোকামি সে করিয়াছে, এইবার তাহাকে সংযত হইতে হইবে। কিন্তু পড়াশুনার মধ্যে, অবাধ্য দৃষ্টি কখন যে থার্ড-ক্লাসের পিছন-ফেরা একটি মেয়ের দীর্ঘ বেণীর লাল টুকটুকে ফিতার ফাঁসে গিয়া জড়াইয়া পড়িল, তাহা তাহার খেয়ালই রহিল না। থার্ড ক্লাসের ঘণ্টায় অসম্ভব গম্ভীর হইয়া সে ক্লাসে ঢুকিল। তাহার কঠিন, শুষ্ক মুখখানার দিকে লক্ষ্য করিয়া শোভনা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আপনার শরীর ভালো নেই, না?" "না, হাঁ, শরীরটা খারাপ বটে।" এই রকম একটা জবাব দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা পূজার সময় কোথাও বেড়াতে যাবে না?" প্রশ্নটা অপর্ণাকে হইল। অপর্ণা মাথা নাড়িয়া বলিল, "সবাই যাব না, শুধু শোভনা যাবে।" "কোথায়" জিজ্ঞাসা করিতেই শোভনার মুখখানা আবার সেদিনকার মত লাল হইয়া উঠিল। সে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, "মধুপুরে।" অপর্ণা হাতের বইখানা ফেলিয়া দিয়া, কুড়াইবার ছলে নীচু হইয়া হাসি চাপিল। মেয়েরা নিজেদের যতই সেয়ানা মনে করুক না কেন, এসব ঝাপসা রহস্য শিক্ষকের চোখে বাধিল না।

ছুটীর সময় যখন সমীর কর্মত্যাগের কথাটা হেড্ মিস্ট্রেস্‌কে জানাইতে যাইতেছিল, তখন সিঁড়ি দিয়া নামিতে-নামিতে অপর্ণা শোভনার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছিল, "আহা, একেবারে মধুপুর! স্বর্গপুর বল্লি না কেন?" শোভনা হাসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "যাঃ, ঐ জন্যে তো তোকে কিছু বল্‌তে ইচ্ছে হয় না।"

"তা বলে তুই একেবারে মধুপুর বল্‌লি কি করে? বাবাঃ—হা—হা—হা!" হাসিতে-হাসিতে তাহার দম প্রায় বন্ধ হইয়া গেল।

পিছন হইতে কথাগুলা শুনিয়া সমীর তাহার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইল না। মেয়েদের তো সকলি অদ্ভুত!

অত্যন্ত উদাস ভাবে সমীর ঘরে ফিরিল। মনটা তখন খাপছাড়া হইয়া গিয়াছে। যাক আর উপায় কি? একবার মনে হইল, শোভনাকে একখানা চিঠি লেখা যাক্। পর মুহূর্ত্তেই মনে পড়িল, পিতা যদি তাহাকে গ্রহণই না করেন, তাহা হইলে চিঠি লিখিয়া সে বেচারাকে জড়ান কেন? সে বেশ আছে। কিন্তু—সমীরের কণ্ঠ পর্য্যন্ত একটা উচ্ছ্বাস উঠিতে লাগিল। সে টেবিলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে দরজা ঠেলিয়া সমীরের মা ভিতরে আসিয়া বলিলেন, "এখনো কাপড় ছাড়িস্‌নি সমীর?" সমীর টপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই যে, ছাড়ছি।" মা তাহার সঙ্কবহারা মুখখানার দিকে চাহিয়া ব্যথা পাইয়াও মৃদু হাসিলেন।

সমীর হাত-মুখ ধুইয়া খাইতে বসিল। মা কাছে বসিয়া ধীরে-ধীরে বলিলেন, "ভাবছিলুম কি, এবার পূজার সময় বৌমাকে আন্‌বো।" "কাকে?" সমীর অত্যন্ত চমকিয়া উঠিল। মা বলিলেন, "আমার বৌমাকে। মিছে-মিছি [illegible] রাখুব।"

[illegible] যে—"

বাধা [illegible] এসব পাগলামি [illegible] গেলে [illegible] ছাড়া [illegible] এখন [illegible] অমত [illegible]।" [illegible] বলিল, [illegible] তাহার [illegible] ছাড়া [illegible] কিছু নাই।

[illegible] লইয়া [illegible]।

[illegible] বলিলেন, "[illegible] চিঠি [illegible] লিখেছেন।"

এই সব অসম্ভব কথাগুলা ক্রমাগত শুনিতে-শুনিতে সমীরের যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মা ব্যস্ত হইয়া, তাহার আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "ও কি রে,—কিছুই যে খেলিনে।" "খেয়েছি তো,—আর বেশী খাব না।" বলিতে-বলিতে সে এক রকম দ্রুতপদে পলাইয়া গেল। বাহিরে আসিয়া সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এ কোন্ যাদুকরের মায়াদণ্ড-স্পর্শে অসাধ্য-সাধন হইতে চলিল! তাহার মনে যেন বিস্ময়ের ঝড় বহিতে লাগিল।

খানিক স্থির হইয়া, বসিয়া-বসিয়া যখন সে একটু সামলাইয়া উঠিয়াছে,—তখন প্রমোদ আসিয়া তাহার কাণের কাছে গুঞ্জন করিয়া বলিল, "বক্‌শীষ!"

পূজার আর বিলম্ব নাই। বর্ষার স্নেহ-মুক্ত প্রকৃতি শরতের পদার্পণে হয় তো কোথাও হাসিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সে

হাসি এই সব ইট-কাঠের অধিবাসীদের কপালে কোথায় মিলিবে? তাহারা প্রকৃতির ভাণ্ডার হতে যেটুকু স্নেহ পায়, সেই নির্ম্মল জ্যোৎস্নাটুকুকেও লজ্জা দিয়া উজ্জ্বল গ্যাস্ ল্যাম্পগুলা রাস্তায়-রাস্তায় দেওয়ালির উৎসব লাগাইয়া দিয়াছে।

পথের দুইধারে জামা-কাপড়ের দোকানগুলা নানা রঙের বিচিত্র শোভা ছড়াইয়া বেচারা "হাঁ করা" পথিকদের মোটর-চাপা পড়িবার সুবিধা করিয়া দিয়াছে। পথে জনস্রোতের বিরাম নাই।

এমনি এক কোলাহলময়ী শারদ সন্ধ্যায় শোভনা শ্বশুর-গৃহে আসিয়া পৌঁছিল। শাশুড়ী আদর করিয়া কাছে টানিয়া বলিলেন, "এস মা, আমার ঘরের লক্ষ্মী!" শ্বশুরকে প্রণাম করিতে, তিনিও অস্ফুটস্বরে কি একটা আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এত সমাদরেও তবু তাহার দুই চোখ কেবলি জলে ভরিয়া আসিতেছিল। বুকের কম্পনটা একটুও থামে নাই। তার পর যখন বাপের বাড়ীর পুরানো চাকর দীনবন্ধু "তবে এখন আসি দিদিমণি, আবার রাত হয়ে যাবে।" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল, তখন শোভনার পাউডার মাখা নিটোল গণ্ড দুইটি বাহিয়া অশ্রুর বন্যা ছুটিল। শাশুড়ী অশ্রু মছাইয়া সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "কেঁদ না মা, যখনি যেতে চাইবে, আমি পাঠিয়ে দেব।" পরের মেয়ের এই বাপের বাড়ীর বিচ্ছেদ ব্যথা, আর পরের বাড়ী ঘর করার একটা অজানিত আশঙ্কা তিনি তাঁহার হৃদয় দিয়া বুঝিলেন। শোভনা আশ্বাস পাইয়া শান্ত হইল। শাশুড়ীর স্নেহার্দ্র মুখখানি দেখিয়া তাহার মনে শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিল।

এতক্ষণে এই বাড়ীর আরো একজনের কথা তাহার মনে পড়িল। তিনি এখনও ক্লাব হইতে ফিরেন নাই। মা জানিতেন, আজ তাহার ফিরিতে বিশেষ বিলম্ব হইয়া যাইবে।

স্বামীটি পুরাতন হইলেও নূতনই বটে,—কে জানে তিনি কি রকমের লোক! ভয়ে, লজ্জায় শোভনার বুকটা কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

শাশুড়ী যে ঘরটি তাহার বলিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই ঘরের মধ্যে একটা চক্চকে পালিশ-করা টেবিলে ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া, সে অপরিচিত ঘরখানার চারিদিকে দেখিতে লাগিল। ঘরখানা অতি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন; খাটের উপর সুন্দর, ধব্‌ধবে বিছানা; দেয়ালে দুই-একখানা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি; একপাশে আল্‌নায় দুই তিনটা সার্ট-কোট ঝুলিতেছে। শোভনা বুঝিল, সেগুলা কাহার।

বাতিটা বাড়াইয়া দিয়া, টেবিলের উপর হইতে একখানা বই তুলিয়া, সে পাতা উল্টাইতে লাগিল। খানিক পরে নীচে কড়া-নাড়ার শব্দ, ও তার পরে সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইলেও, সেদিকে কাণ গেল না। একটু পরেই খট্ করিয়া ঘরের দরজাটা খুলিয়া গেল। শোভনা চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, তাহাদের ইংলিশের টীচার সমীর বাবু ঘরে ঢুকিলেন। সে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আপনি!" সমীর দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া, তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল। আজ শোভনার ঘন, কালো চুলের সোজা সিঁথিতে সিন্দূরের রক্ত রেখা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। ফিরোজা-রঙের পাতলা সাড়ীখানার আঁচল আজ মাথার উপর দিয়া গিয়া পিনে বদ্ধ হইয়াছে। পায়ে জুতা-মোজার বালাই নাই,—শ্বেত-পদ্মের মত শুভ্র ছোট পা দুইখানি আলতার রাঙ্গা রসে লক্ষ্মীর পাদপদ্মের মত দেখাইতেছে। আজ যেন কল্যাণময়ী বধূমূর্ত্তি!

সমীর অগ্রসর হইয়া, শোভনার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া, কোমল কণ্ঠে বলিল, "আমায় কি তুমি চিনতে পার নি শোভা?" তাহার দুই চোখে প্রেমের ঢেউ উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

এমন অদ্ভুত ব্যাপারে শোভনা থতমত খাইয়া গেল। সমীর নামটি তাহার স্বামীরও আছে, সে তাহাই জানিত। কিন্তু স্কুলের মাষ্টার সমীর বাবুই যে তিনি, তাহা তো সে স্বপ্নেও ভাবে নাই! সত্যই সে তো চিনিতে পারে নাই!

অবাক্ হইয়া, সে তাহার বিস্ময়-ব্যাকুল দুই চোখের ব্যগ্র দৃষ্টি দিয়া, স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। সমীরের হাতের মধ্যে তাহার হাত দুইখানা ঘামিয়া উঠিল। সমীর হাসিয়া তাহার ধৃত হাত দুইখানা নাড়া দিয়া বলিল, "কি ভাবছ বল তো?"

শোভনা একটা বিস্ময়-মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ



মণিদর্শন

[অশ্বত্থামার মস্তক-মণি দর্শনে ভ্রাতাদের নিকটে দ্রৌপদীর আনন্দ প্রকাশ]

শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার] [Blocks by Bharatvarsha Halftone Works

নীচু করিল। লজ্জায় মুখ-চোখ লাল করিয়া, সে ফস করিয়া হাত-দুইখানা খুলিয়া লইয়া, মুখখানা ঢাকিয়া ফেলিল। কি লজ্জা! কি লজ্জা! শেষে কি না রসের টীচার সমীর বাবুই—ছিঃ! ছিঃ! সে আর ভাবিতে পারিল না।

দুষ্ট মাষ্টার মহাশয় তাহার লজ্জার উপর আরো লজ্জা দিয়া, মুখখানা জোর করিয়া তুলিয়া—কাণের কাছে ফিস্ ফিস করিয়া বলিল, "মধুপুরটা ভাল লাগবে তো খোকা?"

অভিনব শ্রাদ্ধ-বিধি

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলাল]

বাঙ্গালা দেশে এক অভিনব শ্রাদ্ধ পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে—জীবন চরিত লেখা। উহার মূলে যদি একটুও শ্রদ্ধার আভাস থাকিত, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। তাহা নহে। এ শ্রাদ্ধের এক এবং অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য "পিণ্ডং দত্ত্বা ধনং হরেৎ"। অপহারী নয়, এই প্রকারের ধনলোভী দল যদি কাহাকে দেখেন সাধারণ হইতে বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র, অমনই তাঁহাদের ধারণা হয়, এ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, আমরা জীবনচরিত লিখিব বলিয়া। কিন্তু লিখিবার সময় ইহারা ভুলিয়া যান যে, জীবন-চরিত উপন্যাস অথবা নিছক প্রশংসাপত্র নহে। তাহার পর, বৈদিক এবং স্মার্ত উভয় মতে, অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি অবলম্বন করিয়া বৃষোৎসর্গের আয়োজন করা হয়। শাস্ত্রীয় বৃহৎ ব্যাপারে যে একজন 'ধারক' থাকে, এ ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজন হয় না; কেন না কোন বিষয়ই যাচাই করিয়া তাহার যাথার্থ্য নিরূপণ ইঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। সম্ভবতঃ ইঁহাদের বিশ্বাস যে,—ধর্ম্ম বল, সত্য বল—কলিযুগে তাহার তিনপাদ বিলুপ্ত হইয়াছে। কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা পাঠককে এ কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সম্প্রতি "নাট্য-প্রতিভা-সিরিজ" নাম দিয়া তিনখানি "জীবনী" বাহির হইয়াছে; যথা,—গিরিশচন্দ্র, তিনকড়ি, অমরেন্দ্রনাথ। উদাহরণগুলি আমরা এই তিনখানি পুস্তক হইতে গ্রহণ করিলাম। তিনখানির কোনখানিতেই গ্রন্থকারের নাম নাই। কিন্তু সম্পাদকরূপে বৃহদক্ষরে যাঁহার নাম ছাপা আছে, তিনি কলিকাতার "সিটি" কলেজের "বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক"। যিনি যে গিনটী নহে, তাহার একমাত্র প্রমাণ টাঁকশালের ছাপ। অপর প্রমাণ কষ্টি পাথরের কষ। ছাপের কথা আমরা বলিলাম; আর প্রমাণ—"কষে" কি দর যাচাই হয়, তাহাই দেখা যাক।

গিরিশচন্দ্রের জীবনীর ১৭।১৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে:—

"পিতৃমাতৃহীন হইবার পর তাঁহার (গিরিশের) এক 'জেঠতুতো' ভগিনী গিরিশচন্দ্রের অভিভাবিকা হন। *** সিপাহীরা কলিকাতা আক্রমণ করিবে এই সংবাদ গিরিশচন্দ্রের স্নেহময়ী ভগিনীর কর্ণে পৌঁছিবামাত্র তিনি গিরিশচন্দ্রের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং প্রাণের ভাইটীকে নিজের অঞ্চলে ঢাকিয়াই যেন ভয়ে জড়সড় হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।"

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে একটী লাইন আছে—

"সেই ঘোর দুর্দ্দিনে স্কুল কলেজ সকলই বন্ধ হইয়া গেল।" স্কুল কলেজ যদি বন্ধই হইয়া গেল, তবে আর গিরিশচন্দ্রের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিবার সার্থকতা কি? তবে আত্মপক্ষ সমর্থন পক্ষে এ কথা নিশ্চয় বলা যায় যে, স্নেহ কখনো কখনো বন্ধনের উপর বন্ধন দিয়া থাকে, এবং স্নেহময়ী জেঠতুতো ভগিনী তাহাতে ক্রটী করিবেন কেন? কিন্তু গিরিশচন্দ্র তো কোনরূপ নিষেধে নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। এই পুস্তকেরই ১০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "গিরিশচন্দ্রের বাল্যকাল হইতেই কেমন যেন স্বভাব ছিল, তাঁহাকে যেটা নিষেধ করা যাইত, সেইটাই করিবার জন্য তিনি একেবারে ব্যগ্র অস্থির হইয়া উঠিতেন। শেষ জীবন পর্য্যন্ত তিনি এইভাবে চালিত হইয়া আসিয়া-

ছেন।" ইহার আবার ফুটনোট আছে—"গিরিশচন্দ্র নিজের এই ভাবটা তাঁহার চৈতন্যলীলায় নিমাইয়ের বাল্যলীলায় বেশ পরিস্ফুট করিয়াছেন।" এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক। গিরিশ নিজমুখে বলিতেন "বুড়ো বয়েসেও আমার এ স্বভাব গেল না।" বাস্তবিক এই স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পরিণত বয়সেও তিনি সময়ে সময়ে অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। স্নেহময়ী জ্যেঠতুতো ভগিনী স্কুলে যাইতে নিষেধ করিলে, গিরিশ যে সকল কার্য্য পালন করিয়া বিদ্যালয় অভিমুখে আগে ধাবিত হইতেন, তাহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। তাহার পর, এ সকল কথা যে নিছক রচনা, তাহার একটা বড় প্রমাণ এই যে গিরিশের "জ্যেঠতুতো" ভগিনী কেহ ছিলেন না; কারণ তাঁহার জ্যেঠতাত নিঃসন্তান ছিলেন। আবার এর চেয়েও বড় প্রমাণ এই যে, ঐ কালকাতা আক্রমণের জনরবটা যে সময় উঠিয়াছিল, গিরিশের পিতা তখন জীবিত; ভগিনীর অভিভাবকতার কোন প্রয়োজন ছিল না। গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে এতাবৎ যে কিছু বিশ্বাসযোগ্য জীবন কথা বাহির হইয়াছে, তাহার কোথাও জ্যেঠতুতো ভগিনীর উল্লেখ নাই আছে এক জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কথা। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই গিরিশের অভিভাবিকা, এবং যতদিন জীবিতা ছিলেন, সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। কিন্তু "জ্যেষ্ঠার" অর্থ "জ্যেঠতুতো" নয়, এ কথা "বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক" যে জানেন না, তাহা মুখে আনিলে পাপ, এবং কাগজে কলমে লিখিলে লাইবেল হয়।

"নাট্য-প্রতিভা সিরিজের" গিরিশচন্দ্র পড়িতে-পড়িতে মনে হয়, অবিকল এই সকল কথাবার্ত্তা যেন আর কোথাও পড়িয়াছি। আমরা ঘটনার কথা বলিতেছি না—বলিতেছি, ভাব ও ভাষার কথা। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, যাঁহাকে এই পুস্তকের ১৬৭ পৃঃ ফুটনোটে গিরিশবাবুর বসওয়েল (Boswell) উপাধি দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার "গিরিশচন্দ্র" ও নাট্য প্রতিভা-সিরিজের "গিরিশচন্দ্র" হইতে দুই একটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি—কাহারও গৌরব লাঘব করিবার জন্য নহে, পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য। যথা—অবিনাশচন্দ্রের "গিরিশচন্দ্র" ১৫৪ পৃঃ—"শোক যতই তাঁহার হৃদয়ে উপর্যুপরি শেলাঘাত করিয়াছে, গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর প্রভা ধারণ করিয়াছে।"

নাট্যপ্রতিভা-সিরিজের "গিরিশচন্দ্র" ২০ পৃঃ—"শোক যতই তাঁহার হৃদয়ে শেলাঘাত করিয়াছে, ততই তাঁহার প্রতিভা উজ্জ্বল হইতে আরও উজ্জ্বলতর হইয়াছে।"

অবিনাশচন্দ্রের "গিরিশচন্দ্র" ১৩০ পৃঃ—"এইরূপে যখন মাঘ মাসের অর্দ্ধেক দিন অতীত হইল, তখন সকলের আশা হইল এ বৎসর ভালয় ভালয় কাটিয়া গেল।"

নাট্যপ্রতিভা-সিরিজের "গিরিশচন্দ্র" ৯৮ পৃঃ—"এই ভাবে যখন মাঘ মাসের অর্দ্ধেক কাটিয়া গেল, তখন সকলেরই আশা হইল এ বৎসরও ভালয় ভালয় কাটিয়া গেল। কিন্তু হায়, মানুষ কত আশা করিয়া থাকে!"

উক্ত কয়েক ছত্রের পরে অবিনাশের "গিরিশচন্দ্রে" আছে —"এই দ্বিতল বৈঠকখানার সহিত গিরিশচন্দ্রের কত স্মৃতিই না বিজড়িত, ইহাই তাঁহার অধ্যয়ন-কক্ষ, ইহাই তাঁহার চিকিৎসালয়; এই স্থানে প্রত্যহ পরিচিত, অপরিচিত বহু ব্যক্তির সহিত, তাঁহার সাহিত্য ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা হইত। বহিঃসংসারের নানা দুঃখ তাপ জ্বালায় উত্যক্ত ক্লান্ত জীবন এই কক্ষে আসিয়া পরম শান্তি লাভ করিত। এই কক্ষই তাঁহার অমর-কবি কল্পনার লীলা-বিলাস ভূমি। এই কক্ষই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পদধূলি বক্ষে ধারণ করিয়া গয়া গঙ্গা বারাণসীর ন্যায় তীর্থ মহিমায় মহিমান্বিত। এইখানেই অমর মহাকবির অন্তিম শ্বাস অনন্তে বিলীন হইয়াছে।"

নাট্য-প্রতিভা সিরিজের 'গিরিশচন্দ্রে' ৯৮ পৃষ্ঠার পর ৯৯ পৃষ্ঠায় আছে, "এই বৈঠকখানার সহিত গিরিশচন্দ্রের কত শত স্মৃতি জড়িত। ইহাই তাঁহার অধ্যয়ন-আগার, ইহাই তাঁহার চিকিৎসালয়, সংসারের নানাবিধ ক্লান্তি ও পরিশ্রান্তির পর এইখানে আসিয়াই তিনি পরম শান্তি লাভ করিতেন। এই কক্ষই তাঁহার অমর কাব্যকলার লীলা-ভূমি। এই কক্ষই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পদধূলি বক্ষে ধারণ করিয়া মহাতীর্থ হইয়া আছে। এইখানেই মহাপুরুষের অন্তিম নিশ্বাস অনন্তের সহিত মিলিত হইয়াছে।"

এই কম্বলের লোম-বাছা কাজে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। ভাষা ও ভাবের এইরূপ ঐক্য এক-আধ স্থলে নয়, বহুস্থলেই লক্ষিত হয়। যিনিই অবিনাশচন্দ্রের 'গিরিশচন্দ্র' ও নাট্যপ্রতিভা-সিরিজের 'গিরিশচন্দ্র' মনোযোগ সহকারে

পাঠ করিবেন, তিনিই এই দুইখানি পুস্তকের ভাষার অদ্ভুত ঐক্য ও "টেলিপ্যাথি"র আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিয়া বিস্মিত হই বেন। পূর্ব্ববর্ত্তীর সহিত পরবর্ত্তী পুস্তকের ভাষ ও ভাবের যে সামান্য প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, সম্ভবতঃ তাহা আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য, নহিলে দুই স্বতন্ত্র লেখকের এমন বিস্ময়কর মিল প্রায় দেখা যায় না; অথচ সাধারণ শিষ্টতার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত যেটুকু প্রয়োজন, অর্থাৎ গিরিশবাবুরবস ওয়েলের কাছে ঋণ স্বীকার করা এ পুস্তকে তাহার নামগন্ধও নাই।

তথাপি, এই নাট্যপ্রতিভা সিরিজে গিরিশচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে নূতন তথ্য কিছু নাই, এমন কথা কহিবার দুঃসাহস যেন কাহারও না হয়। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সকল প্রধান অভি নেতা ও অভিনেত্রীর জীবনের সহিত গিরিশচন্দ্রের কর্ম্ম-জীবন অল্প বিস্তর জড়িত ছিল, আমরা এই সিরিজের দ্বিতীয় পুস্তক 'তিনকড়ির' জীবনী হইতে ঐ সকল নূতন তথ্য পরি পন্ন করিব।

তিনকড়ির জীবনীর ৬০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে

"নাট্যকলার শেষ অঙ্গ ভাবপ্রকাশ ছিল। আমাদের মনে হয় শ্রীমতী তিনকড়ির এই ভাবভঙ্গীর বিকাশে কিরূপ দক্ষতা জন্মিয়াছে, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র 'মুকুল মঞ্জরা' নাটকে এই তারার ভূমিকাটির অবতারণা করিয়াছিলেন"। ইহার কয়েক ছত্র পূর্ব্বেই আছে—"সেক্স-পীয়ারের নাটক বুঝিবার ক্ষমতা বঙ্গ-রঙ্গালয়ের দর্শকগণের তখনও হয় নাই দেখিয়া তিনি (গিরিশচন্দ্র) সে কার্য্য হইতে বিরত হইলেন এবং থিয়েটারের আয়রক্ষার জন্য মুকুল মুঞ্জরা নাটক অতি সত্বর প্রণয়ন করিলেন।" এ সত্বর যে কত সত্বর তাহা স্বয়ং গিরিশচন্দ্রও জানিতেন না: এই সিরিজের 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে ১৭১ হইতে ১৭২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উল্লিখিত আছে, ম্যাকবেথের প্রথম অভিনয় রজনী ১৭ই মাঘ এবং মুকুল মুঞ্জরার প্রথম অভিনয়-রজনী ২৪শে মাঘ ১২৯৯ সাল। এই সাত দিনের ভিতরে বৃহদাকারের একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক কল্পিত ও রচিত হইল; তারপর তাহার ভূমিকাসকল নকল করিয়া নির্ব্বাচিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের প্রত্যেককে তাহা বিতরণ, সাজ-সরঞ্জাম দৃশ্যপট প্রস্তুত, মহলা দেওয়া, মায় অভিনয় হইয়া গেল। বাজীকর যে আমের আঁটি পুতিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফল ফলাইয়া দেয়, এ সত্বরতার তুলনায় সেও দীর্ঘ-সূত্রী! মুকুল মুঞ্জরা ও আবুহোসেন দ্বিতীয়বার ম্যাকবেথ অভিনয়ের যে কত পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল তাহা জীবনী-লেখক বা সম্পাদক না জানিতে পারেন, কিন্তু নিতান্ত অলৌকিক ক্ষমতা না থাকিলে সাতদিনে এমন অসম্ভবকে সম্ভব করা অসম্ভব। তারপর, তারার অভিনয় সম্বন্ধে ৬১ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে, "গ্রন্থকার যাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই, শ্রীমতী তিনকড়ির অভিনয় নৈপুণ্যে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।" শ্রীমতী তিনকড়ি জীবিত থাকিলে সম্ভবতঃ এ কথার আদর হইত।

অতঃপর, করমেতি অভিনয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে পরি চ্ছদ লইয়া বিভ্রাট! ৬৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে,—"প্রথম অভিনয় রজনীর রাত্রে (রজনীর রাত্রি কি রকম?) থিয়েটারে আসিয়া তিনকড়ি এই ভূমিকা অভিনয় করিতে সম্মত হয় না, কেন না করমেতি বিধবা, কাজেই করমেতির ভূমিকা অভিনয় করিতে হইলে বিধবার বেশে রঙ্গমঞ্চে বাহির হইতে হইবে।" তাহা করিতে তিনকড়ি অসম্মত, কেন না তাহার "সধবা মরে বৃত প্রতি" (৬০ পৃঃ) জননী তখন বাঁচিয়া আছেন, সুতরাং পরের ৬২ পৃষ্ঠায় যে তিনকড়ি "অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া" "বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া" মতিলালের চিরপ্রিয় অভিনয় সাধনা করিয়াছিল, জীবনীর ৬০ পৃষ্ঠায় আসিয়া সে ভুলিয়া গেল যে, যে ভূমিকা তাহাকে অভিনয় করিতে হইবে, তাহা বিধবার নহে; ভুলিয়া গেল যে 'আলোক' নামে তাহার স্বামী বিদ্যমান, এবং এই নাটকের অভিনয়ে অবিলম্বেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। বাক্স বাবু বসিয়া আছেন জানিয়া সে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া গো ধরিয়া বসিল, "ও বেশে (অর্থাৎ থান পরিয়া) কিছুতেই বাহির হইবে না"। তার পর "গিরিশচন্দ্রের নিকট যাইয়া যখন এই সংবাদ উপস্থিত হইল, তখন রাগে তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল।" (৬১ পৃঃ) তিনিও ভুলিয়া গেলেন যে, তিনকড়িকে থান পরিয়া বাহির হইতে হইবে না, ভুলিয়া গেলেন যে, তিনকড়ির জন্য দিব্য ধানি রঙের সিল্কের উপর সলমা চুমকীর কাজ-করা কাল মখমলের পাড়-বসান সাটী ও বডি, সাজঘরে প্রস্তুত রহিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ সে ঐ পরিচ্ছদে সজ্জিত

হইয়া যবনিকা উঠিবার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তিনিও আত্মবিস্মৃত ও জ্ঞানশূন্য হইয়া “নিজেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ‘ডাক নাপিত, আমিই আজ (অবশ্য গোঁফ মুড়াইয়া) করমেতি সাজব”। গ্রন্থকার-বর্ণিত এই এক রজনীর কেচ্ছার কাছে “একাধিক সহস্র রজনীর” আজগুবি কল্পনা নিছক ছেলেখেলা।

ঘটনাটা আমরা জানি,—এইরূপ ঘটিয়াছিল। কথা আর কিছুই নহে, সাজ-পোষাকের চটকের উপর তিনকড়ির বিশেষ দৃষ্টি ছিল। করমেতি ভূমিকার মহলা দিবার সময় সে গিরিশ বাবুর কাছে আবদার করে যে, “পোষাক ভাল না হইলে সে ও-পার্ট সাজবে না।” গিরিশ বাবু অগত্যা তাহাতে সম্মতি দান করেন। তাহাতে কেহ-কেহ আপত্তি করিয়াছিল যে, দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা, স্বামী বড়মানুষ হইলেও যাহার কোন তত্ত্ব লয় না, তাহার কি জমকাল পোষাকে বাহির হওয়া উচিত। গিরিশ বাবু তাহাতে উত্তর দেন—“চুলোয় যাক্, পার্ট যদি ভাল ক’রে করতে পারে, ও সামান্য দোষ অডিয়েন্স (Audience) ধরবে না।” কিন্তু দুঃখের বিষয়, পার্টও ঠিকমত হয় নাই। যাহাকে যে ভূমিকায় অভিনয় করিতে হয়, অভিনয়কালে আপনাকে সেই চরিত্রে পরিণত করিতে না পারিলে অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। লেডি ম্যাকবেথ, জনা প্রভৃতি তেজস্বিনীর ভূমিকায় তিনকড়ির অসামান্য ক্ষমতা ছিল; কিন্তু ভক্তির ভূমিকায় তাহার তাদৃশ অধিকার ছিল না। এই জন্যই অমন সুন্দর ভক্তি-রসাশ্রিত একখানি নাটক অধিকদিন রঙ্গমঞ্চ অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই।

অবশেষে অমরেন্দ্রনাথের জীবনীতে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে ১৪।১৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—“শিষ্য ও সুহৃদবর্গের প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ গিরিশচন্দ্র খালধারে খোলার ঘর ভাড়া করিয়া লাল পেড়ে সাড়ী পরিয়া অতি গোপনে এই নাটক খানি (নসিরাম) লিখিয়া দিয়াছিলেন, পাছে গোপাল লাল শীল জানিতে পারেন, এই আশঙ্কায় তিনি স্ত্রীলোক সাজিয়া গভীর রাত্রে এই বই লিখিতেন।” এবার নাপিতের জন্য হাঁক-ডাক নাই; গিরিশচন্দ্রের বিপুল দেহ সগুম্ফ নারী সাজিয়া কেমন দেখাইয়াছিল, কে জানে! তাঁর মৃত্যুর পর জীবন লইয়া এমন টানাহেঁচ্‌ড়া হইবে জানিলে গিরিশচন্দ্র যে জন্মগ্রহণ করিতেন না, এ-কথা আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি। প্রতিভার মরিয়াও সুখ নাই! আমরা শুনিয়াছি, কোন ‘অনভিগম্য’ স্থানে বসিয়া গিরিশ ষ্টারের জন্য “নসীরাম” লিখিয়া দিয়াছিলেন। ‘অনভিগম্য’ কথাটা আমরা তিনকড়ির জীবনীতেই পাইয়াছি। ১৪৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—“সর্ব্বত্র তিনকড়ি অনভিগম্যা” !!!

এইবার তিনকড়ির জীবনী সম্বন্ধে দু একটা কথা আলোচনা করিব। তিনকড়ি একদিন জীবনী-লেখককে বলিয়াছিল যে, সে যখন মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশ করে, তখন “নূতন স্থান, কাজেই আমার কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল; আমি গাড়ী হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে থিয়েটারের ভিতর প্রবিষ্ট হইলাম।” তিনকড়ি এক-প্রকার নিরক্ষর ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভূমিকার উক্তি ব্যতীত, তাহার মুখ দিয়া এমন সাধু ভাষা কখনই বাহির হইত না। ‘প্রবিষ্ট’ হইবার কথা যিনি শুনিয়াছিলেন, তিনিই বোধ করি তখন ঘোর সুষুপ্তি মগ্ন ছিলেন। তিনকড়ির জীবনীতে প্রকাশ যে, লেডী ম্যাকবেথের পার্টে প্রমদা নাম্নী অভিনেত্রীকে বদল করিয়া তিনকড়িকে নিয়োগ করিবার ঘটনা মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। তিনকড়ি যখন প্রথম ‘মিনার্ভায়’ যোগদান করে, তখন কলিকাতা সহরের কোন “সর্বভিগম্য” স্থানে ‘ম্যাকবেথ’ ‘মুকুল মুঞ্জরা’ ও একখানি অপেরার মহলা চলিতেছিল। এইখানেই তিনকড়ি প্রথম যোগদান করে, রঙ্গমঞ্চ তখনও প্রস্তুত হয় নাই। অবশ্য ইহার সাক্ষী এখনও বিদ্যমান আছে, কিন্তু তিনকড়ি অপেক্ষা ইহা কে অধিক জানিত!

সময়-সময় দেখা যায় “উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে” চড়ে। ‘নাট্য-প্রতিভা-সিরিজের’ পিণ্ডদান ব্যাপারে তাহারও ত্রুটী নাই। তিনকড়ির জীবনীতে ১৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, “শ্রীমতী তিনকড়িই সিরাজদ্দৌলার “জহরা” ও মীর-কাসেমের ‘তারা’ চরিত্রের প্রকৃত মূল উপাদান সন্দেহ নাই।” এই জীবনীত্রয়ে একটা আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন বিষয়ে লেখক অথবা সম্পাদকের সন্দেহ হয় না; যা শোনেন, যা দেখেন, সব বিশ্বাসের চক্ষে ও কর্ণে; আর লিপিবদ্ধ করেন নির্ভাবনায়। সিরাজদ্দৌলা যখন লেখা হয়, তখন মিনার্ভায় তিনকড়ি ছিল কি না তাহা একবার অনুসন্ধান করাও যুক্তিযুক্ত মনে হয় নাই।

বাস্তবিক, 'জহরার' ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল—শ্রীমতী তারাসুন্দরী। তিনকড়ির জীবনীতে ১১৫, ১১৬ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র কোন সময়ে বলিয়াছিলেন, "বঙ্গ-রঙ্গালয়ে এমন দিন আসিবে, যখন শিক্ষিতা অভিনেত্রী-গণ কোন থিয়েটারে যোগদান করিয়া কেবল এক রাত্রি অভিনয় করিয়া আশাতীত পারিশ্রমিক উপার্জ্জন করিতে পারিবে।" তারপর "তিনকড়ির উপর দিয়া সেই ভবিষ্যৎ বাণী স্বরূপে স্বরূপে ফলিয়া গিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত বঙ্গ-রঙ্গালয়ে আর কোন অভিনেত্রীই কেবল এক রাত্রি অভিনয় করিয়া ৫০।৬০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে নাই।" কেন পারিবে না? বহুপূর্ব্বের কথা বলি; সুপ্রসিদ্ধা সুকুমারী দত্ত ১০০ শত টাকা করিয়া প্রতি অভিনয় রজনীতে কত রঙ্গালয়ে অভিনয় করিয়াছে। এই সেদিনও শ্রীমতী নবীনসুন্দরীকে প্রতিরাত্রি ৭৫ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক দিয়া সিরাজ-বিজয় ও অন্যান্য নাটকে অভিনয় করান হইয়াছিল, এ কথা অনেকেই জানেন। অযথা বাড়াইলে মর্য্যাদার হানিই হয়।

বাঙ্গলার ঔপন্যাসিক ও জীবনী-লেখকগণ মনে করেন যে, অন্তিম সময়ে একটি বক্তৃতা দিয়া দেহত্যাগ না করিলে নায়ক নায়িকার সমস্ত জীবন একেবারে নিষ্ফল হইয়া যায়! এই অভিনেত্রী জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তেমনি এক নাটকীয় মহিমায় মহিমান্বিত। নটনাথকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার অন্তিম শ্বাসত্যাগের বর্ণনা (১২১ পৃষ্ঠায়) কল্পনার দিক হইতে যেমন মনোরম, সত্যের দিক হইতে সেরূপ নহে, কেন না, মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনকড়ির বাক্‌চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়াছিল।

জীবনী লিখিবার সময় নায়কের জীবন-সংক্রান্ত কোন ঘটনা শুনিলে তাহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু নাট্য প্রতিভা-সিরিজের লেখক ও সম্পাদক যে মৌলিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

অমরেন্দ্রনাথ শুনিয়াছিলেন, মাতুলালয়ে যখন তাঁহার জন্ম হয়, সেই সময় তথায় সধবার একাদশী অভিনয় হইতেছিল। জন্ম-সময় কোথায় কি হইতেছিল, তাহা অবশ্য হলপ করিয়া বলা জাতকের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। এ কথা তাঁহার জীবনী-লেখক একটু ভাবিলে ভাল করিতেন। বাগবাজার এমেচিওর পার্টি মোটে সাতবার সধবার একাদশী অভিনয় করেন। তাহা ১৮৬৮ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শেষ হইয়া যায়। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। তবে এ কথা অবশ্য বলা যায় যে, অন্য কোন দল কর্ত্তৃক অভিনয় হইতে পারে কিন্তু ক্ষতি নাই। কিন্তু অমরেন্দ্রের মাতুলালয়ে সধবার একাদশী যে অভিনয় হয় নাই, এ কথা ঠিক। অমরেন্দ্রনাথের জন্মের উপর যে কতটা নির্ভর চলে, তাহা বলিতে চাহি না; কিন্তু সম্পাদকের বিশ্বাস যে পাঠকের মনে, তাহা নিশ্চিত বুঝিয়াছি। যে তিনখানি জীবনী লইয়া আমরা আলোচনা করিতেছি, তাহাদের লেখক সম্ভবতঃ ভিন্ন-ভিন্ন, এবং আশ্চর্য্য নয় যে, একই ঘটনা বর্ণনায় তাঁহাদের পরস্পর সামঞ্জস্য না থাকিতে পারে, কিন্তু এই সিরিজের সম্পাদক একই ব্যক্তি। কাহার কথা, কোনটি ঠিক, অনুসন্ধানে তাহা নির্ণয় করিয়া পাঠককে আলোক প্রদান করা। গিরিশচন্দ্রের জীবনীর ১০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সহিত গিরিশচন্দ্রের যেদিন প্রথম আলাপ হয়, সেইদিন তিনি তাঁহাকে বলেন, 'আপনার পলাশীর যুদ্ধের 'দম করে দূরে তোপ গর্জ্জিল অমনি' লাইনটি লর্ড বাইরনের Childe Harold হইতে গৃহীত'। তারপর গিরিশচন্দ্র বলেন, অনুবাদ ঠিক হয় নাই। কি হইলে ঠিক হয় নবীন জিজ্ঞাসা করিলে গিরিশ বলিয়াছিলেন, এইরূপ হইলে বাইরনের ভাব কতকটা থাকে

"নিকট পাকট ক্রমে নিকটে গর্জ্জন
অস্ত্র ধর অস্ত্র ধর, কামান গর্জ্জন।"

গিরিশচন্দ্রের জীবনীতে এ সম্বন্ধে অমরের নামগন্ধ নাই। কিন্তু অমরেন্দ্র-জীবনীর ১০২ পৃষ্ঠায় অমরেন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, "এই ঘটনার কিছুদিন পরে (অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র নবীনের সহিত অমরের আলাপ করাইয়া দিবার কিছুদিন পরে) নিমন্ত্রিত হইয়া আমি কবিবরের বাটীতে গমন করিলাম। * * * পলাশীর যুদ্ধের কথা উপস্থিত হওয়ায় গিরিশবাবু কবিবরকে 'দ্রুম করি দূরে তোপ গর্জ্জিল আবার' এই পংক্তিটী সম্বন্ধে বলিলেন যে, ইহা Lord Byron এর ,Childe Harold এর 3rd. canto র 22nd. stanza হইতে অনুকৃত।" অনূদিত নয় অনুকৃত!

তারপর গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ স্মৃতি শক্তি ছিল বটে—যদিও গিরিশচন্দ্রের জীবনীতে তাহার আভাস পাওয়া যায় না;—কিন্তু কথায় কথায় একবারে Canto, Stanzaর সংখ্যা পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ,—তাও আবার নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া! যাহাই হউক, "গিরিশবাবু নবীনবাবুকে জানাইলেন যে, তাঁহার বিবেচনায় অনুবাদটা তেমন পরিস্ফুট হয় নাই।" তারপর নবীনবাবু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গিরিশ অনুবাদ করিলেন—

"নিকটে নিকটে পুনঃ বিপুল গর্জ্জন
যে যেখানে অগ্নিময় কামান ভীষণ!"

শেষোক্ত বর্ণনা ঠিক কি না তৎপক্ষে সন্দেহও ভীষণ! তবে ব্যাপারটা না কি পলাশীর যুদ্ধ সংক্রান্ত,—সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে না থাকিতে পারে। কোথায় ১৭৫৭ আর ১৯১৯—দীর্ঘ ব্যবধান! কিন্তু ৯৮ হইতে ১১৩ পৃষ্ঠার ব্যবধানে যে এমন ওলোট-পালট হইতে পারে, তাহা ঐ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ন্যায় বিচিত্র। এ বিস্ময় ও বিভ্রাট তিনকড়িকে লইয়া। তিনকড়ির জীবনীর ৯৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে "শ্রীমতী তিনকড়ি আবার ন্যাশনেল থিয়েটারে যোগদান করিল।" অপিচ, ১১৩ পৃষ্ঠায়—"সে অবশেষে মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিল"—উভয় ঘটনাই তিনকড়ি কাশী হইতে ফিরিয়া আসিবার পর। যদি দুই উক্তিই সত্য হয়, তথাপিও একটা কথা আছে। থিয়োসফিষ্টগণ বলেন, আমাদের দুইটা শরীর—একটা স্থূল, একটা সূক্ষ্ম। এখন কোন্ দেহ কোন্‌টায় যোগ দিয়াছিল?

যাক! এখন অমরেন্দ্রনাথের জীবনী সম্বন্ধে আর দুই-একটা কথা বলি। গিরিশচন্দ্রের জীবনীতে আছে (৫৯ ৬০ পৃষ্ঠায়) "গিরিশচন্দ্র কর্ম্মবীর মহাপুরুষ ছিলেন।" "তিনি প্রত্যেক থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীরই কল্যাণ সাধনের জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, কিন্তু মোসাহেবের কুপরামর্শে অনেক সময়ে তাঁহারা গিরিশবাবুর মঙ্গল-ইচ্ছা বুঝিতে পারেন নাই লাল শীল জানিতে রক্ষিত ইঃ হইতে হইয়াছে। * * *" সাজিয়া গভীর রা...শ্বন মাসে গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটারের নাপিতের জন্য হাঁক ডাক...রিয়া পৌষ মাসে আবার মিনার্ভা সগুম্ফ নারী সাজিয়া কেমন...লেন।" পড়িলে মনে হয় না কি মৃত্যুর পর জীবন লইয়া এমন...পরামর্শে অমরেন্দ্র গিরিশচন্দ্রের সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ করিয়াছিলেন? নহিলে ক্লাসিকের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদের কথা বলিবার সময় হঠাৎ এ তথ্য অবতারণার উদ্দেশ্য কি? কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের জীবনীর ৫৬।৫৭ পৃষ্ঠায় ক্লাসিকে 'পাণ্ডব গৌরব' খুলিবার পরে মহাপুরুষ গিরিশ অমরেন্দ্রকে বলিতেছেন, "আমার জন্যই তোমার থিয়েটার এখন চলিয়াছে। * * * সুতরাং তোমার আমাকে লাভের একটা অংশ প্রদান করা উচিত, তাহা না হইলে আমি তোমার থিয়েটারে থাকিতে পারিব না।" এ কথায় স্বাধীনচেতা অমরেন্দ্র যে উত্তর দিলেন, তার শেষ কথা এই, "আমায় মাপ করিবেন, প্রাপ্য দেয়াতিরিক্ত লাভের অংশ দেওয়া অসম্ভব।" এ সংবাদ আমরা জানিতাম না। গিরিশবাবুর বসোয়েল্, যিনি গিরিশচন্দ্রের কর্ম্মময় জীবনের শেষ পনের বৎসর "সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় তাঁহার নিকট থাকিতেন" তিনিও এ পর্য্যন্ত এ কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই। অমরেন্দ্রের জীবনীতে আছে (৫৭ পৃষ্ঠা) "সেদিন আবার দোল, সর্ব্বত্র আবিরের ছড়াছড়ি।" ইহা রক্তারক্তির ইঙ্গিত কি না, কে বলিবে! কিন্তু একটা কথা জানিতে ইচ্ছা করে যে, এ সকল কথা নাট্য-প্রতিভা সিংহের গিরিশচন্দ্রে নাই কেন?

এইবার অমরেন্দ্রনাথের জীবনী সংক্রান্ত একটা গুরুতর অথচ সঙ্কোচ সঙ্কুল বিষয় আমরা আলোচনা করিব। অমরেন্দ্র এখন বাদ-প্রতিবাদের অতীত দেশে। এখানকার সত্য-মিথ্যায়, সুখ্যাতি-নিন্দায়, তাঁহার আর কিছুই আসে যায় না। তথাপি কথাটা না তুলিতে হইলে ভাল হইত; আর সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইত লেখক বা সম্পাদক যদি এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিতেন। তিনি যখন তুলিয়াছেন, তখন সত্যের অনুরোধে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। কথাটা এই 'হরিরাজ' নাটকের প্রণেতা কে? বহুবার অভিনয়ে 'পলাশীর যুদ্ধে' দর্শকের অরুচি জন্মিয়াছে দেখিয়া অমরেন্দ্র একখানি নূতন নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়া দেন এবং অতি শীঘ্রই একখানি নূতন নাটক রচনা করেন। এই নাটকখানির নাম হরিরাজ। এইখানে ক্রস মার্কা দিয়া ফুটনোট আছে "নাটকখানি সম্পূর্ণ নাট্য-সম্পৎপূর্ণ, সুতরাং অমরেন্দ্র বাবুর ন্যায় অপরিপক্কবুদ্ধি নবীন লেখক দ্বারা বিরচিত বলিয়া বিশ্বাস

করিতে প্রবৃত্তি হয় না"। এখানে জিজ্ঞাস্য, বিশ্বাসটা কার? লেখকের, সম্পাদকের, না পাঠকের? সম্ভবতঃ পাঠকের, কেন না অব্যবহিত পরেই প্রশংসাপত্র প্রদত্ত হইয়াছে— "হরিরাজ নাটকই অমরেন্দ্র বাবুর শ্রেষ্ঠ নাটক।" কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলে কেহ সাদায় কালি দিয়া এ সকল কথা লিখিতে সাহস করিতেন না। সম্ভবতঃ হরিরাজ অমর গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত দেখিয়া লেখক ও সম্পাদক এই লজ্জাজনক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। একটু অনুসন্ধান করিলে লেখক এবং সম্পাদক উভয়েই জানিতে পারিতেন যে, ক্লাসিকে যে সময় "হরিরাজ" রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহারা ভেরী-নিনাদ করিতেছেন, তাহার বহু পূর্ব্বে এই কলিকাতা নগরীতে সেই নাটক একটি অবৈতনিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বহুবার অভিনীত হইয়াছিল। সিটি থিয়েটারের দল যেমন মিনার্ভার বীজ, Victoria Dramatic Club নামায় এই অবৈতনিক সম্প্রদায় ও তাহার সাজ সরঞ্জাম, পোষাক পরিচ্ছদ পর্য্যন্তও তেমনি ক্লাসিকের ভিত্তি। এই দল রামবাগানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুবিখ্যাত মিঃ গাঙ্গুলি পণ্ডিত ইহার অভিনেতা ছিলেন এবং স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর সময়-সময় ইহার শিক্ষকতা করিতেন। এই দলেই হরিরাজের প্রথম অভিনয় হয়। ইহার রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এক্ষণে পরলোকগত। ইনি পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষের ভাগিনেয়। ১৩০২ সালে গ্রেট ইডেন প্রেসে হরিরাজের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় এবং তাহার প্রকাশক ছিলেন সুরেশচন্দ্র বসু। এ সংস্করণে অমরবাবুর নাম-গন্ধও নাই এবং ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধও ছিল না। সুরেশ বাবুর তহবিলে যে তাহা জমা হইত, তাহা সুরেশবাবুর খাতা পরীক্ষা করিলে অনায়াসে জানা যায়।

হরিরাজে কেন যে নগেনবাবু আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তাহা জানা নাই। কিন্তু প্রথম সংস্করণে রমানাথ বাবুর উদ্দেশে যে উৎসর্গপত্র আছে, আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি; দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন যে, তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি হরিরাজের রচয়িতা।

"যে অসীম স্নেহঋণে
বাঁধা আছি শ্রীচরণে
কণামাত্র প্রতিদান শকতি কোথায়।
অতীতের দ্বার খুলি
শৈশবের স্মৃতিগুলি
সেই স্মৃতি সে দলের পুলক বাড়ায়।"

৺রমানাথ ঘোষের বাটীতে যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী কর্ত্তৃক হরিরাজের অভিনয় হয়, তাঁহাদের নামের তালিকা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

হরিরাজ — ৺চন্দ্রনাথ সেন। ইনি ক্লাসিকেও অমরেন্দ্রনাথের পরিবর্ত্তে সময়ে সময়ে হরিরাজ সাজিতেন।

জয়াকর — শ্রীঅমৃতলাল মল্লিক (পরে ক্লাসিকেও অভিনয় করেন)

কুলধ্বজ — ৺গোষ্ঠচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দাবদগ্ধ — ৺ভোলানাথ দে

চিত্রলেখা — ছোটরাণী (পরে ক্লাসিকে)

ইত্যাদি ইত্যাদি।

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় হরিরাজের সঙ্গীতগুলিতে সুর-যোজনা করেন এবং তাঁহার পদ্ধত সুরেই ক্লাসিকে ঐ সকল সঙ্গীত গীত হইত।

জীবনী ও সংকলন সহিত এই নাট্য পরিষদ সিরিজ সম্পাদিত হইয়াছে, উপসংহারে আর একটী ভুল কর উদাহরণ না দিয়া এ আলোচনা শেষ করিতে পারি না।

তিনকড়ির জন্ম অগ্রহায়ণ [illegible] এবং তাঁহার মৃত্যু ১২২৪ সালে, অর্থাৎ জন্মিবার ঠিক ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে! এ ভুলটা ও Manhunt of Voice (১৩৩ পৃষ্ঠা) যেন ছাপাখানার ভূতের ঘাড়ে চাপান যায়; কিন্তু অন্যান্য প্রমাদ যে কোথায় কাহার স্কন্ধে চাপিবে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আমাদের এখনও আর একটা প্রশ্ন আছে। এই সকল জীবনী উপন্যাস সিরিজের অন্তর্গত না করিয়া বিভিন্ন সিরিজভুক্ত করিবার তাৎপর্য্য কি? এই সকল জীবনীতে কল্পনার অবাধ বিহার ও কলমের যথেচ্ছাচার দেখিয়া আজ রাজ জীবিত থাকিলে 'মিঠেকড়া'র ভাষায় বলিতেন—"তাও ছাপালি, গাল হল, নগদ মলা এক টাকা"।

মৃতের শ্রাদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া এই সিরিজে এখন জীবিতের শ্রাদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। যাহাদের শ্রাদ্ধ, তাঁহারা বুঝিবেন।

পশ্চিম-তরঙ্গ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

১। সাগর কত গভীর ?

কিছুদিন আগেও এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বল্‌তে বাধ্য হতেন, "কি জানি না, শুনেছি অতল!" কিন্তু এখন 'সমুদ্রমান' (Marimeter) যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই লোকে ব'লে দিতে পারেন, কোন সাগরতল কত গভীর। এই 'সমুদ্রমান' যন্ত্র থেকে একটা শব্দ তরঙ্গ (Sound wave) একেবারে সমুদ্রের তলা পর্যন্ত ছুটে যায়, আবার সেখান থেকে তার একটা প্রতিধ্বনি উপরে ফিরে আসে। ঐ শব্দ তরঙ্গ যখন সমুদ্রের নীচে নামে, আর তার একটা প্রতিধ্বনি আবার উপরে উঠে আসতে থাকে, সমুদ্রমান যন্ত্র তখন সেই শব্দ তরঙ্গের যাওয়া-আসার সঠিক সময়টুকুরও একটা হিসাব রাখে। পরে সেই হিসেব দেখে সহজেই সমুদ্রের গভীরতা স্থির হোতে পারে। কারণ, শব্দ যখন জলের ভেতর দিয়ে চলাচল করে, তখন তার গতির কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, বরাবর ঠিক একসমান বেগে যাতায়াত করে। (গতি সেকেণ্ডে প্রায় [illegible]০০০ ফিট চলে।) সুতরাং ঐ শব্দ-তরঙ্গের যাওয়া-আসার ঠিক মাপটা কতটা সময় লাগলো, জানতে পারলেই, সাগরের গভীরতার একটা খুব সোজা হিসেব পাওয়া যায়।

(Literary Digest.)

২। ভূগোলের ভুল ছবি !

পৃথিবী গোল ; কিন্তু তার মানচিত্র আঁকা হয়, একখানা চৌকো কাগজে চ্যাপ্টা ভাবে ; কাজেই পৃথিবীর সে মানচিত্র কিছুতেই সঠিক হয় না। অনেক সময়ে ভূগোলের এই বেঠিক মানচিত্র লোকের বিস্তর ক্ষতির কারণ হ'য়ে পড়ে। একবার ক্যালিফোর্ণিয়ায় এই রকম হ'য়েছিল। 'মণ্টেরী' বন্দরের কিছু দূরে একখানা জাহাজ চড়ায় আটকে গেছল। তারা এজেণ্টকে খবর পাঠালে যে, শিগ্‌গীরই যেন কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে একখানা পোতত্রাণ (wrecker) পাঠান হয়। এজেণ্ট দেখ্‌লে, মোটে দু'খানি পোত-ত্রাণ হাতে আছে,—একখানি 'আকাপুল্‌কো'-য়, আর একখানি 'জুনো'য়। তাড়াতাড়ি একখানা ম্যাপে দেখে নিলে, কোন জায়গাটা বেশি কাছে। ম্যাপ দেখে এজেণ্টের মনে হো'ল, যেন 'আকাপুল্‌কোটাই' বেশি কাছে। তিনি অমনি 'আকাপুল্‌কোয়' টেলিগ্রাম করলেন। ভূগোল অনুসারে যদিও 'জুনো'ই বেশি কাছে,—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চ্যাপ্টা ম্যাপ আঁকার দোষে জুনোটাই দূরে বলে মনে হয়েছে। ফলে 'আকাপুল্‌কো' থেকে সাহায্য আসবার আগেই ক্রুদ্ধ সমুদ্রের বিরাট তরঙ্গের প্রচণ্ড আঘাতে জাহাজখানি গুঁড়ো হ'য়ে গেল! জাহাজখানা নষ্ট হওয়ায় যে ক্ষতিটা হ'ল, সেটা কেবল ঐ ভূগোলের ভুল ছবির জন্যে। কারণ, ঐ ম্যাপে বিষুবরেখা থেকে মেরু প্রান্তের দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে—কিন্তু ঐ ম্যাপখানি যদি ঠিক করে আঁকা হো'তো, অর্থাৎ গোলাকার পৃথিবীটাকে চারফলা কোরে কেটে, তার পর তাকে চ্যাপ্টা কোরে এঁকে দেখান হোতো, তা হোলে আর কোন জাহাজ কোম্পানীর এজেণ্টের পক্ষে অমন মারাত্মক রকম ভুল করার সম্ভাবনা থাকতো না।

(Literary Digest.)

৩। বীরের ভূষণ।

পৃথিবীর সভ্যতার সেই আদিম যুগের ইতিহাস থেকে আজ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে যে, কটি-লম্বিত কৃপাণই সকল দেশের সকল বীরের যেন একমাত্র বাঞ্ছিত অঙ্গ ভূষণ। ওটা যেমন তাদের পক্ষে একটা মস্ত গৌরবের বস্তু, তেমনিই সবচেয়ে শোভনও বটে। তাই বোধ হয় বীরত্বের পুরস্কার দিতে হ'লে, বীরেন্দ্র বৃন্দকে সর্ব্বাগ্রে বহুমূল্য অসি উপহার দিতে হয়। এইটেই সকল দেশের একটা সনাতন প্রথা দাঁড়িয়ে গেছে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের চারজন মিত্রপক্ষীয় প্রধান সেনাপতিও তাঁদের বীরত্ব আর রণ কৌশলের জন্যে চারখানি অসাধারণ অসি উপহার পেয়েছেন। তাঁরা হোচ্ছেন, জেনারেল 'জোফ্রে',

'ফশ্', 'পার্শিং' আর 'পীতেন্'। 'জোফ্রে'কে যে তরবারিখানি উপহার দেওয়া হোয়েছে, তার সোনার বাঁট, তাতে মীনের কাজ করা। বাঁটের গায়ে নানা রকম শিল্প-কার্য্য আছে। তার মধ্যে সব চেয়ে প্রধান হচ্ছে, "প্যারী সহর" (The City of Paris) নামে একখানি জাহাজের 'নাম-লিপি'র (Escutcheon) অনুকৃতিটি। টকটকে লাল জমীতে ছোট্ট জাহাজখানির শুভ্র রূপোলী তলা, ওপরে রূপোর সাদা পাল নীল আকাশের গায়ে উড়ছে! আকাশের গায়ে চিত্রিত ফ্রান্সের হৃদ-কমল যেন তারাদলের মত ফুটে রয়েছে! বাঁটের মাথার ওপর সোনার 'ওক্'-পাতায় তৈরী একটা চমৎকার বিজয়মুকুট! প্যারী সহরকে জার্ম্মাণীর আসন্ন ও অনিবার্য্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে প্যারীর অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে, তাদের গভীর কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই অসিখানি ওই প্রবীণ মহারথীকে উপহার দিয়েছে। 'ফশের' তরবারিখানিরও সোনার বাঁট; কিন্তু তাতে বেশি কারুকার্য্য নেই; কারণ, 'ফশ' নিজে বড় সাদাসিধে লোক; —তাই তাঁর চরিত্রের এই দিকটায় লক্ষ্য রেখে শিল্পী যতদূর সম্ভব তার কারুকলাটুকু আড়ম্বরহীন করবার চেষ্টা কোরেছে। বাঁটের যে অংশটুকু মুঠোর মধ্যে থাকে, সেখানে ফ্রান্সের রূপ কল্পনা কোরে, তার একটি প্রতিমূর্ত্তি খাড়া কোরে দেওয়া হোয়েছে। এই মূর্ত্তির পায়ের নীচে 'আলসেস', 'লোরেন' দুই ভগিনী যেন বিজয়িনী জননীর মুখের পানে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে চেয়ে আছে! বাঁটের মাথার ওপর যোদ্ধার শিরস্ত্রাণ। তার চার ধারে আবার রণযাত্রা বীরবৃন্দের অভিযান আঁকা! বাঁটটি মুঠো কোরে ধরলে হাতের মুঠোর ওপর দিয়ে যে অর্দ্ধচন্দ্রের মত একটি বৃত্ত অসিমূল থেকে বাঁটের শেষ পর্য্যন্ত ঘুরে যায়, সেখানে দেবী জয়শ্রীর মূর্ত্তি পরিকল্পনা করা আছে। জেনারেল ফশ ফ্রান্সের যে প্রদেশে জন্মেছিলেন, সেই প্রদেশের অধিবাসীরা তাদের আপন অঞ্চলের এই মহাবীরের সম্মানের জন্য, তাঁকে সগৌরবে এই অপূর্ব্ব অসি উপহার দিয়েছে। মার্শেল 'পীতেনে'র সুবর্ণ অসিমূলে ফরাসী জাতীয়-পতাকা ধারণ করে, মূর্ত্তিমতী প্যারীনগরী যেন দু'হাতে একটি বিজয়-মাল্য ধারণ ক'রে, বীরবরকে বরণ কর্ব্বার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পদতলে প্যারী সহরের নামলিপি খোদিত পোত-প্রতীক্ (Symbolic ship of the Paris Escutcheon); অপর দিকে প্যারীর রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদাজ্ঞাপক কৌলীন্য-নিদর্শন (Coat of Arms)। এগুলি সমস্ত মীনের কাজ করা। বাঁটের গায়ে হাতীর দাঁতের বর্দ্ধনীর মধ্যে জহরতের কাজ করা 'সপ্তর্ষিমণ্ডল' ঝক্‌মক্ কচ্ছে। জেনারেল 'পার্শিং'কে লণ্ডন সহর সম্মানে যে স্বর্ণমণ্ডিত তরবারি উপহার দিয়েছে, তার সেই বহুমূল্য কারুকার্য্য-খচিত বাঁটের একদিকে লণ্ডন 'বৃটানিয়ার' প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে, অপর দিকে 'স্বাধীনতার' প্রতিমা অঙ্কিত। লণ্ডন সহরের ও আমেরিকার রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদাজ্ঞাপক কৌলীন্য নিদর্শন ও মূর্ত্তিমতী লণ্ডন নগরীও খোদিত করা আছে। হাতোলের নীচেই সেনাপতির নামাক্ষর (monogram) কয়টা মণিমুক্তা ও হীরকে খচিত করা হয়েছে।

(Literary Digest.)

৪। অদৃষ্টপূর্ব্ব খবরের কাগজ

প্যারী সহরের ছাপাখানার কর্ম্মচারীরা যখন সকলে ধর্ম্মঘট ক'রে একসঙ্গে কাজ করা বন্ধ করে দিলে, তখন প্যারীর বড় বড় দৈনিক খবরের কাগজওয়ালারা স্ব স্ব পত্রিকা প্রকাশের উপায়ান্তর না দেখে, সকলে মিলে একজোটে একখানা এক সঙ্গে কাগজ বার করতে সুরু করেছিল। সেই সময়ের কয়েকখানি বিখ্যাত সংবাদ-পত্রের এ একখানি মাত্র সম্মিলিত সংস্করণ পৃথিবীর খবরের কাগজের ইতিহাসে এক অদ্ভুত নূতন কাণ্ড! এই কাগজ-খানির নাম দেওয়া হয়েছিল "প্যারীর সংবাদপত্র" (La Presse de Paris)। যে ক'দিন ধর্ম্মঘট চলেছিল, তার মধ্যেই কাগজখানি একফর্দ্দ থেকে ক্রমে চার পাতায় দাঁড়িয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশখানি খবরের কাগজের স্বত্বাধিকারীরা একত্র মিলিত হ'য়ে, অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমে, এই এক-খানি কাগজ প্রকাশ ক'রতে সমর্থ হয়েছিল। কাগজখানির একপৃষ্ঠায় কেবল বিজ্ঞাপন থাকতো, অন্যান্য পৃষ্ঠায় সমস্ত সম্মিলিত সংবাদপত্রের প্রত্যেকের এক-একটী বিভিন্ন সম্পাদকীয় স্তম্ভ, আর প্রধান প্রধান জরুরী খবরগুলি। এই কাগজখানি জনসাধারণের খুব পছন্দ হ'য়েছিল; কারণ, তারা একখানি কাগজ কিনেই পঞ্চাশখানি কাগজের মতামত জানতে পাচ্ছিল। আমেরিকায় যখন এই ছাপা-

খানার ধর্মঘট বাধে, তখন আমেরিকার কাগজওয়ালারা হাতের লেখা 'লিথো' কোরে, আর লিপিযন্ত্রের (Type-writer) সাহায্যে তাদের কাগজ প্রকাশ ক'রেছিল। সেও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে কেউ কখনও পূর্ব্বে এরকম হ'তে দেখেনি। আমেরিকার আবিষ্কৃত এই নূতন ধরণের উপায় দেখে এখন অনেকে বলছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে ছাপাখানার অস্তিত্ব আর থাকবে না; ক্রমে সমস্ত পত্র, পত্রিকা, পুস্তক প্রভৃতি এই 'লিপিযন্ত্র' কিম্বা 'লিথোগাফে' ছাপা হবে।

৭। ফসলের খবর

আমেরিকার সরকারী কৃষিবিভাগ থেকে আগামী বৎসরের ফসল উৎপন্নের একটা আনুমানিক হিসাব পূর্ব্বাহ্নেই প্রকাশিত হয়। এই আগামী বর্ষের ফসল সম্ভাবনার সরকারী হিসাবটা যত শীঘ্র সম্ভব জানবার জন্য অনেক কারবারী লোক উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করে। কৃষি বিভাগে ১০জন ফসল সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অভিজ্ঞ লোক ভিন্ন ভিন্ন ফসল আগামী বৎসর কি পরিমাণ উৎপন্ন হ'তে পারে, তার একটা সঠিক হিসাব প্রস্তুত করার জন্য নিযুক্ত আছেন। আর তাঁদের সাহায্য করবার জন্যে প্রায় ১১৪০০০ হাজার লোক বিভিন্ন প্রদেশের চাষবাসের সন্ধান কোরে তাঁদের কাছে খবর পাঠাচ্ছেন। চাল, ডাল, তুলো, তামাক প্রভৃতি পণ্যের ব্যবসায়ীরা আসছে বছরের ফসলের হিসেবটা একটু আগে জানবার জন্যে অনেক টাকা খরচ করতেও প্রস্তুত থাকে। কারণ খবরটা জানতে পারলে, কোন্ ফসলটা কি রকম জন্মাবে দেখে, তারা আসছে বছরের বাজার দরটা সহজেই অনুমান করতে পারে,—আর সেই বুঝে মাল কেনা-বেচা কোরেও বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিতে পারে। এজন্য অনেকে প্রচুর ঘুস প্রভৃতি নানা অসদুপায় অবলম্বন কোরতেও পশ্চাৎপদ হয় না! তাই কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকেন, পাছে কোনও রকমে সরকারী 'রিপোর্ট' প্রকাশ হবার আগে, বিশেষজ্ঞদের আগামী ফসলের হিসাব নিকাশটা ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারে! হিসাব প্রকাশ হবার দিন সকাল থেকেই দলে দলে খবরের কাগজের সংবাদদাতারা (Reporters) সরকারী কৃষি আপিসে এসে অপেক্ষা করে। আপিসঘরের দোর-জানলা বন্ধ কোরে হিসাবের খসড়া রাখা হয়। তার পর কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যে মুহূর্ত্তে হিসাবটা সাধারণ্যে প্রকাশ করা হো'ক বলে অনুমতি দেন, অমনি সংবাদদাতাদের মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়ে যায়! সকলেই যে যার নিজের কাগজে সবার আগে খবর পাঠাবার জন্য ব্যস্ত হোয়ে পড়ে। তাদের আর সংবাদ নিয়ে আপিসে ফিরে যাওয়ার অবসর হয় না, 'টেলিফোঁ' কোরে খবরটা যে যার কাগজে পাঠিয়ে দেয়। রিপোর্টের কাগজখানা হাতে কোরে ধ'রে, কান খাড়া কোরে তারা নিজের-নিজের টেলিফোঁর দিকে ফিরে তৈরী হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে; যেমন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির হুকুম পায়, অমনি ছুটে গিয়ে যে যার কাগজে টেলিফোঁ কোরতে থাকে। তাদের ভেতর যেন এক জীবন মরণ সংগ্রাম চলে। যার খবর পাঠাতে একটু দেরী হবে, তারই চাকরী যাবে; কারণ কাগজওয়ালাদের ভেতর কে সর্ব্বাগ্রে এই ফসলের খবর প্রকাশ কোরতে পারে, তাই নিয়ে সেদিন একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে।

(Literary Digest.)

৮। আমেরিকায় 'খিলাফৎ' আলোচনা

ভারতবর্ষে "খিলাফৎ" সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানের যে সম্মিলিত আন্দোলন চলেছে, আমেরিকায় অনেক কাগজে মধ্যে মধ্যে তার খবর প্রকাশিত হচ্ছে। সম্প্রতি Literary Digest নামক আমেরিকার বিখ্যাত সাপ্তাহিক কাগজখানি এ সম্বন্ধে প্রায় একপৃষ্ঠাপূর্ণ প্রবন্ধ ও "When the East prays against the West" নাম দিয়ে 'হরতালের' দিন দিল্লীর জুম্মা মসজিদে সহস্র-সহস্র হিন্দু মুসলমান একত্র সমস্ত দৈহিক কাজ ফেলে রেখে, উপবাস ব্রত পালন করে, শুদ্ধ সংযত চিত্তে ভগবানের দরবারে নতশিরে দাঁড়িয়ে হৃদয়ের যে করুণ প্রার্থনা নিবেদন করে দিয়েছিল, তারই একখানি সুন্দর ছবি প্রকাশ কোরেছে!

প্রবন্ধটির আগাগোড়া বেশ একটু সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতার "অমৃতবাজার পত্রিকা" ও মান্দ্রাজের "নিউ ইণ্ডিয়া" কাগজ থেকে তারা এখানকার অনেক কথা উদ্ধৃত ক'রে দিয়েছে। প্রবন্ধটী অত্যন্ত দীর্ঘ ব'লে তার সমস্ত অনুবাদ দেওয়া অসম্ভব; এখানে কেবল তার একটু সারমর্ম্ম দেওয়া গেল:—"বিশাল সাগরতুল্য এক বিচিত্র বিরাট জনসঙ্ঘ গভীর সমবেদনায় সম্মিলিত

হইয়া, আবেগ-কম্পিত হৃদয়ে ঈশ্বর-আরাধনা করিতেছে,—এরূপ মহান্ দৃশ্য প্রাচ্য জগতের বহির্ভাগে আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না, এমন কি পৃথিবীর অন্যখণ্ডেও এমন অসাধারণ ব্যাপার সচরাচর বড় একটা কেহ দেখিতে পায় না। তুর্ক সাম্রাজ্যের বিচ্ছেদ ও সুল্‌তানের রাষ্ট্রীয় শক্তি খর্ব্ব করার বিরুদ্ধে মোসলেম জগতের প্রতিবাদ স্বরূপ এই বিপুল আন্দোলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া এই ব্যাপারটি আজ বিশেষভাবে পাশ্চাত্যবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই আন্দোলন হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী কোন শক্তি মুসলমানদের স্বধর্ম্মী কোন রাজ্যের অভিভাবক হইবে, ইহাতে তাহারা একেবারেই সম্মত নয়। এমন কি মিত্রশক্তির পক্ষপাতী আরব-অধিপতিকে 'ইস্‌লাম' ধর্ম্মের খলিফা নির্ব্বাচিত করা ও পবিত্র 'হজ' তীর্থ তাঁহার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করাতেও তাহাদের বিশেষ আপত্তি আছে। তুরস্কের সুলতানকেই তাহারা চিরপ্রথা অনুসারে খলিফের পদে অভিষিক্ত দেখিতে চায়, এবং সুলতানের রাষ্ট্রীয় শক্তির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম তাহারা ইচ্ছা করে না। এই জন্যই ভারতের সাতকোটী মুসলমান প্রজা তাহাদের হিন্দু ভ্রাতাগণের সহিত মিলিত হইয়া আজ এমন প্রবল প্রতিবাদ উপস্থিত করিয়াছে।"

৭। য়ুরোপে পঞ্জাবের কথা।

এদেশের খবর বড় একটা য়ুরোপের লোক জানতে পায় না। তবে নিতান্ত কোন রকম কিছু অসাধারণ ব্যাপার ঘটলে সে দেশের কাগজওয়ালারা তার খবর দেবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তার পনর আনাই মিথ্যা খবর। এই যেমন আমেরিকার "Review of Reviews" কাগজে পাঞ্জাবের ব্যাপার সম্বন্ধে যা লিখেছে—তা একেবারেই হাস্যকর। যথা—

REVOLUTION IN INDIA

Last April there was a revolution which affected the provinces of Bombay, Bengal, the Punjab, and the United Provinces. Hundreds of lives have been lost on both the sides. It is admitted that the Sixth City of Amritsar was a scene of serious troubles. Many English banks were looted by the revolutionists, and the entire city was in their hands for about a week. The northern section of Calcutta was in the hands of the revolutionists for two days. Bombay, Ahmedabad, Lahore, Delhi, Gujranwala, Allahabad, and other cities were tremendously affected by riots and strikes. The Hindu, the Mahommedans, the Sikhs, the Marwaris, and other sects and creed united in an organized opposition to the British rule in India. India's disarmed people have now been taken under control by British machine guns, bombing planes, and armored cars.

এবং Literary Digest কাগজখানা কতকটা খবর দিতে পেরেছে বলে মনে হয়। যেমন,

THE BRITISH "MASSACRE" IN INDIA

"To make a wide Impression" on the elements of discontent in the Punjab, according to their commander, Brig Gen. R. E. H. Dyer, British and Indian troops fired without warning last April on a meeting of Indians at Amritsar, killing 500 persons and wounding about 1,500 in ten minutes. The wounded were left to die or recover in the place where they fell, because, as General Dyer explained, "That was not my job. There were hospitals." In the view of some severe British critics, General Dyer has "made a wide impression," not only in the Punjab, but also "throughout the world." and an impression which must be removed at all costs, "if our credit and honor are not to be fatally impaired." On the other

hand, certain British editors give credit to General Dyer and other British officials, civil and military, for having saved northern India from a danger comparable only to the Indian mutiny." But even these defenders of the strong hand at Amritsar regret that the British public was not allowed to know at the time all that happened in the Punjab. Full disclosure of these happenings began with the opening of an inquiry at Lahore on November 11 by a committee headed by Lord Hunter. The violent outbreaks of disorder in Calcutta, Bombay, and the Punjab, we are told, eventuated from the "passive resistance" movement against the Rowlatt Act, which is directed at revolutionary and anarchical crime.

The appalling news from Amritsar is a revelation to the British people of what their rule in India might have come to but for the change of course set up by the measure of self-government now passing into law.

এ ত গেল আমেরিকার খবর। বিলাতের "Morning Post" আর Manchester Guardian" অবশ্য খবর কিছু পেয়েছেন, কিন্তু তাঁরাও যা ছেপে দিয়েছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর! যেমন—

The Rowlatt Act, a measure continuing in milder form the Defense of India Act, was made necessary by the attempts to overthrow British rule during the war. Agitators seized upon this measure, to organize an agitation which "threatened the very existence of British rule in India." Events in Afghanistan, and even in Bolshevik Russia, "may or may not have had a connection with the movement," but at all events they made the situation more dangerous. All humane men deplore such a loss of life as occurred at Amritsar, but all men of sense agree that it is a mere trifle compared with the loss of life which must certainly have occurred if these heroic men had not done as they did—and as we hope Englishmen will continue to do in similar situations." The shooting at Amritsar was preceded by earlier trouble there, in the course of which four Europeans were murdered and two banks and the town hall were wrecked.

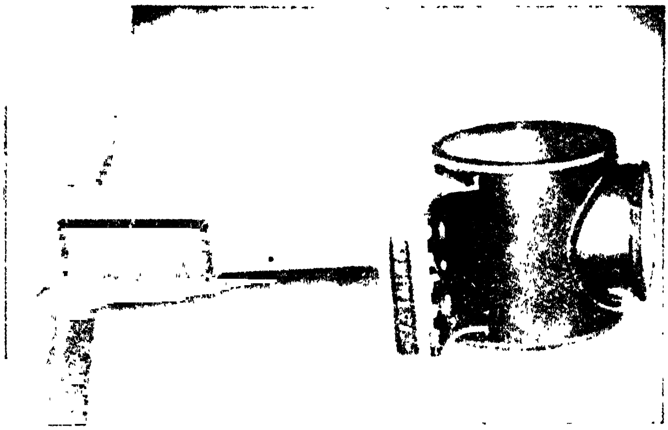
(Morning Post.)

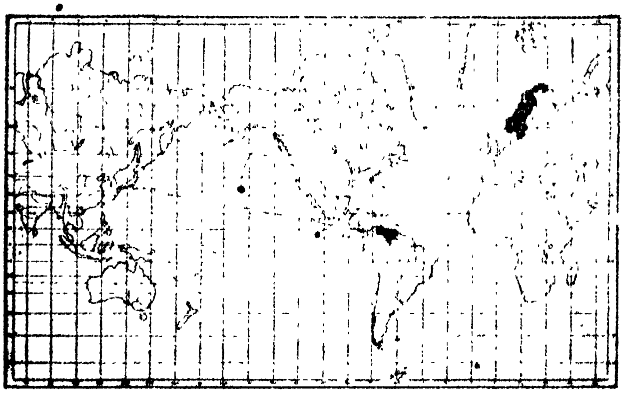
ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন লিখেছেন -

We must wait for the report of Lord Hunter's Committee in order to judge of the extent and seriousness of the disturbances which, on April 13, were at Amritsar "quenched in blood," but "it may be said at once that few more dreadful incidents can be found in the history of British rule in India than the story of their suppression.' The appalling story of the shooting at Amritsar reads "as tho a madman had been let loose to massacre at large."

* * * * * *

"It is unnecessary to recall the further incidents in Amritsar itself of public floggings, apparently without any sort of trial, and the order given by General Dyer that all native Indians passing through the street in which Miss Sherwood was attacked (including those residing in it) must go on all fours. The question for Englishmen is how far proceedings of this kind are to be regarded as necessary incidents of our Indian administra-

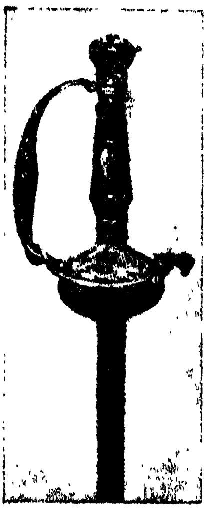








সেনাপতি [illegible] সেনাপতি [illegible] সেনাপতি [illegible]



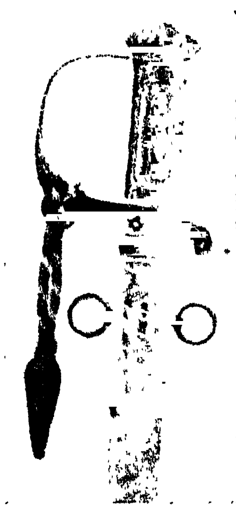
সেনাপতি [illegible] অসি



সেনাপতি [illegible]



সেনাপতি 'পেতেনের' অসি



সেনাপতি [illegible]-এর অসি



Ce journal est publié avec le concours de tous les journaux de Paris

LA PRESSE DE PARIS

MARDI 11 NOVEMBRE 1919

ÉDITION DU MATIN

LA PRESSE DE PARIS

ANNIVERSAIRE

11 NOVEMBRE 1918 - 11 NOVEMBRE 1919

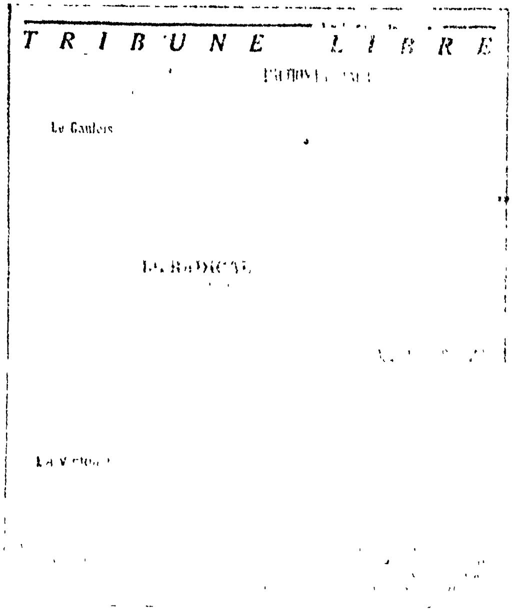
Une année de France en Alsace retrouvée

LONDRES A FAIT A M. POINCARÉ UN ACCUEIL INOUBLIABLE

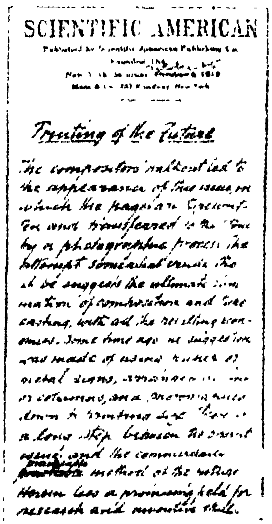
অদ্ভুত সংবাদপত্র

tion, and how far, when they have occurred, they are to be treated as venial errors to be lightly regarded or condoned. General Dyer appears to be an honest soldier who, however deeply disqualified for the wise exercise of the powers entrusted to or assumed by him, believed and believes that the measures he took, however dreadful, were necessary under the circumstances, and that, in fact, they saved the situation. It is quite true that, whether as a consequence or not of his action the outbreak at Amritsar had no sequel elsewhere, and that the movement of discontent died down or went underground. But that does not in any degree absolve the British Government from its responsibility."

Manchester *Guardian*


TRIBUNE LIBRE

(Editorial)


SCIENTIFIC AMERICAN

Printing of the Future

হাতের লেখা, 'সিয়েন্টিফিক আমেরিকান' সাপ্তাহিক পত্র


The Independent

(Typewriter)

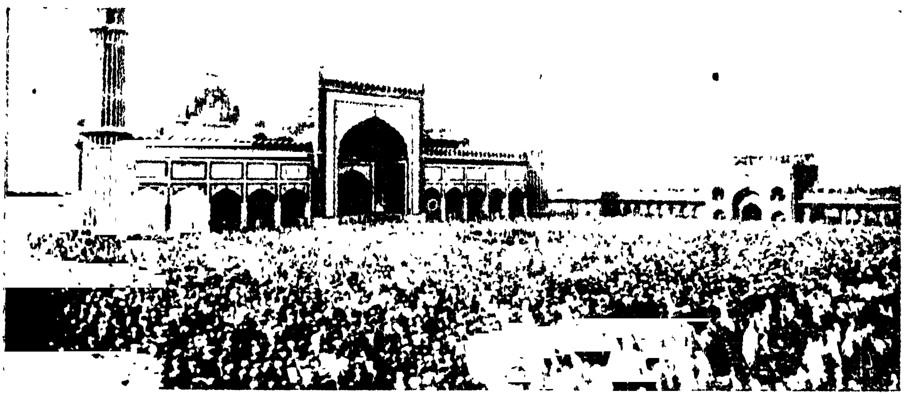
এই ত গেল এক দলের কথা; বিলাতের আর এক দলের মুখপত্র লণ্ডন 'Daily News' আর এক সুরে কি বল্‌ছেন, তাও শুনুন। Daily News লিখেছেন—

It was innocently assumed in England that when the armistice was signed the reign of frightfulness was over. That assumption was wrong. * * *

"The scene of this new frightfulness is not Belgium, but India, the general responsible is not German, but British. The Government



[illegible]
(Reporters.) [illegible]



When the East prays against the West'
[illegible]

which has practised this concealment—in its way one of the most shocking features of the whole concern—is British. The victims are not even technically enemies, but 'rebels,' n General Dyer's words, that is to say, British subjects who innocently or otherwise ventured to act in contravention of his decrees. We do not ignore the gravity of the crimes previously committed. . . . We do not forget the difficulty and delicacy of the position. It is just to remember, moreover, hat the case is in a sense *sub judice*, and that he final conclusions of the Commission of



অমৃতসহরী চালে স্বাধীনতার পরিচালনা

Inquiry may to some extent modify the story as we know it at present. We hope profoundly that it will, for what could be more futile than to talk of Indian reforms, of 'self government for India', of Indian government as a trust held by the British Parliament and people if wholesale massacres could be perpetrated without the British Parliament or people knowing a word about them for months?" (London *Daily News*)

অর্থাৎ, কথাটা এই যে, কোন পক্ষই ভেবে চিন্তে কিছু বলেন না। বিলেতের লোকেরা ভেবে ঠাওর পান না, এর কোন কথাটা সত্য; অথচ তাদের উপরই আমাদের শুভাশুভ আমাদের আনা নির্ভর করছে। উপরে যে সব মত উদ্ধৃত করা গেলো, তার থেকে বেশ বোঝা যায় যে, পাঞ্জাবের সম্বন্ধে যার যা খুসী, সে তাই লিখেছে। বিলেতের" লোক তাই শুনছেন। এতে আমাদের পক্ষে মন্দ বই ভাল হয় না। আমাদের এই সব দেখে বলতে ইচ্ছে হয় —'Save us from our friends.'

ত্রিবাঙ্কুর-ভ্রমণ

[শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, বি-এল্]

(১)

সম্প্রতি কার্য্যোপলক্ষে আমাকে একবার ত্রিবাঙ্কুরে যাইতে হইয়াছিল। ত্রিবাঙ্কুর ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা,—ইহার উত্তরে কোচিন, দক্ষিণে ভারতমহাসাগর, পূর্ব্বে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণী এবং পশ্চিমে আরব সমুদ্র। দাক্ষিণাত্যে যে কয়েকটি দেশীয় রাজ্য আছে, তন্মধ্যে হায়দরাবাদ ও মহীশূরের নিম্নেই ত্রিবাঙ্কুরের স্থান। আয়তনে মহীশূর ইহার চারিগুণ, ও হায়দরাবাদ দ্বাদশগুণ বড়।

সাউথ ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কল্যাণে ত্রিবাঙ্কুর আর পূর্ব্বের ন্যায় দুর্গম নহে। আজকাল মান্দ্রাজ হইতে ২৬ ঘণ্টায় ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবন্দ্রমে পৌছিতে পারা যায়। রেল পথে উভয় স্থানের ব্যবধান ৪৯১ মাইল।

রাত্রি ৮টায় মান্দ্রাজের এগমোর ষ্টেশনে "বোটমেল"



অনন্তশয়নম



ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা



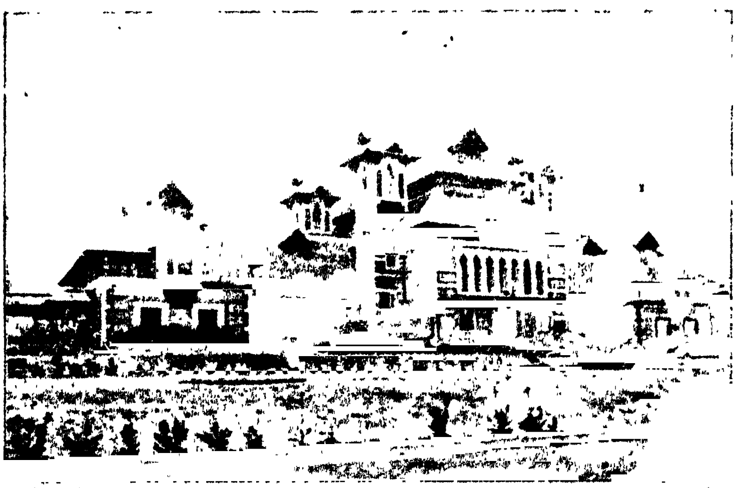




ত্রিবাঙ্কুরের আলওয়াই নদীতে শিবরাত্রির উৎসব



পদ্মনাভস্বামী মন্দির, ত্রিবন্দম







মাদুরার নিকটে তিরুপ্পারানকুণ্ডম—তেপ্পাকুলম মন্দির ও পাহাড়

ট্রেণের একটি কক্ষে উঠিয়া পড়িলাম। এই ট্রেণখানি এগ্‌মোর ষ্টেশন হইতে ছাড়িয়া, রামেশ্বর দ্বীপের শেষ সীমা ধনুষ্কোটি পর্য্যন্ত যায়। সেখান হইতে সিংহল-যাত্রীদিগকে ষ্টীমারে পক-প্রণালী পার হইতে হয়। সিংহলের ডাক এই ট্রেণে ষ্টীমার পর্য্যন্ত যায় বলিয়া, ইহার নাম "বোটমেল।" এই লাইনের গাড়ীগুলি আকারে ছোট (Metre gauge); কিন্তু যাত্রীর ভীড় খুব বেশী। এই জন্য পূর্ব্বে গোঁগাড় করিয়া না রাখিলে, স্থান পাওয়া কঠিন।

ঘটনাক্রমে এদিন আমার কক্ষের দ্বিতীয় "বাথ"টি শূন্য ছিল। আমি দ্বার বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে শয্যাগ্রহণ করিলাম। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম ভোর হইয়াছে, এবং ট্রেণ তাঞ্জোর ষ্টেশনে উপস্থিত। এখানে 'রিফ্রেশমেণ্টরুম' আছে; প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ অনেকেই শয্যা-ত্যাগ না করিয়াই চা পান সম্পন্ন করিলেন। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে, তাঞ্জোরের বিখ্যাত বৃহদীশ্বরের বৃহৎ মন্দির নয়নগোচর হইল।

ইহার পর, বেলা ৮টায় ট্রেণ একেবারে ত্রিচিনপল্লী আসিয়া থামিল। সাহেব যাত্রিগণ এখানে চা-পানের দ্বিতীয় অধ্যায় সাঙ্গ করিলেন। ত্রিচিনপল্লী কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। নদীর অপর পারে, দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বপ্রধান বিষ্ণুমন্দির—'শ্রীরঙ্গম্'। ত্রিচীনপল্লীর প্রসিদ্ধ "শৈলমন্দির" দূর হইতে দেখা গেল। এই মন্দির একটি উচ্চ পাহাড়ের উপরিভাগে নির্ম্মিত। পাহাড়টি রাজপথের পার্শ্ব হইতে ২৭৩ ফিট উর্দ্ধে উঠিয়াছে। শৈলশিখরে মন্দিরের দৃশ্য অতি সুন্দর। বিলাতের "ওয়েষ্টমিনষ্টার য়্যাবি" গির্জ্জায়, এই পাহাড়ের প্রতিকৃতি মেজর লরেন্সের স্মৃতি ফলকে অঙ্কিত আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ত্রিচিনপল্লীতে ইংরাজ ও ফরাসী জাতির যে সংঘর্ষ হয়, তাহাতে লরেন্স ইংরাজের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন।

১২।৷ টায় ট্রেণ মাদুরা জংসনে পৌছিল। মাদুরা দাক্ষিণাত্যের অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ নগরী। প্রাচীন পাণ্ড্যবংশের রাজধানী বহুকাল এখানেই ছিল। মীনাক্ষী দেবীর মন্দির এখনও মাদুরার অতীত গৌরবের সাক্ষী রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ট্রেণ সহরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই, দূর হইতে মীনাক্ষী-মন্দিরের "গোপুরম্"—অর্থাৎ তোরণের উচ্চ চূড়াসমূহ যাত্রিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ষ্টেশনে আমার দুইজন বাঙ্গালী বন্ধু আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইহাদের একজন 'সার্ভিসের ফেরে' ত্রিচিনপল্লী-প্রবাসী। সুদূর বিদেশে ইহাদের আন্তরিক স্নেহ ও যত্ন আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। বন্ধুদ্বয় ষ্টেশনেই আমার মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি এই জংশনে 'বোটমেল' হইতে নামিয়া টুটিকরিণ-গামী গাড়ীতে উঠিলাম। ধনুষ্কোটি পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে, সিংহলযাত্রীদিগকে টুটিকরিণ হইতে জাহাজে কলম্বো যাইতে হইত। এই জন্য, বোট-মেল তখন মান্দ্রাজ হইতে মাদুরা হইয়া টুটিকরিণ পর্য্যন্ত আসিত। এখন টুটিকরিণের পূর্ব্ব-গৌরব নাই; টুটিকরিণে যাইতে হইলে মাদুরায় ট্রেণ পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

মাদুরার ৫ মাইল দক্ষিণে, একটি পাহাড়ের পাদমূলে, 'তিরুপ্পারণকুণ্ড্রম' নামক ষ্টেশনে ট্রেণ থামিল। নামটি বড় হইলেও, ষ্টেশনটি খুব ছোট। এইখানে 'শুভ্রমণ্যম্, অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের একটি সুন্দর মন্দির আছে। মান্দ্রাজ অঞ্চলে কার্ত্তিকেয়ের 'শুভ্রমণ্যম' নাম অত্যন্ত প্রচলিত। শুভ্র মণির ন্যায় কান্তি বলিয়াই তাঁহার এরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। ষ্টেশনে বহু যাত্রী-সমাগম দেখিলাম। অধিকাংশ অবশ্যই স্ত্রীলোক। সকল স্ত্রীলোকেরই, দ্রাবিড়ী প্রথানুযায়ী, পরিধেয় বসন রঙিন এবং মস্তক অনাবৃত। শুনিলাম, প্রতি মাসেই কৃত্তিকা নক্ষত্রে বহু নরনারী পূজা দিবার জন্য এই মন্দিরে আসিয়া থাকে।

অপরাহ্ণ ৪৷৷টায় মানিয়াচী জংসনে পুনরায় গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইল। এখান হইতে একটি ব্রাঞ্চ লাইন ত্রিবন্দ্রম পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই ষ্টেশনটির চারিধারেই মাঠ। এখান হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত রেলপথের দুই পার্শ্বের ভূমি শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ। এই জমিতে কার্পাস জন্মিয়া থাকে (Black Cotton Soil)। রাত্রি ৮টায়, তাম্রপর্ণী-তীরবর্ত্তী তিনেভেলী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তিনেভেলী অতি প্রাচীন জনপদ। পূর্ব্বকালে তিনেভেলী হইয়া স্থলপথে কন্যাকুমারী ও ত্রিবন্দ্রমে যাইতে হইত। এখনও মান্দ্রাজ হইতে কন্যা-কুমারী যাইতে হইলে, তিনেভেলির পথে যাওয়াই সুবিধা। এখান হইতে নাগের কইল পর্য্যন্ত (৪২ মাইল) মোটর গাড়ীতে যাওয়া যায়। নাগের কইল হইতে কন্যাকুমারী (১০ মাইল) গো-যানে যাইতে হয়। তিনেভেলি নগরে

খৃষ্টান মিশনারীদের একাধিক বিদ্যালয় ভিন্ন একটি "হিন্দুকলেজ" আছে। অল্প দিন যাবৎ একজন বাঙ্গালী ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। মাদুরার দক্ষিণে—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের বাহিরে—সম্ভবতঃ ইনিই একমাত্র বাঙ্গালী আসিয়া পড়িয়াছেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে, ট্রেণ সেনকটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে প্রবেশ করিল। এখান হইতে প্রায় ৬০ মাইল রেললাইন পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। দুইধারে বিশাল অরণ্য। স্থানে স্থানে রেলপথের জন্য পর্ব্বত কাটিয়া সুড়ঙ্গ (Tunnel) প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয়! কিন্তু নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে পার্ব্বত্য পথের শোভা দর্শন করিবার সুবিধা হইল না।

রাত্রিশেষে, ট্রেন কুইলন ষ্টেশনে পৌছিল। এখান হইতে ত্রিবন্দ্রম স্থলপথে ৪২ মাইল। ২ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ত্রিবাঙ্কুর শাখা রেলওয়ের ইহাই শেষ ষ্টেশন ছিল। এখান হইতে স্থলপথে অথবা জলপথে ত্রিবন্দ্রম যাইতে হইত। কুইলন হইতে ত্রিবন্দ্রমে রেলওয়ে লাইন, দুইটি সমুদ্র সংযুক্ত হ্রদ (Lagoon) পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রভাতের আলোকে, রেল লাইনের উভয় পার্শ্বে নদী গিরি প্রান্তর ও নারিকেল-তরু-বেষ্টিত পল্লীর শোভা মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিলাম। লর্ড কার্জ্জন ত্রিবাঙ্কুরে আসিয়া কবিত্বময়ী ভাষায় ইহার যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে, এতদিনে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন :—

"এই দেশের উপরে প্রকৃতি-সুন্দরী তাঁহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্-রাশি ঢালিয়া দিয়াছেন। এদেশে দিবাকর প্রতিদিন কিরণ দানে কুণ্ঠিত হন না; পর্জ্জন্যদেব যথাকালে বারিবর্ষণ করেন। অনাবৃষ্টি এখানে অপরিজ্ঞাত। চতুর্দ্দিক চিরবসন্ত-শোভায় উদ্ভাসিত। যে স্থানে ভূমি কৃষি-উপযোগী, সেখানে মনুষ্যের বসতি ঘন-সন্নিবিষ্ট; আবার যেখানে অরণ্য, হ্রদ অথবা সমুদ্রবারিপূর্ণ জলাভূমি (Back Water) বিরাজিত, সে স্থানের দৃশ্যও পরীরাজ্যের ন্যায়—অতুলনীয়।"

কুইলনের ১৮ মাইল দক্ষিণে, ত্রিবন্দ্রমের পথে বারকলা নামক একটি ষ্টেশন আছে। বারকলা অথবা 'জনার্দ্দনম্' পশ্চিম-সমুদ্র-তীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ তীর্থ। প্রতি বৎসর বহুদূর হইতে যাত্রীর দল এখানকার জনার্দ্দন মন্দির দর্শন করিতে আসিয়া থাকে।

বেলা ৮টায় ত্রিবন্দ্রম্ ষ্টেশনে পৌছিলাম। ষ্টেশনটি ছোট, সহরের বাহিরে মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে অল্পদিন যাবৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। ষ্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে ৩ মাইল উঁচু নীচু পথ অতিক্রম করিয়া, রাজ সরকারের পান্থ-নিবাসে (Traveller's bunglow) উপনীত হইলাম। বাংলাটি রেসিডেন্সী-ভবনের খুব নিকটে। সম্মুখে ক্ষুদ্র বাগান। আহার ও বিশ্রামের পর, অপরাহ্নে নগর-ভ্রমণে বাহির হইলাম।

(২)

'ত্রিবন্দ্রম' নামটি 'তিরু-অনন্তপুরম্'এর অপভ্রংশ। ত্রিবাঙ্কুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ 'পদ্মনাভ স্বামী'—অনন্ত-শয্যাশায়ী নারায়ণ। এই 'অনন্ত' হইতে নগরের নাম 'তিরু-অনন্তপুরম্' অর্থাৎ ৺অনন্তপুর রাখা হইয়াছিল।

ত্রিবন্দ্রমের প্রধান দর্শনীয় স্থান পদ্মনাভ স্বামীর মন্দির। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা সমগ্র ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্য ৺পদ্মনাভ স্বামীকে উৎসর্গ করিয়া দেন। তদবধি, ত্রিবাঙ্কুর-রাজগণের বংশগত উপাধি 'পদ্মনাভদাস'। রাজবৃত্তি ব্যতীত, ভূ-সম্পত্তি হইতে ৺পদ্মনাভ-স্বামীর বার্ষিক আয় ৭৫ হাজার টাকা। মন্দির-সংলগ্ন 'অগ্রশালা'য়, সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা আছে। মন্দির ও তৎ সংলগ্ন রাজপ্রাসাদ, উচ্চ প্রাকার-বেষ্টিত। প্রাচীরের অভ্যন্তরে দুইটি সরোবর—একটি ব্রাহ্মণ, ও অপরটি অন্যান্য জাতির ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট। মন্দিরের প্রবেশদ্বার পূর্ব্বদিকে—উহার 'গোপুরম্' ১০০ ফিট উচ্চ। 'গোপুরমের' শীর্ষদেশে সাতটি স্বর্ণস্তূপি, অর্থাৎ স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া। প্রবেশ দ্বার ও ঠাকুর-ঘরের মধ্যে ৪৫০ ফিট দীর্ঘ ও ২৫ ফিট প্রশস্ত একটি 'মণ্ডপম্' (নাট-মন্দির)। ইহাই ব্রাহ্মণগণের আহারের স্থান। এই মণ্ডপের ৩২৪টি প্রস্তর-স্তম্ভ;—প্রতি স্তম্ভে এক-একটি দীপধারিণী নায়ার-নারীর মূর্ত্তি খোদিত। প্রতি দুইটি স্তম্ভের মাঝখানে লৌহ-প্রদীপের শ্রেণী। এই মণ্ডপের নাম 'শিবালী-মণ্ডপম্'। এই মণ্ডপের সম্মুখে ধ্বজস্তম্ভ; তাহার পরে গরুড়-মূর্ত্তি; এবং তাহার সম্মুখভাগে স্বয়ং পদ্মনাভ স্বামীর গৃহ—"বিমানম্।" মন্দিরের অঙ্গনে "কুলশেখরমণ্ডপম্" ও "জপ-মণ্ডপম্" নামক আরও

দুইটি 'মণ্ডপ' এবং অন্যান্য বহু দেবতার বিগ্রহ বিদ্যমান।

আমি যখন ত্রিবন্দ্রমে গিয়াছিলাম, তখন ত্রিবাঙ্কুর-রাজ সপরিবারে কন্যাকুমারী তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে, পদ্মনাভ স্বামীর ঘর প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় অতি অল্প সময়ের জন্য খোলা হইত। এইজন্য আমার অদৃষ্টে দেবতাদর্শন ঘটে নাই।

ত্রিবন্দ্রমের আফিস-আদালত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের বাটী একটি-একটি উচ্চ টিলার উপরে নির্ম্মিত হইয়াছে। সমস্ত সহরটিকে কতিপয় অনুচ্চ পাহাড়ের সমষ্টি বলিলেও চলে। একটি প্রশস্ত টিলার উপরে 'নেপিয়ার পার্ক' নামক উদ্যান; উহার মধ্যস্থলে যাদুঘর—'নেপিয়ার মিউজিয়াম'। মিউজিয়াম গৃহটি যেরূপ সুদৃশ্য, উহাতে সংরক্ষিত দ্রব্য-সম্ভারও সেইরূপ বিচিত্র। পুরাকালের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে একটি লৌহযন্ত্র দেখিলাম - উহার ইতিহাস ভয়াবহ,—সেকালে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ইহাতে আবদ্ধ করিয়া প্রকাশ্য স্থলে ঝুলাইয়া রাখা হইত। কাচের আধারে রক্ষিত একটি জিনিসের নামের সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের নাম সংযুক্ত দেখিলাম—সে এক জাতীয় কুমীর।

উদ্যানের এক দিক ক্রমশঃ ঢালু হইয়া অনেকটা নামিয়া গিয়াছে—সেইদিকে চিড়িয়াখানা। মান্দ্রাজের চিড়িয়াখানা অপেক্ষা ইহা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এখানে নানা জাতীয় পশু-পক্ষী সংগৃহীত হইয়াছে। সিংহের কক্ষে, মাতৃস্তন্যপানরত দুইটি নবপ্রসূত সিংহ-শাবক দেখা গেল।

ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে নানাবিধ শিল্প ও কারুকার্য্যের উৎকর্ষ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। ত্রিবন্দ্রমে একটী 'আর্ট স্কুল' আছে—এখানে চিত্রশিল্প ভিন্ন, ভাস্কর (Ivory Carving) সূত্রধর এবং কুম্ভকারের বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিদ্যালয়ে ভারত-বিখ্যাত চিত্রকর ৺রবিবর্ম্মার স্বহস্তাঙ্কিত কয়েকখানি তৈল-চিত্র আছে। ঐ সকল চিত্রের প্রতিলিপি 'বঙ্গে যথা-তথা' দেখিতে পাওয়া যায়। এতদিনে মূল চিত্র দেখিতে পাইলাম। অনেকে হয় তো জানেন না যে, রবিবর্ম্মার জন্মভূমি ত্রিবাঙ্কুর এবং ত্রিবাঙ্কুর-রাজের আনুকূল্যেই তিনি চিত্র-বিদ্যায় প্রতিষ্ঠালাভ করেন। মৃৎ-শিল্প-বিভাগে একজন কুম্ভকার অবলীলাক্রমে মাটীর নানারূপ জিনিষ প্রস্তুত করিতেছিল,—বহুক্ষণ ধরিয়া আমরা তাহার নৈপুণ্য দেখিলাম। এদেশে কুম্ভকার জাতি উপবীত ধারণ করেন।

ত্রিবন্দ্রমের বিচারালয়সমূহের নিকটবর্ত্তী প্রকাশ্য স্থানে একটি প্রস্তরমূর্ত্তি ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্যার টি, মাধব রাওয়ের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যের বর্ত্তমান উন্নতির ইনিই মূল। শিক্ষা বিষয়ে ত্রিবাঙ্কুর খুব উন্নতিশীল; বিশেষতঃ, স্ত্রী-শিক্ষায় ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশই ইহার পশ্চাদ্বর্ত্তী। রাজপথে বালকদের ন্যায় দলে-দলে বালিকাদিগকেও বিদ্যালয়ে যাইতে দেখিলাম। অবরোধ-প্রথা এদেশে প্রবেশলাভ করে নাই। ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যের নিজস্ব ডাক বিভাগ আছে - উহা এদেশে "অঞ্চল" নামে অভিহিত। ত্রিবন্দ্রমে দুইজন বাঙ্গালী আছেন; একজন রাজ সরকারে ইঞ্জিনিয়ার; অন্যজন কাগজ ব্যবসায়ী ডিকিন্‌সন্ কোম্পানির কর্ম্মচারী।

ত্রিবাঙ্কুর প্রাচীন পরশুরামক্ষেত্র অথবা কেরল দেশের দক্ষিণাংশ। ত্রিবাঙ্কুর রাজবংশ দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'চের' বংশ সম্ভূত। এই রাজ্য কখনও মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় নাই; সুতরাং অনেক প্রাচীন রীতি-নীতির অবিকৃত নিদর্শন এখনও ত্রিবাঙ্কুরে দেখিতে পাওয়া যায়। মালাবারের ন্যায় ত্রিবাঙ্কুরেও 'নাম্বুদি' ব্রাহ্মণ এবং নায়ারজাতির মধ্যে বিবাহাদি বিষয়ে কতকগুলি অদ্ভুত প্রথা বর্ত্তমান। এখানকার রাজবংশে নায়ারজাতির 'মারুমাক-তায়ম' অর্থাৎ ভাগিনেয় উত্তরাধিকার-বিধি প্রচলিত। রাজ-পুত্রের পরিবর্ত্তে রাজ-ভাগিনেয় সিংহাসনের অধিকারী; তদনুসারে রাজ-ভগিনী এ রাজ্যের রাণী। রাজার ভগিনী না থাকিলে, অথবা ভগিনী পুত্রহীনা হইলে, পোষ্যপুত্রের ন্যায় 'পোষ্য'-ভগিনী গ্রহণ করিতে হয়। বর্ত্তমান মহারাজা স্যার রামবর্ম্মা ভূতপূর্ব্ব মহারাজার একমাত্র ভগিনী রাণী লক্ষ্মী বাঈয়ের পুত্র। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দক্ষিণ সীমায় কুমারিকা অন্তরীপ। এখানে ভারত-মহাসাগরের বেলাভূমিতে কন্যাকুমারীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। তিনেভেলীর পথ ভিন্ন, ত্রিবন্দ্রম হইতেও কন্যাকুমারী যাতায়াতের সুবিধা আছে। ত্রিবন্দ্রম হইতে নাগের কইল (৪৫ মাইল)—প্রত্যহ যাত্রী লইয়া মোটর গাড়ী যাতায়াত করে। যাঁহারা কন্যাকুমারী গিয়াছেন,

তাঁহারা সকলেই প্রকৃতির মহান্ দৃশ্য ও কুমারী-প্রতিমার অপার্থিব রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছেন। যাত্রীদিগের বাসের জন্য মন্দিরের নিকটেই একটা সুন্দর পান্থ-নিবাস আছে। কিন্তু সময়াভাবে, এত নিকটে আসিয়াও, বহুদিন-পোষিত কন্যাকুমারী-দর্শন-সাধ পূর্ণ করিতে পারিলাম না। অগত্যা, অধিকতর ভাগ্যবান্ যাত্রিগণের জন্য কন্যাকুমারী-তীর্থের পথ-নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াই আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

বর্ষ-প্রণতি

[শ্রীহেমনলিনী দেবী]

নবীন বরষ এস—ধন্য!
জাগ্রত ভারত তব সম্মুখাগত
নহে ভীত নহে অবসন্ন।
উদয়-অচল-তলে দীপ্ত তপন জ্বলে
নব জ্যোতিঃ ঠিকরে ললাটে;
বিশ্ব ভবন মাঝে উন্নত শিরে সাজে
দাঁড়ায়েছে আপন পাটে।
পরিহরি শঙ্ক বাজায়ে শঙ্খ
বরিয়া লয়েছে দুখ-দৈন্য,—
আজি হের গণ্য ভুবন-বরেণ্য
ভারত আজি পুন ধন্য!

* * *

সামগীতি-বন্দিত তব চিত নন্দিত
মহা পূরা মহিম ছন্দে,
কুরু রণ-ক্ষান্তি শ্রান্ত সে শান্তি
তোমারি চরণ আসি বন্দে।
তপোবনে তুষ্টি, নরদেহে পুষ্টি,
সৃষ্টি সারভূত প্রাণ;
ভারত কল্যাণ সাধনে সাবধান
আবির্ভূত ভগবান!
পুন বহে বন্যা, ধরণী ধন্যা,
মরণ বিজয়ী মহাহর্ষ।
সে পূত দিবসে না জানি কি বেশে
প্রবেশিলে দেশে তুমি বর্ষ!
দেখিলে, সঙ্ঘে হিমাচল লঙ্ঘে
তিব্বত চীনে আনে জয়,—
জয় জয় ভারত! আগত তথাগত!
দুরিত দুখ শোক ভয়!

নারায়ণ রূপ একছত্রী ভূপ
বিশ্ব-পালক-মহা-গর্ব্ব,
বন্দিত জাতি কম্পিত অরাতি,
গৃহে গৃহে নিতি নব পর্ব্ব।
সাগর-তট ভরি সাজিল শত তরি
পূরিত ধন জন-পণ্য,
হেরিলে সে গরিমা ভুবনেশ্বরী মা!
দেশে দেশে বিতরিলা অন্ন!

* * *

না জানি কি পাপে কোন অভিশাপে
নাশিল ভারত পুণ্য?
দেশ ধূলি লুণ্ঠিত, বায়ু বহে কুণ্ঠিত,
মন্দির হল দেব-শূন্য!!
হে কাল পন্থী, সে সাগর মন্থি
উঠিল যে ঘন কালকূট,
পিইল তা জনে-জনে, আগমন লগনে
ভরিল তোমারো করপুট!

* * *

সে কাল কুহেলিকা আবৃত জ্যোতিলিখা
ফুটে বুঝি—উঠে ঐ সূর্য্য!
অন্তরে জাগে প্রাণ, জাগ্রত ভগবান!
বাজে তাঁর আহ্বান তূর্য্য।
আজি পুন ধরণী দিয়াছে সরণি
অরণি ঝলসে জ্যোতি ভায়;
হে বরষ, মঙ্গল! নবীন যাত্রীদল,
নতি রাখে, আশীষ চায়!

কাহিনী

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি এল্]

সমুদ্রের নীল জলকে তরল, গলিত সোণার রং এ রঞ্জিত করিয়া, ধীরে-ধীরে সূর্য্যাস্ত হইতেছিল। সকালে ও সন্ধ্যায় প্রত্যহ যেমন ভীড় হয়, পুরীর সমুদ্র-সৈকতে সেদিনও সেইরূপ হইয়াছিল।

শোকার্ত্ত এই মহা উদারতার মাঝখানে শোক ভুলিবার জন্য আসে,—বিরহীর এখানে বেদনার উপশম হয়,—প্রেমার্থীরা এই রমণীয়তার মধ্যে প্রেমের উপাদান পায়,—এবং স্বাস্থ্যহীনেরা স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে। কিন্তু পুলিশের দারোগার এখানে আসিবার কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে, তাহা না বুঝিয়াও, আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনেরই মত, সেদিনও সেখানে আসিয়াছিলাম।

সি-আই-ডিতে কাজ করিয়া কষ্টে সংসার প্রতিপালন করি, এবং প্রভুর, দশের এবং ঘরের চোখ-রাঙানি খাই। বোধ হয় এই সব-কটাতে মিলিয়াই আমাকে রোজ সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে আনিত।

নর-নারীর কোলাহল হইতে একটু দূরে বেড়ানই পছন্দ করিতাম। সেদিও তাহাই করিতেছিলাম।

হঠাৎ অতি দূরে একটা জাহাজের মত বোধ হইল। "জাহাজ—জাহাজ" করিয়া একটা কোলাহল হইতেই, চক্ষু সেই দিকে ফিরিল।

যাহা দেখিলাম তাহা এত অস্পষ্ট যে, তাহাকে জাহাজ বলিলেও চলে, পাখী বলিলেও চলে। সুতরাং কষ্ট করিয়া তাহা দেখিবার বিড়ম্বনার প্রয়োজন নাই ভাবিয়া চোখ ফিরাইলাম।

চোখ-ফিরাইতেই যাহা দেখিলাম, তাহা সেই কষ্টদৃশ্য জাহাজ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। দেখিলাম, একটি সুন্দরী যুবতী স্থির দৃষ্টিতে আমারই পানে চাহিয়া রহিয়াছে। চারি চক্ষু এক হওয়াতে, সে যেন কতকটা লজ্জিত হইয়া কহিল, "একটু দয়া করবেন কি"? আমি বিস্ময়ে কহিলাম "কি?"

সে কহিল, "আমার হাত থেকে আংটিটা খুলে এই বালিতে পড়েছে,—আমি খুঁজে পাচ্ছি না যদি"—

আমি কহিলাম,—"নিশ্চয়ই,—আমি খুঁজে দিচ্ছি।" বলিয়া খুঁজিতে লাগিলাম—সেও খুঁজিতে লাগিল। মাঝে-মাঝে এত নিকটে আসিয়া পড়িতেছিলাম যে, তাহার নিশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছিল!

অবশেষে পাওয়া গেল—আমিই পাইলাম। আংটিটা যখন তাহাকে দিলাম, তখন তাহার সমস্ত অন্তরের কৃতজ্ঞতা যেন দুই চোখে ফুটিয়া উঠিল; আমার দিকে কোমল দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "ধন্যবাদ!"

আমি প্রত্যভিবাদন করিয়া যখন ফিরিব, তখন সে করুণ কণ্ঠে কহিল, "আপনার কি ভারি জরুরি কাজ? একটু বসতে পারবেন না?"

আমি কহিলাম, "না—তা, এমন বিশেষ কিছু—"

সে কহিল "তবে চলুন,—ওই সমুদ্রের ধারটায় একটু বসি।"

দারোগার অন্ধকার কুঠরি হইতে একেবারে আরব্যোপন্যাসের স্বপ্নলীলা! সমুদ্র যে এত সুন্দর এবং নারী-চক্ষু যে এত কোমল, ইহা এমন করিয়া পূর্ব্বে কখনও অনুভব করি নাই।

রমণী কহিল, "আপনি বোধ হয় খুব আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন—হবার কথাও বটে! কিন্তু, আমি দু'চার দিনের জন্যে এখানে এসেছি,—এক-আধ জন বন্ধু পেতে চাই। গোড়াতেই আপনি আমার যা উপকার ক'রেছেন, তাতে নিশ্চয়ই আপনাকে এই বিদেশে আমি একজন বন্ধু বলে মনে কর'তে পারি।"

আমি কহিলাম, "আমি আপনার যে সামান্য—" রমণী বাধা দিয়া কহিল, "আমাকে আপনি বলবেন না। বয়সে আমি আপনার চেয়ে ছোটই হব বোধ হয়—", হাসিয়া

একটু বসিয়া কহিল, "আমাকে মায়া বলবেন - মায়া-লক্ষ্মী আমার নাম।"

এমন অসঙ্কোচ ভাব আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই; সুতরাং ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম।

মায়ালক্ষ্মী হাসিয়া কহিল "আপনি বুঝি পুলিশের লোক?"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম "কেমন ক'রে জানলে?"

সে আরও হাসিয়া কহিল, "আপনার ঐ জুতো যোড়ায়। ছিঃ, এমন জায়গায় কি ওই টাটু-ঘোড়ার মত জুতো নিয়ে আসতে হয়!"

আমাকে অবাক্ করিয়া দিয়াছে। একটু নড়িয়া চড়িয়া, উঠিবার চেষ্টা করিলাম।

তাহা দেখিয়া সে কহিল, "তাই ভাল, চলুন ওঠাই যাক্।" বলিয়া উঠিয়া পড়িল। সমুদ্রের উপকূল হইতে রাস্তায় উঠিয়া দেখিলাম, একখানি গাড়ি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মায়ালক্ষ্মীর অনুরোধে অগত্যা আমাকেও তাহাতে উঠিতে হইল।

৩

সহর হইতে কতকটা দূরে তাহার বাড়ী। সেইখানে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল।

বাড়ীটী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আসবাব পত্র সামান্য; কিন্তু মূল্যবান এবং পরিষ্কার। ভাবিয়াছিলাম, আত্মীয় স্বজন হয় ত কেহ আছে; কিন্তু অপর কাহাকেও দেখিলাম না। এক দাসী, আর এক চাকর।

খানিকটা অপেক্ষা করিয়া "আমি কহিলাম, "উঠি তা হ'লে।"

মায়া কহিল, "নেহাৎ যদি উঠবেন, ত' আর কি বলব। তবে অনুরোধ, মাঝে মাঝে আসবেন। আমি অল্প দিনই থাকব। একবার জগবন্ধু দর্শন করতে এসেছি,—দর্শন হ'লেই ফিরে যাব। হাঁ, গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে—আপনাকে পৌছে দেবে।"

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কে এ নারী? সত্যই আমাকে একেবারে অবাক্ করিয়া দিয়াছে! জানা নাই, শুনা নাই, অথচ একেবারে চির-পরিচিতের মত ভাব! কোন সঙ্কোচ, কোন দ্বিধা নাই! বরং সঙ্কোচ যদি কাহারও হইয়া থাকে, ত সে আমারি! বয়স ২৪।২৫এর উদ্ধ নহে,—রূপ অসাধারণ; অর্থেরও অভাব আছে বলিয়া বোধ হয় না। আশ্চর্য্য!

* * * *

পরদিন সকালে উঠিয়া কাগজ-পত্র লইয়া বসিয়াছি—মায়ালক্ষ্মীর মায়া কাটাইতেই হইবে। অঙ্ক এবং রিপোর্টে সবেমাত্র মনোনিবেশ করিয়াছি, এমন সময়ে একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল। মায়ালক্ষ্মী!

মায়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "আশ্চর্য্য হচ্ছেন নিশ্চয়ই! কিন্তু এই গাড়োয়ান আপনার বাড়ী চিনেছে, তা' ভুলে গেছেন বোধ হয়। ওঃ, কাজ করছেন!"

আমি কহিলাম, "না, এমন বিশেষ কিছুই নয়।"

মায়া একজোড়া বহুমূল্য বিলাতী জুতা বাহির করিয়া কহিল, "তা করুন, আমি বিরক্ত করবো না। কিন্তু দোহাই আপনার, ওই থ্যাবড়া জুতো পরে আর সমুদ্র-তীরে যাবেন না। আমার এই জুতো-যোড়া পরবেন,—এই জুতোর দোহাই দিয়ে কিছুদিন আমাকে মনেও রাখবেন; আর আমাদের দাম ত' ওর চেয়ে বেশী নয়!" বলিয়া সে এমন হাসি হাসিল, যাহা ঠিক হাসির মত শোনাইল না।

আমি জবাব দিবার পূর্ব্বেই সে কহিল, "কাজ করুন আপনি,—আমি একবার আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে আসি!"

জুতার সম্বন্ধে ধন্যবাদ বা প্রত্যাখ্যানের অবসর-মাত্র না দিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল! একদিনের মাত্র আলাপে এইরূপ জুতা-দান হয় তো ঠিক শোভনীয় নয়; কিন্তু সে এটা এমনি ভাবেই করিল যে, ইহাকে অশোভন মনে করাও কঠিন। মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই ভিতরে উচ্চ কলহাস্যের শব্দে বুঝিলাম, সেখানেও ইহারই মধ্যে আসর জমিয়াছে!

ছিন্ন-সূত্র গুটাইয়া আবার রিপোর্টে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু এই দুর্ব্বোধ্য রমণীর ব্যবহার প্রহেলিকার মত বারংবার বাধা দিতে লাগিল।

খানিক পরে মায়া ফিরিল। সঙ্গে আমার স্ত্রী। স্ত্রী অনুযোগ করিয়া কহিল, "দেখ দিকিনি, ইনি এমন একটা দামী নেক্‌লেস্ দিয়ে যাচ্ছেন কমুকে,—কেন?"

কমলা আমার কন্যা। নেক্‌লেসের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—বাস্তবিকই মহামূল্য।

আমি রিপোর্টখানা উল্টাইতে-উল্টাইতে কহিলাম "বাস্তবিক, এ-সব আপনার ভারি অন্যায়! এর মানে কি?"

মায়া হাসিয়া কহিল "পৃথিবীতে কি সব জিনিসেরই মানে থাকে? তা-ছাড়া, অন্যায় যদি হয়ে থাকে ত' আমি এইটুকু বল্‌তে পারি যে, জীবনে এর চেয়ে ঢের বেশী অন্যায় কাজ আমি করেছি।"

আমি কহিলাম, "এ-সব আমি নোবো না।" মায়া কহিল, "না নেন, ফিরিয়ে নেবো। স্নেহ করেই দিয়েছিলাম, না নিলে বুঝবো যে, আমার কপালের মতই হ'য়েছে। ও জিনিস আমি একদিনও ব্যবহার করিনি; সেইজন্যেই -" কণ্ঠস্বর করুণ, কম্পিত।

নারী হৃদয়েই প্রথম বাজিল! স্ত্রী কহিলেন, "তবে থাক্‌, এতই যদি দুঃখ পান!"

মায়া আমার দিকে চাহিয়া কহিল,--"আর একটা প্রার্থনা পূর্ণ করতে হবে। একবার জগন্নাথদেবকে দেখব-- আপনারা পুলিশের লোক,--আপনাদের সাহায্যেই দেখার সুবিধে হবে। আজ সন্ধ্যের পর যদি দয়া করে দেখান। আমি উপোস করে থাক্‌ব।"

আমি কহিলাম, "বেশ।"

আমার স্ত্রীর সহিত একবার দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া মায়া চলিয়া গেল।

৪

সে-দিন সন্ধ্যার পর দেখিলাম, এ এক অন্য মূর্ত্তি। উপবাস-ক্লিন্ন, পবিত্র-শ্রী মায়ালক্ষ্মীর মুখে যেন দেব-ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। তৃষিত যেমন আগ্রহে জল পান করে, তেমনি সে ব্যাকুল ভাবে দেবতার পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ যে চাহিয়া রহিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। মনে-মনে সে কি প্রার্থনা করিতেছিল, সে-ই জানে; তাহার পর যখন চক্ষু ফিরাইল, তখন দুই গণ্ড সিক্ত করিয়া জলধারা বহিতেছে। আজ তাহাকে এই নূতন প্রেম-মূর্ত্তিতে দেখিয়া আমার মাথা নত হইয়া আসিতে লাগিল।

পূজা সমাপনান্তে সে কহিল, "এবার চলুন।"

আমি কহিলাম, "চলো আমাদের ওখানে—সমস্ত দিন খাওনি, কিছু খাবে।"

সে হাত-জোড় করিয়া কহিল, "মাপ করবেন, আজকের রাত্রিটা আমায় একলা থাক্‌তে দিন। আজ আমার পক্ষে পরম দিন। কাল যাবো আপনাদের ওখানে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

সে আজ আর আমাকে তাহার গাড়ীতে যাইতে অনুরোধ করিল না—শুধু গাড়ীতে উঠিবার আগে, আমাকে প্রণাম করিয়া, সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"চল্লাম।"

গাড়ী চলিয়া গেল। মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই প্রহেলিকাময়ীর প্রহেলিকার কথা ভাবিতে লাগিলাম।

৫

সকালের ডাকে একখানা অনেক টাকার ইন্‌সিওড খাম, আর কয়েকখানা সরকারী চিঠি আসিয়াছিল। বিস্মিত হইয়া ইন্‌সিওর চিঠিখানা খুলিতেই, কয়েক সহস্র টাকার নোট ও একখানা চিঠি বাহির হইল। চিঠিটা এইরূপ:—

"পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,—

আমার নাম মায়া নহে, সুরমা। কলিকাতার বাবু-মহলে, সোণাগাছির সুরমাকে চেনে না, এমন লোক কম।

"এ ঘৃণিত জীবন আমার ছিল না,—আমি গৃহস্থের বধূ ছিলাম,—এবং সেই আমার যোগ্য স্থান ছিল। দরিদ্রের বধূ ছিলাম;—নবীন বয়সে বুঝি নাই যে, দরিদ্র-গৃহেও সোণা মাণিকের অভাব নাই,—যদি গ্রহণ করিবার শক্তি থাকে। জীবনের মধ্যে একটা ভুল করেছিলাম। কিন্তু এমনি নারী জাতির দুর্ভাগ্য যে, ভুল যদি কোন দিন হোল, তা তাকে ঘাড়ে ধ'রে সেই ভুলের কদর্য্য পথেই নামিয়ে দেওয়া হয়।

"যে লোকটি আমাকে সর্ব্বনাশের পথে পৌঁছে দিলে, সে সেইখান থেকেই ফিরল! আমি সোণাগাছিতে উঠলাম। সোণাগাছির হিসাবে আমার মন্দ কিছুই হয় নাই,—অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেছি,—অনেক বাহবা নিয়েছি।

"কিন্তু মন আমার সুরু থেকেই কাঁদতো আমার স্বামীর জন্যে! জীবনে এমন ভালবাসা কাউকে বাসিনি,—অথচ, অভাগিনী আমি,—হেলায় হারালাম। দুনিয়াতে কত ভুলের কত-রকম ক্ষমা আছে, কিন্তু আমাদের ভুলের বিধান একেবারে ফাঁসির চেয়ে কঠোর!

"গোড়া থেকেই আমার সমস্ত মন তিক্ত হয়ে উঠেছিল সেই লোকটার ওপর, যে নীড়বদ্ধ পাখীর মত আমাকে আমার স্বামীর বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছিল। সে ও বোধ হয় তা বুঝেছিল,—তাই আমার কাছে আর ঘেঁসত না। কিন্তু তাকে একবার পেতেই হবে। কতদিন জগবন্ধুকে বলেছি, হে দেবতা, তুমি যদি থাকো, ত' একবার তাকে এনে দাও!

"কয়েক বছর সে এলো না। তাকে আনাবার জন্যেই আমার এ কয়-বছরের ফাঁদ পাতা। তার পর একদিন আমার উর্ণে মাছির মত সে এসে পড়ল। বাস্! আমাদের প্রতিশোধ আমাদের ভালেরই মত অমোঘ, সাংঘাতিক;—আপনাদের মত ছলা-কলা বোঝে না।

"এখন আমি খুনী, ফেরারী! পৃথিবীর চক্ষে তাই হলেও, আমি জানি, আমি খুনী নই। খুনের মধ্যে পাপ থাক্‌লেই সে খুন,—নইলে নয়। বিচারক ফাঁসি দেয় বলে সে কি খুনী? আর ফেরারী? না, তাও নয়। আমি চর্ম্মচক্ষে একবার আমার জাগ্রত দেবতা জগবন্ধুকে দেখতে এসেছিলাম;—আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরই পায়ে আমার স্থান হবে।

"এখানে এসে দেখলাম, আপনার চোখ দুটী ঠিক আমার স্বামীর চোখের মত—তেমনি প্রশান্ত, তেমনি ধীর। সমুদ্র তীরে তাই দেখে আমার মধ্যে কত-দিনকার সেই প্রাণ-জুড়ানো হারানো কথা জেগেছিল! তাই আমি আপনাকে ছাড়তে চাইনি! আপনি কত-কিই না মনে করেছেন!

"অনেক-গুলো টাকা ছিল—সে-গুলো এই সঙ্গেই পাঠালাম;—যেমন ইচ্ছে, ব্যবহার করবেন।

এবার আমি চল্লাম। আর কেউ আমার নাগাল পাবে না। অনেক দূরে যাচ্ছি,—জগবন্ধুর শ্রীচরণে।"

ইতি—

সুরমা।

সরকারী চিঠি খুলিয়া দেখিলাম,—জরুরি হুকুম,—সুরমা নামক এক বারাঙ্গনা খুন করিয়া পুরী গিয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে। তাহার ফটোও পাঠাইয়াছিল।

মনের উপর দিয়া একটা ঝড় বহিয়া গেল। অদ্ভুত এ কাহিনী!

* * * *

একজন কনেষ্টবল আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল,—"হুজুর! সমুনদর মে এক লাশ মিলা!"

গিয়া দেখিলাম, সুরমার মৃতদেহ। সে বোধ হয়, তাহার জগবন্ধুর শ্রীচরণে পঁহুছিয়াছে।

সঙ্গীহারা

[শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল]

সঙ্গীহারা সারা নিশা করি' জাগরণ,
বিরহ-সঙ্গীতে ভরি' অরণ্য নিরালা
হে বিহঙ্গ! জুড়া'তে কি হৃদয়ের জ্বালা
অবিচ্ছেদে করিতেছ বিচ্ছেদ-ক্রন্দন!
তোমার ও মরমের করুণ স্পন্দন
পরায় বিরহী-কণ্ঠে কণ্টকের মালা,
সেই জানে তব গানে কি বেদনা ঢালা
প্রিয়া যার পলায়েছে ছিঁড়িয়া বন্ধন;
জাগিয়া জাগালে মোরে, রে অবোধ পাখি।
জ্বালা'লে বিরহী-প্রাণে নিবান অনল,
চলে' গেছে যে পাষাণী দিয়া তোরে ফাঁকি,
সে কিরে আসিবে ফিরে হেরে আঁখি-জল?
একাকী তবুও পাখী সারা রাতি ডাকে:—
"প্রিয়া কই, প্রিয়া কই, দেখা দে আমাকে।"

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"সে কি! বল কি! এত বড় একটা ছাউনী, বাদশাহী লস্কর, ঘোড়া, উট হাওয়া হইয়া উড়িয়া গেল! এ কি ভোজ-বাজী দাদাঠাকুর!"

"ভোজবাজী কি জুয়াচুরী, তাহা ত বুঝিলাম না দীননাথ! কিন্তু কয় বেটা ভোজপুরী সিপাহী এই কয় মাস ধরিয়া কতকগুলা টাকা খাইয়া গেল—তাহার আর কোন উপায় দেখিতেছি না।"

"বল কি দাদাঠাকুর! কয় বেটা রজপুত না রাজপুত আমার যে সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে,—আমার দোকানের দেড় হাজার টাকার উঠনা খাইয়া গিয়াছে। দাদাঠাকুর, আমি ধনে-প্রাণে মারা গেলাম।"

"আমিই বা কোন্ বাঁচিয়া আছি দীননাথ! গৃহিণীর হাতে যে কয়টা টাকা ছিল, যাহার ভরসায় বুড়া বয়সে কাশীবাস করিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা আর একটীও দেখিতে পাইব না।"

"ও দাদাঠাকুর, তোমার ঘরবাড়ী, জমাজমী আছে;—আমার যে দোকানখানিমাত্র সম্বল! অধিক লাভের আশায় দ্বিগুণ দর ধরিয়া কয় মাস ধরিয়া কেবল পাওনার সুদ কষিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, এই কয়টা টাকা আদায় করিতে পারিলে, নূতন সহরে গিয়া বড় করিয়া একখানি দোকান ফাঁদিব! হায়, হায়! দাদাঠাকুর, আমার সর্ব্বনাশ হইল!"

"সেটা উভয়তঃ দীননাথ! কিন্তু, এই আমবাগানে দাঁড়াইয়া চেঁচাইলে কি হইবে,—চল দেখি, কাজীবাড়ী যাই।"

"দাদাঠাকুর বুঝি এখনও সেই ভরসায় আছ! সে দফা রফা। বনোয়ারী সাহা আমাদের কথা না শুনিয়া অনেক টাকা কারবারে লাগাইয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল যে, কাজীর কাছে নালিশ করিলেই সুদসমেত সব টাকা আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু যখন সে কাজীর নিকট পৌঁছিল, তখন একেবারে হিম হইয়া গেল। লস্করের কাণ্ডকারখানা আলাহিদা,—ফরীয়াদ-মামলা সমস্তই বখ্শীর হাতে,—কাজীর কোন ক্ষমতাই নাই।"

"বল কি দীননাথ! তবে—তবে—সর্ব্বনাশ হউক, উচ্ছন্ন যাউক,—এতদূর অধর্ম্ম করিলে, তাহার অধঃপতন হইবেই হইবে।"

"অভিসম্পাতই কর, আর পৈতেই ছেঁড়,—টাকা ফিরিবে না দাদাঠাকুর! আমার সেজ ঠাকুরদাদা ঠেকিয়া শিখিয়া বলিতেন, ফৌজী কারবার অতি কঠিন ব্যাপার! আমার কর্ত্তাবাবা—"

"আরে, রাখ তোর কর্ত্তাবাবা,—আমার যে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল!" "তোমাদের জাতির ঐ ত দোষ দাদাঠাকুর! তুমি না হয় কুলীন ব্রাহ্মণ, আর আমি না হয় গন্ধবণিক্; উপস্থিত কিন্তু অবস্থাটা দু'জনেরই সমান। খাতক টাকা খাইয়া পলাইয়াছে,—সে খাতক এমন যে, কাজীর দুয়ারে ফরীয়াদ করিয়া কোন ফল নাই। টাকা আদায় করা তোমারও যেমন প্রয়োজন, আমারও তেমন প্রয়োজন। সুতরাং এক্ষেত্রে তোমার বামণামী ফলাইয়া বিশেষ উপকার নাই। আমার কর্ত্তাবাবা বলিতেন—"

"আবার কর্ত্তাবাবা!"

"দেখ ঠাকুর, আমার ইচ্ছা—আমি আমার কর্ত্তাবাবার নাম করিব,—তাহাতে তোমার কি। আমি কি তোমার জমীতে দাঁড়াইয়া আছি যে, তুমি আমাকে চোখ রাঙ্গাইতেছ! আমি দীননাথ সাহা, দশখানা গ্রামে আমার লগ্নি কারবার আছে,—সহরে আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে,—তুমি আমায় চোখ রাঙ্গাইবার কে! ব্রাহ্মণ হইয়া যখন বেণিয়ার ব্যবসায় ধরিয়াছ, তখন বেণিয়ার চাল ধরিতে হইবে। আমার কথা শুনিতে যদি বিরক্ত বোধ হয়,—সিধা রাস্তা পড়িয়া আছে,—যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও।"

মধ্যাহ্নে ভাগীরথীতীরে আম্রকাননে যে দুই ব্যক্তির মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অপর দিকে চলিয়া গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি

এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল এবং আপন মনে বিড়বিড় করিয়া বকিতে আরম্ভ করিল,—"কাজটা নেহাইৎ অন্যায় হইয়াছে। আমার কর্ত্তাবাবা নন্দদ্বীপচন্দ্র সাহা সুবা বাঙ্গালার মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন ;—তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়াই আমার এই দশা হইল। ফৌজী কারবার অতি বিষম ব্যাপার। আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি,—ইহা কি আমার পক্ষে সম্ভব! লোভ অতি পাপ। টাকায় একমণ গম কিনিয়া তিন টাকায় বেচিয়াছি; তাহার উপর প্রতি মাসে তিন টাকা সুদ ধরিয়াছি। বার আনা মণের চাউল দেড় টাকায় বেচিয়া টাকায় টাকা সুদ ধরিয়াছি। আমার অদৃষ্টে কি এত সহে! হে ঠাকুর, তুমি অন্তর্যামী, পাপ পুণ্য কিছুই তোমার অগোচর নহে,—তুমি ভিন্ন দীননাথের আর গতি নাই। হে বাবা কালাচাদ, যদি কোন গতিকে টাকাটা আদায় করিতে পারি, তাহা হইলে টাকায় এক পয়সা হিসাবে—না বাবা, এক পয়সা পারিব না বাবা,—আধলা পয়সা হিসাবে তোমার পূজা দিব।"

ব্রাহ্মণ এই সময়ে ফিরিয়া আসিয়া বণিক্‌কে কহিল, "দীননাথ, তোমার কর্ত্তাবাবার কথা কি বলিতেছিলে বল।" দীননাথ হাসিয়া কহিল, "দেখ ঠাকুর, আমার কর্ত্তাবাবার কথা অনেক কথা। এখন এক কাজ কর দেখি,—যে টাকাটা বাকী পড়িয়াছে, তাহাতে আধলা পয়সা হিসাবে ঠাকুরের পূজা মানিয়া ফেল দেখি!"

"আধলা পয়সা কেন দীননাথ, আমি টাকায় পয়সা হিসাবে পূজা দিব!"

"ঐ ত তোমাদের দোষ দাদাঠাকুর, তোমরা কারবার বুঝ না। আমি টাকায় আধলা হিসাবে পূজা মানিলাম,—আর তুমি একেবারে দুগুণ দর চড়াইয়া দিলে,—ইহাতে কি কারবার চলে।"

"ঠাকুর-দেবতার কাছেও কি কারবার দীননাথ!"

"এইজন্যই দাদাঠাকুর, তোমাদের জাতির পয়সা হয় না। কারবারে ঠাকুর দেবতা, আত্মীয়-স্বজন সমস্তই সমান। তুমি টাকা-পিছু আধলা পয়সা পূজা মানিয়া ফেল দেখি!" "ভাল, মানিলাম; কিন্তু টাকাটা উদ্ধারের কি হইবে?" "দেখ দাদাঠাকুর, আমার কর্ত্তাবাবা অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন।"

"সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই দীননাথ!"

"তিনি বলিতেন যে, জলে জল বাধে, কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা যায় এবং টাকা ভিন্ন টাকা উদ্ধার হয় না। তোমার কত টাকা পাওনা বল দেখি!"

"হাজার চই।"

"আর কত টাকা ছাড়িতে রাজী আছ?"

"দোহাই ধর্ম্মের, মা কিরীটেশ্বরীর দিব্য, আর একটী পয়সাও নাই।"

"ধার করিবে?"

"কত টাকা লাগিবে?"

"দুই তিন শত ত বটেই!"

"অত টাকা কি হইবে দীননাথ!"

"পেশকশ্, দাদাঠাকুর, পেশকশ্!"

"সে কি বাপ্?"

"ঘুস, দাদাঠাকুর ঘুস। সুবাদারের দরবারে যাইতে হইবে,—আৰ্জী পেশ করিতে হইবে—পিয়াদা হইতে সুবাদার পর্য্যন্ত পূজা দিতে হইবে,—তবে যদি টাকার উপায় হয়! এখন ধার করিবে কি না বল।"

"সুদ কত!"

"টাকায় আনা।"

"করিব।"

"চল, তমসুথ লিখিবে চল। সুবাদারী ফৌজের বখ্‌শী এনায়েতুল্লা খাঁ আমার খাতক,—তাহাকে কিছু খাওয়াইতে পারিলে টাকাটা উদ্ধার হইতে পারে।"

"তবে চল।"

উভয়ে গঙ্গাতীরস্থিত পরিত্যক্ত শিবির-ক্ষেত্র হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

নূতন মুরশিদাবাদ সহরের মধ্যস্থলে এক নবনির্ম্মিত অট্টালিকার সম্মুখে বসিয়া জনৈক খর্ব্বাকৃতি বৃদ্ধ মুসলমান নমাজের পূর্ব্বে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিতেছিল,—এমন সময়ে দীননাথ ও তাহার সঙ্গী তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। দীননাথকে দেখিয়া সে ব্যক্তি হাসিয়া উঠিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুজী, এ মাসে কি দ্বিগুণ সুদ দিতে হইবে? মাহিনা কাবারের এখনও ছয় দিন বাকী আছে।" দীননাথ

অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "না,—না, সেথ সাহেব, এখন সুদের তাগাদায় আসি নাই, সেলাম।" এই বলিয়া বণিকপুত্র সেলামের পরিবর্তে মুসলমানকে প্রণাম করিয়া ফেলিল,—মুসলমান উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। দীননাথ লজ্জিত হইয়া কহিল, "সেথ সাহেব, বড় বিপদে পড়িয়া তোমার কাছে আসিয়াছি,—তুমি না উদ্ধার করিলে আমাদের আর উপায় নাই।" মুসলমান বিস্মিত হইয়া কহিল, "সাহাজী, তোমার মত হুসিয়ার বেণিয়া মুরশিদাবাদ সহরে অতি অল্পই দেখিয়াছি। তোমার আবার কি বিপদ্ হইল? কোন ফৌজদারী হাঙ্গামায় পড়িয়াছ না কি?"

"না, সেথজী। কর্ত্তাবাবার কৃপায় দীননাথ এ পর্য্যন্ত ফৌজদারী হাঙ্গামায় পড়ে নাই। কথাটা বড় গোপন, পথে দাঁড়াইয়া বলিতে ভরসা হয় না।"

মুসলমান দীননাথকে ও তাহার সঙ্গী ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া বসাইল; এবং দীননাথ তাহার পিতামহের বিষয়বুদ্ধি সম্বন্ধে বহু অবান্তর প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া, তাহার ও তাহার সঙ্গীর অবস্থা জানাইল। মুসলমান পুনরায় উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল, "সাহাজী, যে কাজটী করিয়াছ, তাহা বেণিয়ার উপযুক্ত হয় নাই।" দীননাথ তাহা শুনিয়া হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি টাকা আদায় হইবার কোন উপায় নাই?" "আছে; কিন্তু সাহাজী, তুমি কি তাহা পারিবে?" "দেখ সেখ সাহেব, আমরা জাতিতে বেণিয়া, পাওনা টাকা আদায়ের জন্য আমরা বুকের রক্ত পর্য্যন্ত দিতে পারি।" "দেখ, বাবুজী, জিন্নৎমকানি আলমগীর বাদশাহের আমল হইতে বাদশাহী ফৌজের চাকরী করিয়া আসিতেছি। লস্করের হাল-চালের খবর আমার নিকট যত পাইবে, সুবা বাঙ্গালায় আর কাহারও নিকট এত পাইবে না। দেখ বাবুজী, আমার অসময়ে তুমি বড় উপকার করিয়াছ,—সে'জন্য তোমার নিকট বড় কৃতজ্ঞ আছি। আমি যেমন করিয়া পারি, তোমার পাওনা টাকা উদ্ধারের উপায় করিয়া দিব; কিন্তু কিছু টাকা খরচ করিতে হইবে।"

দীননাথ মুসলমানের পদদ্বয় আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল, "খাঁ সাহেব, আমার অতি কষ্টের পয়সা;—তুমি যদি কোন উপায়ে টাকাটা আদায় করিয়া দিতে পার—কি আর বলিব,—আসলটা ছাড়িতে পারিব না,—তবে যদি আর কখন সুদের নামও করি, তাহা হইলে আমি নবদ্বীপচন্দ্রের পৌত্রই না।"

মুসলমান পুনরায় উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল; এবং কহিল, "বাবুজী, সুদের টাকা নিয়মমত যথাসময়ে লইও। তুমি অসময়ে আমার উপকার করিয়াছিলে, তোমার প্রাপ্য বঞ্চিত করা আমার উচিত নহে। টাকা অজস্র ব্যয় করিতে হইবে। সুবাদারী ফৌজের কথা হইলে আমি বিনা খরচে তোমার টাকা আদায় করিয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু এ টাকা বাদশাহী লস্কর খাইয়াছে; সুতরাং আমার ক্ষমতার অতীত। বাদশাহী লস্করের বখশী ব্যতীত আর কেহ তোমার ফরীয়াদ শুনিতে পারিবে না। শাহজাদার সহিত রহমৎআলি খাঁ আছেন,—তিনি আমার পরিচিত; কিন্তু তাঁহার নিকট ঐ অর্থের পরিবর্ত্তে লম্বা জবানই সুলভ। দেখ, বড় ঘরানার কথা,—আমরা নফর,—আমাদের মুখে ভাল শুনায় না; তবে লোকের মুখে যতটা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে বোধ হয় যে, শাহজাদা ফররুখশিয়রের লস্করে অর্থের বড়ই অনাটন। দীননাথজী, আজি তোমার মত অনেক বেণিয়াই আফ্‌শোষ করিতেছে। জাহাঙ্গীরনগর হইতে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত শাহজাদা ফররুখশিয়রের লস্করের হাজার হাজার পাওনাদার আছে। দেখ বাবুজী, আমি তোমাকে রহমৎ আলি খাঁর উপরে একখান রোক্কা দিতেছি; তুমি তাহা লইয়া আজিমাবাদের পথে যাও,—সে তোমাদের পাওনা টাকার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবেই দিবে। তবে একটা কথা স্মরণ রাখিও যে, পেশকশটা নগদ দিতে হইবে; কিন্তু টাকাটা নগদ আদায় না হইতেও পারে।"

"সে আবার কি কথা সেথজী!"

"কথাটা ভাল করিয়া বুঝ। শাহজাদা ফররুখশিয়ার আজীম-উশ্-শানের পুত্র। বাদশাহ অতি বৃদ্ধ,—নয়নের পলক পড়িতে-না-পড়িতে হয় ত আজীম-উশ্-শান ময়ূর-তখ্‌তে উপবিষ্ট হইবে। তখন এই বৃদ্ধ মুরশিদকুলি খাঁ ফররুখশিয়রের পদপ্রান্তে লুটাইবে; এবং মুরশিদাবাদ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত প্রত্যেক সুবাদার ও ফৌজদার ফররুখশিয়রের দস্তখৎ যুক্ত হুকুমনামা দেখিলে, টাকার পরিবর্ত্তে আশরফি আনিয়া হাজির করিবে। দীননাথ, তুমি বেণিয়া, কারবার তোমার জাতির পেশা,—যদি টাকার পরিবর্ত্তে

আশরফি রোজগার করিতে চাহ, তাহা হইলে নগদ টাকা খরচ করিয়া একখানা হুকুমনামা লইয়া ফিরিয়া আসিও। টাকার জন্য অধিক তাগিদ করিও না। দেখ, আলমগীর বাদশাহের আমলে দাক্ষিণ দেশে বহুদিন কাটাইয়াছি, বহুতর শাহজাদা দেখিয়াছি। ফররুখশিয়ার সদাশয় ব্যক্তি। এখন যদি তাহার উপকার করিতে পার, তাহা হইলে কালে একের পরিবর্তে শতগুণ পাইবে।"

"সেখজী, রাজা-রাজড়ার কথা! তাঁহাদিগের কি সকল সময়ে সকল কথা মনে থাকে! রোকা দিয়া যদি পরে ভুলিয়া যান! দেখ সেখজী, দেড় হাজার টাকার এক একটী আমার বুকের এক-এক ফোঁটা রক্ত; পুত্রশোক সহ্য করিতে পারি, কিন্তু টাকার শোক সহ্য হয় না।"

"দীননাথ তুমি একটী আস্ত পাগল। তোমার টাকা আদায় করিয়া দিবার জন্যই তোমাকে সন্ধান বলিয়া দিলাম। ইহা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। বাদশাহী লস্করে যে টাকা হাওলাত লইয়াছে, স্বয়ং বাদশাহ অথবা বাদশাহী লস্করের বকশী ব্যতীত অপর কেহ সে ফরীয়াদ শুনিতে পারে না। স্বয়ং মুরশিদ কুলি খাঁ তোমার মামলার বিচার শুনিতে অক্ষম। তাহার উপর, শাহজাদা ফররুখশিয়ার বর্ত্তমান সময়ে প্রায় নিঃসম্বল। সেখানে অধিক তাগিদ করিলে টাকার পরিবর্ত্তে চামড়ার কোড়া পাইবে; আর যদি মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া পাওনা টাকার হুকুমনামার উপরে শাহজাদার দস্তখৎ করাইয়া আনিতে পার, তাহা হইলে কালে সুদ ও সুদের সুদ সমেত সমস্ত টাকা ওয়াসিল করিতে পারিবে। আমার বিপদের সময়ে তুমি বড় উপকার করিয়াছিলে,—আমার যে উপায় ভাল বোধ হইল, তাহাই বলিলাম,—এখন তোমার যাহা ইচ্ছা কর। নমাজের সময় প্রায় অতীত হইল,—আমাকে আপনারা মাফ করিবেন।"

দীননাথও তাহার সঙ্গী বাহিরে আসিল। ব্রাহ্মণ কহিল "ওহে, দীননাথ যখন অন্য উপায় নাই তখন চল, কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া লইয়া, আজীমাবাদের পথেই যাওয়া যাক।"

দীননাথ বিষণ্ণ বদনে কহিল "চল। দেড় হাজার গিয়াছে,—আরও কত যাইবে, তাহা ভগবানই জানেন।"

সাহিত্যিক লড়াই

[সঙ্কলন]

(১)

৺রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত

"জামাই-বারিক

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কেশবপুর—জামাই-বারিক।

চারিজন জামাই আসীন।

পঞ্চম-জামাই।......................................

"রাম-লক্ষণ পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হওয়ায় নিতান্ত মূঢ়মতি বিবেচনায় পঞ্চবটী বনে উপসংহার করিয়া ডেরাডাণ্ডা ফেল্লেন। সাঁওতাল-নন্দনদিগের সহিত হৈঁডুডুডু, নবীন ভুড়কি, কপাটি-কপাটি, ডাণ্ডাগুলি খেলতে লাগলেন; অল্পদিনের মধ্যে সুমেরু-শিখর-নিকর পরাজিত-দিগ্বিজয়ী বীর হয়ে উঠ্‌লেন। ইতিমধ্যে কিচকিন্দা-অধিপতি বালী রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিণয় উপলক্ষে তাঁহার বৈঠকখানায় নৃত্য করিবার জন্য একযোড়া খ্যাম্‌টাওয়ালী উপস্থিত হয়। নাচ আরম্ভ হয়েছে; বালী-রাজা সিংহাসনে বক্রভাবে দীর্ঘ লাঙ্গুল উচ্চ করিয়া উপবিষ্ট; দুই পার্শ্বে হনুমান্, জাম্বুবান্ নল, নীল, গয়, গবাক্ষ প্রভৃতি লোমাচ্ছাদি-উচ্চ পুচ্ছধারী মহোদয়গণ চেয়ারে, বেঞ্চে, কোচে বিরাজ কচ্চেন; জরীর টুপি, মেরেসা, শ্যামলা, কিংখাপের চাপকান, সাটিনের চায়না-কোটে বানরকুল ঝলমল। রাম-লক্ষ্মণ টিকিট পেয়েছিল; তারাও সভায় উপস্থিত। বুনোদের সঙ্গে থেকে ছোঁড়া ছুটোর স্বভাব বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল। বালী রাজাকে ব্যঙ্গ,

"খ্যাম্‌টাওয়ালী ছুটোকে আমাদের দাও।" বালী বল্লে, "দেব না।" ঘোর যুদ্ধ,—বালী-রাজা বধ। খ্যাম্‌টাওয়ালী ছুটোকে দু-ভাইতে ভাগ করে নিলে; যেটার নাম সীতা সেটা নিলে রাম; যেটার নাম সূর্পণখা, সেটা নিলে লক্ষ্মণ।"

(২)

৺রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত

'সধবার একাদশী"

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিৎপুর রোড—গোকুল বাবুর বাড়ীর সম্মুখ।

নিমচাঁদ।..

"চোদ্দ বৎসর কেন, চদ্দ হাজার বৎসর বনে থাক্‌তে পারি, আমার মালিনী মাসী জানকী কাছে থাকে—পবন তনয়ের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এইরূপে বাস, তার পর সীতা পাই ভাল, নইলে সীতাও যে পথে, জগন্নাথও সেই পথে।"

(৩)

—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "ঘরে বাহিরে" ৯৫ পৃষ্ঠা—

সন্দীপ।..

"যে-রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে' শ্রদ্ধা করি সেও এমনি করেই মরেছিল। সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোকবনে রেখেছিল—অতবড় বীরের অন্তরের মধ্যে ঐ এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সঙ্কোচ ছিল তা'রই জন্যে সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে গেল। এই সঙ্কোচটুকু না থাক্‌লে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পূজো করত। এই রকমেরই একটু সঙ্কোচ ছিল বলেই, যে-বিভীষণকে তা'র মারা উচিত ছিল, তা'কে রাবণ চিরদিন দয়া এবং অবজ্ঞা করলে, আর ম'ল নিজে।"

(৪)

রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে"

[শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, এম-এ, বি-এল]

এ মহাপাতকে হিন্দু! তব পুণ্য গেহ
করিও না কলঙ্কিত; আর্য্য রক্ত দেহ
ধরে যদি এক বিন্দু একটি শিরায়,
যদি শুদ্ধ শুচিতার একটি রেখায়
শুভ্র থাকে ও চিত্তের এক তিল স্থান,
এ কলুষ হ'তে দূরে করো অবস্থান;
যে পবিত্র সীতা নামে ধন্য আর্য্য দেশ,
যেথা স্বপ্নে পাপ চিহ্ন করে না প্রবেশ,
সেই শ্বেত সরোজের অমল ধবলে,
আর্য্য হৃদয়ের সেই পূজার কমলে
কালিমার ছায়া দিতে যাহার সৃজন,
আর্য্য কর যেন নাহি করে পরশন;
হায় বঙ্গ! যে কবির বীণায় আপনি
সুমন্দ মলয় এসে করে প্রতিধ্বনি,
তার কর প্রণালীর পূতিগন্ধময়
পঙ্কে কলঙ্কিছে যত দিব্য কুবলয়!
কিন্তু যেও লেখনীর লজ্জালেশহীন
বর্ব্বর যথেচ্ছাচার সেই অমলিন
শুদ্ধ শুচি সতীত্বের তেজে জ্যোতির্ম্ময়
সীতা চিত্তে কল্পিয়াছে পাপিষ্ঠ আশয়,
তার হাতে আর্য্যনারী 'বিমলা'র প্রায়
যথেচ্ছাচারিণী হবে, কি আশ্চর্য্য তায়?
তার হাতে এ ঘরের পবিত্র বাতাস,
সংযমের সুনীতির এ দিব্য আবাস
স্বৈরিণী বিলাস দুষ্ট বাইরের মত
কলুষিত কলঙ্কিত হবে অবিরত।*

* রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' দেখুন।

অর্চ্চনা, (ফাল্গুন, ১৩২৬।)

(৫)

বেতালের প্রশ্ন

[শ্রীত্রিবিক্রম বর্ম্মণ]

পরিচয় দিয়ে যাও গো চলিয়ে,
  হিঁদুয়ানী-অবতার আমার!
সন্দীপ কৃত সীতার গ্লানিতে
  বোতাম বিদরে যার জামার?
"ঘরে বাইরে"টা ঘরের বাহির,
  করিতে তো তুড়ে ক্ষমতা দাও,
হিন্দুয়ানীর পুঁচুকে ছুয়ানী!
  এদিকে বারেক চোখ্ তাকাও!

"জানকী মালিনী মালী" ব'লে হেথা
হল্লা করে কে হাঁকডাকে,
আমি বলি বুঝি নিয়ে দস্তটা,
তুমি বল দেখি, লোকটা কে ?
সীতারে ঘোমটাউলী বানায়ে কে
নাচালে বানর-বৈঠকে,
আমি বলি ওটা গেঁজেল জামাই,
যে হোক্, চাবুক দাও ও'কে।
ব'কে ধম্‌কিয়ে 'থ' বানিয়ে দাও,
ক'সে ওরে তুমি দাও গালি,
রেয়াৎ কোরো না,—হিঁদুর শত্রু,
কই ?—কোথা গেল ?—চুণকালি ?

* অর্চনায় "ঘরে বাইরে" কবিতা দ্রষ্টব্য।

ভারতী, (চৈত্র, ১৩২৬।)

(৬)

সাহিত্যবিচার

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

"ঘরে-বাইরে" উপন্যাসখানা লইয়া বাংলার পাঠকমহলে এখনো কথা চলিতেছে। হৃদয়াবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল হয় তখন মানুষ গদ্য ছাড়িয়া পদ্য ধরে। সম্প্রতি তাহারও সূচনা প্রকাশ পাইতেছে। এক জায়গায় দেখিলাম, "ঘরে-বাইরে" সম্বন্ধে ক্ষোভ চোদ্দ অক্ষরের লাইনে লাইনে রক্তবর্ণ হইয়া ফুটিয়াছে। ইহাতে পদ্যসাহিত্যের বিপদ চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। পাছে ইহা সংক্রামক হইয়া পড়ে সেইজন্য এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিলাম না।

পছন্দ লইয়া মানুষের সঙ্গে তর্ক চলে না। ভর্তৃহরির অনেক পূর্ব্ব হইতেই কবিরা এ সম্বন্ধে অবস্থাবিশেষে হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছেন। স্বয়ং কালিদাসও কবিতাই লিখিয়াছেন, কিন্তু দিঙনাগাচার্য্যের সহিত বাদপ্রতিবাদ করেন নাই। সাধারণত কবিদের নিন্দা-অসহিষ্ণু বলিয়া খ্যাতি আছে; কিন্তু সেই অসহিষ্ণুতা লইয়া (দুই একজন ছাড়া) তাঁহারা নিজেরাই ক্ষোভ অনুভব করিয়াছেন, সাহিত্যকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলেন নাই। যখন তাঁহাদের লেখার প্রতি কেহ কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে, তখন সেই কলঙ্ক-ভঞ্জনের ভার তাঁহারা কালের হস্তেই সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ভাগ্যবান তাঁহাদের লেখা সম্বন্ধে ইহাই প্রমাণ হইয়া গেছে যে, তাঁহাদের রচনার কলসে আলঙ্কারিক ছিদ্র, একটা কেন, একশোটা থাকিতে পারে, কিন্তু তবু তাহা হইতে রস বাহির হইয়া যায় নাই। সাহিত্যে এই কলঙ্কভঞ্জনের পালা অনেক দিন হইতে অনেকবার অভিনীত হইয়াছে, যাঁহারা আলঙ্কারিক তাঁহাদের গঞ্জনা হইতে কবিরা বারবার রক্ষা পাইয়াছেন।

"ঘরে-বাইরে" সম্বন্ধে রসবোধ লইয়া যদি কথা উঠিত তবে সে কথা যতই কটু হউক নীরব থাকিতাম। কিন্তু যে কথা উঠিয়াছে তাহা সাহিত্যসীমানার বাহিরের জিনিষ। তাহা শক্তির অধিকারের মধ্যে, সুতরাং তাহা লইয়া তর্ক চলে, এবং তর্ক না চালাইলে কর্ত্তব্য পালন করা হয় না। কারণ, যাহা অন্যায় তাহাকে সহ্য করিয়া গেলে সাধারণের প্রতি অন্যায় করা হয়।

"ঘরে-বাইরে" বাহির হইবার পরেই আমার বিরুদ্ধে একটা নালিশ শোনা গেল যে, আমি এই উপন্যাসে সীতার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিয়াছি। কথাটা এতই অদ্ভুত যে আমি আশা করিয়াছিলাম যে, এমন কি, আমাদের দেশেও ইহা গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু দেখিলাম, লোকে উৎসাহের সহিত ইহা গ্রহণ করিয়াছে; এবং জনগণের নিন্দায় একদা সীতা যেরূপ নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন এ গ্রন্থও সেইরূপ গণ্যমান্যদের সভা ও লাইব্রেরি ঘরের টেবিল হইতে নির্ব্বাসিত হইতে থাকিল।

এটাকে সামান্য ব্যক্তিগত হিসাবে দেখিলে ইহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু যে-কোনো প্রভাবে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে বিকৃত করে, সেই প্রভাব যদি ব্যাপক হইয়া উঠিতে থাকে তবে সেটাকে সাধারণের পক্ষে ক্ষতিজনক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অতএব "ঘরে-বাইরে" গ্রন্থের যে-অপরাধ বানাইয়া তুলিয়া আমার প্রতি কেবলি আক্রোশবর্ষণ চলিতেছে সেই অপরাধের অভিযোগটাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার।

মহাকাব্যে নাটকে বা নভেলে যে আখ্যানবস্তু পাওয়া যায় তাহার নানা বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু সকল বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সেই-সমস্ত আখ্যানে একটী সাধারণ উপাদান দেখিতে পাই; সেটি আর কিছু নয়, সংসারে ভালোমন্দের

দ্বন্দ্ব। তাই রামায়ণে দেখিয়াছি, রাম-রাবণের যুদ্ধ; মহাভারতে দেখিয়াছি, কুরু-পাণ্ডবের বিরোধ। কেবলি সমস্তই একটানা ভালো, কোথাও মন্দের কোনো আভাস মাত্র নাই, এমনতর নিছক চিনির সরবৎ দিয়াই সাহিত্যের ভোজ সম্পন্ন করা অন্তত কোন বড় যজ্ঞে দেখি নাই।

এত বড় মোটা কথাও যে আমাকে আজ বিশেষ করিয়া বলিতে হইতেছে সেজন্য আমি সংকোচ বোধ করিতেছি। শিশুরা যে রূপকথা শোনে, সেই রূপকথাতেও রাক্ষস আছে; সেই রাক্ষস শুদ্ধ সংযত হইয়া কেবলি মনুসংহিতা আওড়ায় না,—সে বলে, "হাঁউ মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ।" ধর্ম্মনীতির দিক্ হইতে দেখিলে তাহার পক্ষে এমন কথা বলা নিঃসন্দেহই গুরুতর অপরাধ; আশা করি যাহারা এই-সকল গল্প রচনা করিয়াছিল তাহারা নরমাংসাশী ছিল না এবং যাহারা এইসব গল্প শোনে নরমাংসে তাহাদের স্পৃহা বাড়ে না। তাই বলিতেছি, মানুষের গন্ধে গল্পের রাক্ষসের লুব্ধতা উদ্রেক হওয়া ধর্ম্মশাস্ত্রমতে অপরাধ সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষের গন্ধে গল্পের রাক্ষসের ভ্রাতৃ-প্রেম যদি জাগিয়া উঠিত এবং সে যদি সুমধুর স্বরে বলিয়া উঠিত "অহিংসাপরমোধর্ম্ম" তবে সাহিত্যরসনীতি অনুসারে রাক্ষসের সে অপরাধ কিছুতে ক্ষমা করা চলিত না। কোনো শিশুর কাছে ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই এক মুহূর্ত্তেই আমার কথা সপ্রমাণ হইবে। কিন্তু সেই শিশুই কি বড় হইয়া এম-এ পাস করিবামাত্র গল্পের রাক্ষসটা মরাল্ ফিলজফির নীচে চাপা পড়িয়া সরুসুরে শান্তিশতক আওড়াইতে থাকিবে?

যাই হউক, সকল ভাষার সকল সাহিত্যেই ভালো মন্দ দুই রকম চরিত্রেরই মানুষ আসরে স্থান পায়। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেও সেইরূপ বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। এই-জন্যই "ঘরে-বাইরে" নভেলে যখন সন্দীপের অবতারণা করিয়াছিলাম তখন মুহূর্ত্তের জন্যও আশঙ্কা করি নাই যে সেটা লইয়া আমাদের দেশের উপাধিধারী এত গণ্যমান্য লোকের কাছে আমাকে এমন জবাবদিহির দায়ে পড়িতে হইবে। এখন হইতে ভবিষ্যতে এই আশঙ্কা মনে রাখিব, কিন্তু স্বভাব সংশোধন করিতে পারিব না; কেননা আমাদের দেশের বর্ত্তমান কাল ছাড়াও কাল আছে এবং গণ্যমান্য লোক ছাড়াও লোক আছে, তাহারা নিশ্চয়ই রাক্ষসের মুখ হইতে এই অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ কথা শুনিতে চায়—হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ; চন্দ্রবিন্দুর বাহুল্য প্রয়োগেও তাহারা বাংলাভাষা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইবে না।

জানি আমাকে প্রশ্ন করা হইবে, সন্দীপ যত বড় মন্দ লোকই হউক তাহাকে দিয়া সীতাকে অপমান কেন? আমি কৈফিয়ৎস্বরূপে বাল্মীকির দোহাই মানিব,—তিনি কেন রাবণকে দিয়া সীতার অপমান ঘটাইলেন? তিনি ত অনায়াসেই রাবণকে দিয়া বলাইতে পারিতেন যে, মা লক্ষ্মী, আমি বিশহাতে তোমার পায়ের ধূলা লইয়া দশ ললাটে তিলক কাটিতে আসিয়াছি।—বেদব্যাস কেন দুঃশাসনকে দিয়া জয়দ্রথকে দিয়া দ্রৌপদীকে অপমানিত করিয়াছেন? রাবণ রাবণের যোগ্য কাজ করিয়াছে, দুঃশাসন জয়দ্রথ যাহা করিয়াছে তাহা তাহাদিগকেই সাজে,—তেমনি আমার মতে সন্দীপ সীতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা সন্দীপেরই যোগ্য—অতএব সে কথা অন্যায় কথা বলিয়াই তাহা সঙ্গত হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গতি সাহিত্যে নিন্দার বিষয় নহে।

যদি আধুনিক কালের কোনো উপাধিধারী এমন কথা গদ্যে বা পদ্যে বলিতে পারিতেন যে, রাবণের পক্ষে সীতাহরণ কাজটা অসঙ্গত, মন্থরার পক্ষে রামের প্রতি ঈর্ষা অন্যথা, সূর্পনখার পক্ষে লক্ষ্মণের প্রতি অনুরাগের উদ্রেক অসম্ভব, তাহা হইলে নিশ্চয় কবিগুরু বিচারসভায় হাজির থাকিলেও নিরুত্তর থাকিতেন; কেননা এমন সকল আলোচনা সাহিত্যসভায় চলিতে পারে। কিন্তু তাহা না বলিয়া ইঁহারা যদি বলিতেন এ-সকল বর্ণনা নিন্দনীয় কারণ ইহাতে সীতাকে রামকে লক্ষ্মণকে অপমানিত করা হইয়াছে এবং এই অপমান স্বয়ং কবিকৃত অপমান; ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে এই সকল ভালোমানুষের প্রতি সকলেরই সাধু ব্যবহার করাই উচিত;, তবে যে-কবি সর্ব্বাঙ্গে কীটের উৎপাত স্তব্ধ হইয়া সহ্য করিয়াছিলেন তিনিও বোধ হয় বিচলিত হইয়া উঠিতেন।

আমি অন্যদেশের কবি ও লেখকের গ্রন্থ হইতে কোনো দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম না। কেননা, এমন কথা আমাদের দেশে প্রচলিত যে, অন্যদেশের সহিত ভারতবর্ষের কোনো অংশে মিল নাই, সেই অমিলটাকেই প্রাণপণে আঁকড়াইয়া

থাকা আমাদের ন্যাশনাল সাহিত্যের লক্ষণ—অর্থাৎ ন্যাশনাল সাহিত্য কূপমণ্ডুকের সাহিত্য।

(প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৬।)

(৭)

রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ছন্দ

[শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন]

কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদিগের পদানুসরণে ছন্দঃ লইয়া ভগবানের উপরে কান্তভাব স্থাপন করিয়া অধিকাংশ কবিতা লিখিয়াছেন। শোক হইতে শ্লোকের সৃষ্টি; বাল্মীকির মুখ হইতে প্রথম শ্লোক বাহির হইয়াছে; এই কথা যিনি বলিবেন, বলিব,—তিনি নিশ্চয়ই ভুল করিতেছেন। অপৌরুষেয় বেদে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ আছে; বাল্মীকি তাহা সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃত কাব্যে আনিয়াছেন, এই বাল্মীকির মুখে শ্লোকের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ছন্দঃগুলি বৈষ্ণব কবিদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত। এমন কি, তিনি গীতগোবিন্দের রচয়িতা, শব্দমধুর রচনায় সিদ্ধহস্ত, সুরসিক উক্ত কবি জয়দেবের নিকট হইতেও ছন্দঃ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা উদাহরণ স্বরূপে "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" ছন্দের অনুকরণে তাঁহার রচিত "একদা তুমি অঙ্গ ধরি" এই কবিতায় উল্লেখ করিতে পারি।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ এমন কি ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত যখন যে সংস্কৃতচ্ছন্দে কবিতা লিখিয়াছেন, তখন তাঁহারা সেই সেই কবিতায় "হ্রস্ব লঘু, দীর্ঘ গুরু, সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণও গুরু" এই নিয়ম রক্ষা করিয়াছেন। পশ্চিমদেশে ধ্রুপদ গানেও অদ্যাপি সেই নিয়ম রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাচীন নিয়মের দূরে বর্জ্জন করিয়াছেন, "হ্রস্ব লঘু দীর্ঘ গুরু" তিনি মানেন নাই; "সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণগুরু" এই মাত্র স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের যুক্তি এই;—বাঙ্গালায় হ্রস্ব-দীর্ঘ লইয়া লঘু-গুরু উচ্চারণ নাই; কেহই দীর্ঘ বর্ণে গুরু উচ্চারণ করে না, হ্রস্বদীর্ঘ-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র লঘু উচ্চারণই প্রচলিত; সুতরাং কেবল ছন্দে কেন দীর্ঘ স্বরের গুরু উচ্চারণ গ্রহণ করিব? সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণের উচ্চারণ অনিচ্ছাতেও যখন স্বভাবতঃ একটু জোর আসে, তখন তাহাকেই গুরু বর্ণ বলিয়া ধরিয়া লইব,—ইত্যাদি ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের মতে যখন বাঙ্গালায় দীর্ঘ বর্ণের উচ্চারণ গুরু নয় অবধারিত তখন সংস্কৃতে "কিম্" শব্দের অপভ্রংশে বাঙ্গালায় যে "কি" শব্দের উৎপত্তি, চিরদিন বাঙ্গালী যাহাকে হ্রস্ব ইকারের যোগে লিখিয়া আসিতেছে, কোন-কোন স্থলে সেই "কি" শব্দের গুরু উচ্চারণ দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহার ঘাড়ে কেন যে দীর্ঘ ঈকারের চাপ বসাইতেছেন, বুঝিতে পারিলাম না। বাঙ্গালায় দীর্ঘের, গুরু উচ্চারণ নাই; তবে "কী"এর বেলায় তাঁহার প্রদত্ত দীর্ঘ ঈকার বলিয়াই কি গুরু উচ্চারণ হইবে?

সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বস্বর গুরু, এই নিয়মই কি খাঁটি বাঙ্গালা কবিতায় পূর্ব্বে গৃহীত হইত? "কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ। গাইল উত্তরাকাণ্ড গীত রামায়ণ।" এবং

"পূর্ণ সুধাকর; হইতে প্রবর,"
"নেত্র যুগ মীন, দেখিয়া হরিণ,"
"কহলো মালিনী, কি রীতি,
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে নাইক ভীতি।"

ইত্যাদি ইত্যাদি কবিতায় কি সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বস্বরের গুরু উচ্চারণ জন্য তাহাকে দুইমাত্রা বলিয়া ধরা হইয়াছে? যদি বল,—খাঁটি বাঙ্গালা ছন্দের কবিতায় মাত্রা গণনা নাই, অক্ষর মাত্র গণনা আছে। ভাল কথা, স্বীকার করিলাম, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের—

"পঞ্চনদের তীরে, বেণী পাকাইয়া শিরে।"

এই কবিতাতেই বা কেন "পঞ্চ" এই শব্দের 'প'কারে দুই মাত্রা ধরা হইল?

"বিপুল গভীর, মধুর মন্ত্রে"
"সঘন অশ্রু মগন হাস্য"
"প্রভাত অরুণ কিরণ রশ্মি"
"চিরকাল ধরে, গম্ভীরস্বরে"

ইত্যাদি ইত্যাদি কবিতাতেই বা "মন্ত্রে"র "ম"কে, "অশ্রু"র "অ"কে, "হাস্যের" "হা"-কে, "রশ্মির" "র"কে এবং "গম্ভীরে"র "গ"কেই বা কেন দুইমাত্রার উচ্চারণে ধরিয়া লওয়া হইল? এ ছন্দটীও ত লঘু-ত্রিপদীর একটি রূপান্তর। সংস্কৃত "কুজতি কিল কোকিলকুলমুজ্জ্বলকলনাদং।" এই ছন্দঃ হইতে লঘু-ত্রিপদীর উৎপত্তি হইলেও বাঙ্গালায় আসিয়া

সে খাঁটি বাঙ্গালা ছন্দঃ হইয়াছে। এইজন্য পূর্ব্বোদ্ধৃত "পূর্ণ সুধাকরের" "পূ"এ দুইমাত্রা ধরা হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে রবীন্দ্রনাথ স্বরবর্ণের গুরু উচ্চারণ করেন না, তিনিই আবার

"চৌদিক হ'তে উন্মাদ স্রোতে"

ইহার "চৌ"র দুইমাত্রা গ্রহণ করিয়াছেন।

যে রবীন্দ্রনাথ গদ্যেও কলিকাতা প্রদেশের কথ্য ভাষা চালাইতে বদ্ধপরিকর, তিনি যে কবিতায় সংযুক্তবর্ণগুম্ফিত শ্রুতিকঠোর সংস্কৃত শব্দরাশি কেন চালাইতেছেন, তাহার কারণ-নির্ণয়ে আমরা একান্ত অসমর্থ। "কী" লিখিয়া যিনি নিজের নিয়ম নিজেই ভঙ্গ করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে গদ্যে ও পদ্যে এইরূপ বৈচিত্র্য দেখিয়া বিস্মিত হই নাই; অনুবর্ত্তী কবিবৃন্দের সেইদিকে ঝোঁক দেখিয়াও আশ্চর্য্য ভাবি নাই; বরং তাঁহাদিগের এইরূপ অবিচারিত ভাবে এই পদ্ধতিগ্রহণে গুরুভক্তির আতিশয্য বুঝিয়া আনন্দিত হইয়াছি। পদাবলীর প্রণেতা বৈষ্ণব কবিগণ ও প্রাচীন অন্যান্য কবিগণ সংস্কৃতশব্দের সংযুক্তবর্ণকে বিযুক্ত করিয়া, শিথিল করিয়া, কোমল করিয়া কবিতায় বসাইতেন; তাহার ফলে "ধর্ম্ম" "ধরম", "কর্ম্ম" "করম", "প্রীতি" "পীরিতি", হইয়াছে; কৃষ্ণ পর্য্যন্ত কানু হইয়াছেন। উদাহরণের বাহুল্যে আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাই না।

যাহা হউক, আবার সেই পূর্ব্বকথিত বিষয়েরই অবতারণা করিতেছি। বাল্মীকি যেমন বেদ হইতে, দেবলোক হইতে সংস্কৃত কাব্যে—মর্ত্ত্যলোকে খাঁটি বৈদিক ছন্দকে নামাইয়াছেন, আবার কতকগুলি বৈদিক ছন্দকে ভাঙ্গাচুরা করিয়া নূতন আকার প্রদান করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ যখন সেইরূপ গীতগোবিন্দ হইতে ও বৈষ্ণব পদাবলী হইতে ছন্দোগ্রহণ করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন ও সেইগুলিকে বিবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়া নবীন পরিচ্ছদে নবীন ভূমিকায় প্রদর্শন করিতেছেন, তখন এ যুগের কবিদিগের মধ্যে তাঁহাকে বাল্মীকি না বলিয়া আর কাহাকে বলিব? বাল্মীকি তমসাতীরে ব্যাধবিদ্ধ রুধিরপরিপ্লুতদেহে ভূলুণ্ঠিত ক্রৌঞ্চকে দেখিয়া, ক্রৌঞ্চীর আর্ত্তনাদে আত্মহারা হইয়া শুধু "মা নিষাদ" শ্লোকে নয়—তাঁহার মধুর-লেখনীপ্রসূত রামায়ণের করুণপ্রস্রবণে বিশ্ব ভাসাইয়াছিলেন, আমাদিগের বঙ্গবাল্মীকি তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি নিছক করুণ ত সহ্য করিতে পারেনই নাই, শৃঙ্গারে যে করুণ বিপ্রলম্ভ আছে, তাহারও তিনি ছায়া মাড়াইতে রাজি নহেন। তিনি বিশ্বপতিকে পতি বলিয়া টানিয়া লইয়া গৃহে, বাহিরে, বনে, উপবনে, তরুমূলে, নদীকূলে, গিরিশৃঙ্গে, নদীতরঙ্গে, সরোবরে, তারায় তারায়, চাঁদের জ্যোৎস্নায়, মেঘের গায়, আকাশে, বাতাসে, সর্ব্বত্র তাঁহাকে নিভৃতে পাইয়া জড়াইয়া ধরিয়াছেন; তাঁহার স্পর্শে পুলকে মৃদুমধুর হাসি হাসিতেছেন, পাপ, তাপ, শোক, দুঃখ, ভুলিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে জগৎ হাসিতেছে। যিনি ঝঞ্ঝানিলের তর্জ্জনে, সমুদ্রের ঘোর গর্জ্জনে, অনন্তশূন্য-গগনব্যাপী নীলজলধরে খেলায়মান বজ্রপাতকারিণী বিদ্যুতের অট্টহাস্যে ভয় না করিয়া প্রাণনাথের সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার কাটিয়া বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া মেঘের গায়ে চলিয়া বাঁশী বাজান, তিনি ধন্য।

ইয়োরোপ বিরহ জানিত, ভগবানের সম্ভোগ জানিত না; রবীন্দ্রের মুখে সম্ভোগের নূতন গান শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছে। বঙ্গবাল্মীকি সেই দুঃখস্মৃতির গামছা তমসার তীরে না দাঁড়াইয়া মধুময়ী তমসার (টেম্‌স্) তীরে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সেখানে ব্যাধের ভয় নাই, নিষাদের শরের ভয় নাই; সুখে সুখে তুষারশুভ্র ক্রৌঞ্চমিথুন আনন্দে তালে তালে পা ফেলিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে পরিভ্রমণ করিতেছে, দেখিয়া বঙ্গবাল্মীকি সম্ভোগের মাহাত্ম্য অনুভূতিতে আনিয়া নিজের গানে নিজেই মুগ্ধ হইয়াছেন। দেবদেবীরা মিলিয়া, মাণিক্যে যাহার পাপড়ী, সেই সোনার পারিজাতের মালা গাঁথিয়া বাল্মীকিকে পরাইয়া দিয়াছেন। ইহা কেবল রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য নয়, বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নয়, সমস্ত ভারতবাসীর সৌভাগ্য।

নৈদাঘতাপে সন্তপ্ত না হইলে মলয়-সমীরণের উপভোগে সুখানুভব হয় না; তৃষ্ণাগ্নিপীড়িত কণ্ঠ না হইলে, স্বচ্ছ শীতল সলিলের শৈত্য ও মধুরতার অনুভূতি হয় না; ক্ষুধার জ্বালায় অধীর না হইলে অন্নব্যঞ্জনে তাদৃশী প্রবৃত্তি জন্মে না; "ন বিনা বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।" বিপ্রলম্ভ ভিন্ন সম্ভোগের পুষ্টি হয় না। তাই, বৈষ্ণব কবিদিগের কল্পনা পূর্ব্বরাগে বিরহ, মানে বিরহ, প্রবাসে বিরহের তুফান তুলিয়া সম্ভোগের বারিধারা বর্ষণে ভক্ত-জগৎকে শীতল, মুগ্ধ করিয়াছে।

বিরহ কেবল সম্ভোগের পুষ্টি করে না, বিরহের অতিমাত্র তীব্রতায় ব্যক্তিত্ব, ভেদবুদ্ধি, আত্মসত্তা পর্যান্ত প্রিয়তম বা প্রিয়তমার সত্তায় ডুবিয়া যায়। "অদৃষ্টে বিরহোৎকণ্ঠা দৃষ্টে বিশ্লেষ ভীরুতা" আর থাকে না। আরশুলা যেমন কাঁচপোকা ভাবিতে ভাবিতে কাঁচপোকা হইয়া যায়, বিরহী ধ্যাতা সেইরূপ ধ্যান করিতে করিতে ধ্যেয় হইয়া পড়ে। মহাকবি ভগবান্ বেদব্যাস তাই ভাগবতে বিরহোন্মত্তা গোপীদিগকে কৃষ্ণতন্ময়তালাভ করাইয়া কৃষ্ণলীলার অভিনয় করাইয়াছিলেন। চণ্ডীদাস রাধিকার তন্ময়তা আনিয়াছিলেন,—অভিনয় করান নাই। অবশ্য এই তন্ময়তা নিদিধ্যাসনের অনুকূল মনন মাত্র, বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় ক্ষণিক স্থায়ী হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারে আবার গোপীদিগের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়াছিল। মহর্ষি গোপীদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—এইরূপ মনন করিয়া যাও, নিদিধ্যাসন আসিবে; নিদিধ্যাসনে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবে। তখন কে কাহাকে কাহার দ্বারা দেখিবে? ধ্যান, ধ্যাতা কিছুই থাকিবে না; জ্ঞেয়, জ্ঞান, জ্ঞাতা, কিছুই থাকিবে না; একত্বে সমস্ত দ্বিত্ব ডুবিয়া যাইবে। তখন পূর্ণানন্দ হইবে, সচ্চিদানন্দ হইবে; উপনিষৎ যাহা তারস্বরে বলিয়াছেন, তাহার সম্যগুপলব্ধি হইবে। এইজন্য প্রাচীন গ্রন্থকারেরা বদ্ধাঞ্জলিপুটে বেদান্তাঃ পরমাত্মা তত্ত্বগুরবঃ" বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সম্ভোগাত্মক কবিতা শুনিয়া ইয়ুরোপ বিস্মিত হইয়াছে; আমরা কিন্তু বিস্মিত হয় নাই, তাঁহার বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগাত্মক কবিতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার জুবিলি উৎসবে মিশিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ যেমন ইয়ুরোপে যাইয়া তাহাকে নূতন কথা শুনাইয়াছিলেন, সেইরূপ তাহার নিকট হইতে নূতনতত্ত্ব, ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য শিখিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার গদ্যে পদ্যে সর্ব্বত্র ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া বাহির হইতেছে; সুতরাং তাঁহার পরিণত বয়সের কবিতায়, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদের গানের মত নানাছাঁদে একত্ববাদের ফোয়ারা ছুটিবে; আশা করিতে পারি না।

নারায়ণ, (মাঘ, ১৩২৬।)

(৮)

বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ

[শ্রীনবকুমার কবিরত্ন]

কে ক'রেছে ঠাট্টা তোমায় দিয়ে কবির তক্ত?
বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ চেনা তোমায় শক্ত!
বাংলা ভাষার ওজন তুমি বোঝ তো ছাই ঘণ্টা,
মিথ্যে কেন মাথা বকাও গরম কর মনটা?
রবি-রথের ঘোড়ার খুরেও জন্মে যে সব ছন্দ,
নাই ক্ষমতা বুঝতে তোমার, তাই করো গালমন্দ।
ব্যাকরণের চচ্চড়িতে বুদ্ধি-জাতা পণ্ডা,
উদ্ভুটে শ্লোক বানাও নীরস সাত বুড়ি সাত গণ্ডা,
সংস্কৃতের গণ্ডোপরি বিরাজ কর বিস্ফোটক,
বাংলা ভাষার কেউ তুমি নও, হংস, সারস কিম্বা বক।
ভাব-সাধনার ধার ধার না, ঠাট্টা জান বৃদ্ধ হে!
ধ্যান-রসিকের তপোবনে নাড়ছ গ্রীবা গৃধ্র হে!
শাস্ত্র পুঁথি ফুঁড়ে ফুঁড়ে করলে শুধু কীটপনা
কথার আঁচে টের পেয়েছি পাওনি সুধা এক কণা।
একটা কথা এক্‌শো-বার বুঝিয়ে কত বল্‌ব?
অবোধ মোষের ঘাড় নোয়াতে কত বা ঘি ডল্‌ব?
চতুর্ম্মুখের মুখ ব্যথা হয় ঢেঁকীর সঙ্গে তর্কে
এক মুখে কি বল্‌ব আমি বলদ-ধুরন্ধরকে!
নিমেষে কেউ বোঝে, আবার কেউ বা বছর চল্লিশে।
তারও দ্বিগুণ কাট্‌ল বয়েস, আর বোধোদয় হয় কিসে?

(ভারতী, চৈত্র, ১৩২৬।)

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা—]

ইঙ্গিত পাঠ করিয়া 'ভারতবর্ষে'র মফস্বলবাসী পাঠকগণের মধ্যে অনেকে এমন সব জিনিসের এবং ব্যবসায়ের সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন, যাহা তাঁহারা নিজ-নিজ গৃহে থাকিয়াই তৈয়ার করিয়া ব্যবসায় চালাইতে পারেন। ইহার উত্তর দেওয়া কিছু শক্ত। মফস্বলের সকল স্থলের অবস্থা সমান নহে। কোন্ স্থানে কিরূপ ব্যবসায়ের সুবিধা হইতে পারে, কোন্ কোন্ জিনিষ কোথায় সহজে তৈয়ার করা যাইতে পারে, তাহা স্থানীয় অভিজ্ঞতা ভিন্ন কলিকাতায় বসিয়া-বসিয়া স্থির করা সহজ নহে। তবে, এ বিষয়ে মফস্বলবাসী ভদ্রমহোদয়গণ সাহায্য করিলে কিছু কিছু চেষ্টা করা যাইতে পারে।

মফস্বলে বসিয়া ব্যবসায়ের সুবিধা হইতে পারে এমন জিনিসের প্রথমে সন্ধান লইতে হইবে; অর্থাৎ, যেখানে যাহা পাওয়া যায়, প্রথমে তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে, ঐ সকল জিনিসের মধ্যে কোন্টা এখন কাজে লাগে, কোন্টা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা বাছাই করিতে হইবে। তার পর, শেষোক্ত শ্রেণীর জিনিসগুলি লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে, এবং তাহা হইতে নূতন-নূতন প্রয়োজনীয় জিনিস তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তবে ইহা বহু কাল, পরিশ্রম ও চেষ্টাসাপেক্ষ। আপাততঃ, একটী সুবিধাজনক সংবাদ পাইয়াছি। তাহাই এখন পাঠকগণকে জানাইয়া দিতেছি। 'ইঙ্গিত' পাঠ করিয়া ঢাকা Sabir Cottage হইতে শ্রীযুক্ত K. A Sabir মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই সংবাদটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সেজন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এই সংবাদটী আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। এ সংবাদ পাইয়া আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। বোধ হয় 'ভারতবর্ষে'র বহু পাঠকের নিকটেই ইহা নূতন ঠেকিবে। সুতরাং ইহা ইঙ্গিতের মধ্যে প্রকাশ করায় তাঁহাদেরও উপকার হইতে পারে। শ্রীযুক্ত সবির মহাশয় লিখিয়াছেন—

"মাঘ এবং ফাল্গুন মাসের ভারতবর্ষে "ইঙ্গিত" প্রবন্ধটী পাঠে নিতান্ত আনন্দিত হইলাম। আজ ৪০ বৎসর হবে, জনৈক দিল্লীনিবাসী ভদ্রলোকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, এক প্রকার জঙ্গলা গাছের ডালের দ্বারায় দুগ্ধ ঘুঁটিলে পরিষ্কার চূর্ণে পরিণত হয় (desiccated milk)। তার পর, সেও প্রায় ২৫।৩০ বৎসর হইবে যে, বর্দ্ধমান-নিবাসী এক ভদ্রলোকের মুখেও এই কথা শুনিলাম; এবং তিনি বলিলেন যে, তিনি সেই গাছ জানেন এবং দুগ্ধ চূর্ণ করিতে পারেন। শিখিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল এবং সাধ হইল; কিন্তু তিনি না কি কোন সাধু সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বহু কষ্টে শিক্ষা করিয়াছেন বলিয়া আমাকে বলিলেন না। ক্রমান্বয় অর্থাৎ ১৮৯০ সাল হইতে ১৯০৯ সন পর্য্যন্ত যখনি বন্ধুবরের দর্শন পাইয়াছি, অনুনয়-বিনয় করিতে আর ত্রুটি করি নাই; কিন্তু কোন ফল হইল না। কিন্তু বিধাতার কৃপায় ১৯১৩ সনে আমি আলিগড়ে গিয়াছিলাম। সেইখানে ইহা জানিতে পারিলাম। জনৈক Graduate এবং England-returned gentleman ইহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এই গাছ সর্ব্বত্রই জঙ্গলে জন্মে। ইহাকে আলিগড়ে এবং এখানে সহরেও "কাংঘেরা" "কাঞ্জির" গাছ বলে। গাছ বেশী বড় হয় না। ছোট পাতা, ফুল এবং গোল গোল পোটার মত (যেমন স্ত্রীলোকদের কর্ণের অলঙ্কার ঝুমকা হয়) ফল হয়। তাহারি ৪।৫টী ডাল, যাহা বেতের মত—বেশী মোটা হয় না, ২।২॥ ফীট লম্বা—পরিমাণ লইয়া, বেশ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া,—কাঁচা দুগ্ধ উননে দিয়া, তদ্দ্বারা ঘণ্টা খানিক ঘুঁটিলেই, প্রথম ঘনো হওয়া আরম্ভ হয়; শেষে ময়দার মত চূর্ণে পরিণত হয়। ইহাতে আস্বাদের পরিবর্ত্তন, কি কোন প্রকারের গন্ধ বা গুণের পরিবর্ত্তন হয় না। আমি বহুবার প্রস্তুত করিয়াছি এবং নিজে ও আত্মীয় পরিবারবর্গসহ অনেক প্রকারে, পায়স, পুডিং এবং চায়ের সহিত ব্যবহার করিয়াছি। গরম জলে ঘুলিয়া শিশু সন্তানদেরও নির্ব্বিঘ্নে দেওয়া যায়। যত্নে bottleএ পুরিয়া রাখিলে অনেক দিন ভাল থাকে।"

সুচতুর পাঠকগণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন, ইহা কতখানি প্রয়োজনীয় সংবাদ। যেখানে দুগ্ধ সুলভ, সেখানে এই উপায়ে দুগ্ধ চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া স্বচ্ছন্দে ইহার ব্যবসায় চালানো যাইতে পারে। এই দুগ্ধ চূর্ণ, কনডেন্সড মিল্কের (Condensed milk)-এর মত বিদেশ হইতে আমদানী হয়; এবং milk powder নামে খুব বিক্রীতও হয়। কারণ, ইহার সুবিধা অনেক। সময়ে অসময়ে যাঁহাদের চা খাওয়ার অভ্যাস আছে, তাঁহারা ত ইহার খুবই আদর করেন। অসময়ে, যখন টাটকা দুধ পাইবার উপায় থাকে না, তখন চা খাইবার ইচ্ছা হইলে, এই দুধ খুব কাজে লাগে। ভ্রমণকারীদের পক্ষেও ইহা খুব দরকারী জিনিস; বহিতে কষ্ট নাই অথচ যখন-তখনই ব্যবহার করা চলে। সুতরাং ইহার ব্যবসায় বেশ চলিতে পারে। গুঁড়া দুধ বা milk powder-এর ব্যবসায় করিতে হইলে প্রথম হইতেই প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে নামিতে হইবে। সেই জন্য ইহাতে একটু আড়ম্বর দরকার হইতে পারে। টিনের কৌটা বা কাঁচের শিশি,—যে কোন আধারে ইহা রক্ষিত হইবে, তাহা এবং তাহার লেবেল (label) প্রভৃতি খুব সুদৃশ্য হওয়া চাই। সেইটাই যেন ইহার প্রধান আকর্ষণ হয়। আর রীতিমত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইবে। আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ীদের একটা মস্ত দোষ এই যে, তাঁহারা ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের মূল্য ভাল বোঝেন না; মনে করেন, উহা অপব্যয়, কিম্বা অনাবশ্যক ব্যয়। ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা—সে অনেক কথা; আর একবার বিশদভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে: সেই জন্য এখন কেবল এ সম্বন্ধে একটুখানি ইঙ্গিত করিয়াই নিরস্ত হইলাম।

গালা-বাতি একটা সহজ শিল্প। আপিস-আদালতে ইহার ব্যবহার বিস্তর। শিশি বা বোতলে যে সকল দ্রব্য বিক্রীত হয়, ঐ সকল শিশি-বোতলের ছিপির উপর গালা-বাতি লাগাইয়া তাহাতে শিলমোহরাঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়। এই জিনিসটি এদেশে কেহ-কেহ তৈয়ারি করিতেছেন। আরও অনেকে করিতে পারেন। ইহার recipe এই—

রজন, পিচ, ও ভূষা বা আইভরি ব্লাক সমান ভাগে লইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হইবে। গলিয়া গেলে উত্তমরূপে নাড়িয়া মিশাইয়া লইতে হইবে। তার পর নরম থাকিতে-থাকিতে উহাকে বাতির আকারে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। বাতির আকারে না করিয়া চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ যে কোন আকারেই করা যাইতে পারে। পিচ জিনিসটি আলকাতরার কঠিন অংশ। পিচ কঠিন বটে কিন্তু খুব কঠিন নয়। সেইজন্য উহার সহিত রজন মিশাইয়া কঠিনতর করিয়া লইতে হয়। কঠিন হইলে ব্যবহারের সুবিধা হয়। গলাইয়া ব্যবহারের পর উহা ঠাণ্ডা হইয়া কঠিন হইয়া যায়। পিচ খুব কালো জিনিস; কিন্তু রজন তেমন কালো নয়। সেই জন্য ঐ দুই দ্রব্যের মিশ্রণে যে জিনিসটি হয়, তাহা ততটা কালো হয় না। তাই ভূষা বা আইভরি ব্লাক মিশাইয়া কালো রংটা ঘন করিয়া লওয়া দরকার হয়। না মিশাইলেও কোন ক্ষতি নাই,—কেবল রংটা একটু ফিকে হয় মাত্র। এইটী সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা লা-বাতি। কিন্তু ইহার ব্যবহার মোটামুটি রকম। কালীর দোয়াত, বোতল প্রভৃতি কম সৌখিন জিনিসে এই বাতি ব্যবহার করা হয়। রেলেও ইহার প্রচুর ব্যবহার আছে। কেহ কোন রেল কোম্পানীর সহিত চুক্তি করিয়া এই বাতি সরবরাহের জন্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে, একটী ছোট-খাট কারখানা বেশ চলিতে পারে। কিন্তু ইহার দ্বারা সৌখিন কাজ চলে না। আদালতের দলিলপত্র, পোষ্ট-আফিসের রেজিষ্ট্রি-করা বা বীমা-করা পার্শেল প্রভৃতিতে যে লা-বাতি ব্যবহৃত হয়, তাহা আলাদা এবং দামী জিনিস। তন্মধ্যে দুই একটীর উপকরণ এবং ভাগ;—রজন ১৩ ভাগ, মোম ১ ভাগ, মেটে সিঁদুর ৩ ভাগ। অথবা, গালা ৩ ভাগ, তার্পিণ ২ ভাগ, চীনের সিঁদুর, অভাবে মেটে সিঁদুর ৩ ভাগ। কিম্বা রজন ৬ ভাগ, পাতগালা ২ ভাগ, তার্পিণ ২ ভাগ, কোন রং ৩ কি ৪ ভাগ। ইহা হইল মোটামুটি ভাগ। সিঁদুরের বদলে অন্য রং, যথা, সবুজ, নীল, পীত, সোণালী প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়। সে সকল অভিজ্ঞতার দ্বারা স্থির করিয়া লইতে হয়। এই জিনিসটী তৈয়ার করিতে একটু সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। অসাবধান হইলে জ্বলিয়া উঠিতে পারে। তাপ যত কম হয় ততই ভাল। কেবল গলাইয়া লওয়া তাপের কার্য্য। কাঠ-কয়লার আগুনেই কাজ চলিতে পারে। প্রথমে রজন, গালা ইত্যাদি গলাইয়া লইয়া তাহাতে তার্পিণ যোগ করিতে হয়। তার পর রং। মালে ভারী করিবার জন্য অল্প পরিমাণে মিহি চূর্ণ চাখড়ি যোগ করা চলে। নরম থাকিতে

থাকিতে ছাঁচে ঢালিয়া লইলে হয়। ইট তৈয়ারী করিবার ফর্ম্মা যেরূপ, গালা-বাতির ছাঁচও সেই ভাবের। প্রস্তুত-কারকের নাম বা ট্রেড মার্কা অঙ্কিত করিতে হইলে ছাঁচেই উল্টা করিয়া তাহা খোদাই করিয়া লইতে হয়। ছাঁচ সাধারণতঃ পিতলের হইয়া থাকে; দুইচারবার পরীক্ষা করিলেই ইহার হাড়হদ্দ সমস্ত বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

শঠি নামক একটি পদার্থের সহিত বোধ হয় 'ভারতবর্ষে'র অনেক পাঠকই পরিচিত আছেন। এই শঠির বয়স বেশী নয়; ২০।২৫ বৎসরের বেশী হইবে না। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইহা বেশ একটা ব্যবসায়ের জিনিস হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা ইহার ব্যবসায় করিতেছেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ ইহা হইতে কিছু-কিছু লাভও পাইয়া থাকেন। অথচ ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা বন্য জঙ্গল বলিয়াই উপেক্ষিত হইত। ইহা যে কোন দিন লাভজনক পণ্যে পরিণত হইতে পারে, এমন কল্পনাও বোধ হয় তখন কেহ করেন নাই। বাঙ্গলার বন জঙ্গলে এই শঠির মত আরও কত জিনিষ যে উপেক্ষিত না হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? খুঁজিলে কোন না আরও দুইচারিটা ঐ রকম জিনিস বাহির হইতে পারে? মফস্বলে যাঁহারা ঘরে বসিয়া কিছু কিছু কাজ করিতে চাহেন, তাঁহারা একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখুন না?

শঠি, সাগু, এরারুট, প্রভৃতি একই (শ্বেতসার, starch) জাতীয় পদার্থ। ময়দা, আলু প্রভৃতিরও শ্বেতসার অন্যতম প্রধান উপাদান। কোন নূতন, অজ্ঞাত-পরিচয় উদ্ভিজ্জে এই শ্বেতসার আছে কিনা, তাহা স্থির করিতে হইলে শ্বেতসার কিরূপে বাহির করিতে হয়, তাহা জানা দরকার। এখানে তাহা বলিয়া দিতেছি।

আধসের আন্দাজ ময়দা লইয়া খানিকটা ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া একটি পুঁটুলী করুন। অথবা কচি ছেলেদের মাথার কিম্বা পাশ-বালিসের একটা অড় হইলেও চলিবে। এই অড়ের এক-মুখ খোলা, ও এক মুখ বন্ধ হইবে। এটী থলির মত দেখিতে হইবে। ময়দাগুলি ইহার ভিতরে পুরিয়া থলির খোলা মুখটি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলুন। পরে ঐ থলির উপর-দিকটা একটা রুল; কিম্বা একটা ছড়ি, অথবা বাঁখারির মাঝখানে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিন। সেই দণ্ডটি একটি টবের উপর আড়া-আড়ি ভাবে রাখুন; যেন থলিটি টবের ভিতর ঝুলিয়া থাকে, কিন্তু তলা স্পর্শ না করে,—থলির প্রান্ত যেন টবের তলা হইতে ৮।১০ অঙ্গুলি উপরে থাকে। পরে ঐ টবটি জলে পূর্ণ করিয়া থলিটী দুই হাতে ময়দা মাখার মত মর্দ্দন করিতে থাকুন। দুই-এক মিনিট পরে দেখিবেন, থলির ভিতর হইতে একটি সাদা জিনিস বাহির হইতেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাদা জিনিসটি বাহির হইতে থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত থলিটীকে মর্দ্দন করিতে হইবে। যখন সাদা পদার্থ বাহির হওয়া বন্ধ হইবে, তখন থলিটীকে জল হইতে উঠাইয়া লউন। টবের জল কিছুক্ষণ স্থির ভাবে থাকিলে সাদা জিনিসটি তলায় থিতাইয়া পড়িবে। তখন আস্তে-আস্তে উপরের পরিষ্কার জল ফেলিয়া দিয়া সাদা জিনিসটিকে শুকাইয়া লইলেই উহা শ্বেতসার বা starch হইল। আর থলির মুখ খুলিয়া উল্টাইয়া লইলে যে পদার্থটি বাহির হইবে, উহা একটি ঘন আঠাবৎ পদার্থ। উহার নাম গ্লুটেন gluten।

শ্বেতসার অনেক কাজে লাগে। উহা খুব লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর খাদ্য। হোলি খেলায় ফাগ বা আবীর এই শ্বেতসারের সহিত রং মিশাইয়া প্রস্তুত করা হয়। দপ্তরীরা যে নানা রঙ্গের 'কাপড়' দিয়া বই বাঁধে, তাহা এই শ্বেতসার ও রং সংযোগে প্রস্তুত হয়। সুতরাং নূতন নূতন উদ্ভিজ্জ হইতে শ্বেতসার বাহির করিতে পারিলে, তাহা ব্যর্থ হইবে না। কোন অজ্ঞাত-পরিচয় উদ্ভিজ্জ হইতে শ্বেতসার বাহির করিয়া প্রথমেই তাহা খাদ্যরূপে ব্যবহার করা উচিত নহে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা উহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া উহাকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করিবার অনুমতি না দিলে যেন উহা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত না হয়। কিন্তু অপর দুইটি কাজে উহা স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পল্লীগ্রামের অবস্থা আমি ভাল জানি না। সেইজন্য কোন্ কোন্ গাছ হইতে শ্বেতসার পাওয়া যাইতে পারে, তাহা বলিতে পারিলাম না। অনুমানে দুই একটি জিনিসের নাম করিতেছি—খাম-আলু, চুপড়ী-আলু, বুনো-ওল, বুনো-কচু প্রভৃতি পরীক্ষা করা যাইতে পারে। পচা গোল-আলু হইতে যদি শ্বেতসার পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনেক লোকসান নিবারিত হইতে পারে।

পুস্তক-পরিচয়

শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীতারকচন্দ্র রায় প্রণীত, মূল্য ১৷০।

এই পুস্তকে গ্রন্থকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনী সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। উপক্রমণিকায় তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অতি বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন এবং মূলগ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে সেই তত্ত্বের কেমন সুন্দরভাবে বিকাশ হইয়াছিল, তাহাই দেখাইয়াছেন। উপক্রমণিকায় যে নিগূঢ় সত্যের উল্লেখ করিয়াছেন শ্রীচৈতন্যের জীবনী বর্ণনা করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তার্কিক নিমাই পণ্ডিতের হৃদয়ে ভক্তির বিমল রশ্মি প্রবেশ করিয়া কিরূপে তাঁহার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেয়; জ্ঞান-গর্ব্বোন্নত নিমাই পণ্ডিতের মস্তক কিরূপে ভক্তিভরে অবনত হইয়া পড়ে, কিরূপে সুব্রাহ্মণ সদ্বংশজাত নিমাই পণ্ডিত জাতিভেদের দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিয়া আচণ্ডাল সকলকেই প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করেন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, তাঁহাকে সম্ভোগ করিয়া, তাঁহার যে বিপুল আনন্দ হইত, তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ যে আনন্দের বেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া কিরূপে সংজ্ঞাচ্যুত হইয়া পড়িত; পক্ষান্তরে কিরূপে তাঁহার দেহ ভগবদ্বিরহজনিত দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া বিকল হইয়া পড়িত; কিরূপে এই নবীন সন্ন্যাসী বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতের মোহ অপসারিত করিয়া ভক্তিপীযূষ-ধারায় তাঁহাদের হৃদয় পবিত্র করিয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহার হৃদকন্দর-নিঃসৃত প্রেমমন্দাকিনী-ধারা উত্তরভারত হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল গ্রন্থকার অতি সুকৌশলে প্রাঞ্জল ভাষায় তাহা বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত এই পুণ্যকাহিনী পাঠ করিতে করিতে পাঠকের কোথাও ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না, প্রেমের বন্যায় আত্মহারা হইয়া ভাসিতে ভাসিতে তিনিও সেই প্রেম-পয়োনিধির দিকে অগ্রসর হইবেন।

ছবি

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য আট আনা।

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার অষ্টচত্বারিংশ গ্রন্থ। লেখক বঙ্গের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক, সর্ব্বজন-পরিচিত শরৎচন্দ্র; বইয়ের নাম ছবি। শব্দ চিত্র-অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত লেখক মহাশয়ের অতুলনীয় তুলিকাপাতে যে 'ছবি' অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা যে সকলেরই মনোরম হইবে, এ কথা আজকার দিনে না বলিলেও চলে। আমরা 'ছবি'র কোনও পরিচয়ই দিব না; পাঠকগণ পূর্ব্বেও শরৎচন্দ্রের অনেক ছবির পরিচয় পাইয়াছেন, এখানিতেও সেই পাকা হাতের পরিচয় পাইবেন। আট আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার মধ্যে এই ছবি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে ইহা নিশ্চিত।

মনোরমা

শ্রীমতী সরসীবালা বসু প্রণীত, মূল্য আট আনা

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের আট-আনা গ্রন্থমালার ঊনপঞ্চাশৎ গ্রন্থ। লেখিকা মহাশয়া বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিতা নহেন, তাঁহার কয়েকটী ছোট গল্প 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে। এই 'মনোরমা' বোধ হয় তাঁহার প্রথম উপন্যাস, কিন্তু প্রথম হইলেও তিনি পারিবারিক চিত্র অঙ্কনে যে যোগ্যতা, যে লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আশা হয়, তাঁহার ক্ষমতা কম নহে। আমরা এই 'মনোরমা' পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি, এবং যাঁহারা এই ক্ষুদ্র উপন্যাসখানি পাঠ করিবেন, তাঁহারাই আমাদের ন্যায় এই উপন্যাস-লেখিকার প্রশংসা করিবেন।

কবিকথা (দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীনিখিলনাথ রায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় এক নূতন কাজে হাত দিয়াছেন। তিনি ইতিহাস চর্চ্চা করিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এখন তিনি সংস্কৃত নাট্যাবলীর আখ্যায়িকা সরল বাঙ্গালায় লিখিয়া প্রকাশিত করিতেছেন। তিনি 'কবিকথা' প্রথম খণ্ডে কালিদাস ও ভবভূতির নাটকাবলীর মূল ঘটনা অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; সেখানি পাঠক সমাজে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে। এক্ষণে 'কবিকথার' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে মহাকবি ভাসের নাটকাবলীর সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা মূল সংস্কৃতে উক্ত নাটকাবলী পড়িবার অবকাশ পাইবেন না এবং যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে মহাকবির ও তাঁহার নাটকাবলীর পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। নিখিলবাবুর ন্যায় প্রাচীন সাহিত্যিকের রচনা-ভঙ্গী ও বর্ণনার প্রশংসা আর নূতন করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে হইবে না। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ অতি সুন্দর, অনেকগুলি বহুবর্ণ ও একবর্ণ চিত্রও এই পুস্তকে আছে, অথচ এই ৫১৬ পৃষ্ঠার বইখানির মূল্য তিনি অতি সামান্য অর্থাৎ দুইটাকা করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকসমাজ নিশ্চয়ই এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন।

বিয়ের কনে

শ্রীব্রজমোহন দাস প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা।

অল্পদিনের মধ্যেই এই গল্প-পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, পুস্তকখানি বিশেষ আদৃত হইয়াছে। ইহাতে, বিয়ের কনে, কিরণের মা, ছোট আঞ্জ,

প্রভৃতি কয়েকটী ছোট গল্প আছে। গল্পগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। লেখা বেশ ঝরঝরে; বর্ণনা কৌশল এবং ঘটনা-সংস্থানও ভাল। আমরা এই গল্প লেখকের প্রশংসা করিতেছি এবং তিনি যে একজন ভাল গল্প লেখক হইবেন, তাহার পরিচয় এই পুস্তকে পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

স্মৃতি-মন্দির

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা

এখানি উপন্যাস। গ্রন্থকার উপন্যাস ক্ষেত্রে এই প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল, সেইজন্য তাঁহার এই পুস্তকে স্থানে স্থানে বর্ণনা একটু দীর্ঘ হইয়াছে কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার রচনা-কৌশল প্রশংসনীয়। উপন্যাসখানির আখ্যায়িকাভাগ সুবিন্যস্ত; কয়েকটী চিত্রও বেশ অঙ্কিত হইয়াছে। প্রথম চেষ্টা জন্য স্থানে স্থানে যে বর্ণনা-বাহুল্য আছে, তাহা ধর্ত্তব্য নহে। আমরা এই নবীন গ্রন্থকারকে উৎসাহ প্রদান করিতেছি; তাঁহার পুস্তকখানি মোটের উপর ভালই হইয়াছে। পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই বেশ হইয়াছে।

মহাবীর গারফীল্ড

শ্রীউমাপদ রায় সঙ্কলিত, মূল্য সাধারণ সংস্করণ ৸৵০, রাজ সংস্করণ ১।০।

মহাবীর গারফীল্ডের জীবন-কথা অপূর্ব্ব, শুধু অপূর্ব্ব নহে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। শ্রীযুক্ত উমাপদ রায় মহাশয় এই মহাবীরের জীবন কথা আমাদের দেশের বালক বালিকাগণের অধিগম্য করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বাঙ্গালার শিক্ষা-বিভাগ এই সুন্দর পুস্তকখানিকে বালকদিগের পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচিত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই শ্রেণীর পুস্তক যত অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গলের কথা। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি।

বেদ-সাহিত্যে অদ্বৈতবাদ

শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী প্রণীত, মূল্য এক টাকা

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত সাহিত্যরথী বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের স্মৃতি-প্রবাহ সংরক্ষণ কল্পে 'বেদ সাহিত্যে অদ্বৈতবাদ' সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে পুরস্কার দিবেন ঘোষণা করেন। প্রভুপাদ শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী মহাশয় সেই পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি সেই প্রবন্ধ। বিষয় যেমন গুরুতর, লেখক মহাশয়ও তেমনই উপযুক্ত; সুতরাং এই পুস্তকখানি যে পরম উপাদেয় হইয়াছে, সে কথা না বলিলেও চলে। পূজ্যপাদ লেখক মহাশয় অতি সুন্দর ভাবে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, সবিশেষাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে সবিস্তার ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই; কিন্তু আমাদের মনে হয়, ঐগুলির আলোচনা করিলে আমাদের ন্যায় লোকের পক্ষে অদ্বৈতবাদ বুঝিবার আরও সুবিধা হইত। সে যাহাই হউক, আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বড়ই উপকৃত হইয়াছি। আশা করি গোস্বামী মহাশয় অতঃপর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়া আমাদের ক্ষোভ নিবৃত্তি করিবেন।

জ্যোতিষ-যোগতত্ত্ব

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা

শ্রীযুত বিদ্যারত্ন মহাশয় বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই উপাদেয় গ্রন্থখানি সংকলন করিয়াছেন। ইহাতে জ্যোতিষ সম্বন্ধে তত্ত্বগুলি এমন সুন্দর ভাবে সজ্জিত হইয়াছে যে, যাহারা জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহারাও অনায়াসে এই পুস্তকের সাহায্যে জ্যোতিষ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, 'সকল বাঙ্গালীর পক্ষেই এই উপাদেয় গ্রন্থখানি বাটীতে রাখা আবশ্যক মনে করি।' আমরাও সেই কথা বলিতেছি।

বৃন্দাবন কথা

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত বিরচিত, মূল্য আড়াই টাকা মাত্র

শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় বহুদিন হইতে মাসিক-পত্রাদিতে বঙ্গ-কাহিনী বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার লিখিত কয়েকটী সচিত্র প্রবন্ধ আমরা 'মানসী' ও মর্ম্মবাণীতে পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছি। এক্ষণে সেই প্রবন্ধগুলির সহিত আরও অনেক নূতন তথ্য সংযোজিত করিয়া তিনি এই বৃন্দাবন কথা প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীধাম বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তবে আমাদের মনে হয় যে, বৃন্দাবনের সহিত মথুরা এমন ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত যে, মথুরার কথা বিস্তৃতভাবে না বলিলে বৃন্দাবন-কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। লেখক মহাশয়ও সে কথা বুঝিয়াছেন। ভরসা করি, ভবিষ্যতে তিনি সে অভাবও পূর্ণ করিবেন। গ্রন্থখানিতে অনেকগুলি ছবি আছে, আর বর্ণনা কৌশল—একজন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাজ্জ্বল্যমান।

ত্রিরাত্রি

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য এক টাকা চারি আনা

'ত্রিরাত্রি' কয়েকখানি পত্রের সমষ্টি। লেখকমহাশয় এই পত্র কয়খানির মধ্য দিয়া রূপমুগ্ধ এক যুবকের পতন ও উত্থানের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; শুধু যুবক নহে, এক নবীনা যুবতীর মোহ ও তাহার অবসানের করুণ কাহিনীও অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ঘটনার কোন বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু লেখকমহাশয়ের লিপি-

কুশলতা পাঠককে একেবারে তন্ময় করিয়া ফেলে। অতি সুন্দর, অতি মনোরম, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাষা। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণও অতি সুন্দর! আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা।

কবি বসন্তকুমার একটা কাজের মত কাজ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাবুর মহাশয়ের জীবন-কথায় বিগত ৬০।৬৫ বৎসরের সমাজ ও সাহিত্যের একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। বসন্তকুমার শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃ বাবুর নিকট হইতে জোর করিয়া সেই ইতিহাস আদায় করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র বাবু এখন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; তাহার পর তিনি যে প্রকৃতির মানুষ, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে কথা বাহির করা বড় সহজ নহে। এই জীবন-স্মৃতিতেও তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি মোটামুটি কথাগুলি যেন-তেন প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। এই জীবন-স্মৃতি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, আরও কত কথা তিনি বলেন নাই, কারণ তিনি সর্ব্বদাই আত্ম-প্রকাশে নিতান্ত কুণ্ঠিত। আমাদের মনে হয়, লেখক বসন্তকুমার এই পুস্তকে যদি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতৃত্রয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ও ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর স্মৃতি গ্রথিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, অকৃত্রিম সাহিত্যসেবী ও কলাবিদের জীবন-কথা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইত।

অভিমান

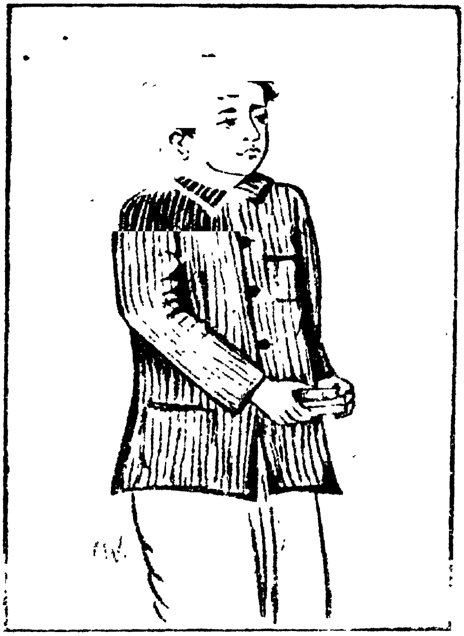
[শ্রীগুরুদাস হালদার]

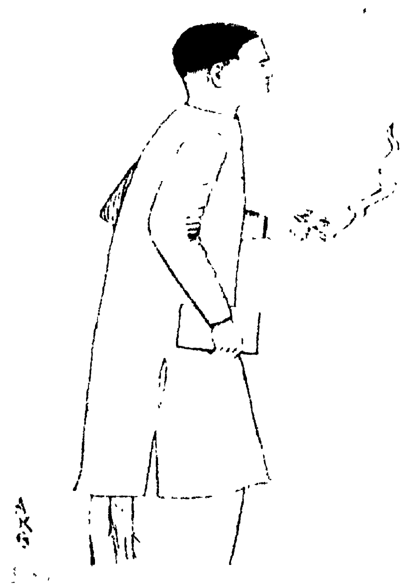
হৃদয়-মাঝারে বাসিব হে ভাল
এ জীবনে ধরা দিব না।
আছি সখা শুধু দরশ-পিয়াসে
হিয়ার পরশ চাহি না॥
উছলে আলোক ধরণী অঙ্গে,
হাসিছে প্রকৃতি নবীন রঙ্গে,
সঙ্গের সাথী অঙ্গনা পেয়ে
ভুলেছে বিরহ-যাতনা।
আমার বিরহ
বড়ই দুঃসহ
সে যাতনা কিবা যাবে না?
ফাগুন আকুল নবীন ছন্দে,
হৃদয় ব্যাকুল কুসুম গন্ধে,
গুঞ্জিছে অলি, মুঞ্জিছে তরু,
মলয় করিছে ছলনা।
তাকে ভয় পাই
'পাছে ভুলে যাই';—
ডেকে নাও সখা, নাও না!!
বুঝেছি নিঠুর, এ তব যুক্তি—
কাড়িয়ে নেবে বা এ মম ভক্তি;
মুক্তির পথ ভক্তের তব
কিছুতে খুলিতে দেব না;—
ধরণী সাজায়ে
শোভায় ভুলায়ে
দিতেছ, করিছ ছলনা!
এতই নিঠুর হৃদয়-চন্দে
কে নেবে হৃদয়ে প্রীতির ছন্দে?—
স্পন্দিত হৃদি চূর্ণি ফেলিব
আর ভালবাসা দিব না।
অভিমান-ভরে
নেব মুখ ফিরে—
স্বপনেতে আর এস না!!
ত্যজিব যখন এ ভব-কুঞ্জ
হেরিব শুধুই আলোক-পুঞ্জ;
সঞ্চিত প্রীতি অঞ্জলি পূরি'
সেথা সখা আমি লব না!
ভকতি-কোমল
চারু শতদল
ও চরণে তব দিব না॥

——

রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ]







সদ্য বিবাহিত



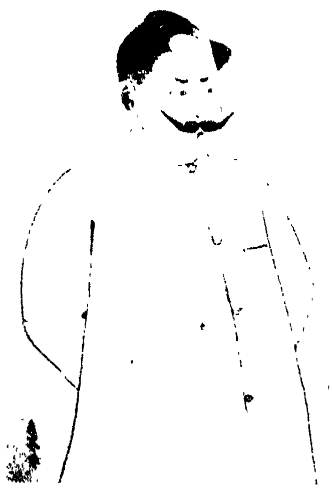
কাব্যি-ফেসান



[illegible]



Beg your pardon



Don't care



ডেড-নট

কৃষকের জীবন-নাট্য*

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]



প্রথম দৃশ্য।—"স্বচ্ছলতায়"

কৃষক-দম্পতীর বর্ত্তমান অবস্থা বেশ সুখে-শান্তিতেই কাটিয়া যাইতেছে; কিন্তু প্রতিবেশীদের ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত। তাই সে তামাক সেবন করিতে করিতে স্ত্রীকে বলিতেছে, "আহা! নিতাইদের ভারি কষ্টে দিন যাচ্ছে—একরকম না খেয়েই তাদের দিন কাটাতে হয়। প্রভুর দয়ায় ঘরে যখন চাষের কিছু ধান আছে, তখন এগুলি তাদের বিলিয়ে দাও চোখের উপর এত কষ্ট কি দেখা যায়! আর বলে দিও, তাদের যখনই যা দরকার হবে, তখনই আমাদের কাছে আসতে যেন কোন রকম সরম না করে।"

* খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই জীবন-নাট্যের প্রত্যেক দৃশ্যেই স্বয়ং স্ত্রী ও পুরুষ উভয় ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছেন। আলোকচিত্রগুলি 'আনন্দ ভাণ্ডার' তুলিয়াছিলেন।



অনটনে

দ্বিতীয় দৃশ্য।—"অনটনে"

কালের পরিবর্ত্তনে এই কৃষকপরিবারেই দুর্ভিক্ষের ভীষণ উৎপীড়ন উপস্থিত হইয়াছে। গৃহে যা কিছু তৈজস-পত্র ছিল, অভাবের তাড়নায় একে একে সকলই বিক্রী করিয়াছে, তবুও অন্নবস্ত্রের অভাবে প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহাদিগকে নিষ্পেষিত হইতে হইতেছে। স্ত্রী একটী শত-ছিন্ন চট্ পরিধান করিয়া কোন রকমে লজ্জা নিবা: করিতেছে, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছে না। তথাপি স্বামীর অন্নক্লিষ্ট মুখের দি- চাহিয়া নিজের সব ভুলিয়া গেল; তাই, হাঁড়িতে যা কি যৎসামান্য অন্ন ছিল, তা আজ স্বামীকেই সব কুড়াই- দিতেছে এবং স্বামীও তদ্দ্বারা কোন রকমে জঠরজ্বা- নিবারণ করিতেছে।



দুর্ভিক্ষের দৃশ্য

তৃতীয় দৃশ্য।—"দুর্ভিক্ষের দৃশ্য"

স্ত্রী এতদিন পর্য্যন্ত যাহা কিছু অদৃষ্টে জুটিয়াছে তাহা দ্বারাই কোনও প্রকারে প্রাণধারণ করিয়াছে; নিজে অনশনে থাকিয়াও স্বামীকে রক্ষা করিয়াছে;—কিন্তু আর পারিতেছে না, পেটের জ্বালায় লতাপাতা ও নানাপ্রকার অখাদ্য দ্বারা এতদিন ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা পাইয়াছে, কিন্তু অন্নাভাবে এখন বাক্য রোধ হইয়া গিয়াছে, উঠিয়া চলিবার শক্তি নাই, পেটে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। তাই শরীরটাকে একেবারে মাটিতে বিছাইয়া দিয়া ঘাস ছিঁড়িয়া খাইতেছে।



মৃত্যু-শয্যায়

চতুর্থ দৃশ্য।—"মৃত্যুশয্যায়"

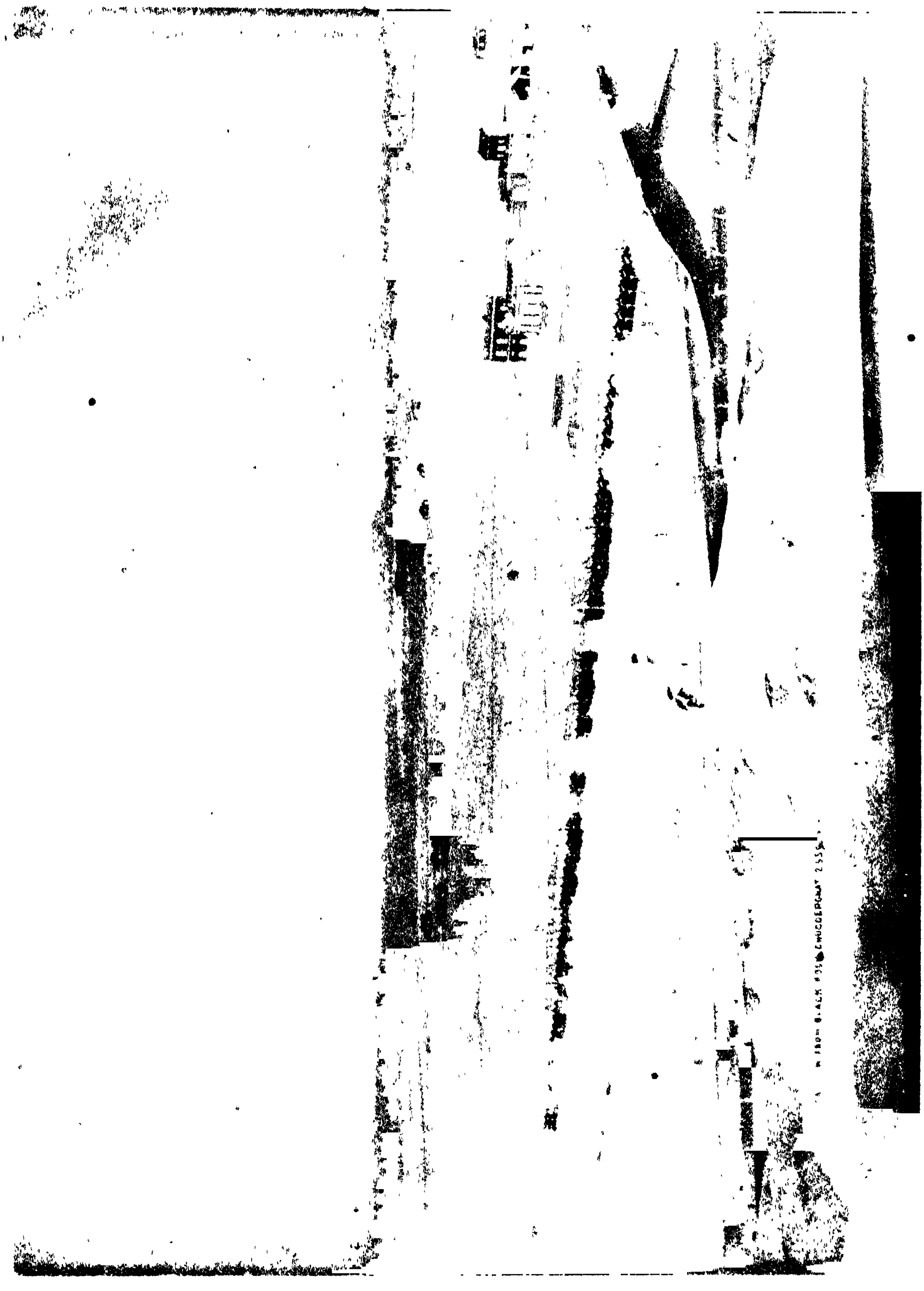
অবশেষে স্ত্রীর মৃত্যুকাল উপস্থিত। স্বামী যে এই অবস্থায় কি করিবে বা করিতে পারে, তাহা কিছুই ভাবিয়া পাইতেছে না। একে অন্নাভাবে দেহ অবসন্ন, তার উপর আবার এই ভীষণ দৃশ্য—সমস্ত আকাশটা তাহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। "হা ভগবান্ এই কি তোমার দয়া—মানুষকে এত কষ্ট দিয়ে তোমার কি লাভ! না! আর সহ্য হয় না, আমিও ঐ পথেই যাব, "এই বলিয়া কৃষক স্বহস্তে নিজের গলা টিপিয়া ধরিয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে।



উদ্বন্ধনে

পঞ্চম দৃশ্য।—"উদ্বন্ধনে"

অভাগিনী স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে ; শোকে, দুঃখে অবসাদে, হতভাগ্য স্বামী একেবারে উন্মত্তপ্রায় ; উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া চির-শান্তিময় দেশে চলিয়া গিয়াছে— 'গিয়াছে' যে দেশে দুঃখ নাই, দারিদ্র্য নাই, অত্যাচার নাই, অবিচার নাই।



মান্দ্রাজ সদর-ঘাট হইতে কৃষ্ণ পাহাড়ের দৃশ্য

হার-জিৎ

(রঙ্গ-চিত্র।)

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু]

(১)

রূপচাঁদ চাকীর দ্বিতীয় পক্ষ পুঁটি যখন একরাশ খাড়া লইয়া চিবাইয়া-চিবাইয়া ছোবড়ার আকারে পরিণত করিতেছিল, চাকী তখন সসম্ভ্রম-বিস্ময়ে ভাবিতেছিলেন, সেই ছোঁবড়াগুলোকে রৌদ্রে শুকাইয়া উনান্ ধরাইবার কাজে লাগাইতে পারা যায় কি না? কিন্তু কি আশ্চর্য্য চর্ব্বণ-শক্তি! চাকীর জিহ্বা'টা অজ্ঞাতসারে একবার তাঁহার মসৃণ মাড়ি দুইটার উপর দিয়া চলাফেরা করিয়া আসিল। চাকী একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন,—একটাও নাই! দুটা মাড়িই মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে! অথচ বয়স তাঁহার পঞ্চাশের বেশী নয়! চল্লিশ না পার হইতে গাল দুইটা এমন তুবড়াইয়া গেল যে, ক্ষৌরকার্য্য করিতে রক্তা রক্তি হয়। রূপচাঁদ সেই তোব্ড়ান ঢাকিবার নিমিত্ত শ্মশ্রু গজাইলেন, এবং শ্মশ্রু রাখিবার কারণ ঢাকিবার নিমিত্ত মাথায় কেশ রাখিলেন; আর অন্তরের আসল কথাটা ঢাকিবার উদ্দেশ্যে বাবা তারকনাথের দোহাই পাড়িলেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। এক অলক্ষ্য কৌতুকী তাঁহার কালো চুলের উপর চূণকাম করিয়া দিল। রূপচাঁদের আনাভি বিলম্বিত শ্মশ্রু ও কেশরের স্থায় তুষার-ধবল কেশভার দেখিয়া পাড়ার প্রবীণগণ তাঁহাকে নিখরচায় উপাধি দিলেন—ঋষি; কিন্তু উপাধি শুনিয়া ঋষির সহধর্ম্মিণী পুঁটি এমন হাসিয়া উঠিল যে, আজও পর্য্যন্ত রূপচাঁদ তাহা ভুলিতে পারেন নাই। পুঁটিকে ঘরে আনিয়া রূপচাঁদ বুঝিয়াছিলেন যে, আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে অচিরাৎ তাঁহাকে উদ্বাস্ত হইতে হইবে। পুঁটি-মাছের মত এক ফোঁটা পুঁটি গোটা একটি শক্তিশেল! সে যে শুধু স্বামীর দেহার্দ্ধ ভাগিনী হইতে আসিয়াছে, তাহা নহে; পুরাদস্তর তাহার সরিক্, যেন যৌথ-কারবারের অংশীদার—লাভের-ভাগ কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে চায়। রূপচাঁদ নিজের জন্ত যখন বস্ত্র কিনিয়া আনেন, সেই সঙ্গে স্ত্রীর জন্ত এক জোড়া না আনিলে সে বস্ত্র আর তাঁহার অঙ্গে উঠে না; কখন কিরূপে উধাও হইয়া যায়, অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও তাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম। রূপচাঁদের বাতিকের ধাত, নিত্য একটু মিছরির পানা পান করেন। কিন্তু পুঁটির প্রিয়-সাধনে কোন দিন সামান্য ত্রুটি হইলে সে মিছরি সহসা সৈন্ধবে রূপান্তরিত হইয়া যায়। দৈবাৎ কোন দিন ঝোলে এত ঝাল হয় যে, সারাদিন স্রোতের মত অবিশ্রান্ত গোটা-নাল ভাঙ্গিতে থাকে। ডালে নন বা পানে চূণ এক-একদিন এমন আকার ধারণ করে যে অন্ততঃ তিন দিন রূপচাঁদের আহার বন্ধ হইয়া অন্তরে সংসার বৈরাগ্যের উদয় হয়। দুধের উপর দিব্য নধর সর পড়িয়াছে, কিন্তু বাটীতে চুমুক দিতেই ওয়াক্! পেটের সমস্ত নাড়ীগুলা বাহির হইবার জন্য ইড়্বিড়্ করিতে থাকে। কোন দিন ধূনার পরিবর্ত্তে লঙ্কার ধোঁয়া—রূপচাঁদ ঘরে ঢুকিয়াই—বাপ্‌স! ছুটিয়া পলাইতে পথ পান না।

পাড়ায় একটা কিংবদন্তী ছিল যে, রূপচাঁদ প্রথম পক্ষকে এত অতিরিক্ত লাগাম কসিয়াছিলেন যে, বেচারা অতিষ্ঠ হইয়া ইহলোক ছাড়িয়া পলাইয়াছে। তাহাকে যাহা খাওয়াইতেন, যেমন পরাইতেন, সে কোন কথা কহিত না। শুনিয়া দ্বিতীয় পক্ষ মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়াছিল মাত্র। তারপর অবিশ্রাম এই নিঃশব্দ সংগ্রাম। রূপচাঁদ প্রথম-প্রথম ভাবিয়াছিলেন—দেখাই যাক না কতটা দৌড়। কিন্তু পরীক্ষায় দেখিলেন, তাঁহার ভার্য্যার অফুরন্ত ভাণ্ডার। উৎপাত নিত্য নূতন আকার ধারণ করে। হাজার সাবধান হইয়াও পরিত্রাণ নাই। খুব সতর্ক হইয়া স্বামী যখন উত্তর দিক লক্ষ্য করেন, তখন শরাঘাত হয় দক্ষিণ দিক হইতে।

এমনি করিয়া এক দিন বিঘোরে প্রাণ যাইবে। কাজ কি? স্বামী মনে মনে সন্ধিস্থাপন করিলেন। স্ত্রীর অস্ত্র শস্ত্র-সকল আপাততঃ নিদ্রিত হইল সত্য, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মনে প্রতিযোগিতার ভাব এখনও জাগিয়া রহিল।

স্ত্রী বিদ্রোহের ছিদ্র খোঁজে। স্বামী অন্বেষণ করেন, কোথায় তাহার দুর্ব্বলতা। অন্তরাল হইতে কিছুদিন লক্ষ্য করিয়া রূপচাঁদ দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী একটু ভোজনপ্রিয়। নিত্য নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু তিনি দন্তস্ফুট করিতে পারেন না -দন্ত নাই বলিয়া। এই এক বিষয়ে পক্ষপাতী বিধাতা তাঁহার প্রতিযোগিনীকে অপরিচ্ছিন্ন প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন। হায় দন্ত! তুমি হস্তীর শোভা, সিংহের শৌর্য্য, ব্যাঘ্রের বীর্য্য, সর্পের প্রহরণ মূষিকের সম্বল, আর অবলার বল। আজ সহধর্ম্মিণীর চর্ব্বণশক্তি রূপচাঁদের মনে ধিক্কার জন্মাইয়া দিল, বাঃ—তারিফ্ করিতে হয়! সজিনা বল, নাজিনা বল, পুঁই বল, ডেঙো বল, লাউ কুমড়া যাহাই বল, থাড়া চিবাইতে হয় ত এমনি করিয়া। হে খাড়ে! হে ডাঁটে! হাটে-হাটে প্রকটে! রসাল-রস-রসিতে! শ্বেত-রক্ত-হরিত-পীত বহুরূপ-চরিতে! হে রুচির-রদন নিপীড়িতে! তুমি দরিদ্রের ভরসা, রমণীর ভালবাসা, দন্তহীনের দুরাশা! লোকটি বঙ্কিম যুগের। ভাবে গদ্‌গদ হইয়া উঠিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন খোদার উপর খোদ্‌কারী করিবেন, অর্থাৎ দাঁত বাঁধাইবেন। এত খাবার কষ্ট সহ্য করা কিসের জন্য? অর্থের অভাব নাই এবং কিঞ্চিৎ কৃপণ-স্বভাব হইলেও আত্মপক্ষে তাহা সম্ভবমত ব্যয় করিতে রূপচাঁদ কাতর নহেন। আর কিই বা ব্যয়? যাই হ'ক, অবিলম্বে কলিকাতায় গিয়া দুই-পাটি দাঁত কিনিতে হইবে। কিন্তু পুঁটির কাছে সে কথা এখন প্রকাশ করা হইবে না। রূপচাঁদ শয্যায় কিছুক্ষণ এ-পাশ ও পাশ করিয়া পুঁটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘুমুলে না কি?" পুঁটি উত্তর দিল না। রূপচাঁদ বলিলেন - "কাল একবার কল্‌কাতায় যেতে হবে।" পুঁটি তন্দ্রার ভাণ করিয়া জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

'কেন'র কি যে উত্তর দিবেন, ভাবিয়া না পাইয়া রূপচাঁদ সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "উড়্‌তে।"

সেই আগেকার মত পুঁটি হাসিল। রূপচাঁদ খাটের খুঁটি ধরিলেন। একটু পরে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, "কল্‌কাতায় একখানা উড়োজাহাজ এসেছে, শোননি? তার কাপ্তেন পঞ্চাশ টাকা দিলে ওড়ায়।" আবার সেই হাসি! রূপচাঁদের রূপ বিরূপ হইয়া গেল। জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "হাস্‌ছ যে!"

"তাই জিজ্ঞাসা করছি, কি ওড়ায়, টাকা না মানুষ?" এতক্ষণে রূপচাঁদের ধড়ে প্রাণ আসিল। তবু ভাল, রসিকতা! বলিলেন, "টাকা কি ওড়ে? মানুষ।"

"পঞ্চাশ টাকা পেলে আমিও ওড়াতে পারি।"

রূপচাঁদকে খাম-খেয়ালী পত্নীর নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে হইবে। তিনিও একটু রসিকতা করিয়া বলিলেন, "তুমি ত অমনিই পার; হেসেও পার, তুড়ি দিয়েও ওড়াতে পার।" পুঁটি বুঝিল, স্বামীর কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ভিতরে-ভিতরে কি একটা মতলব আছে। বলিল, "তা বেশ! অন্যকেও নিয়ে চল।"

"ওরে বাপ্‌রে! পরিবার ত আমার পাঁচ-সাতটা নাই যে, একটাকে উড়িয়ে দোব!"

পুঁটি বলিল, "আমারই বা কটা আছে বল যে, একটাকে উড়িয়ে দেব! আমার হাত ছাড়িয়ে কোথায় উড়ে যাবে, মনে করেছ?"

হায়, তাহা ত সম্ভব নয়! রূপচাঁদের বুক ঠেলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস উঠিল: তিনি সেটাকে চাপিয়া লইয়া বলিলেন, "কোথায় আবার যাব? তোমারই কাছে ফিরে আস্‌ব।"

"কি? উড়ো জাহাজে করে?"

শাস্ত্রে আছে স্ত্রীর কাছে মিথ্যা কথা কহা যায়। রূপচাঁদ অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন, "হাঁ! উড়ো জাহাজে ক'রে আমাদেরই ছাতের ওপর এসে নাম্‌ব।"

"আর যদি পড়ে যাও?"

রূপচাঁদ ভাবিলেন, যদি মরিয়া যাই, ইহার দশা কি হইবে, তাহাই ভাবিতেছে। যেরূপে হউক ইহাকে ঠাণ্ডা করিয়া একবার বাহির হইতে পারিলে হয়। বলিলেন, "ভয় কি পুঁটি, লোহার সিন্দুকের চাবি তোমার কাছে রেখে যাব। যদিই মরে যাই, তুমি ভেসে যাবে না। বরং সুবিধাই হবে, আমাকে রোজ রোজ রেঁধে খাওয়াতে হবে না!

স্বামী যে পেটুক, পুঁটি তাহা বিলক্ষণ জানিত। তাঁহার এই মরিয়া ভাব দেখিয়া নিশ্চিত করিল, কলিকাতা যাওয়ার কোন গভীর উদ্দেশ্য আছে। হঠাৎ ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া রূপচাঁদের হাত ধরিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমার গা ছুঁয়ে বল, সেখানে তুমি ভীমনাগের সন্দেশ খাবে না?"

পত্নীর প্রশ্ন শুনিয়া পতি অবাক্ হইয়া বলিলেন, "সে কি! তোমাকে না দিয়ে? কখন না!"

পুঁটি ইহা বিশ্বাস করিল না। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল, "বাগবাজারের নবীনময়রার রসগোল্লা ?"

"তাও না।"

"তা হ'ক! আমাকে নিয়ে চল।"

"তুমি গিয়ে সেখানে কোথায় থাক্‌বে ?"

"তুমি কোথায় থাক্‌বে।"

"বড়বাজারে মিঠাই-পটিতে।"

পুঁটি দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, "আমি যাবই।"

রূপচাঁদ মহা ফ্যাঁসাদ দেখিয়া বলিলেন, "তুমি পাগল হলে না কি! যে জন্যে যেতে চাচ্ছ, তা যদি ঘরে বসে পাও, তা'হলে যাবার দরকার কি ? আমি দি'বা করছি এক হাঁড়ি ভীমনাগের সন্দেশ, আর এক হাঁড়ি নবীনের রসগোল্লা আন্‌বই ; তা ছাড়া বড়বাজারের মিঠাই।"

"আর যদি না আনো ?"

"কেমন করে আনাতে হয় তা' ত তুমি জানো!"

পুঁটি এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইল। পরদিন যাত্রার পূর্ব্বে তাহাকে লোহার সিন্দুকের চাবিটি দিয়া রূপচাঁদ বলিলেন, "সাবধানে রেখ, কদাচ হাতছাড়া কোর না। আমি এসে নেব। আর সাবধানে থেক।"

(২)

কলিকাতায় আসিয়া রূপচাঁদ বড় মুস্কিলে পড়িলেন। সন্ধ্যার পর পথে বাহির হইলে বলে 'মুস্কিল্ আসান' ; সকালে বলে 'মুনি গোঁসাই।' একদিন একটা মাতাল তাঁহার দাড়ি নাড়িয়া দিয়া বলে, 'পরচুলো কি না দেখ্‌ছি।' রূপচাঁদ পালাই-পালাই ডাক ছাড়িতে লাগিলেন। কিন্তু দাঁত প্রস্তুত হইতে এখনও তিন-চারি দিন দেরী। দন্তের জন্ত এত বিলম্ব করিতে হইবে, রূপচাঁদ ভাবিতেই পারেন নাই। তিনি মনে করিতেন, ছাতা-জুতার মত কলিকাতায় তৈরী দাঁতও বিক্রয় হয় ; আসিয়াই কিনিয়া লইয়া যাইবেন। তাহা ত হইল না!

যে বাড়িতে রূপচাঁদ থাকিতেন, তাহা এক মহাজনের গদি। রূপচাঁদের জ্ঞাতি স্বরূপ মাইতি হেথা মুহুরীর কাজ করে, আর টেলিফোঁ ধরে। গদিতে তর-বেতর লোক আনাগোনা করে। লক্ষ-লক্ষ টাকার কারবার হয়, কিন্তু এক মুষ্টি পণ্য হেথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোথাকার মাল কোথায় চালান হয়, আর ঝন্-ঝন্ করিয়া টাকা আসিয়া পড়ে, যেন ভূতের কাণ্ড! বাড়ীটা চৌতালা, সুসজ্জিত—যেন ইন্দ্র-ভবন ; কিন্তু ঘোর অন্ধকার। দিনের বেলা বিদ্যুতের আলো না জ্বালিলে কাজ চলে না। এ-ঘরে টেলিফোঁ ঝুন্ ঝুন্ করিতেছে, ও ঘরে বন্ বন্ করিয়া বিদ্যুতের পাখা চলিতেছে, সে-ঘরে বিজ্-বিজ্ ফিস্-ফিস্—তাও সাঙ্কেতিক ভাষায়। রূপচাঁদ একটু উতলা হইয়া উঠিয়াছেন। গ্রামের সেই মৃদু-তরঙ্গিত শস্যশীর্ষ হরিৎ-সাগর ; সেই বনফুল বাস-বিলসিত বাতাস ; দিগন্তচুম্বিত আকাশ ; সেই শৈবাল-বসনা সরসীকূলে কুলনারীকুলের কলহাস, সে যেন আর একটা জগৎ! আর এখানে কেবল ঝন্ ঝন্ ঝান্ ঝান্! আচ্ছা, ঐ কাল চোঙ্‌টা কি রকম করে কথা কয়! বাড়ী ফেরবার আগে একবার শুন্‌তে হবে।

রূপচাঁদ আর ভ্রমণে বাহির হইবেন না—প্রতিজ্ঞা। আপনার উপর আপনি কারাদণ্ডের আদেশ দিয়া ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন, এমন সময় ঝুন-ঝুন করিয়া টেলিফোঁ বাজিয়া উঠিল। স্বরূপ মাইতি তখন মনিবের কাছে কি কাজে গিয়াছে। রূপচাঁদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোঙ্ ধরিলেন স্বরূপ যেমন ধরে।

স্বরূপের অনুকরণ করিয়া রূপচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?—কি—কি - কি বললেন, মশাই ? সকাল বেলা! থামকা গাল দেন কেন, মশাই ? কে আপনি ?"

গ্রন্থকার সর্ব্বজ্ঞ। নারীর মনের কথা যিনি অনায়াসে অবগত হইতে পারেন, চোঙে কাণ না দিয়া টেলিফোঁর কথোপকথন শোনা, তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়। রূপচাঁদের প্রশ্নের উত্তরে যন্ত্রের অপর প্রান্ত প্রশ্ন করিল, "আপনি কে ?"

"আমি রূপচাঁদ।"

"ওঃ! স্বরূপবাবু! আমি হিরণচাঁদ!"

"কি! হারামজাদ্! আপনার ত ভারি আস্পর্দ্ধা! হারামজাদ্ বলেন কাকে ? কি চান আপনি ?"

"একের নম্বর বাড়ীটা ভাড়া নোব।"

"কি ? কি ? একের নম্বর দাড়ী ?"

"হাঁ হাঁ বুঝেছেন ? ভাড়া নোব।"

"নাড়া দোব ? কেন মশাই, মাগ্‌না ত নয়!"

"মাগ্‌না কে বলছে মশাই, ভাড়া দোব!"

"ওঃ ? ভাড়া দেবেন ?"

"হাঁ, ভাড়া দোব—পয়লা নম্বর বাড়ী।"

"বটে! আমার পয়লা নম্বর দাড়ী ভাড়া নেবেন? দাড়ী ভাড়া দেবার জন্যে ত সঙ্গে করে কল্‌কেতায় আনিনি, মশাই।"

"আপনাকে ঠিক করে দিতেই হবে!"

"দিতেই হবে? কেন বলুন ত? এ আপনার কি রসিকতা? দাড়ি ভাড়া নেবেন!"

"রসিকতা নয়, মশাই। আপনি যা নেবেন তাতেই রাজি!"

"জানবেন—কি?"

"রাজি।"

"কাজি?"

"কাজি নয়—রাজি।"

"ওঃ!, পাজী!"

"হা হাঁ—আপনি স্বীকার?"

"আমি শুয়ার!"

"তা হলে পাকা?"

"পাকা? নিশ্চয়ই পাকা? শুনছেন? কথা কন না যে!"

ততক্ষণে হিরণচাঁদ যন্ত্র ছাড়িয়া চলিয়া গেছে। কিন্তু অজ্ঞ রূপচাঁদ বলিতে লাগিলেন, "শুনুন, মশাই, শুনুন! আমার পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়েছে। এখন দাড়ী পাকায় দোষ নেই। আপনি হারামজাদা বল্লেন, পাজী বল্লেন, শুয়ার বল্লেন; আর বল্লেন, আমার পাকা দাড়ী আপনি ভাড়া নেবেন। আপনি নানা কথা কইলেন। আমার উত্তরটা শুনে যান—আমি দোব না। ভদ্রলোকের এক কথা।"

রূপচাঁদ রাগে গুম্ হইয়া বসিলেন। এমন সময়ে স্বরূপের প্রবেশ। জিজ্ঞাসা করিল, "স্যাঙাত, আজ ভ্রমণে বেরোও নি যে! তা বেশ করেছ! কল্‌কেতার আজকাল কার নতুন খেলা দেখে যাও।"

"কি? এই ত এক খেলা দেখ্‌লুম।"

"কি? টেলিফোঁ শুনছিলে? আরে ও পুরণো হয়ে গিয়েছে। এস এস, সব জুটেছে!" বলিয়া রূপচাঁদকে এক প্রকার টানিতে-টানিতে হল্‌ঘরে লইয়া গেল। সেখানে দশ বারো জন যুবক উপস্থিত। সকলেরই কিট্‌ফাট্ ফুট্‌ফুটে চেহারা। গায় ফিন্‌ফিনে চুড়িদার—সোণার চেন্‌যুক্ত বোতাম-আঁটা, তা'তে হীরা, মতি, চুণি, পান্না, নানা রত্ন বসান। সকলেরই মাথায় পাগ্‌ড়ী,—হরেক রঙের—শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত। প্রত্যেকের হাতে এক-একটী পান-ভরা রূপার কেস্; তার সঙ্গে একটি-একটি ছোট কেস্—সেটা রুচি-অনুযায়ী জরদা, সুরতী, কিমা, তাম্বুলবিহার প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। স্বরূপ সেই যুবক সভায় রূপচাঁদকে লইয়া গিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন "আমার দোস্ত।" এমন সময় দূরে শব্দ উঠিল—"রাম নাম সত্য হায়!" "রাম-নাম সত্য হায়।" আওয়াজ শুনিয়াই যুবকবৃন্দের সস্মিত মুখের দীপ্তি সহসা যেন নিবিয়া গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া একজন বলিয়া উঠিল—"এই মুদ্দরের সাথে কয় জন লোক আছে? আমি বল্‌ছি আটজন।"

সঙ্গে-সঙ্গে আর এক যুবক শব বাহকদিগের বিকট ধ্বনি একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দশ টাকা বাজী—দশজন।"

"না, বারো জন—পঞ্চাশ টাকা।"

তৎক্ষণাৎ আর একজন বলিল, "একশো টাকা—পনের জন।"

তারপর শব স্ত্রীলোকের কি পুরুষের? "স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক—পচিশ।"

"পঞ্চাশ টাকা—পুরুষ।"

একশো, দুশো—বাজী ক্রমে পাচশোয় উঠিল। "আচ্ছা কি ব্যামোয় মারা গিয়েছে?"

"কলেরা—না হয় ত পঞ্চাশ টাকা দেব।"

"কলেরা হয় ত একশো টাকা বাজী।" "রাজি"-"রাজি"। "বসন্ত না হয় ত দুশো টাকা।" ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা—"ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা না হয় ত তিনশো।" নিদানের তালিকা যেমন ওড়ন্-পাড়ন্ হইতে লাগিল, সঙ্গে-সঙ্গে বাজিও উঠিল হাজারে। তারপর শব কৃশ কি স্থূল; দীর্ঘাকার কি খর্ব্ব; তাহার নাক, কাণ, চোখ কেমন? তখন সকলের মাথায় খুন চড়িয়াছে—টাকার যেন পাখা গজাইয়া উড়িতে লাগিল। রূপচাঁদ বিস্মিত, স্তম্ভিত, আত্মহারা। ইত্যবসরে তাঁহার দিকে একজন চাহিয়া বলিল, "শবের দাড়ী ছিল কি না?" "হাঁ-হাঁ"—"না-না।" "একশো"-"দুশো"-"পাঁচশো"-"হাজার।"

"কি রকম দাড়ি ?" "ছাগল-দাড়ি ?" "আলবৎ !" "পাঁচশো", "ছয়শো", "হাজার", "দুহাজার।"

একজন রূপচাঁদের পানে চাহিয়া বলিল, "এমনি চাপদাড়ি !"

"না"—"না" —"দুশো","পাচশো","হাজার","দুহাজার।"

যিনি দক্ষ মুনির স্কন্ধে ভর করিয়া শিবনিন্দা করাইয়াছিলেন ; যাঁহার অমোঘ প্রভাবে রণক্ষেত্রে রাবণ রামচন্দ্রের প্রতি কটূক্তি করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল; যাঁহার দুর্ব্বার শক্তি পতিপত্নীর বিচ্ছেদসাধন করে, পিতা পুত্রে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ বাধায় ; সেই দুষ্টা সরস্বতী সহসা আজ রূপচাঁদের কণ্ঠে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—"কভি নেই।" তারপর শ্মশ্রুতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে কহিলেন, "এসি দাড়ি হোগা ত হাম দশ হাজার টাকা দেগা।" চারিদিকে রব উঠিল—"রাজি"—"রাজি"—"রাজি।" একজন অপেক্ষাকৃত প্রবীণ বলিলেন, "দেখবেন, মোসাই, ভদ্দর লোকের এককথা। আপনি স্বরূপবাবুর দোস্ত। চলুন, নিমতলায় গিয়ে দেখা যাক।" বলিয়া দুইজন তাঁহার হাত ধরিল। রূপচাঁদ বুঝিলেন, ইহারা শুধু বাক্যবীর নহে, সাংঘাতিকরূপে কার্য্যতৎপর। তাঁহার ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস ক্ষণিকে লয়প্রাপ্ত হইয়া গেল। রূপচাঁদ কাতর ভাবে স্বরূপের মুখ চাহিয়া কহিলেন, "আমার যাবার দরকার নেই। আপনারা ত দেখে এসে যা বলবেন, আমি মেনে নেব।" "হুররে হুররে" করিতে-করিতে যুবকদল স্বরূপকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

রূপচাঁদ হল্‌ঘরে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ কি কাণ্ড করিয়া বসিলাম ! ইহারা ত টাকা আদায় না করিয়া ছাড়িবে না। কিছুতেই না। আবার স্বরূপকে মধ্যস্থ মানিলাম কেন ? নিশ্চয় এদের সঙ্গে সাজোস্ আছে। ওরা এখনই আসিয়া ধরিবে, আর টাকা আদায় করিয়া ছাড়িবে। কি করিয়া আদায় করিবে ? অত টাকা ত আমার সঙ্গে নাই ! কেন, হ্যাণ্ডনোট্ লিখাইয়া লইবে। কি সর্ব্বনাশ ! হাতে পাইয়া এখন যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। ইহাদের খর্পরে পড়িয়াছি, একান্ত অসহায়। দেশে হইলে দেখিতাম, কেমন সব জুয়াড়ি ! লঙ্কার ধোঁয়াতেই পুঁটি গাঁ-ছাড়া করিয়া দিত ! এখন কি করি ? এখান থেকে সরি। কিন্তু যাই-ই বা কোথায় ? এখনও দুই তিন দিন কলিকাতায় থাকিতে হইবে, নহিলে দাঁড়ি পাওয়া যাইবে না। এই দুই তিন দিন গা ঢাকা থাকিতে হইবে। ইহারা অবশ্য কলিকাতা পাতি-পাতি করিয়া খুঁজিবে। দশ হাজার টাকার মায়া কে ছাড়ে ! কিন্তু আমাকে খুঁজিয়া না পাইয়া যদি দেশে গিয়া উপস্থিত হয় ! স্বরূপ ত সবই জানে। সর্ব্বনাশ ! এ কথা ত আগে ভাবি নাই ! হাজার হোক, পুঁটি মেয়েমানুষ। এখনই সতর্ক করিয়া দিই। তৎক্ষণাৎ রূপচাঁদ পুঁটিকে পোষ্টকার্ড লিখিয়া দিলেন,—"আমার যাইতে বিলম্ব আছে। ইতিমধ্যে আমার নাম করিয়া যদি কেহ যায়, কদাচ, কদাচ তাহাকে আমল দিবে না। খুব সাবধান !" এদিক্ ত সাম্‌লাইলাম, এখন আমি যাই কোথা ? কোনও হিন্দু-হোটেলে দুই-একদিন থাকিলে হয় না ? সেই পরামর্শই ঠিক ! অবিলম্বে রূপচাঁদ আপনার ব্যাগটি লইয়া "মহৎ আশ্রম" অভিমুখে চলিলেন। পথে পোষ্টকার্ডখানা একটা ডাকঘরে ফেলিয়া দিয়া গেলেন।

মহৎ-আশ্রমে আসিয়া রূপচাঁদের শয্যা কণ্টকী উপস্থিত হইল। আশ্রমের অধিকারী বড়বাজারে যদি কোন সামগ্রী কিনিতে লোক পাঠান, রূপচাঁদের মনে হয়, অছিলা করিয়া স্বরূপকে সংবাদ দিতে যাইতেছে। অমনি তাঁহার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া নাচিতে থাকে ! রাত্রিতে ভাল নিদ্রাও হইল না। পরদিন আহারাদির পর শয্যায় একটু গড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় একটি লোক কক্ষে প্রবেশ করিয়া, ছাতা ও হাত-ব্যাগ্‌টা মেঝেয় রাখিয়া একটা মাদুর পাতিয়া বসিল। রূপচাঁদের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল ; তিনি অর্দ্ধঘুমে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—যেন একজন ডিটেকটিভ আসিয়া তাঁহার সন্ধান লইতেছে। লোকটি ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি চকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। সে ব্যক্তি কিছুক্ষণ ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের নিবাস ?"

"এই ত দেখছেন, এইখানে।"

আগন্তুক জিজ্ঞাসিল, "আপনার নাম ?"

রূপচাঁদের বুকের ভিতর ছাঁৎ করিয়া উঠিল। নিশ্চয় চর ! নহিলে নাম জানিতে চায় কেন ? বলিলেন, "আমি জানিনি।"

"সে কি মশাই, জানেন না কি ?"

"মাইরি জানিনি! আপনার দিব্যি বল্‌ছি।"

"কি বল্‌ছেন আপনি?"

রূপচাঁদ এই সংশয়ীর উপর অতিশয় চটিয়া উঠিলেন, "বলাবলি আর কি মশাই? কারুর ধার করেও খাইনি, আর চুরি-জোচ্চুরিও করিনি!"

"রাম রাম! আমি কি তাই বলছি! আপনি জানিনি বল্‌ছেন কি?"

"জানিনি তার আবার কি কি? জানতেই হবে এমন কিছু কথা আছে? হুঃ, লোকে বাপ-পিতৃমোর নাম ভুলে যাচ্ছে। ভারি অপরাধ হয়েছে, না? আমার নাম নেই।"

"বাপ মা আপনার নামকরণ করেন নি?"

"সেই অন্নপ্রাশনের সময়। ততদিনের কথা কি মনে থাকে?"

আগন্তুক বলিলেন, "কেন থাক্‌বে না, মশাই? নাম মনে থাক্‌বে না? আমার নাম বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, বিশু চাটুয্যেও বলে।"

"পেন্নাম, মশাই! আপনার স্মরণ-শক্তির খব তারিফ করছি! হ'ল ত? আর কি চাই বলুন?"

"এইবার আপনার নামটা বলুন।"

"ওঃ, আপনি আচ্ছা জিদি লোক! পোষাবে না, মশাই, আমি চল্‌লুম।" বলিয়া রূপচাঁদ ছাতা-ব্যাগ লইয়া চটাপট্ শব্দে সিঁড়ি নামিতে লাগিলেন। মহৎ-আশ্রমের ম্যানেজার পিছু ডাকিতে লাগিলেন, "যান কোথা, মশাই? আমাদের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে যান।" আর পাওনা! "আসছি" বলিয়া রূপচাঁদ উধাও হইয়া গেলেন!

হাঁপাইতে হাঁপাইতে একেবারে দাঁতের দোকানে উপস্থিত। রূপচাঁদের গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবর, উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া দন্তবিক্রেতা বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

"কিসের?"

"এত তাড়া?"

"তাড়ালে আর তাড়া না করে করি কি? বাপু, দাঁত হয়ে থাকে ত দাও, নইলে আমি চল্‌লুম। আর এক দণ্ডও হেথা থাক্‌ব না।"

"একটু অপেক্ষা করুন" বলিয়া বিক্রেতা চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে দাঁত আনিয়া বলিলেন, "পরুন দেখি!" তারপর ঘসাঘসি করিয়া যতক্ষণ তাহারা দাঁত ফিট্ করিতে লাগিল, রূপচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন, স্বরূপ যদি ষ্টেশনে ছোঁড়াগুলোকে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে! দাড়িতে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে-করিতে চট্ করিয়া তাঁহার মাথায় একটা মতলব উঠিল। দাঁত পরিয়া, দাম চুকাইয়া দিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া রূপচাঁদ এক হেয়ার-কাটারের দোকানে গিয়া উঠিলেন। নরসুন্দর তাঁহাকে দীর্ঘচ্ছন্দে সেলাম দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চান, কর্ত্তা?"

রূপচাঁদের রক্ত তখনও টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছিল; বলিলেন—"তোমার এখানে ত, বাপু, বর্দ্ধমানের সীতাভোগও পাওয়া যায় না, আর ধনেখালির খৈচুরও পাওয়া যায় না। অত লম্বা-লম্বা কথা কইছ কেন?"

কিন্তু মুসলমান্ নাপিত সহজে অপ্রতিভ হইবার পাত্র নয়।

রূপচাঁদের দুগ্ধধবল কেশ, গুম্ফ, শ্মশ্রু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উত্তম কলপ্ নেবেন, কর্ত্তা? মাখাতে-মাখাতে আপনার বেবাক চুলে মীশ্ কালী বরণ ধরবে! তখন বলবেন—হাঁ!"

রূপচাঁদ বলিলেন—"হাঁ, ভগবান্ চুণকাম্ করে দিয়েছেন, তুমি কালী মাখিয়ে দাও। তা হ'লে চূণ কালী দুই-ই হয়?"

"কর্ত্তা ঠিক যোয়ান্-মরদের মত দেখ্‌তে হবে। আপনি পরখ করে দাম দেবেন।"

"সে যা হ'ক, বাপু, আমার এই গোফ-দাড়ি সব কামিয়ে চুলগুলো ছোট করে ছেঁটে দিতে পার?"

"বেশ আলবার্ট ফ্যাসান্ করে দিব, কর্ত্তা, আপনি এই চেয়ারে বসেন।"

নরসুন্দর প্রসাদন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কিছুক্ষণ পরে রূপচাঁদ আরসীতে মুখ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। দাঁত পরিয়া গাল বেশ পুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে। খানা-খোন্দল আর কোথাও কিছু নাই। কি সুন্দর! নরসুন্দর আবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছে, "কর্ত্তা, আপনি কলপ্ নেন। দুইঘণ্টা পরে যদি আপনারে আপনি চিন্‌তে পারেন ত আমি পয়সা নিমু না।"

দুই ঘণ্টা পরে দর্পনে মুখ দেখিয়া রূপচাঁদ সত্যই চকিত হইলেন। সত্যই আর নিজেকে নিজে চেনা যায় না।

মুকুরে যে মুখ আজ তিনি দশ বৎসর ধরিয়া দেখিতেছেন, তাহা কোথায় অন্তরিত হইয়া গেছে—আর তার পরিবর্ত্তে আরসীর অন্তরাল হইতে যে মূর্ত্তি উঁকি মারিতেছে, সে তিনি নহেন। রূপচাঁদের মুখে একগাল হাসি ফুটিয়া উঠিল। আ মরি, মরি! একি! যেন মুক্তা ঝরিতেছে! হেয়ার কাটারকে বখ্‌শিস্ দিয়া, চাদরখানা বুকে আড় করিয়া বাঁধিয়া, বড়বাজার অভিমুখে দুই অঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া রূপচাঁদ কলিকাতা হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

(৩)

"ওগো, লোহার সিন্দুকের চাবিটা দাও ত।" নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়াই রূপচাঁদের এই প্রথম উক্তি। লোহার সিন্দুকের চাবি পুঁটিকে দিয়াও রূপচাঁদের বিশ্বাস নাই। কি জানি! সব ঠিক্‌ঠাক্ আছে কি না, না দেখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। বেলা তখন অপরাহ্ণ। ঘণ্টা দুয়েক দিবানিদ্রার পর পুঁটি উঠি উঠি করিতেছে। রূপচাঁদকে দেখিয়াই সে আঁৎকিয়া উঠিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "কে—কে—কে কে তুমি?"

রূপচাঁদ একটু রসিকতা করিয়া বলিলেন, "বেশ করে ঠাউরে দেখ দিকি কে! কখন আলাপ-পরিচয় ছিল কি না?"

পুঁটি চীৎকার করিয়া ডাকিল, "বিন্দি, বিন্দি, দেখ্ ত কে এক মিন্‌সে ঘরে ঢুকে বল্‌ছে, লো'র সিন্দুকের চাবি দাও।"

"আহা, চেঁচাও কেন?"

"এক্ষুনি বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। নইলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় কর্‌ব। ডাক্ ত চৌকিদার।"

রূপচাঁদ হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। ডাক্ চৌকিদার! এ বলে কি? পুঁটি গলা আর এক গ্রাম চড়াইয়া বলিল, "আ গেল মিন্‌সে, এখনও নড়ে না যে! বেরো বল্‌ছি আমার বাড়ী থেকে! বিন্দি, বিন্দি, ডাক্ ত ন'ঠাকুর-পোকে।"

বিন্দি ঘাটে বাসন মাজিতেছিল। সে সেইখান হইতেই চেঁচাইয়া বলিল, "কি হয়েছে গো বৌদি?"

"আমার মাথা হয়েছে! তুই শীগ্‌গির ন'ঠাকুরপো, মতি খুড়ো, বামুন-জ্যাটাদের ডাক্। কে এক মিন্‌সে —ঘরে কে সর্ব্বস্ব চুনিতে এয়েছে।"

রূপচাঁদের আর ধৈর্য্য রহিল না। রাগে গরম হইয়া বলিলেন, "আমাকে চেন না? কখন দেখনি?"

"কস্মিন কালেও না।"

মহা উত্তেজিত হইয়া রূপচাঁদ কহিলেন, "কচি খুকি আর কি! আমার আওয়াজে চিন্‌তে পারছ না?"

তেমনি উত্তেজিত হইয়া পুঁটি বলিল, "না।"

এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! পরের পরিবার না চিনিলে কোনই ক্ষতি নাই। কিন্তু নিজের অর্দ্ধাঙ্গিনী! লোহার সিন্দুকের চাবিটা হস্তগত করিয়া আপনার অর্দ্ধাঙ্গকে একেবারে নির্ম্মম ভাবে নাকচ করিয়া দিতেছে। রূপচাঁদের আর বাক্য-নিঃসরণ হইল না। কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া ফ্যাল-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। পুঁটি সপ্তমে গলা চড়াইয়া ডাকিল, "ওমা, মিন্‌সে যায় না যে রে! ন'ঠাকুর-পো, ন'ঠাকুর পো, ছুটে এস ত!"

"ডাক্ তোর ন'ঠাকুরপো, আর যে যেখানে আছে, আমার বাড়ী থেকে কেমন করে আমাকে তাড়ায় দেখি!" বলিয়া রূপচাঁদ একটা বাসনের সিন্দুক চাপিয়া বসিলেন। দেখিতে দেখিতে বাড়ীও লোকারণ্য হইয়া গেল। পুঁটি একটু আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। দিনের বেলা একা ডাকাতী করিতে আসিয়াছে, কি জানি, যদি কোমরে কোথাও ছোরাছুরি গোঁজা থাকে! মতিখুড়ো পলাইবার পথ রাখিয়া বলিলেন, "বাপু, ভাল এস্তেক যাবে, না চৌকিদার ডাকব?"

রূপচাঁদ সবিস্ময়ে তাঁহার মুখ চাহিয়া বলিলেন, "সে কি খুড়ো, আমায় চিনতে পারছ না? আমি রূপচাঁদ।"

বামুন-জ্যেঠা ভিড়ের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিলেন, "অমন অনেকে বলে! তার প্রমাণ?"

কি সর্ব্বনাশ! রূপচাঁদ যে রূপচাঁদ, অর্থাৎ তিনি যে তিনি, এ কথা প্রমাণ করেন কেমন করিয়া? যে প্রকৃষ্ট প্রমাণ ছিল তা' ত নাপিতের দোকানে রাখিয়া আসিয়াছেন। কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "খুড়ো, আমার গলার আওয়াজে বুঝতে পারছ না?"

পুঁটি বলিল, "ও কম ধড়িবাজ! ঠিক্ তেমনি গলা করে কথা কইছে।"

রূপচাঁদের পুরোহিত বলিলেন, "তুমি ত আচ্ছা

জোচ্চোর হে! দেখতে ভদ্রলোকের মত! ছিঃ—ভালয়-ভালয় চলে যাও! কেন আর কেলেঙ্কারী কর!"

"কেলেঙ্কারী করছি আমি না আপনারা?"

ঠিক্ এই সময় পুঁটি আসিয়া মতি খুড়োর হাতে একখানা পোষ্টকার্ড্ দিয়া বলিল, "ওর কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না। এই দেখুন, তিনি কি চিঠি লিখেছেন।"

অমনি পাঁচ-সাতটা গলা চেঁচাইয়া উঠিল, "কি হে, কি হে? চেঁচিয়ে পড়।"

মতি খুড়ো বলিলেন, "রূপচাঁদ লিখেছে, 'আমার নাম করে কেউ যদি যায়, কদাচ তাকে আমল্ দেবে না। খুব সাবধান!'"

অনেকগুলো গলা চৌকিদার চৌকিদার, করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। নিজ হস্তলিপির এই বিদ্রোহাচরণ দেখিয়া রূপচাঁদ হতাশ কণ্ঠে বলিলেন, "মশাইরা চৌকিদার ডাক্‌বেন এখন! আমার একটা কথা শুনুন।"

"কি বল?"

"মশাই, আমার হাতের লেখা ত আপনাদের চোখের ওপর রয়েছে। আমি যদি আপনাদের সাম্‌নে ঠিক্ অমনি লিখে দিতে পারি, তা হলে কি বলবেন?"

"তা হলে বল্‌ব তুমি যেমন জোচ্চোর, তেমনি জালিয়াৎ।"

রূপচাঁদ কাণে আঙ্গুল দিলেন। তারপর বলিলেন, "আমার এই জুতা, জামা, কাপড়, চাদর, ব্যাগ্, এও কি সব জাল? আমার পরিবারকে আপনারা জিজ্ঞাসা করুন, কল্‌কাতা যাবার সময় আমি এই সব পরে গিয়েছিলুম কি না?"

পুঁটি হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"আপনারা চৌকিদার ডাকুন, ও মিন্‌সে তাঁকে খুন করে সব কেড়ে নিয়েছে। তিনি বলেছিলেন, কল্‌কেতা থেকে আপনাদের জন্য দু' তিন হাঁড়ি মিষ্টি আন্‌বেন।" কিন্তু চকিত চাকী এই ক্রন্দনের ভিতর পুঁটির সেই হাসির আভাস শুনিলেন। কতকগুলা গলা এক সঙ্গে হাঁকিল—'চৌকিদার, চৌকিদার!' রূপচাঁদ তখন উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আমি যে আপনাদের গাঁয়ের লোক, রূপচাঁদ চাকী, তার আরও প্রমাণ দিচ্ছি। দশ বছর আগে মতি-খুড়ার বাড়ীতে ঢিল পড়্‌ত, মনে আছে?"

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পুরুতমশায় বলিলেন, "বাপু, এই ভরসন্ধ্যাবেলা উপদেবতাদের কথা তুল্‌ছ কেন? তুমি যে রূপচাঁদ নও, তার অনেক প্রমাণ আছে। রূপচাঁদের মস্ত গোঁফ ছিল, একহাত দাড়ি ছিল।"

রূপচাঁদ বলিলেন, "গোঁফ দাড়ি কামান যায় না?"

"তার লম্বা-লম্বা চুল ছিল।"

"চুল ছাঁটা যায় না?"

পুরুত্ বলিলেন "সে চুল ছিল, শোণের নুড়িরমত সাদা।"

"পাকা চুলে কলপ্ দেওয় যায় না?"

"রূপচাঁদ ফোক্‌লা ছিল।"

রূপচাঁদ তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে; দুই হাত দিয়া দুই পাটি দাঁত খুলিয়া পুরুৎ মশায়ের গায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই দেখ্, এই দেখ্।"

পুরুতমশায়ের বুকের ভিতরটা গুরগুর করিয়া উঠিল। একটু পূর্ব্বে ভূতে ঢিল ফেলার কথা হইয়া গিয়াছে। দুই পাটী দাঁত যে উড়িয়া আসিয়া তাঁহার গায় পড়িবে, তিনি স্বপ্নেও কখন কল্পনা করিতে পারেন নাই। পুরোহিত হাতে পৈতা জড়াইয়া রাম নামের সঙ্গে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে-করিতে কর্পূরের মত একেবারে উবিয়া গেলেন। অমনি নিমেষে গৃহ জনশূন্য হইয়া গেল। পরাজিত, লজ্জিত, লাঞ্ছিত রূপচাঁদ বাসনের সিন্দুকে বসিয়া হতাশ নেত্রে পুঁটিকে দেখিতে লাগিলেন। ঘর প্রকম্পিত করিয়া পুঁটির বিরাট হাস্যধ্বনি উঠিল, আর তাহার স্খলিত অঞ্চল বিজয়-পতাকার ন্যায় সান্ধ্য-পবনে উড়িতে লাগিল।

শোক-সংবাদ

স্বর্গীয় অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ

মাত্র সাত দিনের ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে অমূল্যকৃষ্ণ আমাদিগকে জন্মের মত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। এক বুধবারে তাঁহার জ্বর হয়—পরের বুধবার ২০শে ফাল্গুন রাত্রিতেই তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করেন। সংসারের বন্ধন, মানুষের শত চেষ্টাও তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না;—মৃত্যুর আহ্বান এমনি অপরিহার্য্য, এমনি নিষ্ঠুর, এমনি নির্ম্মম হৃদয়হীন! ২৭ বৎসর মাত্র তাঁহার বয়স হইয়াছিল; এম,



স্বর্গীয় অমূল্য কৃষ্ণ ঘোষ

এ, বি, এল পাশ করিয়া সবেমাত্র সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন; যৌবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ লইয়া পূর্ণ-উদ্যমে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিবেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মৃত্যুর আহ্বান তাঁর প্রাণের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল; সে আহ্বান তুচ্ছ করে, মানুষের সে ক্ষমতা নাই। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং কলেজে পড়িবার সময় "প্রীতি" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা পরিচালন এবং কয়েক বৎসর তাহার সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। এই অল্প বয়সের মধ্যেই কলেজের পড়া করিয়াও তিনি সাতজন মহাপুরুষের জীবন-চরিত লিখিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, গোখলে, টাটা, নেপোলিয়ান, ওয়াসিংটন এবং কিচ্‌নার এই সাতজন আদর্শ পুরুষের জীবনী সহজ সরল ভাষায় লিখিয়া বাংলা দেশের বালক-বালিকাদিগের সম্মুখে যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায়, সেগুলি কত গভীর; কিন্তু তাঁর ভিতরে যে শক্তি সঞ্চিত ছিল, তাহা আর বিকাশ লাভ করিতে পারিল না। বাঁচিয়া থাকিলে বাংলা সাহিত্য তাঁহার নিকট অনেক আশা করিতে পারিত; কিন্তু হায়—

ফুটিতে পারিত গো
ফুটিল না সে।

মৃত্যুর শীতল স্পর্শে অকালে যে পাতা ঝরিয়া গেল বসন্তের মলয় হিল্লোল সেখানে নবকিসলয় ফুটাইয়া তুলিবার আর অবসরও পাইবে না।

৺ রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মণিলাল কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, আমাদের পরম প্রীতিভাজন রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্নে মণিলাল কোম্পানীর উন্নতি হইয়াছিল। তিনি অবসর-সময় বৃথা ক্ষেপন না করিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন; তাহারই ফলে আমরা কয়েকখানি ভাল বই পাইয়াছি। অল্পদিন পূর্ব্বেই তাঁহার 'শিলংভ্রমণ' প্রকাশিত হইয়াছে। ১লা বৈশাখ হালখাতা উপলক্ষে প্রতিবৎসর তিনি সাহিত্যিক-সম্মিলন করিতেন এবং উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখকগণকে পুরস্কৃত করিতেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী

বাঙ্গালীর গৌরব, দেশের সুসন্তান, মাননীয় শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় অস্থায়ীভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে আমরা গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। সার আশুতোষের ন্যায় বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কর্ম্মকুশল ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশে অতি কমই আছেন; হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কেন, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবারও তিনি সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু আইনে না কি আছে যে, শ্বেতাঙ্গ না হইলে স্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতি হওয়া যায় না; সেই জন্য ইতঃপূর্ব্বে সার রমেশচন্দ্র, সার চন্দ্রমাধবও অস্থায়ী ভাবেই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। যাহাই হউক, সার আশুতোষের এই নিয়োগে আমরা পরম আনন্দিত হইয়াছি, এবং বঙ্গমাতার এই সুসন্তানকে আমরা ভক্তিভরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুর স্বরাজ্যের অনেক উন্নতিকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তন্মধ্যে রাজ্যশাসনের সুবন্দোবস্তের জন্য একজিকিউটিভ কাউন্সিলের উন্নতি-সাধন অন্যতম। কিছুদিন পূর্ব্বে (হিজরী ১৩৩৮ অব্দের সফর উলমুজাফর মাসের ২২ তারিখে) একটী ফরমানের দ্বারা, রাজ্যের শাসন-সৌকর্য্যার্থ নিজাম বাহাদুর একটী একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে, বর্ত্তমান নিজাম বাহাদুরের পিতার আমলে একটী লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু নিজাম বাহাদুরের মতে তাহা বর্ত্তমানকালের প্রয়োজনের অনুপাতে যথেষ্ট নহে, কিম্বা তাহা তাঁহার প্রিয় প্রজাবর্গের উন্নতি ও অগ্রগতির পক্ষে কর্ত্তব্য সম্পাদনের পক্ষে সম্যক উপযোগী বলিয়া নিজাম বাহাদুর মনে করেন না। "Nor do they give promise of the fulfilment of those duties and functions which I consider necessary for the prosperity and advancement of my beloved subjects."। সেইজন্য তিনি এক্ষণে আর একটী ফরমানের দ্বারা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সংস্কার সাধনের ফলে কাজ খুব ভালই হইতেছে। এক্ষণে হিজ একজলটেড হাইনেস নিজাম বাহাদুর ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সদর-ই আজাম শ্রীযুক্ত সার আলি ইমাম সাহেবকে ইহার বন্দোবস্ত করিবার ভার দিয়াছেন। সার আলি ইমাম মহোদয় নিজাম বাহাদুরের নির্দ্দেশ অনুসারে কতকগুলি বিষয়ের সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিলে ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সাধিত হইবে।

মান্দ্রাজ—তাঞ্জোরের উকীল শ্রীযুক্ত কাথুনাথ আয়ার একটী নূতন উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি এমন একটী যন্ত্র (propeller) প্রস্তুত করিয়াছেন, যদ্দ্বারা দূরদেশ যাত্রার সময় খুব কমিয়া যাইবে। এই প্রোপেলার যন্ত্রটি, ইহার উদ্ভাবকের বিবেচনায়, রেলওয়ে, ট্রেণ, ষ্টীমার কিম্বা বিমান—যে-কোন প্রকার যানে ব্যবহৃত হইতে পারিবে, এবং ইহার সাহায্যে যানগুলির গতিবেগ বর্দ্ধিত করা যাইবে। তিনি বলেন, এই প্রোপেলারের বলে বিমানে চড়িয়া ঘণ্টায় ১৫০০ মাইল পথ অতিক্রম করা চলিবে। এই পর্য্যন্ত সংবাদ এখন পাওয়া গিয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে এই যন্ত্রটি কিরূপ ফল প্রসব করে, তাহা দ্রষ্টব্য। বিমানে এই যন্ত্র

ব সাইয়া যদি যথার্থই দেখা যায় যে, ইহার সাহায্যে বিমান ঘণ্টায় ১০০০ মাইল দৌড়িতে পারে, তাহা হইলে বিমান-যানের ক্ষেত্রে যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। একজন ভারতবাসীর উদ্ভাবনের ফলে এই ব্যাপারটি ঘটিলে বিজ্ঞান জগতে ভারতবর্ষ সম্মাদর লাভ করিতে পারিবে। সে যাহাই হউক, আপাততঃ ভারত-বাসীদের নিজেদেরও একটু কর্ত্তব্য রহিয়াছে। দুই একজন করিয়া ভারতবাসীরা যেমন বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন, অন্যান্য ভারতবাসীরাও তাঁহাদের পন্থানুসরণ করুন,—নব নব বৈজ্ঞানিক তথ্যের উদ্ভাবনের চেষ্টা করুন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতিভেদ নাই, বর্ণভেদ নাই;—সেখানে কেবল গুণের আদর হইয়া থাকে। সামাজিক হিসাবে পৃথিবীর সভ্য-সমাজে ভারতবাসীর স্থান এখন নগণ্য বলিলেই হয়। কিন্তু সেখানে উচ্চাসন লাভ করা না করা আমাদের হাত। সে চেষ্টা আমরা করিতে ছাড়িব কেন? এবং কৃতকার্য্য হইলে কে আমাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে।

বাড়ী-ভাড়া, বাড়ী-ভাড়া—কলিকাতা সহরে একটা রব উঠিয়াছে। বাড়ীর ভাড়া যে বাড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কোন কোন স্থলে খুব অসঙ্গত ভাবেই বাড়িয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। বাড়ী-ওয়ালাদের দিক হইতে ভাড়া বাড়াইবার যে কারণ দেখানো হইতেছে, সেটাকে একেবারেই উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কারণ জমির মূল্য, উপকরণাদির মূল্য যথার্থই অনেক বাড়িয়াছে। তাহার উপর demand and supplyএর কথাটাও বিবেচ্য। সহরে লোকসংখ্যা নিত্যই বাড়িতেছে। তার সঙ্গে-সঙ্গে সহরের আয়তনও কিছু কিছু বাড়িতেছে বটে, সহরতলীর দিকে সহর ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে বটে; এবং সহরে যে সকল পতিত জমি ও বস্তি ছিল, তাহাতে কোটা-বালাখানা নির্ম্মিত হইয়া লোকের বাস করিবার স্থানের পরিমাণ বাড়িতেছে বটে, কিন্তু লোকসংখ্যা তাহার অনুপাতে অনেক বেশী বাড়িতেছে; কাজেই মোটের উপর স্থানাভাব কিছুতেই মিটিতেছে না। তাহার উপর ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কার্য্য আরম্ভ হওয়া অবধি সহরে বাস্তবিকই স্থানাভাব ঘটিয়াছে। কাজেই বাড়ীওয়ালারা এখন 'গো' পাইয়া ভাড়া বাড়াইয়া দিতেছেন। এবং এই বর্দ্ধিত হারে ভাড়ার দাবী করাতেও বাড়ী একদিনের জন্য পড়িয়া থাকিতেছে না। পক্ষান্তরে যাঁহারা দীর্ঘকাল সহরে বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে হঠাৎ দেড়গুণ, দুইগুণ বর্দ্ধিত হারে ভাড়ার দাবী করায় তাঁহারাও যে আপত্তি উত্থাপন করিবেন, ইহাও খুবই স্বাভাবিক। সেই জন্যই বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে আইন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আইনের খসড়া সিলেক্ট কমিটীর হাতে গিয়াছে। 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই আইন পাশ হইয়া যাইবে। আমরা এই আইন সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া আর এক দিক দিয়া (from a different angle of vision) কথাটার আলোচনা করিতে চাহি।

অমঙ্গল হইতেও মঙ্গলের উৎপত্তি হয় বলিয়া একটা কথা আছে। বাড়ীর ভাড়াবৃদ্ধি ভাড়াটিয়াগণের পক্ষে নিশ্চয়ই অমঙ্গলজনক। তাঁহারা কি এই ঘটনার মুখটা অমঙ্গলের দিক হইতে মঙ্গলের দিকে ফিরাইয়া দিতে পারেন না? পারেন বোধ হয়। বাঙ্গলা সংবাদ ও সাময়িক পত্রের নিয়মিত পাঠকগণ বোধ হয় স্মরণ করিতে পারিবেন যে, বাঙ্গলা দেশে পল্লীবাসের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব অনেক দিন ধরিয়া চলিতেছে, এবং প্রায়ই তাহার আলোচনাও হইতেছে। মফস্বলের লোক সহরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করাতেই না পল্লীগুলি শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। পল্লীবাসের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, পল্লী শ্রীর পুনরুদ্ধার করিতে হইলে কাজেই তাঁহাদিগকে পল্লীভবনে ফিরিয়া যাইতে হয়। এখন যখন সহরে বাসের স্থানাভাব হইতেছে, বাড়ীর ভাড়া অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গিয়াছে, তখন পল্লীবাসের পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় শুভ অবসর উপস্থিত হয় নাই কি? অমঙ্গলের ভিতর হইতে উহাই ত মঙ্গলের সুন্দর সূচনা হইতে পারে। পল্লীভবনে ফিরিয়া যাইবার পক্ষে ম্যালেরিয়া, চোর ডাকাত, রাস্তা-ঘাটের অসুবিধা, ডাক্তার কবিরাজের অভাব প্রভৃতি যে সকল আপত্তি আছে, তাহাদের কথা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু গ্রামে ফিরিয়া না গেলেও ত তাহাদের প্রতিকার হইতে পারে না। এই সকল অসুবিধার প্রতিকার করিবে কে? উহাও ত আমাদিগকেই করিতে হইবে। সহরে বসিয়া থাকিয়া এ সকল হয় কি? সাঁতার না শিখিয়া জলে নামিব না প্রতিজ্ঞা করিলে যেমন কোন কালেই সাঁতার শিখিবার সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ গ্রামে ফিরিয়া গিয়া বাস করিতে আরম্ভ না করিলেও গ্রামের অভাব অভিযোগগুলির প্রতিকার হওয়া অসম্ভব। এখন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে; এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন না কেন? যাঁহাদের পল্লীগ্রামে বাড়ী-ঘর আছে, জায়গা-জমি আছে, যাঁহারা ঘর দোর তালাবদ্ধ করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন, যাঁহাদের কলিকাতা হইতে গ্রামে অল্পব্যয়ে ও অল্প সময়ে যাতায়াতের সুবিধা আছে, তাঁহারা যদি পরিবার-বর্গকে দেশে রাখিয়া গ্রামের বাড়ীতে সন্ধ্যা-দীপ দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতায় বিষয় কর্ম্ম করেন, তাঁহারা মেসে থাকিতে পারেন, যাঁহারা কিছুই করেন না, তাঁহারা পল্লীভবনে থাকিয়া সেখানকার পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ঘর বাড়ী জায়গা-জমির তত্ত্বাবধান করিতে পারেন। এইরূপে যদি ২০০০ পরিবার কলিকাতার মায়া কাটাইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে, এই দুই হাজার "ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের বাসোপযোগী ঘরভাড়া" ভাড়াটের অভাবে নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে। প্রত্যেক পরিবারের গড়ে লোকসংখ্যা পাঁচজন করিয়া ধরিলে এই দুই হাজার পরিবারের লোকসংখ্যা ১০০০০ হয়। এই দশ হাজারের মধ্যে অনুমান আড়াই হাজার পুরুষ বিষয়কর্ম্ম চাকুরী বা ব্যবসা উপলক্ষে

কলিকাতার বাস করিতে বাধ্য হইলেও ১০০০০ লোকের জন্য যতটা স্থান দরকার হইতেছিল, ২৫০০ লোকের জন্য তদপেক্ষা নিশ্চয়ই অনেকটা কম জায়গা লাগিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা এক সময়ে পল্লীবাসের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিতেছিলেন, তাঁহারা এমন একটা সুযোগ পাইয়াও সে সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিতেছেন না; অধিকন্তু, বাড়ী ভাড়ার বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তাঁহাদের মধ্যে আপত্তির কোলাহল, কলরবটাই যেন বেশী শুনা যাইতেছে।

ভারতগবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটা নূতন কাজে হাত দিয়াছেন,—"ড্রাগ্‌স ম্যানুফ্যাকচার কমিটি" নামে একটা কমিটি গঠন করিয়া, কমিটির হাতে, দেশীয় ভেষজের চাষ ও তাহা হইতে ঔষধ প্রস্তুত করার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার ভার দিয়াছেন। এই কমিটির সেক্রেটারী লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল এইচ, রস একটা কমিউনিক প্রচার করিয়া সাধারণকে জানাইয়াছে যে, কমিটি দুইটা কাজ করিবেন,—ভারতবর্ষে দেশীয় ঔষধ রূপে ব্যবহার্য্য গাছ-গাছড়ার চাষ করা কতদূর সম্ভবপর এবং ব্যবসায়ের হিসাবে তাহা হইতে ঔষধ প্রস্তুত করা কতখানি সম্ভবপর, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন। ঔষধ প্রস্তুত-কার্য্যের তদন্ত গবর্ণমেণ্টের মেডিক্যাল ষ্টোর ডিপোয় চলিবে। এবং যখন বুঝা যাইবে যে, অল্পব্যয়ে ঔষধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তখন প্রাইভেট কোম্পানীগুলিকে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া আপাততঃ কমিটি গঠিত হইয়াছে,—(১) ডাইরেক্টার জেনারেল, ইণ্ডিয়ান মেডিকাল সার্ভিস, সভাপতি; (২) এসিষ্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টর জেনারেল, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস সেক্রেটারী (৩) এগ্রিকালচারাল য্যাডভাইসার টু দি গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া; (৪) ডাইরেক্টার, বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া; (৫) ডাইরেক্টার, জিয়লজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া; (৬) মিঃ অফ, এম, হাউলেট, ইম্পীরিয়াল প্যাথোলজিক্যাল এণ্টমলজিষ্ট; (৭) এসিষ্ট্যাণ্ট ইনস্পেক্টর জেনারেল অব ফরেষ্টস; (৮) য্যাডভিসরি কেমিষ্ট, মান্দ্রাজ। কমিটিকে কোন চিঠিপত্র লিখিতে হইলে সেক্রেটারীর নামে, অফিস অব ডাইরেক্টার জেনারেল ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস এই ঠিকানায় চিঠি পাঠাইতে হইবে। এ পর্য্যন্ত এদেশে পাশ্চাত্য প্রণালীতে দেশীয় গাছ গাছড়া এবং খনিজ ও উদ্ভিজ্জ উপাদান হইতে শ্রীযুক্ত ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম-বি মহাশয় কর্ত্তৃক যে সকল ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে, এবং যাহা গত মহাযুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত, উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে, উক্ত কমিউনিকে তাহার একটা তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

ড্রাগস ম্যানুফ্যাকচার কমিটি গঠন করিয়া দেশীয় ঔষধের গাছ-গাছড়া এবং তজ্জাত ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ ও হাকিমি চিকিৎসা শাস্ত্রকে প্রকারান্তরে স্বীকার (recognise) করিয়া লইলেন কি না, তাহা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। যদি লইয়া থাকেন, অথবা অচির ভবিষ্যতে ল'ন, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হয়। কারণ, বহুদিন হইতে দেশবাসী এই 'প্রার্থনা' করিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ, পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষিত দেশীয় চিকিৎসকগণ ত বটেই, এমন কি, শুনিতে পাই, অনেক কবিরাজ মহাশয়ও আজকাল দেশীয় গাছগাছড়া হইতে য়ুরোপীয় প্রণালীতে ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আর দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ব্যবসায়ের হিসাবে ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েকটি দেশীয় কোম্পানীও গঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস দেশের গৌরবস্থল। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ড্রাগস লিমিটেড নামে আরও একটা ঐরূপ কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার দ্বারাও দেশীয় ঔষধ প্রস্তুতকার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি। বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেডের তরফ পূর্ব্বে, যে সকল দেশীয় ঔষধ বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় গৃহীত হইয়াছে,—তাহাদের একটা তালিকা এবং গুণাগুণ সম্বলিত একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন দেখিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া, আরও দুই একজন দেশীয় ভদ্রলোক এরূপ আরও দুই একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। সে অনেক দিন পূর্ব্বের কথা। তন্মধ্যে স্বর্গীয় ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোম, স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ইহার পরেও আরও অনেক দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে পাশ্চাত্য প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। সেগুলিকেও বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় গ্রহণ করিলে ভাল হয়।

গালার চুড়ী

[শ্রীসুশীলকুমার রায়]

অ

সে চুড়ী বেচত। গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তার, "চুড়ী চাই গো চুড়ী" শব্দে ছোট ছেলে-মেয়েদের বুকের ভেতর তরুণ রক্ত তালে-তালে নেচে উঠত—ঐ চুড়ী পরার আনন্দে।

ফৈজু যখন চুড়ী বেচতে ব'সতো, তখন মেলা ব'সে যেতো। তাদের মুখের দিকে চেয়ে সে চুড়ীর দাম ভুলে যেত। কেমন অন্যমনস্কভাবে প্রত্যেকের মুখের দিকে তার নিষ্প্রভ চোক-দুটী ফিরিয়ে কি যেন অনুসন্ধান ক'রত; তার পর একটা ব্যর্থতার চাপা শ্বাস ফেলে যা হয় বেচে উঠে প'ড়ত।

সন্ধ্যার সময় যখন ফৈজু, হাতের আঙ্গুলে গণনা করে লাভ-লোকসানের একটা হিসাব ক'রতে ব'সত, তখন দেখ্‌ত যে তার লাভ না হ'য়ে লোকসানই হ'য়েছে বেশী; উপরন্তু দু-একজোড়া গালার চুড়ী কারুর কচি হাতে পরিয়ে দিয়েছে।

বিছানায় শুয়ে সে তার বুকের ওপর হাত দুখানি চেপে কি যে প্রার্থনা ক'রত, সে অনেক সময় নিজেই বুঝতে পারত না; তবে তার মনে হ'ত, খোদা যেন তার আশা একদিন পূর্ণ ক'রবেন।

আ

গ্রামের কেউ জানত না যে ফৈজুর বাড়ী কোথায়। সে যেন একটা দম্‌কা হাওয়ায় উড়ে-আসা কুটোর মত; হয়ত আবার একটা জোর বাতাসে সে কোথায় চ'লে যাবে।

পুরো এক বছর কেটে গেছে। ফৈজু ঠিক একভাবে প্রত্যহ চুড়ী বেচে চ'লে যায়। আজকাল যেন তার সদা-মলিন মুখখানির ওপর গভীর নৈরাশ্যের একটা গোপন অতৃপ্তি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সে পথের ধারে কোন ছোট ছেলে দেখলে, হাঁ ক'রে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আর সেই সময়ে তার কোটরগত চক্ষু-দুটো উজ্জল হ'য়ে ওঠে।

বৈশাখ মাস। প্রাতে রোদের তেজে গ্রামখানি নিস্তব্ধ নিঝুম। ফৈজু চুড়ীর ঝাঁকাটি মাথায় ক'রে তার চির-অভ্যস্ত, "চুড়ী চাই গো চুড়ী" হেঁকে চ'লেছে; এমন সময় ফ্রক পরা একটি ফুটফুটে ছেলে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। ফৈজু দরজার কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার মাথার ওপর চুড়ীর ঝাঁকাটা একবার বড় জোরে কেঁপে উঠল। সে ধীরে ধীরে ঝাঁকাটি নামিয়ে ছেলেটির দিকে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইল। ছেলেটি বোধ হয় গ্রামে নূতন এসেছে; তাই, ফৈজুর শীর্ণ দেহ ও লম্বা দাড়ী দেখে ভয়ে বাড়ীর ভেতর পালিয়ে গেল।

ই

আজ ফৈজুর বুকের ভেতর একটা লড়াই চ'লেছে। সে সমস্ত রাত্রি ঘুমুতে পারলে না; বায়স্কোপের দৃশ্যের মত তার চোখের সামনে আজ লুপ্ত স্মৃতি সজীব হ'য়ে ফুটে উঠেছে। সে যে আজ প্রায় আট বৎসরের কথা। তারও সংসার ছিল, পরিবার ছিল, আর 'সাত রাজার ধন এক মাণিক' ছেলে ছিল। ফতেমার কোল থেকে কতদিন সে যে তাকে জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছে। তার সুন্দর কচি হাতে গালার সোনালী চুড়ী যখন সূর্য্য-কিরণে ঝক্-ঝক্ ক'রে উঠত, তখন তার সামনে যে জগৎ সংসার লুপ্ত হ'য়ে যেত। তবু প্রাণ ভ'রে ত' তাকে চুড়ী পরাতে পারেনি—ফতেমার ভয়ে। অত চুড়ী ভাঙ্গলে সংসার চ'লবে কেমন ক'রে?

তারপর একদিন হঠাৎ ফতেমা সব ছেড়ে অনন্তের পথে যাত্রা ক'রল। প্রাণের দুলাল কাসিমকে বুকে চেপে সে সব ভুলবে ভেবেছিল; কিন্তু সেও দুদিন পরে চ'লে গেল। তার মৃত্যু-মলিন মুখখানি যেন ব'লেছিল "বাবা, আবার এসে চুড়ী প'রব', তাই না সে তাকে পাবার আশায় ঘুরে 'বেড়াচ্ছে। ফৈজুর প্রাণ যেন ব'লছে, এই গ্রামেই তাকে পাবি; তাই এক বছর ধ'রে সে এখানে আছে, আর রোজ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আজ ফৈজু ছেলেটির মুখখানি দেখে পাগলের মত হ'য়ে গেছে। তবে কি তার কাসিম আবার ফিরে এসেছে! মুখখানি যে ঠিক তারই মত, সদ্য-প্রস্ফুটিত যুঁই ফুলের মতই সুন্দর। সে রাত্রে ফৈজু কেবল কাসিমকে স্বপ্ন দেখ্‌লে।

সকালে উঠেই ফৈজু সেই বাড়ীটার আনাচে-কানাচে "চুড়ী চাই গো চুড়ী" ব'লে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ছেলেরা সব ছুটে এল, আর তাদের সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে এল তার হারাণ মানিক। ফৈজু সকলকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে সেই ছেলেটিকে দুগাছা ভাল চক্‌চকে চুড়ী পরিয়ে দিলে; তারপর চোরের মত ঝাঁকা উঠিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল।

ঈ

আজ চার দিন থেকে ফৈজু সেই বাড়ীর কাছ দিয়ে হেঁকে যায়; কিন্তু কেউ ত' আর বেরোয় না। তার প্রাণ কেঁদে উঠল। সাহসে বুক বেঁধে দরজা ঠেলে সে বাড়ীতে ঢুকে প'ড়ল।

রোয়াকের ওপর পাঁচ-ছজন লোক বিসন্নমুখে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই ছেলেটি,—তার হারাণ মাণিক, তারই দেওয়া গালার চুড়ী হাতে উঠানে তুলসীতলায় প'ড়ে আছে। মৃত শিশুর মুখে তখন যেন স্বর্গের হাঁসিটি লেগে আছে!

ফৈজু বিহ্বলের মত খানিকক্ষণ সেইদিকে চেয়ে বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল।

এতক্ষণ ফৈজুর দিকে কারও নজর পড়ে নি। এইবার সকলের দৃষ্টি তার ওপর প'ড়ল। দুটি ছোট-ছোট ছেলে রোয়াকের ওপর থেকে আঙুল পেড়ে চেঁচিয়ে উঠল 'ঐ লোকটা, ঐ লোকটা" সকলে ফৈজুকে ডাইন, যাদুকর, বদ্‌মায়েস, ইত্যাদি ব'লে মারতে-মারতে বাড়ীর বার ক'রে দিলে। ফৈজু কাতর দৃষ্টিতে আর একবার তার হারাণ মানিকের দিকে চাইলে, তখন যেন সে হাসছে।

শ্মশানের চিতা ধৌত করে ফেরবার সময় সকলে দেখলে এক ঝাঁকা গালার চুড়ী কে গাছতলায় রেখে গেছে। সকলে একটু বিস্মিত হ'য়ে গেল। সেই দিন থেকে গ্রামে কেউ আর সেই চুড়ীওয়ালাকে দেখেনি।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'মোগল বিদুষী' প্রকাশিত হইয়াছে; ১৲।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'বীরপূজা' তৃতীয় সংস্করণ বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রিত হইল; মূল্য ১৷৹।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ প্রণীত ৷৹ সংস্করণের ৫০ সংখ্যক গ্রন্থ 'সুরেশের শিক্ষা' প্রকাশিত হইল মূল্য ৷৹।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত নূতন উপন্যাস 'স্মৃতি মন্দির' প্রকাশিত হইল; মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস 'চারুদত্ত' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২৲।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত 'মোহমুদ্গর'-মূল, অন্বয়, টীকা, ভাবার্থ, সরল বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য এক আনা মাত্র।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত এম এ প্রণীত 'পল্লীর প্রাণ' প্রকাশিত হইল; মূল্য ২৷৹।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.



বাউল

BY COURTESY OF
THE PHOTO TEMPLE

Blocks by
BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.



জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭

দ্বিতীয় খণ্ড] সপ্তম বর্ষ [ষষ্ঠ সংখ্যা

বেদ ও বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

(জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ জ্ঞান-প্রচার-সমিতির ষড়্‌বিংশতিতম অধিবেশনে পঠিত)

বেদ ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিচারের আবশ্যকতা কোথায়, এবং কি ভাবে, কি উদ্দেশ্যে সে সম্বন্ধ বিচার করিতে হইবে, তাহা আমরা মোটামুটিভাবে গতবারের বক্তৃতায় দেখাইয়াছি। এই সংশয় ও নাস্তিকতার যুগে, আমরা অনেকে অনভিজ্ঞ হইলেও, বিজ্ঞানের কথাগুলিতে আস্থাসম্পন্ন রহিয়াছি। এমন কি, আমাদের অবস্থার মাত্রা অনেক সময় চড়িয়া গিয়া, বিজ্ঞানের গোঁড়ামি নামে একটা অদ্ভুত ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া থাকে। বিজ্ঞানাগারে ঢুকিলেই দেখিতে পাই যে, বিজ্ঞান তার অনেক কথাই হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া, বেশ নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত করিয়া দেয়। দুইটা নিরাকার গ্যাস মিশাইয়া যে সাকার জল হয়, এ কথাটা আমি বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও, পরীক্ষায় প্রত্যক্ষের আমোলে আনিতে পারি। চুম্বকের শক্তি-রেখা (lines of force)গুলির একটা নক্সা বৈজ্ঞানিক আমাকে দেখাইলেন। আমি দেখিয়া প্রশ্ন করিলাম,—এইরূপ নক্সা যে সত্য সত্যই চুম্বকের শক্তি-সমাবেশ দেখাইতেছে, ইহা মানিতেছি কেন? বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন শুনিয়া তর্ক জুড়িয়া দিলেন না। আমায় পরীক্ষাগারে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, একখানা কাগজের উপর কতকটা লোহার গুঁড়া ছড়াইয়া, একটা যন্ত্র-সাহায্যে দেখাইয়া দিলেন যে, তাঁহার নক্সাখানি স্বকপোলকল্পিত নহে। X-ray নামক রশ্মি আমাদের দেহের ভিতরের অস্থি-সংস্থান প্রভৃতি সবই একরূপ দেখাইয়া দিতে পারে, এ কথাটার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঐ মেডিক্যাল কালেজের পরীক্ষাগারে আমরা প্রত্যহই পাইতেছি। এই সব দেখিয়া-শুনিয়া বিজ্ঞানের কাছে আর আমরা মাথা তুলিতে পারি না। ছোটো একটা পরীক্ষা দেখিয়া তাহার সকল কথাই একপ্রকার নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে যাই। ইহাতে কিছু গোল আছে। সকল পরীক্ষাকেই এক জাতীয় মনে করিয়া

আমরা ভুল করি। বিজ্ঞানের কতক-কতক পরীক্ষার ফলাফল একরূপ প্রতিষ্ঠিতই হইয়াছে,—এরূপ মনে করিলে তেমন দোষের হইবে না; কিন্তু অনেক পরীক্ষার ফলাফল এখন পর্য্যন্ত অব্যবস্থিত রহিয়াছে, অথচ সে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা, মতবাদ খুবই চলিতেছে। আবার, এমন অনেক স্থল আছে, যেখানে কথার কাটাকাটি, মতবাদের ছড়াছড়িই বেশী, কিন্তু সে সব স্থলে হাতে-কলমে পরীক্ষা এখনও বিশেষ কিছু হয় নাই, অথবা করিতে পারা যায় নাই। পিতামাতার স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্মগুলি (acquired characters) সন্তান উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইবে কি না; আমি বেশী পড়াশুনা করিয়া চোখ-দুটা মাটি করিয়া গেলাম,—আমার সন্তান কৃপণ-দৃষ্টি-শক্তি হইয়া জন্মিবে কি না;—এই সব কথা লইয়া পরীক্ষা করিয়া ভ্যাইজমান সাহেব রায় দিলেন—না, ঠিক স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্মগুলি সন্তানে সংক্রামিত হয় না। কিন্তু তাঁহার পরীক্ষা এখনও সকলে মানিয়া লন নাই; পরীক্ষা এখনও চলিতেছে এবং বিভিন্ন পরীক্ষকের ফলাফলেরও কিছু-না-কিছু ইতর বিশেষ হইতেছে। শেষ পর্য্যন্ত হয় ত ভ্যাইজ্‌মান সাহেবের কথাটা টিকিয়া যাইতে পারে; কিন্তু এখনও সংশয় রহিয়াছে প্রচুর। একজনের পরীক্ষা অপরে নাকচ করিয়া দিতেছে; পূর্ব্ব-পরীক্ষা উত্তর-পরীক্ষা দ্বারা সংশোধিত হইয়া যাইতেছে। বোতলে খানিকটা জল লইয়া, বেশ করিয়া ফুটাইয়া ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিয়া একজন হয়ত দেখিলেন, জলে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম সজীব পদার্থ আবার আপনা হইতেই দেখা দিল; অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া গেলেন—জড় পদার্থ হইতে সজীব পদার্থের স্বাভাবিক উৎপত্তি (spontaneous generation) হইতে পারে। কিন্তু আবার অপরে সেই পরীক্ষাটি অধিকতর সাবধানতার সহিত করিয়া দেখিলেন—না, বোতলের জলে আর সজীব কিছু জন্মায় না, যদি বাহিরের বাতাস প্রভৃতির সঙ্গে সে জলের কোনও রূপ সংস্পর্শ না থাকে। মেলা দৃষ্টান্ত লইয়া কাজ নাই। কয়েকটা মোটামুটি কথা ভুলিয়া গেলেই আমরা বিজ্ঞানের অন্ধ স্তাবক এবং গোঁড়া ভক্ত হইয়া বসি। বস্তুতঃ, হালের এই প্রকৃতি-বিদ্যা বা অপরাবিদ্যা মায়াবিনী। তার আজব কাণ্ডকারখানায় তাক্ লাগিয়া যাইবারই কথা। Poulet এবং Ross Smith বিমানে চড়িয়া আকাশ-পথে পৃথিবীর কোন্ প্রান্ত হইতে আমাদের এই সহরের উপর আসিয়া পড়িলেন; আমরা সারাটা জীবন পদব্রজে কেরাণীগিরি করিয়া বসুন্ধরার বসুর পরিচয় ত ধূলোকাদারই মধ্যে পাইলাম; সেই রামায়ণ মহাভারতের পুষ্পক রথ, কপিধ্বজ-রথ প্রভৃতির কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি নাই; আজ যে সত্য-সত্যই আকাশ-পোত পক্ষবিস্তার করিয়া আমাদের মাথার উপরে উড়িয়া বেড়াইতেছে, ইহা দেখিলে আমাদের অবাক্ হইবারই কথা। বিজ্ঞানের এই সব ইন্দ্রজাল দেখিয়া আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি। অপিচ, বিজ্ঞানাগারে এক-আধবার ঢুকিয়া হাতে-কলমে পরীক্ষার যে দুটো-একটা ফলাফল দেখিয়াছি, তাহাতে প্রত্যয় খুবই দৃঢ় হইয়াছে। বিজ্ঞান বা Scienceএর কথা শুনিলে মাথা নাড়িতে আর সাহস হয় না। এই যে বিশ্বাসের বাড়াবাড়ি, এটা কিন্তু একটা মোহ। এই মোহ জমিয়া ঘোট হইয়া থাকিলে মানবাত্মার স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নাই।

কেন বিজ্ঞানের সাক্ষ্যকে চরম সাক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না, তাহার একটা নিদান পূর্ব্বের বক্তৃতাতেই দিবার চেষ্টা করিয়াছি। সংক্ষেপে, গোটা-দুই-তিন কথার মধ্যেই বিজ্ঞানের অপ্রতিষ্ঠা ও অব্যবস্থার একটা নিদান আমরা খুঁজিয়া পাই। প্রথমতঃ, বিজ্ঞান যে সমস্ত যন্ত্রপাতি লইয়া পরীক্ষা করে, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ ও চরম নহে। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহার দ্বারা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি হইয়া থাকে, তিনি সাধারণতঃ পক্ষপাতশূন্য, রাগ-দ্বেষাদি-সংস্পর্শ-রহিত নহেন; অথচ পরীক্ষা বিশুদ্ধ হইতে গেলে পরীক্ষককে পক্ষপাতশূন্য হইতেই হয়। তৃতীয়তঃ পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিয়া যে সমস্ত ব্যাখ্যা ও মতবাদ (theories) গড়িয়া তোলা হয়, তাহাতে বিশ্লেষণ-দোষ, বিচার-দোষ প্রভৃতি অল্পাধিক থাকিবারই সম্ভাবনা; কাজেই মাল-মসলা পহিলা নম্বরের হইলেও, গড়িবার দোষে সিদ্ধান্তের ইমারতগুলি বেশ পাকা হইয়া গড়িয়া উঠে না। একই মাল-মসলা লইয়া কেহ গড়িতেছেন শিব, কেহ বা গড়িতেছেন বানর। ডারউইন ও ওয়ালেস্ উভয়েই সম-সাময়িক বৈজ্ঞানিক-ধুরন্ধর। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা লব্ধ তথ্যগুলি দুজনারই প্রায় একরূপ; সাধারণতঃ মতবাদেও উভয়ের মধ্যে মিল্ আছে। কিন্তু মানবের পূর্ব্বপুরুষ খুঁজিতে গিয়া একজন কিষ্কিন্ধ্যায় হাজির হইলেন; অপর

জন কিন্তু সকল প্রমাণের নিগমন দেখিলেন বাইবেলের সেই মহাবাক্যে—ভগবান্ মানুষকে নিজের অনুরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রধানতঃ এই তিন কারণে, বিজ্ঞানের যে আয়তন, তাহা শিথিল ও ভঙ্গুর। শুধু যে উপরের ইমারৎখানাই ভঙ্গুর এমন নহে, তাহার বুনিয়াদও খুব সুস্থির নহে। সে দিন বলিয়াছিলাম, নিউটনের মানসপুত্র গতিবিজ্ঞান (Dynamics) দুর্যোধনের মত গত দুই-তিন শতাব্দী ধরিয়া কতই আস্ফালন করিতেছিল; কিন্তু আইনষ্টাইন প্রভৃতির গদাঘাতে তাহার সম্প্রতি উরুভঙ্গ হইয়াছে। যে মাপ-কাটির সাহায্যে এতদিন আমরা প্রকৃতির হিসাব লইতেছিলাম, সে মাপকাটিতে সম্প্রতি ভুল ধরা পড়িয়া গিয়াছে; সে ভুল শারিয়া লইতে না পারিলে আমাদের হিসাব বিশুদ্ধ হইবে না। নিউটন-লা'গ্রাঞ্জের শিষ্যেরা যে সাধ করিয়া এতদিন জুয়াচুরি করিয়া আসিতেছিলেন তাহা নহে; নূতন কতকগুলি আবিষ্কার ও পরীক্ষা—যেগুলি নিউটনের সময়ে হয় ত আদৌ সম্ভবপর ছিল না—আমাদের ভুল ধরিয়া ফেলিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইখানে সাটে বুঝিবেন, আমি কোন্ পরীক্ষাগুলির প্রতি ইঙ্গিত করিতেছি—মলি-নিকেলসন এক্সপেরিমেন্ট, রেস-র‍্যালি এক্সপেরিমেন্ট, লোরেঞ্জ-ফিট্জেরাল্ড এক্সপেরিমেন্ট প্রভৃতি। যাহা হউক, এই শেষ কথাটা খুব গুরুতর হইলেও, আজ আর ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। ফল কথা, এই সব নানা কারণে বিজ্ঞানে গোঁড়ামি মোটেই শোভা পায় না। 'বিজ্ঞান' এই নামটা শুনিবামাত্রই আমাদের ভয়ে ও বিস্ময়ে 'হতভম্ব' হইবারও কিছু অজুহাত নাই।

পক্ষান্তরে, সেদিন সিদ্ধাশ্রমের গোঁড়ামির কথারও আমরা উল্লেখ করিয়াছিলাম। যাঁহারা সিদ্ধাশ্রমের আশ্রমী, তাঁহাদের গোঁড়ামি না থাকারই কথা; যেমন, যাঁহারা বিজ্ঞান-মহাতীর্থের বড় বড় পাণ্ডা, তাঁহাদের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ও অভিমান কম থাকিতেই দেখা যায়। কিন্তু একদিকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছড়িদার মহাশয়েরা যেমন দল পাকাইয়া গোল বাধাইয়া থাকেন, সেইরূপ অন্যদিকে সাধনের ক্ষেত্রেও, চেলা-মহারাজেরা সত্যের সরলতা ও উদারতার কথা ভুলিয়া গিয়া, অনেক সময়ে কূপ-মণ্ডুক হইয়া বসেন। আসনে বসিয়া স্বহস্তে নাসিকা ও কর্ণ মলিলেই তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শী হইয়া গেলাম; ছাপার অক্ষরে যাহাই পড়িতেছি, তাহাই অভ্রান্ত বেদবাক্য;—এই এক রকম ভীষণ অন্ধতমিস্র আমাদের অনেককেই অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা হইতেও পরিত্রাণ চাই। পরিত্রাণের জন্য তর্কের ঝুলির ভিতর ঢুকিলে চলিবে না। পরীক্ষা ও সাধনা চাই। বিজ্ঞান নিজে অপ্রতিষ্ঠিত ও অসিদ্ধ হইলেও, পরীক্ষামূলক বলিয়া অনেক সময়ে, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে না হউক আভাসে-ইঙ্গিতে, সত্যের সূত্র আমাদিগকেও ধরাইয়া দিয়া থাকে। বিশেষতঃ, যেখানে সংশয় ও ক্লৈব্য আসিয়া অর্জ্জুনের মত আমাদিগকেও ঘিরিয়া ধরিয়া বিনাশের পথে টানিয়া লইতে চায়, সেখানে বিজ্ঞানের দেওয়া সূত্র ধরিয়া আমরা সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দেখিবার মত ভূমিতে ক্রমশঃ গিয়া উপনীত হইতে পারি এবং পরিণামে ছিন্নসংশয় ও বিগতজ্বর হইতে পারি। অর্জ্জুন স্বয়ং ভগবানের মুখ হইতে কত সাংখ্যযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি শুনিলেন; কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ছিন্নসংশয় হইতে পারিলেন না, যতক্ষণ না দেখিলেন ভগবানের বিশ্বরূপ। এই দেখা বা অপরোক্ষ জ্ঞান না আসা পর্য্যন্ত জীবের সুস্থিরতা নাই। বিজ্ঞানও সত্যকে, ভূমা না করিয়া হউক, অল্প করিয়াও দেখাইতেছে। কিছুই না দেখার চেয়ে এ দেখায় লাভ আছে। যেমন করিয়াই হউক, দেখিয়া শুনিয়া পরীক্ষা লইবার একটা নেশা জীবনে আসিলে, ক্রমে কিছুই আসিতে বাকী থাকিবে না। যে বৈজ্ঞানিক হয় ত সারা জীবনটা জড়তত্ত্ব লইয়া পরীক্ষা ও গবেষণায় কাটাইয়াছেন,—হঠাৎ বুড়া বয়সে তাঁহার বিজ্ঞানাগারের দ্বারে দুটো-একটা অধ্যাত্মতত্ত্ব ছুটকাইয়া আসিয়া পড়িলে, তিনি নিশ্চিন্তও থাকিতে পারেন না, অতি বিজ্ঞের মত তুড়ি দিয়া উড়াইয়াও দিতে পারেন না। তাঁহার চির-পরিচিত জড়ের রাজ্যে যে কঠোর পরীক্ষার ব্যবস্থা তাঁহাকে চালাইতে হইয়াছে, সেই ব্যবস্থামতই, তিনি নূতন অতিথিকে নিজের জ্ঞান-বিশ্বাসের এলাকাভুক্ত করিয়া লইতে প্রয়াস পান। যতক্ষণ তাহা না করিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই। ইহাকেই বলে দেখার নেশা। স্যার অলিভার লজ্, স্যার উইলিয়ম ক্রুক্স, আরও কত কে, এই নেশাতেই পাগল। বিজ্ঞানাগারের জানালা-দরজাগুলি বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া যাঁহারা গ্যাসের ধূমে সমাধি পাইবেন এই আশাতেই টেষ্ট-

টিউব নাকে গুঁজিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের সিদ্ধি অবশ্যই ভাবনানুরূপ হইবে। কিন্তু যাঁহারা দরজা-জানালা-গুলি একটু ফাঁক করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা দৈবাৎ দু'-একজন নূতন অতিথিকে অতর্কিতভাবে দ্বারে আসিয়া পড়িতে দেখেন। পশ্চিম দেশে এই নূতন অতিথি সম্প্রতি Psychic Research, Spiritualism প্রভৃতি। কিন্তু, ঐ যা বলিলাম, নূতন কিছু আসিলেই তাহাকে বিনা পরীক্ষায় ও বিনা বিচারে উপাদেয় বা হেয় মনে করা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাগারগুলির দস্তুর নহে। তাই সেখানে সকলকেই প্রাচীন অর্ব্বাচীন সকল কথাগুলাকেই—টিকিট দেখাইয়া, গেটপাশ লইয়া ভিতরে ঢুকিতে হয়; সাধাপক্ষে গোঁজা-মিল সেখানে চলে না। এই যে অপরোক্ষানুভূতির জন্য তীব্র স্পৃহা ও প্রাণপণ সাধনা—এটা বড় কম কথা নহে;—অপরোক্ষানুভূতির লক্ষ্য ও বিষয় আপাততঃ যাহাই হউক। বিষয়টা যদি আপাততঃ তুচ্ছও হয়, তবুও এই স্পৃহা ও সাধনার একবার মোড় ফিরাইয়া লইতে পারিলে, তাহাদিগকে নিখিল অভ্যুদয় ও সাক্ষাৎ নিঃশ্রেয়সের উপায় করিয়া লইতে বড় একটা বেগ পাইতে হয় না। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলির জন্য তাহার আদর যতটা করিতে হয় আর নাই ই হয়,—তাহার জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা, এই দুইটা জিনিষকে আমাদের আদর করিতেই হইবে। আমাদের অনেকের মধ্যে এই জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসার বড়ই অভাব দেখা গিয়াছে। অথচ ভিতরে বেদ ও শাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে সংশয়ের আদি-অন্ত নাই। ভাবের ঘরে চুরি করিয়া যদি বা মুখে সায় দিয়া যাইতেছি—তবুও আমাদের সাধন-ভজন, উদ্যোগ-অনুষ্ঠান, কাজকর্ম্ম এতই শিথিল, পঙ্গু ও অশোভন হইয়া পড়িতেছে যে, সে ভাবের ঘরের চুরি আর কোন মতেই ছাপিয়া রাখা চলে না। দৃষ্টান্ত দিয়া এ কথাটাকে ফেনাইতে হইবে কি? যাঁহারা গতানুগতিক ভাবে মুখে সায় দিয়া যাইতেছেন, কাজকর্ম্মেও বিধিনিষেধগুলি একটু-আধটু মানিয়া চলিতেছেন, তাঁহাদেরও অন্তরে সংশয়-অবিশ্বাস গাঢ় হইয়া উঠিতেছে; কায়মনোবাক্যের মধ্যে বেশ একটা মিল পাতাইয়া লইবার মত বল ও সাহস ইঁহাদের নাই। পক্ষান্তরে, যাঁহারা মুখে সায়ও দেন না, কাজকর্ম্মেও শাস্ত্র-তন্ত্রতা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের রোগ, ঐ দুর্ব্বলতা ও অবসাদ। জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষার বালাই কোন পক্ষেই নাই। আস্তিকও চোখকাণ বুজিয়া চলিতেছেন, নাস্তিকও তাহাই। তবে নাস্তিক মহাশয় একটু বাচাল বেশী, এই যা তফাৎ। আসল কথা, এইরূপ আস্তিক বা নাস্তিক হইয়া থাকার চেয়ে মরিয়া থাকা ভাল। আমাদের বর্ত্তমান বেদ ও বিজ্ঞানের আলোচনার উদ্দেশ্য—এ রোগের একটা প্রতিকার ভাবিয়া দেখা। কালাপাণি পার হইয়া না আসিলে আজকাল কোন জিনিসেরই সম্যক্ কদর আমাদের কাছে হয় না। কাজেই, এই আলোচনাগুলির মধ্যে যদি প্রাচীন বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিকে অন্ততঃ একটা সমস্যার (problemএর) মতও পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষার ভিতরে আনিতে পারি, তবে সে প্রাচীন ঘরওয়া জিনিসগুলা আমাদের কাছেও কতকটা আদরণীয় হইয়া পড়িতে পারে। তন্ত্রের নাম শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করা আমাদের মধ্যে একটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,—কিন্তু বন্ধুবর স্যার জন উড্রফ তন্ত্রকে এমন সাজে আমাদের কাছে উপনীত করিয়াছেন যে, তাহাকে আপনার বলিয়া ঘরে বরণ করিয়া লইতে আমরা অনেকেই আবার গৌরব বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। পরীক্ষার উপযোগী বিষয় পাইলে আমরা হয় কিছুই না করিয়া চুপ করিয়া থাকি, নয় সবজান্তা পুরুষের মত হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি। কিন্তু পশ্চিমের ধারা অন্যরূপ। গঙ্গাজলে radio-activity আছে কি না এ প্রশ্নে কোন পক্ষেরই কিছু ইষ্টানিষ্ট নাই; অথচ এ প্রশ্ন কেহ তুলিলে, সমাধান যাহাই হউক, তাহার জন্য একটুও চিন্তিত না হইয়া, হয় কাণে আঙ্গুল দিই, নয় হাসিয়া উড়াইয়া দিই। যিনি আস্তিক্যের বড়াই করেন, তাঁহার ভয়—এ প্রশ্নটা লইয়া বিবেচনা চলিলেই যেন পতিতপাবনী গঙ্গার পাতিত্য ঘটিবে; আর যিনি আলোয় আসিয়াছেন, তাঁহার অসহিষ্ণুতার হেতু—জগতে এত কাজ পড়িয়া থাকিতে, কোথায় গঙ্গাজলে কি সূক্ষ্ম অশ্বডিম্ব আছে তাহাই খুঁজিয়া-পাতিয়া বেড়ান! কিন্তু, পশ্চিমের পণ্ডিতেরা এই দশ-বিশ বছরের মধ্যে radio-activityর সন্ধানে জল, মাটি, বাতাস প্রভৃতি ভূতগুলাকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক Sir J. J. Thomson তাঁহার Electricity and Matter নামক গ্রন্থে বলিতেছেন—"These radio-active sub-

stances are not confined to rare minerals. I have lately found that many specimens of water from deep wells contain a radio-active gas, and Elster and Geitel have found that a a similar gas is contained in the soil." অর্থাৎ গোটা কয়েক পদার্থেই যে radio-activity, একান্ত ভাবে আবদ্ধ, তাহা নহে। আমি স্বয়ং নানা রকমের জলে এই শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। অপরে আবার মৃত্তিকার মধ্যেও এই শক্তি দেখিতে পাইয়াছেন। রাদারফোর্ড সাহেব এই অভিনব বিজ্ঞানের একজন প্রধান ঋষি। তিনি তাঁহার Radio-activity নামক গ্রন্থে (৫১১ পৃঃ) Sir J. J. Thomsonএর উক্ত পরীক্ষার কথার উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন -"This led to an examination of the waters from deep wells in various parts of England, and J. J. Thomson found that in some cases, large amount of emanation could be obtained from the well-water." পরে Adams সাহেব কূপোদক লইয়া আরও বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করেন। রাদারফোর্ড সাহেবের ভাষায় পরীক্ষার ফল ইহাই মনে করা চলিতে পারে -"Thus it is probable that the well-water, in addition to the emanations mixed with it, has also a slight amount of a permanent radio active substance dissolved in it." কাজেই দেখিতে পাইতেছি যে, পশ্চিমের পণ্ডিতেরা স্থানে-স্থানে মাটি, জল, বাতাস প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়াটা ইতরের কাজ বলিয়া মনে করেন না। রাদারফোর্ড সাহেবের উক্ত প্রামাণিক গ্রন্থে একটা প্রকাণ্ড অধ্যায়ই রহিয়াছে—"Radio-activity of the atmosphere and of other elements" ইহার মধ্যে কত জনের কত পরীক্ষার ফলাফলের কথা নিবদ্ধ হইয়া আলোচিত হইয়াছে। আমরা যদি আমাদের দেশের নদীনালা, পাহাড়, মাঠ প্রভৃতি স্থানে ঐ জাতীয় পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিই, তাহা হইলে কি একেবারে সর্ব্বনাশ হইবে? হইলই বা হিন্দুদের আরাধ্য নদনদীর উদক, অথবা অভীষ্ট তীর্থস্থানের পবিত্র ভূমি। পশ্চিম-দেশের পরীক্ষার ফলেও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের radio-activity বা তাড়িত রেণু-বিকীরণ-শক্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে; আমাদের দেশেও উইলসনের হোটেল এবং বিশ্বেশ্বরের মন্দির এতদুভয় স্থানের মধ্যে যদি ঐ শক্তির তারতম্য দেখিতে পাই, তবে তাহাতে মনস্তাপ বা বিস্ময়ের কিছু আছে কি? আসল কথা, নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা চাই। পরীক্ষার ফলাফল যাহাই হউক না কেন, তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ধর, পরীক্ষার ফলে পাইলাম যে, কূপোদকের মত গঙ্গোদকেও ঐ শক্তি আছে। তখন প্রশ্ন উঠিবে—ঐ শক্তি থাকা না থাকার সঙ্গে জলের পবিত্রতার কি সম্পর্ক আছে? ঐ শক্তির সদ্ভাব জলকে কি কোনও বিশেষ গুণসম্পন্ন করিয়া থাকে যে, তাহার জন্য সে জল আদরণীয় হইবে? যে পদার্থের অণুগুলা (atom)র মধ্যে একটা বিপ্লব, ভাঙ্গাযোড়া চলিতেছে, যে পদার্থের ভিতর হইতে অণু হইতেও সূক্ষ্মতর এবং অণুর দানা-স্বরূপ তাড়িত-কণাগুলি প্রবলবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, সেই পদার্থকে, আধুনিক বিজ্ঞানের পরিভাষা মত, radio active বলা হয়। বেদের জড়তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া ইহার কথা আমাদের বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে; আপাততঃ প্রশ্ন এই: গঙ্গোদক যদি বা এইরূপ লক্ষণবিশিষ্টও হয়, তবে তাহাতে আসিয়া যাইল কি - গঙ্গামাহাত্ম্য বাড়িবার বা কমিবার সম্ভাবনা হইল কোথায়? খুব ধীর ভাবে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজিবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রশ্নটা একেবারে বাজে না হইতেও পারে। Sir J. J. Thomsonএর গভীর কূপোদকে ঐ শক্তির আবিষ্কারটা অবাস্তর ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দিবার নহে।

Radio-active পদার্থগুলি অফুরন্ত তাপের ভাণ্ডার, ইহা আমরা পরীক্ষায় দেখিতে পাইয়াছি। সামান্য এক-টুক্রা রেডিয়াম এত তাপ ছড়াইতে পারে যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বৈজ্ঞানিকেরা তাহার ভিতরে তাপ জন্মিবার একটা ব্যাখ্যাও দিয়া থাকেন। কিন্তু ব্যাখ্যা যাহাই হউক, কথাটা সত্য। এখন, এই রেডিয়াম যে দুর্ব্বাসা মুনির মত গরমই হইয়া আছেন, এ কথাটা স্মরণ রাখিলে, আমাদের পৃথিবীর বয়স-নিরূপণ-সমস্যার মধ্যে একটা নূতন আলোক-রেখাপাত আমরা পাইলাম মনে হয়। আমাদের পৃথিবীর ভিতরটা ক্রমেই নীচের দিকে

গরম হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অনুমান হয়, পৃথিবী এক সময়ে ভিতরে-বাহিরে খুবই গরম ছিল ; এখন ক্রমে বাহিরটা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্তরের জ্বালা এখনও নিভে নাই। তাপ বিকীরণ (radiation)-এর ধারা অনুসারে এইরূপে বাহিরে ঠাণ্ডা কিন্তু ভিতরে গরম হইয়া থাকিতে পৃথিবীর যে কত কোটি বৎসর লাগিয়াছে, তাহা প্রসিদ্ধ লর্ড কেলভিন্ গণিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর গভীরতর স্তরগুলিতে যদি যথেষ্ট পরিমাণে রেডিয়াম-জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তবে পৃথিবীর তাপের উৎপত্তি ও পরিণতির ব্যাখ্যা অন্যরূপ দাঁড়াইয়া যাইতে পারে---অন্ততঃ পক্ষে কেল্ ভিন্ সাহেবের আঁকের খাতাখানা অনেকাংশে সারিয়া লওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। অক্লান্ত ভাবে ও প্রচুর পরিমাণে তাপ যোগাইবার ভার যদি পৃথিবীর গর্ভস্থ রেডিয়াম গ্রহণ করিয়া থাকে, অন্ততঃ আংশিক ভাবেও, তাহা হইলে পৃথিবীর বয়সের আনুমানিক ইতিহাসটা বোধ হয় আবার আমাদের ঢালিয়া সাজিতে হয়। আদৌ গরম জিনিস ক্রমে ঠাণ্ডা হইতে-হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে,—ঠিক এমনটা কয়েক কোটি বৎসরের মধ্যেই হয় ত না হইয়া থাকিতেও পারে। পৃথিবীর গর্ভে radio-activity-র যে যজ্ঞাগ্নি প্রতিনিয়ত জ্বলিতেছে, তাহাই হয়ত পৃথিবীকে প্রায় এমনি ধারা বাহিরে ঠাণ্ডা কিন্তু অন্তরে গরম অনেকদিন ধরিয়া করিয়া রাখিয়াছে। ফল কথা, এই যজ্ঞ যখন পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাপ-জননের একটা মুখ্য কারণ, তখন ইহাকে বাদ দিয়া পৃথিবীর ইতিহাস খাড়া করিতে গেলে, ভুল হইবে এবং লর্ড কেল্ভিনের সে ভুল সম্ভবতঃ হইয়াছিল। গভীর কূপের জলে সত্য-সত্যই radio-activity ধরা পড়িয়া এ কথাগুলাকে কল্পনা-জল্পনার ভিতর হইতে টানিয়া নিশ্চয় কোটির কাছাকাছি অনেকটা আনিয়া দেয় না কি? পৃথিবীর স্তরগুলিতে radio-active পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও থাকিতে পারে, এবং তাহাই পৃথিবীর অন্তর্দাহের (Plutonic energy-এর) একটা মুখ্য কারণ,—এ কথাতে আর বিস্ময়ের কিছুই আমরা দেখিতেছি না। অতএব পরীক্ষা সামান্য বিষয় লইয়া হইলেও, তাহার ফলের দাম অসামান্য হইতে পারে। গঙ্গোদক প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা এই কারণে তুচ্ছ ও অনাদরণীয় মনে করা কর্ত্তব্য হইবে না। বায়ুশূন্য কাচপাত্রের মধ্যে বিজলি লইয়া রং-বেরঙ্গের খেলা করা এক সময়ে বিজ্ঞানাগারে একটা কৌতুকের ব্যাপার ছিল; কিন্তু এখন এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, বিংশ শতাব্দীর নূতন পদার্থ-বিজ্ঞানটাই ঐ নির্ব্বাত কাচপুরীর মধ্যে একরূপ ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা এ রহস্য অবগত আছেন। আর স্বয়ং radio-activity-র গরিমার ত সীমা নাই। আজকালকার বৈজ্ঞানিক জড়তত্ত্বের রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছে—মর্ম্মকথা শুনাইয়াছে, আমাদিগকে এই রেডিয়াম। ইহা না আসিলে জড়ের কুহক আমাদের এত শীঘ্র, এত সহজে ভাঙ্গিত না;—আমরা চিনিতাম না যে, যাহাকে জড় রূপে বহুধা দেখিতেছি, তাহা মূলতঃ, ব্যোমে শক্তির বিচিত্র খেলা বই আর কিছুই নহে। অতএব, পরীক্ষা ছোট জিনিস লইয়া হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। প্রথমতঃ, জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষার আগ্রহ নূতন করিয়া আমাদের মূর্চ্ছিত জাতীয় প্রকৃতির মধ্য হইতে জাগাইয়া তোলার জন্য দরকার—পরীক্ষা;—তা গঙ্গাজল লইয়াই হউক আর গোময় লইয়াই হউক। পরীক্ষা ছাড়া, একরূপ আন্দাজি কথা লইয়া আলোচনা আমাদের দেশে চলিয়াছে, সেটার নাম গবেষণা; এবং সেটাকে যিনি গলদ্‌গোময় বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনি নিতান্ত অবিচার করেন নাই। কিন্তু আমি যে জাতীয় পরীক্ষা ও বিচারের জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, তাহা প্রাচীনকালে এদেশে ছিল, কিন্তু এখন অন্ততঃ আমাদের মত শিক্ষিতাভিমানীদের কাছে ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। চায়ের পেয়ালায় ঝড়-তুফান তুলিয়া এখন আমরা সকল বিষয়ে কেল্লা ফতে করিয়া ফেলিতে চাই। কিন্তু, শুদ্ধ চালাকির জোরে জাতিটা বড় হইয়া উঠিবে কি?

একদিকে যেমন আমাদের প্রত্যয় উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানাগারে ঢুকিবার প্রয়োজন আছে, অন্যদিকে তেমনি বিজ্ঞানের গোঁড়ামি ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার দৃষ্টি প্রসারিত, নির্ম্মল ও সঙ্কোচহীন করিবার জন্য সিদ্ধাশ্রমে যাইবার প্রয়োজন আছে—একথা পূর্ব্বেই আমরা হেতুবাদ দেখাইয়া জানাইয়া রাখিয়াছি। অনেক ব্যাপারের পরীক্ষা বিজ্ঞানাগারে সম্ভবপর হইবে না। সে সকল ব্যাপারের পরীক্ষার জন্য তপোবন-যাত্রার আবশ্যকতা রহিবে।

আমাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে ক্রমশঃ আমরা এ আবশ্যকতা দেখিতে পাইব।

প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য, বিজ্ঞানাগারে ঢুকিবার পূর্ব্বে, বিজ্ঞানের অনেক হাল কথাবার্ত্তা শুনিয়া লইলেও, অনেক সময়ে সে সকলের মধ্যে তথ্যানুসন্ধানের সূত্র ধরিতে পাই। গীতায় স্বয়ং ভগবানের মুখে শুনিলাম—"যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যঃ"; কিন্তু প্রত্যয় হইতেছে না। ঠিক প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য অবশ্য সত্য-সত্যই বিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কিন্তু বিশুদ্ধ ভাবে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে যজ্ঞ করিবার পথে হাঙ্গামা বিস্তর। তা ছাড়া, সে অনুষ্ঠানে আদৌ আমার প্রবৃত্তি দিবার জন্য কতকটা প্রত্যয় মনে আসা দরকার। কেন মিছে আগুনে ঘি ঢালিয়া মরিব? আমি মন্ত্র পড়িয়া আগুনে ঘি ঢালিব, আর তাহা গিয়া আকাশে মেঘমালা রচিয়া দিবে—ইহা কি আদৌ বিশ্বাস যোগ্য কথা? এ জাতীয় প্রশ্ন মনে উঠিয়া থাকে। এবং বিজ্ঞানের হাল কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং পরীক্ষা দেখিয়া যদি এ প্রশ্নগুলার কোনও রকম একটা জবাবের সূত্র পাই, তাহা হইলে তাহাতে সুবিধা হইল না কি? আমরা স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের দুটা একটা কথা পাড়িয়া দেখাইয়াছিলাম যে, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্যের সৃষ্টি সম্ভবপর হইতেও পারে। মন্ত্র সম্বন্ধে আরও দুটো-একটা আজগবি কথার, বিজ্ঞানের তরফ হইতে, কৈফিয়ৎ দিতে আমরা প্রয়াস পাইয়াছিলাম। আমাদের বর্ত্তমান আলোচনাগুলির মধ্যেও প্রসঙ্গক্রমে সেই সকল কথা আবার পরীক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইবে। সে সকল কথার প্রকৃষ্ট আলোচনার জন্য জড়তত্ত্ব আগে আমাদের ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রাচীন বেদের জড়তত্ত্বই বা কি এবং অভিনব বেদ বা scienceএর জড়তত্ত্বই বা কি—এ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার রকমের বোঝাপড়া গোড়াতেই আমাদের করিয়া লইতে হইবে। অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, বেদের যে লক্ষণ আমরা করিয়া লইয়াছিলাম, তাহাতে ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি পুঁথি-কয়খানাকেই আমরা বেদ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকি নাই। আমরা 'বেদ' শব্দকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। এবং এ কথাও বলিয়া রাখিয়াছি যে, এক চরম বেদ বা Veda in the limit ছাড়া, অন্য কোনও বেদ পূর্ণ ও নিরতিশয় রূপে বিশুদ্ধ নহে। বেদ ও বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে গিয়া আমি যদি গীতার কথা, পাতঞ্জলাদি দর্শনের কথা, পুরাণের কথা এমন কি তন্ত্রের কথাও উত্থাপন করি, তাহা হইলে আপনারা কথাগুলি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আমায় বসাইয়া দিবেন না। শিষ্য-পরিগৃহীত গুরু-পরম্পরাগত বেদকে মূল করিয়া যে প্রাচীন বিদ্যা (ancient wisdom) এদেশে নানা শাখায় নানা ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, মূলের সঙ্গে অবিরোধী হইলে, সেই সমস্ত বিদ্যাটাকেই আমরা 'বেদ' শব্দের বাচ্য মনে করিব। স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতিতে যে কথাগুলি স্পষ্ট করিয়া পাইতেছি, বেদের পুঁথি কয়খানায় সে কথা-গুলিকে হয় ত ততটা স্পষ্টভাবে পাই না। তবে মূল আছে কি না তাহার অবশ্য অনুসন্ধান লইতে হইবে। এরূপ আলোচনাকে যিনি বৈদিক আলোচনা বলিতে নারাজ, তিনি আমার বর্ত্তমান আলোচনাগুলিকে হয় ত বৈদিক আলোচনা বলিবেন না। কিন্তু আলোচনার নাম যাহাই দেওয়া হউক, আমাদের জাতির বিশিষ্ট সভ্যতা ও সাধনার অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, এবংবিধ আলো-চনাকে প্রয়োজনীয় মনে না করিয়া পারা যায় না।

ধরুন প্রাণায়ামের কথা। পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্র ও মন্ত্রসমূহে ইহার কথা খুব ফলাও করিয়া বলা হইয়াছে। আবার শ্রুতিতেও ইহার মূল খুঁজিয়া পাই। এখন, উপনিষদেই থাকুক, আর তন্ত্রেই থাকুক, এ অনুষ্ঠান আমাদের সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকর্ম্ম ও সাধনপদ্ধতির মধ্যে একটা মুখ্য আসন লাভ করিয়াছে; ইহাকে বাদ দিয়া কোন ধর্ম্মকর্ম্মও হয় না, সাধনও হয় না। এত বড় জিনিসটার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা যদি অবৈদিক হইয়া পড়ি, তবে সেরূপ অবৈদিক হইতে আমাদের কুণ্ঠা নাই। নানা বিষয়ে আমাদের মনে সংশয় আসিয়াছে; এবং সে সংশয় নিরসনের জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও বিচার একটু-আধটু করিলে সুবিধাই হইতে পারে,—এ কথা বরাবর বলিয়া আসিতেছি। প্রাণায়ামের বিভূতি বা ফলাফল শুনিয়া মনে হয় ত অবিশ্বাস হয়। সুস্থির বিশ্বাস আনিবার জন্য তপোবনে যাত্রা করিয়া প্রাণায়াম করিয়া দেখিতে হইবে; কিন্তু কাজ-চালানো রকমের বিশ্বাস আনিবার জন্য, হালের বিজ্ঞানের দু'চারিটা কথা শুনিলে এবং দুটো-একটা পরীক্ষা দেখিলে, আমাদের

আশু উপকার হইতেও পারে। যে জড়তত্ত্বের কথা বলিতে ছিলাম, তাহার বিধিমত আলোচনার পূর্ব্বে প্রাণায়ামের ব্যাখ্যায় হাত দিলে কাজটা একটু কাঁচা হইবে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য বিবৃতির পক্ষে কতকটা সুবিধা হইতে পারে এই আশায়, প্রাণায়াম সংক্রান্ত নানা কথার মধ্যে একটামাত্র কথার একটু সংক্ষিপ্ত বিচার এই স্থলেই করিয়া লইবার অনুমতি আপনাদের কাছে ভিক্ষা করিতেছি। এই বিচারের ফলে হয় ত বুঝিতে পারিব, আমরা প্রাচীন বিদ্যার হিসাব লইতে গিয়া, কেনই বা অর্ব্বাচীন বিদ্যা বা বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হইতেছি। সরাসরি তপোবনাভিমুখে যাত্রা করিলেই কি ভাল হইত না? ভাল হয় ত হইত; কিন্তু যাত্রা করে কে? হাতে কলমে প্রাণায়াম পরীক্ষা করিয়া দেখ, ইহা সত্য না বুজরুকি—এ কথা যেই শুনিলাম, সেই অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যচিত্ত হইয়া প্রাণায়াম করিতে বসিয়া গেলাম, এমনটা হইলে লেঠা চুকিয়া যাইত; কিন্তু এমনটা হয় কৈ? শুধু কথা শুনিয়া চিড়া আর ভিজাইতে যে কোন-মতেই পারিতেছি না। এইজন্য, গোড়াতেই কোনও উপায়ে কতকটা সংশয় নিরসন করিয়া প্রত্যয় জন্মানর প্রয়োজন রহিয়াছে,— সুস্থির প্রত্যয় না হউক, কাজ চালান রকমের প্রত্যয়। সকালে-সন্ধ্যায় চায়ের পেয়ালার সেবা ত্যাগ করিয়া, হাত-পা ধুইয়া, কাপড় চোপড় ছাড়িয়া, নাক টিপিতে বসিয়া না গেলেও, হাল বিজ্ঞানের দুটো-চারিটা কথা কোনও মতে কর্ণগোচর করা চলিতে পারে; তবে আবার যে কালে স্বামীজীরা মায় গেরুয়ার নেকটাই লাগা-ইয়া সিদ্ধাশ্রম হইতে নামিয়া আসিলেও, আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করিতেছেন না, সে কালে যে প্রাণায়াম করিতে গিয়া সত্য সত্যই চা-বিস্কুট সরাইয়া রাখিতে হইবে, এমনটাই বা ভাবি কেন? শিষ্ট সমাজে কাট-খোলায় সন্ধ্যাহ্নিক পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু অনুষ্ঠানটা নিরম্বু, সুতরাং নীরস; এখন গঙ্গামায়ী যদি লোকের রুচি ও সুবিধা বুঝিয়া কোশাকুশি ছাড়িয়া, চায়ের পেয়ালায় ও চামচে মূর্ত্ত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপ-ত্তির এমনই বা কি হইল? বিশেষতঃ এই শীতের দিনে গঙ্গা-সলিলে radio-activity'র সন্ধান করিতে যাওয়া অকমারি এবং সম্ভবতঃ মরীচিকানুগমন; কিন্তু চায়ের পেয়ালায় radio-activity ত প্রত্যক্ষ। ফল কথা, প্রাণায়াম প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের দুচারিটা কথা শুনিয়া লইতে কেহই হয় ত গররাজি হইবেন না।

ধরুন, পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে পাইলাম যে, উদান বায়ুর জয় হইলে, দেহের এতই লঘুতা হয় যে, সে দেহ তূলার মত শূন্যে ভাসিতে পারে; পঙ্ক, কণ্টক, জল ইত্যাদির উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া যাইতে পারে। এই রকম সব আজগবি কথা পাইলাম। প্রাণায়ামের নানা বিভূতির মধ্যে ইহা একটামাত্র; প্রাণায়ামের আসল সিদ্ধি আধ্যাত্মিক রাজ্যে। যাহা হউক, প্রাণায়াম সম্বন্ধে যে দুটো-একটা কথা শুনিলাম, তাহা বড়ই আজগবি বলিয়া ঠেকিল। আপাততঃ প্রত্যক্ষের বিরোধী ও যুক্তির বিরোধী বলিয়াই মনে হইল। যদি হরিদাস সাধুর মত আবার, এই ৫০।৬০ বৎসর পরে, কেহ আসিয়া আমা-দের ঐ বিভূতিগুলা দেখাইয়া দেন, তবে আর মাথা নাড়িতে পারিব না বটে; কিন্তু তথাপি মনের গোল মিটিবে না। মন জেরা তুলিবে – আচ্ছা, কেমন করিয়া কি হইল? ব্যাপারখানা কি, তাহা ত কিছুই বুঝিতেছি না। ভেল্কি নয় ত? আকাশে সূত্রক্রীড়ার মত ভোজবাজী নয় ত? অপিচ, ভেল্কি বলিলেই খালাস নাই। ভেল্কি ব্যাপারটাই বা কি এবং লাগেই বা কিরূপে? এইজন্য বলিতেছিলাম, এই সকল প্রশ্ন ও সংশয়ের মধ্যে বিজ্ঞান যদি একটা আলোক ফেলিয়া দিতে পারে, তবে তাহাতে উপকার বই অপকার নাই। কথাটার বিস্তৃত ও বিশদ আলোচনা এখন হইবে না; তবে ইসারায়-ইঙ্গিতে দুচার কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করিলে, অন্ততঃ এইটুকু আপনারা স্বীকার করিয়া যাইবেন যে, বিজ্ঞানের দিক্ হইতে আমাদের পুরাতন জ্ঞান-বিশ্বাস ও ব্যবস্থা-গুলির একটু বোঝাপড়া হইলে, কতকটা মনের গোলও মিটে, আবার সত্য সত্য শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষার একটা প্রবৃত্তি ও সাহসও হয়। দরকার তাহাই। আমরা শিশু না হইলেও অবোধ; আমাদিগকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া কাজে লওয়াইতে কিছু বেগ পাইতে হয়। প্রাচীনেরা অর্থবাদ প্রভৃতি ফাঁদিয়া জন-সাধারণের মতিগতি বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও উপাসনার দিকে লইতেন; আমাদের অদৃষ্টে অর্থ সত্য-সত্যই বাদ পড়িয়া গিয়াছে; প্রত্যয়ের দশাও তথৈবচ; আছে শুধু বাক্ বা শব্দ।

শুনিতেছি অনেক কথা ; বকিতেছি আরো বেশী ; প্রত্যয় বড় একটা হয় না ; প্রত্যয় যদি বা হইল, অর্থপ্রতিপত্তি বা সাক্ষাৎকার আদৌ হইতেছে না।

আচ্ছা; পাতঞ্জলের বিভূতিপাদের ৩৯ ও ৪২ সূত্রে বায়ুজয়ের ফলে "জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গঃ" এবং কায় ও আকাশের সম্বন্ধে ধ্যানাদির কল্যাণে "লঘুতূলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্"—এই সকল বিভূতি দেখিতে পাই। এ কথাগুলা শ্রুতির অবিরোধী এবং ইহাদের মূলও শ্রুতিতে আছে, ইহা আমরা পরে বলিব। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমাধ্যায়েই প্রাণ অপান এবং তদুভয়ের সন্ধি স্বরূপ ব্যানের কথা আছে ; এবং ব্যানের উপাসনাও বিশেষ ভাবে বিহিত হইয়াছে। ব্যাপারটার প্রাচীনত্ব, অর্ব্বাচীনত্ব সম্বন্ধে আপাততঃ আর প্রশ্ন করিব না। এখন কথাটা এই,—এই যে সব বিভূতির কথা বলা হইতেছে, ইহা কি বায়ুরোগগ্রস্তেরই প্রলাপ, অথবা এ সকলের মূলে সত্য সত্যই একটা কিছু থাকিতে পারে ? যিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তাঁহার বালাই নাই বটে ; কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বাহ্ণে একটা কৈফিয়ৎ শুনিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে। চলুন বিজ্ঞানাগারে। তার পর, প্রয়োজন বুঝিলে না হয় হরিদাস ঠাকুরের আখড়াতেও যাইব।

বিজ্ঞানাগারে ঢুকিয়া দেখি, বৈজ্ঞানিক দুইটা জড়দ্রব্যের পরস্পর আকর্ষণের (gravitation এর) একটা হিসাব লইতেছেন। দুইটা জড়দ্রব্যের যে টানাটানি আছে, এবং থাকিলে সেটা কি পরিমাণে কাহার উপর নির্ভর করে, তাহা বৈজ্ঞানিক আমাকে বেশ করিয়া দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন। ঐ টানাটানির নিয়মের বিবরণ দিয়া নিউটন যশস্বী হইয়া গিয়াছেন ; এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি সকল জ্যোতিষ্কের চলা-ফেলার এমন সুন্দর কৈফিয়ৎ ঐ বিবরণের মধ্যে আমরা পাইয়াছি যে, এই দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া আমাদের স্পর্দ্ধার সীমা নাই। নিউটনের টানাটানির আইন ও চলা-ফেরার আইন (laws of gravitation and laws of motion) পুঁজি করিয়া ল্যাপ্‌লাস প্রভৃতি গণিতবিদ্‌গণের আশার আর অবধি নাই—সমস্ত জড়জগৎ (celestial sphere)কে একটা ঘড়ির মত বা এঞ্জিনের মত ব্যাখ্যা করিতে, ইঁহারা আশা করিয়াছেন। অথচ, মজার কথা এই যে, দুইটা জিনিসের অতিরিক্ত আর একটা জিনিস উপস্থিত থাকিলেই, তাহাদের পরস্পরের টানাটানির বিবরণ দিতে ইঁহাদের পুঁজি ফুরাইবার উপক্রম হয়। যাহা হউক, বিজ্ঞানাগারে জড়দ্রব্যের টানাটানির হিসাব পাইয়া পুলকিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে একজন নবীন বৈজ্ঞানিক ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জড়ের টানাটানি বুঝিতে সাধ তোমার,—কিন্তু জড় নিজে কি এবং কেনই বা টানে, তাহা খেয়াল করিয়া দেখিয়াছ কি ? আমি প্রশ্ন শুনিয়া কিছু বিপন্ন বোধ করিলাম। জড়ের টানাটানি বা gravitation এর ব্যাখ্যা নানা জনে নানারূপে দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এখন জড় সম্বন্ধে বিজ্ঞানের ধারণাই যখন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, তখন সেই পূর্ব্বের ব্যাখ্যা (Le Sage প্রভৃতির) আবার নূতন করিয়া ঝালাইয়া লইতে হয়। জড় পদার্থ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের হাল মতকে Electro magnetic theory of matter অথবা Electronic theory of matter বলা হইয়া থাকে। ইহার কথা আগামীবারেই বিশেষভাবে আমাদের পাড়িতে হইবে। তবে আপাততঃ এইটুকু বলিলেই চলিবে—তড়িৎ জিনিসটার নাম আমরা সকলেই শুনিয়াছি ; আর ঐ আলোতে, ট্রাম গাড়ীতে, টেলিফোঁ প্রভৃতিতে তার লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই তড়িৎ দ্রব্যটা সত্যসত্যই কি, তাহা বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। তবে এই তড়িৎকে পূর্ব্বে দুই জাতীয় এক রকম fluid মনে করা হইত তারের মধ্য দিয়া যেন স্রোতের মত গড়াইয়া যাইতে পারে। এখন ফ্যারাডে ম্যাক্‌সওয়েলের পর হইতে, আর বড় একটা সন্দেহ নাই যে, এই তড়িৎ জিনিসটা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলাদা-আলাদা দানায় গঠিত। তড়িৎ দানা-দার জিনিস—ইহাই হালের প্রসিদ্ধ atomic structure of electricity. প্রমাণ-প্রয়োগের ইহা স্থল নহে, তবে Helmholtz তাঁহার Faraday lectureএ কি বলিয়াছিলেন, শুনিয়া রাখুন—"If we accept the hypothesis that the elementary substances are composed of atoms, we cannot avoid the conclusion that electricity, positive as well as negative, is divided into definite elementary positions which behave like atoms of electricity." তড়িতের এই সমস্ত ছোট-ছোট দানাগুলির

নাম J. J. Thomson দিয়াছেন, 'corpuscles', Dr. Johnston Stoney দিয়াছেন 'Electrons'; এই শেষোক্ত নামটাই বিশেষভাবে চলিয়া গিয়াছে; তবেই, তারের মধ্য দিয়া যখন তড়িৎ ছুটিয়া যায়, তখন ঠিক তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন একটা কিছু যে চলিয়া যায়, এমন নহে; ঐ ইলেকট্রনগুলা দলে-দলে একটা বিপুল বাহিনীর মত অভিযান করিয়া থাকে। ফলতঃ, এই উপমায় বৈজ্ঞানিকেরা ইলেকট্রনদের দলগুলাকে 'Company,' 'army' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই তড়িতের কণাগুলি রসায়ন-শাস্ত্রের অণু বা atomsগুলির চেয়ে ঢের ছোট। হাইড্রোজেনের অণু হয় ত একটা তড়িত কণিকার চেয়ে সহস্রগুণ গুরু-গম্ভীর। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদের লইয়া মাপাজোকা করিতেছেন। এখন হালের মত এই, যে জিনিষটাকে আমরা জড়ের অণু (atom) বলিতেছি, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সূক্ষ্মতর তড়িত-কণিকায় (positive and negative charges of electricityতে) গঠিত। একটা অণু যেন একটা বালখিল্য সৌরজগৎ। একটা অণুর ভিতরে তড়িত কণিকাগুলি, সৌরজগতে গ্রহউপগ্রহগুলার মত, নিজ নিজ কক্ষে পাক খাইতেছে, সময়ে সময়ে ছট্‌কাইয়াও বা আসিতেছে। ছট্‌কাইয়া আসিলেই অণুর ভিতরে খণ্ডপ্রলয় হইয়া গেল। ১৭ই ডিসেম্বর কয়েকটা গোঁয়ার-গোবিন্দ তালকাণা গ্রহ এক-জোট হইয়া যেমনধারা খণ্ডপ্রলয় ঘটাইবে আশঙ্কা করিতেছি সেইরূপ। অণুর ভিতরে খণ্ডপ্রলয় হইতে থাকিলে, বাহিরে যে তাহার অভিব্যক্তি, তাহাই radio-activity,—এ কথা ভবিষ্যতে আরও খোলসা করিয়া বলিব। যাক্‌—অণু যদি তাড়িত-উপকরণেই নির্ম্মিত হয়, তবে দুইটা অণুর মধ্যে যে টানাটানি, অর্থাৎ জড়ে-জড়ে যে টানাটানি, তাহার মূল তড়িতের মধ্যেই অন্বেষণ করিতে হইবে। দুইটা জড় যখন দুই বিন্দু তড়িত, তখন জড়ের টানাটানি মানেই ঐ তড়িত-বিন্দুদ্বয়ের টানাটানি। কিন্তু তাড়িত-বিন্দুদের আবার জাতিভেদ আছে। পরীক্ষায় দেখিতে পাই যে, তড়িত-বিন্দুগুলি সজাতীয় হইলে পরস্পরকে তাড়াইয়া দেয়। সেখানেও সেই চিরন্তন জাতিবিরোধ। বিজাতীয় হইলে পরস্পরকে টানিয়া লয়। "পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর"—ঐ আণবিক বালখিল্য জগতের কবিও এ খেদ করিয়াছেন। এখন ধরুন, সোজাসুজি বুঝিয়া লই যে, একটা অণুতে দুইটা বিজাতীয় তড়িতবিন্দু প্রকৃতি-পুরুষের মত, পরস্পরে অধ্যাস করিয়া বাস করিতেছে। টম্‌সন সাহেবের ভাষায়, ধরুন, একটা অণু যেন একটা electrical doublet। প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু অণুগুলার গঠন বিচিত্র। এখন, 'ক' অণুতে দুই বিন্দু বিজাতীয় তড়িত আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে; 'খ' অণুতেও তাহাই। 'ক'এর এক বিন্দু তড়িত অবশ্য 'খ'এর এলেকাভুক্ত নিজের বিজাতীয় তড়িত-বিন্দুটিকে আকর্ষণ করিতেছে; আবার 'ক'এর অন্তর্গত অন্য বিন্দুটি 'খ'এর অন্তর্গত স্বজাতীয় বিন্দুটিকে ঠেলিয়া দিতেছে। ইহাতে পাইলাম কি? 'ক' অণু 'খ'কে টানিতেছেও এবং ঠেলিতেছেও। টানা ও ঠেলা যদি ঠিক সমান-সমান হয়, তবে উভয়ের মধ্যে কার্য্যতঃ (effectively) টানাটানি ঠেলাঠেলি না থাকাই হইয়া গেল। আমি তোমায় যত জোরে টানিতেছি, তুমি যদি আমায় ঠিক তত জোরে ঠেলিয়া দাও, তবে আমিও তোমায় টানিয়া কাছে আনিতে পারিলাম না, তুমিও আমায় ঠেলিয়া দূরে সরাইতে পারিলে না। কিন্তু টানের জোরটা যদি ঠেলার জোরের চেয়ে ঈষৎ বেশী হয়, তবে ব্যাপারটা দাঁড়াইবে অন্যরূপ। অণু ও অণুর মধ্যেও সম্ভবতঃ হইয়াছে তাহাই। সজাতীয় তড়িত-কণিকারা পরস্পরকে যত জোরে ঠেলিয়া দেয়, তার চেয়ে বিজাতীয় তড়িত-কণিকারা পরস্পরকে ঈষৎ বেশী জোরে টানিয়া থাকে। ফলে, 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে একটুখানি টানই রহিয়া গেল। দুয়ের মধ্যে দ্বেষ-রাগও আছে। কিন্তু তারা পরস্পরকে যতটা দ্বেষ করে, তার চেয়ে একটু বেশী পরস্পরকে ভালবাসে। ফলে, দুয়ের মধ্যে একটুখানি প্রাণের টানই (resultant attractionই) দেখা যায়। রাগ হইতে দ্বেষের খরচা বাদ দিয়া কিছু উদ্বৃত্ত আছে বলিয়াই এই একটুখানি টান; নইলে দ্বেষ ফাজিল হইলে এ জগতে কেহ আর অপর কাহারও সহিত ঘর করিত না। অণুদের মধ্যে ঐ যে উদ্বৃত্ত টানটুকু, তাহাই জড়ের টানাটানি বা gravitation। ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসের Philosophical Magazineএ W. Sutherland electron theory of gravitation প্রসঙ্গে এই ভাবে

বলিয়াছেন :-- "The attraction between opposite charges is greater than the repulsion of similar charges in the ratio of $(1 + 10^{[illegible]}) : 1$, Thus accounting for a very small resultant attraction" । Sir J. J. Thomson লিখিতেছেন, "In another development of the theory, the attraction is supposed to lightly exceed the repulsion, so as to afford a basis for the explanation of gravitation" । আচ্ছা, ঐ যে সামান্য একটু বাড়তি টান, তাহাই যদি দুইটা জড়ের মধ্যে gravitation হয়, তবে ঐ একটুকু টান কাটাইয়া দিতে পারিলেই তাহারা আর পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে না; অঙ্ক ফাজিল হইয়া গেলে তাহারা পরস্পকে ঠেলিয়া দিবে। এই কথাটা স্মরণ রাখা দরকার। বাড়্তি টানটুকু খুবই কম হইলেও, তড়িত-বিন্দুগুলির মধ্যে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ কিন্তু খুবই বেশী। ইহারা অণু-রাজত্বে বাস করিলে কি হইবে, ইহারা আকারে "অণোরণীয়ান্" হইলেও শক্তি-সামর্থ্যে "মহতো মহীয়ান্"। দুইগ্র্যাম সীসা লইয়া পরস্পরের এক Cent. m. দূরে রাখিলে তাহাদের মধ্যে ঐ বাড়্তি টান বা gravitation $6.6 \times 10^{[illegible]}$ dynes,—এতই কম যে, আমাদের আবিষ্কৃত কোনও যন্ত্রেই তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। কিন্তু দুই গ্র্যাম electricity যদি ঐ রূপ ব্যবধানে রাখা যায়, তবে তাহাদের ঠেলাঠেলির মাত্রা ভাবিতে কল্পনাও অবসন্ন হইয়া পড়ে—$31{\cdot}4 \times 10^{24}$ dynes অথবা 320 quadrillion tons. অণুর চেয়েও ছোট বলিয়া ইহাদের আমরা উপেক্ষা করিতেছিলাম। "Even if they were placed, one at the North Pole of the earth, and the other at the South Pole, they would still repel each other with a force of 192 million tons, and that in spite of the fact that the force decreases the square of the distance." অবশ্য, আমাদের কল্পিত 'ক' অণু ও 'খ' অণু; মধ্যে মাত্র দুইটি করিয়া তড়িতের দানা আছে—এক গ্র্যাম করিয়া তড়িত আমাদের নাই। তথাপি, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দুইটা দানার মধ্যে টানাটানি বা ঠেলাঠেলি খুবই কম হইলেও, ঐ মাপের দুইটা জড়ের gravitationএর তুলনায় তাহা $10^{[illegible]}$ গুণ বেশী। তড়িতের শক্তি এমনি বিপুল! তাড়িত শক্তি দ্বারা শুধু যে gravitationএর হিসাব লইতে হইবে এমন নহে, জড়ের মধ্যে অন্য যত প্রকার রাগ বা দ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকলেরই মূল এইখানেই অন্বেষণ করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ, J. J. Thomson দেখাইতেছেন—"The view that the forces which bind together the atoms in the molecules of chemical compounds are electrical in their origin, was first proposed by Berzelins; it was also the view of Davy and of Faraday. Helmholtz, too, declared that the mightiest of the chemical forces are electrical in origin."

আচ্ছা, ধান ভাণিতে এ মহীপালের গীত হইতেছে কেন? প্রাণায়ামে দেহের লঘুতা হয় এবং তজ্জন্য "জলপঙ্ক কণ্টকাদিষ্বসঙ্গ" ও "আকাশ গমনং" হয়, ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অণু পরমাণু লইয়া এত টানাটানি ঠেলাঠেলি হইতেছে কেন? কারণ আছে। দেহের গুরুতা মানে কি? ধরিত্রী ও আমার দেহের মধ্যে ঐ মাধ্যাকর্ষণের টান। আমার দেহের ওজন যদি দেড় মণ হয়, তবে তাহাই এই জড় পদার্থদ্বয়ের টানা-টানির মাপ বা পরিমাণ। এই টানের দরুণ উড়িবার বিলক্ষণ ইচ্ছা থাকিলেও আমাকে ধরণী-পৃষ্ঠেই সংলগ্ন হইয়া থাকিতে হয়। প্লেনের মতন যন্ত্র-সাহায্যে উড়িয়া আসিতে পারিলে আলাদা কথা। সে ক্ষেত্রে মোটরের জোরে পৃথিবীর টানের বিপরীত দিকে একটা টানের সৃষ্টি করা হইয়াছে। পাখীরা ত কত লক্ষ বৎসর আকাশে এক রকম এ্যারোপ্লেন চালাইয়া বেড়াইতেছে। পাখীর ডানার সঞ্চালনে এমন কৌশল আছে, যাহাতে তাহার দেহের লঘুতা ও আকাশ-গমন স্বভাব-সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমরাও একটু লম্ফ-ঝম্প করিয়া ধরণী-পৃষ্ঠ ছাড়িয়া উঠিতে পারি, কিন্তু বেশী চালাকি করা চলে না। ডারউইন মানুষের পূর্ব্ব-পুরুষ খুঁজিতে যে দেশে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সে রাজ্যের অধিবাসীরা লম্ফ-ঝম্প করিয়া অনেক বাহাদুরী দেখাইতে পারে। সে দেশেও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে একটা সহজ কৌশল বহুদিন হইতে

আবিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। গাছ-পালা সাধারণতঃ মাটিতে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া না থাকিয়া আকাশের দিকে বাড়িয়া উঠে;—এক-একটা শাল, তাল, নারিকেল, দেবদারু কতই না উঁচু হইয়া উঠে। এখানেও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে যাইবার একটা স্বাভাবিক প্রয়াস,—যিনি করিতেছেন তিনি উদান-বায়ুই হউন, অথবা অপর অন্য কোনও দেবতাই হউন। এ প্রকার দৃষ্টান্ত অনেক। ধরুন, আমাদের দেহ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ যে পথে টানিতেছে, সে পথটা মোটামুটি আমাদের মেরুদণ্ডের কাছাকাছি,—অর্থাৎ, ধরা যাক্, ঐ রেখাতেই পৃথিবীর বাড়্তি টানটা আমার উপর কাজ করিতেছে। এখন, ঐ টানকে রদ করিয়া দিতে হইলে আমি কি করিব? হয় ছান্দোগ্য-প্রোক্ত ধ্যান-শক্তির বলে একটু উদ্ধে লাফাইয়া উঠিব, নয় কোনও বিমানে চড়িয়া বসিব। এ ছাড়া, আমার আয়ত্তাধীন অন্য কোনও উপায় আছে কি? আছে, এবং তাহাই প্রাণায়াম। কুম্ভক করিয়া দেহটাকে বেলুনের মত বায়ুপূর্ণ করিলে সেটা উঠিয়া পড়িবে, এ কথা বলিলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হয় না। প্রাণায়ামে দেহ উঠিয়া পড়িতে পারে, যদি ব্যাপারটা এইরূপ দাঁড়ায়। আমরা দেখিয়াছি যে, দুইটা জড় দ্রব্যের মধ্যে যে বাড়্তি টান, তাহাই হয় ত gravitation। আসল ও প্রবল টানা ও ঠেলা তাড়িত-শক্তিরই কাজ। টানাটা ঠেলার চেয়ে অতিরিক্ত হইলেই gravitationএর আবির্ভাব। পৃথিবী ও আমার দেহের মধ্যে এই অতিরিক্ত টান রহিয়াছে এবং ইহারই নাম আমার দেহের গুরুত্ব—দেড়মণ। কিন্তু ঠেলাটা টানার সমান বা তার চাইতে বেশী হইলে আমার দেহের গুরুত্ব পৃথিবী-সম্পর্কে আর রহিল না—আমার "লঘুতুল-সমাপত্তি" হইল। এখন প্রাণায়ামে খুব সম্ভবতঃ মেরুদণ্ডের মধ্যে পৃথিবীর টানের বিপরীত দিকে একটা টান জন্মায়,—হয় ত সেটা পরীক্ষায় Electric repulsive বলিয়াই সাব্যস্ত হইতে পারে। Electric forceগুলি gravitationএর তুলনায় কত বিপুল, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। দুই গ্রাম সজাতীয় তড়িতের মধ্যে যে ঠেলাঠেলি, তাহা ৬২০ quadrillion tons; কাজেই তাড়িত-শক্তির পক্ষে আমার দেহের ভার দেড়-মণ তুলিয়া ফেলা অসাধ্য-সাধন নহে। আসল কথা, প্রাণায়ামের ফলে মেরুদণ্ডের পথে পৃথিবীর টানের বিপরীত দিকে একটা টানের বিকাশ হইয়া থাকে, এবং সেটা খুব সম্ভবতঃ তাড়িত শক্তির বা তদনুরূপ অপর কোনও শক্তির টান। এই কথা কয়টির মধ্যে প্রাণায়ামের ঐ বিভূতির কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ এখনই মিলিয়া যায় নাই, এবং প্রাণায়ামের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও ছাঁটা-ছোঁটা ভাবে তৈয়ারী এখনই হয় নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—নব্য বিজ্ঞান তাড়িত বিন্দু ও তাহাদের টানাটানি ঠেলাঠেলির সাহায্যে gravitation এবং অন্যান্য জড়-ব্যাপারের যে ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে পাতঞ্জল-দর্শনের উক্ত বিভূতির একটা সন্তোষ-জনক হেতুবাদ ভবিষ্যতে আমাদের মিলিবে, এমনটা আশা কি আমরা করিতে পারি না? ঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার পথে অন্তরায় ও অসুবিধা এখনও বিস্তর। দেহের তাড়িত-শক্তিগুলির পরিমাণ ও সমাবেশ কিরূপ? প্রাণায়াম দ্বারা সে শক্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া সত্য সত্যই কি মেরুদণ্ড-পথে (অথবা সুষুম্নামার্গে) একটা শক্তির উদ্ধস্রোত হইয়া থাকে—একটা Electro-magnetic impulsion যাহার গতির মুখ (direction) পৃথিবীর টানের গতিমুখের বিপরীত? যদি বা হয়, তবে তাহার পরিমাণ (magnitude) কত? এ সকল প্রশ্নই ধীর পরীক্ষা ও বিচারের দ্বারা সমাধান করিয়া লইবার;—শুনিয়া সহসা আজগবি অথবা ধ্রুবসত্য মনে করিবার ব্যাপার ইহা নহে। কাজেই, বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যা আপাততঃ না মিলিলেও, নব-বিজ্ঞান জড় তত্ত্বের এবং মাধ্যাকর্ষণের যে রহস্য আমাদিগকে শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে বিভূতির কথা শুনিলেই বিজ্ঞের মত হাসিয়া উঠিতে আর ভরসা পাই না। আমাদের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলাইতে যাইলে এই একটুখানি লাভ আছে দেখিতে পাই। বিজ্ঞানাগারে গিয়া ঢুকিয়াছিলাম এই আশাতেই। বিজ্ঞানের নূতন পরীক্ষা ও কথাগুলি এইরূপ আভাসে-ইঙ্গিতে সত্যের পথ দেখাইয়া কতকটা আশ্বস্ত করিতে পারে।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিজ্ঞানের মন্দিরে পূজা ও বলি দিয়াই আমাদের আশু সর্ব্বকাম হইবার আশা নাই। পরীক্ষার শেষ দেখিবার জন্য তপোবনে যাইবারও প্রয়োজন আছে। আগামী বার হইতে সুস্থির ভাবে বেদ ও বিজ্ঞানের

জড়-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। প্রকৃত কথারম্ভ হইবে তখন হইতেই। আজ একবার সেই ছান্দোগ্য শ্রুতির দিনে ফিরিয়া যাই,—দেখি গিয়া সে সময়ের আরুণি ও শ্বেতকেতুগণ কি ভাবে এবং কি পদ্ধতিতেই বা তত্ত্ব-পরীক্ষা ও তত্ত্ব-মীমাংসা করিয়া ছিন্ন সংশয় হইতেন। পিতা আরুণি ত্রিবৃৎকরণ বুঝাইতে গিয়া বলিলেন—অন্ন অশিত হইলে তাহারই যে অণিষ্ঠ বা সূক্ষ্মতম অংশ তাহাই মন হয়। সেইরূপ "আপঃ" পীত হইলে তাহাদের যে অণিষ্ঠ অংশ তাহাই প্রাণ হয়। সেইরূপ আবার "তেজঃ" অশিত হইলে তাহার যে অণিষ্ঠ অংশ তাহাই হয় বাক্। শ্বেতকেতু শুনিয়া বুঝিলেন না, কিরূপে মন অন্নময়, প্রাণ আপোময় ও বাক্ তেজোময় হইল। পিতা কত দৃষ্টান্ত ও উপমা দেখাইলেন—হে সৌম্য! দধি মথ্যমান হইলে তাহার সে অণিমা (অর্থাৎ নবনীত কণিকাসমূহ) তাহা যেমন সর্পিঃ হইয়া ঊর্দ্ধে ভাসিয়া উঠে, সেইরূপ অশ্যমান অন্নের সূক্ষ্মাংশগুলি মন হইয়া ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। কিন্তু এ সমস্ত উপমান দেখিয়া শ্বেতকেতুর সংশয় দূর হইল না, তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন—"ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু"। তখন পিতা হাতে-কলমে পরীক্ষা জুড়িয়া দিলেন। বলিলেন—"পুরুষ ষোড়শকলা চন্দ্রের মত। তুমি পনের দিন কিছুই খাইও না। তবে ইচ্ছামত জলপান করিতে পার।" এক পক্ষকাল উপবাসের ব্যবস্থা—শ্বেতকেতুর ভক্তি চটিল না, প্রাণে দ্বিধা হইল না। আর তর্ক নাই, জেরা নাই—শ্বেতকেতু গিয়া না খাইয়া পড়িয়া থাকিলেন। পক্ষান্তে পিতার সন্নিধানে আসিলে তিনি বেদের প্রশ্ন পুত্রকে করিলেন। পুত্র জবাব দিলেন—"কৈ আমার স্মৃতিতে কিছুই ত প্রতিভাত হইতেছে না।" পিতা কহিলেন—"চন্দ্রের ষোলকলা কৃষ্ণপক্ষ দিনে দিনে ক্ষয় পাইয়া শেষে যেমন এককলা অবশিষ্ট থাকে, তেমনি তোমার মন উপবাসে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া এক কলায় গিয়া ঠেকিয়াছে। ঐ একটি কলায় কিছুই স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। আগুনের যখন খদ্যোত মাত্র একটু অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে, তখন তাহাতে দাহিকা শক্তির কতটুকুই বা প্রকাশ? আবার তৃণ কাষ্ঠ যোগাইয়া আগুন জাকাইয়া তোল; তাহাতে সবই পুড়িয়া যাইবে। তুমিও আবার আহার করিয়া তোমার মনের কলাগুলিকে পুষ্ট করিয়া তোল, আবার বেদ-বিদ্যা তোমার মধ্যে প্রতিভাত হইবে।" হইলও তাহাই; শ্বেতকেতুও অন্ন ব্যতিরেকে অন্ন-মনের সম্পর্ক বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। সেই ছান্দোগ্যের দিন হইতে বহু সহস্র বর্ষের উপবাসে আমাদেরও ধীবৃত্তি ক্ষীণ খদ্যোত মাত্র হইয়া গিয়াছে—এ বুদ্ধিতে আর নির্ম্মল বেদবিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয় না। এখন অয়ি বেদমাতঃ, তোমার স্তন্য সুধা জাহ্নবী ধারার মত অপরোক্ষানুভূতিরূপে আমাদের প্রাণে আবার না পৌঁছিলে, আমরা যে চিরকাল এমনি মৃত ও বেদবিগর্হিতই রহিয়া যাইব। শ্বেতকেতুর মত আমাদেরও একটি মাত্র স্মৃতিই পরিস্ফুট রহিয়াছে—আমরা এই মৃত্যুকল্প অবসাদ ও দৈন্যের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকিয়াও "অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

একটী গান

[৺নবীনচন্দ্র সেন]

[মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমার পরমারাধ্য পিতৃদেবকে একটী গান লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সম্প্রতি কতকগুলি পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে আমি তাহা পাইয়াছি। নিম্নে তাহা সঙ্কলন করিয়া দিলাম। ভরসা করি, কবিবরের গানটী পেন্সন-প্রার্থী ব্যক্তিগণের 'রসায়ন' স্বরূপ হইবে।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত]

মন! বল আর কি ভাবনা?
তোর ফুরাল সাহেব ভজনা!
চাকরী ছেড়ে যেতে কি মন তোর এত মনোবেদনা?

এ যে জগৎ ছেড়ে যেতে হবে কর এবে তাঁর ভাবনা!
ইংরাজেরো রাজা যিনি তার রাজ্যে মন, চল না!
তিনি কীট পতঙ্গে যোগান অন্ন নিরন্ন তুমি রবে না!
খোসামুদি, জুয়াচুরি, হিংসা, দ্বেষ, প্রবঞ্চনা,
এ পাপ নাই সেই রাজ্যে মন আমার, চুকলি শুনে না!
মা আমার আনন্দময়ী মন, তুমি কি তা' জান না?

মনরে!

নবীন কহে জয় কালী বল ঘুচিল মোর লাঞ্ছনা!

অগ্নি-সংস্কার

[ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরের দিন ভোরে লীলা আসিয়া দেখিল, ইলা ড্রইং-রুমে সেই ভাবে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সে আস্তে-আস্তে তাহাকে ডাকিয়া উঠাইল। ইলা ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। লীলা বলিল, "সারারাত এই ভাবে কাটিয়েছিস ?—scoundrel !—আমি আয়ার কাছে সব শুনেছি—rascal —; বাবার যেমন খেয়ে কাজ ছিল না, বাঁদরের গলায় মুক্তোহার ঝুলিয়েছেন। নে, এখন ওঠ্, মুখহাত ধুয়ে চল্ আমার ওখানে।"

ইলা উঠিল না। অর্দ্ধেক রাত সে কাঁদিয়া কাটাইয়াছে। এখন বেদনার অবসাদে তাহার নড়িবার বা ভাবিবার শক্তি ছিল না। সে কেবল কাঁদিয়া ফেলিল। লীলা বলিল, "নে ওঠ্! চল্, কাপড় তো পরাই আছে; চল্, আমার ওখানে গিয়ে মুখহাত ধুবি। গাধাটাকে আচ্ছা করে শাস্তি দিয়ে তবে ছাড়বো। Devil !"

ইলা চক্ষু মুছিয়া উঠিল, আবার থমকিয়া দাঁড়াইল। কি করিবে স্থির করিতে পারিল না। একবার বলিল, "তুমি একবার ওঁকে ব'লে এস।"

লীলা ভ্রূকুঞ্চিত করিল। পরে "আচ্ছা" বলিয়া সত্যেশের ঘরের দিকে গেল।

সত্যেশ তাহার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে উঠিয়া দেখিল বিছানায় ইলা নাই। মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। পরে ড্রইং-রুমের দিকে চাহিয়া দেখিল, ইলা ঠিক রাত্রে যেমন ছিল তেমনি পড়িয়া ঘুমাইতেছে। মনে একটু অনুশোচনা হইল। একবার মনে হইল যে এতগুলো কড়া-কড়া কথা বলিবার কোনও দরকার ছিল না। মনে করিল আজ ইলাকে শান্ত করিতে হইবে। ইলা উঠিলে তাহাকে কি বলিবে, তাহার মুসাবিদা করিতে-করিতে সত্যেশ দাড়ী কামাইতে বসিল। এমন সময় লীলা আসিল। তাহার মধুর বচন এবং মধুর সম্ভাষণগুলি সত্যেশের কাণে ঢুকিয়া ঠিক অমৃত সিঞ্চন করিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার সুপ্ত ক্রোধ আবার উদ্যত হইয়া উঠিল, ক্ষমার স্থানে হিংসা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। তাহার সমস্ত শরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল, এমন কি একবার ইচ্ছা হইল যে গিয়া লীলাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেয় এবং কখনও এ বাড়ীতে আসিতে মানা করে।

রাগে যখন সে ভিতরে-ভিতরে গর্জ্জন করিতেছে, তখন লীলা আসিয়া পরদার আড়াল হইতে বলিল, "আমি ইলাকে নিয়ে চল্লুম।" সত্যেশকে উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়াই সে চলিয়া গেল এবং পরমুহূর্ত্তে সত্যেশ দেখিল যে, সে ইলাকে প্রায় বগলদাবা করিয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে চলিয়াছে। অক্ষম রোষে সত্যেশের সমস্ত শরীর জ্বলিতে লাগিল; সে স্থির হইয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

প্রথমটা ঝোঁকের মাথায় ইলা লীলার সঙ্গে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তা'র পরক্ষণেই তার মনে হইল সে কাজটা ভাল করিল না। তা'র পর ভাবিল, সত্যেশ নিশ্চয়ই শীঘ্রই তাহার খোঁজ করিতে একবার আসিবে; তখনই সে চলিয়া যাইবে। এই মনে স্থির করিয়া সে অশান্ত চিত্তে বসিয়া-বসিয়া গত রাত্রির সমস্ত কথা আবার ভাবিতে লাগিল। কাল রাত্রে তাহার মনে হইতেছিল, তাহার স্বামী তাহার উপর কঠোর অবিচার করিতেছে। সে যা নয়, ঠিক সেইটা বলিয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া, তা'র স্বভাবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ সমস্ত দোষ তার ঘাড়ে চাপাইয়া তাহার স্বামী তাহাকে যে গালাগালি দিয়াছে, সেটা ঘোরতর অন্যায়। তাহা ছাড়া যে সকল ছোট ছোট তুচ্ছ বিষয়ে সত্যেশ তাহাকে অপরাধী করিয়া মনের ভিতর এতদিন বিষ পুষিয়া আসিয়াছে, সে সব কথা যে সে আগাগোড়া ভুল বুঝিয়াছে, এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই যে ভুল সংশোধন হইয়া যাইত, সেই ভুল যে তাহাকে সংশোধনের কোনও অবসর না দিয়া তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিয়াছে, ইহাতে সত্যেশের উপর তাহার দারুণ অভিমান হইল। তা'র বুকভরা কান্না

বাসা, তার স্বামীর মঙ্গলের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা, সে সব কি এমনি করিয়া ভুলিয়া তা'র অপমান করিতে হয় ? তার'পর মনে হইল, তা'র বিবাহের কথা। সে যে সত্যেশকে দেখিয়াই ভালবাসিয়াছিল, এবং ভালবাসিয়াছিল বলিয়াই মায়ের, ভাইয়ের, ভগিনীর এবং তাহার সমাজের দারুণ অসম্মতি এবং বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিল, সে কথা মনে পড়িল। তা'র পর হইতে আরম্ভ করিয়া কবে সত্যেশের জন্য কি ভাবিয়াছে, কি করিয়াছে, সব স্মরণ করিল। এই যে সেদিন তা'র সমস্ত আত্মীয়-বন্ধুকে অবহেলা করিয়া, সব আমোদের প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া কেবল সত্যেশের জন্য সে মহীশূর গেল – সে কথা সত্যেশ এর মধ্যেই কেমন করিয়া ভুলিল ? তা'র পর সংসারে থাকিয়া রোজ-রোজ নানা ক্ষুদ্র কার্য্যে সে কেমন করিয়া শুধু স্বামীর প্রীতি লক্ষ্য করিয়াই কত কাজ করিয়াছে, তাহার খাওয়া-দাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দৈনিক জীবনের প্রত্যেক কার্য্যটিতে সব চেয়ে সত্যেশের কিসে সুখ বেশী হয় সেই চিন্তা সেই ধ্যান সে দিন-রাত করিয়াছে ; সত্যেশের যে এই এক বৎসরের অধিক কাল ঘরে আসিয়া একবিন্দু অসুবিধা বা অশান্তি ভোগ করিতে হয় নাই—এ সব কথা সত্যেশ একবারও ভাবিল না ? সত্যেশের তিরস্কারের মধ্যে সব চেয়ে বেশী বিঁধিয়াছিল তাহাকে তাহার প্রাণঢালা ভালবাসার এই অপমান।

যখন সকালে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখনও অপমান-জ্ঞানটাই তাহার প্রবল ছিল ; তাই সে চট করিয়া লীলার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া চলিয়া আসিল। কিন্তু, যখন সে অনুভব করিল যে, সে দিদির সঙ্গে অমন করিয়া ঘর ছাড়িয়া আসিয়া গুরুতর অন্যায় করিয়াছে এবং সত্যেশকে গুরুতর আঘাত করিয়াছে, তখনই তার মনের দৃষ্টির ক্ষেত্র একদম ঘুরিয়া গেল। সে বুঝিল যে, সেই তাহার স্বামীর প্রাণঢালা প্রেমের অপমান করিল। স্বামীর সঙ্গে মতান্তর যে সে দিদির কাছে লইয়া আসিয়াছে, ইহাতে তাহার বড় লজ্জা বোধ হইতে লাগিল ; সত্যেশের এই অপমানে দুঃখ বোধ হইল। তখন আবার সমস্ত কথাগুলি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া সে পদে-পদে নিজেকেই দোষী মনে করিতে লাগিল। সে দেখিল যে, বাস্তবিক সে কোন দিনই সত্যেশের জন্য কোনও বিশেষ কিছু ত্যাগস্বীকার করে নাই ; কিন্তু সত্যেশ তাহার জন্য সব ছাড়িয়াছে। এই সর্ব্বত্যাগী ভালবাসার সে মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই। যে সব দোষের জন্য সত্যেশ তাহাকে তিরস্কার করিয়াছে, সে দোষ যে তাহার হইয়াছে সে ঠিক। মনে মনে না হউক বাহিরের আচরণে সে সত্যেশের কাছে দোষী হইয়া গিয়াছে। দশ জনের কাছে মান রাখিতে গিয়া সে সর্ব্বদাই দশজনের মতকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়াছে, সত্যেশের মতের দিকে চাহে নাই। তার দুর্ব্বলতাই ইহার জন্য দায়ী। যখন লোকে বলিল, সত্যেশ তাহাকে একচেটিয়া করিতেছে, তখন তাহার মন বলিতেছিল কথাটা সত্য এবং ইহা প্রশংসা বই নিন্দার কথা নয় ; কিন্তু দশ জনের এই কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন নিন্দাটুকু সে সহ্য করিতে না পারিয়া দশের মতকে অন্যায়রূপে মানিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়াই অপরাধ করিয়াছে। যদি সে বুক ফুলাইয়া সকলকে নিজের মনের কথাটা, সত্য কথাটা শুনাইত, তবে তো তাহাকে এত বিপদে পড়িতে হইত না। তা' ছাড়া, সে যে এতদিন এসব বিষয়ে সত্যেশের সঙ্গে লুকাচুরি করিয়াছে, সব কথা তাহাকে খুলিয়া বলিয়া তাহার সঙ্গে পরামর্শ করে নাই, এটাও তাহার দাম্পত্য-ধর্ম্মের অযোগ্য হইয়াছে।

আজ সে এইরূপে সমস্ত ব্যাপার খুঁটাইয়া-খুঁটাইয়া দেখিয়া পদে-পদে নিজেকেই অপরাধী করিতে লাগিল। আর, তা'র পর স্বামীর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত না করিয়া, যে লীলাকে সত্যেশ দু'চক্ষে দেখিতে পারে না এবং ইলাও বড় প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখে না, তাহার সঙ্গে সে চলিয়া আসিল, এই অপরাধ সত্যেশের সমস্ত ত্রুটী ছাপাইয়া তাহার চক্ষে পর্ব্বত-প্রমাণ হইয়া উঠিল। সে আবার ঘরে ফিরিবার একটা সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আশা করিল যে মিষ্টার ঘোষ এখনি যাইয়া সত্যেশকে বুঝাইয়া-পড়িয়া ডাকিয়া আনিবেন। কিন্তু মিষ্টার ঘোষের সেদিকে কোনও গা দেখা গেল না ; বরঞ্চ সত্যেশকে বেশ জব্দ করিবার জন্যই যেন তাঁহাকে উৎসুক দেখা গেল। তা'র পর, সে আশা করিল যে, সত্যেশ নিজেই হয় তো আসিবে ; কিন্তু বারোটা বাজিয়া গেল, সে আসিল না। তখন সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল বাড়ী ফিরিয়া যায়, কিন্তু

দিদির ঠাট্টার ভয়ে পারিল না। সমস্তক্ষণ অস্থির ভাবে ছুটাছুটী করিতে লাগিল।

মিষ্টার ঘোষ আফিসে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পর একটা চাপরাসী ইলার কাছে একখানা চিঠি লইয়া আসিল। স্বামীর চিঠি ভাবিয়া সে কম্পিতপদে অগ্রসর হইল। খুলিয়া নিরাশ হইল। চিঠি লিখিয়াছেন তার বাবা। চিঠিটি এই :—

"ইলা মা, নলিনের কাছে যাহা শুনিলাম তাহাতে স্তম্ভিত হইয়াছি। এ কি করিয়াছ মা? তুমি আমার কথা শুনিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, মনে আছে কি? বাড়ী ফিরিয়া যাও, সেখানে আমি সন্ধ্যার আগেই আসিব। সত্যেশকেও লিখিলাম। পাগলামি করিও না।

তোমার বাবা।"

পত্রখানি যেন ইলাকে কশাঘাত করিতে লাগিল। চিরদিন সে বাপের ভক্ত, পিতার মতামতের সঙ্গে একমত হওয়াই তাহার বরাবর অভ্যাস। তাই পিতার এই তিরস্কারে সে অন্তরে অন্তরে আরও দৃঢ়ভাবে অনুভব করিল যে, সে অন্যায় করিয়াছে। সে কাঁপিতে কাঁপিতে পত্রখানি লীলাকে দিল। লীলা তো পত্র পড়িয়া চটিয়া গেল। সে বলিল, "Nonsense, এইখানেই তোমায় থাকতে হ'বে যে পর্য্যন্ত ঐ পাজীটা মাথা না নোয়ায়। বাবা তো সব বোঝেন! বুঝলে আর আজ এ দুর্গতি হ'ত না। বাঁদরের গলায় মুক্তাহার পরিয়েই না এত কাণ্ডকারখানা।"

কথাগুলি ইলার ভাল লাগিল না, কিন্তু সে কিছু বলিল না। নীরবে গিয়া একখানি বই লইয়া পড়িতে বসিল। কিন্তু সে পড়িল না, সে কেবল নিজেকে মনে-মনে চাবুক মারিতে লাগিল। সে যে কেন দিদির কথা অবহেলা করিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেছে না, যেটা সত্য-সত্য উচিত তাহা যে সে এই তুচ্ছ নারীর নাসিকা-কুঞ্চনের ভয়ে কেন করিতে পারিতেছে না, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে পারিতেছে না বলিয়া নিজেকে তিরস্কার করিতে লাগিল, কিন্তু সত্য সত্য উঠিয়া বাহির হইয়া পড়িতেও পারিল না।

বৈকালে মিষ্টার ঘোষ এক দল বন্ধু লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। বন্ধুরা মিসেস মুখার্জ্জীর সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন! Lawnএ বসিয়া চা খাইতে-খাইতে লীলা ও বন্ধুরা সত্যেশের বেশ স্বচ্ছন্দ সমালোচনা করিতে লাগিল;—বলা বাহুল্য, কাহারও ভাষা বিন্দুমাত্রও সংযত করিবার জন্য চেষ্টা করিবার কেহ প্রয়োজন অনুভব করে নাই।

ইলা প্রথমে ভদ্রতা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং এক-আধজনকে সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদও দিয়াছিল। তা'রপর ক্রমে তাহার অসহ্য হইতে লাগিল। সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া চা খাইতে লাগিল। শেষে যখন গালাগালির মাত্রা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল, তখন সে দাঁড়াইয়া উঠিল; বলিল, "দিদি, আমি তোমার এখানে অপমান হ'তে আসি নি।"

"যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!" সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল। পুরুষ বন্ধুরা বেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া উঠিল, কিন্তু লীলা জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "ইস্, ভারী যে দরদ! তবে আমার সঙ্গে এলি কেন?"—

ইলা বলিল, "ঘাট হ'য়েছে, তশো'বার ঘাট হ'য়েছে। এই চল্লুম।" বলিয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ী ফিরিয়া সে দেখিতে পাইল যে অনেকগুলি ট্রাঙ্ক সত্যেশের ড্রেসিং রুমে পড়িয়া রহিয়াছে। বেয়ারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল যে সাহেব তাহাকে তাঁহার সমস্ত কাপড়-চোপড় বিছানা পত্তর প্যাক করিতে হুকুম দিয়া সকালে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

ইলার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবেন বলিয়া গিয়াছেন কি?"

বেয়ারা বলিল "তাহা বলেন নি, কিন্তু কাল জাপানী জাহাজে মাল পাঠাইতে বলিয়াছেন।"

জাপানী জাহাজে? তবে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া—সত্যেশ নিজেকে নির্ব্বাসিত করিতে বসিয়াছে! কম্পিতকণ্ঠে ইলা জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব কারখানা থেকে ফেরেন নি?"

বেয়ারা বলিল, "ফেরেন নি, তবে গাড়ী তাঁকে হাবড়া ষ্টেশনে পৌছে দিয়ে ফিরে এসেছে।"

কম্পিত-হস্তে ইলা টেলিফোনের রিসীভারে হাত দিয়াছিল, সে তাহা ফেলিয়া দিল। তবে কি সত্যেশ চলিয়া গিয়াছে! তাহাকে একটিবার মা বলিয়া, ক্ষমা-ভিক্ষার একটা অবসর না দিয়া চলিয়া গিয়াছে! তাহার

বড় কান্না পাইল, কিন্তু বুড়ো বেয়ারার সম্মুখে লজ্জায় কাঁদিতে পারিল না।

বেয়ারাকে বিদায় দিয়া সে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। একটু পায়চারি করিয়া সে আবার টেলিফোনে গিয়া Mc-Crindle সাহেবকে ডাকিল, তাহার কাছে যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, মাথা ঘুরিয়া পড়িতে-পড়িতে সে সামলাইয়া গেল। Mc-Crindle বলিলেন যে, মরিসাস দ্বীপে একটা শাখা কারখানা খোলার জন্য তাঁহার সেখানে যাওয়ার কথা ছিল। আগামী কল্য নিপ্পন ইয়ুফেন কাইশার ষ্টীমারে যাওয়ার প্রস্তাব ছিল। আজ সকালে সত্যেশ হঠাৎ যাইয়া বলিল যে, সেই নিজে যাইবে, Mc-Crindle কলিকাতায় থাকুক। এই বন্দোবস্ত করিয়া সে বেলা তিনটায় আফিস হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাহার আদেশ যে আবশ্যক কাগজপত্র সাজ-সরঞ্জাম একটি লোক দিয়া জাহাজে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। সত্যেশ নিজে রেলে যাইয়া মাদ্রাজ হইতে ষ্টীমারে উঠিবে।

দুই হাতে মাথাটাকে চাপিয়া ধরিয়া ইলা বসিয়া পড়িল,—তবে কি সে সত্যই গিয়াছে, আর কি ইলা তাহাকে ফিরাইতে পারিবে না? ভাবিতে তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার সময় চ্যাটার্জ্জী সাহেব আসিলেন। তাঁহার মুখে ব্যস্ত ভাব। তিনি আসিতেই ইলা তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। চ্যাটার্জ্জী সাহেব তাহাকে যথাসাধ্য শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যেশ বাড়ী আসেনি?"

ইলা কাঁদিতে কাঁদিতে Mc-Crindleএর কাছে যাহা শুনিয়াছিল, তাহা জানাইল। চ্যাটার্জ্জী সাহেব চিন্তিত হইলেন। কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পর ইলা কাতরভাবে বলিল, "বাবা, আমার কি উপায় হইবে?" বলিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে আবার পিতার বুকে মুখ লুকাইল।

বৃদ্ধ কন্যার বিস্রস্ত কেশে হাত বুলাইতে-বুলাইতে কেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন। তার পর ইলাকে বসাইয়া সত্যেশের শফারকে ডাকাইলেন। সে বলিতে পারিল না সাহেব কোন্ জায়গার টিকিট কিনিয়াছেন; কিন্তু তাহার কথায় প্রকাশ পাইল যে, সত্যেশ অন্ততঃ বেঙ্গল-নাগপুর লাইনের গাড়ীতে ওঠে নাই। ইহা শুনিয়া চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "তুমি মিছে ব্যস্ত হচ্ছ। আমার ঠিক বিশ্বাস যে, সত্যেশ বৰ্দ্ধমানে গেছে তার বাবার সঙ্গে দেখা ক'রতে। বেয়াই বৰ্দ্ধমানে বদলী হ'য়ে এসেছেন কি না! সেখান থেকে ফিরে তবে মাদ্রাজ যাবে। আমি এখনি বৰ্দ্ধমানে টেলিগ্রাম ক'রে দিচ্ছি।"

চ্যাটার্জ্জী কেবল বৰ্দ্ধমানে টেলিগ্রাম পাঠাইলেন না, তিনি তাহা ছাড়া নিপ্পন ইয়ুফেন কাইশারের এজেণ্ট সাহেবের কাছে টেলিফোন করিলেন। সাহেবের সঙ্গে চ্যাটার্জ্জীর পরিচয় ছিল। টেলিফোনের আলাপের ফলে, যে ষ্টীমারে সত্যেশের যাইবার কথা, সেই ষ্টিমারে দু'খানা কেবিন মাদ্রাজ যাইবার জন্য রিজার্ভ করা হইল।

সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া চ্যাটার্জ্জী কন্যাকে বলিলেন, "তোমার কোনও চিন্তা নেই, সত্যেশের সঙ্গে দেখা হ'বেই। সে খুব সম্ভবতঃ কাল এখানে আসবে। যদি না আসে, তবে কাল আমরা তা'র জিনিষগুলির সঙ্গে মাদ্রাজ চ'লে যাব, সেখানে তা'কে ধরতে পারবোই। তার পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব হ'বে কি না, সেটা কাল সকালবেলা Mc-Crindleএর কাছে জেনে পরামর্শ ক'রে কর্ত্তব্য স্থির করা যাবে। সুতরাং তোমার ব্যস্ত হবার কোনও কারণ নেই।"

ইলা সমস্ত বুঝিয়া আশ্বস্ত হইল।

চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "মা, আমার কথা শুনো, দেখা হ'লে যেন নরম হ'য়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়ো। একজনের দোষে কখনই ঝগড়া হয় না। কাজেই, তোমার পক্ষে অনেক কথাই হয় তো ব'লবার আছে, তা'র অনেক কথা জবাব দেবার মত আছে; কিন্তু যদি আমার কথা শোন, তবে কোনও জবাব দিও না। সব কথার যদি ন্যায্য জবাব দিতে যাওয়া যায়, তবে সংসার অনেক সময় একটা ভালুকের খাঁচা হ'য়ে পড়ে। সে না হয় তোমাকে একটা অন্যায় কথা ব'ললেই; তা'তে বিশেষ কিছু লোকসান হয় না। কিন্তু, তা'র জবাব দিতে গেলে কথা বাড়ে, আরও অন্যায় হয়। তাই বলি মা, এবার দেখা হ'লে কোনও অন্যায় কথারও প্রতিবাদ করো না।"

ইলা কিছু বলিল না। এ কথার উত্তরে তার বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল যে, সে কোনও জবাবই এ পর্য্যন্ত দেয়

নাই, কেবলই শুনিয়া গিয়াছে ; কিন্তু এ জবাবটাও না দিয়াই সে পিতার উপদেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিল।

চ্যাটার্জ্জী চলিয়া গেলেন। ইলা তার মাদ্রাজ যাওয়ার উপযোগী কাপড়-চোপড় গুছাইয়া প্যাক করিল। তাহার অনুপস্থিতিতে ঘর দুয়ারের কি ব্যবস্থা হইবে, সে সব মনে মনে ঠিক করিল। এই রকম করিয়া সে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মনটাকে ব্যস্ত করিয়া শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল।

একটু বেলায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। বাহিরে আসিয়া একখানা টেলিগ্রাম পাইল। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া অসম্ভব আশায় আশান্বিত হইয়া সে টেলিগ্রাম খুলিল ; পড়িয়া বসিয়া পড়িল। সত্যেশের পিতা টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে, সত্যেশ বৰ্দ্ধমানে গিয়া মাত্র দুই ঘণ্টা ছিল, তাহার পর সে কলিকাতার ট্রেণে ফিরিয়াছে।

তবে সে কোথায়? কালই যদি সত্যেশ কলিকাতায় ফিরিয়া থাকে, তবে সে এখনো কলিকাতাতেই আছে! ভাবিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সে মোটর তৈয়ার করিতে বলিয়া টেলিফোনের কাছে গেল। যত সম্ভব-অসম্ভব জায়গা ছিল, সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিল,—কেহ সত্যেশের খবর দিতে পারিল না।

চ্যাটার্জ্জী সাহেব আসিয়া দেখিলেন যে, ইলা একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। তাঁহার হাতে টেলিগ্রামখানি দিয়া সে শুষ্কমুখে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। চ্যাটার্জ্জী ইলাকে চা খাওয়াইয়া বলিলেন, "তুমি সুস্থির হও, আজ রাত্রেই জাহাজে উঠতে হ'বে। সেজন্য প্রস্তুত হও। আমি একবার কারখানায় Mc-Crindle-এর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।"

চ্যাটার্জ্জী চলিয়া গেলেন, ইলা আপনার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার শরীর-মন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়াছিল ; সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, সত্যেশ ফিরিয়া আসিয়াছে। ইলা লজ্জায় তাহার সাম্‌নে যাইতে পারিতেছে না, তাহার পা যেন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, কণ্ঠরোধ হইয়াছে। সত্যেশ জিনিষপত্র গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া মোটরের উপর উঠিয়া বসিল, ইলা ঘর হইতে দেখিল। শেষে প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়া যেই সে সত্যেশের কাছে যাইবে, অমনি হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল। সে তখন সত্য-সত্যই খাট হইতে পড়িতে-পড়িতে ঘুম ভাঙ্গিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল। কিন্তু জাগিয়াও সে শুনিতে পাইল যেন সত্যেশ শোফারকে বলিতেছে "জাহাজ-ঘাট"।

সে চমকিয়া চক্ষু রগড়াইয়া উঠিয়া বসিল। সত্যই সত্যেশ আসিয়াছে, তাহার মালপত্র গাড়ী বোঝাই করাইয়া গাড়ী জাহাজঘাটে যাইবার আদেশ দিতেছে। ইলা উঠিয়া দাঁড়াইল, বুক ভয়ানক ধড়ফড় করিয়া উঠিল ; বুক চাপিয়া সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ততক্ষণ সত্যেশ গাড়ী বিদায় করিয়া খাইবার ঘরে গেল।

আয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া ইলাকে বলিল, "হুজুর, সাহেব আয়ে হৈঁ ; খানেমে বৈঠে হৈঁ।" ইলা কোন কথা না বলিয়া একেবারে খানার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। সত্যেশ একবার চাহিয়া দেখিল, কোনও কথা বলিল না। ইলা তাহার চেয়ারটাতে গিয়া বসিল ; সেও কিছু বলিতে পারিল না। খানসামা তাহার সামনে একখানি প্লেট দিতে আসিল ; ইলা বারণ করিল।

সত্যেশ নীরবে মাথা গুঁজিয়া খাইয়া যাইতে লাগিল। ইলা কেবল খানসামাকে এটা-ওটা আদেশ করা ছাড়া কিছুই বলিল না। খাওয়া শেষ হইলে সত্যেশ উঠিল ; তখন ইলা তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত ধরিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কোথা যাবে?" তাহার কণ্ঠ যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

সত্যেশ কেবল বলিল, "মরিসাসে।" তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তোমার কোনও চিন্তার কারণ নেই। আমি এখানকার আফিসে অর্ডার দিয়ে গেলাম, এরা এখান থেকে তোমাকে মাসে মাসে ৫০০৲ টাকা ক'রে দেবে, বাড়ী-গাড়ী সব থাকবে, তোমার কোনও কষ্ট হ'বে না।"

ইলার কেবল বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল। তাহার মনের ভিতর কত কথা গজগজ করিতেছিল ; কিন্তু সে একটী কথাও বলিয়া উঠিতে পারিতেছিল না,—কথাগুলা যেন তাহার গলার কাছে আসিয়া ভয়ানক ঠেকিয়া গিয়াছিল। তাই সে শুধু বলিল, "কেন যাবে?" বলিয়া তাহার করুণ চক্ষুদুটি একবার সত্যেশের মুখের উপর রাখিল। সত্যেশও একবার তাহার দিকে চাহিল। সত্যেশের মনে যেন একটু ধোকা লাগিল। ইলা যে এই একদিনে এতটা রোগা ও ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে, তাই

লক্ষ্য করিয়া সত্যেশের ধোকা লাগিল। কিন্তু সে ভাব সামলাইয়া সে ধীর ভাবে বলিল, "কেন, সে কথা বলবো; যাচ্ছি যখন, তখন তোমার কাছে কথাটা স্পষ্ট ক'রে বলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু এখানে চাকরদের সামনে নয়, ও-ঘরে চল।"

ড্রইং-রুমে যাইয়া সত্যেশ ইলাকে একটা চেয়ারে বসাইল; নিজে সামনে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "আমি যে হঠাৎ রাগের মাথায় একটা কিছু করেছি তা নয়। আমি বেশ করে ভেবে দেখেছি, যে, তোমায় আমায় এক-সঙ্গে থাকলে আমাদের দুজনেরই জীবন ব্যর্থ হ'বে। হিন্দুমতে আমাদের বিবাহ হ'য়েছে, কাজেই এটা ভাঙবার কোনও উপায় নাই। তাই ব'লে যদি আমরা দুর্জন একসঙ্গেই থাকতে আরম্ভ করি, তাতে তোমারও কষ্ট, আমারও কষ্ট। এটা কারও দোষ নয়, আসল কথা আমরা পরস্পরের জন্য তৈয়ারী হইনি। তোমার দিদি ঠিক ব'লেছেন, এ যেন বাঁদরের গলায় মুক্তাহার! অথচ আমরা যদি তফাৎ থাকি, তবে তুমিও আনন্দে জীবন কাটাতে পারবে, আমিও বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারবো। সেই জন্যই আমি যাচ্ছি। জীবনের প্রথমে একটা প্রকাণ্ড ভুল ক'রে বসেছি। অনেক আশা ক'রে তোমাকে বিয়ে করেছিলাম; অনেক স্বপন দেখেছিলাম; এখন দেখছি সেটা ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু তাই বলে কি দুটো জীবনকে একদম ব্যর্থ ক'রে দিতে হবে? তুমি যদি তোমার পথে যাও, আমি আমার পথে যাই, তবে এখনও আমাদের দুজনেরই জীবন সার্থক হ'তে পারে। ভালবাসাবাসি ছাড়াও জীবনের একটা সার্থকতা হ'তে পারে।"

ইলা সব কথা শুনিল না, শুনিতে পাইল না, শুনিবার কোনও দরকার বোধ করিল না। সত্যেশের কথা শেষ হইলে সে কেবল বলিল, "আমার একটি কথা রাখবে কি? আমি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি, সে আমার অদৃষ্টের দোষ। আমি দোষী, কিন্তু আমাকে এত বড় একটা শাস্তি দেবার আগে আমাকে একটিবার পরীক্ষা ক'রে দেখবে? ছয় মাস আমি সময় চাচ্ছি; আর একটীবার আমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখ; ছয়মাস পরে পায় ঠেলতে চাও আমি বারণ ক'রবো না।"

সত্যেশ বলিল, "দেখ ইলা, তুমি পণ্ডিত, তুমি বাজে স্ত্রীলোকের মত কথা বলো না। আমাদের সম্বন্ধটা কি ভাল ক'রে মনে করে দেখ। এতে পায় ঠেলার কোনও কথা আসে না। তোমায় আমায় একটা সংসার গড়বার চেষ্টা করলাম। দেখতে পাচ্ছি, আমাদের স্বভাব চরিত্র, শিক্ষা-দীক্ষা এমন বিপরীত যে, পরস্পরকে খোচা না দিয়ে আমাদের চলাই কঠিন। দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের সংসার করবার Experimentটা সফল হ'ল না। কাজেই এটা ছেড়ে দেওয়াই ভাল। এ নিয়ে কোনও কান্নাকাটি করাটা তোমার মত বুদ্ধিমতীর শোভা পায় না। আর ছয় মাস সময় নিয়ে কোন লাভ নেই। আমাদের সমস্ত সত্তা এতটা বিরুদ্ধ রকমের যে, কোনও চেষ্টা করেই আমরা আমাদের জীবনটা সুখী ক'রতে পারি না। কাজেই ছয় মাস যদি আবার আমরা সংসার ক'রতে বসি, তবে হয় আমরা ঠিক এমনি পরস্পরকে কষ্ট দিতে থাকবো, না হয় তুমি একটা প্রচণ্ড চেষ্টা করে হয় তো তোমার সমস্ত স্বভাবটাকে মাস কয়েকের জন্য চেপে দেবে। তোমাকে এমন করে রাখতে আমি ইচ্ছা করি না, আমার এমন কোনও অধিকার আছে ব'লে মনে করি না।"

ইলা এবার উঠিয়া সত্যেশের পা জড়াইয়া ধরিল; চক্ষের জলে তাহার বুক ভাসাইয়া সে সত্যেশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাকে মেরে ফেলো না, বাঁচতে দাও। তুমি আমায় ফেলে গেলে আমি দু'দিনও বাঁচবো না। আমায় দয়া কর, ছ'মাস না হয় দু'মাস আমায় সময় দাও!"

সত্যেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইলাকে টানিয়া বুকের কাছে তুলিয়া লইল। তাহারও চক্ষু ছলছল করিতেছিল। ইলাকে বক্ষে ধরিয়া সে তাহার কম্পিত অধরে একটি চুম্বন দিল। তাহারা আর কোনও কথা কহিল না।

কিছুক্ষণ পর চ্যাটার্জ্জী সাহেব একেবারে Mc-Crindleকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্যেশকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কন্যার দিকে চাহিলেন। ইলার আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখ চোখ দেখিয়া তাঁহার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না।

চ্যাটার্জ্জী আসিয়া বলিলেন, "তা হ'লে মিটে গেছে সব? Mc-Crindleকেই তবে যেতে হবে মরিসাস?"

সন্তোশ বলিল, "না, আমিই যাব।"

ইলা ও চ্যাটার্জ্জী দু'জনেই শঙ্কিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। সন্তোশ বলিল, "ইলাকে একটু কালাপানি পার করিয়ে নিয়ে আসি। কি বল ইলা?" ইলার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সন্তোশ ও ইলা সেই জাহাজেই মরিসাস যাত্রা করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

ছয় মাস পরে সন্তোশ ও ইলা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। মরিসাসে ম্যাসাচুসেটস্ মেশিনারী লিমিটেডের কারবার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সেখানে একজন যোগ্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া সন্তোশ ফিরিয়া আসিল। বন্ধু-মহলে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের ছড়াছড়ি লাগিয়া গেল।

সন্তোশ আসিয়া দেখিল তাহার পিতা মৃত্যুশয্যায়। তিনি ইতিমধ্যে পেনসন লইয়া কাশীবাস করিতেছিলেন; সেখানে যাইয়া তাঁহার এপোপ্লেক্সী হয়। সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু তাহার পর তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইয়া তিনি শয্যাগত হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় তিনি তিন চার মাস পড়িয়া আছেন; এখন তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কলিকাতায় আসিয়াই সন্তোশ কাশী যাত্রার উদ্যোগ করিল; ইলা সঙ্গে চলিল, কিছুতেই ছাড়িল না। ইহার পর প্রায় একমাস বৃদ্ধ কালীভূষণ মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া থাকিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইলেন; কিন্তু এই এক মাস বৃদ্ধের সন্তপ্ত হৃদয় অনেকদিন পর শান্তির আস্বাদ পাইয়াছিল। এ একমাস সন্তোশ তাহার পিতার শয্যাপার্শ্ব ছাড়ে নাই। ইলা এই একমাস দেবীর মত শ্বশুরের শিয়রে বসিয়া সেবা করিয়াছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে সংসারে এমন একটা সুশৃঙ্খলা ও শান্তি আনিয়াছে যে, কালীভূষণ বাবুর সমস্ত সমবেত আত্মীয়বর্গ তাহার নিষ্ঠা, চেষ্টা ও পটুতায় অবাক্ হইয়া গিয়াছে।

সন্তোশের বোন মনোরমা একদিন কাঁদিয়া বলিল, "বৌদিদি, তুমি এত জান, এত পার! এতদিন যদি তুমি বাবার কাছে থাকতে, তবে বুঝি আজ তাঁর এ দশা হইত না।"

ইলা শুধু কাঁদিল, কিছু বলিল না। তাঁহারও মনে হইতেছিল যে, কেবল যত্ন ও শুশ্রূষার ত্রুটিতেই তাহার শ্বশুরের এই বয়সেই এ দশা হইয়াছে। সে যদি তাঁহার কাছে থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে তাহার প্রীতি, সেবা ও পূজার দ্বারা ঘিরিয়া রাখিতে পারিত, তবে বুঝি তাঁহাকে আজ যমে ছুঁইতে পারিত না। কেন সে তাহা পারিল না?

কালীভূষণ বাবু নিজে অবাক্। তাঁহার জ্ঞান শেষ পর্য্যন্ত অটুট ছিল; কিন্তু কথা অস্পষ্ট ও স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। আকার-ইঙ্গিতে সকলকে তাঁহার কথার ভাব গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু কি জানি কেমন করিয়া ইলা তাঁহার সব কথা, সকল ইঙ্গিত চট্ করিয়া বুঝিত, আর কেহই তাহা বুঝিত না। কালীভূষণ বাবু মাঝে-মাঝে সপ্রশংস নীরব দৃষ্টিতে সন্তোশ ও ইলার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেন। ইলা তখনি নিজের অশ্রু চাপিয়া তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া কত কি কথা বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিত। সে ঠিক তাঁর মনের কথা বুঝিয়া উত্তর দিত বলিয়াই তাহার সান্ত্বনায় বৃদ্ধের মুখে শীঘ্রই আনন্দ ফুটিয়া উঠিত।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন চ্যাটার্জ্জী সাহেব আসিলেন। সেদিন কালীভূষণ বাবু অনেকটা শান্ত ও সুস্থ হইয়াছেন। চ্যাটার্জ্জী সাহেবকে দেখিয়া তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে ইলার খোঁজ করিতে শিয়রের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন। ইলা পাশের ঘরে গিয়াছিল, সন্তোশ ইঙ্গিত করিতেই আসিয়া দাঁড়াইল। কালীভূষণ ইঙ্গিত করিয়া ইলাকে কি বুঝাইয়া তাহার পিতাকে বলিতে বলিলেন। ইলা বুঝিল, কিন্তু পিতাকে কিছু বলিল না, কেবল শ্বশুরকে বলিল, "আপনি ওসব কথা বলবেন না, ছি!" বলিয়া চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে লাগিল। কালীভূষণ অনেকদিন পর আজ তাঁহার কম্পিত দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া ইলার চোখের কাপড় সরাইলেন; প্রায় স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন; "কেঁদো না, বাবাকে বল।"

ইলা তাহার মুখের দিকে চাহিল, বৃদ্ধের ব্যগ্রতা দেখিয়া বুঝিল না বলিলে চলিবে না। চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "কি বলছেন উনি মা, বল আমাকে।"

ইলা বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিল না। কিন্তু সন্তোশ এতক্ষণে কথাটা বুঝিয়াছিল; সে বলিল, "উনি যে ইলাকে যত্ন ক'রতে পারেন নি, সেই কথা ব'লছেন?"

কালীভূষণ সম্মতি জানাইলেন, পরে অনেকক্ষণ চেষ্টা

করিয়া নিজেই চ্যাটার্জ্জীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রত্ন দিয়েছিলে—চিনিনি।"

ইলা কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "এ সময় ও-কথা ব'লে আমাকে অপরাধী ক'রবেন না। আমি ত জানি আমি আপনার কাছে কত দোষ ক'রেছি। আপনার কোলে ঠাঁই পাই নি, সে তো আমারই দোষ।"

কালীভূষণের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লগিল। চ্যাটার্জ্জী সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহারও দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। অনেকদিন পর কালীভূষণ আজ স্পষ্ট করিয়া দুটী কথা বলিয়া জন্মের মত নির্ব্বাক্ হইলেন। পরদিন প্রাতে তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন।

সত্যেশ কলিকাতায় ফিরিল। সেখান হইতে দেশে গিয়া প্রায়শ্চিত্ত ও শ্রাদ্ধ করিবে স্থির করিল। ইলা কিছুতেই ছাড়িল না, তাহার সঙ্গে গেল। তখন বর্ষাকাল, সারা বিক্রমপুর জলে থৈ-থৈ করিতেছে। অপার জলরাশির মাঝখানে এক-একখানি বাড়ী বা এক-একটি পাড়া যেন ভেলার মত ভাসিয়া রহিয়াছে। সত্যেশ ইলাকে বলিল, "কেমন লাগ্ছে।"

নৌকার ছাদে দুজনে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছিল। নীল আকাশে থরে-থরে মেঘ চারিদিকে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে; আকাশের ঠিক মাঝখানে পূর্ণচন্দ্র সেই বিস্রস্ত মেঘরাশির উপর ঝলকে-ঝলকে আলো ছড়াইয়া তাহাদিগকে রঙ্গাইয়া দিতেছে; সেই অপার বারিরাশি চাঁদের আলোয় ঝিক-মিক করিতেছে। মাঝিরা তালে-তালে দাঁড় ফেলিয়া জলের ভিতর চাঁদির ঝলক তুলিতেছে। দূরে গ্রামের গাছগুলি অন্ধকারে জ্যোৎস্নার আড়ালে যেন চোরের মত উঁকি মারিতেছে।

ইলা বলিল, "বড় সুন্দর!"

এই নীরব নির্জ্জন অন্ধকারে ইলার মনে হইতে লাগিল যেন তাহারা আর এ জগতের নহে। কোন এক অজানা ইন্দ্রজালের নৌকায় চড়িয়া তা'রা দুটি প্রাণী যেন পরলোকের পথে মেঘের মাঝখান দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সমস্ত জীবনের পরপারটা যেন তার চোখে ওই স্বচ্ছ নীল আবরণের ভিতর দিয়া একেবারে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে সত্যেশের হাতখানা আরও চাপিয়া ধরিল। বলিল, "সুন্দর, বড় সুন্দর! বুঝি সমুদ্রের চাইতেও সুন্দর!"

সত্যেশের পৈতৃক বাসগৃহ অনেক দিন পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। সে আসিবে বলিয়া তাহা ঝাড়া-পোঁছা হইয়া একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। কিন্তু বালিগঞ্জের সে সুরম্য অট্টালিকার তুলনায় ইহা একটা অন্ধকূপ বলিলেও চলে। সত্যেশ ইলাকে বলিল, "তোমার আর বাড়ীতে উঠে কাজ নাই; তুমি এই বোটেই থাক, সে বাড়ীতে তুমি বাস ক'রতে পারবে না।"

ইলা সত্যেশের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, বলিল, "সে হবে না।"

দু'দিন বাড়ীতে থাকিতেই সে গৃহখানিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। মনোরমা বলিল, "বৌদিদি, তুমি কি পরেশ পাথর, যা ছোঁবে তাই সুন্দর হ'বে।"

ইলা বলিল, "আমি নই ঠাকুরঝি, তোমার দাদাই পরশ-পাথর—কিম্বা, হয় তো বা আগুন।"

"কেন আগুন কিসে হ'লো?"

"আগুনে পোড়ালে সোণা খাঁটি হয় জানো না? পরশ-পাথর সত্যি-সত্যি নেই, কিন্তু আগুনটা সত্যি।"

দারুণ বর্ষা, দিনরাত সমানে বৃষ্টি! ব্যাপারের বাড়ী; লোকজনের হাঁটাহাঁটিতে সমস্ত উঠান কাদায় থই-থই করিতেছে! তাহার ভিতর সকলে ছুটাছুটি করিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতেছে। ইলারই সবার চেয়ে কাজ বেশী, সেই খুব বেশীর ভাগ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। ওয়াটারপ্রুফ গায় চড়াইয়া সে চারিদিকে ছুটিয়া সব তদ্বির করিতেছে। একদিন সকালে এক হাঁটু কাদা ভাঙ্গিয়া সে ভিজিতে-ভিজিতে তার শুইবার ঘরের বারান্দায় আসিয়া পা দিল। তাহার গায় বর্ষাতি নাই, মাথায় একটা "মাথাল", হাতে জামা ও চুড়ি রহিয়াছে, আর সারা হাত হলুদ-মাখা। বারান্দায় জল ও গামছা ছিল; সে হাত-পা ধুইয়া-মুছিয়া ঘরে উঠিল; সম্মুখে দেখিল সত্যেশ।

সত্যেশ বলিল, "কি ইলা, এখন কেমন লাগছে, বড় সুন্দর! না? কেমন কাদা, কেমন জল! কেমন থৈ-থৈ—না?"

ইলা হাসাময় চক্ষু ঘুরাইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, বলিল, "ঠাট্টা নয়, সত্যি বড় সুন্দর! পৃথিবীর মাটী জল-হাওয়ার সঙ্গে কি চমৎকার মাখামাখি—প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে মিশে গেছি! এ যে Life! এর চেয়ে সুন্দর

আর কি আছে ?" তাহার গণ্ডে ও ওষ্ঠাধরে রক্ত আভায় জীবন ফুটিয়া উঠিতেছিল; সত্যই সে জীবনের স্বরূপ উপভোগ করিতেছিল, তাহা বুঝা গেল।

সত্যেশ বলিল, "ইলা, তুমি আমায় অবাক্ ক'রলে! আমার এ দেশের সঙ্গে রক্ত-মাংসের সম্পর্ক; আমি বিশ্বাস করি যে, আমি এদেশ খুব ভালবাসি, তবু আমি প্রায় ক্ষেপে যাবার মত হ'য়েছি। জল আর কাদা, কাদা আর জল! ঘরে থেকে ভদ্রভাবে বেরোবার উপায় নেই! আর তুমি বলছো কি না সুন্দর!"

ইলা হাসিয়া বলিল, "তুমি যে একটা গোড়ায় গলদ ক'রে রেখেছ! এখানে আসবার সময় ভদ্রভাবটা যে বাক্স-বন্দী ক'রে রেখে এসনি, সেই ক'রেছ ভুল। এখানে প্রকৃতি তার কাদা মাখা হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন ক'রতে এগিয়েছে,—ভদ্রামীর পোষাক আসবাব ছেড়ে না এলে তা'র ভিতর ঢ়ুকে উপভোগ ক'রবে কি ক'রে?"

সত্যেশ বলিল, "আর তা' ছাড়া এই দেশের লোকগুলো আমায় পাগল ক'রে তুলবে। সমস্ত রাজ্যশুদ্ধ লোক ঘোঁট পাকাচ্ছে, যাতে আমি এই কাজটা সারতে না পারি। আমাকে অপমান করবার একটা সুযোগ পেয়ে কেউ সেটা হেলায় হারাতে চায় না। অথচ কি যে সব লোক? মনুষ্যত্ব হিসাবে আমার কারখানার মুটে-মজুরেরও অধম। সমস্তটা জীবন ভরে' খাওয়া দাওয়া ঘুমোনো, কুকার্য্য আর কুচিন্তা ছাড়া তা'দের অন্য অবলম্বন নাই। একবারের তরে কেউ ভাবে না যে, ভগবান তা'দের মানুষ করে সৃষ্টি ক'রেছেন কিসের জন্য? আচ্ছা, প্রকৃতি না হয় খুব বেশী ক'রে তোমায় পেয়ে ব'সেছে, এখানকার মানুষগুলোও কি তোমায় জ্বালাতন ক'রে উঠতে পারেনি?"

ইলা বলিল, "মোটেই না। আমি তো দেখি, এরা সহৃদয়! এরা সর্ব্বদাই যে আমায় বাহবা দেবে, আর সব বিষয়েই ঠিক আমার মতে মত দেবে, আমার দরকার বুঝে কাজ ক'রবে, এমন আমি আশাও করি না, এমন হয়-ও না। ও বাড়ীর বট্‌ঠাকুরুণ সে দিন তো আমায় এসে যা নয় তাই ক'রে ব'কে গেলেন, আমি বেহায়া বলে। আমার তাতে একটুকুও রাগ হয়নি। আমি ঘোমটা দিই না, সবার সামনে বেরুই, পাড়ার বাবুদের কাছে ব'সে সমানে-সমানে কথা কই, এ দেখে বট্‌ঠাকুরুণের মত লোক যদি আমায় বেহায়া না বলে—তাদের সংস্কারের সঙ্গে তাদের কথা এতটা বেখাপ হয়—তবে বল্‌তে হবে যে, তারা মনের কথা বল্‌ছে না। কল্‌কাতায় হ'লে তাই হ'ত। সেখানে যিনি অতি বড় নিষ্ঠাবান হিন্দু, যিনি গঙ্গাস্নান না করে জল-গ্রহণ করেন না, তিনি হয়তো আমার বাড়ী নিমন্ত্রণে এসে নানা মিষ্ট কথায় আমাকে আপ্যায়িত করে, ফের গঙ্গা-স্নান ক'রে বাড়ী ফিরতেন। এখানে যে সেটি হয় না, যে যা ঠিক সেইটাই প্রকাশ করে, সেইটে আমার বড্ড ভাল লাগে।"

সত্যেশ ইলার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল, সে প্রাণের কথা বলিতেছে। সে বলিল, "তা না হয় হ'ল, কিন্তু এখন উপায় কি? প্রায়শ্চিত্ত তো হ'ল, এখন শ্রাদ্ধ নিয়ে বড় গোলযোগ, কেউ আস্‌বে না বোধ হয়!"

ইলা বলিল, "তার আর কি করবে বল। তুমি যেটা ভাল বুঝবে, সেইটে তুমি করবে; তাতে যে আসে আসুক, না আসে না আসুক।"

"কিন্তু তা'হলে আমার লাভ হ'ল কি? সমাজকে ত আমার দিকে পেলাম না। সমাজের তো সংস্কার হ'ল না।"

"না হ'ক, শ্বশুর মশায়ের আত্মার তৃপ্তি হবে! আর সমাজের জন্য তুমি চিন্তা করো না। ধাঁ ক'রে এক মুহূর্ত্তে জোর করে সমাজকে ঠেলে তোলা যায় না। কিন্তু সত্যের পথে সমাজকে আস্‌তেই হবে! আজ তুমি আমাকে নিয়ে এসে সমাজের ভিতর যে বোমা ঢুকিয়ে দিয়েছ, সেটা ফাটবেই, তাতে পুরাণো সংস্কার ভেঙ্গে চুরমার হবে। তুমি-আমি আজ যে কাজ করছি, তার্কিকেরা যত অপছন্দ করুক, যত গাল দিক, যদি আমাদের পথ সত্য পথ হয়, তবে সেটা এদের নিতেই হবে।"

শ্রাদ্ধ কোনও মতে শেষ হইল। কতক-কতক লোক সত্যেশের পক্ষে আসিল, বেশীর ভাগ আসিল না। কিন্তু সত্যেশ পিতার অন্ত্যকৃত্য শাস্ত্রমতে সম্পন্ন করিয়া উঠিল।

শ্রাদ্ধের পর সত্যেশ কলিকাতায় ফিরিল। সে এখন একজন মস্তলোক। কাজেই তার সময় বড় কম। ইলাও এখন মহাব্যস্ত। কেন না, আগের চেয়ে এখন বাড়ীতে বন্ধুবান্ধবের ভিড় বাড়িয়াছে বই কমে নাই। তাহাদিগকে আদর-আপ্যায়ন করিতে এবং মাঝে-মাঝে নানাবিধ

ভোজ্য-পেয়ে পরিতৃপ্ত করিয়া সত্যেশের আতিথেয়তার খ্যাতি বিস্তার করিতে তাহার অনেকটা সময় কাটিয়া যাইত। তাহার উপর আর এক উৎপাত দাঁড়াইল, তাহার নিজের খ্যাতি। সে "জগতের ইতিহাসে নারীর স্থান" সম্বন্ধে একখানি বই লিখিয়া ছাপাইয়াছে; সে বইয়ের প্রশংসা দেশ-বিদেশে বিস্তৃত হইয়াছে। কাজেকাজেই তাহাকে আরও লিখিতে হয়। মাসিকপত্রের সম্পাদক, পুস্তকের প্রকাশক প্রভৃতি জীবের উৎপাতে তাহাকে সদা-সর্ব্বদাই কোনও একটা কিছু লিখিতে হয়। তাহার সাহিত্যিক কর্ম্মজীবন কাজেকাজেই অত্যন্ত প্রসারিত হইয়া পড়িল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সত্যেশ ও ইলা তাহাদের নূতন বাড়ীর [illegible] বারান্দার ছাদে বসিয়া কাগজ পড়িতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সত্যেশের নূতন ব্যারিষ্টার বন্ধু অশোক ঘোষ আসিয়া যোগদান করিল। অশোক বলিল, "মিসেস্ মুখার্জ্জী, দেখেছেন কি, Miss Rankfast 'Woman's World' পত্রে আপনার সমালোচনা করে কি বলেছেন।"

ইলা কেবল একটু হাসিয়া বলিল, "দেখেছি।"

সত্যেশ বলিল, "সে কি, তুমি দেখেছ, আর আমায় কিছু বলনি! কি লিখেছে হে অশোক?"

"Miss Rankfast বলেছেন যে, Mrs. Mukherjee মোটের উপর স্ত্রীজাতির আধুনিক পন্থার সঙ্গে বেশ সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তবে তিনি ভারতবর্ষের স্ত্রীজাতির বন্ধনদশার ফল থেকে একেবারে মুক্তি পান নি। সেই বন্ধনদশাকে তিনি idealise ক'রে নারী-জীবনের যে একটা আদর্শ এঁকেছেন, তাহা কবিত্ব হিসাবে বেশ সুন্দর, কিন্তু বাস্তবিক রক্ত-মাংসের জগতে সে জিনিসটা যে আকারে দেখা যায়, সেটা নারীর দাস্যের নামান্তর। মোটের উপর পঞ্চাশ বছর আগে হ'লে এঁর কথাগুলো বেশ শোনবার যোগ্য বলে ধরা যেত, কিন্তু আজকার দিনে তিনি out-of-date. তা হলেও সে এঁকে খুব সুখ্যাতি করেছে।"

ইলা বলিল, "আবার এদিকে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় লিখেছেন যে, আমি একেবারে বিপ্লববাদী, হিন্দুনারীর জীবনের আদর্শ বুঝতেই পারিনি। আমি পুরা মেমসাহেব, ভারতীয় নারী-জীবনের কিছুই জানি না ইত্যাদি।"

অশোক বলিলেন, "তা আর বল্‌বেন না। তিনি সেদিন ব্যবস্থাপক সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন যে, গভর্ণমেণ্ট স্ত্রী-শিক্ষায় বেশী হাত দিতে গেলে অনর্থ হবে। স্ত্রীজাতির আসল শিক্ষা হচ্ছে অন্তঃপুরে, সেখানে সে যে শিক্ষা পায়, সেটা 'Spiritual, if not intellectual' আর তাতে ক'রে যে মেয়েমানুষ তৈরী হয়, সে নাকি একটা ministering angel. তা ছাড়া পরিবারের বাহিরের কোন রকম প্রভাব মেয়েদের ভেতর হ'তে গেলে হিন্দুসমাজ ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে যাবে—ইত্যাদি।"

সত্যেশ বলিল, "The blessed word—Spiritual.—আমাদের যত দোষ-ত্রুটী ঢাক্‌বার একটা ব্রহ্মাস্ত্র! আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের দেখে এখন নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারে তিন শ্রেণীর লোক; এক, যারা কখনও আর কোন রকমের স্ত্রীলোক দেখেনি; তারা অবশ্য নারী-চরিত্রের সে সব গুণ দেখে, তাতেই মুগ্ধ হয়ে বাহবা দিতে থাকলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। আর এক দল হচ্ছে তারা, যাদের প্রভুত্বস্পৃহা আর সকল প্রবৃত্তিকে একেবারে দমন ক'রে রেখেছে। আর তৃতীয় দল হচ্ছেন তাঁরা, যাদের সাংখ্যের ভাষায় বলা যায় 'তুষ্ট'—যারা যা আছে তাতেই খুসী! চোখ মেলে দেখবার বা হাত-ছড়িয়ে কাজ করবার চাইতে যা কিছু তারা মেনে নিতে রাজী। তবু আমার মনে হয় যে, চাটুজ্জে মশায় যদি আমাদের গ্রামের কাদম্বিনী ঠাকুরুণের মত spiritual মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়তেন, তবে ত্রাহি-ত্রাহি ডাক্ ছাড়তেন।"

ইলা ঈষৎ হাসিয়া স্বামীর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল, "কাদম্বিনী ঠাকুরুণ কি 'মেকী ফিরিঙ্গীর' চেয়েও খারাপ।"

সত্যেশের মুখ লাল হইয়া উঠিল—আট মাস আগের কথা মনে পড়িয়া সে আজ লজ্জিত হইল।

অশোক চলিয়া গেলে সত্যেশ বলিল, "ইলা, আজ কথাটা মনে করিয়া দিলে, তোমার কাছে আমার সেই দিনের জন্য মাপ চাওয়া হয়নি। তোমার মত স্ত্রীকে আমি যে অপমান ক'রেছিলাম, তা'র জন্য আমি লজ্জিত।"

ইলা দুই হাতে সত্যেশের মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল,

"অপমান করনি গো কর্ত্তা, শোধন ক'রেছ। আগুনে না পোড়ালে কি সোণা খাঁটি হয়।"

সত্যেশ বলিল, "তাই নাকি, তুমি খাঁটি সোণা।"

ইলা হাসিয়া বলিল, "দুশো বার, নইলে এমন হীরে কি তার মাথায় এমনি মানায়?" বলিয়া সত্যেশের চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

"ইস, খোসামোদ ক'রতেও শিখেছ দেখছি। যাই বল, আজ তোমায় বল্‌তে হ'বে যে, তুমি আমায় সত্য-সত্য প্রাণের সঙ্গে ক্ষমা ক'রেছ।"

ইলা বলিল, "এ যে বড় জবরদস্তি, যেটা সত্যি নয় সেটা ব'লতে হবে; তোমার বাপ-মা তো ভারি নাম রেখেছিল তোমার—সত্যেশ।"

সত্যেশ একটু মুখ ভার করিয়া বলিল, "না, সত্যি-সত্যি যদি ক্ষমা ক'রতে না পেরে থাক, তবে তোমায় ব'লতে বলি না"—

ইলা মৃদু-মৃদু হাসিয়া সত্যেশের গম্ভীর কাতর মুখখানা কিছুক্ষণ দেখিল; তার পর দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া বুকে মাথা রাখিয়া বলিল, "তুমি আজ আমায় এমন কথা কেন ব'লছো। আমি কি জানি না, আমি তোমার কাছে কত বড় দোষ ক'রেছিলাম—তোমাকে কত কষ্ট দিয়েছিলাম। তা'র পর এই আট মাস গেছে, এতে কি আমি একটুকুও বদলাই নি? এখনো কি তোমার মনের মত হইনি? তবে তুমি কেন এ কথা ব'লছ।"

সত্যেশ নিবিড় ভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া শুধু চুম্বন করিল। কিছুক্ষণ কেহ কথা কহিল না। তাহার পর ইলা উঠিয়া বসিল, বলিল, "আজ তোমার কিছু বলবার নেই, আজ আমার পালা। সেদিন তুমি শুধু বলে গিয়েছিলে, আমি শুনে গিয়েছিলাম। অনেক কথা জবাব দেবার ছিল, কিছু বলিনি। ভেবেছিলাম, যদি তুমি কোনও দিন আমায় ক্ষমা কর, যদি আমায় আবার ঠিক আগের মত ভালবাস, তবে সে জবাব দেব।"

সত্যেশ বলিল, "পাগলের কথা শোন, যেন নেকা, জানেন্‌ না ওঁকে ভালবাসি কি না।"

"যদি ভালবাস, যদি আর রাগ না কর, তবে বলি। আমি দোষ করেছিলাম সত্য, কিন্তু তুমি কি দোষ কর নি? তুমি কি কোনও দিন মুখ-ফুটে আমায় ব'লেছিলে, আমার কাছে কি তুমি চাও? যাতে তুমি খুব বেশী দুঃখ পেয়েছ, সে কাজ ক'রতেও কি তুমি আমায় একদিন বারণ ক'রেছ? তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়েছে বলেই আমাকে তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলতে হ'বে তোমার মনের আনাচে-কানাচে কোথায় কি আছে, তুমি এই স্থির ক'রেছিলে; কিছু ব'লতে হবে, এ কথা ভাবতেই তোমার অভিমান হ'য়েছে! কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছিলে যে, তার আগে মাত্র কয়দিন তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হ'য়েছে। আমি তোমার সব মনের কথা বুঝিতে পারি নি, সেটা কি আমার এত বড় গুরুতর অপরাধ, যার জন্য আমাকে ভাসিয়ে দিতে হ'বে?"

সত্যেশ হাসিয়া বলিল, "কাব্যে এই রকম লেখে বটে?"

"কি রকম?"

"যে যাকে ভালবাসে, সে নিজের হৃদয়ের ভিতর ভালবাসার বস্তুর সমস্ত মনের ছবি দেখতে পায়; বুকে-বুকে রেখেই সুখ-দুঃখের বখরা ক'রে নেয়; আরও কত কিছু। কাব্যের মতে ভালবাসার পক্ষে এ কথাটা একান্ত নিষ্প্রয়োজন।"

"তা' বটে, কিন্তু জীবনটা কাব্য নয়।"

"না ঠিক, কিন্তু বিয়ের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত লোকে ভাবে জীবনটা কেবলি একটা কাব্য, কেবল অক্ষরে লিখে ছাপালেই মহাকাব্য হ'য়ে উঠতে পারে। 'প্রথম যখন বিয়ে হ'ল'—জান না?"

"অনেক ভুলই বোধ হয় বয়স হ'লে সারে; রজ্জুতে সর্পভ্রম—যেমন যাকে-তাকে দেখে মেকী ফিরিঙ্গী সাব্যস্ত করা! অথচ ধরতে গেলে নিজে ষোল আনা সাহেব!"

"আমি সাহেব!"

"নও কি? দাদার সঙ্গে অশন-বসন সাজ-সজ্জা কিসে তোমার তফাৎ?"

সত্যেশ একটু ভাবিয়া বলিল, "বলতে পার হয় তো! কিন্তু তফাৎ আছে—মনের ভিতর।" (সমাপ্ত)

সেতুবন্ধের পথে

[অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার সরকার এম, এ]

ঠিক করিয়াছিলাম, সেবার পূজাবকাশে পুরী পর্য্যন্ত গিয়াই ফিরিব। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। ৬ বিজয়ার পর ত্রয়োদশীর দিন বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া রেল-ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময় নদীয়ার পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত কুক্ষণে অথবা সুক্ষণে দেখা হইল। তিনি সস্ত্রীক রামেশ্বর যাইতেছিলেন,—আমাদেরও পূর্ব্বে একবার রামেশ্বর যাইবার কল্পনা-জল্পনা হইয়াছিল; তার উপর অক্ষয়বাবুর মত উকীলের বক্তৃতা আমাদের পুরীর পথটাকে লম্বা করিয়া একবারে রামেশ্বরে পৌছাইয়া দিল। সঙ্গে জিনিস-পত্র টাকা-কড়ি বিশেষ কিছু ছিল না,—কলিকাতা পৌছিয়া জনৈক আত্মীয়ের নিকট তাড়াতাড়ি কিছু টাকা লইয়া মাদ্রাজ মেলে চড়া গেল।

সারারাত্রিই ট্রেণে চলিয়াছি; রূপনারায়ণ, মহানদী, কাঠজুড়ির সেতুর উপর দিয়া যাইতে-যাইতে ম্লান জ্যোৎস্নায় ঢাকা চারিদিকের সুন্দর নৈশ দৃশ্য চোখের ঘুম যেন কোথায় কাড়িয়া লইয়া গেল। প্রভাতের আলোকে এক নয়ন মনোরম দৃশ্য সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চিল্কা-হ্রদের বিস্তৃত জলরাশির এক পাশ হইতে সূর্য্যদেব পূর্ব্ব-গগনে আরোহণ করিলেন। সে অরুণচ্ছটায় প্রকৃতির সারা অঙ্গ মোহন রাগে রাঙিয়া উঠিল। চিল্কার পাশ দিয়া ট্রেণ চলিতে লাগিল; হ্রদটী ৪৪ মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্থে ৫ হইতে ২০ মাইল; কিন্তু জল কোথাও ৬ ফুটের অধিক নয়। চিল্কার মাঝে-মাঝে বৃক্ষলতা-শোভিত ছোট-ছোট দ্বীপগুলি যেন সবুজ স্পঞ্জের মত ভাসিয়া রহিয়াছে। কত রকমের পাখী চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে। ওদিকে দূরে জেলেরা ছোট-ছোট ডিঙি লইয়া মাছ ধরিতেছে।

চিল্কা শেষ হইলে পূর্ব্বঘাট-গিরিমালার অনন্ত সৌন্দর্য্য আমাদের পাশে-পাশে যেন ছুটিয়া চলিতে লাগিল। মেঘের কোলে মেঘ জমিয়া শৈল-শিখরে স্বপ্নাবেশে যেন শুইয়া আছে। কত গ্রাম, কত নগর, কত শস্য-শ্যামল প্রান্তর অতিক্রম করিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। উৎকলের ভাষা এবং পাহাড়-পর্ব্বত হইতেই বুঝিতে পারিতেছিলাম যে, অপরিচিতের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। ষ্টেশনে বাঙ্গালীর জলখাবার বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না—মুড়ি, কলা, দই, দুধ, এই কয়টি জিনিসই দেখিলাম। মধ্যে মধ্যে নারিকেল ও কিছু কিছু মিষ্টান্নের দর্শন মিলিয়াছিল। দইএর নাম এদেশের ভাষায় 'পেরগু' এবং দুধকে বলে 'পালু'। উড়িষ্যা হইতে রামেশ্বর এবং রামেশ্বর হইতে উড়িষ্যা কেবল এই পালু পেরগুর কারবার।

ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনে নামিয়া Indian Refreshment Roomএ কিঞ্চিৎ অন্নাদি আহার করা গেল। বাঙ্গালী বলিয়া আমাদিগকে স্বতন্ত্র স্থানে বসিতে দেওয়া হইল। মাছ খাইয়া বাঙ্গালী কি অপরাধই করিয়াছে—উত্তরে দক্ষিণে কোথাও তাহার নিস্তার নাই। টকের ডাল, লেবুর ডালনা, লঙ্কার চচ্চড়ী প্রভৃতি দিয়া ভাত দেওয়া হইল,—অবশেষে পাচক-ঠাকুর জলবৎ তরলম খানিকটা ঘোল আনিয়া দিয়া বলিলেন—Master, card, nice Master। আমরা যে-স্থলে 'মহাশয়' বা 'হুজুর' ব্যবহার করি, মাদ্রাজীরা সেই-স্থলে 'স্বামী' অথবা ইংরেজীতে Master কথাটি ব্যবহার করে। মাদ্রাজের মুটে, মজুর, ঠাকুর, চাকর, দোকানদার প্রায় সকলেই কিছু-কিছু ইংরেজী বলিতে পারে। ভদ্রলোকের তো কথাই নাই, স্কুলের খুব ছোট ছোট ছেলেরাও বেশ ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বলে। আমাদের দেশে কিন্তু কলেজের ছেলেরা, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাসপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটরাও অনেকে ইংরাজী বলিতে ভয় পান।

মাদ্রাজীরা ইংরেজীটাকে এতটা স্বরগত করিয়াছে যে, এমন কি নিজেদের মধ্যেও মাতৃভাষা না বলিয়া পরস্পর ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বলে। পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের কাছে শুনিয়াছি যে, তিনি এই আচরণের নিন্দা করিয়া মাদ্রাজ টাউন-হলে কয়েকমাস পূর্ব্বে তাঁহার দাক্ষিণাত্য-

ভ্রমণকালে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে জনৈক সভ্য কাউন্সিল-গৃহে পরদিনই একবারে স্বীয় মাতৃভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দেন। অবশ্য লাট সাহেব বাধা দেওয়ায় তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি এই হঠাৎ সম্মান-প্রদর্শনের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। যাই হোক, মাদ্রাজীরা অনেকে ইংরেজী জানে বলিয়াই ভ্রমণকারীদের এত সুবিধা, নতুবা কি মুস্কিলেই যে পড়িতে হইত, বলা যায় না। হিন্দীরও কতক চলন মাদ্রাজে আছে,—বিশেষতঃ মুসলমানগণের মধ্যে। ভারতবর্ষে যদি কোনো সাধারণ ভাষা চালানো সম্ভবপর হয়, তবে সে হিন্দী, এই ধারণা ভারতের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া আমার মনে বিশেষভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে।

রেলপথের দুধারে অসংখ্য তালগাছ রহিয়াছে;—তবে সবগুলিরই অধিকাংশ পাতা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে,—নব্য বাঙ্গালী বাবুর মত মাথাটি চৌদ্দ আনা-দু-আনা রকমে ছাঁটা। পরে দেখিলাম যে, এদেশে ঘর-ছাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া নানা কাজে তালপাতার ব্যবহার হয়। কোথাও তাড়ির জন্য তালগাছ কাটা হইয়াছে দেখি নাই—বোধ হয় 'তাড়িত'-শক্তির আস্বাদন এদেশের লোক এখনো পায় নাই।

গোদাবরী, কৃষ্ণা প্রভৃতির উপর দিয়া দাক্ষিণাত্যের নৈশ প্রকৃতির নীরব শোভা দেখিতে দেখিতে ৪২ ঘণ্টা রেলে চলার পর তৃতীয় দিবসের মধ্যাহ্নে মাদ্রাজে পৌছিলাম। শ্রীযুক্ত ভি, আর, চৌধুরী এম এ নামক জনৈক সহৃদয় মাদ্রাজী ভদ্রলোক আমাদিগকে সেন্‌ট্রাল ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী দানবীর রাজা স্যার রামস্বামী মুদালিয়ারের ধর্ম্মশালায় পৌছাইয়া দিলেন। এদিকে ধর্ম্মশালাকে Chouttry অথবা ছত্রম্ বলে। ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণদিগের জন্য বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র। ধর্ম্মশালাটিতে বৃহৎ রান্নাঘর প্রভৃতি আছে,—বন্দোবস্ত সবই ভাল; কেবল পাইখানার বন্দোবস্ত অদ্ভুত, এদেশে এ বিষয়ে পর্দ্দা কিছুমাত্র নাই। শুনিয়াছি ইউরোপেও নাকি এইরূপ বন্দোবস্ত প্রচলিত। যাই হোক, আমাদের বড়ই অসুবিধা বোধ হইত। মাদ্রাজে আরো কয়েকটি ধর্ম্মশালা আছে; তন্মধ্যে গুজরাতী ছত্রম্ এবং Eggmore ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী আর একটি ছত্রই ভাল—কিন্তু দু'টিই Central Station হইতে দূরে।

মাদ্রাজ সহরটি বেশ সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। কলিকাতা-বাসীর পক্ষে অবশ্য দ্রষ্টব্য এখানে বিশেষ কিছুই নাই—কেবল সাগরতীর ও তাহার সৌধরাজি দেখিবার মত বটে। এখানে সাধারণতঃ রিক্স, বাণ্ডি, ঝটকা ও ফিটন পাওয়া যায়। এক-গোরুর গাড়ীকে বাণ্ডি এবং ঐ প্রকার গাড়ীর একটু ভাল সংস্করণে ঘোড়া জোড়া থাকিলেই ঝটকা হইল। এদেশের গোরুগুলি কিন্তু খুব দৌড়িতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলাল বেঘোরে বেহারে এক্কা চড়িয়াছিলেন, আর আমরা বেঘোরে মাদ্রাজে ঝটকা চড়িলাম। তবে পেটের নাড়ী হজম করাইয়া ক্ষুধার উদ্রেক করিতে ঝটকাও এক্কার সমান নয়। এখানকার ট্রামগাড়ীগুলি একটু ছোট ধরণের; সাধারণত একখানা গাড়ী থাকে—ভাড়া ৴১০ হইতে ৶১০ পর্য্যন্ত। ট্রামে করিয়া মাইলাপুরে রামকৃষ্ণ মিশন দেখিতে গিয়াছিলাম। এখানে সুন্দর কাজ হইতেছে।

মাদ্রাজের Indian Reviewএর সম্পাদক অনরেবল জি, এ, নটেশন মহাশয়ের সহিত আলাপ হইয়াছিল। পুস্তক-প্রকাশের দ্বারা তিনি দেশের অনেক উপকার করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি বলিলেন যে, বাঙ্গালীরা তাঁহার প্রকাশিত পুস্তক খুব কমই কেনে—The Bengalees seldom buy out-books; they are a very light-fisted people। মাদ্রাজে এখন স্বদেশীর যুগ;—আমাদের দেশে সে সময়ে যেমন একটা ভাবের প্রবল বন্যা বহিয়াছিল, বর্ত্তমানে মাদ্রাজেও ঠিক সেইরূপ চলিতেছে। তবে স্থানীয় লোকের মুখে শুনিলাম যে, বাংলা দেশের মত সেখানেও কার্য্য অপেক্ষা বাগাড়ম্বরই বেশী। এদেশে 'মডার্ণ রিভিউ' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র খুব আদর। গান্ধী প্রভৃতি মহাত্মগণের ছবির সঙ্গে মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের ছবিও বিক্রী হইতেছে।

মাদ্রাজের 'এগ্‌মোর' ষ্টেশন হইতে ছোট লাইনে সাউথ-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের Ceylon-Boat-Mailএ রামেশ্বর যাত্রা করিলাম। S. I. R.এর মত রেল-লাইন ভূভারতে আর নাই। একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন S. I. R. মানে Stupid Irreguler Rascal,—কথাগুলির সত্যতা ভ্রমণ করিতে-করিতে অন্তরে-অন্তরে অনুভব করিয়াছিলাম। সন্ধ্যাবেলায় গাড়ী ছাড়ে, টিকিট করিতে হয় সকালে কিম্বা তার আগের দিন। আরেকবার [illegible]

নির্দিষ্ট সংখ্যক টিকিট ডাকগাড়ীর জন্য দেওয়া হয়। ইহাতে কেহ মনে করিবেন না যে, তাহা হইলে বেশ আরামে যাওয়া যায়। তাহা নয়; কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রদান করিলেই টিকিট মিলে। এই লাইনের টিকটীকি গিরগিটীটা পর্য্যন্ত দক্ষিণা-গ্রহণে সিদ্ধহস্ত,—ষ্টেশন-মাষ্টার হইতে কুলী পর্য্যন্ত সকলেরই এ বিষয়ে সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতা দেখিলাম। ষ্টেশনে 'টাইম টেবল' পাওয়া যায় না—বলিল ফুরাইয়া গিয়াছে। একে গাড়ীগুলি ছোট ছোট, তাতে আবার ভিতর দিয়া বরাবর যাতায়াতের পথ, সুবিধা কিরূপ, সহজেই অনুমিত হইবে। ইণ্টার ক্লাস নাই, তবে সেকেণ্ড ক্লাসের বন্দোবস্ত ভাল—এক-এক গাড়ীতে দুটী দুটী বেঞ্চ। যাই হোক, কষ্টে-সৃষ্টে একখানি 'রাজকীয়' শ্রেণীর গাড়ী দখল করিয়া আমরা ২৪ ঘণ্টায় রামেশ্বর পৌছিলাম।

মন্দিরের নিকটস্থ তুলচাঁদ লোহানার প্রতিষ্ঠিত ছোট একটি সুন্দর ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। মাদ্রাজ হইতেই পণ্ডিত শিউনারায়ণ নামে জনৈক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ আমাদের পিছনে ফিঙাপাখীর মত লাগিয়াছিলেন। রামেশ্বরের প্রধান পাণ্ডার নাম গঙ্গাধর পীতাম্বর—মারাঠী ব্রাহ্মণ। শুনিলাম যাত্রি-সংগ্রহের জন্য ইঁহার ছয় শত গোমস্তা আছে এবং ইনি দৈনিক দুই হইতে তিন হাজার টাকা পাইয়া থাকেন।

রামেশ্বরের মন্দির পাম্বম্ দ্বীপের উপর অবস্থিত। এই দ্বীপ ১২ মাইল লম্বা ও ৫ মাইল চওড়া। যাইতে হইলে সমুদ্রের উপর নির্ম্মিত রেলের পুল পার হইতে হয়। উভয় পার্শ্বের দৃশ্য অতি মনোরম! সেতুবন্ধের নিকট সাগরের জল গভীর নয়; ঢেউ তত নাই, চারিদিকে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত পাথর পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দ্বীপমালা, বালুকাস্তূপ এবং নারিকেলকুঞ্জ সাগর-শোভাকে আরো সুন্দর করিয়াছে। রামেশ্বর মন্দিরে শিবলিঙ্গ বিরাজমান—মন্দিরটি ১২০ ফুট উচ্চ; ভিতরের কারুকার্য্য বিস্ময়জনক।

তিন দিন রামেশ্বরে থাকিয়া আমরা চব্বিশ মাইল দূরস্থিত ধনুষ্কোটি নামক স্থানে যাত্রা করিলাম। প্রবাদ আছে, এই স্থলে রামচন্দ্র ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা বিভীষণের অনুরোধে সেতুবন্ধনের খানিকটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। এখান হইতে সিংহলদ্বীপ দুইমাইল মাত্র—জাহাজে যাইতে হয়। আমাদের ট্রেণ জাহাজের জেটিতে পৌছিলে কতকগুলি কৃষ্ণকায় বালক আসিয়া সমুদ্রজলে সাঁতরাইতে লাগিল। যাত্রীরা পয়সা জলে ফেলিয়া দেয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ ডুব দিয়া তুলিয়া ফেলে। ধনুষ্কোটির ষ্টেশন-মাষ্টার বলিলেন যে, এই দুইমাইল জল এত অল্প, যে হাঁটিয়াও যাওয়া যায়—তবে মধ্যে-মধ্যে দু একজায়গায় সাঁতরাইতে হয়। খরচ অত্যন্ত বেশী বলিয়া রেল-কোম্পানী পুল বাঁধে নাই। ধনুষ্কোটির পথের শোভা না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হয় না—বঙ্গোপসাগর ও আরব উপসাগর এখানে আসিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে;—যে দিকে দেখা যায়, অনন্ত নীলাম্বুধি নীল আকাশকে চুম্বন করিতেছে—চারিদিকে কিয়দ্দূর শ্বেত বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে—'নীল-সিন্ধুজল-ধৌত-চরণতল অনিল বিকম্পিত-শ্যামল অঞ্চল' ভারত-মায়ের মোহন সৌন্দর্য্য এখানে যেন অলসভাবে অনন্ত নীলিমার মাঝে এলাইয়া পড়িতেছে।

সেতুবন্ধের দৃশ্য দেখিয়া অমরকবি কালিদাসের সেই কথাগুলি মনে পড়ে—

বৈদেহি, পশ্যামলয়াদ্বিভক্তম্
মৎসেতুনা ফেনিলাম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নম্
আকাশমাবিষ্কৃত চারুতারম্॥

আর সেই—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

সন্ধ্যার অন্ধকারে তীরে বসিয়া সাগরের ভৈরব সঙ্গীত শুনিতে লাগিলাম,—ঢেউএর সঙ্গে ফস্ফরস্ জ্বলিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছিল;—পাগল হাওয়া হুহু করিয়া গায়ের উপর দিয়া তরঙ্গ-জলকণা বহিয়া অবিশ্রান্ত ছুটিতে লাগিল;—তখন কবির কথা মনে পড়িতে লাগিল—

"হে আদি জননি, সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন, তাই উঠে বেদমন্ত্র সম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্র মন্দির পানে

অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গল গানে
ধ্বনিত করিয়া দিশিদিশি, তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর, আলিঙ্গনে সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গ-বন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি' সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।"

উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা, ভীমকায়া স্রোতস্বতী, অনন্তবিস্তৃত জলধি এবং শস্যশ্যামল প্রান্তর সমগ্র মাদ্রাজকে যেন একখানি ছবির মত করিয়াছে। তাহার উপর তীর্থস্থানগুলি মানবের মহনীয় কীর্ত্তিরাজি বক্ষে ধারণ করিয়া ভ্রমণকারীর নিকট দক্ষিণাপথকে চিরপ্রিয় করিয়াছে। উত্তর-মাদ্রাজে তাল, নারিকেল, খেজুর—তিনপ্রকার গাছেরই ঘন-সন্নিবেশ দেখা যায়। দক্ষিণের নারিকেলকুঞ্জ ও তালের সারি দেখিবার মত। ঝাউ এবং কলার চাষও এদিকে রীতিমত হয়। জমি খুব উর্ব্বর। এখন ওদিকে বর্ষাকাল, ধানও যথেষ্ট হইয়াছে দেখিলাম।

অদৃষ্টের এমনই দারুণ পরিহাস যে, এই স্বর্ণপ্রসূ দেশের সন্তানগণই অনশনে-অদ্ধাশনে দিন কাটাইতে বাধ্য হয়।

একজন বন্ধু দুঃখে গাহিয়াছিলেন—

"কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে।
(এমন) পেটের সাথে পিঠ মিশে যায় ক্ষুধায় কাহার দেশে॥"

শ্যামল হাস্যে মা নিখিল বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়া কবিজনের মনকে আহ্লাদিত করেন বটে, কিন্তু প্যোলিটিক্যাল ইকনমির ভাষায় ইহার সাদা বাংলা ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, রপ্তানির চোটে আজ দেশের ধান গম চলিয়া গিয়া আমাদের প্রাণ বাহির করিয়া দিতেছে। রোগের ঔষধ জানা আছে,—দুঃখের বিষয় প্রয়োগের উপায় অন্যের হাতে।

সমুদ্র-সৈকতের অসীম শোভার মায়া ত্যাগ করিয়া পরদিন প্রত্যাবর্ত্তনের পথে যাত্রা করিলাম। ধনুষ্কোটি হইতে একবারে মদুরায় আসিলাম,—পথে রামেশ্বরে আর নামি নাই। সিংহলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রামেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী মণ্ডপম্ ষ্টেশন হইতে হেল্‌থ সার্টিফিকেট লওয়া হয় নাই বলিয়া যাইতে পারিলাম না। পবন-নন্দনের পন্থা অনুসরণের সাধ্য ছিল না,—তাই লঙ্কা দর্শন ঘটিয়া উঠিল না।

'মদুরা' নামটি, 'মথুরা'র প্রকারান্তর মাত্র। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ইহা দ্বিতীয় সহর—লক্ষাধিক লোকের বাস। এখানকার মন্দিরের মত দেবালয় বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও নাই। এই মন্দিরে আরতির পূর্ব্বে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় দশ হাজার প্রদীপ জ্বালা হয়; আর পর্ব্ব-উপলক্ষে এক লক্ষ প্রদীপ জ্বলে। সুন্দরেশ্বর শিবলিঙ্গ ও মীনাক্ষীদেবী মন্দিরমধ্যে অধিষ্ঠিত। 'স্বর্ণপদ্ম পুষ্করিণীর' বামপার্শ্ব দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই সুবর্ণমণ্ডিত মন্দির-চূড়ার অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। দেবতার অলঙ্কার ও দেবালয়ের তৈজসপত্র দর্শনীয়। তৈজসপত্রের মূল্য পঞ্চাশ হাজার ও মণিমুক্তাদির মূল্য প্রায় দেড়লক্ষ টাকার অধিক। মন্দিরের গগনস্পর্শী প্রবেশদ্বার, যাহাকে এ দেশে গোপুরম্ বলে—তাহার কারুকার্য্য এবং সহস্রমণ্ডপের ৯৯৭টি স্তম্ভের শিল্পচাতুর্য্য দর্শনে বিস্ময়ে আত্মহারা হইতে হয়। হিন্দুরাজা তিরুমল নায়ক খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মদুরা নগরীকে সুন্দর নয়নাভিরাম সৌধমালায় সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরাট প্রাসাদের অন্তঃপুরে আজ ইংরেজের আদালত বসিয়াছে;—কালের কি বিচিত্র গতি!

মদুরা হইতে ত্রিচিনাপল্লী হইয়া শ্রীরঙ্গমে গেলাম। মন্দিরের প্রাকারের ভিতরেই সহরটি অবস্থিত। ত্রিচিনাপল্লী-ফোর্ট ষ্টেশনে নামিয়া যাওয়াই সুবিধা;—পথে যাইতে যাইতে গিরিশিখরস্থিত দুর্গটি চোখে পড়িয়াছিল এবং এই দেশ জয় করিবার সময় ক্লাইব যে বাড়ীতে ছিলেন, সেটিও দেখিয়াছিলাম। শ্রীরঙ্গম মন্দিরের ধনসম্পত্তি অতুল—পৃথিবীর মধ্যে ইহার ধনসম্ভার তৃতীয়স্থান অধিকার করে। সোনার ছাতা লইয়া স্বর্ণকলসে হস্তীপৃষ্ঠে করিয়া দেবতার জন্য কাবেরী হইতে জল আনা হয়। রীতিমত তিলক কাটিয়া হস্তীটিকেও পরম বৈষ্ণববেশ ধারণ করানো হয়। পূর্ব্বে হিন্দু-বিস্কুট, হিন্দু গরম চা, এমন কি মেডিকেল কলেজের সম্মুখে হিন্দু-পাঁটার মাংসের কথাও শুনিয়াছিলাম; এতদিন পরে দেবতার জলবাহী তিলক-কাটা পরম-বৈষ্ণব হিন্দু-হস্তী দেখিয়া মনে-মনে যে একটু বিস্ময় অনুভব করি নাই, এমন নয়।

দুকূল প্লাবিয়া খরস্রোতা কাবেরী বহিয়া যাইতেছে—সহস্র-সহস্র যাত্রী কাবেরীস্নান করিয়া নিজেকে পবিত্র করি-

তেছে। কাবেরীর বিশাল ভীমকান্ত সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই যেন চিত্তের সকল পাপ মুছিয়া দেয়। আমরা পথে কাবেরী-স্নান সমাপন করিয়া ত্রিচিনাপল্লীতে ফিরিয়া আসিলাম। গবর্মেণ্ট টেলিগ্রাফ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত প্রমথ নারায়ণ বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

কাঞ্চির পথে চিঙ্গলপতে একটী মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। চিঙ্গলপতে জনকয়েক মাদ্রাজী আসিয়া তাড়াতাড়ি আমাদের মালপত্র উঠাইয়া দিয়া শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবুকে গাড়ীতে সসম্মানে বসাইয়া দিলেন এবং একটু সরিয়া আসিয়া আমাকে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন—ইনিই তো বাবু মতিলাল ঘোষ। আমি শুনিয়াও যেন শুনিতেছি না, এই ভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গাড়ী ছাড়িবার সময় উত্তর দিলাম, 'না'। তখন বেচারীরা একটু অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেলেন।

ছবিতে চেহারা দেখিয়া তাঁহাদের এ ভ্রম হইয়াছিল; অবশ্য সাদৃশ্য যে কিছু ছিল না, তাহা নয়। যাহা হউক, সে সাদৃশ্য সেই দূর বিদেশে আমাদের বেশ কাজে আসিয়াছিল। এ দেশে 'পত্রিকার' উপর লোকের খুব অনুরাগ।

প্রমথবাবুর আতিথ্যে পরম পরিতোষ লাভ করিয়া সেই দিনই কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। শাস্ত্রে বলে—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতাঃ মোক্ষদায়িকাঃ॥

কাঞ্চী দাক্ষিণাত্যের বারাণসী। শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণু-কাঞ্চী, দুইভাগে সহরটি বিভক্ত। "নগরীষু কাঞ্চী" এ কথা খুবই সত্য। সহরের রাস্তাগুলি সোজা-সোজা এবং লম্বা ও চওড়ায় যথেষ্ঠ,—বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; দুই ধারে নারিকেল ও অন্যান্য গাছের সারি দেখিতে বড়ই সুন্দর। যাঁহারা কাশীর বাঙালীটোলা অথবা দিল্লীর পুরাণো দিকটার অসূর্য্যম্পশ্যা গলিগুলি দেখিয়াছেন—তাঁহাদের বিবেচনায় কাঞ্চী অমরাপুরী বলিয়া বোধ হইবে। এখানকার মন্দির-গুলির মধ্যে পাথরের গায়ে হাজার হাজার অনুশাসন সংস্কৃত, তামিল প্রভৃতি ভাষায় লেখা রহিয়াছে। কামাক্ষীদেবীর প্রাঙ্গণে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সমাধি আছে। সমাধির উপরে তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরসমূহে লক্ষ-লক্ষ টাকার ধনরত্ন রহিয়াছে। একাদশ শতাব্দীতে—গঙ্গাগোপাল রাও নামক রাজা বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ঐ দেশের একজন শেঠ একটি মন্দির মেরামতের জন্য দশলক্ষ টাকা দিয়াছেন,—এখনও কাজ চলিতেছে। কাঞ্চীর নৃসিংহদেব ও বামন অবতারের মূর্ত্তি বিস্ময়জনক। বামনমূর্ত্তি কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত, প্রায় ২০ ফুট উচ্চ হইবে;—তাহার ভাস্কর্য্য অতুলনীয়। এখানকার পাণ্ডাদের অনেকে ইংরাজী, হিন্দী প্রভৃতি বেশ বলিতে পারেন। আমাদের অন্যতম সঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাজার করিতে দিবার সময় চাল, ডাল, হাঁড়ি প্রভৃতির সঙ্গে কিছু 'লেড়কী' আনিবার আদেশ দিতেছিলেন; পাণ্ডা-ঠাকুর বাজার হইতে কেমন করিয়া 'লেড়কী' আনিবেন ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছেন, এমন সময় আমরা হাসিতে-হাসিতে বুঝাইয়া দিলাম যে 'লকড়ী' আনিলেই হইবে—লেড়কী নয়।

কাঞ্চীতে তিনটি বেদের পাঠশালা আছে। এখনও এমন একজন পণ্ডিত আছেন, যাঁহার না কি সমগ্র বেদ কণ্ঠস্থ। আর একজন বড় পণ্ডিতের সহিত সংস্কৃতে আলাপ হইল—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ করেন না শুনিয়া তিনি অবাক্ হইলেন। আমাদের বাসার সম্মুখেই একটি বেদের পাঠশালা ছিল—ছাত্রগণের অধ্যয়নের সুরটা ঠিক বর্ষাকালের ব্যাং ডাকার মতই বোধ হইত।

কাঞ্চী হইতে মাদ্রাজ হইয়া পুণ্যতোয়া গোদাবরীতে উপস্থিত হইলাম।—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

ছেলেবেলায় পড়িয়াছিলম—"অস্তি গোদাবরী তীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ"—চারিদিকে নানা বৃক্ষ দেখিলাম, কিন্তু শৈশবের স্মৃতি কল্পিত সেই বিশাল শাল্মলীতরু দেখিতে না পাইয়া নয়ন যেন হতাশভাবে ফিরিয়া আসিল।

গোদাবরীর ডিষ্ট্রিক্ট্ মুন্সেফ মহাশয়ের পুত্রের সহিত পূর্ব্বে ট্রেণে আলাপ হইয়াছিল। তিনি আসিয়া ষ্টেশন হইতে আমাদিগকে লইয়া গিয়া পরম সমাদরে আতিথ্য সম্পাদন করিলেন। গোদাবরীর পুলটি লম্বায় পৌনে দুই মাইল,—ভারতের মধ্যে ইহা তৃতীয় স্থানীয়। পথে রাত্রির অন্ধকারে কৃষ্ণার পুল পার হইয়াছিলাম—কৃষ্ণার সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয়। দুধারে পাহাড়, মাঝখান দিয়া বেগবতী

প্রবাহিতা। গোদাবরীতে স্নানাদি করিয়া একবারে পুরী আসিলাম;—পথে ওয়াল্‌টেয়ারে নামিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দৈব-দুর্য্যোগে ঘটিয়া উঠে নাই।

এখন মাদ্রাজের সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটী কথা বলিব। বাঙালীরা প্রায়ই এদিকে আসেন না;—তাহার প্রধান কারণ, ভাষা ও খাদ্য। অবশ্য যাঁহারা ইংরেজী জানেন তাঁহাদের অনেকটা সুবিধা। মাদ্রাজের উত্তরে তেলেগু এবং দক্ষিণে তামিল ভাষা প্রচলিত। তামিল অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষা। তেলেগু ভাষা অত্যন্ত শ্রুতি-কটু। কিন্তু নিজের ঘোল যেমন কেহ টক বলে না—সেইরূপ তেলেগুরাও তাহাদের ভাষাকে শ্রুতিকটু বলে না। মাদ্রাজে ধর্ম্মশালায় এক ভদ্রলোক এমন কি তেলেগুকে most musical language বলিয়া ফেলিলেন। অবশ্য যখন তিনি ও তাঁহার ভগিনী সজোরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন, তখন আমরা ভাবিলাম কি এক অনর্থই বা ঘটিয়াছে,—হয় ত বা দুজনে বিষম ঝগড়া বাধিয়াছে। তখন তাঁহাদের মুখে মধ্যে-মধ্যে হাসি না দেখিলে, হয় ত আমরা সেই most musical language শুনিয়া পুলিস ডাকিতে বাধ্য হইতাম। এক ভদ্রলোক ট্রেণে গান ধরিয়াছিলেন; গানের দুটি লাইনের শেষ কথা দুটি বুঝিতে পারিয়াছিলাম—প্রথমটি 'জাভা' দ্বিতীয়টী 'তাভা'। কবিত্ব সহজেই অনুমেয়! ঘণ্টাখানেক বৃষভ-বিনিন্দিত ভৈরবীসুরে গান চলার পর আমরা তাঁহাকে সঙ্গীতসুধা পান হইতে বিরত করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কথায় বলে, "ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি!" What is play to you is death to us;—জানি না, আমাদের ভাষাটা উঁহাদের কাণে কেমন লাগে।

তামিল ভাষা শুনিতে তত মধুর না হইলেও, তামিল গানগুলি বড় মিষ্ট। ট্রেণে এক ভিখারিণী তামিল-যুবতী ছোট একটী ছেলে কোলে করিয়া' এমন একখানি গান গাহিয়া গেল, যাহার মিষ্ট-মধুর করুণ সুরটি আজো যেন কাণে লাগিয়া রহিয়াছে। একবর্ণও বুঝি নাই—কিন্তু সুরটি আজো ভুলিতে পারি নাই। আরও একটি বালককে গাহিতে শুনিয়াছিলাম—সে গানটিও বড় মধুর লাগিয়াছিল! কুল্‌পী বরফের হাঁড়ী নাড়া দিলে যেমন শব্দ হয়, এ দেশের ভাষার ধ্বনিও তদ্রূপ বলিয়া এক ভদ্রলোক উপমা দিয়া-ছিলেন। এটি ঠিক কালিদাসের উপমা না হইলেও বড় realistic হইয়াছে। এই ভাষায় ট, ঠ, ড, ঢ প্রভৃতি ধ্বনির অত্যন্ত আধিক্য। প্রাচীন আর্য্যভাষায় এই ধ্বনি ছিল না,—পরে অন্‌আর্য্য (১) সংস্রবে যে ইহা আসিয়াছে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নাই। তামিল ভাষার ব্যাকরণ ও বাক্যবিন্যাস-পদ্ধতির সহিত বাংলার যথেষ্ট মিল আছে। আমাদের সহিত দ্রাবিড় জাতিরও সভ্যতার যে এককালে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল—হয়তো আমরা তাহাদেরই বংশধর—নানা কারণে ইহা খুব সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। আমরা কতকগুলি এদেশী কথা শিখিয়াছিলাম, তন্মধ্যে ভিখারী তাড়াইবার ও গাড়োয়ানকে চলিবার জন্য "পো পো সিঘ্রম্ পো" প্রায়ই ব্যবহার করিতাম। ইহার মানে 'শীঘ্র যা।' সিঘ্রম্ কথাটি সংস্কৃত শীঘ্রমের রূপান্তরমাত্র।

এখন খাদ্যের কথা বলিব। পেঁয়াজ, লঙ্কা, নেবু, কলা, নারিকেল এদিকে খুব পাওয়া যায়। ছানা এ দেশের লোকে তৈরী করিতে জানে না। মিষ্টি খাবার প্রায়ই পাওয়া যায় না। মাদ্রাজী হোটেলের লঙ্কা ও টকের চোটে বাঙালীর প্রাণ বাহির হইয়া আসে। বাঙালীর মত নানা সুব্যঞ্জনে রসনার পরিতৃপ্তি করিতে অন্য জাতি পারে না এবং বাঙালীর মত অজীর্ণ রোগেও নিরন্তর ভুগিতে অন্য জাতি জানে না।

তীর্থস্থানগুলি প্রায়ই বড়-বড় সহর—সবগুলিতেই সুন্দর সুন্দর ছত্রম্ আছে; বিনা ভাড়ায় সেখানে তিন দিন থাকিতে পাওয়া যায়। নিজেদের রান্নার বন্দোবস্ত করিয়া লওয়াই ভাল। এদেশে জিনিসপত্র বড় মহার্ঘ। রামেশ্বরে টাকায় দেড়সের চাল, দশ আনা সের দুধ, এবং ছয় আনায় একটি মাটির হাঁড়ি কিনিয়াছিলাম। অন্যত্র অবশ্য দু'সের, আড়াই সের দর - তবে সের ১০৫ তোলার ওজন। চালের অনুপাতে অন্যান্য জিনিসও মহার্ঘ। গোদাবরীতে এক প্রকার বাতাবী লেবু পাওয়া যায়—খুব সুস্বাদু। এখানকার কলাও খুব মিষ্ট।

মাদ্রাজে চায়ের তত চলন নাই—'পাল্‌কাফী' অর্থাৎ দুধ-কফীর খুব চলন;—এক প্রকার পিতলের পাত্রে দেওয়া

---

(১) "অনার্য্য" শব্দটির সঙ্গে একটি বদ্ গন্ধ জড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া, শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পদানুসরণে "অন্ আর্য্য" লিখিলাম।

হয়। 'বিড়বিড় পালু' অর্থাৎ গরম গরম দুধ—সে বরফের মত ঠাণ্ডাই হৌক, আর যাই হোক—এবং ইট্‌লী নামক এক প্রকার পিঠা এদেশের ষ্টেশনগুলিতে পাওয়া যায়। Coffee club অসংখ্য;—সকলগুলিতেই লেখা—Best coffee club,—কাজেই সস্তা দরে খারাপ কফি-খাবার পাইবার জো নাই। Superlative ডিগ্রির এমন অপ-ব্যবহার আর কোথাও দেখা যায় না!

এদিকে সরিসার তেলের ব্যবহার নাই—নারিকেল ও তিলের তেলেই কাজ চলে। স্ত্রী-পুরুষ কেহই প্রায় তেল মাখে না। পুরুষদের কাপড়ে কাছা নাই; চাদর গায়ে, পায়ে জুতা নাই। তেলেগুদেশে একটু কাছা আছে। Sandal জুতার চলনই দেখা যায়—পুলিশ কনষ্টেবলরাও স্যাণ্ডাল পায়ে দেয়। খালি পায়ে, নেকটাই গলায় এবং টুপি মাথায় প্রকাণ্ড টিকিওয়ালা লোক এদেশে অনেক দেখা যায়;—তাহা দেখিয়া, দেশটা যে বালি-সুগ্রীবের রাজ্য ছিল, সে বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এত হইলেও, মাদ্রাজ বাংলার মত anglicised হয় নাই। এখনো বিদ্যাসাগরী ফ্যাসানে চুল না কাটিলে এবং দেশীয় আচারপদ্ধতি না মানিলে, উচ্চবর্ণের মধ্যে সমাজচ্যুতি হয়। এদেশে সকলে পেঁয়াজ খাইলেও, নিষ্ঠাবান উচ্চশ্রেণীর লোকে মাছ-মাংস-পেঁয়াজ প্রভৃতি খান না।

মাদ্রাজের সধবা স্ত্রীলোকেরা প্রকাণ্ড রঙীন কাপড় কাছা দিয়া পরে। বিধবারা মাথায় কাপড় দেয় ও সাদা কাপড় পরে। সধবারা মাথায় কাপড় দেয় না—খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া কেশের কত বিচিত্র বিন্যাস করে। মালাবার প্রদেশের নায়ার জাতির মধ্যে মেয়েলোকের উর্দ্ধাঙ্গে কাপড় দেওয়ার প্রথা নাই,—তাঁহারা অনাবৃত বক্ষেই বিচরণ করিয়া থাকে। নায়ার পরিবারে ভ্রাতা এবং ভগিনীই কর্ত্তা। ছেলে মামার নামে পরিচয় দেয়, এবং মামার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। এই সমাজেই ভারতের উজ্জ্বল মণি স্যার শঙ্করম্ নায়ারের জন্ম। ভগবান শঙ্করাচার্য্যও নায়ার সমাজের ব্রাহ্মণবংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, শোনা যায়।

রামেশ্বরের দিকের স্ত্রীলোকগুলি দেখিলে অন্ধকারে সূর্পনখাজাতীয়া বলিয়াই ভ্রম হয়। ইহারা কাণে প্রকাণ্ড [illegible] অলঙ্কার বিচিত্র রকমের গহনা পরিয়া থাকে। দেখিয়া বুঝিলাম, এত থাকিতে লক্ষ্মণ সূর্পনখার নাক-কাণ কেন কাটিয়া দিয়াছিলেন।

বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পের জন্য মাদ্রাজ বিখ্যাত। কাপড়, চাদর, সাড়ী—এক-একখানির দামও অনেক, দেখিতেও বড় সুন্দর। তেলেগুপ্রদেশে পুরুষেরা কাণে ফুল ও হাতে নিরেট সোণার বালা পরে। এদেশের অধিকাংশ লোকের স্বাস্থ্য ভাল এবং বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। ফরসা লোক বোধ হয় তিন হাজার মাইলের মধ্যে ত্রিশটি দেখিয়াছিলাম কি না সন্দেহ। তবে মেয়েদের রং প্রায়ই তেমন কালো নয়।

জাতিভেদের কঠোর শাসনে এখানকার সমাজ নিতান্ত পীড়িত। পঞ্চম নামক জাতি হিন্দুর চারি বর্ণের বাহিরে বলিয়া অত্যন্ত ঘৃণিত হয়। অবশ্য সহরে তাহাদের উপর তেমন অত্যাচার নাই;—কিন্তু মফস্বলে ইহারা গ্রামের বাহিরে বাস করে। পথে চলিবার সময় ব্রাহ্মণগণকে সাবধান করিবার নিমিত্ত ইহাদিগকে চীৎকার করিতে-করিতে যাইতে হয়; কারণ, ইহাদের ছায়া মাড়াইলেও পবিত্র ব্রাহ্মণের জাতি যায়! দৃষ্টি পড়িলেও ব্রাহ্মণের আহার উচ্ছিষ্ট হইয়া যায়! কিছুদিন পূর্ব্বে একজন 'পেরিয়া' এক ব্রাহ্মণের পুকুরের নিকট দিয়া গিয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মণ তাহার নামে আদালতে নালিশ করে যে, তাহার পুকুরের জল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মকদ্দমার ফলাফল জানিতে পারি নাই। ইহা দেখিয়া ভাবি, what man has made of man! আমরা আবার হোমরুল চাই—রেলগাড়ীতে Reserved for Anglo Indians দেখিলে চটিয়া অস্থির হই! জানি না, কবে এই don't touchism-এর পর্ব্ব শেষ হইবে!

আমার গোঁফদাড়ি দেখিয়া অনেকে মুসলমান বলিয়া সন্দেহ করিত; তাই মন্দির প্রবেশে বাধা পাইয়া, অকালে শ্মশ্রু-গুম্ফের মায়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অব্রাহ্মণগণ মন্দিরের ভিতর দেবতার নিকটে যাইতে পারে না—একগাছা উপবীতেই সে অধিকার পাওয়া যায়। সেজন্য মনে হইয়াছিল, কায়স্থ, গোয়ালা, যোগী প্রভৃতি জাতি পৈতা লইয়া ভালই করিতেছেন। তবে দেশে এই মহান্ বস্ত্র-সমস্যার দিনে এইরূপ সংস্কার ভাল কি না, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য!

আসিবার সময় রামেশ্বরে আমাদের পরিচারিকাকে চাবি.

আনা বক্‌সিস দিয়াছিলাম। ধর্ম্মশালায় এক ভিক্ষুক অলস ব্রাহ্মণী ছিল, অনেক বিরক্ত করাতে তাহাকে এক আনা দিয়াছিলাম বলিয়া সে আমাদিগকে মরলোকের কত ভয় দেখাইয়াছিল—পরিচারিকা শূদ্রাণীকে চারি আনা আর অলস ব্রাহ্মণীকে এক আনা দেওয়াতে যে আমাদের ঘোর অধর্ম্ম হইল, ইহা বুঝাইতে সে কত শাস্ত্রের প্রমাণই না উপস্থিত করিল। আমরা কিন্তু সে ভয়ে সাদাবুদ্ধির শাস্ত্রটা ভুলি নাই।

এই যুক্তিহীন অন্ধ-বিশ্বাসই আমাদের জাতির কাল হইয়াছে। পুরীতে দেখিয়াছি সহস্র-সহস্র দুর্ভিক্ষপীড়িত নিরন্ন কঙ্কালসার ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট্ করিতেছে। তাহাদের মুখে জল দিবার লোক নাই, কিন্তু ধর্ম্মের ষাঁড়-গুলিকে পয়সা দিয়া ঘাস কিনিয়া 'গোগ্রাস' প্রদান করিতে কত যাত্রী ব্যস্ত এবং এই সকল জীবের সমধর্ম্মাবলম্বী কতকগুলি অত্যাহার-পীড়িত পেশাদার জুয়াচোরকে ভোজন করাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে আরো কত জনে ব্যগ্র। কিন্তু হায়, দরিদ্র-নারায়ণের ক্ষুধিত উদরে একবিন্দু জলও কেহ দিতেছে না। কবি সত্যই বলিয়াছেন—

"যদি ক্ষুধাতুরে অন্ন নাহি পায়, তবে আর কিসের উৎসব
যদি দেয় কাটাইয়া ম্লানমুখে বিষাদে দিবস, তবে মিছে
সহকার শাখা, তবে মিছে মঙ্গল-কলস।"

অন্ধ-বিশ্বাসে আমাদের বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়াছে—তাই আমাদের এই শোচনীয় অধোগতি। শ্রীবুদ্ধের ভারতে বিবেকানন্দের বাণী এখনো কেহ শুনিল না—

"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু—সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন পূজিছে ঈশ্বর।"

যাহা হোক, জাতিভেদের ভীষণ কারাগার মাদ্রাজ হইতে পুরী আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। উদার নীল-অম্বুধিতীরে অবস্থিত জগন্নাথক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ভেদ নাই—এখানে এখনো একপাত্রে ব্রাহ্মণ শূদ্রে আহার করে—এখানকার দেবতা মূর্ত্তিহীন বলিলেই হয়;—কবে এই অমূর্ত্ত, অখণ্ড, অভিন্নের পূজক হইয়া মানবের সকল তীর্থ জগন্নাথ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া বিশ্বমৈত্রী এবং করুণার ধারায় পূত হইবে জানি না! জানি না, কবে সেই তীর্থের পূজারির আহ্বান কবির কথায় ধ্বনিত হইয়া উঠিবে—

"এস হে আর্য্য এস হে অনার্য্য
হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
এস এস খৃষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন,
ধরি হাত সবাকার।
এস হে পতিত কর অপনীত,
সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গল-ঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা,
তীর্থ নীরে,
এই ভারতের মহামানবের,
সাগর তীরে।"

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

৪৪

জ্যৈষ্ঠের মধ্যভাগে একদিন একটা বৃষ্টিশূন্য ঝড়ের অবসানে, আসবাবপত্রের ধূলাঝাড়া লইয়া চাকরদের সহিত বকাবকি করিয়া, তিক্ত-বিরক্ত চিত্তে ব্রজরাণী নিজেই উহাদের হাত হইতে ঝাড়ন লইয়া, কেমন করিয়া ঝাড়িতে হয়, দেখাইয়া দিবার জন্য বিশেষ-বিশেষ স্থানগুলির ঝাড়াঝুড়ি স্বহস্তে করিতে লাগিয়া গেল। চতুরিয়া, বিষণা, বেহারি প্রভৃতি চাকরের দল কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া, শিক্ষাকার্য্য সমাধা করিয়াও যখন কর্ত্রীঠাকুরাণীকে শিক্ষকতা হইতে নিবৃত্ত হইতে দেখিল না, তখন তাহারা একে-একে গৃহান্তরে, কেহ বা কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল। যে ঘরটার সম্মার্জ্জন লইয়া চাকর-মনিবে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেটা অরবিন্দের বসিবার ঘর, এবং এই ঘরটিই খাস করিয়া তাহার নিজের। এই ঘরটাতেই তাহার দিনের মধ্যের অন্ততঃ তিনভাগ সময় কাটে। ব্রজরাণী চিরদিন কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছে। চাকর-দাসীর চরিত্র বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। কর্ত্তা বা কর্ত্রী—যাহার প্রকৃতি কিছু ঠাণ্ডা, ইহারা আড়ালে দশের কাছে তাহার খ্যাতি বাড়ায় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ ইঁহার ভাগেই ফাঁকি চালায়। অরবিন্দ হাজার ত্রুটী পাইলেও, কাহাকেও কখনও মুখ ফুটিয়া একটা কথা পর্য্যন্ত বলে না; সেইজন্য মনিবের মতন অমন মনিব কি আর আছে; এ কথা গর্ব্বের সহিত বলিয়া বেড়াইলেও, তাহার ঘরে যদি সাত মণ ধূলা জমিয়া থাকে, তাহার গামছায় যদি চিটা পড়ে, বা জুতাগুলায় ছাতা ধরে, সে সব কাজ করিতে উহাদের আলস্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ব্রজরাণীর বেলায় পান হইতে চুণটুকু না খসে, এজন্য সকলেই সদা-সর্ব্বদা তটস্থ। ব্রজরাণী এ সমস্তই দেখিতে পায়; দেখিয়া সে যৎপরোনাস্তি রাগও করে। চাকরদের এবং তাহাদের কর্তৃত্ব-শক্তিতে খর্ব্বতাপ্রাপ্ত, অকর্ম্মা মনিব উভয় পক্ষই তিরস্কৃতও হয়। কিন্তু স্বভাব কোন পক্ষেরই সংশোধিত হয় না। নিরুপায়ে ব্রজরাণী যতটা পারে নিজেই উহার ঘরদ্বার বিছানা-বস্ত্রের তদারক করিয়া বেড়ায়। আজও তাই এই এত বড় তিনতালা বাড়ীটার সর্ব্বত্র ছাড়িয়া ইঁহার ব্যবহৃত ঘর কয়টারই তদ্বির করিতে আসিয়া দেখিল—এই ঘরটায় সে সচরাচর আসে না বলিয়াই বোধ করি সেই ভরসাতে চাকর মনিবের মিলিত চেষ্টার ফলে এটার যে অবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার জন্য আজিকার এই ঝড়কে দায়ী করিতে গেলে, সে যে কত বড় মিথ্যা অপবাদ রটনা করা হয়, তা যাহারা অম্লানমুখে সে কথা বলিয়া গেল, তাহারাও বুঝে। ঘরের চারিদিকের কোণে-কোণে, আলমারি কৌচের পাশে-পাশে ধূলায় জাল পড়িয়া গিয়াছে। আলমারির বইগুলার মাথা দশখানার বা সোজা আছে, আবার তিনখানার বা উল্টা দিকে নামান; কাগজফেলা ঝুড়িটা ভরিয়া গিয়া, ছেঁড়া খাম, খবরের কাগজ, মাসিক-পত্রিকার মোড়ক, শীলভাঙ্গা গালা ছাপাইয়া পড়িয়াছিল,—ঝড়ে উড়িয়া এক্ষণে ঘরময় ছড়াছড়ি হইয়া গিয়াছে। লিখিবার টেবিলের উপর আঁটা সবুজ বনাতটা নিজের গাঢ় সবুজত্ব হারাইয়া ধূলায় ধূসর হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর ছড়ান নাই, বোধ করি এমন কোন জিনিসই সংসারে নাই। দোয়াত প্রায় পাঁচটা জড় হইয়াছে, তার মধ্যে গোটা তিনেক কালিহীন। কলমের সংখ্যার অনুপাতে নিবের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। ত্যক্ত চিত্তে চারিদিকের গোছ-গাছ সমাধা করিয়া তুলিয়া, টেবিলে বিক্ষিপ্ত চিঠিপত্রগুলা বাছিয়া-বাছিয়া চিঠির ফাইলে গাঁথিয়া দিতে গিয়া, একখানা খামের লেখায় হঠাৎ তাহার চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া পড়িল। চিঠিখানা হাবড়ার বাড়ী হইতে ঠিকানা কাটিয়া এখানে আসিয়াছে। ইহার খামের উপর বর্দ্ধমানের ছাপ। তা'ভিন্ন আরও কয়েকটা;—একটা হাবড়ার, একটা এখানের। কাটা খামের মধ্য হইতে পত্রখানা টানিয়া বাহির করিয়া সে চঞ্চল চক্ষে তাহারই উপর চাহিল; বুকের মধ্যটা হঠাৎ তাহার এমনি প্রচণ্ড বেগে দুলিয়া উঠিয়াছিল, যে,

তাহারই আবর্ত্তে চোখের দৃষ্টিও কিছুক্ষণের জন্য যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। চিঠিখানা এই—

"প্রণামা শতকোটি নিবেদনমিদং

আপনি বোধ হয় এখনও জানেন না, আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছি। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আর অধিক কি লিখিব। এখানের সমস্ত কুশল। ইতি সেবক শ্রীঅজিতকুমার বসু।"

চিঠিখানা পাঠ শেষে ব্রজরাণী সেখানা হাতে করিয়া অনেকক্ষণই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু বাহিরে স্তব্ধ থাকিলে কি হইবে, এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহারই ঘর-কন্নার জিনিষপত্র উলোটপালট করিয়া দিয়া যেমন করিয়া ঝটিকা বহিয়া গিয়াছিল, সেই জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্নের আগুনে হাওয়ার অনুকল্পে তাহার মধ্যেও তখন একটা উন্মত্ত ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রথম হইয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে, সেই নবকিসলয়তুল্য সুন্দর কিশোর, বিদ্যার গরিমায় দীপ্ত সমুজ্জল মুখে মনোরমাকেই তো 'মা' বলিয়া ডাকিতেছে! আজ এতক্ষণে পুত্রগৌরবে মনোরমার বুকটা যে কতখানিই ভরিয়া উঠিয়াছে, নিজের বুকের এই আকস্মিক অভাবনীয় শূন্যতা হইতেই সে ইহা কল্পনা করিয়া লইয়া, যেন অসহনীয় একটা তীব্র যন্ত্রণা বুকের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল। চেনা-অচেনা সবাই তো আজ রত্নগর্ভা বলিয়া সেই সৌভাগ্যবতীর অভিনন্দন করিবে। দরিদ্র-কুটীরে আজ কত উৎসব! আর তাহার এই এতবড় রাজপ্রাসাদ—এ যে নিরানন্দভরা, চির-অন্ধকারময়। তাহাকে গৌরবান্বিত করিতে আজ কেহ কোথাও নাই! এইখানে রাণীর গৌরবের মাঝখানেও সে যে ভিখারিণী!

চিঠিখানা যেখানকার সেইখানে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু মনটাকে ব্রজরাণী আর সেদিন সেখান হইতে নড়াইয়া আনিতে পারিল না। ঘুরিয়া-ফিরিয়া কেবল সেই দুই বর্ষাধিক পূর্ব্বে দেখা মুখখানি মনে পড়ে, আর চিঠির কথাগুলা বুকের মধ্যে আসিয়া ঘা দেয়। একবার ইহাও তাহার মনে হইল, যে, হে ভগবান! ওই ছেলেটাকে কেন আমার পেটে একটু জায়গা দিলে না? আবার নিজের কাছে নিজেই লজ্জায় রাঙিয়া এ চিন্তার সুখ-প্রলোভনটুকু চাপা দিয়া ফেলিতে হইল। কে যেন হৃদয়-গুহার অন্ধকার কোণ হইতে তাড়না করিয়া কহিয়া উঠিল, তার স্বামী নিয়েও তোর মন উঠেনি? ঐটুকু শেষ বাঁধনও তার, তুই রাক্ষসী খসিয়ে নিতে চাস্ না কি?

অরবিন্দ কি একটা বৈষয়িক কার্য্যে দুদিনের জন্য ভাগলপুরে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিলে, দু'একদিন ইতস্ততঃ করিয়া এক সময় দ্বিধার নিষেধ সরাইয়া ফেলিয়া ব্রজরাণী হঠাৎ এই কথাটা তুলিয়া বসিল। বলিল, "অজিত ফার্ষ্ট হয়ে পাশ করেছে।" বলার ধরণে, এই কথাটা সে জিজ্ঞাসা করিল, অথবা জানাইল,—ঠিক করিয়া বুঝা গেল না। অরবিন্দ শুনিয়াও যেন শুনে নাই, এম্নি করিয়া থাকিয়া পূর্ব্বের মতই আহার করিতে লাগিল। ব্রজরাণী তাহার নিরুত্তর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "সে এইবার কল্‌কেতায় এসে পড়বে বোধ করি?" অরবিন্দ তাহার প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া জবাব দিল, "বর্দ্ধমানেও একটা কলেজ আছে যে।" "সে তেমন ভাল কলেজ নয়। এমন ভাল করে পাশ হয়ে কি আর সে কলেজে সে পড়বে।"

ইহাও ঠিক প্রশ্ন নয়। অরবিন্দ আপন মনে খাইয়া যাইতে লাগিল, জবাব দিল না।

এ কয়দিন ব্রজরাণী রাত্রিদিন ধরিয়াই ভাবিয়াছে। ভাবিতে গিয়া নিজের মাথার মধ্যে আগুন ধরাইয়া দিয়া, কতই না সম্ভব-অসম্ভব কল্পনার জালই সে বুনিতে বসিয়া গিয়াছিল; সে সবের একটুখানি আভাষও যদি বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তো, লোকে তাহাকে পাগল বলিতে দ্বিধামাত্র করিবে না। কতবার তাহার মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এইবার অজিতের পিতা নিশ্চয়ই তাহাকে এইখানে নিজের কাছে লইয়া আসিবেন। তা ছেলে যখন আসিল, তখন ছেলের মা-ই বা না আসিবেন কেন?—বিশেষ, যেমন-তেমন মা নয়,—অমন ছেলের মা। তার মর্য্যাদা কি আজ পুত্রের মর্য্যাদায় মিলিয়া শতগুণেই বাড়িয়া উঠে নাই? চাহি কি, ভাগলপুরে যাওয়া একটা অছিলা,—আসলে উনি স্ত্রী-পুত্রকে আনিতেই গিয়াছেন।

আচ্ছা, ব্রজরাণী তখন কি করিবে? যেমন আধুনিক দু'একখানা উপন্যাস বা ছোট গল্পে সপত্নী-প্রীতির ঢেউ উঠিয়াছে, তেম্নি,—না, সেকালের সেই বগী-বিন্দির মত চুলাচুলি করিতে-করিতে সতীন লইয়া ঘর-কন্না করিতে বসিয়া যাইবে? মনে করিতেই, দারুণ বিতৃষ্ণায়, বিরাগে মন ভরিয়া উঠিল। বিশেষতঃ, ছোট বয়সে ঝগড়া করাও

সাজে, আবার 'পিরিতি' করাও চলে ;—এ বয়সে কাঁচিয়া ও ঢুটার একটাও আর চলে না। মরিয়া গেলেও সতীন লইয়া ঘর সে করিতে পারিবে না। স্বামী তাহাকে মনে-মনে ভালবাসেন মনে হইলে, কত সময়ে তাহার এমনও মনে হইয়াছে যে, ঐ মনটা যদি কোন পদার্থ হইত, তো, সেটাকে সে নির্দ্দয় হস্তে ছিঁড়িয়া আনিয়া খণ্ড-খণ্ড করিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া দিত ; এবং এই একমাত্র উপায়েই সেই অবিস্মৃতার গুপ্ত স্মৃতি সে ইহার হৃদয় হইতে লুপ্ত করিতে যদিই পারিত। তদ্ভিন্ন স্বামীর সেই প্রিয়তমাকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়া সে দৃশ্য চোখ মেলিয়া বসিয়া দেখিতে পারে, এত উদারতা তাহার মধ্যে নাই। তা এর জন্য তাহাকে যে যা বলিতে হয় বলুক !

কিন্তু—! কিন্তু কি ? সে নিজেও বুঝি ভাল করিয়া বুঝিতেছিল না যে এ কিন্তুটা কি ? এবং ইহার মূলই বা কোথায় ? তাই স্বামীকে এ বিষয়ে যথাপূর্ব্ব নীরব থাকিতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইবে কোথায়, তা নয়,—তাহার বুকের মধ্যে অস্বস্তিতে ঢেঁকি পড়িতে লাগিল।

এখন স্বামীর নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ততায় নিজের বক্তব্যটাকে জটিলতর হইয়া উঠিতে দেখিয়া মনে-মনে চটিয়াছিল,—গলার সুরে খানিকটা উষ্মা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "তার চিঠিটার জবাব দিয়েছ, না—না ?"

অরবিন্দ পাতের উপরকার তপ্সে মাছটা টানিতে গিয়া হাত সরাইয়া লইয়া, তাহার উত্তেজিত মুখের দিকে বারেক চাহিয়া দেখিল, এবং পুনশ্চ আহারে মনোনিবেশ করিল, কথা কহিল না।

তা কথা না কহিলে কি হয়, স্বামীর সেই এক লহমার সাশ্চর্য্য দৃষ্টিটুকুই যে একশো'টা কথার চাইতে অনেকখানি বেশি, সে কথা না কি ব্রজরাণী জানিত না ? মুহূর্ত্তে সে বিদ্যুৎচ্ছটার ন্যায় দৃপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"বলি, পরও তো পরকে একখানা চিঠি লিখ্‌লে তার জবাব দেয়—এটুকুও কি মনে করলে পারতে না ? না, আমিই তা'তে দম ফেটে মরে যেতুম।"

অরবিন্দ এবার কথা কহিল ; বলিল, "তুমি মরে যেতে কি না ঠিক জানিনে, কিন্তু আমি এটা পারতুম না। আমি তাদের পরের চাইতেও যে অনেক বেশি পর, সে কি তোমারও জানা নেই ?"

"তুমি না' বল্লেই তো আর সত্যিকারের সম্বন্ধটা ফুস্-মন্তরের চোটে হুষ্ করে উড়ে যাবে না। জগৎ-শুদ্ধ সবাই তাকে তোমার ছেলে ছাড়া আর কিছু বল্‌বে কি ? তুমি পর হ'তে চাইলে কি হবে ?"

অরবিন্দ শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "জগৎ-শুদ্ধ সবার সঙ্গেই তো আর আমার কারবার নয়। তুমি তাকে আমার আপন বলে স্বীকার কর্‌তে কখন চেয়েছ কি ? সেই কথাটারই জবাব দাও না ?"

এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য যাহাই থাক, ব্রজরাণীর উত্তপ্ত মন ইহাকে নিছক ব্যঙ্গ বলিয়াই ধরিয়া লইল। তাই অপমানে অভিমানে আগুন হইয়া গিয়া সে উত্তর করিল,"সৎ-মায়ে সংসারে অনেক কুকীর্ত্তি করে থাকে,—সে এমন কিছু নতুন কথা নয়; কিন্তু সৎ-বাপ যেমন আমি অজিতের দেখ্‌চি, এমন আর কোথাও কারও দেখিনি। বেশ ত, তোমার ছেলে, তুমি যদি তার ভাল-মন্দ না দেখ, নাই দেখবে। আমার তো তাতে বড় বয়েই গেল। আমি ধর্ম্ম ভেবেই বলেছিলুম।" এই বলিয়া ব্রজরাণী কাঁদো-কাঁদো হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

অরবিন্দের খাওয়া হইয়াছিল, "এতদিন আমি ভাল-মন্দ না দেখে যদি কেটে গিয়ে থাকে, আজও দিন পড়ে থাক্‌বে না।"—এই কথা কয়টা বলিয়াই উঠিয়া চলিয়া গেল। এ আলোচনা এই পর্য্যন্তই থামিয়া রহিল।

৪৫

ভগবান যাহাকে দিতে ইচ্ছুক না থাকেন, তাহাকে এমনি বঞ্চিত করিয়াই বুঝি দান করেন? অজিতের পরীক্ষার ফল যেদিন জানা গেল, দুর্গাসুন্দরীর অসুখ সেদিন খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। অজিত যখন লাফাইতে-লাফাইতে ঘরে ঢুকিয়া চেঁচামেচি করিয়া বলিয়া উঠিল, "দিদিমামণি! তোমায় একটা সুখবর দিই যদি, তো, কি আমায় দেবে বলো ?" তখন সেইমাত্র একটা শ্বাসকষ্ট হইতে উদ্ধার পাইয়া দুর্গাসুন্দরী ঘন-ঘন হাঁপাইতেছিলেন,—কষ্টে দম লইয়া-লইয়া বলিলেন, "কি দোব, কি আছে দাদু, তোর দিদিমণির মত এত বড় গরীব কি আর এ ভূ ভারতে আছে রে ? তুই পাশ হয়েছিস্ বুঝি ?"

অজিত প্রথম উচ্ছ্বাসের মুখে ঈষৎ দমিয়া গিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ফার্ষ্ট হয়েছি।"

সমপাঠী অনেকেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছিল,—আবার ফেলও অনেক ছেলেই করিয়াছে। এই দুই দলের ছেলেই অজিতকে নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিল যে, একদিন ভাল করিয়া খাওয়াইতে হইবে। যাহারা পাশ করিয়াছিল, অজিত তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তাহলে তোমরাও তো ভাই, খাওয়াতে পারো ?"

তাহারা বলিল "দ্যাৎ, আমরা না কি আবার পাশ করেছি! ইউনিভারসিটি আমাদের দয়া করে ফাউ দিয়েচে। তোর মতন পাশ করলে আমরা রোজ একশোটা করে বামুন খাওয়াতুম।" অজিত বলিল, "আমরা তা হলে তো ফাঁকে পড়েই যেতুম।" "আচ্ছা, তোরাও না হয় প্রসাদ পেতিস্।"

শেষকালটায় এই রকম বন্দোবস্ত দাঁড়াইল যে, খবরের কাগজে শ্রেণীবিভাগ হিসাবে যাহার নাম যেরূপ আগে, পরে বাহির হইয়াছে, খাওয়ানর ব্যবস্থাও ঠিক সেই হিসাবে হইবে। তা গুণানুসারে বা বর্ণমালা অনুসারে যেদিক দিয়াই ধরা হোক না কেন,—ঘুরিয়া-ফিরিয়া প্রথম ভোজের আয়োজনটা অজিতেরই উপরে পড়ে। অজিত মাকে আসিয়া বলিল, "ছেলেদের একদিন ভাল করে খাওয়াতে হবে যে মা-মণি, কবে খাওয়াবেন বলুন তো ?"

মনোরমা ছেঁড়া কাপড়ে তালি লাগাইতে লাগাইতে কি সব চিন্তা করিতেছিল ; বিষণ্ণ মুখ তুলিয়া বলিল, "সে কি করে হবে অজি, দিদিমায়ের অত অসুখ।"

অজিত মুহূর্ত্তে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল ; কিন্তু নিজের সঙ্কট অবস্থা স্মরণে আসিয়া তাহাকে নিবৃত্ত হইতে দিল না, —সঙ্কোচের সহিত কহিল, "সে ওদের বলেছিলুম, কিছুতেই ওরা শুনতে চায় না যে।"

মনোরমা কহিল, "তা হ'লে একদিন টাকা দুয়ের জলখাবার আনিয়ে দিই, খাইয়ে দে'।"

পুনশ্চ সঙ্কোচের সহিত অজিত জানাইল, "সে রকম খাওয়া তাহারা মানিবে না। সবাই বলে, দুটো স্কলারশিপ পাচ্চিস্, একলাই খাবি, আমরা না হয় দশটা টাকাই খেলুম। একটা দিন বই তো নয়। দিন্ না মা-মণি, একটু ভাল রকম করে খাইয়ে।"

মনোরমা কিছু অপ্রসন্ন হইয়া উত্তর করিল, "ঘরে এত বড় একটা রোগী, অবস্থা তো এই ; যা ক'রে দিন যাচ্চে,—যাক্ এ সব যখন তারাও বুঝবে না, তুমিও না, তখন তাই হবে। বোলো তাদের।"

ইহার পর হইল সবই, কিন্তু অজিতের মনে সুখ আর হইল না। তাহার মুখের হাসি কোথায় মিলাইয়া রহিল, কাজকর্ম্মের উৎসাহ অনেক দূরেই চলিয়া গেল। শিশিরে-ভেজা ফুলের কুঁড়ির মত চোখের পাতার তলায়-তলায় জলের আভাষ জমিয়া ক্ষণে ক্ষণে পতনোন্মুখ হইয়া আসিতে লাগিল। দুঃখের মধ্যে জন্ম হইলেও অভাবের স্পর্শ সে এ পর্য্যন্ত পায় নাই। নিজের প্রাণ বাহির করিয়াও মনোরমা আজ পর্য্যন্ত ছেলের কাছে ঐ জিনিষটাকেই অপরিচিত রাখিয়াছে। কিন্তু আজ-কাল দুর্গাসুন্দরীর ভীষণ রোগের চিকিৎসায় যখন মনোরমার সমস্ত সম্বলই শেষ হইয়া আসিল, তখন হইতেই এ জিনিষটা এ বাড়ীতে একটু বেশি রকম প্রভাব বিস্তৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একে রাখু'র মৃত্যুর পর হইতেই জমিজমার দেখা-শুনার অভাবে পূর্ব্বের মত ইহাতে উৎপন্ন হয় না ; তার উপর এ দু'তিন বৎসর অজন্মায় খাজনা-টেক্স দিয়া জন-মজুরের মজুরি পোষাইয়া বাকি তো কিছুই থাকেই না, উপরন্তু ঘর হইতেই বাহির করিয়া দিতে হয়। তা ঘরের সঞ্চয়ই বা কতটুকু ? অকূল-পাথারে হাবু-ডুবু খাইতে-খাইতে মনোরমা দুর্গা, কালী - সবার কাছেই মাথা খুঁড়িয়া প্রার্থনা করিতেছিল, অজিত যেন অন্ততঃ নিজের পড়াটা চালাইয়া লইতে পারে। নতুবা কেমন করিয়া সে উহার পড়ার খরচ যোগাইবে ? অথচ,—উঃ! কেমন করিয়া এ কথা সে মনেই আনিবে ? তা, প্রার্থনা তাহার দেবদেবীরা শুনিয়াও ছিলেন। অজিত পঁচিশ এবং পনের, এই চল্লিশ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়া মায়ের ঘোরতর দুশ্চিন্তা দূর করিল। এখন চারিদিকের দেনা-কর্জ্জের মধ্যে ঐটুকুকে সম্বল করিয়াই মনোরমা আবার নবীন আশায় বুক বাঁধিতেছিল। সংসারে যে এত বড় করিয়া অভাব দেখা দিতে পারে, ইতঃপূর্ব্বে এই খবরটা তাহার এমন করিয়া জানা ছিল না। রাখু নিজের বুকের রক্ত দিয়া জমিজমাগুলি দেখিত, দুর্গাসুন্দরী নিজে দাঁড়াইয়া তদারক করিতেন, তার উপর উপ্‌রি দরকারের বেলায় মনোরমার কয়েকখানা অলঙ্কারও ছিল। এখন যে আর কোন দিকেই কিছু নাই। তা হোক, এত অভাবের দিনেও মনোরমা

এই একটুখানি অবলম্বন লাভ করিয়াই অনেকখানি সুস্থ হইল। সে জানে জীবনের মধ্যাহ্নে সূর্য্যরশ্মি একটু প্রখর হইয়াই উঠে; এবং আবার তাহা অস্তের ছায়ায় শীতল হইয়া যায়।

অজিত একখানা সদ্য-লেখা চিঠি হাতে করিয়া তাহার কাঁচা কালি শুখাইবার জন্য নাড়া দিতে-দিতে আসিয়া বলিল, "বাবাকে এই চিঠিখানা লিখলুম, পাঠিয়ে দিই ?"

মনোরমা প্রথম একবার চম্‌কাইয়া উঠিয়াই, সাগ্রহে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "কি লিখেছিস, কৈ দেখি।" পড়িয়া দেখিয়া, কিছুক্ষণ মনে-মনে কি একটা চিন্তা করিয়া, ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "পাঠাও।"

কয়দিন নিজেই সে ঠিক এই কথাটাই ভাবিতেছিল। কিন্তু চিন্তা করিয়া কোন মীমাংসায় পৌছিতে পারে নাই। ছেলের মনেও যখন সেই চিন্তারই তরঙ্গ পৌছিয়াছে, তখন ইহাকেই প্রত্যাদেশ বলিয়া গ্রহণ করা যা'ক্। অপরিহার্য্য বাধা বশতঃ পুত্রের অবশ্য প্রাপ্য অধিকার দানে অপারগ হইলেও পিতার নিশ্চিত প্রাপ্য কেন তিনি পাইবেন না ? অজিতকে চুম্বন করিয়া মনে-মনে আশীর্ব্বাদের উপর আরও অনেক আশীর্ব্বাদ করিল।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল। বাহিরের ঘরের যে জানালাটা হইতে রাস্তার সবচেয়ে বেশি দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়, সেইখানে অজিতের বসিবার আড্ডা হইয়াছে। প্রত্যহই প্রায় ডাক-পিয়ন ঐ পথে যায়। তাহাকে দেখিলেই তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত একটা আহ্বানের প্রত্যাশায় কাণের মধ্যে গিয়া শব্দ করিতে থাকে, উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু অধীর প্রতীক্ষা সফল হয় না। কোন দিন থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করে, "নকড়ি! আমার চিঠি আছে ভাই ?" উত্তরে যখন শুনিতে পায়, "এজ্ঞে, না দাদাঠাকুর, নেই তো।" তখন তাহার ভয় হয়, পাছে তাহার কান্না আর চাপা না থাকে!—এমন করিয়া আশার আশ্বাসের প্রতীক্ষায় দিন যখন গত হইয়া গিয়া, সমুদয় বুকখানা জুড়িয়া একটা গভীর নৈরাশ্যের বেদনা হা-হা করিয়া উঠিয়াছে,—বর্ষা-সমাগত বন্যাধারার ন্যায় প্রবল ও গভীর উচ্ছ্বাস যখন আকস্মিক নিদাঘ-রৌদ্রের তপ্ত কিরণ-স্পর্শে পঙ্কিল হইয়া উঠিতেছে,—এমনি সংশয় সঙ্কুল দুঃসময়ে একদিন অপ্রত্যাশিত সঙ্গীতের রেশ কাণে আসিয়া ধ্বনিত হইল, "দাদাঠাকুর, চিঠি আছে গো।"

শুনিয়াই হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন পা দুখানার আগেই লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া যাইতে চাহিল। ব্যথিত বালকের কাতর মর্ম্মের করুণ ক্রন্দন তখনি থামিয়া পড়িয়া তাহারই মধ্য দিয়া মধুর মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় আশার দিব্য সঙ্গীত যেন মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিল।

কিন্তু কার লেখা এ চিঠি ? শিরোনামার ইংরেজী লেখা দেখিয়াই তাহার চিত্তে সংশয় জাগিয়াছিল। খামের মধ্য হইতে লেখা চিঠিখানা টানিয়া বাহির করিতে সন্দেহ দৃঢ় হইল। কেমন মনে হইল, এ লেখা তাহার পিতার নয়। যদিও তাহার মনের মধ্যে উৎসাহের জোয়ারে ভাঁটা আসিয়া গিয়াছিল, তথাপি কৌতূহলের বশে সে চিঠিখানা পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। সে চিঠিখানা অসীমা বা তাহার পরিচিত কাহারও নয়। বিশেষতঃ, ইহার সম্বোধন পদ হইতে লেখককে তাহার 'গুরুজন' পর্য্যায়-ভুক্ত বুঝায় এবং পরলোকনিবাসিনী পিসিমাকে মনে পড়ে। চিঠিখানা এম্‌নি—

"শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন,

অজিত! তুমি পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছ জানিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি জানিবে। ঈশ্বর তোমায় দীর্ঘজীবী ও কীর্ত্তিমান করুন; তাঁহার নিকট ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা। অতঃপর তুমি খুব সম্ভবতঃ কলিকাতায় পড়িতে আসিবে ? প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াই স্থির করিয়াছ বোধ হয় ? কবে আসিবে ? আশা করি সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছ ? আশীর্ব্বাদ লইও। আর অধিক কি লিখিব ?

ইতি—তোমার ছোট-মা।"

পত্রের উত্তর দিবার অনুরোধ দুইবার দুই জায়গায় করিয়াই আবার উহা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। চিঠিখানার পাঠ সমাপ্ত হইতেই, সেখানা যেন বিশ মণ ভারি একখানা পাথরের মত দুঃসহ হইয়া অজিতের হাত হইতে খসিয়া পড়িল; সঙ্গে-সঙ্গে বিস্মিত, স্তম্ভিত অজিতের মনশ্চক্ষে বহুদিন পূর্ব্বেকার সেই একটা দৃশ্য, যে দিন অপরিচিতা নারী তাহার ভ্রমের লজ্জাকে নিজের মাতৃ-অঙ্কে

তুলিয়া লইয়া, কোমল করুণায় তাহাকে বুকে টানিয়াই, সহসা আবার কোন্ অজ্ঞাত-সত্যের আকস্মিক আবিষ্কারে অসহ্য ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করিয়াছিল! একটি নিমেষের মধ্যেই করুণাময়ীর মমতা মাখান মুখের ছবি, অকরুণার নৈষ্ঠুর্য্যে যে কেমন করিয়াই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে, সে দিনের সে দৃশ্য চোখে দেখা না থাকিলে, সে কল্পনায়ও উহা আনিতে পারিত না। তখন তাহার নিকট যত বড় আশ্চর্য্য রহস্যই এ থাক, আজ অনেক জিনিষের মত এ বিষয়টাও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুটা যে বিমাতার বিদ্বেষ, এই সত্যটুকু আজ কিশোর অজিতের অজ্ঞাত নয়। তাহার অন্তরকেন্দ্রে অঙ্কিত সেই ঘৃণাপূর্ণ মুখের ছবি সে তাহার মাতৃমূর্ত্তির পাশাপাশি স্থাপন করিতেই, দুজনের মধ্যেকার সুস্পষ্ট বৈষম্য তাহার অনভিজ্ঞ কিশোর চক্ষুকেও প্রতারণা করিতে পারিল না। মা তাহার যথার্থই মাতৃ-প্রতিমা—তাঁহার ভুবন-মোহন রূপে শুধু মায়েরই ছবি! দৃষ্টিতে মাতৃদৃষ্টি, অধরে বাৎসল্য-উৎস, কণ্ঠে করুণা-মমতায়-গলান যে সুধারস স্বতঃই উৎসারিত—সে যেন জগতেরই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে সমর্থ। এ মায়ের পাশে সেই মা! বিতৃষ্ণায় মন তাহার বিকল হইয়া গেল।

মনোরমা লক্ষ্য করিল, অজিতের মুখে কি যেন একটা দৃপ্ত গাম্ভীর্য্যের ভাব প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে। গতি তাহার রেলগাড়ির এঞ্জিনের মতই বেগবান ছিল। ছুটা-ছুটির চোটে হাত পা তাহার ছড়াকাটা কোন দিন বন্ধ থাকিত না। আজকাল সেটা প্রায় ঘুচিয়াছে। দরজা সে ধাক্কা দিয়া খুলিয়া ধড়াস্ করিয়া বন্ধ করিত,—এর জন্য বহু তিরস্কার লাভেও স্বভাব শোধরায় নাই,—আজকাল তাহার চালচলনে সব সময়ই যেন কেমন একটা অস্বাভাবিক ভব্যতা প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষ করিয়া মায়ের সঙ্গে সে এমন করিয়া ভক্তি-সম্মান দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে, যে, সে দেখিয়া মনোরমা হাসি চাপিতে না পারিলেও, মনের ব্যথাটা ইহাতে তাহার বেদনার ব্যথা অনুভব না করিয়া পারিল না। আসন্ন-বিচ্ছেদের সম্ভাবনা অতি তীক্ষ্ণ ছুরিকার ফলার মত এই শিশুর মনটাকে যে নিয়তই কাটিতেছে, হাতেই তাহার খেলা-ধূলা ঘুড়ি-নাটাই, বন্ধু সমপাঠী, মায়ের পর আদায়ের অত্যাচার, ভুলাইয়া তাহাকে এই অকাল-প্রৌঢ়ত্ব প্রদান করিতেছিল, ইহাতে সে নিঃসংশয়ই ছিল। একদিন কথায়-কথায় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যারে, সেই যে চিঠিখানা লিখেছিলি, তার উত্তর এসেছে?" মা যে এ প্রশ্ন কোন দিন না কোন দিন করিবেন, এ ভয় অজিতের মনে ছিল। তথাপি জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহার অন্তর-সঞ্চিত নিবিড় বেদনা চঞ্চল হইয়া উঠিল। মুখখানা পাশের দিকে ফিরাইয়া রাখিয়া, নত চক্ষে সবেগে মাথা নাড়িয়াই, সে দ্রুতপদে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। ডাল নাড়া দিলে যেমন পাতায়-ভরা জল ঝরঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে, মায়ের মুখের ঐটুকু কথাতেই তেমনি করিয়া তাহার গোপন সঞ্চিত অভিমানাশ্রুরাশি বাহিরে আসিবার জন্য উদ্দাম বেগে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। জীবনের এই সর্ব্বপ্রথম সফলতার আনন্দময় দিনে জীবনকে এত বড় ব্যর্থতার বেদনায় ভরাইয়া নিরানন্দ করিয়া তুলিতে যে পিতৃ-হৃদয় একবিন্দু সঙ্কোচ মাত্র করিল না, সেই পিতাকেই যে দেবতারও ঊর্দ্ধে স্থান দিয়া রাখিয়াছিল, আজীবন ইঁহার নিকট তীব্র অবমাননা লাভ করিয়াও সে যে তাঁহার দত্ত লাঞ্ছনাকে তাঁহারই গরিমারূপে কল্পনা করিতে ছাড়ে নাই, সেই পিতার এই এত বড় নিষ্ঠুর পরিচয় কেমন করিয়া সে আজ সহ্য করিবে? সামান্য একটা কাগজে কয়েকটা অক্ষর টানিয়া পাঠাইলে যদিই তাঁহার ব্রতভঙ্গ হইত, তা না হয় না-ই পাঠাইতেন। যাহার অন্তর তাহার প্রতি বিদ্বেষের বহ্নিতে রশ্মিময়, তাহাকে অজ্ঞাতে স্পর্শ করিয়াও যে হস্ত অস্পৃশ্য স্পর্শের সঙ্কোচে কুঞ্চিত হইয়া উঠে—সেই হাতের চিঠি তাহাকে পাঠাইয়া অবহেলার চরম দেখাইবারও কি তাঁহার প্রয়োজন ছিল?

৪৬

অজিতের মনের সুখস্বপ্নটুকু শরতের ক্ষীণ মেঘের মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়া গিয়া, তাহার সমস্ত দেহ-মনের উপর রৌদ্রতপ্ত একটা দারুণ গুমোটের মত করিয়া রাখিল। কিন্তু বয়সের ধর্ম্ম তাহাকে ইহার জন্য ক্লান্ত না করিয়া বরং আর একদিক দিয়া ভাবের বন্যায় তাহার নবজীবনকে ভাসাইয়াই লইয়া গেল;—নৈরাশ্যের পঙ্ক-শয্যায় ফেলিয়া গেল না। বয়সে বালক মাত্র হইলেও, অবস্থার অভিজ্ঞতায় এবং পুস্তকের শিক্ষায় তাহাকে সাধারণ বালক অপেক্ষা অল্প দিনের মধ্যেই যেন এই সরল মাধুর্য্য-মণ্ডিত কৈশোর

হইতে একেবারেই যৌবনের মধ্যভাগে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিল। সে যেদিন মাতার অবিরল অশ্রু-প্রবাহের স্রোতে ভাসিয়া আরক্ত মুখে অশ্রু-স্পন্দিত অন্ধ নেত্রে নিতাইচরণের সহিত একটা বিছানার মোট ও পিসিমা-দত্ত ষ্টীল ট্রাঙ্কটি সঙ্গে লইয়া কোলাহল-মুখরিত ঈডেন হিন্দু-হোষ্টেলের দ্বারদেশে অবতরণ করিল, সেদিন সেই সদ্য মাতৃক্রোড়-ভ্রষ্ট বিচ্ছেদ-ব্যাকুল, দুঃখার্ত্ত বালকের আধিক্লিষ্ট ম্লান মুখচ্ছবিতেও একটা অটল প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ও তেজ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। যখন মায়ের আদরের দুলাল, অঞ্চলের নিধি, আত্মীয় বান্ধব-পরিশূন্য, জন-কোলাহল-মুখর কর্ম্মকঠোর কঠিন রাজধানীর নির্ব্বান্ধব ছাত্রাবাসের সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি শূন্য কক্ষে, ততোঽধিক শূন্য অন্তঃকরণ লইয়া প্রবিষ্ট হয়, তখন সেই কাতর অন্তরের মাঝখানে মায়ের অশ্রুপরিপ্লুত করুণ মুখের ছবিখানা একান্তই উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে। সারাদিনের পুঞ্জীভূত গোপন অশ্রুর রুদ্ধ-ধারা যখন এই নিঃসঙ্গ নিরালোক অন্ধকারে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, নয়ন-পল্লব সিক্ত করিয়া ধারায়-ধারায় প্রবাহিত হইয়া শেষে মাথাবালিসটাকে আর্দ্র করিয়া দেয়, তখনও অবসাদক্ষিপ্ত কাতর চিত্তে চিরদুঃখিনী জননীরই বিদায়-বেদনায় পরিম্লান মুখচন্দ্রমা একান্ত চিত্তে ধ্যান করিতে থাকে। ধ্যানের তন্ময়তায় অবশেষে কখন গণ্ড-প্রবাহী অশ্রুর ধারা থামিয়া যায়, আর্ত্ত হৃদয় শান্ত হইয়া সুপ্তির শান্তিতে সমস্ত তাপদাহ জুড়াইয়া দেয়, জানিতেও পারে না। অহোরাত্রের মধ্যে এই সময়টুকুই অজিতের পক্ষে সব চেয়ে আরামের। তাই এইটুকুর জন্য সে যেন কাঙ্গালের মত ব্যাকুল হইয়া পথ চাহিয়া থাকে। নিদ্রার আবেশে স্বপ্নের ঘোরে প্রত্যহই সে মাকে দেখিতে পায়। স্বপ্নের জননী স্বপ্নের মত রহস্যময়ী নহেন;—বাস্তবেরই মত, সেই একান্ত তাহারই মা। ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াও তাই সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝিতেই পারে না যে, স্বপ্ন কোন্‌টা? এই যে এতক্ষণ সে চিরদিনের মতই চিরপরিচিত মায়ের কোলের মধ্যে শুইয়া, মায়ের গলা জড়াইয়া, তাঁহার স্নেহ-হাস্য-বিভাসিত মুখে চুম খাইয়া কত আবদার-আদর জানাইতেছিল, মা যে তাহার মুখে ভাতের গ্রাস তুলিয়া দিতেছিলেন, স্নান করাইয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতেছিলেন, দুজনে হাসি-কথার বিরাম ছিল না, সেইগুলাই কি সব মিথ্যা? —আর এই শব্দহীন বিশাল অট্টালিকার একতলার একটা ছোট্ট কোণের ঘরের মধ্যে সরু খাটের নিঃসঙ্গ শয্যায় মায়ের বুকের পরিবর্ত্তে শীতল একটা পায়ের বালিস জড়াইয়া ধরিয়া সে যে এই পড়িয়া আছে, পাশের আর একখানা খাটিয়া হইতে তাহার গৃহসঙ্গী অপর একটি যুবকের নাসিকা-গর্জ্জন, নির্জ্জন অন্ধকারে শিশুচিত্তে আকস্মিক ভীতি উৎপাদনেও অসমর্থ নয়;—এই সবগুলাই সবচেয়ে বড় সত্য? অজিত আর সহিতে পারে না! প্রাণপণে কান্না চাপিতে গিয়া সে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে থাকে। এ পৃথিবীতে মা ব্যতীত আর যে তাহার কেহ নাই। সেই মাকে দূরে ফেলিয়া আসিয়া কেমন করিয়া সে একা, একেবারে অসহায় বালক, একাকী এই প্রাণহীন, হৃদয়হীন কলিকাতার বন্দীশালায় দীর্ঘ দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিবে?

অতীতের স্মৃতিগুলি আজ অজিতের মানসনেত্রে সন্ধ্যা-তারার মত সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিতে একটি-একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া তাহার দুঃখাহত হৃদয়ে আনন্দের চকিত স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া যায়। কবে তাহাকে কে কি বলিয়াছিল। কাহার উপরোধ শুনা হয় নাই। তাহার কোন্ অপরাধের জন্য মা তাহার কোন্ এক সুদূর দিনে দুঃখ করিয়া কি একটা কথা বলিয়াছিলেন—অমনি বুক চিরিয়া-চিরিয়া কৃত কার্য্যের অনুশোচনায়, আত্মগ্লানির প্রচণ্ড ধিক্কার তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়াকে যেন রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহে। অতি ক্ষুদ্রতম কীটাণুটিও যেমন অণুবীক্ষণের তলায় বৃহদাকৃতি লাভ করে, প্রতিদিনের অতি তুচ্ছানুতুচ্ছ ব্যাপারটুকুও আজ এই গৃহহীন বালকের চক্ষে তেমনি করিয়া একটা বিশেষ আকার ধরিয়া দেখা দিতে লাগিল। খাইতে বসিয়া অনভ্যাস-প্রযুক্ত মাছের কাঁটা আঙ্গুলে বিঁধিয়া যায়, গলায় বেঁধে, পাচকের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন বিতৃষ্ণায় পাতের উপরেই পড়িয়া থাকে। জলখাবারের জোগাড় করিতে একটি দিনও স্মরণ থাকে না। আর সকল সময়েই পড়াশোনা, খাওয়াপরা—সব চিন্তা ডুবাইয়া দিয়া—যন্ত্রণার্ত্ত প্রাণটা তাহার কচিছেলের মত কাঁদিয়া-কাঁদিয়া পাগল হইয়া গিয়া অনবরত ডাকিতে থাকে, মা, মা, মা! এ ধ্বনি তাহার ব্যথাহত অন্তরের অন্তস্তলে সে কোনমতেই চাপিয়া রাখিতে পারে না;—কেমন করিয়া পারিবে? এইটুকুই যে তাহার স্বজনত্যক্ত, নিরালোক জীবনের একটি

মাত্র আলো। আবার এই মাকেই স্মরণ করিয়া সে অসহ্য বেদনায় বিকৃত চিত্তকে সুস্থির করিয়া ভবিষ্যটাকে আশার আলোয় সমুজ্জ্বল করিয়া বইএর বোঝা টানিয়া লইয়া সেই আলোতেই পড়িতে বসে। মন যখন অবাধ্য ঘোড়ার মত রাশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বর্দ্ধমানের চিরপরিচিত গৃহাভ্যন্তরেই ছুটিতে চায়, তখন স্নেহ-শাসনে অটল ধৈর্য্যময়ী মাতৃদৃষ্টিই তাহার ভিতরটাকে লজ্জার চমকে চাবুক মারিয়া শিষ্ট সংযত করিয়া রাজ্যের কেতাব ও নোটবুকের গাদার মধ্যেই ঠাসিয়া ধরে। বাহিরের মাকে আড়াল করিয়া ভিতরের মা যে এমন করিয়া জাগিয়া উঠিতে পারেন, এ যে ধারণারও অতীত ছিল! আজ এই চরম দুঃখের দিনে পরম পরিতৃপ্তির মতন করিয়া সে এই মানসী মায়ের ছবিখানাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া, শুধু তাঁহারই মুখ চাহিয়া সীমাহীন দুঃখ-সমুদ্রে নিজের ক্ষুদ্র ভেলাটুকু ভাসাইয়া দিল,—যদি কখনও কূল পায়, তবেই তাহার জন্য দুঃখিনী মায়ের মুখে সে হাসি ফুটাইতে পারিবে। আর এটুকুও যদি সে না পারে, ভগবান্! সেই কুন্তলবতীকে অপুত্রক করিও,—সংসারের অনেক দুঃখের মত এ দুঃখটাও তাঁহার সহিবে।

নিজের মনের অসহ্য ব্যথায় মার কথা তাহার প্রথম-প্রথম বেশি করিয়া মনে হইল না। যখন হইল, তখন সে ভাবিল, মার দুঃখ বুঝি তাহার অপেক্ষাও অধিক। সে তো তবু দশটা-চারটেয় কলেজ করে, ভাল লাগুক আর না লাগুক, তবুও পড়াশুনা কিছু-কিছু করিতেই হয়। কিন্তু যেখানে জন্মাবচ্ছিন্নে সে একটা দিনের জন্যও মায়ের কোল-ছাড়া হয় নাই, জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া আজ এই চৌদ্দটি বৎসর নিরবচ্ছিন্ন যেখানে অনন্যসহায় হইয়াই শুধু মায়েরই বুকে বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেইখানের আশ্রয় হইতে এই যে সে উৎপাটিত হইয়া উঠিয়া আসিল, এর অভাব যার বুক জুড়িয়া শিকড়ের জাল বুনাইয়া গিয়াছিল তাহার যত হইবে—সেই শিকড়-ছেঁড়া বুকের বেদনা কি গাছের অভাবের সহিত তুলনীয়?

ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া এই কথাটাই অশ্রু-জলের মধ্য দিয়া ভাবিতে গিয়া বর্দ্ধিত বিস্ময়ে সহসা তাহার স্মরণ হইল, বর্দ্ধমানে থাকিতে সকাল বেলায় সাত বার না ডাকিয়া মা কখনও তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতে পারিতেন না। এখনও ওঠা হয়নি, ওঠেনি, ওমা, মাগো, আর একটু ঘুমুই না মা! এম্‌নি কত কি আদর-কাড়াকাড়ি,—মায়ের সস্মিত মুখের সেই তিরস্কার "হনুমান ছেলে, নবাবী ঘুমটুকু বেশ পেয়েছেন;" এইটুকু শুনিয়াই আবার পাশবালিসের আলিঙ্গনে আবদ্ধ-হওন মনে পড়িয়া গেল। আজকাল তাহার অসাড় নিদ্রাই বা গেল কোথায়? বর্ষারাত্রে যখন আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বজ্রের হুহুঙ্কার সহস্র কামান দাগিয়া ফেরে, ভীষণ কলরোলে ঝটিকা গর্জ্জিয়া আর সেই ভীষণ রণাঙ্গনে বিজয়মদে মাতিয়া উঠিয়া রণবাদ্যের কর্ণ-বধিরকারী ধ্বনির ঝমাঝম শব্দে বর্ষণ চলিতে থাকে, তখন মাতৃক্রোড়ভ্রষ্ট ভীত বালক আড়ষ্ট হইয়া বিছানার মধ্যে জাগিয়া পড়িয়া, মায়ের স্নেহতপ্ত আলিঙ্গনের দৃঢ়পাশ নিজের কুঞ্চিত রোমাঞ্চিত শরীরের উপর অনুভব-চেষ্টা প্রাণপণ শক্তিতেই করিতে থাকে। এমন বর্ষারাতে মায়ের কোলের ভিতর ঢুকিয়া গিয়া তাঁহাকে এমন করিয়া জড়াইয়া সে দুড় দুড়-বক্ষে মেঘগর্জ্জন শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া থাকিত যে, সারারাত্রি মাকে সেই একটি পাশেই যাপন করিতে হইয়াছে। এ মা তাহার কেমন করিয়া বাঁচিবে?

কালের ব্যবধানে সকল শোকেরই হ্রাস হয়। মানব-চিত্তের ধর্ম্মই এই যে, যত বড় দুঃখই হোক, চিরদিন ধরিয়া সেই একই অসহ্য যন্ত্রণা তাহাতে অনুভূত না হইয়া ক্রমেই ইহার বেগ মন্দীভূত ও সহ্য-সীমার অন্তর্নিহিত হইয়া যায়। অজিতের বিচ্ছেদবেদনাতুর চিত্তও দিনের পর দিনে, মাসের পর মাসে অল্পে-অল্পে একটু-একটু করিয়া শান্ত হইয়া আসিল। অভ্যাসেই সব করে, বিশেষতঃ ক্ষুধার জ্বালা জিনিষটাকে খুব তুচ্ছ করা চলে না। পাচক-ব্রাহ্মণের অবহেলাদত্ত অপরিচ্ছন্ন থালায় ছড়ান, অন্ন-ব্যঞ্জন আজকাল আর বেশির ভাগই পড়িয়া থাকে না। বর্ষা, শরৎ কাটিয়া শীতেরও অন্ত হইয়া আসিল। মেঘের ডাক এখন কদাচিৎ, আর সে ডাক এখন তেমন করিয়া অজিতের বুক কাঁপাইয়া তুলে না। ঘুম এখনও ভোরে ভাঙ্গে, তবে রাত্রের নিদ্রাকে সুনিদ্রাই বলা চলে। ভোরের আলোকে মায়ের স্মৃতিভরা তপ্ত-অশ্রু উপহার না দিয়া এখন সে ঐ সময়টিতেই ইংরাজি সাহিত্যের বাছাবাছা পাঠ্যগুলি লইয়া পড়িতে বসে। মার বরাবর সাধ ছিল, সে ভোরের বেলা উঠিয়া পড়া করে; সে তাহার পিতার কাছে শুনিয়াছিল যে এই সময় পড়া করিলে সময়ের গুণে চিত্তস্থৈর্য্য বশতঃ উহা অধিকতর ফলদায়ক

হইয়া থাকে। মায়ের বুকের চেয়ে মায়ের মুখের দিকে চাহিতেই, এক্ষণে তাহার মাতৃ-বৎসল চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। গায়ত্রীর অনুরূপ একটি মন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিয়া মা একদা উহা অভ্যাস করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।—দুটি বেলা কাচা-কাপড়ে সেই মন্ত্রটী সে আটাশ-বার করিয়া জপ করিত। সে যে এ রকম করিত অহা দেবতুষ্টির উদ্দেশ্যে নয়, শুদ্ধ মায়ের আদেশ বলিয়াই তাঁহার তৃপ্তির জন্য করিত। অথচ মা এ সব দেখিতেও আসিতেছেন না, সে কথাও সে জানে। পিতৃ-সম্বন্ধে অনেক দিন হইতেই অজিত মনের রাশখানাকে টানিয়া ধরিয়াছিল। পিতার কথা লইয়া মনের মধ্যে নাড়া-চাড়া করিতে গেলেও, চারিদিকের আঘাতদ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে চিত্ত-বীণার তার কাটিয়া যাছে তাহাতে আবার কিছু বেসুরা বাজিয়া উঠে, এই ভয়ে সে তাঁহার চিন্তাটাকে যেন একটা পাথর-ঢাকা কবরের মত সমাহিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, এবং সাধ্যপক্ষে সেটাকে যতদূর এড়াইয়া চলিতে পারা যায়, তেমনি করিয়াই চলিত। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, অপরিচিত পিতার রহস্যময় পরিচয়কে সে অত্যন্ত ভয়ের চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অতীতের যে গৌরবোজ্জ্বল, উদার ও মহিমান্বিত পিতৃমূর্ত্তি সে মার নিকট হইতে পাইয়াছিল, সে ছবি, অরবিন্দের কনভোকেশনের ক্যাপ ও গাউন পরা সেই বি এ পাশের সময়ের ছবিটার মতই অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এখন যে পিতার পরিচয়ের দিকে তাহার আহত-অভিমানের বেদনা বুদ্ধি-বিবেকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া দেখিতে চায়, সে যেন 'এক্সরে'র মত মাংস-ত্বক সব বাদ দিয়া, শুধু অস্থি-পঞ্জরটাকেই দেখাইতে চায়। কিন্তু মানুষের মধ্যে না কি ঐ স্থানটা সবচেয়ে কুশ্রী - আর ভীষণ, কাজেই চোখ সেদিকে ফিরাইয়া আতঙ্কে আধমরা হওয়ার চাইতে দৃষ্টিটাকে অন্যত্র রাখাই সুবিবেচনার কার্য্য। সে জানিত, মা যদি তাহার এই মানস বিদ্রোহের এতটুকু খবর পান, বুক তাঁহার ফাটিয়া যাইবে। মাকে ছাড়িয়া আসিয়া অজিত মাকে চিনিয়াছে। সরল অজিত জটিল সংসারপথে পা দিয়াই আজ কুটিল হইয়া উঠিল কি? যদি তাই হয়, তবে তার জন্য একমাত্র ভাগ্যই তাহার দায়ী।

বাসিক একজামিন হইয়া গ্রীষ্মের ছুটী আসিয়া গেল। বাড়ী ফিরিয়া অজিত মা, দিদিমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে, সগপৎ হর্ষবিস্ময়ে উভয়েই একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন "ওমা! এর মধ্যে কতখানি লম্বা হয়েছিস রে! মাগো মা! আর তেমনি কি রোগা হয়েছিস! ও অজিত! অমন হলি কি করে রে! পেটভরে খাস না বুঝি?"

জগদ্ধাত্রী সুন্দরীর বুকের অসুখ শীতে কম থাকিয়া আবার গ্রীষ্মের দিনে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। অজিতের কুশল প্রশ্নের উত্তরে তিনি বড় দুঃখের একটি ফোটা হাসি হাসিয়া করুণ কণ্ঠে জবাব দিলেন, "কেমন আর আছি দাদা! দেখ্‌চোই তো দামড়াগাছিয়া কচুলের মত আধপোড়া হয়েই রইলুম! বাঁচবোও না, মরবোও না, শুধু তোমাদের জ্বালাবো।" শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া দুটি বিন্দু অশ্রু গড়িয়া পড়িল। অজিত তখনি সযত্নে কোঁচার খুটে উহা মুছাইয়া দিয়া ধারে ধারে পাখা খানি তুলিয়া লইয়া বিছানার একধারে বসিল। চেঁচামেচি করিয়া উহাঁর এমন কথারও কিছুমাত্র প্রতিবাদের কথা কহিল না। দেখিয়া মনোরমা সবিস্ময়ে মনে-মনে বলিল "অজু এখন সত্যি সত্যি বড় হয়ে গ্যাছে। কিন্তু ওর মুখখানি অমন গম্ভীর দেখলে আমার বুক যেন কড়কড় করে ওঠে। ও যে আমার বড় ছেলেমানুষ।"

(ক্রমশঃ)

স্মরণে

[শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ]

১

যদি কভু পথ ভুলে, কভু আনমনে,
অজানা গোপন তব হৃদয়-দুয়ারে—
খুঁজিতে আসিয়া মোর মানস-প্রিয়ারে—
অজ্ঞাতে পশিয়া থাকি নিঃশঙ্ক চরণে—

তারি স্মৃতি জেগে রবে বিশ্বমাঝে আজ ?
বাজিবে না হৃদিতন্ত্রে আর কোনো সুর—
অতীতের দীপ্তজ্বালা করি দিয়া দূর—
মল্লার রাগিণী স্নিগ্ধ—দীপকের মাঝ ?

আজি তাই ভিক্ষা মাগি ও কম চরণে—
অনন্ত বিস্মৃতি এক অনন্ত মরণে !

মালাগাছি দূরে ফেলা গন্ধ সাথে তার,
পথ-রেখা মুছে ফেলা আঁধারের রাতে ;
মরণেতে বিসর্জ্জিয়া স্মৃতি গুরুভার,
উপাড়ি কামনা-বীজ প্রণয়ের সাথে।

২

তোমারি সাথে এই নিগূঢ় পরিচয়,
নূতন ক'রে এ যে হৃদয়-বিনিময়।
এ নব পরিচয়ে বলিতে পারি আজ
পুরানো কথা যত জাগিছে স্মৃতিমাঝ—
কবে সে মধু-রাতে বিফলে কতবার
তোমারি আঙ্গিনাতে মানস-অভিসার—
বুঝিবে তুমি সেই বিরহ রজনীর
কত না অনুতাপ, বেদনা সুগভীর ?

কোথায় আছ তুমি আজি এ বরষায়
মরম ব্যথা কার স্বপন মাঝে ভায়—
ভাষাতে যে কথা ফোটেনি কোন দিন,
অধর-কোণে এসে হ'য়েছে মনোলীন—
বাজে গো যদি সেই সুরটী হৃদিমাঝ
পত্র পরিচয়ে বুঝিবে তুমি আজ ?

৩

পথেরি পানে চেয়ে
কাটিছে সারা বেলা,
স্মৃতিটী নিয়ে শুধু
আপন মনে খেলা।
বাঁশীটি কোথা আজি
তুলিছে নবতান,
কণ্ঠ আনমনে
গাহিছে নব গান ;
মিলন-নব-হাস
জাগে কি তারি মাঝ—
প্রবাস-স্মৃতিকথা
বরষ পরে আজ ?

বাঙ্গালীত্ব ও মনুষ্যত্ব

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

বাঙ্গালী আমরা বড় ভাবপ্রবণ জাতি। আমাদের প্রাণ সরস, কোমল,—মস্তিষ্কের রহস্যোদ্ভেদ-শক্তি সূচ্যগ্র-তীক্ষ্ণ। যে তথ্য যেমনই হউক, তাহা অবগত হইতে পারি; যে তত্ত্ব যেমনই হউক না, হৃদয়ঙ্গম করিতে দেরি হয় না। মোটের উপর আমরা বেশ;—দেখিতেও বেশ, শুনিতেও বেশ, পরিচয় দিতেও বেশ। বাহিরের দিক হইতে অশোভন কিছুই নাই,—বরং তদ্বিপরীত। আকুমারিকা-হিমাচল ভারতের লোকের মনে আমাদের উপর একটা শ্রদ্ধার ভাবই জাগিয়া আছে।

ঘরের বাহির হইতে বাঙ্গালীকে দেখ, চমৎকৃত হইবে। বাহিরে গিয়া তাহার গুণপনা কীর্ত্তন কর, জমিবেও ভাল। সে "ইলেমদার", সে "বাহাদুর", সে "আংরেজকা গুরু।" — সত্যই তাহার মধ্যে প্রভাব উৎপন্ন করিবার এমন একটা ক্ষমতা আছে যে, তাহার আসন শুধু ভারতবর্ষেই সকলকে ছাপাইয়া যায়, তাহা নহে,—ইয়োরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পীঠস্থানের কষ্টিপাথরে ঘষামাজা হইয়াও সেই-ই ভারতের সকল প্রদেশবাসী অপেক্ষা উন্নতিশীল, শ্রেষ্ঠ, এ কথা প্রতিপন্ন হইয়া যায়;—যাইতেছেও।

তথাপি কিন্তু এততেও, হায়, বিধাতা বিমুখ। গৃহলক্ষ্মীগণ যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট মেডেলের কবচ কুণ্ডল-ধারী বংশদুলালগুলিকে বুক ফুলাইয়া ছাঁদনাতলাটুকু পার করাইবার পরই ঠেকিয়া যান,—তেমনি দেশলক্ষ্মীও তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি-সৌরভ-মণ্ডিত-মহিমা দুলালগুলিকে সগর্ব্বে সভামণ্ডপটুকু পার করাইয়া আনিয়াই ঠেক্ খাইয়া যাইতেছেন। কর্ম্ম-পদ্ধতি "রেজোল্যুসন" অবধারণার পর অবতারণা আর তাঁহাদের দ্বারা ঘটিয়া উঠে না। জীবনের যেখানটায় প্রতিষ্ঠা উপার্জ্জন করিবার কথা, সেখানে তাঁহার সন্তানগুলি অচল, তিনিও হতভম্ব।

অবশ্য আমি কোনও আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া লক্ষ্যহীন আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। বাঙ্গালীর কোনও [illegible] [illegible]জিত আমার অন্তরকে স্পর্শ করিয়া নাই। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা জাতির মূল স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছি।

ওই যে সৌম্যমুখ গম্ভীর-দর্শন বাঙ্গালী "সাহেব" বা কর্ত্তাবাবু (হঠাৎ দর্শনে সাধারণ দরিদ্র লোকের সাধ্য কি যে মুখের সম্মুখে কথা কহিতে পারে)—উঁহার বাহিরটা দেখিলে, জাপান, রুষ, মার্কিণ হইতে আরম্ভ করিয়া, অসভ্য হনলুলু পর্য্যন্ত সকলকেই একবার না একবার বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিতে হইবে। চালে-চলনে, হাবে-ভাবে, কথা-বার্ত্তায় আলাপ জমাইবার পদ্ধতিতে পৃথিবীর কোনও সারবান বলবান জাতির কাছেই বাহিরের দিকটায় ন্যূন নহেন। মেলামেশার মধ্যে যে জিনিসটাকে ইংরাজিতে "এটিকেট্" বলে, সেটাও না কি ইঁহাদের ব্যবহারে ও-সব জায়গায় নিখুঁত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে;—আদর্শ বলিলেও ক্ষতি নাই।

মাঝারি শ্রেণীর কর্ত্তা যাঁহারা,—অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বাবু-সম্প্রদায় তাঁহাদের মধ্যেও চালে-চলনে ভব্যতার যে সম্ভ্রান্ত ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহাতে মহত্ত্বের উপাদান এতখানি মিলে যে, অনুমান করিতে ইচ্ছা হয়—যেন কি একটা স্তরে আট্‌কাইয়া, তথায় সেই পদার্থটাই থমকিয়া আছে, যেটা জাতি হিসাবে জাগিবার জন্য আমাদের আজ নিতান্ত প্রয়োজন।

নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী ছোটলোক যাহারা, তাহাদের মধ্যেও সরসতা, কোমলতা, স্পষ্টতা,—সর্ব্বোচ্চ ভাবগুলি ধারণায় আনিতে সামর্থ্য পর্য্যন্ত বেশই দেখিতে পাই। মনে হয়, উপযুক্ত গুরুশক্তি উপর হইতে টানিয়া তুলিলে ইহাদের ভবিষ্যৎ সামান্য নহে।

এতগুলি উপাদান ত পুঞ্জীভূত; তবু বাঙ্গালী মনো-বৃত্তি হিসাবে নিঃস্ব কেন? তাহার হৃদয়-বীণায় এমন তার নাই কেন, যেখানে ঘা দিয়া তাহাকে খাড়া করিয়া তোলা যায়? উন্নতির সংসারে সুন্দরী বধূর যে স্থান, বিশ্ব-সংসারে তাহার স্থানটা অনেকটা সেই রকমই। আদরটুকু

সৌখীনতার খাতিরে,—পরের সখ্ ছাড়া সেটুকু পাইবার দাবী তাহার নাই,—এটা কি কিছুতেই বুঝান যাইবে না? বাঙ্গালী তর্কে খুবই মজবুত,—discussion স্রোতের জলের মত তাহার মনটাকে তর্-তর্ করিয়া ছুটাইয়া লইয়া যাইতেছে;—সেইজন্য সেখানে কিছু স্থান পায় না, এটা সম্ভব হইতে পারে।

স্থান কিন্তু কিছুকে আজ পাইতে হইবে। অবস্থা এ দিকে সঙ্গীন।

প্রথম শ্রেণীর সোমাম্য গম্ভীরদর্শন কর্ত্তাবাবু,—বংশ-গরিমারই হউক অথবা সভ্যতা বা প্রভাব-গরিমারই হউক,—উঁচু মাথাটা অর্থ-সামর্থ্যে খাড়া করিয়া রাখা, যাঁহাদের চলিয়া যাইতেছে,—আছেন বেশ। তাঁহারা যে উপরতলা;—নীচের তলা হইতে অনেক দূর কি না? সে দিকটা আছে কি ভাঙ্গিয়া গেছে, দেখিতে গেলে মাথা যদি নীচু করিতে হয়? বাপ রে! প্রাণের চেয়েও মূল্যবান্ মানের পার্থক্যটুকু তিল পরিমাণেও খসিয়া গেলেই যে সর্ব্বনাশ! যে কৃষাণ তাঁহাদের বিস্তৃত দেশের ক্ষেত্রগুলি শস্যে সু-শ্যামল রাখিত,—যে ছোটলোক সেবার সহস্র উপাদান যোগাইয়া জীবন স্বচ্ছন্দ করিত,—সে বর্ত্তমান জীবন সংগ্রামে বাঁচিল কি মরিয়া গেল, প্রয়োজন কি দেখিবার? বাঁচিয়া থাক্ টাকা। তাহার চক্‌চকে রূপের ঝম্‌ঝম্ নৃত্যশব্দে দেশদেশান্তরে যে আছে, প্রয়োজনের মুখে দ্রব্যসম্ভার যোগাইতে ছুটিয়া আসিবে!—আমি উঁচু, নীচুর সহিত আমার সম্পর্ক বড়ই যে প্রাকৃত! আমি থাকিব আমার দিব্য সুকোমল সুরম্য হর্ম্ম্যে শয়ান; আমি শুনিব কাণের কাছে প্রতিধ্বনিত চাটুবাদের কলগুঞ্জন ও করতালি!

কিন্তু হায় রে! প্রয়োজনের জিনিস জুটিবে জানি। কালিফর্ণিয়া ধান্য যোগাইবে, অষ্ট্রীয়া গোধূম যোগাইবে, ল্যাঙ্কেশায়ার বসন যোগাইবে! আনাজ, তরি-তরকারি পর্য্যন্তও একদিন বরফের বাক্‌সবন্দী হইয়া জাপান অথবা বাটাভিয়া হইতে বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইবে;—আটকাইবে না তাহাও জানি। কিন্তু দেশের এই মুমূর্ষু ছোটলোকগুলি যে হৃদয়ের সম্পর্কে তোমার জন্য তাহা উৎপন্ন করিত, সে হৃদয়ের সম্পর্ক কি ঐ বিদেশীদের সহিত পাতাইতে পারিবে? বণিক কি কোনও দিন সেবক হইয়া তোমার কাছে ধরা দিবে? তাহাদের লোভটাকে তোমরা কি কোন উপায়ে তোমাদের উপর ভক্তিতে রূপান্তরিত করাইতে পারিবে? সে কি কোনও দিন তোমার বাধ্য হইবে? তোমায় মমতা করিবে?

যতই দেশের শূদ্রশক্তি ভিতর হইতে স্তিমিত হইয়া আসিতে থাকিবে, বণিকশক্তি ততই আপনার উপযোগিতা প্রভাবের ভাবে বিস্তার করিতে-করিতে স্পর্দ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। সে তাহার লোভ এমন বাড়াইয়া তুলিবে যে, সে হুতাশনের আহুতি যোগাইতে বড় ঘর-ওয়ালার অর্থ-সামর্থ্য নিঃশেষ হইবেই। জানি না, মানের সঙ্গে প্রাণ তাঁহাদের ঠেকিবে গিয়া কোথায়!

তাঁহাদের মনের সমস্ত ধারা যে দিকে গিয়াছে, তাঁহাদের মানের সমস্ত আদর্শ যে দিকে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের প্রাণের সমস্তটা যেখানে আপনাকে পরিতৃপ্ত, সার্থক ভাবিতেছে, সে দিক হইতে ফিরিবার জন্য প্রয়োজনের তাগিদ পড়িতেছে, এটা কি আজ তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে না?—হইবে কি নীচের তলার ভিত্তিমূল ধসিয়া স্বয়ং বিরাট মহিমাশুদ্ধ যেদিন হুড়মুড় করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিবেন সেই দিন?

তার পর, মাঝারি শ্রেণীর কর্ত্তাদের বলিবার অনেক আছে। তাঁহারা উপরতলা বটে, আবার নীচের তলাও। অভিমানে তাঁহারা উপরতলার উঁচু মেজাজ লইয়া, চারি দিকে চাহিয়া, নাসিকা সীটকারের সহিত ফুৎকার করিতেছেন। আর অক্ষমতায় অপমান-মৌন অন্তরাত্মাকে ভিতরের দিকে কুঞ্চিত করিতে-করিতে, নীচের তলার ভাগ্যকে বরণ করিয়া, অস্তিত্বের প্রায় শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন বলিলেই হয়। বৈরাগী ভারত মুক্তিমার্গের অনুসরণ করিয়াছিল। আজ অভিমানী বাঙ্গালী অন্তর্ধান-মার্গের অনুসরণ করিয়াছে।—এ মার্গের লক্ষ্যস্থল মৃত্যু!—জাতি হিসাবে extinct হওয়া।

ঐ যে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী দিবসের একমাত্র আহার তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, সারসের গতিভঙ্গীর অনুকরণে ঐ দীর্ঘ-দীর্ঘ পদক্ষেপ,—ও কোথাকার অভিমুখে? অফিস। জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র। তাঁহার ঘরের সতী-সাধ্বী সীমন্তিনীর মত তাঁহারও ওই জীবন-বিকাশের স্থানটিতে আবরু রাখিতে

হয়, পর্দ্দা মানিতে হয়,—লজ্জা, সরম,ভয়, মান্য সবই রাখিয়া চলিতে হয়। আবার সেখানে মধ্যাহ্নে একটু কাজের ভিড় হাল্‌কা হইলে, সেই সময়ে নিঃশ্বাস লইবার জন্য, সখীতে-সখীতে বিশ্রম্ভালাপের ন্যায় সভয়,সতর্ক, অস্ফুট হাস্যকৌতুকময়ী আলাপ-প্রলাপটুকুও না কি আছে, তাও শুনিতে পাই। ঘরের মধ্যে অসার, নিস্তেজ, অবকাশটুকুর অদ্ধাংশের উপর শয্যাশায়ী অথবা অলস সুখাসনে উপবিষ্ট! বাহিরে স্তম্ভিত স্তিমিত কর্ম্মচাঞ্চল্য! এই জাতিটির মনস্তত্ত্ব বিশেষ রূপেই আলোচনা করিতে আমার ইচ্ছা হয়! ইহারা কোন্ ভাবে ভাবুক, কোন্ রসে রসিক, কোন শিক্ষা-প্রণালী বা গঠনপদ্ধতিতে বিকশিত ;—আর কেমন করিয়াই বা ভাবের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিতে পারিলে ইহাদের মধ্যে নূতনের আহ্বান ধ্বনিয়া উঠিবে!

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী আপনাকে সকল হইতে স্বতন্ত্র জানে। সে মান্য চায় ; কিন্তু মানাইয়া লইবার ক্ষমতা তাহাতে নাই। তাই পরে যতটা অবজ্ঞা করে, সেটা ভুলিতে মনে-মনে আপনাকে আপনি একটা গৌরব-ভারের বোঝা বহিতে দিয়া, ভারগ্রস্ত হইয়া বসিয়া থাকে। 'আমি অমুক ঋষির সন্তান, অথবা আমি শিক্ষিত সুসভ্য ভদ্রলোক, ইত্যাদি চিন্তা দশের উপর তাহার শ্রদ্ধা-বুদ্ধি কিছুতেই জন্মিতে দিবে না। পরের শ্রদ্ধা বুদ্ধিও তাহার উপর স্থাপিত নয়। এইরূপে সেও কাহাকে শ্রদ্ধা করে না, তাহাকেও কেহ শ্রদ্ধা করে না ;—উভয়ে মিলিয়া-মিশিয়া শ্রদ্ধা-বুদ্ধিটাকেই তাহার ভিতর হইতে ঘুচাইয়া দেয়। আত্ম-সম্প্রসারণ-শক্তি শ্রদ্ধার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই শক্তিই মানুষকে পৃথিবী-বক্ষে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রতিষ্ঠিত হইবার সকল সহায় ঘুচাইয়া বাঙ্গালী দিনে-দিনে আপনার মধ্যে সঙ্কুচিত হইতেছে।

ছোটলোক সম্বন্ধে এইটুকু বক্তব্য যে, আইন-আদালত স্থাপিত হইবার পর হইতে, পিতৃ-পিতামহ-ক্রমে সঞ্চিত ভূয়োদর্শনের ফলে তাহারা ঠিক করিয়াই রাখিয়াছে যে, যাঁহাদের পেটে কালির অক্ষর আছে, সেই ভদ্রলোকের দল তাহাদের বন্ধু হইতে পারেন না ;—তাঁহাদের সহিত উহাদের ভক্ষ্য-ভক্ষক সম্পর্ক। তাহারা ইঁহাদের ভয় করে, অবিশ্বাস করে ;—প্রণতি যেটুকু করে, সেটুকু উপদেবতাকে প্রণাম করিবার মত। অন্তরাত্মাটা তাহাদের বিগড়াইয়াই আছে।

অথচ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত ছোটলোকের কতটুকু পার্থক্য! অর্থ হিসাবে, শক্তি হিসাবে, স্বার্থ হিসাবে পার্থক্যের পাকা বনীয়াদ কিছুই নাই। বিদ্বেষ-বুদ্ধিমূলক এ পার্থক্য-জ্ঞান বাঙ্গালীকে দিন-দিন নিঃস্ব করিয়াছে। উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক, বড়ভাই-ছোটভাই সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াই স্বাভাবিক। পার্থক্যটুকু তবেই মধ্যবিত্তকে সত্যকার উচ্চ আসন দিবে। এ মঙ্গল-বুদ্ধি আজ কোথায় গেল!

সত্যই বাঙ্গালায় অদূর-ভবিষ্যতেই এই মঙ্গল-বুদ্ধির উপর ভদ্রলোক-ছোটলোকের সম্পর্ক স্থাপিত করিতে হইবে। এই পাকা ভিত্তিমূলে জাতির জীবিকা, শিক্ষা, সভ্যতা সমস্তকেই নূতন করিয়া গাঁথিতে না পারিলে পরিত্রাণ নাই। আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব।

ভদ্রলোক বলিতে শিক্ষাভিমানী, সভ্যতাভিমানী সকলকেই বুঝাইতেছে। জাতিভেদের কথার এখানে কোনও প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্ব্বিশেষে ভদ্রলোক ছোটলোক বলিয়া দুইটা জাতি যে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে সে ত' দেখিতেই পাইতেছি। ছোটলোকের মধ্যে কেহ আমার এ প্রবন্ধের পাঠক নহে জানি। যাহা ভদ্রলোককে বলিবার, তাহাই এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিব। ভদ্রলোক বলিতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বা বৈশ্য নহে ;—যে লেখাপড়া শিখিয়াছে, লেফাফা দুরস্ত হইয়া আদব কায়দা অভ্যস্ত করিয়া লইতে পারিয়াছে, তাহাকেই ও-নাম দিতে হইবে। ইংরাজি শিক্ষা, আর বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রভাব মানুষের মধ্যে আসিলে, গণতন্ত্রের ভাব প্রবল হইবেই,—হইয়াছেও। আর এটা লক্ষণ যে মন্দ, তাহাও নহে। এ যুগে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকুন, কায়স্থ কায়স্থই থাকুন, শূদ্র শূদ্রই থাকুন। আপন-আপন জাতি নিজেদের ঘরের ভিতরকার বৈশিষ্ট্য ;—বাহিরে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের উপায় নহে। বাহিরে সকলকেই চরিত্র ও গুণপনাতেই প্রভাব বিস্তার করিয়া লইতে হইবে। তৈরী প্রভাব উপভোগ বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম্ম নহে।—এই কথাটা স্মরণ রাখিয়া সামাজিক গোলমাল-গণ্ডগোল আপনা-আপনিই থামাইয়া লইতে হইবে। সকল জাতিকে এক করিয়া সমাজ-সংস্কার করিতে হইবে না ;—এক মনুষ্যত্বের শিক্ষা সকল জাতির মধ্যে সমভাবে বিস্তার করিয়া, আমাদের

সমাজকে শিক্ষিত করিয়া লইতে হইবে। এ ব্যবস্থায় কার্পণ্য করিলে বিপদ অনিবার্য্য।

ভদ্রলোক ছোটলোকের গুরু! তাহাদের যে জীবনে প্রয়োজন, গুরুগিরি করিয়া সেই জীবনটাই গড়িয়া দিতে হইবে।—এ জীবনটা আধ্যাত্মিক নহে, সে সকলেই জানেন। সুতরাং গুরুগিরির একটা শিক্ষা চাই। গুরুকে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি শিখিয়া নিজের মস্তিষ্কের সহিত তাহাদের হাত দুখানা এক দেহের অঙ্গের মতই জুড়িয়া ফেলিতে হইবে। শুধু দেশের ধনবৃদ্ধির উপায় চিন্তা করিলে চলিবে না,—ধনবৃদ্ধি করাইয়া লইতে হইবে। তবেই গুরুগিরি সম্ভব। তাঁহারা বড়ভাই, ছোটর সমস্ত দায়িত্ব তাঁহাদের কাঁধে;—দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতিতে যথোপযুক্ত পর্য্যবেক্ষণের অভাবে তাহারা উজাড় হইলে সে লজ্জা তাঁহাদেরই।

কাহারও এতক্ষণে এমনটা মনে হওয়া বিচিত্র নহে যে, এ সকল প্রস্তাবের মত কার্য্য যদি হয়, তবে ভদ্রলোকের ভদ্রলোক হইয়া বসিয়া থাকা চলে কই? আর ছোটলোককেই বা ছোটলোক করিয়া রাখা চলে কই?—এও ত এক রকম ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া একাকার করিবার মতলব। মতলব অবশ্য প্রকৃতপক্ষে কি, সে আমি স্পষ্ট করিয়াই বলিতে চাই। আমি দেখিতেছি, সকলি ত নিরাকার হইতে বসিয়াছে। তাড়াতাড়ি একটা আকার খাড়া করিয়া না বসিলে, বাঙ্গালীর অস্থি পঞ্জর মিউজিয়মে গিয়া উঠিবে। ভদ্রলোকের ভদ্রতার রীতিনীতি কতটা, সে এখন ধামা-চাপা থাক,—আগে লোক বলিয়া লোকের মধ্যে সে যেমন করিয়া পারে প্রতিষ্ঠিত হউক।

মালকোঁচা-আঁটা পাগড়ি-মাথায় ঐ যে বিকানিরী, বা ভাটিয়া বণিক, যে আদব-কায়দা, বিধি-সহবৎ কিছুরই ধার ধারে না—তোমাদের কলিকাতার সামান্য মুদিখানা, পান-সরবতের দোকান পর্যন্ত ঐ যে বিভিন্ন প্রদেশবাসীর করগত। ঐ যে বড়বাজারের মহাজন প্রকাণ্ড জুড়িতে রাস্তা কাঁপাইয়া চলিয়াছে! সবই ত আজ চক্ষের সম্মুখে স্বপ্ন! চমৎকার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া বসিয়া আছে!—বাঙ্গালী উহাদের এখনও মুখ ভেঙ্গাইতেছে, উহাদের মেড়ুয়াবাদী ভূত বলিতেছে; আবার যখন আপনার বাসগৃহখানি উহাদের কাছে চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রয় করিতে পাইতেছে, অথবা উহাদের একটা বড় পাবলিক দানে কিছু প্রাপ্তির আশা করিতেছে, তখন 'সেলাম' সাহেব 'ভাই সাহেব' বা 'বাবু সাহেব' বলিয়া কম্পিত হস্তখানি প্রসারণ করিতেও ছাড়িতেছে না। বাঙ্গালী ভদ্রলোক; উহারা এখনও, বাঙ্গালী যে অর্থে ভদ্রলোক সে অর্থে ভদ্রলোক, হয় নাই।—উহাদের আছে টাকা, আর টাকা না হইলে ভদ্রয়ানা রক্ষা হয় না। বাঙ্গালীর টাকা নাই। টাকা কিসে আসে, কিসে থাকে,—সেও বাঙ্গালী জানে না। অথচ ভদ্রয়ানী বাঙ্গালীর হাড়ের সামগ্রী। সে কি করিবে! এই কলিকাতায়, এই বিংশ-শতাব্দীতে, টাকা হাতে আসিবার তাহার সকল দরজা বন্ধ,—সে ভদ্রয়ানা সামলায় কি করিয়া?

এই টলটলায়মান ভদ্রয়ানাকে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া সে এখনও দেখুক, এখনও বিচার করুক, ভদ্রয়ানা কাহাকে বলে! এই দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা, উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে এই অনুপযুক্ততা কেন তাহার আসিল? যাইবেই বা কিসে?

আচ্ছা, বাঙ্গালী পারে কি? বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য কি?

বৈশিষ্ট্য যে কি নয়, আর পারে না যে কি, সে স্থির অবধারণ করা সহজ নয়। বিশেষ বাঙ্গালী হইয়া সে সমাধান করা ত বড়ই শক্ত। কেবল হাতে-কলমে যে সমাধানটুকু বিধাতা জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়া করিয়া দিয়াছেন, সেইটুকুই অবলম্বন করিয়া আমাদের বিচার আরম্ভ করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, বাঙ্গালী পারে না আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াইতে; বাঙ্গালী পারে না, যেখানে বাক্য ছাড়া আর কিছুর প্রভাব দেখাইতে হয়, সেখানে জয় লাভ করিতে। এই পরাবলম্বিনী লতা কোনও সহকারকে আশ্রয় করিতে পাইলে, কুসুম-কিশলয়ে তাহার সকল অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া শোভাময়ী হইতে জানে।—ইহার মঞ্জরীগুলি স্তবকে-স্তবকে ঝুলিয়া পড়ে; ইহার নধর শাখা-প্রশাখাগুলি কোমল কান্তিতে টলিয়া, এলাইয়া, ছড়াইয়া পড়িতে জানে। শাখা-প্রশাখার যে ধর্ম্ম—চারিদিকে ঝাঁকড়া হওয়া—সে ধর্ম্ম ইহার প্রচুর। মূলের-কাণ্ডের যে ধর্ম্ম উপর দিকে খাড়া হইয়া উঠে, শত ঝঞ্ঝাবাতে আপনাকে অটুট রাখে, সে ধর্ম্মের একেবারেই এখানে অভাব। ভাবুকতার দিকে বাঙ্গালী অনেকখানি;—চরিত্রের দিক হইতে বাঙ্গালীর কোনও যোগ্যতা নাই।

বাঙ্গালীর চরিত্র নাই—বাঙ্গালা মাসিক পত্রেই এবার

কথার অবতারণা করিলাম,—এ অত্যন্ত অশোভন দেখাইতেছে। কথাটা ঘুরাইয়া লইলাম; বলিব, বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব নাই।—বাঙ্গালীত্বে মনুষ্যত্বের সংমিশ্রণ আজ চাই।

বাঙ্গালী পারে সব; কিন্তু কিছুই আজ সে করিতেছে না। মানুষে যাহা-যাহা করিয়া জগতে প্রতিষ্ঠিত, সকলই তাহাকে করিতে হইবে। তাহাকে মানুষ হইতে হইবে।

দেশের মাটী বাঙ্গালীরই। সে যদি সবল হইয়া আত্ম বিকাশ করিতে পারে, কেহই তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইতে পারিবে না। আপন দেশে বাঁচিবার অধিকার তাহার আপনারই হাতে। যে কাপড় সাতটাকা জোড়া বিকায়, সে পরের হাতে তৈয়ারী ও বিক্রির ভার আছে বলিয়াই বিকাইতেছে। যে চাউল বারটাকা মণ, তাহার আবাদ, আমদানী, রপ্তানার উপর আপনার মন নাই বলিয়াই তেমনটা হইয়াছে। দুধ-ঘি কিছুই আজ মিলিতেছে না;—দোষ কাহার? খাইবে বাঙ্গালী। খাবার তৈয়ারী ঘরে হইতেছে কি না, সেটা দেখিয়া লওয়া ভদ্রয়ানার বাহির,—ইহাই আজ তাহার ধারণা। দেহ-পুষ্টির জন্য যেগুলি প্রয়োজন, জীবন-রক্ষার জন্য যেগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য, সেগুলির উৎপাদন ও আনয়নের ব্যবস্থা, দেশের ভিতরে, স্বজাতির ভিতরে পরস্পর সেবাপ্রবৃত্তি জাগাইয়া, স্থির করিয়া লওয়াই স্বাভাবিক। সকল জাগ্রত দেশেই তাহা হইতেছে। বাঙ্গালীরও এতদিন তাহাই ছিল। বিদেশীর ব্যবসামূলক লোভের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া ও-গুলির আশা করিলে আমরা বিষ খাইব, সে আবার বিচিত্র কি?

আজ ভদ্রলোক সম্প্রদায়, এমন কি অভিজাত সম্প্রদায় পর্য্যন্ত দেশের অপর দশজন হইতে আপনার পার্থক্য ও দূরত্ব রক্ষা করাটাকেই আপনার respectibility রক্ষা বলিয়া মনে করিতেছেন। এই মোহ বিনাশের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। সম্মান ত তাহাই, পরস্পর মিলমিশের মধ্যে যেটা আপনাকে অপর পাঁচজন হইতে বিশিষ্ট করিয়া তোলে। পৃথক্ হইয়া দূরে থাকা কখনই কোন বিশেষত্ব দিতে পারে না। দেশে আমি কতটা সকলের পক্ষে উপযোগী হইয়া উঠিলাম, আমার অভাবে শত কিংবা সহস্র লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানটাই ত সম্মান। আবার সে দিন আসুক, অভিমানের তৃপ্তি অপেক্ষা হৃদয়ের তৃপ্তিই যেদিন মানুষের কামনার বস্তু হইবে।

আপনার মধ্যে স্থির উচ্চ আদর্শ, আর সেই আদর্শ-অনুযায়ী জীবনকে বিকশিত করিয়া তোলার সঙ্গে-সঙ্গে, অপরাপর সকলকে গঠন করা, ইহাই ত মনুষ্যত্ব। বাঙ্গালীর এই মনুষ্যত্বেরই আজ প্রয়োজন। বাঙ্গালীর স্বজাতীয় পণ্ডিত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন "বাঙ্গালী আত্ম-বিস্মৃত জাতি।" আত্ম-সংজ্ঞা বিস্মৃতির অগাধ জলতল হইতে উঠিয়া কবে ইহাদের আপনাকে চিনাইয়া দিবে? বাঙ্গালী আপনাকে চিনুক, আপনাকে বুঝুক, আপনাকে গড়িয়া তুলুক। নতুবা, বাঙ্গালী এই নামের মধ্যে যে গর্ব্ব আছে, সে গর্ব্বের সার্থকতা কোথায়?

পরের মধ্যে প্রভাব-বিস্তার শক্তি আমাদের প্রচুর; কিন্তু আপনার মধ্যেও যদি প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলাম, তবে ত এ প্রভাব মেরুদণ্ডহীন। শ্রদ্ধা আপনাকে করিতে হইবে। আপনার আত্ম-শক্তি স্থির সংযত প্রত্যক্ষ করিয়া, তার পর পরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ বা দৃষ্টি আকর্ষণ,—তাহার কাছে নিজেকে উপযোগী প্রতিপন্ন করা,—সেইটাই ত জয়। নতুবা তাহার যত আদরই পাই, যত সম্ভ্রমই জাগাই, সে ত' ভাঁড়ামি,—মনযোগান মাত্র। বাঙ্গালী আত্মগঠিত নহে বলিয়াই, তাহার এত এত মহদ্‌গুণ সত্ত্বেও অতি অপদার্থ জাতিতেও তাহাকে বার-বার জয় করিয়া গিয়াছে।

বিয়োগে

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

তব যৌবন হাসি ভাষা দেহ রূপ
তোমারি পূজায় জেলেছে তাহারা দপ--
তবে তুমি মনো-মন্দিরে মম আজি
ভুবন-ভুলানো রূপে আসিয়াছ সাজি।
যা নেবার তা'তো নিয়ে গেছ দুই হাতে--
ফেলে গেছ যাহা যাবার ব্যস্ততাতে,
তারা কেন হেন তপ্ত তীক্ষ্ণ বাজে
বিষ বাণ বুক-মাঝে ?
সে যে-অসংখ্য—সারাটি গৃহের কাযে।

এতদিন যারা আছিল চোখের আড়ে
শেফালির মত পড়ি একান্ত ধারে-
পাইতাম শুধু মৃদু সৌরভ যার,
পরিচয় ছিল,—গন্ধেরি সম্ভার,—
আজ তারা সব দাঁড়ায়ে দৈত্যসারি
রোষ-কষায়িত নিকাসিত তরবারি
রুধিয়া দুয়ার হানা দেয় নিশি-দিন
বিরাম-বিরতি হীন ;
স্তম্ভিত ভীত, চেয়ে থাকি আমি দীন।

আয়না দেরাজে নানাবিধ বড় ছোটো
শঙ্খের জোড়, কত সিঁদুরের কোটো।
কোন কৌটায় আঙ্গুলের দু'টী দাগে
তব আঙ্গুলের রেখাবলী আজো জাগে ;
তেলের বোতলে আছে তেল' আজো আধা,
কা'ল বুঝি আর হয় নি ক' চুল বাঁধা ?
গুছিতে, ফিতাতে, কাঁটাতে, পিনেতে, তাই
বাঁধা যে দেখিতে পাই !
চুলের বাঁধন—তাও কিগো বাঁধ নাই ?

কোচানো শাড়ীটি সংকোচে ছোট হ'য়ে
ঝুলে আলনায়--মূক প্রতীক্ষা ল'য়ে—
মেলিবে বলিয়া আপন বিপুল দেহ
তোমারে আবরি, পাবে বলি তব স্নেহ,
দুঃসহ আশে আছে প্রভাতের লাগি,
প্রভাত আসিল শ্মশান রজনী জাগি।
এখনো শেমিজে দেহ কুঞ্চনগুলি
উঁচু-নীচু হয়ে ফুলি
রেখেছে তোমার সুবাসিত ছবি তুলি।

গহনারা তব বাঁধন হারায়ে আজ
হেথা হোথা পড়ে অযতনে গৃহ-মাঝ !
তোমার তনুর অণু অণু মলা নিয়া
পরশ-স্মারক রেখেছে ভরিয়া হিয়া।
ভিজে আলতায় গিয়াছিলে কবে চলি,
আজো সেই দাগ কক্ষে রয়েছি ফলি
ম্লান জোছনায় নিশান্ত বিধু যথা।
চাবির রিঙের কথা
তাও শেষ—সেও বহিছে নীরব ব্যথা !

সরু মোটা তব চিরুনীরা অই প্রিয়ে,
গুটি কত তব কেশ সম্বল নিয়ে,
কলিজা চিরিয়া রেখেছে সিঁদুরে বাসে—
রঙীন সুরভি মূর্ত্ত স্বপনে হাসে।
শেলাই তোমার এলায়ে আসেনি আজো
দু'টি কাপড়ের অটুট বাঁধন ভাঁজ-ও !
গিয়াছে কেবল প্রাণের গ্রন্থি টুটি
চিতার ভস্মে লুটি—
চকাচকী সম দু'পারে হৃদয় দু'টি।

ইমান্‌দার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধ ক্ষণিকের জন্য গুম্‌ হইয়া রহিলেন। তার পর বিরক্তভাবে নিজের শ্মশ্রু উৎপাটন করিতে-করিতে—সুমতি দেবীর দিকে চাহিয়া,—বেশ সংযত ভাবেই স্বভাবসিদ্ধ কোমল নম্রতার সহিত বলিলেন, "তুমি তাদের ছেড়ে একলা চলে এলে কেন মা ?"

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর যতই নম্র হউক, তাঁহার দৃষ্টিতে যে প্রচ্ছন্ন উগ্রতার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সেটা সুমতি দেবীর দৃষ্টি এড়াইল না। মোক্ষদা ও ঝিএর আচরণটা তিনি বৃদ্ধের কাছে চাপিয়া যাইতেই চাহিতেছিলেন,—কেন না তিনি নিজে, তাহাদের অবহেলার উপর যেটুকু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহাই সুমতি দেবীর মতে—যথেষ্ট! প্রভু বংশের সুক্ষাদপিসুক্ষ্ম মান অপমানের প্রতি এই কর্ত্তব্যপ্রিয় বৃদ্ধ ভৃত্যের দৃষ্টি যে কত কঠোর, সেটা সুমতি দেবীর খুব ভাল রূপেই জানা ছিল। সেইজন্য ইহাঁর বিচার দৃষ্টির সামনে, তিনি অন্য আশ্রিত প্রাণীগুলির দোষ-ঘাট যথাসাধ্য ঢাকা দিয়াই চলিতেন। আজও তাহাই করিতে চাহিতেছিলেন ;—কিন্তু তাহার ফলটা বড় বিপরীত দিকে গিয়াই দাঁড়াইতেছে দেখিয়া, তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি কি ভাবিয়া লইলেন কে জানে,—তার পর বেশ শান্ত ভাবেই সংক্ষেপে মোক্ষদা ও ঝিকে ছাড়িয়া আসিবার কারণটা ব্যক্ত করিলেন ;—সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও বলিলেন যে, তাহারা শীঘ্রই আসিবে বলিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু তিনি তাহাদের অপেক্ষায় বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিলেন না,—যেহেতু, ঠাকুর-বাড়ীতে আজ অতিথি-অভ্যাগত বৈষ্ণবগণের কার্য্য-ব্যস্ততার অত্যন্ত ভিড়।

সুমতি দেবী সঙ্কোচ কাটাইয়া, বৃদ্ধের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে কোন কার্য্য-ব্যস্ত বৈষ্ণবের নামোল্লেখ করিলেন না।

হঠাৎ পুত্রের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "তুই এ সময় সেখানে কি করতে গিয়েছিলি ?"

অন্য সময় হইলে, পিতার এই অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নটা ফৈজু সরল চিত্তেই গ্রহণ করিতে পারিত ; কিন্তু আজ পারিল না ! আজ প্রথমেই পিতার সেই অন্তর্ভেদী সংশয়ের দৃষ্টি তাহার চিত্তে বিদ্রোহের তাণ্ডব জাগাইয়া দিয়াছিল ; তার উপর এই প্রশ্নে একেবারে আগুন জ্বালাইয়া তুলিল !—অতি কষ্টে আত্মদমন করিয়া পরিষ্কার স্বরে বলিল, "নজিরুদ্দীনকে খুঁজতে গিয়েছিলুম—" কিন্তু দৃষ্টি তাহার নত হইয়াই রহিল। পাছে তাহার দৃষ্টির প্রচ্ছন্ন বিরক্তি-অসহিষ্ণুতা পিতার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, সেই ভয়ে সে চোখ তুলিতে পারিল না।

বৃদ্ধ তীব্র কটাক্ষে চাহিয়া সন্দিগ্ধ স্বরে বলিলেন, "নজিরুদ্দীনকে খুঁজতে ? ঠাকুর-বাড়ীর মধ্যে ?"

প্রাণপণে ধৈর্য্য বজায় রাখিয়া ফৈজু ধীরভাবে বলিল, "ঠাকুর-বাড়ীর ভেতর কেন যাব ? ঠাকুর বাড়ীর চলন-ঘরে একজন আলখাল্লা-পরা বাউল দাঁড়াইয়া ছিল, তাকেই জিজ্ঞাসা করছিলুম্‌—পেছনে আড্ডা-বাড়ীতে নজরু আছে কি না ?"

সুমতি দেবী একটু বিব্রত হইয়া বলিলেন, "আমি সেইখানেই—মাঝের দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম, ফৈজুর সাড়া পেয়ে তাই চলে এলুম,—বাড়ী চল সর্দ্দার—" সুমতি দেবী কথাটা শেষ করিয়াই অগ্রসর হইয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধ আলো হাতে লইয়া মাঝে চলিতে লাগিলেন ; ফৈজু চলিল সকলের পিছু। চলিতে চলিতে বৃদ্ধ বলিলেন, "নজরুর কাছে তোর কি দরকার ছিল রে ফৈজু ?"

ঠোঁট কাম্‌ড়াইয়া, অসন্তুষ্ট ভাবে ফৈজু ব'লল, "আমার নিজের দরকার কিছুই না, নজরুর ছেলের অসুখ........ তাই.......।"

তাই যে কি, ফৈজু সেটা আর সুস্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিল না, বৃদ্ধও সেটা জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন না। বোধ হইল, তিনি আর একটা কিছু ভাবিতে-ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখের গাম্ভীর্য্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল।

তিনজনে নিঃশব্দে বাড়ীতে আসিয়া ঢুকিলেন।

পিসিমা রোয়াকের উপর গড়াগড়ি দিয়া, শুইয়া-শুইয়াই মালা জপিতেছিলেন। সুমতি দেবী আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া, পায়ে হাত দিয়া—যেন কিছুই হয় নাই, এমনি প্রসন্ন, নির্ব্বিকার দৃষ্টি তুলিয়া, বলিলেন, "গায়ের জ্বালাটা এখন কমেছে পিসিমা ?"

"আর বাছা, যে পিত্তির জলন্" বলিতে-বলিতে পিসিমা উঠিয়া বসিলেন। সর্দ্দার ও ফৈজু পিছনে আসিতেছে দেখিয়া, গায়ের কাপড়টা টানিয়া গুছাইয়া লইয়া বলিলেন, "সর্দ্দার, বাড়ী যাব বলে বেরিয়ে আবার ফিরলে যে ?"

সর্দ্দার "হুঁ" বলিয়া অদূরে রোয়াকের উপর বসিলেন, ফৈজু তাঁহার পায়ের নীচে সিঁড়িতে বসিয়া, মাথা হেঁট করিয়া শান-বাঁধান উঠানটা দেখিতে লাগিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সর্দ্দার বলিলেন—দিদিঠাকুরুণ্ আপনি নিজে যেখানে যেতে পারবেন না, সেখানে যার-তার সঙ্গে ছোটমাকে কেন পাঠান বলুন দেখি ? বিশেষ ঐ মেনীর মা টেনীর-মার সঙ্গে ? জানেন, ওরা কি রকম ধরণের লোক, তবু আপনাদের কি যে বিশ্বাস—হুঁ।"—বৃদ্ধ বিরক্ত ভাবে থামিলেন।

শঙ্কিত হইয়া পিসিমা বলিলেন, "কেন, কি হয়েছে ? তারা কই ?"

রুক্ষ-শ্লেষের স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন, "তারা এখন ঠাকুর-বাড়ীতে—ঠাকুর-ই দেখ্ছেন্! তাঁদের ঠাকুর দেখা এখনো শেষ হয় নি! লোকে ষোল-আনাই পুণ্যি করে,—কিন্তু তাঁদের পুণ্যিটা বত্রিশ-আনা হওয়া চাই তো! কোনখানে এতটুকু কসুর থাক্‌লে চল্‌বে না! তাঁরা চান-জল নেবেন, ফুল নেবেন, পেসাদ নেবেন, আলাপীদের সঙ্গে সাত-সতের খবর লেনা-দেনা করবেন্, তবে তাঁদের ঠাকুর দর্শন ঠিক হবে, না হলে হবে না!"—একটু থামিয়া উগ্র ভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, কঠোর উত্তেজনার সহিত বলিলেন, "এত বড় বুকের পাটা তাদের, যে, ছোটমাকে একলা দোর-গোড়ায় দাঁড় করে রেখে, তারা দুজনেই পূজারীকে খোঁজবার ছল করে, সরে পড়ে! আজ আসুক তারা,—আমি এইখান থেকে তাদের দূর করে দিয়ে, তবে এ জায়গা ছেড়ে উঠ্‌ব! তারা জানে না, কোন্ ঘরে তারা চাকরী কর্‌তে এসেছে ?.........যত মনে করি ভালমানুষীর ওপর চল্‌ব, ততই যে দেখ্‌ছি বাড়াবাড়ি হয়ে উঠ্‌ছে!"

পিতার প্রত্যেক কথাটির ভিতর হইতে ফৈজু নিজের জন্য অন্তরে-অন্তরে, 'অনেক কিছু' সংগ্রহ করিয়া লইল। তাহার মাথাটা ক্রমশঃই নিজের পায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল।

পিসিমা বহুদিন হইতেই এই সংসারে গৃহিণীপনা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার গৃহিণীত্বের যা-কিছু বিশেষত্ব, সে শুধু সংসারের সকলকে 'পেট ভরিয়া খাওয়ান'র ব্যবস্থাতেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল,—অন্য সকল ব্যাপারে তিনি নিতান্তই ঢিলা প্রকৃতির মানুষ,—বিশেষ ঝি-চাকরদের অবাধ্যতা সংশোধনে, শাসন-কসন প্রয়োগে, তিনি সম্পূর্ণ ই অপারগ! এ সকল বিষয়ে তিনি ভ্রাতুষ্কন্যা সুমতি দেবীর বুদ্ধি-বিবেচনার উপরই একান্ত ভাবে নির্ভর করিতেন। সুমতি দেবী, পিসিমার মত অতখানি ঢিলা প্রকৃতির মানুষ না হইলেও, ঝি চাকরদের সহিত বকাবকি করিতে আদৌ ভালবাসিতেন না,—ঝি চাকরদের ত্রুটি তিনি নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতেন, দু-পাঁচবার মৃদুভাবে সতর্কও করিয়া দিতেন; তার পর নিষ্ফল হইলে—সর্দ্দারকে ডাকিয়া বলিতেন অন্য লোক দেখিতে,—আর গোমস্তাদের ডাকিয়া বলিতেন, মাহিনা চুকাইয়া দিতে! অবাধ্য ঝি-চাকররা এমনি ভাবে শিষ্টাচারের সহিত এ বাড়ী হইতে বিদায় লাভ করিত।

আজ সর্দ্দার কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া, নিজেই একসঙ্গে দুই-দুইটা মানুষকে বিদায়দানে উদ্যত দেখিয়া, পিসিমা বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। সুমতি দেবীর মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, তিনি সম্পূর্ণ শান্ত-শীতল ভাবে চুপচাপ বসিয়া আছেন। তাঁহার জন্যই এই অপ্রীতি-কর কাণ্ড ঘটিতে চলিয়াছে, অথচ তাঁহার কোন সাড়াশব্দ নাই দেখিয়া পিসিমা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। নিরুপায় ভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া—শেষে আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "অবিশ্যি অন্যায় তারা করেছে বটে, তা' সর্দ্দার তুমি আজকের মত তাদের............ওর নাম কি, একটু ধমকধামক দিয়ে যাও। এখনকার দিনে আর লোকজন রেখে সুখ নাই, যে লন্ধায় আসে সেই তো রাবণ হবে! কি আর করা যাবে বল.......আর হাজার লোক

ভাদ্দর মাস, এখন শিয়াল-কুকুরকে বাড়ী হতে তাড়াতে নাই!"

বাধা দিয়া সর্দ্দার তীব্রস্বরে বলিলেন, "শিয়াল-কুকুর বাড়ী থেকে তাড়াতে নাই,—কিন্তু গোখ্‌রো সাপ তাড়াতে আছে! কি বলেন দিদিঠাকরুণ, যে নিমকহারাম ঝি-চাকর মনীব-গোষ্ঠির মান-ইজ্জতের দিকে নজর রাখে না, তাদের জন্যে আবার ভাদ্দর মাস, পৌষ মাস!" বৃদ্ধ উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—অধিকতর তীব্র স্বরে বলিলেন, "ও সব নিমকহারাম ঝি চাকরদের এক লহমা বাড়ীতে ঠাঁই দেওয়ার চেয়ে গোখরো কেউটে সাপ এনে বাড়ীতে পুষে রাখা ঢের ভাল।"

ঐ উপর্য্যুপরি উচ্চারিত নিমকহারাম শব্দটা ফৈজুর মাথায় যেন বজ্রাঘাতের মত বাজিল! তাহার বেশ বোধ হইল, পিতা যাহাদের উপর কটাক্ষপাত করিয়া এ কথাটা বলিতেছেন, ফৈজুও তাহাদের মধ্যে একজন! ফৈজুর সমস্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দগ্ধ করিয়া মনের মধ্যে যেন দারুণ হুঙ্কারে দাউ দাউ করিয়া দাবানল গরজিয়া উঠিল! হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কাহারো দিকে না চাহিয়া, মাঝখান হইতে মাথা নোয়াইয়া সে বলিল, "আমায় ভোরেই বেরুতে হবে, এখন তা'হলে আসি।"

সে দুয়ারের কাছাকাছি হইয়াছে, এমন সময় মোক্ষদা ও ঝি বাড়ী ঢুকিল। পথ দিবার জন্য ফৈজু পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মোক্ষদা কোল হইতে কাল কুচ্‌কুচে নাদুস্‌নুদুস গড়নের মেয়েটিকে নামাইয়া, ঝঙ্কার হানিয়া বলিলেন, "হেঁগা দিদি, তোমার কি আর একটু ত্বর সইল না?"

সর্দ্দার বাধা দিয়া দৃঢ়, সংযত কণ্ঠে বলিলেন, "না, সইল না। যাও বাছা, তোমাদের যার যা জিনিসপত্র আছে, নিয়ে এখনি যে যার আপনার বাড়ীতে চলে যাও, আমি এখনি অন্য লোক ঠিক করে আস্‌ছি—তারা কাল সকাল থেকে কাযে আস্‌বে। তোমাদের দ্বারা এ বাড়ীর কায আর হবে না।"

দারুণ আক্রোশে মোক্ষদা দিদির চক্ষু দুটা ধবক্ ধবক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! দুহাত নাড়িয়া কর্কশ চীৎকারে বলিলেন "আমাদের দ্বারা হবে না? তবে হোল কি করে এত দিন? তোমার হুকুমে আমরা যাব না কি? মুনীবদের জবাব দিক, যাচ্ছি। তুমি বল্‌বার কে?"

সুমতি দেবী রুষ্ট স্বরে বলিলেন, "আমার বাবার আমলের লোক,—এ বাড়ীর পঁচিশ বছরের পুরোনো লোক;—মোক্ষদা দিদি, তুমি একটু মুখ সামলে কথা কও,—মনে রেখো, আমাদের ভালমন্দটা সর্দ্দার আমাদের চেয়ে বেশী বোঝে।"

মোক্ষদা দিদি চেঁচাইয়া বলিলেন—"তা সে জানি, জানি, ওরাই তোমাদের সব, সেটা খুব ভাল করেই জানি! নইলে।"

বাধা দিয়া সর্দ্দার বলিলেন, "ত্থাখো, মায়ের জাত তোমরা,—মান রেখে কথা কইছি। শোন, এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, অত চেঁচিও না। ঠাকুরবাড়ীর সেই হোটেলখানায়, যত রাজ্যের ভদর-কুটে জংলী-গুলিখোর জুটে যে চেঁচামেচিটা করে, সে চেঁচামেচিটা এখানে চল্‌বে না, বুঝ্‌লে, বাড়ী যাও।"

মোক্ষদা সর্দ্দারের মুখপানে একটা বঙ্ক-কটাক্ষক্ষেপ করিয়া, উদ্ধতভাবে বলিল, "এ কি হিঁদুর বাড়ী, না আর কিছু। বাড়ীর ভেতর বোষ্টুমের নিন্দে, বোষ্টুম ধর্ম্মের নিন্দে, আর সবাই কাণ পেতে বসে তাই শুন্‌ছে? এ গাঁয়ের কি আর ভদ্দত্ত আছে? থাক্‌তো যদি আজ এখানে মানুষের মত মানুষ কেউ, তা হলে—"

"তা হলে, হাঁ।" বাধা দিয়া, শান্তকণ্ঠে সুমতি দেবী বলিলেন "হাঁ, যিনি যথার্থ বৈষ্ণবধর্ম্মকে প্রাণের নিষ্ঠায় ভালবেসে পূজা করেন, ভণ্ড বৈষ্ণবদের উচ্ছৃঙ্খলতা, অনাচার—ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অত্যাচারকে তিনি অন্ধ ভক্তির খাতিরে চোখ বুজে প্রণাম করবেন না,—এ আমি নিশ্চয় বল্‌ছি! তবে যার নিজের ভেতর সত্যনিষ্ঠার জোর নাই, নিজের ভণ্ডতাকে ঢাক্‌বার জন্যে যিনি পরের ভণ্ডামীকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেন, তাঁর কথা আলাদা!"

সুমতি দেবী কি বলিলেন মোক্ষদা সেটা আদৌ বুঝিতে পারিল কি না, বলা শক্ত; কিন্তু নিশ্চয় বুঝিতে পারিল, সে কথাগুলার মধ্যে একটা দুঃসহ গালাগালি প্রচ্ছন্ন আছে-ই! নিষ্ফল আক্রোশে অধীর হইয়া, ক্ষিপ্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া, দুহাত নাড়িয়া বলিল, "আমি অত পুঁথী-কেতাব পড়ে লাট-বেলাটের দরবারের খবর রাখি না,—পিথিমি সুদ্ধু বোষ্টুম ভণ্ড কি অভণ্ড তা আমি—"

রুক্ষ কণ্ঠে সুমতি দেবী বলিলেন, "পৃথিবী সুদ্ধ বৈষ্ণবের

কথা হচ্ছে না মোক্ষদা দিদি, কথা হচ্ছে আমাদের ঠাকুর-বাড়ীর মোহন্ত, আর তার চেলা-চণ্ডদের খবর। এর মধ্যে পৃথিবী সুদ্ধ লোককে টেনে আনবার কোন দরকার নাই। তোমরা খুব বেশী কথা কইতে পার, তা আমি খুব জানি; কিন্তু আমার সামনে বাজে বোক না,—থাম।"

মোক্ষদা দিদি উদ্ধত ভাবে আর একটা কি কথা বলিতে যাইতেছিলেন, সদ্দার দুয়ারের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন "চলে যাও, আর নয়!"

মোক্ষদা নিরুপায় হইয়া একবার এদিক-ওদিক চাহিলেন; তারপর চোখে আঁচল দিয়া, বার দুই ফোঁশফোঁশ করিয়া,—সহসা পিছন হইতে মেয়েটিকে টানিয়া নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া, তাহার মাথায় ডানহাত রাখিয়া, নাকি কান্নার সুরভরা কণ্ঠে বলিলেন, "আমার এই 'নোক্ষ' টাকার ছেলে পিসিমা, এর মাথায় হাত রেখে আমি বলছি, আমি কোন দোষে দুষী নই।"

সুমতি দেবী স্তম্ভিত-নয়নে একবার সেই মেয়েটির পানে, একবার তাহার মার পানে চাহিলেন; কিন্তু মোক্ষদার নির্লজ্জ প্রতিজ্ঞা থামাইতে পারিলেন না,—কি একটা অব্যক্ত ক্ষোভে তাঁহার কণ্ঠ যেন সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল। আড়ষ্ট হইয়া তিনি মোক্ষদার অস্বাভাবিক জ্বালাভরা চোখ দুইটার পানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন!

পিসিমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আহা, কর কি মোক্ষদা, ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি করো কেন বাপু? থামো না, ওতে যে ছেলের অকল্যাণ হয়!"

মোক্ষদা যেন এই আদরের গৌরব টুকুই খুঁজিতেছিলেন—ফুলিয়া উথলিয়া উঠিয়া—একেবারে উচ্ছ্বাস ভরে ক্রন্দন জুড়িয়া দিলেন—"আমার কত দুঃখের মরা-হাজা ছেলে, আজ আদর করবার লোক নেই তাই,—নইলে আমার 'নোক্ষো' টাকার ছেলে, কি বল্‌ব পরের দুয়োরে খেটে খাচ্ছি, মিনি দোষে তাই অপমান সইতে হচ্ছে—কথা কবার নোক নেই! আমি ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি করছি—"

পিসিমা আবার বাধা দিতে গেলেন,—কিন্তু মোক্ষদাকে ঠেকায় কে? পিসিমার পুনঃ-পুনঃ নিষেধ ও পুনঃ পুনঃ জেদ্—দুই প্রতিকূল চেষ্টার শব্দ-দ্বন্দ্ব সংঘাতে একটা বিষম কোলাহলের সৃষ্টি হইল। ঝি এতক্ষণ ভয়ে চুপ করিয়াছিল, এবার সাহস পাইয়া, সেও মোক্ষদার পক্ষ সমর্থনে লাগিয়া পড়িল! বড়লোক হইলেই কি এমনি হইতে আছে? না হয় ঝি ও মোক্ষদা গরীব,—পেটের দায়ে বড় লোকের বাড়ীতে খাটিতেই আসিয়াছে,—তাই বলিয়া এত অবিচার কি সহিতে পারে? মিছামিছি তাহাদের এত অপমান, ...কাযেই তাহারা ছেলের মাথায় হাত দিয়া দিব্যি করিবে না তো কি করিবে? মাথার উপর ধর্ম্ম একজন আছেন, তিনি সবই দেখিতে পাইতেছেন...... ইত্যাদি! যেন দৃশ্যমান দোষের প্রমাণগুলা খণ্ডন করিবার একমাত্র উপায়—অদৃশ্য ধর্ম্মকে সাক্ষী মানিয়া সন্তানের মাথায় হাত দিয়া শপথ করা, ও অসংযত তীব্র চীৎকারে, আর্ত্তনাদ করা ছাড়া আর কিছুই না! ঝি ও মোক্ষদা দিদি বিস্তর চেঁচাইয়া, পরস্পরকে পরস্পরের নির্দ্দোষিতার সাক্ষী মানিয়া, পরস্পরে পরস্পরের পক্ষ সমর্থন করিয়া, নিশ্চয়রূপে প্রমাণ করিতে চাহিল—তাহারা খুব ভাল, খুব ভাল, খুব ভাল!

ফৈজু এতক্ষণ দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া, অন্যদিকে চাহিয়া ইহাদের কলহ-কলরবের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না,—শব্দগুলা কাণের উপর দিয়া অকারণে ভাসিয়া গেল,—মন তাহার এক বর্ণও আয়ত্ত করিতে পারিল না। সেখানে যে অগ্নিদাহের আলোড়ন চলিতেছিল, তাহাই নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতে লাগিল! আর অনর্থক দাঁড়াইয়া থাকিতে ভাল লাগিল না,—ফৈজু নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িল।

সদর দেউড়ীর পাশে, অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া একটা লোক দাঁড়াইয়া ছিল, ফৈজুকে দেখিয়া সে সহসা উদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল! ফৈজুর মনের অবস্থা যদি আজ ভাল থাকিত, তবে পলায়ন-তৎপর মানুষটার অদৃষ্টে কি দুর্গতি ঘটিত কে জানে;—কিন্তু ফৈজু ইচ্ছা করিয়াই নিশ্চেষ্ট হইয়া তাহাকে পলায়নের সুযোগ দিল,—একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসাও করিল না, সে কে,—বা, কেন পলাইল! নিগূঢ় বেদনায়, তীব্র অভিমানে আজ তাহার মন জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছে,—নিজের দুঃখে আজ তাহার সমস্ত চিত্ত কঠোর-উৎক্ষেপে ভরিয়া গিয়াছে, অন্যের আচরণে আজ তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইবে কেমন করিয়া?—অর্থহীন দৃষ্টিতে সে একবার শুধু পলায়মান মানুষটার দিকে চাহিয়া দেখিল; তার পর

নিঃশব্দে নিজের বাড়ীর দিকে চলিল। মানুষটার ব্যবহারে এতটুকু বিস্ময় বা এতটুকু সংশয় আজ তাহার মনে স্থান পাইল না! যেন ওটা কিছুই না!

পিতা যদি মুখোমুখি ফৈজুকে প্রশ্ন করিতে পারিতেন, তবে ফৈজু মুখোমুখি উত্তর দিয়া, বোধ হয় হাল্কা হইয়া যাইতে পারিত! কিন্তু পিতা তাঁহার মনের সংশয়কে রাখিয়া দিলেন মনের অন্ধকারে,- আর ফৈজু সেই সংশয়ের গ্লানিতে বুক ভরাইয়া গোপন-ক্ষোভের পীড়ন ভোগ করিতে লাগিল,—গোপন অন্তরে! একটা অসহনীয় ঘৃণার ধিক্কারে তাহার চিত্ত থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল! পিতা তাহাকে এতদূর হীন দৃষ্টিতে দেখেন! এত বড় নৃশংস কৃতঘ্ন বলিয়া মনে করেন! সে বাহিরে যতই দৈন্য দারিদ্র্যের মধ্যে অবস্থান করিতে বাধ্য হউক, —কিন্তু নিজের ভিতরে, নিজের মাথাটাকে শক্ত ভাবে উঁচু করিয়া চলিবার শক্তি তাহার যথেষ্ট পরিমাণে আছে,— এ কথা কি পিতা কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না? শুধু ঘৃণার্হ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতেই তাহার অন্তঃস্থল বিদ্ধ করিয়া যাইবেন?

সহসা বজ্র চমকের মত ফৈজুর মনে পড়িল শুধু পিতা-ই বা কেন, পত্নীও তো তাহাকে একদিন এ সন্দেহে আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই!

ফৈজুর যেটুকু ধৈর্য্য অবশিষ্ট ছিল, সেটুকু এবার লোপ পাইল! দুর্জ্জয় ক্রোধে আপাদ-মস্তক পূর্ণ হইয়া গেল! ফৈজুর ইচ্ছা হইল, এই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গিয়া,—খুব একটা উৎকট রূঢ়তার সহিত, যতগুলা শক্ত কথা মনে পড়ে, সমস্তগুলা টিয়াকে শুনাইয়া, বজ্রকণ্ঠে জানাইয়া দিয়া আসে যে, সে দুর্ব্বলতার চরণে নত হইতে জানে না, নত হইতে জানে প্রবলতার চরণে! এবং সে যতই নগণ্য, যতই অধম, যতই হেয় অবজ্ঞেয় মানুষ হউক, তাহার বুকের ভিতর যে প্রাণটা অহরহঃ কাজ করিতেছে, সেটা মানুষেরই প্রাণ, ইতর জন্তুর কুৎসিত লালসা-উন্মাদ-জঘন্য প্রাণ নয়! ইহা যদি সে না বিশ্বাস করিতে পারে, তাব স্বামী বলিয়া যেন তাহার মুখপানে না চায়!

ঝড়বেগে কত চিন্তা ফৈজুর মনের মধ্যে বহিয়া গেল, তাহার হিসাব নাই। উদ্ভ্রান্ত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া, অন্ধকার বাড়ীর মধ্যে পা দিয়াই কিন্তু সহসা সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল! মনে পড়িল, টিয়ার অবস্থা এখন সহজ নহে! ফৈজুর মনের মধ্যে আজ যে বিষময় দ্বন্দ্বের গরল ফেনাইয়া উঠিয়াছে, সে দ্বন্দ্বের প্রচণ্ড অভিঘাত টিয়ার উপরে বর্ষণ করিতে চাওয়া, আর তাহাকে হত্যা করিয়া বসা, এখন একই কথা! ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া সসম্মানে যাহাকে বংশধরের জননী পদে বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে—আজ স্বামীত্বের প্রবল গর্ব্ব-মর্য্যাদার অহঙ্কারে আত্মহারা উন্মাদ হইয়া, তাহাকে এমনি নৃশংসভাবে সংহার করাই উপযুক্ত কর্ত্তব্য পালন হইবে বটে।

প্রতিকূল ঘৃণার ধিক্কারে,—নিজের অসংযত উন্মাদনা-পূর্ণ মনটাকে সবলে আঘাত করিয়া, ফৈজু নিঃশব্দে আসিয়া অন্ধকার রোয়াকের উপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর উঠিয়া, জামা জুতা পাগড়ী খুলিয়া, কুয়া-তলায় গিয়া, বাল্‌তী কতক জল তুলিয়া অন্ধকারেই স্নান করিতে বসিল।

শব্দ পাইয়া রহিমা বাহিরে আসিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "রকম কি?"

ফৈজু সংক্ষেপে উত্তর দিল, "বড় মাথা ধরে গেছে।"

রহিমা তিরস্কার করিল, সারাদিন অনাহারে রৌদ্রে পথ হাঁটিলে মাথা ধরে আর না ধরে! ফৈজু চুপ করিয়া রহিল।

নক্তের উপাসনা ও উপবাস ভঙ্গের নিয়ম রক্ষাটা পূর্ব্বেই সারিয়া লওয়া হইয়াছিল। স্নানান্তে ফৈজু আহারে বসিল; রহিমা এদিক-ওদিক কথা কহিতে কহিতে জানিয়া লইল, শ্বশুরের সহিত ফৈজুর সাক্ষাৎ হইয়াছে। নিশ্চিন্ত হইয়া সে বলিল, "তবে আর কি, তুমি খেয়ে শুয়ে পড়, আহা সারাদিনের কষ্ট............।"

ফৈজুর আহার শেষ হইতেই, রহিমা একটা কাজের ছল করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল—অভিপ্রায় দম্পতিকে কিছুক্ষণ নিভৃত আলাপের সুযোগ দেওয়া! কিন্তু ফৈজু সে সুযোগটা নির্দ্দয়-তাচ্ছিল্যে উপেক্ষা করিয়া নিঃশব্দে পাশের ঘরে ঢুকিয়া পিতার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শুইয়া পড়িল, এবং সমস্ত দিনের পরিশ্রম-ক্লান্ত দেহে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক রাত্রে, কি একটা মৃদু-আহ্বান শুনিয়া ফৈজুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,—চাহিয়া দেখিল, টিয়া কাঁধের উপর হাত দিয়া

ডাকিতেছে। নিদ্রালস-বিকল মস্তিস্কে কোন কথা ভাল করিয়া স্মরণ হইল না—চমকিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি! কেন?"

একটু দূরে সরিয়া গিয়া, টিয়া মৃদুস্বরে বলিল "খাবে চল, রাত্তি দুটো বেজে গেছে— কাল আবার উপবাস তো, ওঠো।"

চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া ফৈজু বলিল "দুটো!"—একটু সন্ত্রস্ত হইয়া চুপি-চুপি বলিল "বাবা কই?"

টিয়া বলিল, "তিনি খেয়ে-দেয়ে ও-বাড়ীতে ঘুমুতে গেছেন।"

ফৈজু বলিল, "আমায় খোঁজেন নি?"

টিয়া উত্তর দিল, "খুঁজেছিলেন, দিদি বল্লে সব। তাই একটু বকে গেলেন শুধু—"

অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া ফৈজু বলিল "কেন?"

একটু হাসিয়া টিয়া বলিল "বল্লেন্ ছেলেমানুষদের এত কটকিনি কেন? রাতদুপুরে আস্নান্ করা!"

"ওঃ!" বলিয়া ফৈজু চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। টিয়া ইতস্ততঃ করিয়া, নিকটে সরিয়া আসিয়া তাহার মাথার চুলে আঙুল লাগাইয়া বলিল, "সত্যি. মিছে নয়,—এই এক-মাথা চুল নিয়ে স্নান করলে, ভিজে মাথায় ঘুম হচ্ছে; তার পর এতে অসুখ হবে না?"

উন্মনা ভাবে ফৈজু উত্তর দিল, "অনেকদিন চুল ছাঁটা হয় নি, ওগুলো বড় বেড়ে গেছে, এবার ছাঁটতে হবে।"

স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি তুলিয়া চাহিয়া বলিল "তুমি শুয়ে পড় গে, আমি উঠ্‌ছি।"

টিয়া বলিল "তোমার খাওয়াটা শেষ হোক না, আমি যাচ্ছি।"

ব্যস্ত হইয়া ফৈজু বলিল "না,—না, তোমায় আর জাগ্‌তে হবে না,—ঘুমোও গে। খলিফা ও-ঘরে আছে তো? ঘুমুচ্ছে? আচ্ছা যাও, তুমিও শুয়ে পড় গে।"

অনুনয়-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া টিয়া বলিল, "তোমার খাওয়া হয়ে যাক্, আমি চলে যাচ্ছি.—এখন আমার ঘুম চটে গেছে —কিছুতেই ঘুমুতে পারব না।"

ঈষৎ বিরক্ত হইয়া ফৈজু বলিল, "মুস্কিল এক!"

কিন্তু মুস্কিল কাটাইবার জন্য স্ত্রীকে চলিয়া যাইবার অনুরোধ আর করিল না। নিজেই উঠিয়া, হাত-মুখ ধুইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

যথারীতি ভোজন শেষ করিয়া, আঁচাইয়া আসিয়া স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিয়া স্নেহময় স্বরে বলিল, "আর কেন? এবার হয়েছে তো, এখন যাও।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া টিয়া বলিল "যাই, তুমি দিন পনের পরে আবার আস্‌বে তো?"

"বোধ হয়—" বলিয়া ফৈজু মুহূর্ত্তের জন্য কি যেন ভাবিল। তার পর মুখ ফিরাইয়া শয্যার দিকে চলিয়া যাইতে-যাইতে বলিল, "কিন্তু বলা যায় না,—যদি কাজ পড়ে তো না এলেও না আস্‌তে পারি। না যদি আসি, তাহলে তোমার ভাব্‌বার দরকার কিছু নাই, বুঝ্‌লে,—আমি যেখানেই থাকি, বেশ ভালই থাক্‌ব, আমার জন্যে ভাবনা কি?"

টিয়া নতদৃষ্টিতে নিরুত্তর হইয়া রহিল।

টিয়াকে অতটা শান্ত স্থির দেখিয়া, ফৈজু মনে-মনে কেমন একটু অশান্ত—অস্থির হইয়া উঠিল! শয্যায় বসিতে গিয়া সহসা উঠিয়া,—ঘরের এদিকে-ওদিকে পায়চারী সুরু করিয়া দিল। তার পর কোথাও কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া, হুকের উপর হইতে জামাটা টানিয়া লইয়া,—পকেট খুঁজিয়া একটা বিড়ি বাহির করিয়া বলিল "দাও তো, তোমার হাতের কাছে ঐ জানালায় দেশ্‌লাইটা আছে—"

টিয়া দিয়াশলাই আনিয়া স্বামীর হাতে দিয়া, একটু সরিয়া দাঁড়াইল, কোন কথা কহিল না। ফৈজু মনে-মনে আরো বিচলিত হইয়া উঠিল;—একটু ইতস্ততঃ করিয়া, বিড়িটা দাঁতে চাপিয়া অগ্নি সংযোগ করিতে-করিতে, আপন মনেই রহস্যের সুরে—কৈফিয়ৎ ছন্দে অস্পষ্ট ভাবে বলিল, "বড় বদ্‌খৎ জিনিস! তবে নিষ্কর্ম্মাদের সময় কাটানর পক্ষে মন্দ নয়!"

টিয়া ম্লান মুখে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল "আমিও তাই ভাব্‌ছি,—তোমায় এ নেশা ধরল কোত্থেকে?"

ফৈজুর ভিতরটা অনেকখানি লঘু হইয়া গেল,—স্বচ্ছন্দ-সরল হাস্যে বলিল "নেশা! নাঃ, আমার এ স্রেফ্ সখ্!"

টিয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল "তা'হলে আমি এখন চল্লুম।"

"যাও—" বলিয়া, পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, সোজা

জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের অন্ধকারের পানে চাহিয়া, ফৈজু চিন্তাকুল মুখে বিড়ি টানিতে লাগিল। টিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণপরে বিড়ি ফেলিয়া দিয়া, ফৈজু শয্যায় গিয়া বসিল। দুহাতে মাথা ধরিয়া, হেঁট হইয়া বসিয়া গভীর অন্যমনস্কতার সহিত—কি কতকগুলা কথা ভাবিতে লাগিল।

টিয়া নিঃশব্দ পদে আসিয়া আবার ঘরে ঢুকিল। ফৈজু হেঁট হইয়া যেমন বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল, মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিল না। বোধ হয় অনুভব করিতেই পারিল না যে, টিয়া আবার আসিয়াছে! টিয়া সেই টুপিটা হাতে করিয়া সামনে আসিয়া, ফৈজুর মাথায় সেটা বসাইয়া দিয়া, স্নিগ্ধ হাস্যে বলিল, "এই নাও, তোমার জিনিস তোমায় ফেরৎ দিয়ে চল্লুম,—এটার জন্যে কষ্ট করে ভোরবেলা আর ও-ঘরে যেতে হবে না। শুধু দিদি বলে দিলে,—যাবার সময় দিদিকে উঠিয়ে দিয়ে যেও।"

টিয়া কি বলিল, কি করিল, কিছুই ফৈজুর বোধগম্য হইল না, শুধু উদ্বেগ-বেদনাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল! টিয়ার কথা শেষ হইতেই—সহসা গভীর ক্ষোভের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাকুল কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "নিজের হিতাহিত বুদ্ধিকে শিকেয় তুলে রেখে, যে আহাম্মক্ পরের বুদ্ধিতে বাদশাই করবার্ লোভে মেতে ওঠে, সংসারে সে বড় হতভাগা! আমি তাদেরই একজন, টিয়া! ছি, ছি! কি মহাপাপই করেছি বল দেখি! জেনে-শুনে ইচ্ছে করেই, তোমায় এমন মরণের পথে—উঃ! লৌকিকতার দোহাই দিয়ে, লোকের রক্ত-মাংসে-গড়া চোখকে ফাঁকী দেওয়া খুব সহজ; কিন্তু তার ওপর আর একজনের চোখ জেগে আছে। আমার নির্ব্বুদ্ধিতার দণ্ড আমাকেই মাথায় করে বইতে হবে,—সেখানে ফাঁকী চল্‌বে না! উঃ, কি অশান্তি!"

টিয়ার হাত দুইটা কাঁপিতে লাগিল। পাছে ফৈজু টের পায় সেই ভয়ে পাশের দেওয়ালটা ধরিয়া ফেলিয়া, প্রাণপণে আত্ম-সংযম করিয়া, মৃদু-কম্পিত স্বরে বলিল, "আমার মত এমন অসুখ তো কত লোকের হয়। আবার তারা ভালও তো হয়ে যায়—বেঁচেও তো থাকে।"

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ফৈজু বলিল, "থাকে আধ-মরা হয়ে!" পরক্ষণেই উঠিয়া, অস্থির চরণে ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে-করিতে ঈষৎ তীব্রস্বরে বলিল, "বাপ-মা'রা অবশ্য আমাদের ভাল খুঁজেই কাজ করেন; কিন্তু আমাদের নিজের ভালমন্দটা বুঝে চলবার সুবিধে দেন না,—তার শাস্তিটা ভোগ করতে হয় আমাদেরই! ···· কি পাপই করেছি!"

উত্তেজনার ঝোঁকে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ফৈজু আরো কত কি বলিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু রুগ্না স্ত্রীর বেদনা-নত চোখ দুটির উপর দৃষ্টি প'ড়তেই, আহত চিত্তে থামিল। মুহূর্ত্ত কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, নিঃশব্দেই আত্মদমন করিয়া লইয়া, নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া, স্নেহময় স্বরে বলিল, "এই রাত তিন পহরে রোগা শরীর নিয়ে টল্‌তে-টল্‌তে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছ কেন?—খলিফা এবার বকাবকি করবে নিশ্চয়,—যাও শুয়ে পড় গে।"

ভয় চকিত নয়নে চাহিয়া টিয়া বলিল "আমি যাচ্ছি, কিন্তু ছাখো,—তুমি রাগ করে, ও রকম যা-তা গুলো বোল না,—আমার শুন্‌তে বড় কষ্ট হয়।"

ফৈজুর ভ্রুযুগল আবার তীব্র কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। উগ্র হইয়া বলিল "কষ্ট? কই, আমি তো তোমায় কিছু বলিনি, তোমার দোষ কি? তুমি তো নিরুপায়······ আমার এ আপশোস কারুর কাছে ফোট্‌বার নয় টিয়া, আমি এমন হতভাগা···নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার ওপর আমার কি রাগই যে হচ্ছে, সে--"

টিয়ার পা অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল! দেয়ালের গায়ে ভর রাখিয়া, স্বামীর হাতটা খুব জোরের সহিত চাপিয়া ধরিয়া, অধীর কণ্ঠে বলিল, "তুমি ওরকম করে বোল না,—বোল না,—আমি ওসব শোনবার জন্যে এখানে আসিনি,—তুমি কেন পাগলের মত নিজের ওপর রাগ করছ?—তুমি কি আমার অসুখ হতে বলে দিয়েছিলে? তোমার দোষ কি?"

বড় অসহ্য সান্ত্বনা! সন্ধ্যাবেলার সেই সুমতি দেবী-ঘটিত সমস্ত ব্যাপারের সুপ্ত জ্বালাটা ফৈজুর মনের ভিতর সহসা আবার উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্যে জাগিয়া উঠিল,—তাহার ধৈর্য্য লোপ হইল!—ক্ষিপ্তস্বরে বলিল "করব না! কি বুঝবে তুমি,—আমার ঝঞ্ঝাট কত! বাড়ীতে এক লহমা বসে থাক্‌তে আজ আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে, সে আমি জানি। কি করব—তোমার জন্যে আজ আমার হাত-পা

বাঁধা! নইলে আজ তুমি যদি ভাল থাকতে,* কি ডাক্তার যদি না বারণ করতেন, তবে আজই তোমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে যেথানে হোক চলে যেতুম! এত পাপ, এত সন্দেহের বাতাসের মধ্যে বাস করা আমার অসাধ্য! এখানকার বাতাসে নিঃশ্বাস টানতে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমার আজ কলিজা ঝল্‌সে যাচ্ছে,—এখানে আমি কিছুতেই তিষ্ঠাতে পারব না—কিছুতে না!"

এ ক্রোধোত্তেজনার অর্থ টিয়া কিছুই বুঝিল না,—শুধু অজ্ঞাত অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাহার মুখখানা বিবর্ণ পাণ্ডুর ম্লানিমায় ভরিয়া গেল! টলিয়া—কাঁপিয়া সে পতনোন্মুখ হইতেই ফৈজুর সংজ্ঞা ফিরিল! তৎক্ষণাৎ সংযত হইয়া সন্তর্পণে তাহাকে ধরিয়া, শয্যায় শোয়াইয়া দিল, পাখাটা লইয়া সজোরে মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। কিন্তু একটা কথাও কহিতে পারিল না।

রুদ্ধ ব্যাকুল কণ্ঠে টিয়া বলিল, "আবার সেই মতলব! তোমার পায়ে পড়ি এবার এখানে থেকো,- দেখছ আমার অবস্থা—" টিয়া আর বলিতে পারিল না, হাঁপাইতে লাগিল, —তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া জল ঝরিতে লাগিল!

মূঢ় বেদনায় ফৈজু নির্ব্বাক্!—নিজের মূর্খতার উপর অপরিসীম ক্রোধের উদয় হইল। কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিল,—সেটা এখন সম্পূর্ণ-ই নিস্ফল! নিঃশব্দে আত্মদমন করিয়া লইয়া, খুব সহজ ভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া, সান্ত্বনা-কোমল কণ্ঠে বলিল "তুমি পাগল হয়েছ! আমি কি এখন কোথাও যেতে পারি? সেবারে টাকার জন্যে,—যাক্ গে সে কথা,—তুমি কিছু ভেবো না, তুমি যতদিন না সুস্থ হবে, ততদিন আমি কোথাও গিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারব, এটা তুমি বিশ্বাস কর?"

স্বামীর দুই হাত টানিয়া লইয়া, নিজের অশ্রু-উচ্ছল চোখের উপর সজোরে চাপিয়া ধরিয়া, বেদনাহত কণ্ঠে টিয়া বলিল "সেই জন্যেই তো! তুমি আমার জন্যে বড্ড বেশী ভাবো—সেই জন্যেই তোমায় আমি বড় ভয় করি।" ফৈজু মুহূর্ত্তের জন্য নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তারপরে প্রাণপণে আত্মসংযম করিয়া সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে,—নিতান্ত সহজ ভাবে হাসিয়া বলিল, "ভয়! কেন কিসের ভয়? পাগল তুমি! আমিই বা তোমার জন্যে ভেবে কি করি? খোদা-মালিক। তবে আমার যেটুকু কর্ত্তব্য, সেটুকু পালন করা চাই, তারই জন্যে যতটুকু যা ভাবা উচিত, তাই ভেবে থাকি মাত্র। না, না, ওর জন্যে তুমি কিছু মনে কোর না—যাক্ ওসব কথা এখন থাক,—শোন, মাথায় একটু জল দিয়ে দেব? বড় গরম ঠেকছে না?"

টিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "দাও জল, আমার গলাটাও শুকিয়ে গেছে।"

ফৈজু জল আনিয়া দিল, মাথায় জল দিয়া জল পান করিয়া টিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করিল। ফৈজু পাশে বসিয়া মাথায় বাতাস করিতে করিতে তাহাকে আবার মিষ্টস্বরে বুঝাইতে আরম্ভ করিল, এত ভীরু, এত দুর্ব্বল মন লইয়া সংসারে বাস করা বড় বিপজ্জনক! মনকে যথাসাধ্য শক্ত ও সাহসী করিয়া তোলা উচিত! শেষে একটু পরিহাস করিয়া, বলিল—মানুষের মন, মানুষের মতই বুদ্ধি ও ধৈর্য্য সম্পন্ন হওয়াই উচিত। ভীরু খরগোস বা চঞ্চল চড়ুইয়ের মত মনটা মানুষের দেহের মধ্যে পুষিয়া রাখা বড় অন্যায়! টিয়া যেমন নির্ব্বোধ! সামান্য কথার জন্য ··!

টিয়া চুপচাপ করিয়া সমস্ত শুনিয়া গেল। ফৈজু বেশ অনুভব করিতে পারিল, কথাগুলা সে শুধু কাণ দিয়াই শুনিতেছে না, যথেষ্ট মনোযোগ সহকারেই শুনিতেছে!

একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে ফৈজু বলিল "আর একটা কথা তোমায় বলে রাখি,—যদি কিছু না মনে করো।"

টিয়া দৃষ্টি খুলিয়া চাহিয়া বলিল "কি?"

ফৈজু সুকোমল হাস্যে বলিল "কিছু মনে করবে না তো?"

একটু হাসিয়া টিয়া বলিল "না, বলো।"

আবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া, হাতের পাখাখানার গা খুঁটিতে-খুঁটিতে, সেইদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া, ফৈজু মৃদুস্বরে, ধীরে ধীরে বলিল, "আমি সকল রকমে রাগ সামলাতে পারি, কিন্তু একটা বিষয়ে পারি না,—সেইজন্যেই তোমায় এটা জানিয়ে রাখছি। যারা আমায় চেনে না, তারা আমার চরিত্র সম্বন্ধে যত খুশী অপবাদ রটনা করে যাক্, আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু যারা আমায় চেনে,—যেমন তুমি একজন,—তুমি কোনদিন আমার দিকে সে রকম নজরে চেও না। আমি বলে দিচ্ছি, তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রেখো,—আমি কোনদিন তোমার সে বিশ্বাস নষ্ট করব না! তুমি মনে

রেখো, সংসারের পথে চল্‌তে গিয়ে যদি কোন দিন পাপের দিকে আমার পা টলে, তবে—পা টল্‌বার আগেই আমি নিজেই নিজেকে খুন করে ছাড়্‌ব! এটুকু নিষ্ঠার জোর আমার মধ্যে আছে!"

টিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া স্তব্ধ ভাবে পড়িয়া রহিল! কোন কথা বলিল না। ফৈজুও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর অধিকতর ধীর কণ্ঠে বলিল, "মানুষের যত রকম ক্ষতিকে আমি ভয় করি,—তার মধ্যে সব চেয়ে ভয় করি, ঐ ক্ষতিকে! কোন মানুষ মারা গেছে শুন্‌লে, আমার যত-না দুঃখ হয়, সে চরিত্রহীন হয়েছে শুন্‌লে আমার তার চেয়ে বেশী দুঃখ বোধ হয়।"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়াই কাতর কণ্ঠে টিয়া বলিল, "আমি কবে তোমায় কি একটা কথা বলেছিলাম, তুমি সেটা আজও ভুলতে পার নি। আচ্ছা, কেমন করে বল্লে তোমার বিশ্বাস হবে বল,—আমি তেম্নি করেই বলছি—আজ আমি তোমায় আর এক চুলও অবিশ্বাস করি না,—করি না,—করি না!" টিয়া আবার কাঁদিয়া ফেলিল!

সস্নেহে তাহার মাথা চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে ফৈজু কোমল কণ্ঠে বলিল "না—না, কেঁদ না,—কেঁদ না,—এ তো কান্নার কথা হচ্ছে না টিয়া! থাক্‌, আর আমার কিছু শোনবারও নাই, শোনাবারও নাই। এবার ওঠো তুমি, শোবে চল,—না, এই ঘরেই তুমি থাক্‌বে? খলিফাকে এখানে ডেকে দিয়ে আমি ঐ ঘরেই যাব?"

"না,—না, আমিই উঠে যাচ্ছি।" টিয়া চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল। ফৈজু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কি একটু ভাবিল, তার পর হঠাৎ হাসি-হাসি মুখে বিনা প্রশ্নেই মন্তব্য প্রকাশ করিল, "আমি দিন পনের পরেই আবার আস্‌ব,—অন্ততঃ ঘণ্টা-খানেকের জন্যেও এসে তোমায় দেখে যাব, বুঝ্‌লে।"

টিয়া চকিতের জন্য তাহার মুখপানে শুধু বেদনা করুণ দৃষ্টিক্ষেপ করিল মাত্র, কিছু বলিল না; মাথায় কাপড় টানিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল।

টিয়ার সেই বেদনা-করুণ দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া, ফৈজু ভিতরে-ভিতরে আবার দমিয়া গেল! অসতর্ক মুহূর্ত্তে বর্ব্বরের মত আঘাত দিয়া, এই দুর্ব্বল-চেতা রুগ্না স্ত্রীর মনে সে যে শঙ্কা, যে দ্বিধা জাগাইয়া তুলিয়াছে, এখন সহস্র কৈফিয়ৎ এবং ছদ্ম-চপলতার অভিনয়েও সে দ্বিধা কাটান বড় সহজ নহে! বিচলিত চিত্তে, মূঢ়ের মত ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া, সহসা তাহার পথরোধ করিয়া বলিল "না, আর একটু বসে যাও,—তুমি এখনো কাঁপ্‌ছ যে! বোস—"

ফৈজু তাহার হাত ধরিতে গেল, কিন্তু টিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া, ঘাড় নাড়িয়া, নতমুখে বলিল, "না, অনেকক্ষণ এসেছি। দিদির ঘুম ভেঙে যায় তো এবার খুঁজ্‌বে।"

ফৈজু সঙ্কুচিত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করিয়া রহিল। তার পর ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিল,"আজ আমার বড় মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল,—ঝোঁকের মাথায় কতকগুলো কথা বলে তোমার মনে হয় তো বড়ই কষ্ট দিলুম। তুমি ওগুলো ভুলে যাও টিয়া,—নইলে, ভেবে-ভেবে অসুখে পড় যদি,—আমার তা হলে মুস্কিলের সীমা থাক্‌বে না, একে এই ঘরে-বাইরে—" কথাটা বলিতে গিয়া সামলাইয়া লইয়া—ঈষৎ অধীর ভাবে বলিল "বল তুমি, এ সব ভেবে আড়ালে-আড়ালে কান্নাকাটি কর্‌বে না?"

টিয়া নিঃশব্দে নতমুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল, "না।"

নিকটে আসিয়া, তাহার দুই কাঁধে দুই হাত রাখিয়া, ব্যস্ত ভাবে ফৈজু বলিল "ও-রকম করে না,—আমার মুখের দিকে চেয়ে বল।"

ফৈজুর মত সহিষ্ণু মানুষের এতটা অসহিষ্ণুতা, টিয়ার কাছে আজ—এত দুর্ভাবনার মাঝেও, একটু অদ্ভুত ঠেকিল!—তাহার ম্লান মুখের উপর মৃদু কৌতুকের হাস্যরেখা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দ্বিধা সরাইয়া, মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল "বল্‌ছি—'না'। কিন্তু ও কি তোমার কপাল যে ঘামে ভরে গেছে—" বলিতে বলিতে অজ্ঞাতেই নিজের আঁচলটা মুঠার মধ্যে গুছাইয়া তুলিয়া অনুনয়ের স্বরে বলিল "একটু হেঁট হও না।"

অন্য সময় হইলে ফৈজু নিশ্চয়ই আপত্তি করিত; কিন্তু আজ বিরাট স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, বিনাবাক্যে তৎক্ষণাৎ মাথা নোয়াইল!

নিজের যত্ন-আরামের সম্বন্ধে চির-উপেক্ষা-পরায়ণ এই মানুষটি আজ কেন হঠাৎ ঔদাসীন্য কাটাইয়া, তাহার ক্ষুদ্র অনুরোধ পালনে এত আগ্রহের সহিত ঝুঁকিয়া পড়িল, টিয়া সেটা বুঝিতে পারিল কি না বলা যায় না; কিন্তু সে কেমন যেন একটু লজ্জায় পড়িয়া গেল! ফৈজুর মুখের দিকে আর চোখ তুলিতে পারিল না। সসঙ্কোচে দৃষ্টি নত করিয়া,

লজ্জা-কম্পিত-হস্তে, নিজের প্রার্থিত কাজটুকু করিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু ফৈজু বেশীক্ষণ ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিল না; ক্ষণপরেই মুখ সরাইয়া লইয়া বলিল, "হয়েছে, এবার তুমি শোও গে!"

অসমাপ্ত কাজে বাধা পাইয়া, টিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "বড় ছট্‌ফটে মানুষ! ঐঃ, পড়্‌ল টুপিটা!"

সত্যই নাড়া পাইয়া ফৈজুর মাথা হইতে টুপিটা খুলিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল! টিয়া হেঁট হইয়া সেটা কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "কি মানুষ তুমি বল দেখি!"

স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া, সহসা সকৌতুকে হাসিয়া উঠিয়া ফৈজু বলিল, "বাঃ, ওটা যে এর মধ্যে কখন এসে মাথায় চড়ে বসেছে তা জানি কি? তোমার তো আচ্ছা সাফাই হাত!—" বলিতে-বলিতে স্ত্রীর দুই হাত ধরিয়া আবেগভরে পীড়ন করিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "একটু ঘুমোও গে,— রাত শেষ হয়ে এল যে!"

টিয়ার স্নিগ্ধ হাস্যোজ্জ্বল মুখের উপর একটী প্রচ্ছন্ন বিষাদের ম্লান ছায়া আবার নামিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরাইয়া, দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল "যাই।"

"চল, আমিও সঙ্গে যাই" বলিতে-বলিতে অগ্রসর হইয়া, ফৈজু মৃদু কণ্ঠে পুনশ্চ বলিল, "আমি পনর দিন পরে নিশ্চয় আস্‌ব,—তুমি কিছু ভেবো না।"

"না।" বলিয়া টিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া চলিল।

একটু থামিয়া শান্তস্বরে ফৈজু বলিল, "মাথার ওপর একজন আছেন, তাঁর কথা আমরা যেন সব সময়ে মনে রেখে চল্‌তে পারি। মিছে কেন ভাব্‌ছ? ভয় কি?"

পরকে অভয়, আশ্বাস দিতে গিয়া, ফৈজু নিজের মনের কোন নিগূঢ় প্রদেশ হইতে কি নির্ভয় সান্ত্বনার বাণী শুনিতে পাইল, কে জানে,—কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেই সহসা তাহার দুই চক্ষু অস্বাভাবিক প্রসন্ন দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! স্ত্রীর মাথার উপর হাত রাখিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল "নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিও—"

টিয়া যন্ত্র-চালিতের মত নিঃশব্দে চলিয়া গেল। ফৈজু ফিরিয়া আসিয়া গ্লানি-ভার-মুক্ত চিত্তে, গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া শয্যাশ্রয় করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোরে উঠিয়াই সে জয়দেবপুরের উদ্দেশে চলিল। ঠাকুরবাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়া যখন সে যায়, তখন দেখিল, একটা লোক তত ভোরে উঠিয়া ঠাকুরবাড়ীর দুয়ার খুলিয়া, সন্তর্পণে মুখ বাড়াইয়া, উঁকি মারিয়া এদিক-ওদিকে, কি দেখিতেছে! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া-চাহিয়া, ফৈজু দূর হইতেই চিনিল, গত রাত্রের সেই বাউল মহাশয়!

ফৈজুর সহিত চোখোচোখি হইতেই, বাউল মহাশয় আচম্বিতে সশব্দে দ্বাররোধ করিলেন। ফৈজুর ভারী হাসি পাইল। মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিল, এই অপরিচিত বাউল মহাশয় নিশ্চয় কোনরূপ ছিট্‌গ্রস্ত! না হইলে গত রাত্রে তাহাকে দেখিয়া, সেই উল্লাসের গান থামাইয়া তেমন করিয়া ছুটিয়া পলাইবেই বা কেন, আর আজ বিনাপরাধে এমন অভদ্রভাবে মুখের উপর দুয়ার বন্ধই বা করিবে কেন? খোদার রাজ্যে কত অদ্ভুত প্রাণীই যে আছে!

হাসিতে-হাসিতে ফৈজু নিজের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। অনাবশ্যক বোধে, লোকটার ব্যবহারে কিছুমাত্র দুশ্চিন্তাকে মনে ঠাঁই দিল না; একান্ত সংযত চিত্তে ভাবিতে-ভাবিতে চলিল— জয়দেবপুর মহলের জন্য তাহার উপস্থিত কর্ত্তব্যগুলার কথা। আর তাহার মাঝেই এক-একবার অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষোভ-কাতর চিত্তে ভাবিয়া লইল পীড়িতা স্ত্রীর ভূত এবং বর্ত্তমান অবস্থা।

(ক্রমশঃ)

আমেরিকার স্মৃতি

(১—পথে)

[শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম-ডি (নিউইয়র্ক)]

সন ১৩১৫ সাল, ৩১শে শ্রাবণ বোম্বাই বন্দরে ইতালীয় জাহাজ "রুবিতানো"তে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হইয়াছিলাম। জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বে ডাক্তার আসিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে পরীক্ষা করিলেন। সে পরীক্ষা কিছু অদ্ভুত রকমের। চকিতের ন্যায় একবার করিয়া স্পর্শ মাত্র। এ রকম নাড়ীজ্ঞান আর কাহারো আছে কি না জানি না। যাহা হউক, ডাক্তার মহাশয়ের নিকট হইতে অব্যাহতি পাইয়া আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম; কারণ, পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল, এই ডাক্তারী পরীক্ষা কি একটা ভীষণ ব্যাপার হইবে। বেলা ১১টায় জাহাজ ছাড়িবে। আমরা ১০৷৷০টার সময় জাহাজে উঠিয়া নিজের-নিজের কামরা অনুসন্ধান করিয়া লইলাম। সঙ্গে আসবাব-পত্র অন্য কিছুই নাই, কেবল একটি হ্যাণ্ড-ব্যাগ্ মাত্র। একটি বড় পেটিকায় বস্ত্রাদি ছিল; তাহা বোম্বাই নগরের "প্রিন্স্ অফ্ ওয়েল্স্ হোটেলে" সেই দিন প্রাতে টমাস কুকের কর্ম্মচারীর নিকট দিয়াছিলাম। কথা ছিল যে তিনি যথাসময়ে আমার কেবিনে তাহা দিয়া যাইবেন। কিন্তু দেখিলাম, ট্রাঙ্কটি এখনো যথাস্থানে আসে নাই। তখন সেই কর্ম্মচারীর অনুসন্ধানে ছুটিলাম। জাহাজখানি ক্ষুদ্র সহর-বিশেষ। নানা শ্রেণীর আরোহী, তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধব, জাহাজের কর্ম্মচারী, কুলী, মজুর প্রভৃতি লোকের ভিড়ে, বিশেষ একজনকে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ ব্যাপার নহে। প্রায় বিশ্ মিনিট্ দৌড়াদৌড়ির পর তাঁহাকে আবিষ্কার করিলাম। তিনি বেশ ইংরাজী কায়দা-মাফিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাকে জানাইলেন যে, ভুলক্রমে আমার কেবিনের পরিবর্ত্তে পেটিকাটি জাহাজের খোলে (hold) চলিয়া গিয়াছে, এবং এডেন্ পঁহুছিবার পূর্ব্বে তাহা পাইবার কোন আশা নাই। চমৎকার! একসুট কাপড়ে আটদিন কাটাই কি করিয়া! তাঁহার বিস্মৃতিকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া, তাড়াতাড়ি জাহাজের এক কর্ম্মচারীকে ধরিলাম। তাঁহাকে যত কথা বলি, তিনি হাঁ করিয়া শুনেন মাত্র; মুখে একটি কথা নাই—কেবল হাত-নাড়া ও কাঁধ-নাড়া। বুঝিলাম যে, তিনি ইংরাজী মোটেই জানেন না। আর একজন কর্ম্মচারীর শরণাপন্ন হইলাম,—তিনিও দাদার ভাই। তাঁহার তিনটি মাত্র ইংরাজী শব্দ জানা আছে—ইয়েস্, নো, এবং ভেরি ওয়েল। এই তিনটি কথা আমার কথার পৃষ্ঠে তিনি পর্য্যায়ক্রমে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বেগতিক দেখিয়া কাপ্তেনকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম—তিনিও ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ! পরে জানিয়াছিলাম যে, তিনি ইয়েস্, নো, ভেরি ওয়েল ছাড়া আর একটি কথা জানেন, থ্যাঙ্কস! কি মুস্কিল! এই ইতালীয়ান জাহাজ ক্রমাগত জেনোয়া হইতে জাপান যাতায়াত করে; এবং প্রত্যেকবার বোম্বাই, এডেন্, সুয়েজ, ও পোর্টসায়েদ হইতে আরোহী ও মাল লইয়া থাকে; কিন্তু ইহার কোন কর্ম্মচারী ইংরাজী জানে না,—আর এই জাহাজে আমাদের প্রায় কুড়ি দিন থাকিতে হইবে।

নিরুপায় হইয়া কেবিনে ফিরিতেছি;—ভয় হইতেছে যে, আমার অনুপস্থিতিতে হ্যাণ্ড্ ব্যাগটি না অন্তর্হিত হইয়া থাকে! এমন সময়ে জাহাজ ছাড়িয়া দিল। তখন ডেকের উপর হইতে বোম্বাইকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। বোম্বাই কলিকাতা নহে, এবং জেঠিতেও আমার পরিচিত কোন লোক নাই; তথাচ বোম্বাইকে কত প্রিয় মনে হইতেছিল। কত দূরে যাইতেছি,—জীবন-মরণের কথা কে বলিতে পারে;—আবার বোম্বাই দেখিতে পাইব কি না কে জানে! অন্য আরোহীদিগের আত্মীয়েরা ঘনঘন রুমাল উড়াইতেছিলেন,—তাঁহাদিগকে পরমাত্মীয় মনে করিয়া রুমাল নাড়িয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় চাহিলাম।

দেখিতে-দেখিতে জাহাজ গভীর সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং ব্রেক্-ফাষ্টের ঘণ্টা বাজিল। এতক্ষণ ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা কিছুই মনে হয় নাই। প্রাতে হোটেলে

কিছু রুটী-মাখন ও এক পেয়ালা কোকো খাইয়াছিলাম। ঘণ্টা-ধ্বনিতে যেন সুপ্ত ক্ষুধা জাগ্রত হইয়া উঠিল। কেবল জাগ্রত হইল নহে,.যেন একটা লম্ফ প্রদান করিল। কাল-বিলম্ব না করিয়া খাবার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রত্যেক চেয়ারে আরোহীর নাম দেওয়া আছে। দেখিলাম, আমরা ছয় জন ভারতবাসী এক টেবিলে পাশাপাশি আছি। বড়ই আহ্লাদ হইল। আমাদের টেবিলে আর ছয়জন য়ুরোপীয়ান আছেন; তাঁহাদের মধ্যে তিনজন মহিলা।

অনেকেই হোটেল্ হইতে প্রাতরাশ শেষ করিয়া আসিয়াছেন,—তাঁহারা আসিলেন না। আমরা চারিজনমাত্র ভারতবাসী একত্র বসিলাম। বোম্বের এক জন হিন্দুবণিক, রেশমের কারবার করিবার জন্য ফ্রান্সে যাইতেছেন;—তিনি টেবিলে আসিয়াই আমাকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি নিষিদ্ধ মাংস দেখিলে চিনিতে পারি কি না। তাঁহাকে বলিলাম যে, আমিও কখন-যে জীব মাতৃ-স্থানীয়া—যাহার দুগ্ধ পান করিয়া মানুষ হইয়াছি—তাহার মাংস খাই নাই, এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছি যে, কিছুতেই তাহা খাইব না। এবং ভগবান বরাহ-অবতার হইয়াছিলেন, সুতরাং সে মাংস কিছুতেই ভক্ষণ করা যাইতে পারে না;—ও শূকর জীবটা এমন অখাদ্যভোজী যে, তাহার মাংসের নামে আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠিয়া আইসে। নিষিদ্ধ মাংস খাইব না বলিয়াই তাহা বিলক্ষণ চিনিয়া লইয়াছি, অতএব খাদ্য গ্রহণের সময় তিনি স্বচ্ছন্দে আমার অনুকরণ করিতে পারেন। দেখিলাম, ভদ্রলোকটি আশ্বাস পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। যতক্ষণ আমরা কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম, মধ্যে মধ্যে আমার কর্ণে "হরিঃ ওম্, হরিঃ ওম্" শব্দ আসিতেছিল। শব্দকারী এক শিখ্ ভ্রাতা, এক-খানি আসন ব্যবধানে বসিয়া আছেন। তিনিও বলিলেন যে, তিনি আমাদের দলভুক্ত—বৃহৎ চতুষ্পদ জীবাদির মাংস গ্রহণ করিবেন না। আমরা তিনজনে রুটি, মাখন ও আলুপোড়া তখন পেট ভরিয়া খাইয়া লইলাম। পরে যখন জাহাজের ভাণ্ডারীরা দেখিল যে, আমরা নিরামিষভোজী, তখন আমাদের প্রচুর পরিমাণে চকলেট্, বাদাম, পেস্তা, আখরোট, আঙ্গুর, আপেল, পেয়ারা প্রভৃতি ফল প্রত্যহ দুই-তিনবার করিয়া দিত। ইহাতে আমাদের স্বাস্থ্য বরাবর খুব ভালই ছিল। জাহাজে পাঁচবার দৈনিক ভোজনের ব্যবস্থা। মাছ-মাংস বাদ দিয়া খাইলেও, কোন মহা-পেটুকের ক্ষুন্নিবৃত্তি না হওয়ার ভয় নাই।

দিনের বেলা এক রকম গোলমালে কাটিয়া গেল। দেখিলাম, দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমরা মোট এগারজন ভারত-বাসী আছি। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা সকলে যেন ভাই-ভাই হইয়া গেলাম। দুই-চারিজন য়ুরোপীয়ানের সহিতও পরিচয় হইল। কেহ বা আমাদের সহিত আগে কথা কহিলেন, কাহারো মুখের ভাব দেখিয়া আমরাই আগে আলাপ করিলাম। যাঁহাদের গম্ভীর ভাব দেখিলাম, তাঁহাদের নিকট গেলাম না। ইংরাজী আদব-কায়দা বজায় রাখিতে হইবে।

ধন্য এই "এটিকেট্"! একটা গল্প আছে যে, এক জাহাজ জলমগ্ন হওয়ার পর একজন সাহেব ও একজন মেম এক ভেলায় সমুদ্রে ভাসিতে থাকেন। ভেলার মধ্যস্থলে একটা মাস্তুল, তাহার উপর সাহেব নিজের রুমালখানি নিশানের মত বাঁধিয়া দিয়াছেন যে, কোন জাহাজ দূর হইতে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের উদ্ধার করিবে। মাস্তুলের এক দিকে সাহেব পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া বসিয়া আছেন,—বিপরীত দিকে মেমও সেইভাবে সমাসীনা। এইরূপে দুইজনে নিঃশব্দে এক দিন কাটাইলেন। দ্বিতীয় দিবস সাহেব আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি সসম্ভ্রমে বলিলেন, "Madam, I am afraid, we shall have to spend more days like this".—(মহাশয়া, বোধ হয় এইরূপে আমাদের আরও কিছুদিন কাটাইতে হইবে)। মেম ভ্রূকুটী করিয়া উত্তর দিলেন,—"How dare you address me, sir? We have not been introduced!—(কি সাহসে আপনি আমার সহিত কথা কহিলেন, মহাশয়? আমাদের ত' পরিচয় হয় নাই!)। এই গল্পটি স্মরণ করিয়া আমরা উপযাচক হইয়া কোন শ্বেতাঙ্গের সহিত আলাপ করিতে বিরত হইলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ভগবানের লীলা! বিশাল সমুদ্র-বক্ষে জাহাজ যখন ভেলার মতন ভাসিতে থাকে, প্রত্যেক ভীষণ তরঙ্গের আঘাত যখন পোতখানির ক্ষণভঙ্গুরতা প্রতি মুহূর্ত্তে স্মরণ করাইয়া দেয়, ক্রুদ্ধ ঝঞ্ঝাবাতের প্রবল আক্রমণে যখন অর্ণব-পোত সজীব হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, এবং মৃত্যুর ছায়া যখন চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করে,—তখন আমরা সব

ভুলিয়া যাই। তখন মান-অভিমান থাকে না, এবং ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, দাতা-কৃপণ, কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ সব এক হইয়া যায়। ফ্রীমেসনদের ভ্রাতৃভাব দেখিয়াছি; কিন্তু সমুদ্র-বক্ষে মনে হয় ভ্রাতৃভাব বা মনুষ্য-প্রেম অধিকতর পরিস্ফুট। কবে সমগ্র ভারতবাসী এক জাহাজে বাস করিবে!

প্রথম রাত্রে ডিনার খাইতে বসিয়া একটু গোলযোগ হইয়াছিল। বোম্বের সেই হিন্দু বণিক ভদ্রলোকটি সাহেবী পরিচ্ছদের উপর মাথায় এক দেশী টুপি দিয়া খাইতে বসিয়াছিলেন। তাহার কারণ পরে বুঝিয়াছিলাম। জাতীয় নিয়ম অনুসারে তাঁহার মস্তক অর্দ্ধ-মুণ্ডিত—অর্থাৎ মধ্যস্থলে কেশদাম, ও চতুষ্পার্শ্বে কেশহীন—যেন সাহারার মধ্যে ওয়েসিস্। আমাদের টেবিলে ছয় জন য়ুরোপীয়ান ছিলেন, যথা—মিসেস্ ও কাপ্তেন পেরী, মিসেস্ ও লেফ্‌টেনাণ্ট গন্, মিসেস্ ও মিঃ হিউম। শেষোক্ত দুইজন আমেরিকান পর্য্যটক, দেশে ফিরিতেছেন। মাথায় টুপি দেখিয়া গন্ সাহেব উঠিয়া বলিলেন যে, ইহার জন্য তাঁহারা বিশেষ অপমানিত বোধ করিতেছেন,—টুপি না খুলিলে তাঁহারা সকলে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন। উত্তরে তাঁহাকে বলা হইল যে, ইহা দেশী টুপি, ইহা মাথায় থাকাই সম্মানের চিহ্ন, খুলিয়া ফেলিলে তাঁহাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে। তখন তিনি নিজের অজ্ঞতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। তাহার পর এক হাস্যজনক ঘটনা হইল। আমাদের পঞ্জাবী ভ্রাতা কাঁটা-চামচের ব্যবহার না শিখিয়াই জাহাজে উঠিয়াছেন। তিনি যদি হাত দিয়া খাইতেন, (তাঁহার ইংরাজী পরিচ্ছদ সত্ত্বেও) তাহা বরং ভাল ছিল; কিন্তু তিনি কাঁটা-চামচ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ও মধ্যে মধ্যে ছুরীখানিও মুখের মধ্যে দিতে লাগিলেন। শেষোক্ত কার্য্যের পরিণাম অচিরাৎ ভীষণ হইল। আমি তাঁহাকে হিন্দি কথায় সাবধান করিতে-না-করিতে দেখিলাম তাঁহার জিভ কাটিয়া শোণিত-স্রাব হইতেছে। বেচারী ছুরী ও কাঁটার সাহায্যে "ভারমিচিলি" খাইতে গিয়াছিল,—তাহা আর খাওয়া হইল না, টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে হইল। সাহেব-মেমেরা মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন, দেখিলাম তাঁহারা অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া আছেন মাত্র। আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। পরের দুঃখে হাসিটাই আগে আসে।

পরদিবস বোম্বাইয়ের সেই ভদ্রলোক্ সশব্দে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মিসেস্ পেরি অদূরেই ছিলেন। দুই মিনিট পরেই কাপ্তেন পেরি আমাকে আসিয়া বলিলেন যে, এই ঘটনা দ্বারা তাঁহার মেমকে বিশেষ অপমান করা হইয়াছে,—এবং অপমানকারী এই দণ্ডে ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে, তিনি জাহাজের কাপ্তেনের নিকট নালিশ করিতে যাইবেন। দোষীকে আনিয়া হাজির করিলাম। তিনি বলিলেন যে, অভ্যাসমত তিনি থুথু ফেলিয়াছেন। কাহাকেও অপমান করিবার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মিসেস্ পেরির নিকট তিনি ক্ষমাও চাহিলেন। সব মিট্‌মাট্,—কাপ্তেন পেরি সন্তুষ্ট হইয়া বণিক-প্রবরের করমর্দ্দন করিলেন। এই ঘটনার কিছু পরেই আমরা সবাই ডেকের উপর বসিয়া আছি। মিসেস পেরি ও মিসেস্ গন্, তাঁহাদের স্বামী ও আমি এক সারিতে বসিয়া গল্প করিতেছি। আমাদের সম্মুখেই সেই থুথু-ফেলার আসামী ও অপর জন-কয়েক বসিয়া আছেন। হঠাৎ নজর পড়িল যে, গন্ সাহেব আমার বণিক-বন্ধুর চেয়ারের পশ্চাৎ দিকে একটি পা বেশ আরাম করিয়া তুলিয়া দিয়াছেন। এই রকম একটা সুযোগ আমি খুঁজিতেছিলাম। গন্ সাহেবকে বলিলাম যে, তিনি একজন ভারতবাসীর আসনের উপর পা রাখিয়া তাঁহাকে যে কতটা অপমান করিতেছেন, সে জ্ঞান আছে কি? প্রশ্ন শুনিয়া তিনি যেন একটু অবাক্ হইয়া গেলেন—বলিলেন যে, তাঁহার এই কার্য্যে যে কোন দোষ হইতে পারে, তাহা তাঁহার আদৌ জানা ছিল না; য়ুরোপীয়েরা ত' এরূপ করিয়াই থাকে। যাহা হউক, তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া তখনই নিজের অপরাধের জন্য প্রকাশ্যভাবে অপর পক্ষের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গোল মিটিল।

তখন আমি শ্বেতাঙ্গের দলকে বলিলাম যে, দুঃখের বিষয় এই যে, শ্বেতাঙ্গেরা ভারতবর্ষে বাস করিয়া ভারতবাসীদিগের সহিত মেলা-মেশা করেন না; তাহার-ই ফলে পরস্পরের নীতি-রীতি জানিবার সুযোগ হয় না। অথচ অনেক ইংরাজ দেশে ফিরিয়া ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধে পুস্তকাদি লিখিয়া এরূপ বিদ্যার পরিচয় দেন যে, তাহা পড়িলে ভারতবাসীরা হাস্য-সম্বরণ করিতে পারে না।—

যাহা হউক, আমাদের যখন একসঙ্গে কিছুকাল কাটাইতে হইবে, তখন উভয় পক্ষেরই একটু সহ্য ও ক্ষমা গুণের প্রয়োজন।—ইহার পর হইতে আর কোন সংঘর্ষ হয় নাই। বড়ই আমোদে দিন কাটিয়াছিল।

আর দুইজন সহযাত্রীর কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। একজন মান্দ্রাজ-ফেরত মিশনারী। তিনি কালা-আদমীদের ঠাকুর-দেবতাকে গালি দিয়াছেন বলিয়া, কালা-আদমীরা তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিল,—এই জন্য ভারতবাসী সকলকেই তিনি অসভ্য, বর্ব্বর ইত্যাদি মনে করিয়া থাকেন। একদিন তিনি আক্ষেপ করিতেছেন যে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে গিয়া তাঁহাকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। আমরা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই কাপ্তেন পেরি উত্তর দিলেন যে, যে সব খৃষ্টান্ মিশনারী পরের ধর্ম্মকে গালি দিয়া থাকেন, তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন না, এবং তাঁহাদের লাঞ্ছনা ভোগ করা কিছুই বিচিত্র নহে। ইহার পর হইতে খৃষ্টিয় প্রচারক মহাশয় আমাদিগকে দশহস্ত ব্যবধানে রাখিতেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ডাক্তার ফ্লানাগান্। ইনি এডেনে বদলি হইয়া যাইতেছেন। সদালাপী, হাস্যমুখ এবং সর্ব্বদাই পরসেবা করিতে ব্যস্ত। দুই দিন পরে যখন সমুদ্রে খুব তুফান আরম্ভ হইল এবং অধিকাংশ যাত্রী শয্যা গ্রহণ করিল, তখন এই ডাক্তার নিজে সমুদ্র-পীড়ার কবলগত হইয়াও সকলের সেবা করিতেন। এক হাতে রুমাল দিয়া নিজের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছেন, ও অন্য হাতে একটী কমলা-লেবু লইয়া ঘরে ঘরে বেড়াইতেছেন;—এই চিত্রটি এখনও আমার স্মৃতিপটে জাজ্জ্বল্যমান।

তখন অগষ্ট মাস, তুফানের সময়। সমুদ্র এত ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল যে, আট দিনে এডেন পহুঁছিবার কথা, কিন্তু আমরা দশ দিনে পহুঁছিলাম। যাহারা সমুদ্র-পীড়া-গ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক বেলার জন্য নবজীবন লাভ করিলেন। কি কষ্টই তাঁহাদের হইতেছিল! ভগবানের কৃপায় আমরা চারিজন ভারতবাসী এক দিনের জন্যও সমুদ্র-পীড়া ভোগ করি নাই। খুব তুফানের সময়ও আমরা উপরের ডেকে থাকিয়া সমুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া আমোদ উপভোগ করিতাম।

এডেনে জাহাজ থামিলে আমরা সহর দেখিতে গেলাম। সমুদ্র-তীরের ঘর-বাড়ী, দোকানগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাজারটিও দেখিতে বেশ; কিন্তু মাছিতে পরিপূর্ণ। একজন মাড়োয়ারী দোকানদারকেও এখানে দেখিলাম। তিনি এই উত্তপ্ত বালুকার দেশে আসিয়া মস্‌লার ব্যবসা করিতেছেন। এমন অধ্যবসায় না থাকিলে কি লক্ষ্মী-শ্রী হয়! একজন সোমালী বালক আর কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না। অল্প ভিক্ষায় সে সন্তুষ্ট নহে। লেফ্‌টেনান্ট গন্ বিরক্ত হইয়া তাহাকে "ড্যাম্" বলিয়াছিলেন। বালকটি তৎক্ষণাৎ একটু দূরে সরিয়া গিয়া গন্ সাহেবকে বলিল, "ইউ ড্যাম্"। বলিয়াই চম্পট্! সাহেব অবাক! একটি তরমুজ্ কিনিয়া আমরা জাহাজে ফিরিলাম। এমন শীতল ও সুমিষ্ট তরমুজ আর কখন খাই নাই।

বিকালে জাহাজ ছাড়িল। পুনরায় "সমুদ্র-পীড়ার" প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল। এ ব্যাধির কোন ঔষধ নাই। ইহা স্নায়বিক পীড়া মাত্র। ভরা-পেট, খালি পেট, শ্যাম্পেন-পান, প্রভৃতি যত রকম তুক্‌তাক্ আছে শুনিয়াছিলাম, তাহাতে কাহারো কিছুমাত্র উপকার হইল না দেখিলাম। যে "সমুদ্র-ব্যাধির" ঔষধ আবিষ্কার করিবে, সে অল্প সময়েই ক্রোরপতি হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্দের মধ্যেও কিছু ভাল থাকে—এই সমুদ্র-পীড়ায় পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি জাগাইয়া তোলে।

ক্রমশঃ উত্তপ্ততর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে উপস্থিত হওয়া গেল। সুয়েজ-কেনাল্ নিকটবর্ত্তী। প্রবাদ আছে যে, বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আসিবার সময়ে অনেক সাহেবের এই সুয়েজের গরম হাওয়া লাগিয়া মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া যায়। ভারতবর্ষে প্রচুর আহারাদি ও সেলামের গুণে সেই উষ্ণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, এবং স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া পুনর্ম্মূষিক না হওয়া পর্য্যন্ত রোগের শান্তি হয় না। আমরা গরীব ভারতবাসী, আমাদের রক্ত ঠাণ্ডা; সুতরাং মাথা গরমের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কেবল পিপাসা বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমাগত বরফজল পান করিয়াও তাহার নিবৃত্তি করিতে পারিতেছিলাম না।

এডেনে মিসেস্ ও কাপ্তেন পেরি এবং ডাক্তার ফ্লানাগান্ নামিয়া গিয়াছেন। ডেকের উপর তাঁহারা যেখানে বসিতেন, সেদিকে চাহিয়া বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। মিসেস্ পেরি বিদায় লইবার সময়ে কম্পিত স্বরে বলিলেন,

"ভগবান আপনাদের শরীর ভাল রাখুন,—আপনাদের মঙ্গলের জন্য আমি প্রার্থনা করিতে ভুলিব না।" তাঁহার কথাগুলি আমার কাণে এখনও যেন বাজিতেছে। আমরা কাহারো সহিত ঝগড়া করিলে, বাহ্যিক মিটমাট করিয়া মনের মধ্যে কিছু-না-কিছু অসন্তোষের ভাব লুকাইয়া রাখি। এই বিষয়ে ইংরাজ জাতি আমাদের অপেক্ষা কত মহৎ। তাহারা মুখের চেয়ে হাতের ব্যবহারই বেশী করিয়া থাকে—অনেক সময় রক্তারক্তি হইয়া যায়। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই যদি সব মিটিয়া যায় ও পরস্পরে করমর্দ্দন করে, তাহা হইলে সেই সঙ্গে তাহাদের মনের কালিও সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলে—যেন কখন কিছু হয় নাই। আমরা অনেক সময়ে ইংরাজদের দোষগুলির, অনুকরণ করিয়া থাকি,—তাহাদের গুণের অনুকরণ করাই প্রয়োজন।

সুয়েজ কেনাল্ ও সুয়েজ বন্দরের পথে কেবল বালি ধূ-ধূ করিতেছে। গাছের মধ্যে কেবল খেজুর গাছ। বালুকারাশির দিকে বেশীক্ষণ চাহিয়া থাকা যায় না। মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ু আমাদের শরীর দগ্ধ করিতেছিল। হঠাৎ তখন মনে পড়িল, "সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।" দুই দেশে কত প্রভেদ! যাহা হউক, বেশী দিন কষ্ট পাইতে হয় নাই,—শীঘ্রই ভূমধ্যসাগরে আসিয়া পড়িলাম, গরমও কমিয়া গেল।

এডেন হইতে ষষ্ঠ দিবসে আমরা পোর্টসায়েদে পঁহুছিলাম। সুয়েজ বন্দর একটি ক্ষুদ্র স্থান কিন্তু পোর্টসায়েদ বেশ একটি জমকাল সহর। এই স্থান হইতে য়ুরোপের আরম্ভ বলিতে পারা যায়; কারণ, আফ্রিকার উপকূল হইলেও সহরটিতে য়ুরোপীয়ান বিস্তর। ইহার আর একটি নাম "ক্ষুদ্র প্যারিস্" (miniature Paris)। য়ুরোপের যত বদমায়েস্দের আড্ডা এই সহরে,—এবং পাপের স্রোতে ইহা পঙ্কিল। পোর্টসায়েদে আসিলে প্রথমে মনে হয় যে, এতদিনে য়ুরোপীয়ান সহরের একটু নমুনা দেখা গেল। এই স্থানেই প্রথমে "glare of the West" (পাশ্চাত্য দেশের চাকচিক্য) বুঝিতে পারা যায়।

পোর্টসায়েদ ছাড়িয়া পঞ্চম দিবসে মেসিনায় আসা গেল। পথে "ষ্ট্রম্বলি" (Stromboli) আগ্নেয়-গিরির নিকট দিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের জাহাজ চলিয়াছিল। সে সুন্দর ও ভীষণ দৃশ্য জীবনে কখন ভুলিব না। যেন আরব্য উপন্যাসের এক ভীষণ দৈত্য মুখ দিয়া অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। মেসিনা সহরটি অতি সুসজ্জিত ও মনোরম, যেন একখানি ছবি। এইবার যথার্থ য়ুরোপীয়ান সহর প্রথম দেখিলাম। কে তখন জানিত যে, তিন মাস পরে "ষ্ট্রম্বলির" কৃপায় এই সমৃদ্ধিশালী নগর এক দিনে ভূগর্ভে মিশিয়া যাইবে, তাহার কোন চিহ্ন মাত্র থাকিবে না! আমরা নিউইয়র্কে পঁহুছিবার দুই মাস পরে সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, মেসিনা রসাতলে গিয়াছে। কি পাপে বা পুণ্যে এক দিনে লক্ষাধিক স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকার জীবন্ত সমাধি হইল, কেহ বলিতে পারেন কি?

সেই দিনই মেসিনা ত্যাগ করিয়া জাহাজ ইটালী অভিমুখে ছুটিল, এবং পর দিবস আমরা নেপলসে পঁহুছিলাম। যাত্রার প্রথম অংশ ভগবানের কৃপায় সম্পূর্ণ হইল,—এই স্থানে জাহাজ বদল করিতে হইবে। নেপল্সের সৌন্দর্য্য ও মনোহর দৃশ্যাবলীর বর্ণনা করিতে গেলে একখানি বড় পুস্তক লিখিতে হয়। ভ্রমণ-কাহিনী লেখা যখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, তখন সহরের বর্ণনা করিয়া পুঁথির আয়তন বৃদ্ধি না করাই ভাল। আর য়ুরোপ্ ত' এখন ঘরের সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—ইচ্ছা করিলেই আপনারা স্বচক্ষে সব দেখিয়া আসিতে পারেন।

জেনোয়া হইতে যে বড় জাহাজগুলি প্রতি সপ্তাহে আমেরিকা যায়, তাহার একখানি আমরা নেপল্সে পঁহুছিবার দুই দিন পূর্ব্বেই এই বন্দর হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাদের এখন পাঁচ দিন এখানে থাকিতে হইবে। অন্যান্য বন্ধুবান্ধব সকলেই এখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এগার জনের মধ্যে আমরা পাঁচজন মাত্র ভারতবাসী আমেরিকা-যাত্রী রহিলাম। তিন সপ্তাহকাল একত্র বাস করিয়া এত বন্ধুত্ব হইয়াছিল যে, স্বদেশে এক যুগেও তাহা হয় না। বিদায় গ্রহণের কালে প্রায় সকলেরই চক্ষু আর্দ্র হইয়াছিল। হোটেলে আসিয়া মনে হইল, "নানা পক্ষী এক সঙ্গে, নিশীথে বিহরে রঙ্গে, প্রভাত হইলে করে সবে পলায়ন"। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, এই পাঁচ দিন জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, ও রোম দেখিয়া কাটাইব; কিন্তু পর দিন মতলব্ উল্টাইয়া গেল। "নর্ড—এমেরিকা" নামের একখানি অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজ সেই দিন নিউইয়র্কে যাইবে শুনিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া জেটিতে উপস্থিত হইলাম। এবার একটু নূতনত্ব

আছে। চক্ষুরোগ (Trachoma) থাকিলেই সর্ব্বনাশ। যাহা হউক, আমাদের কোন ভয়ের কারণ ছিল না। আমরা ডাক্তারের নিকটবর্ত্তী হইয়া নিজেরাই চক্ষু বিস্তৃত করিয়া দেখাইলাম। তিনি একই তারের যন্ত্র দিয়া সকলের চক্ষু পরীক্ষা করিতেছিলেন। কি ভয়ানক! Trachoma সংক্রামক পীড়া, ইহা কি তাঁহার জ্ঞান ছিল না! নিউইয়র্কে পঁহুছিয়া কিছুদিন পরে এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়াছিলাম; তাহাতে ডাক্তারদের ভবিষ্যতে সাবধান হইতে বাধ্য করা হইয়াছিল।

কি কুক্ষণে "নর্ড এমেরিকা" জাহাজে পদার্পণ করিয়াছিলাম! এমন স্বেচ্ছাচার কখন দেখি নাই। ইহা uni-class জাহাজ—অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণী কিছুই নাই। সবই এক ক্লাসের যাত্রী। অধিকাংশই ইতালীয়ান, দুই চারিজন আমেরিকানও আছেন। পরিচিতের মধ্যে মিসেস্ ও মিঃ হিউমকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। কেবিনে গিয়া দেখি, কি একটা দুর্গন্ধময় পদার্থ পড়িয়া আছে। তাহা আর কিছু নহে, জেনোয়া হইতে যে লোকটি এই কামরায় ছিল তাহারই "সমুদ্র-পীড়ার" চিহ্ন। তিন সপ্তাহ ইতালীয়ান জাহাজের কর্ম্মচারীদের সহিত মিশিয়া ও একখানি বাক্যালাপের পুস্তকের সাহায্যে চলিত কথা অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছিলাম। এবার একেবারে কাপ্তেনের নিকটে গিয়া কেবিন পরিষ্কার করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে বলিলাম। হুকুম হইল যে, আমরা যে কয়জন প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী এ জাহাজে আছি, তাহাদের সুবিধার দিকে যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। কিন্তু সুবিধা হইবে কোথা হইতে? জাহাজে স্নানের বন্দোবস্ত মোটেই নাই। এ জাহাজে স্নান অর্থে মাথায় ও মুখে হাতে দুই পেয়ালা আন্দাজ জল দেওয়া। রাস্তায় পালার্মো সহরে জাহাজ থামিলে, একটা হোটেলে গিয়া স্নান করিয়াছিলাম; আর তাহার পরের স্নান দুই সপ্তাহ পরে নিউইয়র্কে। "রুবিতানো" জাহাজে জলাভাব মোটেই ছিল না; আমরা প্রত্যহই স্নান করিতাম। কিন্তু "নর্ড-আমেরিকা"য় কেবল পানীয় জল ছাড়া আর কিছু ছিল না। সমুদ্রের লোণা জল ছিল বটে, কিন্তু স্নানাগার কোথা? তাহার পর, ভূমধ্যসাগর জিব্রল্টরে যখন শেষ হইল ও আমরা আট্লাণ্টিক মহাসাগরে পড়িলাম, তখনকার অবস্থা অবর্ণনীয়। প্রবল পরাক্রম আটলাণ্টিক যেন জাহাজখানিকে লইয়া ফুটবল্ খেলিতে লাগিল। স্ত্রীলোকদের চীৎকার, বালকদের ক্রন্দন, কতকগুলি পুরুষের (ইহারা পুরুষ কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে) উন্মত্তের ন্যায় মস্তকের কেশ উৎপাটন—এক দিকে এই দৃশ্য, অপর দিকে দুই হাত অন্তর "সমুদ্র-পীড়া"র চিহ্ন সকল চতুর্দ্দিকে ছড়ান। প্রায় সাড়ে তিনশত যাত্রী। তাহাদের আবর্জ্জনা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা এই জাহাজের অল্প সংখ্যক কর্ম্মচারীদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং আমরা দুর্গন্ধের মধ্যেই রাত্রিবাস করিতে লাগিলাম। রাত্রে বেশ কন্‌কনে শীত, ডেকের উপর শয়নের উপায় নাই।

যাহা হউক, এত যে কষ্ট, তাহা আমরা আটলাণ্টিক্ দেখিয়া ভুলিয়াছিলাম। পর্ব্বত দেখিতে হইলে হিমালয়, আর সমুদ্র দেখিতে হইলে আটলাণ্টিক্। ভারত-মহাসাগর বা ভূমধ্য সাগর ইহার নিকট পুকুর বলিলেই চলে। ভূমধ্যসাগরের ত' একটা অপর নাম Herring pond। বেশী তুফানের সময় আটলাণ্টিকের এক-একটি ঢেউ যাট্ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। পর্ব্বতাকার তরঙ্গ, একটির পর একটি, যখন প্রবল বেগে আসিতে থাকে, তখন মনে হয় যে, যে-কোন মুহূর্ত্তে জাহাজকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। দূরে অন্য একখানি জাহাজ যখন দুইটি তরঙ্গের মধ্যে পড়িতেছে, তখন তাহার মাস্তল পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না,—মনে হইতেছে, যেন চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইল। এই আট্লাণ্টিকে যত জাহাজ নষ্ট হয়, তত আর কোন সমুদ্রে হয় না।

গল্প-গুজবে এক রকম দিন কাটিতেছে। জাহাজের আমরা নূতন নামকরণ করিয়াছি, "নর্দ্দামা-মার্কা।" আহারের বিশেষ কোন কষ্ট নাই; তবে প্রত্যহ দুইবার করিয়া এমন একটি চমৎকার পনীর টেবিলের নিকট লইয়া আইসে যে, তাহাতে আমরা দশ মিনিট কাল নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য হই। ওয়েটারটি বেশ রসিক। প্রত্যহ হাসিতে হাসিতে সেই পনীর লইয়া উপস্থিত হয়, আর ঘরের চৌকাট পার না হইতেই সব টেবিল হইতে যোড়া-যোড়া হাত উঠিয়া তাহাকে "দূর-দূর" করিতে থাকে। কিন্তু সেও নাছোড়বন্দা। সকলের নিকটে একবার পনীরটি



সোমালীগণ



এডেনের সোমালী ব্যবসায়িগণ



আরবের মরুভূমিতে আরবীয় উট

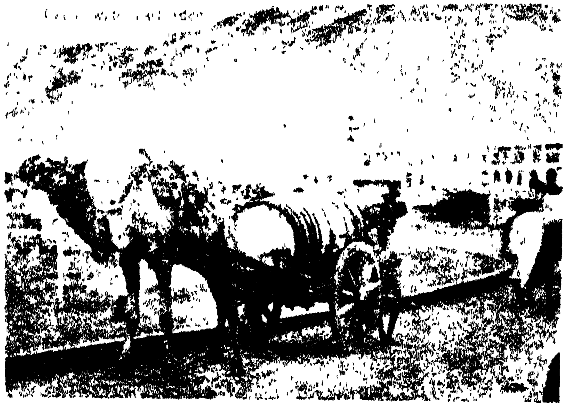


এডেনের আরব পল্লী

নিশ্চয়ই দেখাইবে। এই পনীরের একটু ইতিহাস আছে, —সেই জন্যই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। ইহার কল্যাণে আমেরিকান্ মহিলার পুরুষোচিত বীর্য্যের নমুনা প্রথমে দেখিতে পাইলাম। মিসেস্ হিউমকে একজন ইটালিয়ান পনীরের কথা লইয়া কি বিদ্রূপ করিয়াছিল। মিঃ হিউমকে কিছু বলিতে হইল না। মিসেস্ চক্ষের নিমেষে চেয়ার হইতে উঠিয়া, সেই ইটালীয়ানের পঞ্জরে সজোরে এমন পদাঘাত করিলেন যে, সে মেঝের উপর পড়িয়া গেল। বেচারী যেমন গা ঝাড়িয়া উঠিল, মিসেস্ হিউম তাহার মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ

করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে ঘরের বাহিরে গেলেন। আমার মনে হইল, যেন Duke of Wellington Waterloo জয় করিয়া চলিয়া গেলেন। স্ত্রীলোকের পদাঘাত ইতালীয়ান মহাশয় হজম করিতে বাধ্য হইলেন। আর কোন উচ্চ বাচ্য হইল না। কেবল সন্ধ্যার সময় দেখিলাম, হিউঃ পরিবার অন্য টেবিলে বসিয়াছেন।

আমরা ক্রমশঃই বেশী শীত অনুভব করিতেছি। নিউ ইয়র্ক নিকটবর্ত্তী। দুই দিন তিনি মৎস্যের দল দেখা গেল



[illegible]



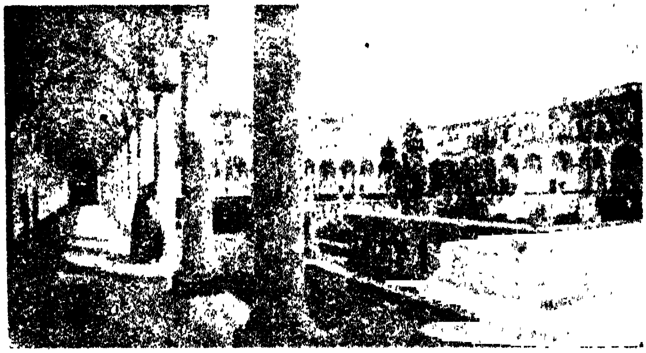
সাধারণ চক—নেপল্‌স্



লা ফনটানা—জাতীয় উদ্যান বাটিকা—নেপল্‌স্

একটা ছানা এক দিন জাহাজের খুব নিকটে আসিয়াছিল,—তাহার বিরাট আকার দেখিয়া ভয় হইয়াছিল যে, পুচ্ছাঘাতে জাহাজ না ভাঙ্গিয়া দেয়।

১লা আশ্বিন, ১৩১৫ সাল আমার চিরকাল মনে থাকিবে। এই দিন বিকালে জাহাজ Statue of Liberty (স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি)র নিকটে আসিল। দূর হইতে জাহাজের বেগ মন্দীভূত করা হইল; এবং মাস্তুলে ইটালিয়ান ও আমেরিকান জাতীয় নিশান উড়িতে লাগিল। তাহাতে ব্যাণ্ড ছিল না। কিন্তু জনকয়েক ইতালিয়ান হাপ্ ও বেহালার সাহায্যে Star Spandle Banner



[illegible] নেপলস



[illegible]



[illegible] উদ্যান—নেপলস

বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিলেন। কি মিষ্ট বাদক এই ইটালিয়ানরা! অনেক ইটালিয়ান্ গান বা গৎ আমাদের দেশের সুর বলিয়া মনে হয়।

স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র জাহাজ একেবারে থামিয়া গেল; আর শত-শত কণ্ঠ হইতে এক গগনভেদী জয়ধ্বনি উঠিল। সকলে অনাবৃত মস্তকে বার-বার তিনবার জয়ধ্বনি করিলেন,—জাহাজ হইতে ক্রমাগত Siren (জাহাজের বাঁশী) বাজিতে লাগিল, এবং তাহার পরই সকলে নতজানু হইয়া বসিয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। ধন্যবাদ শেষ হইলে জাহাজ পুনরায় ধীরে-ধীরে চলিতে লাগিল। যতক্ষণ পারিলাম, চক্ষু মেলিয়া স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তিকে দেখিলাম। এই শত-শত বৎসরের পরাধীন জাতির একজন লোকের কি তখন মনে হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতে অক্ষম। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে আমি ভালই মনে করিতাম ও এখনও করি। বাল্যকাল হইতে অনেক ভাল ইংরাজের সহিত মিশিয়াছি; এবং পরে বিলাতে অনেক



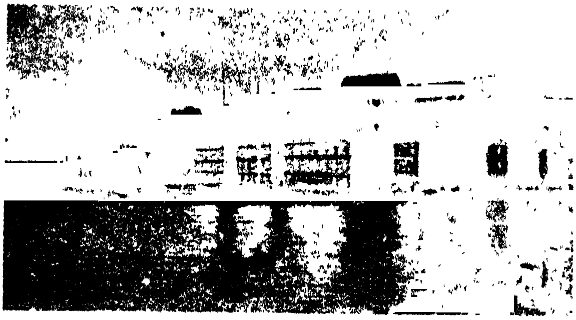
[illegible]র অভ্যন্তর-ভাগ—নেপল্‌স



নেপল্‌স—কাপোডিমন্টি উদ্যান



ডন আন্না এ পোসিলিপো প্রাসাদ—নেপল্‌স



সেণ্ট এলিমো দুর্গ — নেপলস



নেপলস্-বাঁধ

উদার হৃদয় মহাপুরুষ ইংরাজের সংস্রবে আসিয়াছি। ইংরাজ মহিলার ভগিনীর অধিক যদি অকৃত্রিম যত্ন থাকে, তাহাও পাইয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি। কিন্তু কি জানি কেন, তখনও মনে হইয়াছিল এবং এখনও মনে হয় যে, সেই Statue of Libertyর দেশে থাকি।

কি বিরাট মূর্ত্তি! দেখিলেই যুগপৎ ভক্তি ও বিস্ময় মনকে অধিকার করে এবং মনে কত যেন আশা ও ভরসার উদ্রেক হয়।

পরে নিউইয়র্ক হইতে আসিয়া এই প্রতিমূর্ত্তিকে ভাল করিয়া দেখিয়াছি এবং ইহার উপরেও উঠিয়াছি। সন্ধ্যা হইলেই ইহার হস্তস্থিত মশাল ও মস্তকের মুকুট হইতে যখন বৈদ্যুতিক আলোকের ছটা বাহির হয়, তখন এক অপূর্ব্ব শোভা হয়। বহুদূর হইতে এই আলোক দেখা যায়।

এই প্রতিমূর্ত্তি আমেরিকার স্বাধীনতার সম্মানস্বরূপ ফ্রান্স আমেরিকাকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। ইংরাজি ১৮৮৬ সালে ইহা সংস্থাপিত হয়। ইহার নির্ম্মাতা বিখ্যাত ভাস্কর বারথল্ডি। ইহার ওজন ৪৫০,০০০ পাউণ্ড বা ২২৫ টন্। ইহাতে 'ব্রোঞ্জ' ধাতুই আছে ২০০,০০০ পাউণ্ড। চল্লিশ জন লোক ইহার মাথার ভিতর আরামে দাঁড়াইতে পারে, হাতে যে মশাল আছে তাহার মধ্যে বারজন। প্রতি অঙ্গের আয়তন লিখিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না, দুই চারিটি বলিলেই বোধ হয় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন :—

ভিত্তি হইতে হস্তস্থিত মশালের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত—৩০৫ ফীট, ৬ ইঞ্চ।

কেবল প্রতিমূর্ত্তি	১৫১	ফীট	৬	ইঞ্চ
বাম হস্ত, দৈর্ঘ্য	১৬	"	৫	"
দক্ষিণ বাহু	৪২	"		
নাসিকা	৪	"	৬	"
এক একটি নখ	১৩ × ১০ ইঞ্চ			

প্রতিমূর্ত্তির ভিতরে উঠিবার জন্য ১৫৬টি ধাপ আছে ও কতকদূর পর্য্যন্ত ইলেকট্রিক লিফ্টও আছে।

স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর শ্রেষ্ঠ দেশ আমেরিকার উপযুক্ত এই মূর্ত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যে ফ্রান্স ইহা তাহার নিজ-তন্ত্রের ভগিনীকে উপহার দিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় কত উদার!

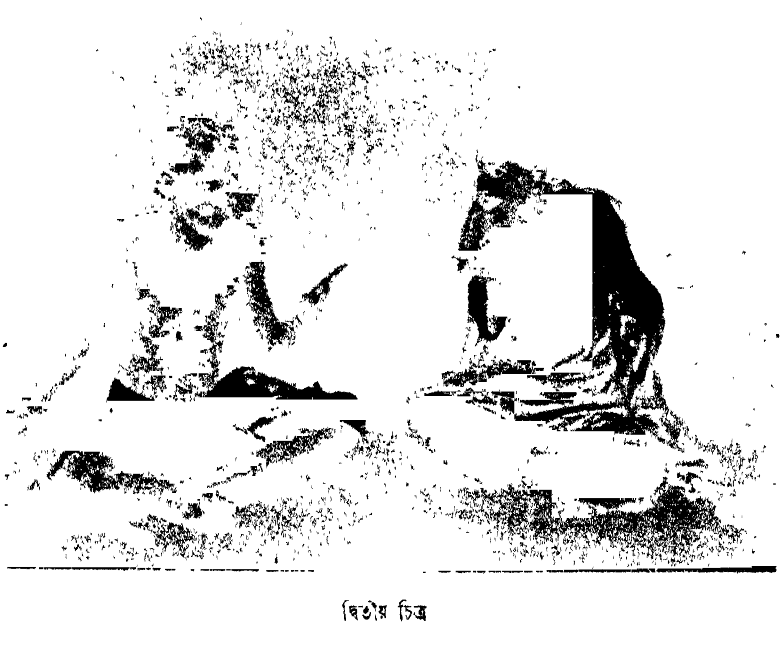
আজ জাহাজ নিউইয়র্ক বন্দরের অতি নিকটে। স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বন্দরে প্রবেশ করিতে হয়, যেন দেবতার মন্দির হইয়া গৃহ-প্রবেশ।

পরনিন্দা-চাট্‌নী

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]



প্রথম চিত্র



দ্বিতীয় চিত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ

কয়লার খনি

[শ্রীসুশীলচন্দ্র রায় বি এস সি]

গহ্বরের আকার (Shape of the Shafts)

ইহার আকার চারি প্রকার হইতে পারে।

(১) সমকোণী (Rectangular)

(২) বহুভুজবিশিষ্ট (Polygonal)

(৩) ডিম্বাকৃতি (Elliptical)

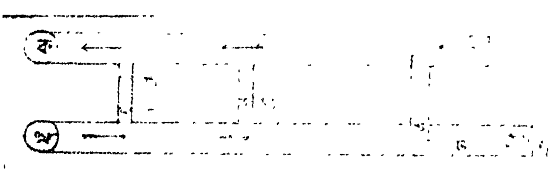
(৪) গোলাকার (Circular)

(১) ইহা প্রায়ই ধাতুখনিতে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে প্রত্যেক পিঞ্জরের জন্য কাঠের খোপ প্রস্তুত করা হয়। ইহার অসুবিধা এই যে, যখন একটি পিঞ্জর উঠে ও একটি নামে তখন তাহাদের ভিতর বায়ু-চলাচলের জন্য যথেষ্ট স্থান থাকে না।

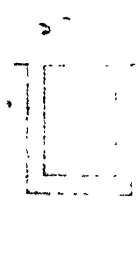
(২) এই আকার সাধারণত সাউথ ওয়েলসে (South Wales) ব্যবহৃত হয়। ইহাতেও ১নং আকারের অনেক কাঠের দরকার। সুতরাং যেখানে কাঠের মূল্য সুলভ সেখানেই এরূপ আকার সম্ভব।

(৩) উপরিউক্ত দুই প্রকার অপেক্ষা ইহা মজবুত [illegible] পিঞ্জর থাকে এবং উভয় পার্শ্বে দমকল, নল ও বায়ু চলাচলের জন্য স্থান থাকে। ই, আই, আর কোম্পানীর গিরিডির খনির গহ্বরের আকার এইরূপ।

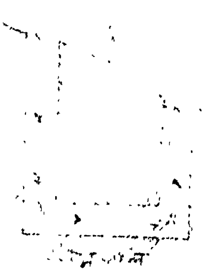
(৪) আমাদের এখানে সর্বস্থানের গহ্বরের আকার গোল। ইহা সর্বাপেক্ষা মজবুত এবং ইহা অন্য আকার অপেক্ষা পাথের [illegible] ইহার গঠনও সহজ [illegible]।



গহ্বরের আকার (১)



(২)



(৩)



(৪)

খনন (Sinking)

গহ্বরের (Shaft) স্থান ও আকার ঠিক হওয়ার পর তাহার খনন কার্য আরম্ভ হয়। গহ্বরের বাহিরের দেওয়াল ইষ্টক দ্বারা দরকার, কাটিবার সময় উহু মাপের ইষ্টক গাঁথিবার জন্য গহ্বরের মাপ বেশী করিয়া আরম্ভ করা হয়। ঐ প্রাচীর পাথর [illegible] উঁচু করা হয়। কঠিন প্রস্তরে পৌঁছান পর্যন্ত গহ্বরের মাপ একরূপ বেশী রাখিয়া যাওয়া হয়। তার পর সেখান হইতে আবশ্যক মত মাপ রাখিয়া যাওয়া হয়, কারণ সেখান হইতে আর ইষ্টকপ্রাচীরের আবশ্যক হয় না।

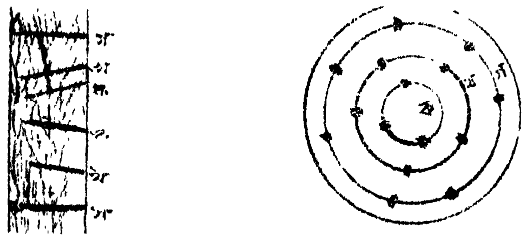
কঠিন প্রস্তর উপর হইতে [illegible] পর্যন্ত পূর্ববর্তী খননের [illegible] বহে। কিন্তু [illegible] বেশী হইলে মাথায় বোঝা লইয়া এইরূপ [illegible] অসম্ভব হইয়া পড়ে। তখন উপরে একটি কাঠের ফ্রেম করিয়া তাহাতে একটি কপিকল ঝুলান হয় এবং তাহার দ্বারা দড়ি দিয়া বেতের ঝুড়ি করিয়া নীচের প্রস্তরাদি কাটিয়া অংশ উপরে তুলা হয়। [illegible] তুলিবার সময় বেতের পরিবর্তে মহিষ চর্মের ঝুড়ি ব্যবহৃত হয়।

এইরূপে কঠিন প্রস্তরে পৌঁছিলে, সেই প্রস্তরের উপর হইতে ইষ্টকের প্রাচীর গাঁথিয়া উপর পর্যন্ত তোলা হয় এবং প্রাচীর নিশ্চিত হইয়া গেলে, তখন উপরে অস্থায়ী ভাবে ছোট Headgear ও ছোট Engine বসান হয়। এই Headgear ও Engine কেবল খনন কার্যের জন্য। খনন কার্য হইয়া গেলে, তাহার পর স্থায়ী ভাবে Headgear ও Engine বসান হয়।

কঠিন প্রস্তর ডিনামাইট দিয়া ফাটাইয়া দেওয়া হয়। ডিনামাইট কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা নিম্নের চিত্র হইতে বুঝা যাইবে।



ডিনামাইট ব্যবহারের প্রণালী



প্রথমে 'ক' চিহ্নিত গর্তগুলি খনন করা হয়। এই গর্তগুলি সোজা না হইয়া একটু বক্র হইবে। তাহার পর উহাদের ভিতর ডিনামাইট পুরিয়া ফাটান হয়। তৎপরে 'খ' চিহ্নিত গর্তগুলি একরূপে খনন করা হয়। এইরূপে খনন শেষে পৌঁছান হয়, কিন্তু সেখানে আর ডিনামাইট ব্যবহার করা হয় না,— তাহাতে গহ্বরের পার্শ্ব খারাপ হইতে পারে। সেখানে শাবল দিয়া সমান করা হয়।

বিস্ফোরক (Explosives)

প্রস্তরের কাঠিন্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকার বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়।

(১) Gunpowder ইহা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া সকল স্থানে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারা যায়।

ইহাতে শতকরা—৭৫ ভাগ Potash Nitrate (সোরা)
" ১৫ " কাঠকয়লা
" ১০ " গন্ধক থাকে।

ইহা কঠিন প্রস্তরে ব্যবহৃত হয় না।

(২) Dynamite—কয়লার গুঁড়া ও সোরা দিয়া Nitro-glycerine শোধন করা হয় এবং ইহাকেই ডিনামাইট বলে। ইহা টোটার (cap) ভিতর পুরিয়া ব্যবহৃত হয়। অগ্নি সংযোগ করিবার সময়ে প্রথমে পলিতার একমুখ একটু বক্র ভাবে কাটিয়া তাহা detonatorএর ভিতর পুরিয়া দিয়া detonatorএর মুখ বেশ করিয়া চাপিয়া দেওয়া হয় যাহাতে তাহা পলিতাটি ধরিয়া থাকে। তৎপরে একটি কাষ্ঠশলাকা দ্বারা টোটার ভিতর গর্ত করিয়া detonatorটি ভাল করিয়া বসাইয়া দেওয়া হয় এবং টোটাটি প্রস্তরের গর্তের ভিতর পুরিয়া প্রথমে মৃত্তিকা দ্বারা ধীরে ধীরে, এবং পরে কাষ্ঠ বা তাম্রশলাকা দ্বারা ভাল করিয়া চাপিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে সব ঠিক হইলে, সেখানকার লোকজন সরাইয়া পলিতায় অগ্নি-সংযোগ করা হয়। পলিতাটি ৪।৫ ফিট বাহিরে থাকে; সুতরাং ঐ ৪।৫ ফিট জ্বলিয়া যাইবার পূর্ব্বে, যে লোক অগ্নি সংযোগ করে সে পলাইতে পারে।

Detonator—Fulminate of Mercury আর Potash chlorate এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া একটি তাম্রনির্ম্মিত চোঙ্গের ভিতর পূরণ করা হয়। উহাকে detonator বলে। পলিতার অগ্নি ইহা স্পর্শ করিবামাত্র ইহা ফাটিয়া যায় এবং ইহার সংঘর্ষে ডিনামাইটও ফাটে।

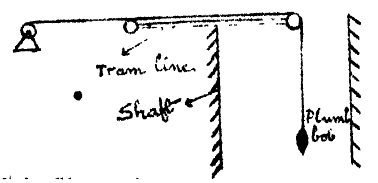
পলিতা প্রথমে বারুদ পাট (jute) দিয়া জড়ান হয় এবং তৎপরে ইহা আলকাতরায় ডুবান হয়, যাহাতে জল লাগিয়া নষ্ট না হয়।

যে সমস্ত খাদে Marsh gas ইত্যাদি গ্যাস আছে, সেখানে ডিনামাইট ব্যবহার করা বিপজ্জনক। সেখানে Mines Actএর অনুমোদিত একরূপ explosive আছে, তাহারই ব্যবহার করা হয়। ইহাদিগকে Nitrate of ammonium class explosives বলে।

গহ্বরের ব্যাস (Diamter of the Shaft)

গহ্বর দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে গেলে দেখিতে হইবে যাহাতে তাহার ব্যাস বরাবর সমান হয় এবং তাহা ঠিক সোজা (vertical) থাকে। ইহার জন্য নিম্নের উপায় অবলম্বন করা হয়।

(১) গহ্বর মুখের উভয় পার্শ্বে কাষ্ঠের তক্তা থাকে এবং উহার মধ্যে একটি Tramline বসান থাকে। গহ্বরের ঠিক মধ্যস্থলে Tramlineএর উপর একটি কপিকল থাকে এবং এই কপিকলের উপর দিয়া একটি রজ্জু ঝুলান থাকে। রজ্জুর এক প্রান্ত গহ্বরের ভিতর থাকে এবং তাহাতে একটি ওলন (plumb bob) ঝুলান থাকে এবং অন্য প্রান্ত তক্তায় আবদ্ধ থাকে। সেই ওলনকে কেন্দ্র করিয়া চারিধার মাপিয়া গহ্বরের ব্যাস ঠিক রাখা হয়।



ট্রামলাইন ও স্যাফ্‌ট

(২) Tram lineএর পরিবর্ত্তে একটি কব্‌জা দেওয়া হাতল থাকিতে পারে এবং তাহার একপ্রান্তে একটি কপিকল থাকে। ইহার উপর দিয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ওলন ঝুলান থাকে। কার্য্য হইয়া গেলে হাতল গহ্বরের মুখ হইতে সরাইয়া রাখা যাইতে পারে।

প্রাচীর গঠন

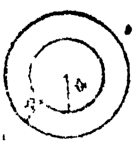
উপর হইতে খনন করিতে আরম্ভ করিয়া নিম্নে কঠিন প্রস্তরে পৌঁছিলে, সেখানে চতুষ্পার্শ্বে আলিসা (ledge) রাখা হয়। এই আলিসার উপর হইতে গহ্বর-মুখ পর্য্যন্ত ইষ্টক প্রাচীর গাঁথা হয়। ইংলণ্ডে ইষ্টক প্রাচীরের পরিবর্ত্তে লৌহের পাত দিয়া চারিধারে মুড়িয়া

দেয়। প্রাচীর গাঁথিবার সময় আলিসার (ledge) উপরিভাগ সাবল দিয়া সমান করা হয় এবং গাঁথিবার সময় মিস্ত্রীরা উপর হইতে লম্বমান্ বাঁশের মাচানের উপর বসিয়া কার্য্য করে। এই মাচানের মধ্যস্থলে বাল্‌তি দিয়া নীচে হইতে জল ইত্যাদি তুলিবার জন্য জায়গা থাকে।

বাঁশের মাচানের পরিবর্ত্তে আর এক প্রকার মাচান ব্যবহার করা হয়, তাহাকে Walling Stage বলে। ইহা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ও গোলাকার এবং ইহার চারিদিকে টিন দিয়া ঘেরা থাকে, যাহাতে লোকজন নীচে পড়িয়া না যায়।

ইষ্টকের পরিমাণ

এই প্রাচীরের ইষ্টক খুব ভাল হওয়া দরকার। ইহা সাধারণতঃ ৯" × ৪" × ৩" বা ১০" × ৫" × ২½" আকারের হইয়া থাকে।



গহ্বর

যদি ক গহ্বরের বহির্ব্যাস হয়

" খ " ভিতরের ব্যাস হয়, তাহা হইলে বাহিরের বৃত্তের কালি (area) ক^{2} × ·৭৮৫৪, ভিতরের কালি (area) খ^{2} × ·৭৮৫৪। কিন্তু আমাদের যতটা ইষ্টক দিয়া গাঁথিতে হইবে, তাহার কালি (area) = ·৭৮৫৪ (ক^{2} − খ^{2}); এবং 'গ' যদি ইহার গভীরতা হয়, তবে ইহার ঘন কালি (cubic area) = গ × ·৭৮৫৪ (ক^{2} − খ^{2}) অতএব ইষ্টকের সংখ্যা গ = ÷ একখানি ইষ্টকের ঘনকালি ·৭৮৫৪ (ক^{2} − খ^{2})। এই গণনায় অবশ্য mortar ধরা হয় নাই। গাঁথুনির মসলার মধ্যে চূণ এবং বালি কিম্বা চূণ এবং সুরকি আর যেখানে বেশী জল থাকে সেখানে সিমেণ্ট মাটি ব্যবহার করা হয়। ১ ভাগ চূণ ও ২ ভাগ সুরকি এই অনুপাতে থাকে।

প্রাচীর প্রায় ১৮" ইঞ্চি হইতে ২৪" ইঞ্চি পর্য্যন্ত চওড়া হয়।

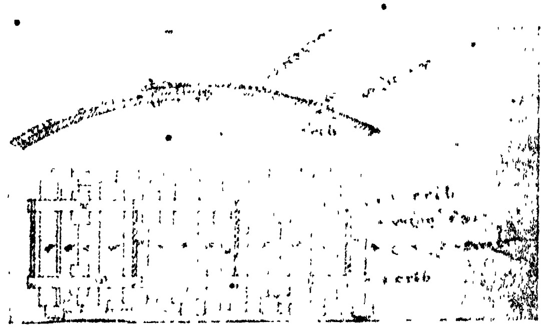
খরচ

গহ্বর খননের সাধারণ খরচ, বিস্ফোরক (Explosives) লোকজনের বেতন ইত্যাদি ধরিয়া ৩০ হইতে ৪০ টাকা প্রতি ফুটে পড়ে এবং Engine ইত্যাদি সমস্ত ধরিয়া একটি গহ্বরের সমস্ত খরচ প্রতি ফুটে ১০০৲ টাকা পড়ে। অবশ্য আমি যুদ্ধের পূর্ব্বের কথা বলিতেছি; এখন খরচ অনেক বেশী পড়ে। প্রতি সপ্তাহে সাধারণতঃ ১০ ফিট করিয়া কার্য্য হইয়া থাকে।

খাদের পার্শ্ব-রক্ষণ (Temporarily supporting the side of Shafts.)

গহ্বর খনন করিবার সময় যদি উভয় পার্শ্বের মাটি এরূপ নরম হয় যে, তাহা খসিয়া পড়িতে পারে, তবে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য অস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে হয়।

কিছুদূর খনন করিবার পর উপরে গহ্বর অপেক্ষা কিছু বড় একটি চতুষ্কোণ কাঠের ফ্রেম বসান হয়। তাহারি পর আন্দাজ ৪ ফিট গভীর হইলে, সেখানে একটি গোলাকার কাঠের ফ্রেম বসান হয়। এই ফ্রেম গহ্বরের ধার ঠিক মিল করিয়া ছোট ছোট অংশে ভাগ করা থাকে,—ইহাদিগকে crib বলে। ইহা প্রায় ৬" ইঞ্চি চওড়া ও ৪ ফিট লম্বা এবং ইহা উপরে চতুষ্কোণ ফ্রেম হইতে লোহের আংটা দিয়া ঝুলান থাকে। গহ্বরের ধার ও এই গোলাকার ফ্রেমের ভিতর কাঠের তক্তা উপর হইতে আঘাত দিয়া আঁটিয়া বসান হয়, যাহাতে ধারের মাটি খসিয়া না পড়িতে পারে। ধারের মাটির প্রকৃতি অনুসারে প্রায় ৩।৬ ফিট অন্তর এক-একটি crib বসান হয়। ২টি crib এর মধ্যে আবার ছোট-ছোট তক্তা দিয়া, গজাল দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। যতক্ষণ কঠিন প্রস্তরে না পৌঁছান যায়, ততক্ষণ এইরূপে পার্শ্ব রক্ষা করা হয়। তাহার পর যখন প্রস্তর স্তরের উপর হইতে প্রাচীর গাঁথা আরম্ভ হয় তখন একে একে এইগুলি খুলিয়া লওয়া হয়।

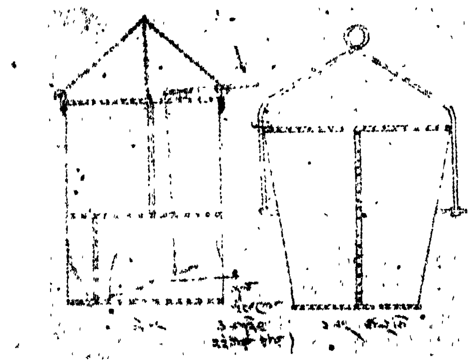


কাঠের ফ্রেম

গহ্বর খনন করিবার সময় ভিতরে অনেক জল জমে। যেখানে খনন করা হয় সেখানে জল থাকে; তদ্ভিন্ন বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া জল চুয়াইয়া আসে। এই জল হয় দমকল দিয়া উপরে তোলা হয়, নচেৎ কপিকলের উপর দিয়া লৌহ রজ্জু দ্বারা বালতি ঝুলাইয়া সেই বাল্‌তি দিয়া তোলা হয়।

এই বালতি নানা প্রকারের আছে; তন্মধ্যে দুই প্রকারের চিত্র দেওয়া গেল। যেখানে জলের ভাগ কম সেখানে ১নং বালতি ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্তু যেখানে জল বেশী সেখানে ২নং বালতি ব্যবহৃত হয়। ইহার নীচে একটি দ্বার (Valve) আছে। যখন বালতি জলের ভিতর ডুবান হয়, তখন নীচের জলে চাপে দ্বার (Valve) খুলিয়া যায়,

এবং ভিতরে জল প্রবেশ করে; কিন্তু যখন বালতি উঠান হয়, তখন বালতির জলের চাপে দ্বার (Valve) বন্ধ হইয়া যায়। বালতি উপরে পৌঁছিলে ঐ দ্বার (Valve) সংলগ্ন দড়ি টানিয়া ধরা হয় এবং সব জল বাহির হইয়া যায়।



১নং ও ২নং বালতি

পুরাতন কথা—খাঞ্জা খাঁ

[শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

মানুষ সমাজে তাহার নিজের নাম রাখিয়া যায় নানা কাজের সাহায্য লইয়া,—এ সে কাজ যে প্রকারই হউক।

'বিশ্বনাথ' তাহার নাম রাখিয়া গিয়াছেন ডাকাতি করিয়া ও সেই সঙ্গে 'বাবু' খেতাব লইয়া, 'আশানন্দ' অসাধারণ দৈহিক শক্তি হেতু 'ঢেঁকি' হইয়া; 'মুণ্ডকে রঘু' ও 'খানমুণ্ডে কৈলাস' অপরিমিত অর্থাৎ একমণ ও আধমণ আহার করিয়া (১); 'গৌরী সেন' তাঁহার বদান্যতায়—যথা "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন"; আর 'খাঞ্জা খাঁ' তাঁহার 'বাবুয়ানায়' বা 'নবাবিতে'—যথা "বেটা যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ"। তন্মধ্যে গৌরী সেন ও খাঞ্জা খাঁ, বেচা-কেনা শেষ করিবার জন্য একই স্থানে তাঁহাদের ভবের দোকান-পাট খুলিয়া বসিয়াছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে গৌরী সেন সম্বন্ধে দু-একটা কথার অবতারণা করিবার অভিলাষ হইয়াছিল; কিন্তু "ভারতবর্ষের" পৃষ্ঠায় একবার সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় আর সে চেষ্টা করি নাই।

অতিমাত্রায় সৌখীন বা বিলাসী কাহাকেও (অথবা কাহারও অনাবশ্যক বা অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বর) দেখিলে, অনেকে তাহাকে উপহাস করিয়া বলিয়া থাকেন—"বেটা যেন নবাব খাঞ্জা-খাঁ"। নবাব খাঞ্জা খাঁর বিলাসিতা চিরপ্রসিদ্ধ এবং আজীবন তাহা সমভাবেই চলিয়াছিল। অভাব, অভিযোগ, দারিদ্র্যের প্রবল তাড়নায়ও তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় নাই এবং এই জন্যই সে বিলাসিতার খ্যাতি এত অধিক। ধনী নির্ধন হইয়া পড়িলে তাঁহার পদমর্য্যাদা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে; এবং অগত্যা বিলাসিতা ও বাহ্যাড়ম্বর ক্রমশঃ তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু অভাবের দুঃসহ অত্যাচার ও লাঞ্ছনা এবং দারিদ্র্যের শত সহস্র কশাঘাতও নবাব খাঞ্জা খাঁকে টলাইতে পারে নাই। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু বিলাস ও বাহ্যাড়ম্বরের এতটুকু ব্যতিক্রম সহ্য করিতে তিনি কোন দিন প্রস্তুত হন নাই। "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"—নীতি বাক্যের তিনি একদিনও অবমাননা করেন নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে খাঞ্জা খাঁ (প্রকৃত নাম খান্ জাহান্ খাঁ) ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইঁহার পিতা সুজা কুলি খাঁ তিহারাণের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহারা সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ইরাণি মোগল।

যুবক খাঁ জাহান মোগল-সরকারে কর্ম্ম-প্রার্থী রূপে উপস্থিত হইয়া অল্প দিনেই নিজের কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করেন। এই সময়ে হুগলীর ফৌজদার ওমর বেগ্ খাঁর (২) মৃত্যুতে খাঁ জাহান ঐ পদে নিযুক্ত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তখন বাংলা, বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান।

ইংলণ্ডের সুপ্রিম কাউন্সিল স্থাপিত হইলে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ ও অপরাপর সভ্যগণের মধ্যে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়; এবং এই গোলযোগের ভিতর নবাব খাঞ্জা খাঁও জড়াইয়া পড়েন।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ১০শে মার্চ্চ তারিখে মহারাজ নন্দকুমারের নির্দ্দেশানুসারে জেলালুদ্দিন নামক এক ব্যক্তি কাউন্সিলে একখানি আবেদনপত্র পেশ করেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, হুগলীর ফৌজদার কোম্পানীর নিকট হইতে বেতন স্বরূপ বার্ষিক ৭২,০০০, টাকা প্রাপ্ত হইতেন। তন্মধ্যে ৩৬,০০০, হেষ্টিংসকে ও ৪,০০০, তাঁহার দেশীয় সচিবকে (Secretary) প্রদান করিতেন এবং ৩২০০০, নিজের জন্য রাখিতেন। এই হিসাব প্রদর্শন করিয়া আবেদনকারী কোম্পানীর নিকট আর্জ্জি করেন যে, ৩২,০০০, বার্ষিক বেতনে তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলে তিনি উহাতে স্বীকৃত হইবেন ও কোম্পানীর বার্ষিক চল্লিশ সহস্র মুদ্রা লাভ থাকিবে। (৩)

নবাবের ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিল। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সপ্রমাণের জন্য তাঁহাকে সত্য প্রকাশ করিতে আদেশ করা হইল। কিন্তু তাহা না করায় বা তাহাতে অসমর্থ হওয়ায় তিনি পদচ্যুত হইলেন। নন্দকুমারের ইচ্ছানুসারে ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ প্রভৃতি মির্জ্জা মিন্দি নামক এক ব্যক্তিকে ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। (৪) কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে

(১) এ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকটিত 'ককারের অহঙ্কারে' অনুপ্রাসের বহর

(২) ইঁহাকে কেহ কেহ আমির বেগ্ খাঁ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইয়ার বেগ্ খাঁর পর ইনি হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন।

(৩) History of British India. Vol iii. pp 441—442; 5th Edn.: by H. H. Wilson.

(৪) মির্জ্জা মিন্দি নন্দকুমারের অধীনে ২০, বেতনে কর্ম্ম করিতেন। "বেটা যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ" চলিত কথাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ফৌজদার হইলেন তখন নন্দকুমার। নূতন রাজ্যের পত্তন তখন সবে সুরু হইতেছিল এবং ভাগ্যাকাশে কাহারও মেঘ কাহারও বা রৌদ্র খেলা করিতেছিল। নন্দকুমার জাল অপরাধে অভিযুক্ত ও জুরিগণ কর্ত্তৃক বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া ঘাতকের হস্তে আইনের শেষ দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

নবাবের ভাগ্যাকাশ আবার মেঘনির্ম্মুক্ত হইল, তিনি পুনরায় হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু সে আকাশ তখন শরতের আকাশের মত; সব "রাম কি মায়া কহি ধূপ কহি ছায়া"। ১৭৯০ খৃঃ লর্ড কর্ণওয়ালিশ্ কর্ত্তৃক ঐ পদের বিলোপ সাধিত হইল এবং নবাব [illegible] মাত্র মাসিক বৃত্তির অধিকারী হইলেন।

নবাব যে সময়ে ফৌজদার ছিলেন, সে সময়ে ধনে, মানে, ক্ষমতায়, ঐশ্বর্য্যে আড়ম্বরে, হুগলীতে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। সুন্দর সুন্দর হস্তী ও অশ্ব তাঁহার পশুশালার শোভা সম্পাদন করিত। তাঁহার সুসজ্জিত গৃহ দর্শনীয় মধ্যে পরিগণিত হইত। ১৭৬৯ খৃঃ ওলন্দাজ পরিব্রাজক ষ্টাভোরিণাস (Stavorinus) হুগলী পরিদর্শনে আসিয়া নবাবের গৃহ ও হস্তীশালার আড়ম্বরের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিচার গৃহ সুবাদারগণের দরবার গৃহের ন্যায় বোধ হইত।

নানারূপ দুষ্প্রাপ্য সুখাদ্য ভোজ্য ব্যতীত তাঁহার দৈনন্দিন আহার সম্পন্ন হইত না। প্রকাণ্ড হস্তীর পৃষ্ঠে সুসজ্জিত হাওদা ও তদুপরি শয্যার উপর লতা-পুষ্প-বিভূষিত নানারূপ মনোমুগ্ধকর চিত্রখচিত "সুকোমল মখমল" বিস্তৃত হইলে নবাব তাহাতে উপবেশন করিয়া বায়ুসেবনার্থ বহির্গত হইতেন। তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন, তাহার উপর নিত্য নূতন বহুমূল্য সৌখীন বেশভূষা তাঁহাকে সর্ব্বদাই আড়ম্বরময় করিয়া রাখিত। নামে মাত্রে নবাব হইলেও তাঁহার বেশ-ভূষা, চাল-চলন, আদব কায়দা, আচার ব্যবহার সমস্তই প্রকৃত নবাবের ন্যায় ছিল। বস্তুতঃ তিনি কিরূপ সৌখীন ও আড়ম্বর প্রিয় ছিলেন,—তাঁহার নাম সংযুক্ত তাঁহার বাবুয়ানা প্রসঙ্গে ওয়াজিদ আলির নবাবি উল্লেখযোগ্য। সকলেই জানেন লক্ষ্ণৌএর নবাব ওয়াজিদ আলি ধরা না দিয়া হয় ত পলাইতে পারিতেন। কিন্তু নবাবি বজায় রাখিতে গিয়া তাহা হয় নাই। পলায়ন-উদ্যোগী নবাব দেখিলেন, তাঁহার বিচিত্র জরী-মোড়া সুন্দর 'জুতির' এক পাটি উল্টাইয়া রহিয়াছে এবং তাহাকে স্বাভাবিক ভাবে লইয়া আসিবার জন্য অথবা তাঁহার শ্রীপদে পরাইয়া দিবার জন্য কোন খানসামা হাজির নাই। সুতরাং জুতি তাঁহার 'পয়ের মে' উঠিল না ও তাঁহার পলায়ন করাও হইল না। ইহাকেই বলে প্রকৃত নবাবি 'চাল'।

খাঞ্জা খাঁর বেতন যথেষ্ট হইলেও, তাহাই তাঁহার একমাত্র আয় ছিল না। তাঁহার নিজের প্রভূত সম্পত্তি ছিল। গোঁদলপাড়া তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি। এই গোঁদলপাড়াতেই দেনেমারগণের (Danes) প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং এখনও উহা 'দেনেমারডাঙ্গা' নামে পরিচিত।

দেনেমারগণ গোঁদলপাড়া হইতে শ্রীরামপুরে উঠিয়া যাওয়ায় নবাব ঐ গ্রাম ফরাসীদের পত্তনী দেন। ফরাসীগণ এতদুপলক্ষে তাঁহাকে বার্ষিকী দিতে স্বীকৃত হন। পরে এই সম্পত্তি তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা চুঁচুড়ার মতিঝিল-নিবাসী মির্জ্জা নসরৎ উল্লা খাঁ সাহেবের নিকট বিক্রীত হয়, কিন্তু উহা পূর্ব্ববৎ ফরাসীগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত থাকে এবং আজ পর্য্যন্ত ইহা ফরাসীরাজ্য চন্দননগরের অন্তর্ভুক্ত।

নবাবের আর দুইখানি তালুক ছিল। তন্মধ্যে একখানি মহম্মদনগরে ও অপরখানি মান্দিনাবাদ। এই দুইখানি তালুকের আয়ও যথেষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি বেলবনি নামক জায়গীরের অধীশ্বর ছিলেন। ইহা গবর্ণমেণ্টের হুগলি জেলার গেজেটিয়ারে খাসমহালের অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

খাঞ্জা খাঁর অনেকগুলি বেগম ছিল; কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বেগমেরাও অন্তর্হিতা হইলেন। জীবনের পূর্ব্বাহ্নে যাঁহাকে তিনি সহচরীরূপে বরণ করিয়াছিলেন, জীবনের অপরাহ্নে দুঃখের দশায়ও একমাত্র তিনিই তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন।

ফৌজদার পদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের পক্ষে ভাগ্যলক্ষ্মীকে ত্যাগ করা বরং সম্ভবপর, কিন্তু বাহ্যিক আড়ম্বর ত্যাগ করা মোটেই সম্ভবপর নহে—নবাব সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন। সুতরাং শীঘ্রই তাঁহাকে ঋণজালে জড়িত হইতে হইল। কিন্তু আশা মানবকে কখনও ত্যাগ করে না। বারবার ব্যর্থমনোরথ হইয়াও একটির পর আর একটি আশাকে আশ্রয় করিয়া মানুষ তাহার জীবন তরী ভাসাইয়া চলে, নবাবের জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই সময় তিনি মনে মনে একটি সঙ্কল্প করেন; এবং আশা করেন, উহা কার্য্যে পরিণত হইলে, শেষ জীবনে তাঁহাকে কোনরূপ আর্থিক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। হুগলীতে সে সময়ে প্রচুর ধনসম্পন্না এক বিধবা মুসলমান-মহিলা বাস করিতেন। ইনি মহম্মদ মহসীনের ভগিনী মন্নুজান। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি আর বিবাহ করেন নাই। নবাব স্থির করেন, কোন উপায়ে এই সর্ব্বগুণসম্পন্না মহিলাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে পারিলে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনে কষ্টের কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না ও তিনি যেরূপ ভাবে চলিয়া আসিতেছিলেন, সেইরূপ আড়ম্বর সহকারেই চলিতে পারিবেন।

কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই যে, মানুষ প্রস্তাবনা পর্য্যন্ত করিতে পারে—বাকীটুকু তাহার আয়ত্তাধীন নহে। সেইটুকু তাহার হাতে থাকিলে জগতের অবস্থাও হয় ত অন্যরূপ হইত। নবাবের প্রস্তাব মহিলার নিকট উপস্থাপিত হইয়া প্রত্যাখ্যাত হইল। আশার যে উজ্জ্বল জ্যোতিঃ নূতন করিয়া তাঁহার অন্তর আলোকিত করিয়া তুলিতেছিল, এক ফুৎকারে তাহা নিবিয়া গেল। নিরাশার ভিতর দিয়া তিনি কেবল অন্ধকার ভবিষ্যতের অস্পষ্ট ছায়া দেখিতে লাগিলেন।

একটার পর একটা করিয়া তাঁহার দিনগুলি ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় বিলাস ও আড়ম্বরের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল; ফলে তাঁহার কণ্ঠাবধি নিমজ্জিত হইল। দারিদ্র্যের প্রবল তাড়নায় শেষ জীবনে অশেষ কষ্ট ভোগি-

করিয়া ১৮২১ খৃঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারি তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

নবাব বরাবর হুগলীর মোগল দুর্গে বাস করিতেন। সহরের ধরমপুর নামক পল্লীতে তাঁহার একখানি সুন্দর উদ্যান ছিল; তন্মধ্যে অষ্টকোণ বিশিষ্ট একটা বৈঠকখানা বা প্রমোদ ভবন থাকায়, উহা 'আট-পালা বাগান' নামে অভিহিত হইত। বাগনটী এখন "নবাব বাগ" নামে পরিচিত।

নবাবের আর্থিক অবস্থা হীন হইবার পরও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে হুগলীর শেষ ফৌজদার বলিয়া বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ১৮০৩ খৃঃ কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট-হাউসের উদ্বোধন উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট, রাজা, মহারাজা, নবাব প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করেন। সে দরবারে নবাব খাঞ্জা খাঁও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

নবাব মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে, তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা নসরৎউল্লা খাঁ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন; কিন্তু দ্বাররক্ষক তাঁহাকে অন্দরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। অবশেষে মৃত্যু হইলে য়ুরোপীয়গণের তত্ত্বাবধানে তাঁহার মৃতদেহ সমাধিক্ষেত্রে নীত ও সমাহিত হয়। *

আজ প্রায় এক শত বৎসর হইতে চলিল তিনি চিরবিশ্রাম লাভের জন্য পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন; ইতিমধ্যে কত শত সহস্র মানব আসা যাওয়ার পালা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, প্রকৃতির দৃশ্যপটে কত নূতন দৃশ্যের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, কত নূতন স্মৃতি জগতের সমক্ষে আসিয়া আবার বিস্মৃতির অতলে লীন হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু তাঁহার নাম এখনও লুপ্ত হয় নাই। এরূপ কোন কার্য্য তিনি সম্পাদন করেন নাই, যাহাতে তাঁহার নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইতে পারে। কিন্তু তবুও তাঁহার নাম এখনও এ অঞ্চলে গৃহে-গৃহে বিরাজ করিতেছে। কেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

(*) শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দে লিখিত "Hooghly Past and Present" হইতে গৃহীত।

বাৎস্যায়নের কাম-সূত্র

[শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ]

(২)

ইতঃপূর্ব্বে আমরা কামশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়াবলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছি। এবার ঐ পুস্তক হইতে নানা বিষয়ের কিছু কিছু বিবরণ পাঠকবর্গের গোচর করিতে চেষ্টা পাইব।

ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গ সেবন সম্বন্ধে ঋষি উপদেশ করিয়াছেন যে, মানবগণ নিজ আয়ুষ্কালের বিভাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে উহাদের সেবা এরূপ ভাবে করিবেন, যেন একে অন্যের উপঘাতক না হয়।

বাল্যে বিদ্যাভ্যাসই প্রধান প্রয়োজন। যৌবনে কামের সেবা এবং বার্দ্ধক্যে ধর্ম্ম এবং মোক্ষ-চিন্তা। তবে এস্থলে যৌবনে কামের সেবা করিতে হইবে বলিয়া যে ধর্ম্মার্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিতে হইবে, এরূপ নহে। তাহাদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তাহা করিতে হইবে; এই জন্যই পূর্ব্বেই অনুপঘাতক এই কথা বলা হইয়াছে। বয়োবিভাগ করিতে আষোড়শ বাল্যাবস্থা, তার পর সপ্ততি বর্ষ পর্য্যন্ত মধ্যম অবস্থা; তারপর বৃদ্ধাবস্থা— এইরূপ টীকাকার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সময়ে পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বেই বার্দ্ধক্য আমাদিগকে অধিকার করিয়া বসে; এবং অনেককেই ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়োবিভাগ-ব্যবস্থা পৌছিবার পূর্ব্বেই "ভবলীলা সাঙ্গ" করিতে হয়; সুতরাং তাৎকালিক বিভাগ এ সময় অচল।

যতদিন বিদ্যা অভ্যাস করিতে হইবে, ততদিন রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। সে পর্য্যন্ত কাম-সেবা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে হইবে। অন্যথা অধর্ম্ম, বিদ্যা গ্রহণ-ব্যাঘাতাদি দোষ জন্মিবে।

ধর্ম্মের দ্বারা দুই কার্য্য সাধিত হয়। শ্রুতি, স্মৃতি এবং ধর্ম্মজ্ঞ-সমবায়ের উপদেশানুসারে যজ্ঞাদি অলৌকিক এবং অদৃষ্টার্থ কার্য্যে লোকের প্রবৃত্তি জন্মান এবং লৌকিক দৃষ্টার্থ প্রবৃত্তিমূলক অনেক কার্য্য হইতে লোককে নিবৃত্ত করা।

অর্থ বলিতে বিদ্যা, ভূমি, স্বর্ণাদি ধাতু, গবাদি পশু এবং গৃহোপকরণ, শস্যাদি অর্জ্জন, বর্দ্ধনাদি ব্যাপার বুঝিতে হইবে। ইহার তত্ত্ব বার্ত্তা-শাস্ত্রবিৎ এবং বণিক্ প্রভৃতির নিকট শিক্ষা করিবে।

কাম বলিতে চক্ষু শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিজ-নিজ বিষয়ের অনুকূল প্রবৃত্তির সুখ দুঃখাদি প্রযত্ন গুণের সমবায়ী কারণ মনের সহিত সংযোগ। যেমন মনের কোন বিষয় উপভোগের ইচ্ছা হইলে, তৎসাধন ইন্দ্রিয়েরও সেইদিকেই প্রবৃত্তি জন্মে। এইরূপ প্রবৃত্তিই কাম। ইহা সামান্য ও বিশেষভেদে দ্বিবিধ। সামান্য কামেরও আবার দুই প্রকার ভেদ আছে। আত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বিষয়সুখ ভোগ করেন, সেই সুখটাই প্রধান কাম, কিন্তু তার জন্য ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত প্রবৃত্তিটিও কাম বলিয়া উক্ত হয়।

বিশেষ কামও আবার দ্বিবিধ। তাহার বিশেষ বিবরণ এখানে দিতে পারিলাম না। তবে সামান্য কামের বিভাগের দিকে দৃষ্টি করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে।

এই কাম-তত্ত্ব শিক্ষা কোথা হইতে করিতে হইবে? তদুত্তরে বাৎস্যায়ন বলিতেছেন যে, কামশাস্ত্র হইতে এবং কামকলাভিজ্ঞ নাগরিক-সমবায় হইতে এই শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হইবে।

এই তিনটির শিক্ষার সম্বন্ধে ঋষি গুরু-লাঘবের প্রস্তাবও করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই তিনের যুগপৎ সেবা অনেক সময়েই সম্ভব না হইতে পারে। সেরূপ স্থানে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বর্গ পর-পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মনে করিতে হইবে। কাম অপেক্ষা অর্থ গরীয়ান্, কারণ কাম অর্থ-সাধ্য। অর্থ অপেক্ষা ধর্ম্ম গরীয়ান্; কারণ, ধর্ম্মের দ্বারা অর্থ সাধন হইতে পারে। তবে রাজার পক্ষে অর্থই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ, লোকযাত্রা অর্থমূলক। বর্ণাশ্রম-পালন রাজধর্ম্ম। এই

পালন-কার্য্যে প্রভু-শক্তির প্রয়োজন। প্রভুশক্তির মূলকোষ দণ্ডবল। এই কোষ দণ্ডবল অর্থ হইতেই জাত। অতএব লোকযাত্রা অর্থমূলা। এজন্য রাজার পক্ষে অর্থই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় মহাসমর প্রসঙ্গেও প্রাচীন ঋষির এই বাক্যের যাথার্থ্য বিশেষরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে। আমরাও সমরঋণের নানাপ্রকার ভেদের সহিত অল্প-বিস্তর পরিচিত হইয়া, রাজার অর্থবলের সহায়তা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

বেশ্যাদিগের পক্ষেও অর্থই গরীয়ান্। এ সত্যের প্রমাণ আমরা অহরহঃই আমাদের চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাইতেছি। কত কত রাজা-মহারাজার অভ্রংলিহ প্রাসাদ-চূড়া ধূলি-বিলুণ্ঠিত হইয়া গণিকার হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে,—কত শত ভূমি সম্পত্তি বেশ্যার প্রসাধনে আত্মদান করিয়াছে, কত ধনপতির যক্ষের ধন বারবিলাসিনীর বিলাস-সজ্জার যজ্ঞে ইন্ধন যোগাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষাতে শাস্ত্র এবং অর্থতত্ত্ব সংগ্রহের উপায় শিক্ষা আবশ্যক। কিন্তু কাম সম্বন্ধে শিক্ষা সহজাত, কারণ তির্য্যক্ যোনিদিগের মধ্যেও কাম বিষয়ে স্বয়ং-প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। ঐ বিষয়ে উহাদের কোন গুরু-করণের আবশ্যকতা দেখা যায় না।

অতএব এই কাম নিত্য। নিত্য হইলেও ইহা স্ত্রীপুরুষ-সম্প্রয়োগাধীন পরাধীন। সুতরাং ইহা নিত্য বলিয়া যে ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে উপায় পরিজ্ঞানের কোন প্রয়োজন নাই, ইহা ঠিক নহে।

এই উপায় পরিজ্ঞানের জন্য কামশাস্ত্রের আবশ্যকতা আছে। তার পর ধর্ম্ম করিলে পরকালে ফল হইবে। সেটা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টব্য বিষয়। লোকে তাহাতে বড়-একটা আস্থা স্থাপন করিতে চাহে না। সুতরাং ধর্ম্মাচরণ দ্বারা ফল কি, ইহা মনে করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে বলিতে গিয়া মুনিবর বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিলে তো চলে না। যদিও লোকে "বরমদ্যকপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ" (A bird in the hand worth two in the bushes) এই বলিয়া পারলৌকিক ফলপ্রদ ধর্ম্মে অনাস্থা করিতে পারে বটে, কিন্তু জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের বাক্যের সাফল্য দৃষ্টি করিয়া এবং অপৌরুষেয় বেদাদি অভ্রান্ত শাস্ত্রোক্ত বিষয়ে সংশয় না করিয়া ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য। ভবিষ্যতে বেশী ফললাভ করিতে পারিব, এই বিশ্বাসেই লোকে হস্তগত বীজ ক্ষেত্রে বপন করিয়া থাকে। সর্ব্বদাই যে বেশী ফললাভ হয়, তাহা নহে; তথাপি লোকে তাহা করিয়া থাকে। অতএব শাস্ত্রে বিশ্বাসবান্ হইয়া ধর্ম্ম-সাধনে চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য।

অর্থচর্য্যার সম্বন্ধেও এইরূপে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, উপায় প্রযত্ন পূর্ব্বক কৃত হইলেও সর্ব্বদা ফলদায়ক হয় না। আবার যখন অদৃষ্টে ঘটে, তখন বিনা প্রযত্নেও হঠাৎ নিধান প্রাপ্তি, গুপ্তধন প্রাপ্তি প্রভৃতি রূপে অর্থলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার উপায় পরিজ্ঞানের জন্য শাস্ত্র-চর্চ্চা নিরর্থক। এ সকলই কালের দ্বারা কৃত; কালই প্রবর্ত্তক। এই কালকেই আমরা দৈব বলিয়া থাকি। এই কাল-প্রভাবেই বলিরাজার ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি; আবার এই কালই তাঁহাকে পাতালে প্রেরণ করিবার কারণ। অতএব কাল দুরতিক্রম্য। মুনি বলেন যে কাল দুরতিক্রম্য, তাহা সত্য বটে; কিন্তু কালই হউক আর উপায়ই হউক, অর্থ সিদ্ধি সম্বন্ধে পুরুষকারের প্রয়োজন আছে। আবার পুরুষকারও উপায় সাহায্য ব্যতিরেকে অর্থ সাধন করিতে পারে না। পুরুষকারও অর্থসিদ্ধি বিষয়ে কালের অপেক্ষা করে। শক্তি, দেশ, পাত্র প্রভৃতি উপায়েরও প্রয়োজন; ইহাদের অভাবে কালের অকিঞ্চিৎকরত্ব পরিস্ফুট। অতএব, ইহারা সকলেই পরস্পর-সাপেক্ষ। সংসারে দৈব এবং মানুষ উভয়বিধ কর্ম্মই লোক-পালনে প্রযুক্ত হয়। অতএব শুধু দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই চলিবে না। "নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।" অর্থ সাধনে উপায়ের, সুতরাং পুরুষকারের প্রয়োজন আছে।

তার পর কামচর্য্যা প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, কাম-প্রবৃত্তির দ্বারা সংসারে বহু প্রকারের দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। কামাসক্ত হইয়া লোক ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়া অসৎ মার্গ অবলম্বন করে। অর্থার্জ্জন করে না, এবং অর্জ্জিত অর্থও মদ্য-নারী-আদি নানা অসদুপায়ে ব্যয় করিয়া ফেলে। কামাসক্ত ব্যক্তি অনেক সময়ে অনেক প্রকার অন্যায় অতি-সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, শৌচাচার পরিশূন্য হয়, স্বীয় শরীর নষ্ট করিয়া ফেলে, অবিমৃষ্যকারী হয়, লোকের নিকট ঘৃণ্য হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্থলে দাণ্ডক্য, ইন্দ্র, রাবণ প্রভৃতি এই কাম প্রবৃত্তির বশেই অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শনে কামচর্য্যাও নিতান্ত অন্যায় বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং তাহার শিক্ষারও কোন আবশ্যকতা দেখি না। এই আপত্তির খণ্ডনে মুনি বাৎস্যায়ন বলিতেছেন—

"শরীরস্থিতি হেতুত্বাদাহারসধর্ম্মাণো হি কামাঃ।"

শরীরস্থিতির জন্য আহারও যেরূপ প্রয়োজনীয় কামও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। সংসারস্থিতির জন্য ইহার আবশ্যকতা নিত্য। এই কাম, ধর্ম্ম এবং অর্থেরও ফলভূত; কারণ, ধর্ম্ম এবং অর্থের সেবাও সুখেরই জন্য। সে সুখের স্থান হইল কাম। সংসারে অপত্যসন্তান জন্য স্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহার সেবায় দোষাশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে একেবারে পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নহে। সে দোষের প্রতিবিধান চেষ্টা করিয়া ইহার সেবা করিতে হইবে।

যে সব ব্যক্তি সুখান্বেষী, উহাদের জন্য তৃণাদির ন্যায় ব্যর্থ। আচার্য্য-গণের মত এই যে, উহার দোষগুলি পরিহার করিবে। মৃগাদিতে নষ্ট করে বলিয়া কৃষকেরা কি যবাদি শস্য বপনে ক্ষান্ত থাকে?

অতএব উপযুক্ত ভাবে অর্থ, কাম এবং ধর্ম্ম সকলেরই সেবা করিবে। যেরূপ কার্য্যে পরকালে কি হইবে, ভবিষ্যৎ সুখের কি দুঃখের হইবে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা না থাকে, সাধু ব্যক্তিগণ সেইরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যদি একটি অন্যের বিঘাতক হয়, তবে যাহা দ্বারা গুরু বিষয়ের বাধা জন্মে, কখনও তাহার সেবা করিবে না; যে অর্থার্জ্জনে

ধর্ম্মহানি ঘটে, সেরূপে অর্থ অর্জ্জন করিবে না ; যেরূপ কাম-সেবায় ধর্ম্ম ও অর্থহানি হয় সেরূপ কাম-সেবা করিবে না।

কামের অত্যন্ত সেবায় ধর্ম্ম এবং অর্থ উভয়েরই বিশেষরূপে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, অতএব তাহা কখনও করিবে না।

উপযুক্ত কালে ও বয়সে বিবেচনা পূর্ব্বক তাহার সহিত ব্যবহার করিবে। এইরূপে ত্রিবর্গ শিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া কাম-সিদ্ধি বিষয়ে বিদ্যা গ্রহণের প্রাধান্য বিবেচনা পূর্ব্বক মুনি বলিতেছেন যে, শ্রুতি, স্মৃতি, বার্ত্তাশাস্ত্র, দণ্ডনীতি প্রভৃতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কাম-সূত্র এবং তদঙ্গ বিদ্যা গীত-বাদ্যাদিও লোকে অধ্যয়ন করিবে।

স্ত্রীলোকেরাও যৌবনাবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বে অবিবাহিত অবস্থাতে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। বিবাহ হইলে স্বামীর যদি অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তাঁহার সম্মতি অনুসারে স্ত্রী ইহা শিক্ষা করিতে পারে। এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে স্ত্রীলোকের তো শাস্ত্রপাঠে অধিকার নাই ; সুতরাং স্ত্রীলোকের শিক্ষার কথা উত্থাপন করা নিরর্থক। কিন্তু বাৎস্যায়ন বলেন যে, স্ত্রীলোকেরা শাস্ত্রগ্রহণ দ্বারা না হউক উক্ত শাস্ত্রাভিজ্ঞগণের নিকট হইতে ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ লাভ তো করিতে পারে।' শুধু এই শাস্ত্র কেন, সকল শাস্ত্রেই এইরূপ উপদেশ গ্রহণের ব্যবস্থা সকলের পক্ষেই আছে। একই ব্যক্তি সর্ব্ববিদ্যায় পারগ অতি কমই হইয়া থাকে। একজন এক শাস্ত্রের প্রয়োগ জানিলে অন্যে তাঁহার নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিয়া থাকে, তাঁহার নিকট হইতে আবার অন্য ব্যক্তি উহা শিক্ষা করিবে--এইরূপ।

শুধু শাস্ত্র কেন সংসারেও এইরূপ দেখা যায় যে, রাজা বহুদূরস্থ হইলেও, দূরদেশবর্ত্তী প্রজালোক তাঁহার মর্য্যাদার লাঘব করে না, তাঁহার শাসন মানিয়া চলিয়া থাকে।

অতএব স্ত্রীলোক শাস্ত্র পাঠ না করিয়াও, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে এ বিষয়ে উপদেশ লাভ করিতে পারে। তার পর গণিকা, রাজপুত্রী মহাসামন্ত-কন্যা প্রভৃতি শাস্ত্রমার্জ্জিতবুদ্ধি স্ত্রীলোকও আছে। এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে স্ত্রীলোক শাস্ত্র ও প্রয়োগ (Theory and Practice) উভয়ের সম্বন্ধেই উপদেশ পাইতে পারে। যাহারা মেধাবিনী, তাহারা শাস্ত্র ও প্রয়োগ উভয়ই শিক্ষা করিবে, যাহারা সেরূপ নহে, তাহারা শুধু প্রয়োগই শিক্ষা করিবে। তবে যাহার নিকট হইতে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, সে ব্যক্তি বিশেষরূপ বিশ্বস্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক, নতুবা গুহ্য বিষয় নিবন্ধন সঙ্কোচ আসা স্বাভাবিক।

এইরূপ বিশ্বস্ত আচার্য্য কাহারা হইতে পারে? তদুত্তরে মুনি বলিতেছেন যে, একত্র লালিত-পালিত, অতএব সুবিশ্বস্ত, বিবাহিতা ধাত্রীকন্যা, নির্দ্দোষ সম্ভাষণা অতি অন্তরঙ্গা সখী, সমবয়স্কা মাতৃস্বসা, বিশ্বস্তা মাতৃস্বসা তুল্যা বৃদ্ধ দাসী, বিশ্বস্তা ভিক্ষুকী জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রভৃতি এই বিষয়ের শিক্ষাদাত্রী হইতে পারে। উক্ত বর্ণনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, পূর্ব্বকালে অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় ঐ কামশাস্ত্র শিক্ষারও রীতিমত ব্যবস্থা ছিল ; এবং স্ত্রীলোকেরাও এই শাস্ত্র বিশ্বস্ত আত্মীয়-গণের সাহায্যে শিক্ষা করিতেন। এই বিষয়ের আচার্য্যা নিরূপণে প্রত্যেক স্থলেই বিশ্বস্তা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, শিক্ষাদাত্রী-নির্ব্বাচনে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, নতুবা কুচরিত্রা, অজ্ঞাতকুলশীলার দ্বারা অনেক স্থলে বিশেষ কুফল প্রসূত হইতে পারে।

এ কথা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, কন্যা যৌবনস্থা হইলে কতক কতক বিষয়ে তাহাদিগকে বিশেষ শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা সকল মাতা বা ভগিনী প্রভৃতিই অনুভব করিয়া থাকেন, এবং সেরূপ শিক্ষা প্রদান করাও হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে বোধ হয় ঐ সব অবস্থার উপযোগী সব রকম শিক্ষাই আগে হইতেই প্রদান করা হইত, আর সেইজন্যই পূর্ব্বকালের পণ্ডিতগণ নিজ-নিজ গ্রন্থাদিতে ঐ সব বিষয়ের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে বর্ত্তমান সময়ের মত সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। আর একটি বিষয় আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে, বাৎস্যায়নের সময়ে নিতান্ত বালিকা বয়সে কন্যা পরিণীতা হইত না। তাঁহার সূত্রে আছে, "প্রাক যৌবনাৎ স্ত্রী"। টীকাকার বলিতেছেন— "পিতৃগৃহ এব। তদনন্তরে পরিণীতত্বাদস্বতন্ত্রায়াঃ কুতোঽধ্যয়নম্।"

ইহা হইতে কি বোধ হয় না যে, যৌবনাবস্থাতে বিবাহিতা হইলে তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না, অতএব বিবাহের পূর্ব্বেই পিতৃগৃহে সে এই শিক্ষা করিবে।

যে সময়ে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত মধ্যমাবস্থা এবং আষোড়শ বাল্যাবস্থা, সেখানে যৌবনে যে ১১।১২ বৎসরেই বালিকার দেহে আধিপত্য বিস্তার করিত, একথা তো আমাদের বোধ হয় না। এখনও অবিবাহিতাবস্থায় বালিকা ১৩।১৪ বৎসর বয়সেও যুবতী হইয়া পড়ে না,—কিশোরীই থাকে। তবে বাল্যে বিবাহ হইয়া গেলে যে ১১।১২ বৎসরেই বালিকার দেহে অকাল যৌবন বিকশিত হইয়া উঠে তাহার জন্য প্রকৃতি দায়ী নহেন, বিকৃতিই দায়ী, তাহা বলা বাহুল্য।

আর একটি কথাও আমরা বুঝিতে পারি যে, তাৎকালিক সমাজে স্ত্রীলোক সাধারণের শাস্ত্রাদি শিক্ষার অধিকার ছিল না, অর্থাৎ স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল না। যদিও রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতি বড় বড় লোকের মেয়েরা এবং গণিকাদি লেখা পড়া শিক্ষা করিত বটে, কিন্তু গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা লেখাপড়া বড় একটা জানিত না। তবে তাহারা শাস্ত্রাদির উপদেশ উপযুক্ত লোকের নিকট পাইত সন্দেহ নাই।

তার পর কামশাস্ত্রের অঙ্গবিদ্যার পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে কর্ম্মাশ্রয়, দ্যূতাশ্রয় শয়নোপচারিকা প্রভৃতি অধিকারের চতুঃষষ্টিকলার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সেগুলির পরিচয় বিশেষরূপে না দিয়া চতুঃষষ্টিকলার নামগুলি নিম্নে লিখিলেই ইহা হইতে তাৎকালিক শিল্পকলার একটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১। গীত, ২। বাদ্য, ৩। নৃত্য, ৪। আলেখ্য (রংএর দ্বারা চিত্র করার কার্য্য) ৫। বিশেষকচ্ছেদ্য (নানাপ্রকার তিলক কাটার কৌশল) ৬। তণ্ডুলকুসুমবলি বিকার (আস্ত চাউলের দ্বারা এবং নানা বর্ণের ফুলের দ্বারা দেবগৃহ বা কলাগৃহ নানাপ্রকার সুদৃশ্য আকৃতি প্রস্তুত করা) ৭। পুষ্পাস্তরণ (ফুলের দ্বারা সূচী-সূত্র সাহায্যে মালা

গাঁথা) ৮। দশন বসনাঙ্গরাগ (কুঙ্কুম আদি দ্বারা অঙ্গরাগ, কাপড় রংকরা এবং দন্ত পরিষ্কার এবং সুদৃশ্য মুক্তাবৎ করিবার কৌশল) ৯। মণিভূমিকাকর্ম্ম (গ্রীষ্মকালে শয়নাদির উদ্দেশ্যে গৃহ কুট্টিমে মরকতাদি দ্বারা চিত্রিত করা) ১০। শয়নরচনা (কাল ও অবস্থাভেদে নানা রুচি অনুযায়ী শয়নস্থান বিরচন) ১১। উদকবাদ্য (জলে মুরজাদিবৎ বাদ্যকরণ) ১২। উদকাঘাত (হস্তচক্রযুক্ত জলের দ্বারা তাড়নাকরার কৌশল; এসব জলক্রীড়ার অন্তর্গত) ১৩। চিত্র যোগ (নানাপ্রকারে পরাভিসন্ধানের কৌশল, কামকলার অন্তর্গত) ১৪। মাল্য গ্রথম বিকল্প (মুণ্ডমালা প্রভৃতি নানাপ্রকার মালা গাঁথনের প্রকারভেদ শিক্ষা) ১৫। শেখরকাপীড় যোজন (শিক্ষা প্রভৃতিতে পরিধানের জন্য ইহাও মাল্যরচনারই এক প্রকারভেদ) ১৬। নেপথ্য প্রয়োগ (দেশ কাল পাত্রভেদে বস্ত্র মাল্য অলঙ্কারাদি ধারণের দ্বারা শরীরের শোভা সম্পাদন) ১৭। কর্ণপত্রভঙ্গ (হস্তীদন্ত শঙ্খ প্রভৃতির দ্বারা কাণের গহনা প্রস্তুতের কৌশল) ১৮। গন্ধযুক্তি (নানা সুগন্ধি দ্বারা শরীরের প্রসাধন, এসেন্স মাখাটা আজকালকার দিনের ফ্যাসন নহে, সে কালেও ছিল।) ১৯। ভূষণযোজন (অলঙ্কার যোগ কণ্ঠমালা প্রভৃতিতে মণিমুক্তাদি বসান, আর কটক কঙ্কণ প্রভৃতির প্রস্তুতি করণ, শরীরে অলঙ্কার পরা নহে) ২০। ঐন্দ্রজাল শাস্ত্র সম্ভূত নানাপ্রকার কৌশল শিক্ষা। ২১। কৌচমার (কুচুমার প্রোক্ত সুভগকরণোপায়) ২২। হস্তলাঘব (সমস্ত কার্য্যে লঘুহস্ততা, অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি সব কাজ করিবার অভ্যাস, ইহাতে সময়ের অপব্যয় হয় না, অন্য কার্য্যে ক্রীড়াতে অথবা বিশ্রামের সময় পাওয়া যায়) ২৩। বিচিত্র শাক যূষ ভক্ষ্য বিকার ক্রিয়া। ২৪। পানক রসরাগাসব যোজন (ইহারা পাক ক্রিয়ার অন্তর্গত, ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য ও পেয় ভেদে নানারূপ শাক ব্যঞ্জন পয়, চাট্‌নি, আসব (যে গুলি গাঁজিয়া উঠে, পর্য্যুষিতও ইহার অন্তর্গত), প্রভৃতি অগ্নির সাহায্যে এবং অগ্নি ব্যতীত প্রস্তুত করিবার কৌশল) ২৫। সূচীবান কর্ম্ম সকল (কাঁচুলি প্রভৃতি প্রস্তুত, ছিন্ন বস্ত্র সংস্কার যাহার নাম উত্তন এবং কাঁথা প্রভৃতি বিরচন) ২৬। সূত্র ক্রীড় (অঙ্গুলির সাহায্যে সূত্র দ্বারা নানাপ্রকার খেলা দেখান,) ২৭। বীণা ডমরুক বাদ্যাদি (এই সব প্রকার তন্ত্রী বাদ্য শিক্ষার কৌশল)। ২৮। প্রহেলিকা (হেঁয়ালির রচনা এবং তদ্দ্বারা বাদ প্রতিবাদ করা)। ২৯। প্রতিমালা (একজন একটি শ্লোক বলিলে ঐ শ্লোকের শেষাক্ষর লইয়া অন্যে নূতন শ্লোক বলিবে, এইরূপ ক্রীড়া। আমাদের দেশে বিবাহ রাত্রে পূর্ব্বে এইরূপ হেঁয়ালি ও শ্লোক কাটিবার প্রথা ছিল, আমরাও বাল্যকালে দেখিয়াছি)।

৩০। দুর্ব্বাচকযোগ (এমন সব শব্দযোগে শ্লোক প্রস্তুত করা যে, যাহা উচ্চারণে বড় কষ্ট হয় কটমট গোছের। টীকাকার একটা ঐরূপ শ্লোকের উদাহরণ দিয়াছেন, সেটা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না:—

"দংষ্ট্রাগ্রর্দ্ধা প্রাগ্যো গ্রাকৃন্নামামম্বরও: ষ্ঠামুচ্চিক্ষেপ্

রেখপ্রষ্ট্রক্ষিত্বিক্ষিকূজন্যো মুস্যাবৃন্দোহব্যাৎ সর্পাৎ কেতুর্মিতি।

৩১। পুস্তকবাচঃ (শৃঙ্গারাদিরসানুসারে কোন কাব্য-নাটকাদি পুস্তক গীত দ্বারা বা স্বরযোগে পাঠ করা) ৩২। নাটকাখ্যায়িকাদর্শন। ৩৩। কাব্য-সমস্যা পূরণ (যেমন সুকবি রসসাগর করিতেন।) ৩৪। পট্টিকাবেত্রবান বিকল্প (বেতের আসন, খাট প্রভৃতি প্রস্তুতকরণ কৌশল) ৩৫। তর্কু কর্ম্ম (কুঁদিয়া কোন বস্তু প্রস্তুতকরণ) ৩৬। তক্ষণ (ছুতারের কাজ) ৩৭। বাস্তুবিদ্যা (গৃহাদি প্রস্তুতকরণ) ৩৮। রূপ্য রত্ন পরীক্ষা (ইহাদের গুণদোষ বিচার করণ) ৩৯। ধাতুবাদ (মৃত্তিকা প্রস্তর বহুধাতু প্রভৃতির পাতন, শোধন মননাদি বিষয়ক জ্ঞান) ৪০। মণিরাগাকরজ্ঞান (স্ফটিকাদি মণির রঞ্জন করিবার বিধি এবং পদ্মরাগাদি মণির উৎপত্তি স্থান বিজ্ঞান) ৪১। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ যোগ (বৃক্ষাদির রোপণ, পুষ্টি চিকিৎসা প্রভৃতির পরিজ্ঞান এখন যে কাজ Horticultural Society তে হইয়া থাকে) ৪২। মেষ কুক্কুট লাবক যুদ্ধবিধি (এখনও অনেক স্থানে মেষ ও কুক্কুটের এবং বুলবুলের লড়াই প্রচলিত আছে) ৪৩। শুক সারিকা প্রলপন (পাখী পড়ানোর কৌশল) ৪৪। উৎসাদনে, সংবাহনে, কেশমর্দ্দনে কৌশল (হাত পা প্রভৃতি টিপিয়া দেওয়া এবং মাথায় হাত বুলাইয়া দেওয়া, চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন প্রভৃতি আরামদায়ক কৌশল অনেকের গা, পা টেপার গুণে বড় আরাম পাওয়া যায়, আবার অনেকের ঐরূপ কার্য্য কেবল পীড়াদায়ক হয়- সুতরাং ইহারও কৌশল আছে।) ৪৫। অক্ষর মুষ্টিকা কথন (অক্ষর মুষ্টির সংকেত ভেদ পরিজ্ঞান। ইহা নানাপ্রকারের আছে। এক-প্রকারে শব্দের আদ্য অক্ষর মাত্র দ্বারা শ্লোক রচনা করা হয়, এটা এক-প্রকারের সংক্ষিপ্ত সংকেত যেমন হিন্দুর দশকর্ম্ম "বিনপুংসি জানি না অ চ উ" ইত্যাকারে জানান হইয়াছে। আর একপ্রকারের মুষ্টিমুদ্রা আছে তাহাও নানাপ্রকারের—করাঙ্গুলি এবং পর্ব্বগুলিকে অক্ষর কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা সংকেত প্রদর্শনে মনোভাব প্রকাশ, যেমন আজকাল যুদ্ধাদিতে নিশান দ্বারা করা হয়। অন্য প্রকারে প্রচলিত অক্ষরের কোন একটা বা দুইটা বাদ দিয়া নিজের সাঙ্কেতিক অক্ষর সৃষ্টি করা। যেমন ক এবং খ বাদ দিয়া 'গ' কে 'ক' ধরিয়া লইয়া সেইরূপ অক্ষর দ্বারা গুপ্ত বিষয় লিখিয়া পাঠান, ঐরূপে 'কথন' এই কথাটা 'গ ঘ ক' হইয়া যাইবে। এইরূপ আরও নানারূপ কৌশল আছে সেগুলি সবই) ৪৬। ম্লেচ্ছিত বিকল্প এই কলার অন্তর্গত। (কৌটিল্যের পুস্তকে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এসব মন্ত্রগুপ্তির উদ্দেশ্যেই প্রচলিত ছিল। আজকালও রাজকার্য্যে Cypher code প্রচলিত আছে।) ৪৭। দেশভাষা বিজ্ঞান। ৪৮। পুষ্প শকটিকা (ফুলের দ্বারা শকটাদি নির্ম্মাণ কৌশল) ৪৯। নিমিত্ত জ্ঞান (শুভাশুভাদি পরিজ্ঞান ফল) ৫০। যন্ত্রমাতৃকা (বিশ্বকর্ম্মা প্রণীত এই শাস্ত্র দ্বারা সজীব নির্জ্জীব যন্ত্রাদি যানে ও জলে যুদ্ধার্থ ঘটনা করার উপায় জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহা কি কলের জাহাজ কামান প্রভৃতির ন্যায় যুদ্ধ নির্ম্মাণের কৌশল? আমাদের সেইরূপ ভাবেরই কিছু বোধ হয়।) ৫১। ধারণমাতৃকা (শ্রুতিধর হইবার কৌশল পরিজ্ঞান) ৫২। সংপাঠ্য (একত্র মিলিয়া পাঠকরা। একজন পূর্ব্বে মুখস্থ করা কিছু পড়িবে, অন্যজন তাহা শুনিয়া আবার সেইরূপই পড়িবে এই

প্রকার) ৫২। ক মানসী (একজন নানা আকার ইঙ্গিত এবং শ্লোকাদি পাঠ দ্বারা যে ভাব ব্যক্ত করিল ও তাহাই শুনিয়া ঠিক সেইরূপে তাহা আবৃত্তি করিয়া যাওয়া। এটা মনের চেষ্টাতে কৃত বলিয়া এইরূপ নাম। এ সকলই আমোদ অথবা বাদানুবাদ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়।

৫৩। কাব্য ক্রিয়া (নানা ভাষায় কাব্যাদি প্রস্তুত করণ)। ৫৪। অভিধান-কোষ।

৫৫। ছন্দোজ্ঞান। ৫৬। ক্রিয়াকল্প অর্থাৎ কাব্যালঙ্কার। ৫৭। ছলিতক যোগ (অন্যকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে অন্য ব্যক্তির রূপ ধারণ, বহুরূপীরা যেরূপ করিয়া থাকে।) ৫৮। বস্ত্র গোপন (কাপড় পরিবার কৌশল, কিরূপে কাপড় পরিলে বাতাসের বেগেও বস্ত্র স্খলিত হয় না, বড় কাপড় কোঁচাইয়া ছোট করিয়া কেমন করিয়া পরিতে হয়, কাপড়ের খুঁট কেমন করিয়া গুঁজিতে হয়, কাটা কাপড় আদি কেমন করিয়া পরিতে হয় ইত্যাদি কৌশল অভ্যাস।) ৫৯। দ্যূত বিশেষ, নানারূপ জুয়া খেলার কৌশল। ৬০। আকর্ষ ক্রীড়া অর্থাৎ পাশা খেলা। ইহার রহস্য বিজ্ঞান বড় কঠিন, নল যুধিষ্ঠিরাদি পর্য্যন্ত ইহা না জানাতে পরাজিত হইয়াছিলেন। এজন্য এটা দ্যূত সাধারণ হইতে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ৬১। বাল-ক্রীড়নক (ছেলেপুলেদের খেলনা পুতুল, গোলক আদি ফেলে ভুলাইবার জিনিস প্রস্তুত কৌশল)। ৬২। বৈনয়িক, বিনয় আচার শাস্ত্র হস্তী শিক্ষা প্রভৃতি বিদ্যাজ্ঞান ৬৩। বৈজয়িনী যুদ্ধে বিজয় লাভ সম্বন্ধীয় শাস্ত্র বিদ্যাদি এবং দেববিদ্যাদির জ্ঞান। ৬৪। ব্যায়ামিকী (শরীরের উৎকর্ষ বিধানে, এবং রক্ষণার্থে মৃগয়াদি বিদ্যার পরিজ্ঞান।)

এই মোট চৌষট্টিকলাবিদ্যা কাম শাস্ত্রের অন্তর্গত। বাৎস্যায়ণ বলিতেছেন যে, এই সব কলাবিদ্যা কামশাস্ত্রের অবয়বস্বরূপ। ইহাদের পরিজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে কামতন্ত্র শিক্ষা বৃথা।

এই সব কলাবিদ্যা শিক্ষাতে উৎকর্ষ লাভ করিয়া সৎস্বভাবা, রূপগুণান্বিতা বেশ্যা গণিকা এই উপাধি প্রাপ্ত হয় এবং জনসমাজে আদরে স্থান প্রাপ্ত হয়। তখন সে বেশ্যা বলিয়া অবমানিতা হয় না। রাজাও তাহাকে আবাসবাটী এবং ক্ষেত্রাদি দানে সংবর্দ্ধিত করেন। গুণজ্ঞগণ তাহার কলা-কৌশলে মুগ্ধ হন, কামতন্ত্র শিক্ষার্থী তাহার শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রার্থী হয় এবং বিলাসিগণের সে লক্ষ্য স্থল হইয়া উঠে।

এইরূপ কলা কৌশলাদি কুশলা রাজপুত্রী এবং মহামাত্যপুত্রী শত-সহস্র সপত্নী সত্ত্বেও স্বীয় স্বীয় স্বামীকে স্ববশে রাখিতে পারে। এইরূপ স্ত্রীলোকের ভাগ্যদোষে স্বামী বিয়োগ ঘটিলেও, স্বকীয় কলা কৌশলের গুণে দেশান্তরে গিয়াও ঐ বিদ্যা শিক্ষা দান করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

কলাকুশল পুরুষও জনপ্রিয় হইয়া সর্ব্বত্রই আশু সমাদর প্রাপ্ত হয়। কলা-নিপুণ ব্যক্তির সর্ব্বত্রই সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া ইহার প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত।

উপরে যে চৌষট্টিকলার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা বুঝা যাইবে যে, কোন ব্যক্তি ঐ সমুদয় কলাতে নৈপুণ্য লাভ করিলে, তাহার কিরূপ গুণশালী হইবার কথা। সমুদায় কলার কথা ছাড়িয়া দিলেও, যদি কেহ উহার কতকগুলি বিদ্যাও ভালরূপ শিক্ষা করে, তবে তাহার আদর সর্ব্বত্রই হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

এই সব কলার এখন অনেকই লোপ পাইয়াছে। পূর্ব্বে দেব-মন্দিরে দেব-দেবী মূর্ত্তির প্রসাধন কল্পে উহার অনেকগুলি কলার উৎকর্ষ সাধিত হইত। এখনও পুরী ধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে ফুলের দ্বারা নানা কারুকার্য্যসম্পন্ন অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হয়। কিন্তু আমরা উহাতে উৎসাহ দিতে একেবারে বিমুখ। মালাকার জাতির দ্বারা এই সব কলার কতকগুলির রীতিমত চর্চ্চা পূর্ব্বে হইত, এখন তাহারাও লোপ পাইতে বসিয়াছে, অথবা স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পেটের দায়ে স্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

তার পর দেখিতে পাই, বেশ্যারা পূর্ব্বে এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া প্রভূত সম্মান অর্জ্জন করিত। তখন তাহাদের নাম হইত গণিকা। এইরূপ সব কলা-নিপুণা বিদগ্ধা গণিকার গৃহে পূর্ব্বে অনেক পণ্ডিত-গণেরও সমাবেশ হইত। মহারাজ বিক্রমাদিত্য, কালিদাস প্রভৃতি বিদ্বৎগণের বেশ্যালয়ে গমন জনশ্রুতির মূলও এইখানে। প্রাচীন হিন্দুরাজগণের সময়েও এইরূপ গণিকাগণের আদর ছিল; তাহার পরিচয় আমরা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থাদিতেও দেখিতে পাইতেছি।

পতিহীনা কলা-নিপুণা রমণীগণ এই বিদ্যা শিক্ষা দান করিয়া নিজ জীবিকার সংস্থান করিয়া সসম্মানে কালযাপন করিত, এ পরিচয়ও আমরা কামতন্ত্র হইতে পাইতেছি।

অতএব কামশাস্ত্র তুচ্ছ বিষয় নহে, ঘৃণার বস্তুও নহে। ইহার সঙ্গে অনেকানেক বিষয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কামশাস্ত্রবিশারদ লম্পট কামুক নহে—একজন নানাবিদ্যা-পারদর্শী প্রকৃত গুণী ব্যক্তি; ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

ইলেকট্রণ ও রেডিয়ম

[শ্রীভিক্টরনারায়ণ বিদ্যান্ত এম-এস্ সি]

গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে জড় বিজ্ঞানে (Physics) যে দ্রুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, এই উন্নতি সাধন কার্য্যে রঞ্জন-রশ্মির আবিষ্কার যে কতদূর সাহায্য করিয়াছে, তাহা দেখিলে আমাদের বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া থাকিতে হয়। ১৮৯৫ সালে অধ্যাপক রঞ্জন প্রথম তাঁহার পরীক্ষাগারে এই রশ্মির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই ভিন্ন ভিন্ন দেশের মনিষীগণ নানা ভাবে এই রশ্মি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। বলিতে গেলে ইহার আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক জগতে একটি নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। তখন হইতে আর

পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে একটার পর একটী করিয়া অনেকগুলি অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার হইয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই নব-আবিষ্কৃত রঞ্জন-রশ্মির বিষয়ে কিছু বলিয়া আমরা পাঠকগণের ধৈর্য্য এবং সময়ের অপব্যবহার করিতে চাহি না। যদি কখনও সময় পাই, বারান্তরে চেষ্টা করিব। উপস্থিত এই রশ্মি, অন্য দুইটি আবিষ্কার সম্বন্ধে আমাদের কতদূর সাহায্য করিয়াছে, এবং ইহার আবিষ্কার বিদ্যুৎ এবং পদার্থ-গঠন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে কতদূর ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে, তাহারই যৎসামান্য বিবরণ প্রদান করিবার চেষ্টায় রহিলাম। কতদূর কৃতকার্য্য হইব জানি না।

অধ্যাপক রঞ্জন সাহেবের আবিষ্কারের পরেই অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ এই আবিষ্কারের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দিক দেখিতে পাইলেন। একদল ভাবিলেন যে, বায়ুহীন কাচের নলের মধ্যস্থ দ্রুতগামী ক্যাথোড রশ্মি ওই নল-গাত্রে আঘাত করিয়া যে পীতাভ আলোক-রশ্মির (Phosphoresence) সৃষ্টি করে, সম্ভবতঃ সেই আলোকের সহিত এই রঞ্জন-রশ্মির কোন নিকট সম্বন্ধ আছে। চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গেই কার্য্য। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন অমনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন যে, অন্যান্য যে সকল পদার্থ হইতে সূর্য্যালোক-সাহায্যে পীতাভ হরিদ্রা আলোক রশ্মি বাহির হয় (Phosphoresced under ordinary light), তাহা হইতে রঞ্জন-রশ্মি বাহির হয় কি না? ১৮৯৬ সালে H. Bacquerel ইয়ুরেনিয়ম (uranium) ধাতুর একটি salt লইয়া এইরূপ পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন যে, সেই পদার্থ হইতে একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম তেজ, রশ্মি বা তাপ বাহির হইতেছে। এই প্রকার তেজ-নির্গমনই radio-activity নাম প্রাপ্ত হয়। অন্য দল রঞ্জন-রশ্মির প্রকৃতি এবং ইহাদের উৎপত্তি-স্থান লইয়া গবেষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গবেষণার ফলে তাঁহারা ক্যাথোড-রশ্মি লইয়া আরও ভাল করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন; এবং শীঘ্রই দেখাইলেন যে, ক্যাথোড-রশ্মি একপ্রকার অতি দ্রুতগামী জড়কণা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই কণাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা লঘু Hydrogen-atom অপেক্ষাও সহস্র-গুণে হাল্‌কা। ইঁহাদের এই আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বেই Sir William Crookes ও এই জিনিসই দেখিয়াছিলেন, এবং এই কণাগুলিতে কঠিন, তরল এবং বায়বীয় কোন অবস্থারই গুণ বর্ত্তমান না থাকায়, তিনি ইহাদের পদার্থের চতুর্থ অবস্থা নাম প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, যাহা বলিতেছিলাম। অল্প দিন পরেই দেখা গেল যে, উল্লিখিত অতি লঘু জড়কণা বা ইলেকট্রণগুলিকে ultra violet রশ্মির সাহায্যে অতি সহজেই যে কোন ধাতু হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে। আবার radio-active পদার্থ সকল হইতেও এই জড়কণা বা ইলেকট্রণই অতি প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে।

একটা অন্ধকার ঘরে, ত্রিকোণ কাচখণ্ডের সাহায্যে সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ করিলে একটী বর্ণছত্র পাওয়া যায়। এই বর্ণছত্রটি কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন নহে; ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই বর্ণ-ছত্রটিকে অসংখ্য কাল-কাল রেখা কাটিয়াছে। সূর্য্যরশ্মি না লইয়া যদি আমরা অন্য কোন পদার্থকে প্রদীপ শিখায় ধরিয়া তাহা হইতে নির্গত আলোক এইরূপে ত্রিকোণ কাচখণ্ডের সাহায্যে পরীক্ষা করি, তাহা হইলে আমরা এই বর্ণছত্রে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন রংয়ের রেখা মাত্র দেখিতে পাই; বাকিটা সমস্তই অন্ধকার। সৌর বর্ণছত্রের সহিত এই বর্ণছত্র পাশাপাশি পরীক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সৌর-বর্ণছত্রে যেখানে যেখানে কাল রেখা আছে, তাহাদেরই কোন-কোনটার স্থান এই দ্বিতীয় বর্ণছত্রের আলোক-রেখাগুলি অধিকার করিয়াছে। এখন যদি এই আলোক রশ্মিটি ত্রিকোণ কাচখণ্ডের মধ্য দিয়া যাইবার পূর্ব্বে দুইটি শক্তিশালী চুম্বকের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে আলোক রেখাগুলি আর তাহাদের পূর্ব্বস্থানে থাকে না;—তাহারা একটু সরিয়া যায়। অনেক সময়ে একটা সরু রেখা বেশ প্রশস্ত হইয়া পড়ে; আবার কখন-কখন একটা রেখাকে দুইটি বা ততোধিক রেখাতে বিভক্ত হইতে দেখা গিয়াছে। ইহারই নাম Zeeman effect। Lorentz সাহেব এই Zeeman effectএর যে কারণ দর্শাইলেন, তাহা হইতেও প্রমাণ হইল যে, সমস্ত পরমাণুতেই জড়কণাসমূহ বা ইলেকট্রণ বর্ত্তমান আছে; এবং তাহাদের দ্রুত স্পন্দনেই আলোকের উৎপত্তি।

Sir J J Thomson এই সমস্ত আবিষ্কারের সূচনাতেই বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত পরমাণুই (atoms) এই জড়কণার বিভিন্ন সমষ্টি মাত্র; এবং এইজন্য ionisation in gases হইয়া থাকে। এই মনীষির কার্য্য এবং শিক্ষা এই জড়কণা বা ইলেকট্রণ বাদে অনেক সাহায্য করিয়াছে। Kaufmann সাহেব প্রমাণ করিলেন যে, এই জড়কণাগুলির গুরুত্ব (mass) তাহাদের বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে উদ্ভূত; এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে Sir J. J. Thomson সাহেব দেখাইলেন যে এই জড়কণাগুলি তাহাদের অতি দ্রুত গতির জন্য একটা অতিরিক্ত গুরুত্ব (mass) লাভ করিয়া থাকে। Theory of relativity ও গতির বেগের সহিত গুরুত্বের (mass) একটা সম্বন্ধ দেখাইয়াছে। রেডিয়ম ধাতু হইতে নির্গত জড়কণাগুলির গতি প্রায় আলোক রশ্মির গতির সমান। অতএব এই জড়কণাগুলিতে গতির বেগের সহিত গুরুত্বের (mass) কি সম্বন্ধ, তাহা দেখিলেই আমরা সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষার (theory and experiment) একটা অতি চমৎকার সামঞ্জস্য দেখিতে পাইব।

জড়কণা বা ইলেকট্রণগুলি যে কণাত্মক বিদ্যুৎ সমষ্টি, ইহা প্রমাণ হওয়াতে বিদ্যুতের বিষয় আমাদের অনেকগুলি ধারণা বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। ধনাত্মক বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আমাদের এতদূর পরিষ্কার ধারণা নাই, কারণ, আজ পর্য্যন্ত আমরা ধনাত্মক বিদ্যুৎবাহী কোন জড়কণার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই নাই। Positive rays কিম্বা radio-active transformations সংক্রান্ত কোন পরীক্ষায় আমরা আজ পর্য্যন্ত hydrogen পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এমন কোন জড়কণা দেখিতে পাই নাই, যাহার সহিত ধনাত্মক বিদ্যুৎ সংযুক্ত আছে।

ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক বিদ্যুৎ-বাহকদিগের গুরুত্ব সম্বন্ধে বেশ একটা বিশেষ রকম পার্থক্য আছে। একটা পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ কল্পনা করেন, তাহাতে এইরূপ একটা পার্থক্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই হাইড্রোজেন-পরমাণুকেই ধনাত্মক ইলেকট্রণ বলা যাইতে পারে, এবং একটা ইলেকট্রণ অপেক্ষা হাইড্রোজেন অণুর সহস্রগুণ গুরুত্বের ইহাই হয় ত একটা কারণ যে, একটী হাইড্রোজেন-অণু ইলেকট্রণ বাহিত ঋণাত্মক বিদ্যুৎ অপেক্ষা বহুগুণ ধনাত্মক বিদ্যুৎ বহন করে।

Gasএর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করা যাইতে পারে দেখিয়াই, বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুতের আণবিক গঠন কল্পনা করিয়াছিলেন। চুম্বক বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গমনকালে ক্যাথোড এবং আলফা রশ্মিগুলি তাহাদের গন্তব্য পথ হইতে বাঁকিয়া বিদ্যুতের আণবিক গঠনের সমর্থন করে। Townsend সাহেব মাপিয়া দেখাইলেন যে, gas ions-বাহিত বিদ্যুৎ জল হইতে বৈদ্যুতিক উপায়ে বিশ্লিষ্ট Hydrogen atom-বাহিত বিদ্যুতের সমান। Sir J. J. Thomson এবং H. A. Wilsonও এই জিনিস দেখাইলেন, আবার Millikan সাহেব অন্য কতকগুলি পরীক্ষার সাহায্যে এইরূপ বিভিন্ন আকারে প্রাপ্ত বিদ্যুৎকণাগুলির একত্ব প্রমাণ করিলেন; এবং এই বিদ্যুতের পরিমাণকে খুব নির্ভুল ভাবে মাপিতে সমর্থ হইলেন। ইহাই unit charge of electricity। ইহা একটী খুব আবশ্যক মৌলিক Physical constant। এই Physical constantএর সহিত electro chemical data মিলাইয়া এক ঘন-সেণ্টিমিটার স্থানে আবদ্ধ gasএ moleculesএর সংখ্যা এবং তাহাদের পরমাণুগুলির গুরুত্ব বাহির করা হইয়াছে। বিদ্যুতের আণবিক প্রকৃতির নিঃসন্দেহ প্রতিষ্ঠা এবং অণু ও পরমাণুগুলিকে নির্ভুল ভাবে মাপিতে পারাই বর্ত্তমান যুগের একটী বিশেষ স্মরণীয় বিষয়।

রঞ্জন-রশ্মির একটী প্রধান গুণ এই যে, এই রশ্মি কোন gasএর ভিতর দিয়া গমনকালে সেই gasকে বিদ্যুৎ প্রবাহ বহন করিবার ক্ষমতা প্রদান করে। এইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত gasএর মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-পরিচালনা লক্ষ্য করিবার সময়ে দেখা গেল যে, এই gasএর মধ্যেকার কতকগুলি charged ions মাত্রই এই বিদ্যুৎ বহন করিয়া লইয়া যায়; বাকি gas moleculeগুলি একেবারে নিষ্ক্রিয়। এই gasএর মধ্যে ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক দুই প্রকার ionsই পাওয়া গেল। আবার Townsend সাহেব দেখাইলেন যে, একটী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে কতকগুলি gas moleculesএর পরস্পর সংঘর্ষেও positive এবং negative ions উৎপন্ন হইয়া থাকে। রেডিয়াম রশ্মি সাহায্যে gasএ বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহনের ক্ষমতার উৎপত্তি এবং অগ্নিশিখা দ্বারা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহন, এই দুইটি কার্য্যও এই ionগুলি দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। H. A. Wilson এবং O. W. Richardson এই বিষয়ে অনেক মাথা ঘামাইয়াছেন।

Cavendish Laboratoryতে যে সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণার আরম্ভ, এবং যাহাতে কেবল বৈজ্ঞানিকগণই আমোদ পাইতেন, তাহাদের এত শীঘ্র practical কাজে লাগান হইয়াছে দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া যাইতে হয়। ইলেকট্রণ এবং ion আবিষ্কারের অল্পদিন পরেই alternating current এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রভৃতি নির্দ্ধারণের জন্য একটা বায়ুশূন্য কাচপাত্রের মধ্যে একটী অতি সূক্ষ্ম গরম তারই প্রধান অবলম্বন হইয়া পড়িয়াছে। আবার একটী অতি সূক্ষ্ম জলন্ত তার হইতে নির্গত ইলেকট্রণের সহিত পরস্পর সংঘর্ষে উৎপন্ন ionগুলির সংযোগে অতি ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ তরঙ্গকে ইচ্ছামত বাড়াইবার জন্য electric oscillators এবং amplifiers প্রস্তুত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে এই amplifiersগুলি অনেক কাজ দিয়াছে, এবং ইহাদের সাহায্যে radio.telephony সম্ভবপর হইয়াছে। Coolidge x-ray tube ও radiography প্রভৃতি অনেক গবেষণায় অনেক সাহায্য করিতেছে।

রঞ্জন-রশ্মি ও রেডিয়াম-রশ্মির সাহায্যে gasএর ionisation ব্যাপারটা বুঝিতে এখন আর আমাদের গোলযোগ হয় না। আবার সাধারণ-বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ চলাচল, ইহাও আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। অথচ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে ঘটনা দেখিয়া উপরিউক্ত ব্যাপারগুলিকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে আমরা প্রথমে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেই ঘটনা সম্বন্ধে আমরা "যে তিমিরে সেই তিমিরে"ই থাকিয়া গেলাম। একটা Vacuum tubeএর ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালাইলে, disruptive discharge যে কেন হয়, সে তত্ত্ব আমরা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। অবশ্য এই disruptive dischargeএর কতকগুলি কারণ আমরা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি; কিন্তু low pressure disruptive discharge ব্যাপার এতই জটিল যে, সে বিষয়ে আমাদের ভালরূপ জ্ঞান জন্মিতে এখনও অনেক দেরী। Sir J. J. Thomson এবং Wein এ বিষয়ে গভীর গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং Thomsonসাহেব এই disruptive dischargeএর সাহায্যে discharge tubeএর ভিতরকার gas বিশ্লেষণ করিবার একটা অতি সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন।

পদার্থমাত্রের পরমাণুমধ্যস্থ গতিশীল ইলেকট্রণগুলির আবিষ্কার হওয়ার পর বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়া অনেক বড়-বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে। অনেক সময়ে একটী ইলেকট্রণকে শুধু গুরুত্ব এবং point charge ভিন্ন আর কোন গুণই দেওয়া হয় নাই। এবং মাত্র দুইটী গুণের সাহায্যেই ধাতুর মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-পরিচালনা ব্যাপারটি বুঝান হইয়াছে। যাহা হউক, Donde এবং Sir J. J. Thomson ইলেকট্রণের যে সকল গুণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের সাহায্যে অনেক বিষয় বুঝান গেলেও, সম্প্রতি Kamerlingh অল্প উত্তাপে বিশুদ্ধ ধাতুর মধ্য দিয়া Supra Conductivity সম্বন্ধে এমন কতকগুলি তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা Sir J. J. Thomsonএর ইলেকট্রণ সাহায্যে বুঝান যায় না। আবার Ohm's Law সম্বন্ধেও কোন-কোন বিষয় এই জড়কণাগুলির

দ্বারা বুঝান যাইতেছে না। এই সমস্ত বুঝাইতে হইলে Keesom সাহেবের কথা-মত আমাদের quantaর সাহায্য লইতে বাধ্য হইতে হয়। Langeir সাহেব এই ইলেকট্রণের সাহায্যে magnetism এবং diamagnetism বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সেখানেও তিনি ততদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই বিষয়ে বোধ হয় Weiss সাহেবের অনুমান কতক ঠিক। তিনি বলেন যে, বৈদ্যুতিক পরমাণুর (atom of electricity) ন্যায় চৌম্বক পরমাণুও (unit of magnetism) আছে; কিন্তু প্রমাণাভাব।

এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জগতে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার হইয়াছে, এবং তাহাতে বৈজ্ঞানিকদের অতি প্রিয় ইলেকট্রণের কতদূর হাত আছে, তাহার একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের দিলাম। যতদূর দেখা যাইতেছে,—এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইলেকট্রণের কাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে; কারণ, সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকগণ quantum নামক আর একটি জিনিসের সন্ধান পাইয়া তাহাকে লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন, আর তাঁহাদের ইলেকট্রণ ভাল লাগিতেছে না। এখন quantumএর যুগ আরম্ভ হইয়াছে।

আরবজাতির জ্ঞান-চর্চ্চা—করডোভা বিশ্ববিদ্যালয়

[অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, এম্-এ, বি-টি]

আণ্ডালুসিয়া প্রদেশের (বর্ত্তমান স্পেন) করডোভা বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যযুগে বিশ্ববিশ্রুত জ্ঞানকেন্দ্র কায়রো ও বাগ্‌দাদের ন্যায় গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়া উঠে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে খৃষ্টান, ইহুদী ও মুসলমানগণ সেই শিক্ষাকেন্দ্রে জ্ঞান চর্চ্চার ও বিজ্ঞানালোচনার পূর্ণ অধিকার সমভাবে প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে উদারভাব বর্ত্তমান জগতে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে; সঙ্কীর্ণতা ও বিদ্বেষভাব তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগে স্পেনদেশে সুসভ্য ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বিগণ হিংসা-দ্বেষ বিজড়িত সঙ্কীর্ণতা দ্বারা তাঁহাদের উদার ধর্ম্মমতকে কলুষিত করেন নাই; কোন প্রকার ভেদবুদ্ধি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। মধ্যযুগে মানবীয় সভ্যতার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই যেন তাঁহারা প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা ভেদাভেদ ভুলিয়া সে লক্ষ্য সাধনে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম; তাঁহাদের জ্বলন্ত উৎসাহ, তাঁহাদের সাম্যবাদ, সর্ব্বোপরি তাঁহাদের উদার ধর্ম্মমত জগতে সভ্যতাবিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। কাজেই মুসলমান কর্ত্তৃক স্পেন বিজয় য়ুরোপের ইতিহাসে এক অশেষ কল্যাণকর ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল।

বারশত বৎসর অতীত হইল, দামাস্কসের খলিফার নিয়োজিত আফ্রিকাদেশের শাসনকর্ত্তা মুসা, তারিক নামক একজন সেনাপতির অধীনে স্পেন বিজয়ের জন্য সাত সহস্র সৈন্য প্রেরণ করেন। দুর্দ্ধর্ষ ও রণনিপুণ আরবেরা অচিরে তাঁহাদের বীর পরাক্রমে ও অজেয় সাহসের প্রভাবে স্পেনদেশে তাঁহাদের আধিপত্য স্থাপন করেন।

রণপ্রিয় আরবীয় বীরগণের সমর-পিপাসা ও বিজয়িনী শক্তি দিন-দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে বীরমদে মত্ত হইয়া তাঁহারা "গল" (ফরাসী) দেশ অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। টুরের বিখ্যাত রণক্ষেত্রে আরব সেনানী মহোল্লাসে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। ফরাসীদেশের তদানীন্তন রাজা শার্লে (Charles) তাঁহার অপরিমিত সৈন্যসহ স্বীয় দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আরব সৈন্যের গতিরোধ করিলেন। ছয়দিনব্যাপী তুমুল যুদ্ধের পর সপ্তম দিনে আরবদের পরাজয় হইল। এইরূপে সমস্ত য়ুরোপ এক মহা বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিল। যদি আরবগণ সেই যুদ্ধে পরাজিত না হইত, তবে সমস্ত য়ুরোপের ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। খৃষ্টধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আজ সমস্ত য়ুরোপে ইস্‌লামের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইত গির্জ্জার পরিবর্ত্তে মস্‌জিদে আজ সমস্ত য়ুরোপ পরিপূর্ণ হইত। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ, তাই আরবদের বিজয়স্রোত সেইখানে নিরুদ্ধ হইল।

আরবগণ ভুজবলে ও তরবারির প্রভাবে সমগ্র য়ুরোপে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিল না সত্য; কিন্তু তাহারা সমস্ত য়ুরোপে যে জ্ঞানরাজ্য স্থাপন করিল, তাহার একচ্ছত্র রাজত্বের অক্ষুণ্ণ প্রভাবে, অজ্ঞানান্ধ, কুসংস্কারগ্রস্ত, নীতিহীন, ধর্ম্মশূন্য য়ুরোপীয় সমাজ জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল।

য়ুরোপের তদানীন্তন অবস্থা অতীব শোচনীয়। সর্ব্বশতাব্দী অতীত হইয়াছে। রোমকদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাহাদের সেই প্রাধান্য, সেই ক্ষমতা, সেই প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে। অধর্ম্মের তাণ্ডব নৃত্যে সমস্ত য়ুরোপ থরথরি কম্পিত, দুর্নীতির স্রোতে য়ুরোপীয় সমাজ পরিপ্লাবিত, অজ্ঞানতা তিমিরে ও কুসংস্কারে মানব মন আচ্ছন্ন; অত্যাচার ও উৎপীড়নে নরকুল প্রপীড়িত। দেশসকল শ্রীভ্রষ্ট, সম্পদ্‌হীন ও অরাজকতায় পরিপূর্ণ। সবলের অত্যাচারে দুর্ব্বল নিষ্পেষিত, নিরক্ষর জনসমাজের উপর ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের প্রভাব অব্যাহত, স্বাধীন চিন্তাস্রোত সাম্প্রদায়িক মত-প্রাবল্য পঙ্কিল, বিবেকবাণী পদে-পদে প্রতিহত ও অনাদৃত।

Hallam বলেন, "In tracing the decline of society from the subversion of the Roman Empire, we have been led, not without connection, from ignorance to superstition, from superstition to vice and lawlessness, and from thence to general rudeness and poverty."

বস্তুতঃ য়ুরোপীয় সমাজ আরবদের স্পেনবিজয়কালে মোহান্ধকারে নিমগ্ন ছিল; এবং সেই অজ্ঞানতা নিবন্ধন দুর্নীতির প্রবাহ মানবগণকে অধর্ম্মের অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল।

"রাজানুশাসন অবজ্ঞাত হইতেছিল। দর্শনশাস্ত্র এত বিকৃত হইয়াছিল যে, অবশেষে উহা ঘৃণ্য বিষয় মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ইতিহাসের

চর্চা রহিত হইয়াছিল। লাটিন ভাষা দিন-দিন অপভাষায় পরিণত হইতেছিল; কাব্যশাস্ত্র ক্ষুদ্র হস্তে পতিত হইয়া অপব্যবহৃত হইতেছিল। শিল্পবিজ্ঞান দিন-দিন লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছিল।

"Law neglected, philosophy perverted till it became contemptible, history nearly silent, the Latin tongue growing nearly barbarous, poetry rarely and feebly attempted, art more and more vitiated."—(*Hallam.*)

অজ্ঞানতার বিষময় ফল অচিরেই য়ুরোপীয় সমাজে অনুভূত হইল। শিক্ষালোক-বঞ্চিত মানবকুল স্বতঃই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইল। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় (ascetics) নানা-প্রকার উন্মাদনাপ্রসূত কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহাদের জ্বলন্ত উৎসাহ ও ত্যাগধর্ম্মের পরিচয় দিতেছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহাদের সেই উচ্চ আদর্শ অনুসরণে অসমর্থ জনসাধারণ, কোনরূপ মধ্যবর্ত্তী পথ দেখিতে না পাইয়া, পাপ-স্রোতে দেহ ভাসাইয়া দিয়া নিঃসঙ্কোচে পরম আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল।

লাটিন মৃত ভাষায় পরিণত হইল; কাজেই জনসাধারণের নিকট জ্ঞানরত্নাগার অবরুদ্ধ হইল। গির্জ্জা বা মঠ-সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে শুধু ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষাই প্রসার লাভ করিল। জনসাধারণ শিক্ষার অমৃত-ধারা হইতে বঞ্চিত হইয়া কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের আপাতমধুর পরিণাম-বিষ ফল আহার করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিল। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সুসভ্য ও শিক্ষাভিমানী য়ুরোপীয় সমাজের ভিত্তিস্বরূপ জনসাধারণ বর্ণজ্ঞানহীন রহিয়া গেল।

ফরাসীদেশ অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে অবনতির নিম্নস্তরে অবরোহণ করে। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজজাতির ঘোর দুর্দ্দশা ও দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়। দশম শতাব্দীতে ইটালী দেশে সাহিত্যের যে শোচনীয় অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা অবর্ণনীয় ও অননুমেয়।

পুস্তকের অভাব দিনদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেশব্যাপী অজ্ঞানতা তাহার অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতে অগ্রসর হইল। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুসলমানগণ তাহাদের অদম্য সাহস, অপ্রমেয় পরাক্রম ও অপূর্ব্ব শক্তিপ্রভাবে বিজিত আলেকজেন্দ্রিয়াতে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। সেই অবধি একাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগ পর্য্যন্ত য়ুরোপে আলেকজেন্দ্রিয়া হইতে পেপাইরাস (papyrus) নামক লিখনোপযোগী উপকরণের আমদানীর পথ বন্ধ হয়। তখনও য়ুরোপ জীর্ণবস্ত্র হইতে কাগজ প্রস্তুত করণের প্রথা অবগত ছিল না; কাজেই পার্চ্চমেণ্ট (parchment) ভিন্ন অন্য কোনও রূপ কাগজ য়ুরোপে ছিল না। আবার সেই পার্চ্চমেণ্টও এত বহুমূল্য ছিল যে, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই ব্যয়-সাধ্য সাহিত্য চর্চ্চা অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হইল। কৃপাপাত্র য়ুরোপীয় সমাজ কাগজের অভাবে, চর্ম্মোপরি হস্তলিখিত লিপিসমূহ বিনষ্ট করিয়া, তদুপরি তাহাদের লিখন কার্য্য সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিল। এরূপে বহু প্রাচীন গ্রন্থকারের অমূল্য গ্রন্থ বিলুপ্ত হইল, এবং তথাকথিত সন্ন্যাসী ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের উপকথা ও অন্যান্য অসার বাক্যসমূহ তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

য়ুরোপীয় সমাজের এই ঘোর দুর্দ্দশার দিনে, যখন য়ুরোপীয় জ্ঞানাকাশ ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন, যখন কুসংস্কারের বজ্রনির্ঘোষে সমগ্র য়ুরোপ থরহরি কম্পিত, যখন য়ুরোপের শিথিল সমাজভিত্তি পতনোন্মুখ, পাপরাক্ষসী তাহার বিকট বদন ব্যাদান করিয়া যখন য়ুরোপকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল,—য়ুরোপের সেই দুর্দ্দশার দিনে আরবগণ স্পেনদেশে রাজত্ব করিতেন। তাহাদের অষ্টশত বর্ষব্যাপী রাজত্বকালে স্পেনদেশ য়ুরোপের শীর্ষস্থান অধিকার করে ও সমগ্র য়ুরোপের আদর্শরূপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক বিস্তার করিয়া সেই বিপন্ন হতশ্রী সমাজকে উন্নত করিতে অগ্রসর হয়।

স্পেনবিজেতা আরবগণ য়ুরোপের বর্ত্তমান শিল্প বিজ্ঞান ও স্থাপত্য বিদ্যার পথপ্রদর্শক। তাঁহারাই য়ুরোপে সাহিত্য চর্চ্চার যুগ সর্ব্বপ্রথমে আনয়ন করেন। আরবদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্ম্মণী, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে জ্ঞানপিপাসু শতশত যুবক জ্ঞানামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত ও চরিতার্থ হয়। চিকিৎসা ও অস্ত্র-বিদ্যায় আরবগণ অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীজাতিও নানাপ্রকার বিদ্যাচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিতেন। করডোভা নগরীতে স্ত্রী-চিকিৎসকের অপ্রতুলতা ছিল না।

গণিত, জ্যোতিষ, উদ্ভিদবিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন ও আইনশাস্ত্রে শিক্ষা-লাভ করিবার বন্দোবস্ত তদানীন্তন য়ুরোপে স্পেন ভিন্ন অন্য কোনও দেশে বর্ত্তমান ছিল না।

কৃষিকার্য্যের উদ্দেশ্যে খাল খনন, দেশরক্ষার জন্য দুর্গ ও জাহাজ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তন্তুবায়, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি শিল্পীগণ তাহাদের নিজ নিজ শিল্পের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। যুদ্ধ ব্যাপারে তাহাদের অদম্য সাহস, তাহাদের অপূর্ব্ব বীরত্ব, তাহাদের অসি-চালন-নৈপুণ্য লোকের ভয় ও বিস্ময় যেরূপ উৎপাদন করিত, তাহাদের হিতকর শাসনপ্রণালী সেইরূপ মানব-মনে ভক্তি ও প্রীতির সঞ্চার করিত। তাহাদের রণতরী মিশর-দেশের ফেটিমাইট (Fetimites) দিগের রণতরীর সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের আধিপত্য লইয়া যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত থাকিত, আর তাহাদের স্থলসৈন্য তরবারির প্রভাবে খৃষ্টানাধিকৃত দেশসমূহে ইস্‌লামের বিজয়গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিত। শিক্ষাবিষয়ে তাহারা য়ুরোপীয় সমাজে অগ্রগণ্য ও আদর্শস্থল ছিল। তাহাদের শাসনকালে স্পেনদেশ পাঠাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিপূর্ণ হয়।

তাহাদের প্রিয় করডোভা নগরী গ্রাণাডা (Granada), সেভিল (Sevele), টলেডো (Toledo) প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠে। একজন আরব গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

"করডোভা আণ্ডালুসিয়া দেশের রাণী। রত্নগর্ভ ভাষাসমুদ্র হইতে অসংখ্য রত্নরাজি উদ্ধার করিয়া কবিগণ তাহার কণ্ঠহার গ্রথিত করিয়াছেন।" (Cardova is the Bride of Andalusia. Her

necklace is strong with the pearls which her poets gathered from the ocean of language).

বস্তুতঃ মহাপ্রতাপশালী তৃতীয় আবদর রহমানের রাজত্ব সময়ে (৯১২—৯৬১), আরবশাসিত সুখবিলাসপূর্ণ স্পেনদেশের রাজধানী, সুরম্য হর্ম্ম্যরাজিশোভিত করডোভা নগরী অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল; জ্ঞানগরিমায় ও বিদ্যাবত্তায় বিজেনসিয়াম ব্যতীত য়ুরোপের অন্য কোনও নগরী তাহার সমকক্ষ ছিল না।

"করডোভা নগরী নানাবিদ্যাবিদ্ বুধমণ্ডলীতে পরিবৃত ছিল। খ্যাত-নামা মহাপুরুষগণ তাঁহাদের গুণগরিমায় ও মাহাত্ম্য প্রভায় করডোভা নগরী উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। বিজয়শ্রীলাঞ্ছিত সুনিপুণ যোদ্ধৃবৃন্দে সেই নগরী গৌরবমণ্ডিত ছিল। কাব্যামৃত রসাস্বাদলিপ্সু, বিজ্ঞানাধ্যয়ন-চিকীর্ষু, আইন ও ধর্ম্মসংক্রান্ত জ্ঞানপিপাসু শত শত যুবক পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আসিয়া সমবেত হইত। এইরূপে সেই করডোভা নগরী নানা শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত-মণ্ডলীর মিলনক্ষেত্ররূপে ও অধ্যয়ন-রত ছাত্রবৃন্দের সারস্বত-কুঞ্জরূপে পরিচিত হয়।

"There thou wouldst see doctors, shining with all sorts of learning, lords distinguished by their virtues and generosity, warriors renowned for their expedition, officers experienced in all kinds of warfare. To Cordova came from all parts of the world students, eager to cultivate poetry, to study the sciences, or to be instructed in divinity or law; so that it became the meeting-place of the eminent in all matters, the abode of the learned and the place of resort for the students."

করডোভা নগরীর সেই সৌন্দর্য্য, সেই বিস্তৃতি এখন আর নাই। আলকেজর রাজপ্রাসাদ এখন ধ্বংসাবশিষ্ট অবস্থায় কারাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। সেই সেতু এখনও গোয়াডিলকুইভার নদীর উপর বিস্তৃত রহিয়াছে সত্য, আর সেই ওম্মিয়াবংশের সর্ব্বপ্রথম নরপতি-নির্ম্মিত মসজিদ্ এখনও শত-শত দর্শকের মনে বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার করিতেছে সত্য, কিন্তু নগরীর সে শোভা আর নাই। যে নগরী এক সময়ে প্রায় দশ মাইল বিস্তৃত ছিল, এখন তাহা এক ক্ষুদ্রায়তন সহরে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন করডোভা নগরীর পাদমূল বিধৌত করিয়া যে নদী প্রবাহিত হইত, তাহার উভয় তীর মর্ম্মর প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহে, মসজিদে এবং উদ্যানে পরিশোভিত ছিল। সেই সকল উদ্যান অপূর্ব্ব-শোভাবিশিষ্ট পুষ্পফলে পরিপূর্ণ ছিল। সীস নির্ম্মিত নলের (pipe) সাহায্যে উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে এই সকল উদ্যানে জল প্রেরণ করা হইত। এইরূপে উদ্যানস্থিত স্বর্ণ ও রজত-নির্ম্মিত জলাধার, কৃত্রিম হ্রদ, জলাশয় ও নির্ঝরসমূহ জলে পরিপূর্ণ থাকিত।

সমস্ত নগরী হর্ম্ম্যরাজিতে পরিশোভিত ছিল। ৫০ হাজার আমীরের প্রাসাদ, ১০ লক্ষ সাধারণ লোকের বাসগৃহ, ৭০০ মসজিদ, ৯০০ স্নানাগার (public baths) সেই প্রাচীন করডোভা নগরীতে পরিদৃষ্ট হইত। বাহ্য সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া করডোভার অধিবাসিগণ কখনও বিদ্যার বা জ্ঞানের অনাদর করে নাই। সে স্থানের সুশিক্ষিত অধ্যাপক ও শিক্ষকমণ্ডলীর গুণে আকৃষ্ট হইয়া বহু শিক্ষার্থী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইত। এইরূপে তদানীন্তন য়ুরোপে করডোভা (Cordova) সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে এইস্থানে শিক্ষা প্রদত্ত হইত। আণ্ডালুসিয়ার চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিগণ নব নব আবিষ্কারের দ্বারা চিকিৎসা-শাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিতেন।

আলবুকেসিস (Albucasis) একাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন, এবং অস্ত্রব্যবহারে তাঁহার নিপুণতা কোন-কোনও অংশে বর্ত্তমান চিকিৎসকগণের দক্ষতা হইতে ন্যূন ছিল না। তাঁহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তীকালে আভেন্‌জোর (Avenzoar) চিকিৎসা-বিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যাবিষয়ক কতকগুলি নূতনতত্ত্বের আবিষ্কার করেন। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ইবন বেটাস (Ibn Beytas) ভৈষজ্য গুল্মলতা আহরণ উদ্দেশ্যে প্রাচ্যদেশ প্রদক্ষিণ করেন; এবং অবশেষে তৎসম্বন্ধে একখানি বিস্তৃত পুস্তক প্রণয়ন করেন।

মধ্যযুগে প্রদর্শনশাস্ত্রবিদ্ আভারোস (Averraes) প্রাচীন গ্রীসের দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের সংযোগ-সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করেন। জ্যোতিষ, ভূগোল, রসায়ন, প্রকৃতি পাঠ ও বস্তুতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্র অতি আগ্রহের সহিত করডোভাতে সমালোচিত হইত। সাহিত্য ক্ষেত্রে য়ুরোপে কাব্যশাস্ত্রের এক শুভদিন উপস্থিত হইয়াছিল। কাব্যা-লোচনা এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, সাধারণ লোকেও আরবীভাষায় কবিতা লিখিতে প্রয়াস পাইত। বক্তৃতাকালে বক্তৃতামধ্যে সময়োপযোগী কোনও ছন্দোবদ্ধ ব্যাকরণ রচনা করিয়া, অথবা কোনও কবিতাংশ আবৃত্তি করিয়া বক্তৃতার উপসংহার করিবার এক প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহা না হইলে সেই বক্তৃতা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। খলিফা হইতে আরম্ভ করিয়া নৌকার মাঝি পর্য্যন্ত সকলেই কবিতা রচনা করিত।

স্পেনবাসী আরবদিগের উদ্ভাবনী-শক্তি ও মৌলিক চিন্তার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কাগজ, দিঙ্‌নির্ণয়যন্ত্র (Compass) ও বারুদ তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে নব-নব তথ্য পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মধ্যযুগে প্রচার করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

গারবার্ট (Gerbert) মধ্যযুগে য়ুরোপের একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। * তিনি ফ্রান্স, ইটালী ও জার্ম্মাণীর বিদ্যালয়সমূহে তাঁহার জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে মুসলমান-শাসিত

* তিনি প্রায় ৯৩০ খৃষ্টাব্দে জন্ম পরিগ্রহণ করেন এবং সিলভেস্টাস (Silvestas II) নামে ৯৯৯ খৃষ্টাব্দে পোপ নির্ব্বাচিত হন। ১০০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

স্পেন দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া প্রচুর যশঃ উপার্জ্জন করেন।

Mr. Painter writes in his History of Education, "The Arabians originated Chemistry, discovering alcohol and nitric and sulphuric acids. They gave Algebra and Trigonometry their modern forms, applied the pendulum to the reckoning of time, repeated the Greek experiments that ascertained the size of the earth by measuring a degree, and made catalogues of stars. For a time they were the intellectual leaders of Europe.

এইরূপে শাস্ত্রালোচনেচ্ছা ও জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা স্পেনদেশে আরবদিগের মধ্যে এত বলবতী হইয়াছিল যে, দেশের স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের নানা বিষয়-সম্বলিত গ্রন্থাবলী বহু অর্থব্যয়ে সংগৃহীত হইয়া সেই সকল পাঠাগারের পূর্ণতা ও শোভা সম্পাদন করিয়াছিল।

প্রাচ্যদেশ হইতে হস্তলিখিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়া করডোভাতে আনয়ন করার জন্য খলিফা বহু লোক নিযুক্ত করিলেন; এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিয়োজিত লোকসমূহ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর অনুসন্ধানে কায়রো, দামাস্কাস, ও বাগদাদের পুস্তক-বিক্রেতাদিগের বিপণিশ্রেণী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এই উপায়ে তাঁহার পাঠাগারের জন্য তিনি ন্যূনকল্পে চারি লক্ষ (৪০০,০০০) পুস্তক সংগ্রহ করেন। যে সময়ে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই, সে সময়ে এত পুস্তক সংগ্রহ করা কিরূপ অর্থ ও শ্রমসাপেক্ষ, তাহা ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইতে হয়।

হাকাম একজন জ্ঞানপিপাসু ও অধ্যয়নপ্রিয় সম্রাট্ ছিলেন। তিনি কেবল পুস্তক সংগ্রহ করিয়াই নিরস্ত হন নাই। তিনি অতি আগ্রহের সহিত সেই সমস্ত পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন এবং সেই সকল পুস্তক যাহাতে সহজবোধ্য হইতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের টীকাও লিখিতেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সেই সকল পুস্তক পাঠকালে তিনি পার্শ্বদেশে যে টীকা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার পরবর্ত্তীকালের পণ্ডিতগণ শতমুখে তাহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

অজ্ঞানতিমিরাবৃত য়ুরোপের ঘোর দুর্দ্দিনে জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত স্পেনদেশের সভ্যতা পরিদর্শন করিয়া, নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয় ঐতিহাসিক লেইনপুল (Lanepoole) সরলভাবে স্বীকার করিয়াছেন—"যখন দশম শতাব্দীতে আমাদের স্যাক্সন জাতীয় পূর্ব্বপুরুষগণ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সঙ্কীর্ণ গৃহে বাস করিত, যখন আমাদের ভাষা সুগঠিত হইয়া উঠে নাই; যখন বিদ্যালোচনা শুধু কয়েকজনে ধর্ম্মযাজকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, যখন সমস্ত য়ুরোপ অসভ্য জনোচিত অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; সভ্যজনোচিত আচার ব্যবহার যখন য়ুরোপে প্রবর্ত্তিত হয় নাই; সেই দশম শতাব্দীতে করডোভা-নগরী জ্ঞান-গরিমায়, শিল্পচাতুর্য্যে ও স্থপত্যবিদ্যায় সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল।"

যে য়ুরোপীয় সমাজ এক সময়ে ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী আরব জাতির শিষ্যরূপে সাগ্রহে তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত, কালের কুটিল চক্রাবর্ত্তনে আজ সেই পূর্ব্বগৌরববিচ্যুত মুসলমান-সমাজ য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মুখাপেক্ষী, তাহাদের জাতীয় ইতিহাস আজ তাহারা য়ুরোপীয় পণ্ডিতের মুখে শুনিয়া, নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে। ইহা ভারতের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কারণ শুধু মুসলমান নয়, আজ ভারতীয় হিন্দুসমাজও তাহাদের শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর পানে উদগ্রীব হইয়া তাকাইয়া রহিয়াছে।

এই নিরাশার ভিতরেও আশার একটু ক্ষীণালোক দেখা যাইতেছে। আজ মুসলমান-সমাজ সুষুপ্তির সুখময় ক্রোড় হইতে জাগরিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। তাই বঙ্গদেশে আজ আমরা মুসলমান ছাত্রসংখ্যার দিন দিন বৃদ্ধি দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। মুসলমান সমাজনেতৃগণ তাঁহাদের সমাজের শিক্ষোন্নতির জন্য যথেষ্ট আগ্রহ ও স্বার্থত্যাগ প্রদর্শন করিতেছেন। যাহাতে অল্পবুদ্ধি কোমলমতি বালকগণ সুপথে চালিত হইয়া ভেদবুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া উদারভাবে জাতীয়ধর্ম্ম ও জাতীয়শিক্ষার লুপ্ত-গৌরব উদ্ধারসাধনে যত্নবান হয়, সমাজপতিগণের সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে। আশা করি তাঁহাদের নেতৃত্বাধীনতায় মুসলমান সমাজ অচিরে গৌরবমণ্ডিত হইয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিবে।

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা পালভরে ভাগীরথী-বক্ষে উজানে চলিয়াছিল। অদূরে পদ্মা ও ভাগীরথীর সঙ্গম। তখন ভাগীরথীর এত দুরবস্থা ছিল না,—গঙ্গার অধিকাংশ জল ভাগীরথী বাহিয়া সাগরে মিশিত। সুতরাং তখনও পদ্মা প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে নাই।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে সুতী গ্রামের নিম্নে ভাগীরথীর একটী প্রকাণ্ড দহ ছিল। তাহার কিয়দংশ এখন বিলে পরিণত হইয়া আছে। দিবাবসান দেখিয়া মাঝি পাল নামাইয়া নৌকা বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে একখানি ক্ষুদ্র পানসী আসিয়া তাহার পার্শ্বে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে উভয় নৌকা তীরে আসিয়া লাগিল। পানসীর সম্মুখে বসিয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটী ক্ষুদ্র হুঁকায় তামাকু সেবন করিতেছিল; এবং তাহার সম্মুখে জনৈক মসীবর্ণ প্রৌঢ় লোলুপ দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের বদন-নির্গত ধূমপুঞ্জের দিকে চাহিয়া ছিল। পানসী তীরে লাগিলে প্রৌঢ় বলিয়া উঠিল, "দাদাঠাকুর, পেসাদটা একবার দিলে না? কর্ত্তাবাবা বলিতেন—" ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "দীনু, তোমার কর্ত্তাবাবার জ্বালায় স্থির হইয়া এক ছিলিম তামাকও খাইবার উপায় নাই।" প্রৌঢ় ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দিল, "দেখ দাদাঠাকুর, এই যে শেষ তিন ছিলিম তামাক সাজিয়াছি, তাহা একাই ছাই করিয়াছ,—এ কলিকাটাও পুড়িয়া আসিয়াছে। কর্ত্তাবাবা বলিতেন যে বামুনের হাতে —"

"রাখ্ তোর কর্ত্তাবাবা!" ব্রাহ্মণ এই বলিয়া হুঁকা হইতে কলিকাটি নামাইয়া দিল। দীননাথ কলিকাটি লইয়া নিজের ক্ষুদ্র হুঁকায় বসাইয়াছে, এমন সময়ে জনৈক দীর্ঘাকার, কৃষ্ণবর্ণ, অতি কৃশকায় ব্রাহ্মণ পানসীর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তা, কলিকাটায় কিছু আছে কি?" দীননাথ মুখ হইতে হুঁকাটি নামাইয়া আগন্তুকের দিকে রুষ্ট-নেত্রে চাহিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, "বামুন বুঝি?" আগন্তুক আকর্ণ-বিশ্রান্ত দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া কহিল, "হাঁ।" দীননাথ পানসী হইতে নামিয়া যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করিয়া একটা ক্ষুদ্র প্রণাম করিল; আগন্তুক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা?"

"আজ্ঞে আমরা গন্ধবণিক্। এই কলিকাটা ঐ ঠাকুরটী দেড় প্রহর ধরিয়া পোড়াইয়াছেন; সুতরাং ইহাতে বড় কিছু নাই। অনুমতি করেন তবে ঢালিয়া সাজিয়া আনি।" দীননাথ এই বলিয়া হুঁকাটি মুখে তুলিল। আগন্তুক অতি ছিন্ন, মলিন বসনখণ্ডে আবদ্ধ একটী পুঁটুলী শুষ্ক বালুকারাশির উপরে রাখিয়া তাহার উপর উপবেশন করিল। দীননাথ হুঁকায় একটী টান দিয়া কাসিতে-কাসিতে তাহা নামাইয়া রাখিল এবং সঙ্গীকে কহিল, "দাদাঠাকুর, দেখ দেখি, হুঁকার নলিচাটায় আগুন ধরিয়াছে কি না?" তাহার সঙ্গী তখন অনন্যমনে বৃহৎ নৌকার দিকে চাহিয়া ছিল; সুতরাং সে শুনিতে পাইল না। দীননাথ পানসী হইতে তামাকু লইয়া আসিয়া আগন্তুকের নিকট সাজিতে বসিল। আগন্তুক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সাহাজী, কত দূর যাইবে?" দীননাথ চারিদিকে চাহিয়া উত্তর দিল, "ঠিক নাই! তুমি কোথায় যাইতেছ ঠাকুর!"

"শ্বশুরবাড়ী!"

"সে কোন্ খানে!"

"উপস্থিত নিকটে কোথাও নয়।"

"তবে যাইবে কোথায়?"

"বলিলাম ত শ্বশুরবাড়ী।"

"ঠাকুর কুলীন বুঝি?"

"ফুলের মুখোটি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান।"

"ভাল, ভাল, দাদাঠাকুর বস।"

এই সময় তামাকুর ছিলিম প্রস্তুত হইল; এবং কলিকাটি আগন্তুকের হস্তে দিয়া দীননাথ কহিল, "দাদাঠাকুর, ইচ্ছা কর; কিন্তু দেখিও, খবরদার, প্রসাদ করিয়া যেন চক্কোত্তি মশায়ের হাতে দিও না। উনি দেড় প্রহরে দশ ছিলিম

তামাক পোড়াইয়াছেন, অথচ প্রসাদটা আমা অবধি পৌঁছায় নাই।" আগন্তুক হাসিয়া কলিকাটি লইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "সাহাজী, ঠিক কোন্‌খানে যাইবে বল দেখি?" দীননাথ কহিল, "বলিলাম যে ঠাকুর ঠিক নাই।" "তবে তুমিও কি শ্বশুরবাড়ী যাইবে না কি?"

"আমাদের জাত কি তোমাদের মত ঠাকুর! তোমরা বিবাহ করিয়া পয়সা পাও, আমাদের টাকা দিয়া বিবাহ করিতে হয়।"

"তাও ত বটে। কি উদ্দেশ্যে চলিয়াছ বাপু?"

"ব্যবসায় আর কি দাদাঠাকুর! বেণের ছেলে, যেখানে দুপয়সা রোজগারের পথ দেখি, সেখানেই যাই। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?"

"কাটোয়া হইতে।"

"পরশু দিন মুরশিদাবাদ হইতে ফৌজ কুচ করিয়াছে, তাহার কিছু লক্ষণ দেখিলে?"

"বিলক্ষণ দেখিলাম! বহরামগঞ্জ হইতে ভগবানগোলা পর্য্যন্ত দুইধারেরই গ্রামের লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছে,—ক্ষেতের ধান ও গাছের ফল উধাও হইয়া উড়িয়া গিয়াছে,—ঘর-বাড়ী ও ধানের গোলা খাক হইয়া আছে। ভগবান-গোলার মঠের মোহান্ত কাল সন্ধ্যাবেলা দেখা করিতে গিয়াছিল, কোড়া খাইয়া আধমরা হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে!"

"এ ফৌজটা কাহার ফৌজ শুনিতে পাইলে কি?"

"ফৌজ আবার কাহার, দিল্লীর বাদশাহের।"

"আচ্ছা দাদাঠাকুর, ফৌজ এখন কত দূর?"

"গোয়ালারা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতেছিল,—তাহারা বলিয়া গেল আজ সন্ধ্যাবেলায় সুতীর মোহানার এক ক্রোশ দূরে ছাউনী পড়িবে।"

আগন্তুক দীননাথের হস্তে কলিকাটী দিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া দীননাথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাদাঠাকুর, উঠিলে যে?—আজ রাত্রিতে বাসা কোথায়?" আগন্তুক হাসিয়া উত্তর করিল, "বাসা! ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ সাহাজী! শ্মশানের ধারে একটা বড় বটগাছ দেখিয়া আসিয়াছি,—মনে করিয়াছি, আজ সেখানেই বাসা লইব।"

"রাম, রাম, বল কি দাদাঠাকুর! এই ঘোর সন্ধ্যাকাল, শ্মশানে থাকিবে কি? চল একখানা গ্রামে গিয়া বাসা খুঁজিয়া লই।"

"তাহা হইলে দিন কতক বাদে আসিও। পদ্মাপারে না গেলে আর কোন ঘরে চাল দেখিতে পাইবে না।"

দীননাথ যতক্ষণ আগন্তুক ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ করিতেছিল, ততক্ষণ তাহার সঙ্গী ব্রাহ্মণ একমনে বৃহৎ নৌকার আরোহীদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। সেই নৌকার সম্মুখে বসিয়া এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ দীননাথের কথা-বার্ত্তা শুনিতেছিল। দীননাথ যখন আগন্তুককে নিমন্ত্রণ করিল, তখন তাহার সঙ্গী পানসী হইতে নামিয়া বৃহৎ নৌকার আরোহীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিদ্যালঙ্কার মহাশয় না?" কিন্তু প্রৌঢ় তাহার কথার উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী বিস্মিত হইয়া পুনরায় পানসীতে ফিরিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে এক গৌরবর্ণ কৃশকায় যুবা বড় নৌকা হইতে বাহিরে আসিয়া দীননাথের নিকটে গেল। তাহার কণ্ঠে শুভ্র যজ্ঞোপবীত দেখিয়া দীননাথ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। যুবা দীননাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, ফৌজের কথা বলিতেছিলেন, নিকটে কি ফৌজ আসিতেছে না কি?" আগন্তুক কহিল, "বাদশাহী ফৌজ এখান হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে ছাউনী করিবে। আপনাদের নৌকায় কি স্ত্রীলোক আছে?"

"হাঁ, আমরা সপরিবারে কাশী যাইতেছি।"

"তাহা হইলে নৌকা লইয়া শীঘ্র পারে যান।"

"সেই কথাই ভাল।"

যুবা ফিরিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া আগন্তুক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনারা কোন্ শ্রেণী?"

যুবা বিস্মিত হইয়া কহিল, "রাঢ়ীয় শ্রেণী। কেন?"

"কোন্ মেল?"

"ফুলিয়া। এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?"

"আমি ফুলের মুখুটি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান, যদি কন্যা পাত্রস্থ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি প্রস্তুত আছি।"

আগন্তুকের কথা শুনিয়া যুবা হাসিয়া উঠিল এবং কহিল, "না, মহাশয়, আমাদের পরিবারে বিবাহযোগ্যা কন্যা নাই।" যুবা নৌকায় ফিরিয়া গেল এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই বড় নৌকার মাঝিমাল্লা নৌকা পরপারে লইয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অন্ধকার রাত্রি'তে ভাগীরথী তীরের অদূরে এক বৃহৎকায় তিন্তিড়ী বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া জনৈক মুসলমান এস্রাজের সুর বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল। রাত্রি অন্ধকার, তাহার উপরে আলোকের অভাব। দীর্ঘ পথ গো-শকটে চলিয়া এস্রাজের কাণগুলা প্রায় সমস্তই খুলিয়া গিয়াছিল। অদূরে আর এক ব্যক্তি রন্ধন করিতেছিল। তাহার অগ্নির আলোক মাঝে-মাঝে আসিয়া বাদককে অন্ধ করিয়া দিতেছিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল,—এস্রাজের সুর ঠিক হইল না। তখন বাদক বিরক্ত হইয়া পরিচারককে হুকা ভরিতে আদেশ করিল। পরিচারক রন্ধন করিতেছিল, ডেকচি নামাইয়া কলিকা লইয়া তামাকু সাজিতে বসিল। ঠিক সেই সময়ে এক ব্যক্তি তিন্তিড়ীমূল দিয়া যাইতেছিল;সে অন্ধকারে মূলে আঘাত পাইয়া বাদকের উপর পড়িয়া গেল। বাদক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার কর্ণমূলে এক চপেটাঘাত করায়, নবাগত ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "জনাব আলী, গোস্তাকি মাফ হো জায়!" তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাদক লজ্জিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে কোন্ হ্যায়! পরবেজ! বইঠ যা, বইঠ যা।"

আগন্তুক চপেটাঘাত হইতে বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া তিন্তিড়ীমূলে উপবেশন করিল। বাদক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আরে নয়ী তাওয়াইফ কোই আয়ী?"

"হজরৎ, বাঙ্গালে মুলুক তো বিলকুল রেজিস্তান,—হিঁয়া কাঁহাসে খুপসুরৎ তাওয়াইফ পয়দা হোগী?"

"মজ্‌লেস কা ক্যা হাল হোগা?"

"জনাব, ইস দো বাঙ্গালীনে সাহেবজাদেকে মজ্‌লিস ভরপুর কর রখ্‌থি দুসরী আউরৎকী থোড়ী জরুরৎ থী।"

"দেখো, পরবেজ, জঙ্গ মেরে পেশা, ইস দো বাঙ্গালীয়োঁকো আউরৎকো মোকাবিল মৎ সমঝো। দেখো লড়াইকী পেশাসে মেরী বাল পাক গয়ী; লেকিন এইসী হোশদার হিম্মৎ ওর জওয়ান ময়নে থোড়ী দেখী। ইন্ লোগোঁকো পাশ শামসের ও এস্রাজ,.তে সো সেতার বরোবর সমঝো।"

"জনাব, আপনে বাঙ্গালীয়োঁকো বড়ী তারীফ কী।"

"হাক্ হ্যায় ভাই, হাক্।"

"ইস সিয়া সগ্‌কে মুলুকমে ময়নে আভিতক এক ভি মর্দ নেহি দেখা।"

"জব গাজীকো তবলপর আওয়াজ পড়ে গা তব ইস দো বুহাদরনে সাফ মসলন্দ দেখ্‌লায় গা।"

এই সময়ে দূর হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল "খাঁ সাহেব, বাবা সাহেব আছ বাবা?" বাদক বলিয়া উঠিল "তোবা, তোবা।" পরবেজ জিজ্ঞাসা করিল "কোন হ্যায় হজরৎ?" বাদক কহিল "লালবাগকী হারামখোর বণিয়া আ গয়ী।" পুনরায় প্রশ্ন হইল "বলি বাবাসাহেব, আমি দীননাথ বাবা, নবদ্বীপচন্দ্রের পৌত্তুর বাবা। বড় কষ্টে এতদূর এসেছি বাবা।"

"হাঁ, হাঁ, আস আস।"

"জয় জগন্নাথ, রাধেকৃষ্ণ, গোবিন্দ বল। কি জান দাদাঠাকুর, এই আমার কর্তাবাবা অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন।"

"দেখো দীনু, তোমারে কর্তাবাবা বড়ে হারামজাদ থা।"

"রাধেকৃষ্ণ, রাধেকৃষ্ণ, বাবাসাহেব বল কি? কর্তাবাবা নবদ্বীপচন্দ্রের প্রসাদে এখনও করে খাচ্ছি।"

"তোমারে নবদ্বীপ চন্দর কা মাফিক ঠগ্ জুয়াচোর ফেরেববাজ পেশাবর সে জহাঙ্গীর নগর তকলে ময়নে আজ ভি নেহি দেখা। জরুর দোজখ মে গয় হোঙ্গে।"

"জয় রাধেকৃষ্ণ, বেটা বলে কি! দাদাঠাকুর, কর্তাবাবার অনুমতিটা কি জান? যতক্ষণ টাকা আদায় না হয়, ততক্ষণ খাতক দশ ঘা জুতা মারিলেও রা কাড়িবে না।"

"আরে দীনু, ক্যা বোলতা হ্যায়?"

"বোলতা আর কি বাবাসাহেব, যতদিন তোম লোক চলে আয়া, ততদিন বোলতার কামড়ের মত ছটফট করতা হ্যায়। আমি বড় গরীব হ্যায় বাবাসাহেব, আমার টাকা-কড়ি আর কিছু নেহি হ্যায়, সমস্ত তোমাদের পেটের মধ্যে চলে গ্যা।"

"বহুৎ আচ্ছা, বণিয়াকী হাল এইসাই হোনা চাইয়ে।"

"বেটা উচ্ছন্ন যাও। হে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্র, তুমি যদি সত্য হও, বেটার যেন সর্ব্বনাশ হয়। তা যা বল্লে বাবা-সাহেব তা সব ঠিক হ্যায়, তবে টাকাটা—"

"ক্যা, টাকা! রুপেয়া! বদবখৎ বেতমীজ কাফের! আরে কোয়ী হ্যায়!"

দুইজন আহদী তিন্তিড়ী বৃক্ষের পশ্চাতে অশ্বের সেবা-

করিতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিল, এবং কহিল "বন্দে নওয়াজ, হুকুম!" হুকুম হইল "কোড়া লেয়াও।" আহ্দী দীননাথ সাহার দোকানের অনেক আটা ও দাল হজম করিয়াছিল,—সে হুকুম শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া সাহস পাইয়া দীননাথ মুসলমানের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল এবং ক্রন্দনের সুরে বলিয়া উঠিল "যাহা ইচ্ছা কর বাবা, মোদ্দা টাকাটা দিও।" তাহার আচরণ দেখিয়া তাহার সঙ্গী বলিয়া উঠিল, "দীনু, করিস কি,—যবনের পায়ে ধরলি?" দীননাথ এবার রাগিল, সে বিরক্ত হইয়া কহিল, "বামুনের বুদ্ধি কি না! পায়ে ধরিব না ত সুদের হিসাবে কোড়া খাইব? তোমার মতে চলিলে হইয়াছে আর কি।" বলিতে বলিতে দীননাথ কাছার খুঁট হইতে একটা আশরফি বাহির করিয়া বাজাইয়া ফেলিল। সুবর্ণের নিক্কণ শুনিয়া মুসলমানের অধরপ্রান্তে হাসির রেখা দেখা দিল। সে কহিল "দীনু, তু বড়ে লায়েগ ঠগ হ্যায়।"

দীননাথ আশ্বাস পাইয়া বলিয়া উঠিল "সে দয়া করে যা বল বাবা। তোমার পান আতরের খরচ বাবং কিছু নজর এনেছি। খাঁ সাহেব, তুমি আমার ধর্ম্ম বাপ বাবা, আমার টাকাটা উদ্ধার করিয়া দিও।"

সুবর্ণ-মুদ্রাটী যথারীতি বাজাইয়া খাঁ সাহেব প্রসন্ন-বদনে দীর্ঘ শ্মশ্রু মধ্যে ক্ষিপ্র অঙ্গুলী চালনা করিতে-করিতে কহিলেন "আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যায়গা। রুপিয়া ত বড় মুস্কিল কা বাত হ্যায়, লেকিন রোকা মিল যায় গা।" দীননাথের সঙ্গী চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিল। খাঁ সাহেব দ্বিতীয়বার পেশকষ লাভের আশায় দীননাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "আরে, ইয়ে কোন হ্যায়? তোম ক্যা মাঙ্গতা?" দীননাথ অতি বিনীত ভাবে করজোড়ে নিবেদন করিল, "ও আমার অংশীদার বাবাসাহেব, জাতে মুচি, সেইজন্য তফাতে দাঁড়াইয়া আছে।" চক্রবর্ত্তী দীননাথের কথা শুনিয়া অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "তবে রে বেটা, আমি না কি জাতে মুচি!" দীননাথ অতি শান্ত ভাবে তাহাকে কহিল, "রাগ কর কেন দাদাঠাকুর, কাজ উদ্ধার করিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়,—তুমি বামনামী ফলাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া আছ, তাহাতে কি নেড়ে বশ হয়। দেখ বাবা সাহেব, ও বদ্ধ পাগল, কাহাকে কি বলে তাহার স্থিরতা নাই। দেখ দাদাঠাকুর, সঙের মত দাঁড়াইয়া না থাকিয়া মোহরটা বাহির করিয়া ফেল না। দিতেই যখন হইবে, তখন আর মায়া করিয়া লাভ কি?"

চক্রবর্ত্তী আশরফিটা বাহির করিয়া দীননাথের হস্তে দিল এবং দীননাথ তাহা খাঁ সাহেবের পদপ্রান্তে রাখিল। খাঁ সাহেব অধিকতর প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "দীনু, কাল আও, রোকা মিল যায় গা।" দীননাথ অপ্রতিভ হইবার পাত্র নহে, সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল "এবারে রোকা ছাড়া আরও কিছু লাগেগা বাবা।"

"আওর ক্যা মাঙ্গতা?"

"রোকায় সাহজাদার একটা সহি-মোহর চাই বাবা।"

"আরে দীনু, তুমনে তোমারা কওাবাবাসে ভি বড়া ঠগ হ্যায়। সহি মোহর বড়া মুস্কিলকা বাৎ হ্যায়।"

"তুমি একবার দাড়ী নাড়িলেই সমস্ত হয় বাবা। কত খরচ লাগিবে?"

খাঁ সাহেব বিব্রত হইয়া সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিলেন; সঙ্গী পরবেজ কহিল "এক অসীম রায়সে ইয়ে কাম হো সকতা।"

খাঁ সাহেব সম্মতিসূচক শিরশ্চালনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কীমৎ?"

"জনাব, নয়া কারবার।"

"দীনু, কাল আস। দশ বিশ আসলী আশরফি লাও।" দীননাথ অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল।

ক্রমশঃ

চিত্র ও চরিত্র

ভস্মে হীরক

[শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম-এ]

(১)

মানমঞ্জরী একজন চব্-কীর্ত্তনওয়ালী।

সেবার আদিমহট্টে এসে প্রায় এক মাস নানা স্থানে কীর্ত্তন গাইল,—নামও হ'লো।

তার বয়স বোধ হয় ৩৬।৩৭ বছর,—বা আরো একটু বেশী; কিন্তু তাকে দেখাতো যেন ২৫।২৬ বছরের মত, অথবা আরো একটু কম। চেহারাটা একটু মোটা-সোটা, ভারভাত্তিক গোছ; রংটা উজ্জল গৌরবর্ণ, মুখখানা বোধ হয় ভালই।

মেয়েরা কেউ-কেউ ব'লতেন,—"কেত্তনওয়ালীর গান যেমনি হোক, ওর চেহারাটা ভাল,—তাই—"

এর পরে আর চেহারার বর্ণনা অনাবশ্যক।

(২)

আদিমহট্ট বৈষ্ণব-প্রধান স্থান।

কীর্ত্তনওয়ালীর সঙ্গীত যেমনি হোক,—অনেকেরই তা' ভাল লাগ্লো।—আর বাস্তবিক কীর্ত্তনটাও সে ভালই গাইতো; কিন্তু চেহারাটার সৌন্দর্য্য বোধ হয় কীর্ত্তনের মাধুর্য্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে কেমন একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা জুড়ে' দিয়ে 'শ্রোতা'কে 'দর্শক'-শ্রেণীর মধ্যে নিয়ে দাঁড় করাতো'। কীর্ত্তনওয়ালীর দুর্ভাগ্য!

এই 'দুর্ভাগ্যের' মধ্যে একটা সৌভাগ্যও ছিল। যেখানে সময়োচিত পরিচ্ছদ পরে' কীর্ত্তনওয়ালী গান ক'রতো, 'আসর' তাকে আর ক'রে নিতে হ'তো না,—'আসর' যেন তার জন্য 'জমানই' থাক্তো। বৈষ্ণব-প্রধান স্থান, 'ক্ষেত্র' ভাল থাক্লে 'ফসল' ভালো হবার কত সুবিধে!

কীর্ত্তনওয়ালী এসে গান ধ'রতেই, কতজন কাঁদ্তে সুরু করতেন।

(৩)

আবার 'ক্ষেত্র' ভাল থাক্লেই হয় না;—তাতে যত্ন না নিলে 'আগাছা'ও জন্মায়; যদি 'আগাছা' একবার জন্মালো, —তখন কিন্তু প্রভাত-শিশির তার উপর,—আর 'সুশস্যে'র উপর, নিরপেক্ষ এবং সমভাবেই প'ড়ে থাকে।

নবীন জমীদার বঙ্কুবিলাস ছিলেন আদিমহট্টে একটা 'আগাছা'। তাঁর বয়স,—কিছুই নে ব'ল্লেই হয়; এই আর কত?—বোধ হয় ১৭।১৮ বৎসর হবে; কিন্তু এরি মধ্যে তিনি একেবারে—; থাক্ সে কথা। তাঁর দোষ ক'-টা ব'লব?—তাই একটাও এখন বল্লুম্ না।

বঙ্কুবিলাস বিবাহিত; স্ত্রীর বয়স ১৪।১৫ বছর,—খাসা মেয়ে টুকুন,—আহা!

(৪)

সেদিনকার 'আসরে' যত লোক মানমঞ্জরীর কীর্ত্তনের সুরে কাঁদ্লো, তার মধ্যে নবীন জমীদার বঙ্কুবাবু সবাইএর বাড়া।

লোকে ভাবলে, বঙ্কুবাবুর এবারে 'হরিভক্তির পালা!'

* * * * * * * * *

কীর্ত্তনওয়ালী গাইল,—

"সই, কে বলে পীরিতি ভাল!
সোণায় জড়িয়া হিয়ায় ধরিতে
দুখ উপজিলা কিবা।
* * * *
পরশ-পাথর বড়ই শীতল,—
কহয়ে সকল লোকে,
মুঞি অভাগিনী!— লাগিল আগুণি,
—পাইনু এতেক দুখে!" [চণ্ডীদাস]

বঙ্কুবাবু কেঁদে ফেল্লেন।

কীর্ত্তনওয়ালী 'আসরের' মধ্যে ঘুরে'-ঘুরে' পদাবলী গাইতে লাগ্লো,—বঙ্কু' রেশমী রুমালের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত ক'রে, জনতা ভেদ করে ঘুরে'-ঘুরে', বারবার চোখ্ পুঁছলেন।

মানমঞ্জরী আবার 'আসরের' মধ্য-স্থলে দাঁড়িয়ে বেহালার মধুর তানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইল,—

"সখি হে, কেমন পীরিতি লেহা!
আনের সহিত করিয়া পীরিতি,—
গরলে ভরল দেহা!" [চণ্ডীদাস]

আবার,—

"চণ্ডীদাস কহে বাণী,— শুন রাধা বিনোদিনি,
[মঞ্জরী কহয়ে বাণী]
—মিছে কেন ডুবেছিলে জলে?
বুঝিতে নারিলে মায়া,— জলে ছিল অঙ্গ-ছায়া!
— শ্যাম ছিল কদম্বের ডালে!"
[চণ্ডীদাস]

বন্ধু এ সব কথা বুঝতে পারলেন কি না, তা' টের পাওয়া গেল না; কিন্তু কাঁদছিলেন।

কীর্ত্তনওয়ালী দেখ্লে মেয়েদের বস্‌বার জায়গায় ছোট্টো একটী টুকটুকে 'বউ' বন্ধুর দিকে তাকিয়ে কেঁদে আকুল হ'চ্ছে;—বন্ধুর দৃষ্টি অন্যদিকে।

কীর্ত্তনওয়ালীরাও বুঝি 'মানুষ'! মানমঞ্জরীর বুকের পাঁজ্‌রা তখন একটা অজ্ঞাত আঘাতে ভেঙ্গে গুঁড়া হ'য়ে যাচ্ছিল!

(৫)

পালা শেষের দিকে কীর্ত্তনওয়ালী গাইল,—

"মাধব! হাম্ পরিণাম নিরাশা!—
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়,—
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা!

* * * * * *

কত চতুরানন নিতি নিতি যাওত
ন-তুয়া আদি-অবসানা!
তোহে জনমি, পুন তোহে সমাওত,—
সাগর-লহরী সমানা!" [বিদ্যাপতি]

তার পর আবার,—

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়!
দেই তুলসী-তিল দেহ সমর পিনু,—
দয়া জানি,—ছোড়বি মোয়!
গণইতে দোষ,— গুণ-লেশ ন পাওবি,—
যব্ তুঁহু করবি বিচার!
—তুঁহু 'জগন্নাথ',— জগতে কহায়সি,—
'জগ'-বাহির নহি মুঞি ছার!" [বিদ্যাপতি]

বন্ধু এর কিছুই বুঝ্লেন না,—তবু কাঁদ্‌লেন।

গাইবার সময় কীর্ত্তনওয়ালীও কেঁদে ফেলেছিল।

সেই ছোট্টো মেয়েটা হাত জোড় ক'রে ব'সে কাঁদ্‌ছিল; তার চক্ষু-ছটা তখন মুদ্রিত। বিগলিত-অশ্রু তার সুন্দর মুখখানিকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।

---

(৬)

কীর্ত্তনওয়ালীর 'বাসা' ছিল 'লামার পাহাড়ে'।

এক দিন বেলা তিনটের সময়ে বন্ধুবাবু সদল-বলে গিয়ে সেখানে উপস্থিত।

জমীদার বন্ধুবাবু কি একটা প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন।—সে কথায় কাজ নেই।

কীর্ত্তনওয়ালী বাড়ীর ভেতর থেকে চাকরকে ব'ললে,—"বাবুকে ডাক।"

* * * * * *

বন্ধুবাবু কম্পিত-পদে সেই গৃহে প্রবেশ ক'রতেই শুন্‌তে পেলেন, কীর্ত্তনওয়ালীর কণ্ঠস্বর,—

"দেই তুলসী তিল,—
"গণইতে দোষ,—
তুঁহু জগন্নাথ,—"

ঘরে ঢুকে' বন্ধু দেখ্লেন, কীর্ত্তনওয়ালী সেদিন শুধু একখানা 'নামাবলী' গায়ে দিয়ে, হাতে-গড়ানো একটী তুলসী-বেদীর কাছে ব'সে, হাত যোড় ক'রে গান গাইছে!

তখন মানমঞ্জরী গাচ্ছিল,—

"ভণয়ে বিদ্যাপতি,— অতিশয় কাতর,—
[রো-য়ে মানমঞ্জরী]
তরাইতে ইহ ভবসিন্ধু,
—তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন,—
তিল-এক দেহ দীনবন্ধু!"
[বিদ্যাপতি]

ঝর্-ঝর্ ক'রে কীর্ত্তনওয়ালীর ছুটো চোখ্ দিয়ে জল পড়্‌ছিলো!

(৭)

বন্ধু এলে, কীর্ত্তনওয়ালী উঠে এসে তার হাত ধ'রে

ব'লুলে,—"এস, বাবা,—এসো। তা' আমার বৌ-মাকে সঙ্গে আন্‌লে না? আমি আরও ভাবছিলুম্‌, তোমাদের দু-জনকে একবারটি দেখে, তবে এ দেশ থেকে বিদেয় হ'বো।"

বন্ধুকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে একটা চৌকীতে বসালে।

তখন বন্ধুবাবুর মাথা ছম্‌-ছম্‌ ক'রছে; ব'ললেন,—"এঁ্যা,—আমি,—আমি,—এই ব'লছিলেম্‌—"

ধীর, সহজ, প্রশান্ত স্বরে কীর্ত্তনওয়ালী ব'ললে,—"তা'—বাবা,—তা' আমি জানি: তোমার লজ্জা কি, বাবা? অমন কতজনের আরো হ'য়েছে।"

"আপনি আমাকে অমন ক'রে ডাকলেন,—"

"তা, বেশ তো বাবা; কেউ তো তোমায় অমন ক'রে—; আচ্ছা, একটা জিনিষ দেখাচ্ছি, বাবা, ব'সো।"

(৮)

হাত থেকে মানমঞ্জরী একটা সোণায় বসানো হীরের আংটা খুলে' নিলে। হাতে খানিকটে নেকড়া জড়ালে।

তার পর সমস্ত নেকড়াটাকে কেরোসিন তেলে ডুবিয়ে নিয়ে তা'তে আগুন ধরালে।

নেকড়াটুকু পুড়ে' ছাই হ'য়ে গেল।

হীরের আংটাটে আর একটু সেই পোড়া নেকড়ার ছাই ছোট্টো একটু কাগজে মোড়ক ক'রে কীর্ত্তনওয়ালী সেই আংটী আর ছাই বন্ধুর হাতে দিয়ে ব'ললে,—

"তোমার বয়সী আমার এক ছেলে ছিল,—তার নাম ছিল দীনেশ। সে আজ নেই! তুমি, বাবা, আমার এই 'দান'টুকু নাও। তোমায় নিতেই হবে; আমার বৌমাকে দেবে। আর ব'লো, 'আলোকার' তোমাকে, আর তুমি 'আমাকে যা' দেখেছিলে তাকে', আমি আজ 'ছাই' ক'রে দিইছি।—এই হীরে আর সোণাটুকু তার মধ্যে ছিল; তুমি এ নিয়ে যাও,—যদিও 'ছাই'এর আড়ালে তোমার ঘরে যে "সোণা আর হীরে" আছে, তার কাছে এ নিতান্তই 'ছাই'!—যাও বাবা, আর কেঁদো না!"

তখন কান্নায় বন্ধুর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসছিল;—"মা, —মা"—ছাড়া কিছুই সে ব'লতে পারলে না!

কান্নায় কীর্ত্তনওয়ালীর আর কথা সর্‌ছিল না। শুধু ব'ললে,—"আর কাঁদিসনে বাবা,—তোর মা থাকলে বুঝি তু—"

* * * * *

পরদিন বন্ধু আর তার স্ত্রী সুরমা এসে "মা,—মা" ক'রে 'সোনার পাহাড়ের' সেই বাড়ীটেতে খুঁজতে লাগ্‌লো।

কীর্ত্তনওয়ালী চ'লে গিয়েছে!

ঘরের মেঝেয় খানিকটে ছাই তখনো প'ড়ে ছিল।

গ্রীষ্মের ভেট

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

মর্ত্তমান রম্ভা এনো 'বঙ্কিমের' উপন্যাস
দেবে ভোগে দুই দিকে লাগে,
হিঙ্গুল 'কম্‌লা' এনো 'রবীন্দ্রের' কাব্যসুধা
অম্ল মিঠা যার যথা ভাগে।
এনো যেন 'পানিফল' গ্রীষ্মে বড় স্নিগ্ধকর
'অমৃতের' নক্‌সা মনোহর,
আনিয়ো সরল 'ইক্ষু' 'দ্বিজেন্দ্রের' কাব্যগীতি
মণ্ডা আর ডাণ্ডা একস্তর।
এনো কালো খরমুজা গন্ধ তার বড় মিঠা
'শরতের' উপন্যাস সম,
এনো কাল তরমুজ ভিতর গভীর লাল
'দেবেন্দ্রের' কাব্য অনুপম।
এনো কচি-কচি আম বাউল ক্ষেপার গীতি
পেতে প্রাণ আন্‌চান্‌ করে,
এনো নেয়াপাতি ডাব 'রামপ্রসাদের' গান
বুক দেয় সুধারসে ভরে।
বাণীর কলসী ভরি এনো সুরধুনী নীর,
সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন,
পরাণ জুড়ানো আহা, বৈষ্ণবের পদাবলী
'তুলসীদাসের' রামায়ণ।

সোণা ঠাকুর

[শ্রীযামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত]

(ইনি বরিশাল বাজারখোলার ৺কালীবাড়ীর পুরোহিত ছিলেন। ইনি একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন বলিয়া, বঙ্গের বিখ্যাত সুসন্তান, বরিশালের নেতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ইঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন এবং ইঁহার জীবনের অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইনি যৌবনকালে বরিশাল অঞ্চলের বিলাসী ধনী যুবকগণের প্রধান বয়স্য ছিলেন। যে ঘটনায় ইঁহার জীবন-গতি ফিরিয়া যায়, এই কবিতায় তাহাই বিবৃত হইয়াছে। কীর্ত্তনখোলা নদী বরিশাল নগরীর পূর্ব্ব অংশ দিয়া প্রবাহিত।)

মলয়ার মৃদু- মধুর পরশে
'কীর্ত্তনখোলা'-বুকে,
ফেনায়ে ফেনায়ে উঠিছে পড়িছে,
লহরী খেলিছে সুখে।
সাঁঝের তারার ছোট আলোটুক
পথহারা জোছনায়,
রূপার ওড়না উড়াইয়ে মেঘ
ছুটেছে আকাশ-গায়।
ক্ষত-হৃদয়ের চন্দন বহি
ধূমপোত এল কত!
কত চলি গেল ফুঁকারিয়ে বাঁশী
জাগায়ে বেদনা শত।
তটিনীর তীরে মুগ্ধা নগরী
দীপের নয়ন মেলে—
দেখিছে চাহিয়া তরল সলিলে
ফুল্ল লহর খেলে।
সুন্দর অতি বজরা চলেছে
উজান বাহিয়ে জলে,—
বাতায়ন-পথে কাঁপি দীপশিখা
জলে যেন পড়ে গ'লে।

রঙীন পতাকা দখিণ পবনে
এলায়ে পড়েছে ঝুঁকে,
মূর্চ্ছিত গানে বিভল পবনে
আঁকড়িছে যেন বুকে।
গাহে সনাতন উঠিতেছে গান
নারীর কণ্ঠে মিশি,
থমকি দাঁড়ায়ে মলয়া শুনিছে
ভ'রে দিয়ে দশ দিশি।
মুহূর্ত তরে থমকি দাঁড়াল
তরল লহরী-খেলা;
থামিল নারীর শঙ্খ-পূরিত
জীবন দুপুর বেলা।
এত কাল ধ'রি, আবেগ বাসনা
সেই পথ ঘিরি ঘিরি
খেলিত ছুটিত, আজ যেন কেন
এল তথা হ'তে ফিরি।
শান্ত হইল, চোখের চমক
কাঁকণ শিথিল হাতে;
চরণে নূপুর হইল অচল
বাজে না বীণার সাথে।
দলিল না আর নর্ত্তিত পদ
সুকোমল গালিচায়,
বিলাস, শয়ন, দলে দিয়ে মন
উর্দ্ধে ছুটিয়া ধায়।
পতিতা কাটিলা সোণার শিকল
ধনীর সমুখে হাসি,
ইঙ্গিতে ফুটে "দিয়েছি ছলনা
পাওনি পীরিতিরাশি।"
গায়ক-কণ্ঠে, পতিতা আবেগে
তুলে দিল ভুজলতা,
সনাতন শোনে পরশ-মাঝারে
ধ্বনিছে মরম কথা,—

"কণ্ঠের তব সুর ঢালি দাও
এ দীন কণ্ঠে মোর,
শ্যামা-গান গাব আপনা হারায়ে
দিবস রজনী ভোর।
সে গানে জাগিবে রুদ্র শকতি
বাজায়ে হৃদয়-তার,
কামনা শতের মুণ্ড কাটিয়া
করিব গলার হার।
কল্যাণ যত শিব রূপে আসি
চরণে পড়িবে ঢলে,
জননীর স্নেহ উঠিবে উথলি,
এ পরাণ যাবে গ'লে।
ঘুচাইতে পাপ, ধরার কালিমা
নিজ দেহে তু'লে নিব,
মান অভিমান রঙীন বসন,
একেবারে খুলে দিব।
দেবতার মাঝে সেবিকা তাঁহার
দিবে আপনারে দান।"
সনাতন দেখে, দীপ্ত চাহনি
ভাব নীরে করে স্নান।

ভাবে সনাতন, আসর-জাকাঁন
দেবতার ফাঁকা গান,
শুষ্ক নদীতে বহাইল যদি
ভক্তি-নদীর বান,
সুরের সহিত পরাণ বাঁধিয়া
ঢালিলে দেবতা পায়,
জীবন কুটীর উঠিবে উজলি
ভ'রে যাবে জোছনায়।
বন্ধন কাটি, উঠিল গায়ক
ঝাঁপ দিলা নদী জলে,
তরঙ্গ তারে, লইয়া আদরে
উল্লাসে কলকলে।
মন্দিরে পশি, শ্যামা-পাদ মূলে
পাতি নিলা যোগাসন।
আর দিন ধনী, নৌকা বিহারে
বলে "চল সনাতন!"
সনাতন কহে "সে যে পুরাতন,
পেয়েছি নূতন খেলা,
চির বসন্ত বিরাজে তথায়,
চির আনন্দ মেলা।"

পশ্চিম-তরঙ্গ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

১। সেলাইয়ের কল

হাতের সেলাই আজ-কাল খুব কমে এসেছে। এখন প্রায় সমস্তই কলে সেলাই হচ্ছে। ঘরে-ঘরে সেলাইয়ের কল দেখতে পাওয়া যায়,—হয় হাতে চালাবার, নয় পায়ে চালাবার। আমেরিকায় এই হাতে চালাবার এমন একটি চমৎকার ছোট্ট সেলাইয়ের-কল বেরিয়েছে যে, তাতে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা পর্য্যন্ত খুব সহজে সেলাইয়ের কাজ করতে পারে; অথচ, তাদের সেই কাজ খারাপ হওয়া দূরে থাক্‌, বরং বেশ পরিপাটিই হবে। এই কলটীতে সেলাইয়ের কাজ এত শীগ্‌গির আর এমন সুন্দর হয় যে, ছুঁচ-সুতো নিয়ে বসে দিবারাত্রি পরিশ্রম করে একটু-একটু করে সেলাই করলেও তত ভাল হয় না। লতাপাতা কাটা, ফুল তোলা, নক্সার কাজ এই কলে খুব সহজে সেলাই করা যায়। কলটী অনেকটা তাঁতি-কলের মত,—চালাতে কোন কষ্ট হয় না। এতে একটা 'বিঁধ করা' যন্ত্র আছে; যেখানে সেলাই করবার দরকার সেইখানে টিপে ধরলেই

আপনি সেলাই হয়ে যায়। কলটি খুব হাল্কা, ওজনে এক-পোয়ারও কম; আর মাপ আট ইঞ্চির বেশী বড় নয়।

(Scientific American)

২। খবরের কাগজ-ওয়ালা কল

রাস্তার মোড়ে মোড়ে খবরের কাগজ ওয়ালাদের সকলেই দেখেছেন। আমেরিকাতেও এই রকম খবরের কাগজওয়ালা আছে। তা ছাড়া অলিতে গলিতে খবরের কাগজ বিক্রী করবার 'কল' বসানো আছে। সেই কলে দু'টো পয়সা ফেলে দিলেই একখানা খবরের কাগজ পাওয়া যায়। সেদিনের প্রধান-প্রধান খবরগুলো বড়-বড় অক্ষরে কলের গায়ে কাঁচ-আঁটা ফ্রেমের মধ্যে একখানা কাগজে লেখা থাকে। আমাদের এখানে যেমন একখানা কাগজ সমস্ত দিনের ভেতর যখন হোক্ কেবল একবার মাত্র বেরোয়, সেখানে কিন্তু একখানা কাগজই নূতন নূতন খবর নিয়ে অনেকবার বেরোয়। কাগজ কেনবার সময় কলের গায়ের সেই কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে দেখে নিতে হয়, খবর-গুলো নতুন কি না, আর সেটা কাগজের কোন্ সংস্করণ,—প্রভাত, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, অপরাহ্ণ, না সন্ধ্যার? প্রতিবার কাগজ বেরুলেই খবরের কাগজের আপিস থেকে মটর গাড়ী করে লোক গিয়ে প্রত্যেক কলে কাগজ ভরে রেখে আসে।

(Scientific American)

৩। টেলিফোঁর চিঠি

অনেক সময়ে কোথাও টেলিফোঁ করে শোনা যায়, যাকে খুঁজছি, সে বাড়ী নেই; খবর আসে—"No reply!" তখন বড় মুস্কিলে পড়তে হয়। একটা হয় ত দরকারী কথা বলতে হবে;—আর একবার অন্য সময়ে টেলিফোঁতে তাকে ডাকবার আমার হয় ত আর ফুরসুৎই হবে না। তখন কি করা যায়? তার কাছে চিঠি লিখে লোক পাঠানো ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সে যদি আবার সহরের বাইরে থাকে—এই ধর যেমন বর্দ্ধমানে কি রাণীগঞ্জে,—তাহ'লে আর তার কাছে তখনি লোক পাঠানোও চলে না। সুতরাং দরকারী কথাটা তাকে সে দিন তখনি না জানাতে পারায়, হয় ত অনেক সময়ে বিস্তর ক্ষতিও হয়ে যায়। এই সব অসুবিধে দূর করবার জন্যে ক্যালিফোর্ণিয়ার একজন লোক একটা চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তিনি টেলিফোঁর সঙ্গে টেলিগ্রাফ যোগ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ আমি একজনকে টেলিফোঁ করে যদি তাকে না পাই, তাহলে আমার যা বক্তব্য, আমি টেলিফোঁ আপিসে বলে যাব, আর তারা সেটা সেই লোককে টেলিগ্রাফে খবর দেবে; কারণ টেলিগ্রাফের সাহায্যে, সে না থাকলেও, খবরটা সাঙ্কেতিক অক্ষরে—তার টেলিফোঁর সঙ্গে যে টেলিগ্রাফ যন্ত্র যোগ করা আছে,—তারই মধ্যের একটি সরু ফিতের মত কাগজের ওপর আপনি লেখা হয়ে যাবে। সুতরাং সে লোক যখনই ফিরে আসুক, এসেই আমার খবরটা জানতে পারবে। অতএব আমার কাজেরও আর কোনও ক্ষতি হবে না।

(Scientific American)

৪। আল্‌গা বাড়ী

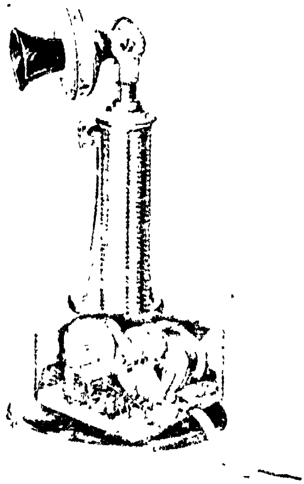
ভাড়া-বাড়ীর অভাবে মধ্যবিত্ত লোকদের থাক্‌বার যে আজকাল ভয়ানক অসুবিধা হয়েছে, সেটা কেবল আমাদের দেশেই নয়,—সাবেক আমেরিকায় অনেকদিন থেকেই এই অভাবের অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। তবে তারা আমাদের মত নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকবার পাত্র নয়। এই অভাব দূর করবার জন্যে তারা নানা উপায় বার কচ্ছে। আমেরিকা "আবর্ত্তনশীল কক্ষ" আবিষ্কার করে অতি সহজে একখানি ঘরকেই আবশ্যকমত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বসবার, খাবার, শোবার, বস্‌বার ঘর করে নেবার উপায় উদ্ভাবন করেছে (চৈত্রমাসের 'ভারতবর্ষ' দেখুন)। লণ্ডনে গৃহস্থ ভদ্রলোকের থাকবার মত বাড়ীর এমন অভাব হয়েছে যে, মিউনি-সিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষ—সহরের স্থানে-স্থানে ব্যবহারের জন্য যে সব উদ্যান বা খোলা মাঠ আছে,—সেখানে তাদের থাক্‌বার মত অস্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এই বাড়ীগুলি সব কাঠের তৈরি,—যখন যেখানে ইচ্ছে তুলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এর মধ্যে লোকে বেশ আরামে বসবাস করতে পারে,—একটুও কষ্ট বা অসুবিধা হয় না। এগুলো অনেকটা পশ্চিমের 'বাঙ্‌লো' ধরণে তৈরি; একটা পরিবারের বাস করবার জন্যে যে কটি ঘর বিশেষ দরকার, এই কাঠের আল্‌গা বাড়ীগুলিতে তার সমস্তই বন্দোবস্ত করা থাকে। ঘরগুলিও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সব ঘরেই দরকারী আস্‌বাবপত্র সমস্ত সাজানো থাকে।

(Scientific American)



[illegible]





[illegible]

৫। রাস্তার নাম

রাতে অন্ধকার ট্রাম থেকে কিম্বা গাড়ী থেকে রাস্তার নাম ভাল পড়া যায় না দেখে, আমেরিকা এক নতুন উপায় বার করেছে। একটা মোটা চৌকো লোহার ফ্রেমের চারদিকে মোটা মোটা লাল কাচ লাগিয়ে, তার উপর বড় বড় সাদা হরফে রাস্তার নাম লিখে গলির মোড়ে মোড়ে ইট দিয়ে গেঁথে বসিয়ে দিচ্ছে। এ লোহার ফ্রেমের মধ্যে 'ইলেক্‌ট্রিক' আলো লাগানো আছে। রাতে সেগুলো জেলে দিলে প্রায় ৬০ হাত তফাৎ থেকে রাস্তার নাম বেশ স্পষ্ট পড়া যায়। এই কাচ আঁটা লোহার ফ্রেমগুলি রাস্তার ধারে দেওয়ালের গায়ে কিম্বা থামের মাথায় আঁটা থাকে না, রাস্তার উপরেই বসান থাকে। রাস্তা একটু খুঁড়ে ইট দিয়ে গেঁথে বসিয়ে দেওয়া হয়। চৌকো ফ্রেমটা মোট



আলগা বাড়ী



[illegible]



[illegible]

১১ ইঞ্চি চওড়া, আর রাস্তার উপর সেটা সবে সাড়ে চার ইঞ্চি মাত্র উঁচু হয়ে থাকে।

(Scientific American)

৬। ফল কুড়ুনী

ক্যালিফোর্নিয়ায় বড় বড় ফলের বাগান আছে। ফল-ব্যবসায়ীরা এই সব বাগানের ফল সংগ্রহ ক'রে দেশ-বিদেশে রপ্তানি করে। অনেক গাছ থেকে বিস্তর ফল মাটিতে খসে প'ড়ে গাছের তলায় ছড়িয়ে থাকে। এই সব ফল সংগ্রহ করবার জন্যে যখন হেট হোয়ে একটী-একটী করে কুড়িয়ে কুড়িয়ে তুলতে হয়, তখন যারা ফল কুড়োয়, তাদের ভারি কষ্ট হয়। অনেকক্ষণ হেট হোয়ে থাকতে হয় ব'লে, তাদের কোমর ব্যথা করে; পিঠে খিল ধরে যায়। জে, এফ, ফ্রাঙ্ক্ নামে একজন ক্যালিফোর্নিয়াবাসী সম্প্রতি একটী "ফল কুড়ুনী" যন্ত্র বার করে তাঁর জাতভায়েদের কষ্ট নিবারণ করেছেন। এই 'ফল-কুড়ুনী' নিয়ে তারা এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেড়াতে-বেড়াতে ফল কুড়োতে



[illegible]

পারে। যন্ত্রটা বিশেষ কিছু শক্ত নয়; একটা লম্বা হাতোলের মুখে একটা চুঙির মত খোল লাগানো আছে। এই খোলটার তলায় স্প্রীংয়ের একটা ঢাকনা আছে। ফলের উপর চুঙিটা ঠেকিয়ে একটু চাপ দিলেই, তলা দিয়ে স্প্রীংয়ের ঢাকনা ঠেলে ফলটা খোলের ভিতর ঢুকে পড়ে।

(Scientific American)

৭। গরম পোষাক

যারা উড়া জাহাজ চালায়, তাদের গরম পোষাক পরতে হয়, কারণ আকাশের উপরকার বাতাস ভয়ানক ঠাণ্ডা। তারা যত উঁচুতে ওঠে, ততই তাদের হাত-পা হিম হ'য়ে আসে। এই জন্যে তাদের এমন পোষাক প'রে উঠতে হয়, যাতে শরীরটি বেশ গরম থাকে—হাত পাগুলো ঠাণ্ডায় না জমে যায়। তারা যে পোষাক পরে, সে শুধু পশমী কাপড়ের নয়। আকাশের উপরটায় এত ঠাণ্ডা যে,





ইলেকট্রিক মোজা ও দস্তানা

পশমী কাপড় পরলেই শীত ভাঙে না। শরীর গরম রাখবার জন্যে তারা ইলেকট্রিকের আঁচে তাতানো এক রকম পোষাক ব্যবহার করে। এই পোষাকটি লোমশুদ্ধ চামড়ায় তৈরি, খুব মোটা, ভেতরে অস্তর দেওয়া আছে, চারদিকে ইলেক্‌ট্রিকের তার আঁটা, মাঝে মাঝে 'সুইচ' লাগানো আছে। এই 'সুইচ' টিপে ইচ্ছেমত পোষাকের উত্তাপ কম বেশি করা যায়। এদের হাতের দস্তানায় আর পায়ের মোজাতেও ইলেকট্রিক তার লাগানো থাকে। উড়ো জাহাজের ভিতরই একটা ইলেক্‌ট্রিক উৎপাদন করবার ছোট ইঞ্জিন থাকে। সে ইঞ্জিনটি আবার বায়ু-বেগের সাহায্য নিয়ে চলে। পোষাক-সংলগ্ন ইলেক্‌ট্রিকের তার এই ইঞ্জিনের সঙ্গে যোগ করে দিলেই, সমস্ত পোষাকটি ইলেক্‌-ট্রিকের আঁচে বেশ তেতে ওঠে। তখন খুব উঁচুতে উঠলেও ঠাণ্ডায় আর শরীর হিম হ'য়ে যাবার ভয় থাকে না। হাতে পায়েও ইলেকট্রিক দস্তানা আর মোজা পরা থাকে ব'লে, হাত পাগুলোও বেশ গরম থাকে, হিমে, শীতে অসাড় ক'রে ফেলতে পারে না।

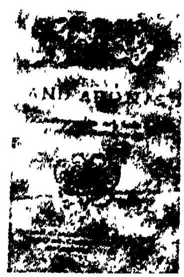
(Literary Digest)

৮। পুরানো বই

বিলেতে আর আমেরিকায় অনেক বড়লোক আছেন, যাদের ভাল-ভাল পুরোনো বই, যা নাকি বাজারে আর কিনতে পাওয়া যায় না, সেই সব সংগ্রহ করে রাখবার ভয়ানক ঝোঁক আছে। এই সখের জন্যে তাঁরা অগাধ টাকা খরচ করতে কাতর হ'ন না। সম্প্রতি আমেরিকার মিঃ হান্টিংটন প্রায় ১০০০০০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে খান







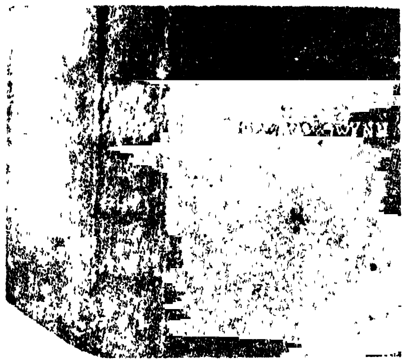
কয়েক পুরোনো বই সংগ্রহ করেছেন। যে তিনখানি বইয়ের জন্যে তাঁকে সব চেয়ে বেশি দাম দিতে হয়েছে, তার মধ্যে দু'খানি হচ্ছে সেক্সপীয়রের—"The Passionate Pilgrim" আর "Venus and Adonis."-এর প্রথম সংস্করণ; আর তৃতীয় খানি হচ্ছে I. D. & C. M. লিখিত "Epigrammes and Elegies." নামক বইয়ের একখানি নির্দ্দেশিত সংখ্যা। "Passionate Pilgrims" বইখানির জন্যে তাঁকে ত'লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দিতে হয়েছে, আর "Venus and Adonis"এর জন্যে প্রায় দু'লক্ষ ষাট হাজার টাকা। "Passionate Pilgrims" বইখানি কিন্তু ছোট একখানি পকেট-বইয়ের মত—মোট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা আর



তিন ইঞ্চি চওড়া,—তারই দাম দিতে হ'য়েছে দু'লাখ ছাব্বিশ হাজার পাঁচশত টাকা! সার মণ্টেগু বারলো বিলাতের পার্লামেণ্ট মহাসভার একজন সভ্য। তাঁর লাইব্রেরীর একটী ছোট শেল্‌ফের খানকয়েক বই সেদিন লণ্ডনের নিলামে ১৬৫৫৬৪০ টাকায় বিক্রী হ'য়েছে! তার মধ্যে



একখানি বইয়ের দামই তিনি প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার উপর পেয়েছেন। আমেরিকায় যে দিন হো-লাইব্রেরী (Hoe-Library) নিলামে—বিক্রী হয় সে দিন একখানি প্রাচীন বাইবেল একলাখ পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রী হয়েছে। পৃথিবীর আর কোথাও কখনও এ পর্য্যন্ত একখানি ধর্ম্ম পুস্তক এত দামে বিক্রী হ'তে কেউ শোনেনি! আর একখানি, "সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী"—১৬১৯ খৃঃ অব্দে



প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় বিক্রী হ'য়েছে। এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে মহাকবি সেক্সপীয়রের নয়খানি নাটক প্রথম একত্র মুদ্রিত হয়েছিল। এই পুস্তকের মালিক ছিলেন মিঃ এডওয়ার্ড গাইন।

(Literary Digest)

৯। দানসাগর

মৃত মহাত্মা 'এণ্ড্রু কার্ণেগী' যে দিন জগতের ও স্বদেশের কল্যাণের জন্য দেড়শত কোটী টাকা দান করে যান, সে দিন বিশ্বের লোকে তাঁর জয়গান করেছিল। কার্ণেগীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজ আবার তাঁর একজন স্বদেশবাসী জগতের হিতার্থে একশত পঁচাত্তর কোটী টাকা দান করেছেন। তিনি আমেরিকার বিশ্ববিশ্রুত ধনী মিঃ 'রকফেলার'। 'রকফেলার' সামান্য মজুর থেকে আজ ক্রোড়পতি হয়েছেন। আজ তাঁর দানসাগরের তালিকা দেখে জগত বিস্মিত হয়ে গেছে! শিক্ষার জন্যে তিনি ৩৬,৪০০০০০০০ টাকা, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে ২৮,৭০০০০০০ টাকা, চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১১,৯০০০০০০৲ টাকা, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে ৯৫০০০০০০৲ টাকা, রকফেলার সমিতির জন্যে ৫৫০০০০০০৲ টাকা, ধর্ম্ম প্রচারের জন্যে ২,৮০০০০০০৲ টাকা, খ্রীষ্টিয় যুবক সমিতির (Y.M.C.A) জন্যে ১,৪০০০০০০৲ টাকা, কীভল্যাণ্ড সহরের জন্য ১,৫০০০০০ টাকা, বালক সংস্কার সমিতির জন্যে ১৫০০০০০০ টাকা, আর অন্যান্য অসংখ্য খুচরা দান ৭৭,৭০০০০০০৲ লক্ষ টাকা—সবশুদ্ধ একশত পঁচাত্তর কোটী টাকা দান করেছেন। (Literary Digest)

বিলাতে খেলাফত প্রতিনিধিগণ



রঙ্গ-চিত্র

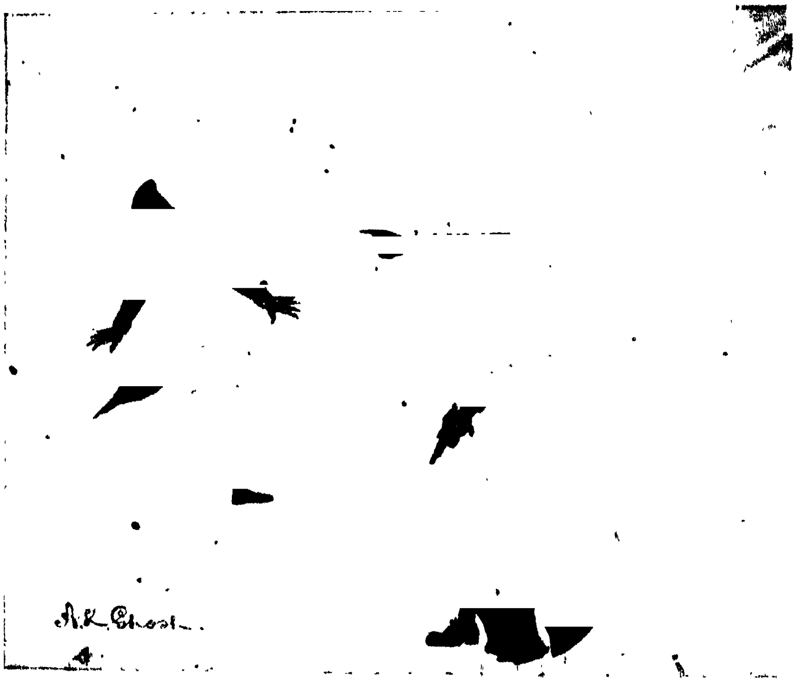
[শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ]



চুলের বাহার



চুলের টুপি



বলাই

[শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)

রসিক হ'ল ধোনাই মণ্ডলের ছেলে, বিশাই মণ্ডলের নাতি, ভাগবত মণ্ডলের জামাই, ও মদন মণ্ডলের সম্বন্ধী। বিশাই মণ্ডলের ছেলে ধোনাই মণ্ডলের যৌবনকালেও তাদের অবস্থা না কি বেশ ছিল। জমিজারাত থাকিলেও, নিজ হাতে লাঙ্গল ঠেলিয়া চাষবাস করিতে হইত না, কৃষাণ রাখিয়া চাষের কাজ চলিত। রসিক যখন ছেলেমানুষ, সেই বয়সেই সে কলমের বদলে লাঙ্গল ধরিয়া হাতে-কলমে চাষবাস আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু এ' একবার জ্বরে ভুগিয়া সে তার বাপকে স্পষ্ট বলিল, "আমি ও-সব পারব না।"

মামলা করিয়া বিশাই মণ্ডল সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন সর্ব্বস্বের মায়া ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিল, তখন ধোনাই বড় আশা করিয়া রহিল, তার রসিক বাঁচিলে আবার সবই হইবে।

রসিকের মামা বলাই মণ্ডল সে দিন থেকে অনাহারে মরিবার ভয়ে ভগিনীপতির সংসারে আসিয়া লাঙ্গল কাঁধে লইল, সেই দিন হইতে সে গরুবাছুরের রাখাল হইল, মাঠের কাজে সবার 'মণ্ডল-দাদা' হইল। মণ্ডলের সংসারে বাজার-সরকারী,—বাড়ীর যা কিছু কাজ ছিল, একে-একে সকল ভার আসিয়া বলাইএর মাথায় পড়িল। এদিকে রসিকচন্দ্রকে লাঙ্গল ছাড়িয়া গাঁয়ের নূতন পাঠশালায় আসিতে হইল।

লেখাপড়ায়ও রসিকের নাম পড়িয়া গেল। তার 'বানান' 'ফলা' সাঙ্গ হইয়াছে, 'যুক্তাক্ষর' লেখা সাঙ্গ, 'কলার পাতায়' দাগা বুলাইতে-বুলাইতে শ্লেটের আমদানী হইয়াছে, আবার বালীর কাগজে হাতচিঠার মকস চলিতেছে। এ হেন রসিকচন্দ্রের জন্য যখন মণ্ডলবাড়ীতে সম্বন্ধের পর সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, ধোনাইএর তখন আর ছেলের বিদ্যা বুঝিতে বাকী রহিল না। সেও সময় বুঝিয়া পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিল। বিবাহের সঙ্গে-সঙ্গে রসিকের লেখাপড়াও বন্ধ হইল। অতি কষ্টে যদিও গাঁয়ে পাঠশালা বসিয়াছিল, ছাত্রের অভাবের চেয়েও ছাত্র-বেতনের অভাবে পাঠশালাটি যখন উঠিয়া গেল, তখন স্বয়ং শ্রীমান রসিকচন্দ্রই বলিল, "বৌএর ভাগ্যেই তার পড়াশুনা বন্ধ হইল।"

কিন্তু ভাগবত মণ্ডল জামাতা বাবাজীকে ছাড়িল না। যাকে বিষয় আশয় দিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছে, সাধ্যপক্ষে তাহাকে মুখ্য রাখিলে, লোকের কাছে নিন্দা শুনিতে হয়,—ছেলের মা ও মেয়ের মা'র গাল খাইয়া হজম করিতে হয়, মেয়ে বড় হইলে মেয়ের মুখ ভারা দেখিতে হয়, মেয়ের দু' কথা শুনিতেও হয়, এবং বিনা প্রয়োজনেও জামাইএর অভিযোগ শুনিতে হয়। সর্ব্বোপরি মেয়ের কষ্ট দেখিলে বাপ মা ও আত্মীয় স্বজনকেও ভবিষ্যতে অনুতপ্ত হইতে হয়; বোনের বিয়েতে ভাগবত তাহা বেশ বুঝিয়াছিল। সুতরাং একমাত্র আদরিণী মেয়ের ভবিষ্য-সুখশান্তির জন্য রসিকের ব্যয়ভার সে মাথায় লইয়া দূরবর্ত্তী হাই স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিল। দূরবর্ত্তী বলিয়া রসিকচন্দ্র কিছুদিনের মধ্যেই স্কুল-বোর্ডিংএ আশ্রয় লইল।

পড়াশুনা না হইলেও রসিকচন্দ্রের জামা, জুতা ও চুলের বাহার খুবই খুলিয়া গেল। লাঙ্গল-ধরার ইতিহাস সে ভুলিতে চেষ্টা করিল। নিজে যে একজন বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, বিষয়ী ও প্রতিষ্ঠাপন্ন লোক, সেই ভাবটাই সে সবাইকে দেখাইতে লাগিল। সহসা একদিন দু'বার ভেদ-বমিতে ধোনাই শয্যায় শুইয়া যখন রসিকের কথা ভাবিতে লাগিল, সেই সময়ে অনেক ঘুরিয়া বলাই এক হাতুড়ে ডাক্তার লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সামান্য পল্লীগ্রামে ডাক্তার-কবিরাজের অভাবের জন্য ধোনাই রসিককে ডাক্তারী পড়াইবার কল্পনার কথা স্মরণ করিয়া, রসিককে সকল রকমে বড় করিবার কল্পনা ও গর্ব্ব মনে রাখিয়া, চোখ বুজিয়া দু'বার রসিককে ডাকিয়া, চোখের জল ছাড়িয়া দিল। রোগীকে অভয় দিয়া টাকা লইয়া ডাক্তারও বাহির হইল, রোগীরও আসন্ন সময় বুঝিয়া বাড়ীর লোক সব কান্নাকাটি জুড়িয়া দিল। বলাই চোখের জল মুছিয়া দেখিল, শত্রু মিত্র সবাই এ সময়ে ধোনাই-মণ্ডলের শেষ দেখিতে আসিয়াছে। রসিকের শ্বশুরের দেওয়া ও আপনার সামান্য সম্পত্তির গর্ব্বে যে ধোনাই সকলকেই স্পষ্ট বলিয়াছে যে, আমি কোনদিন কারও সাহায্য চাই না, আজ তাদের সাহায্যেই সে আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া শ্মশানে যাত্রা করিল, সেই প্রাতিবেশীরাই তার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের সঙ্গে তার সদ্য বিধবা স্ত্রীকেও সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

(২)

বলাইএর যে বুদ্ধি মোটেই নাই, রসিকচন্দ্র তাহার মায়ের কাছে ও স্ত্রীর কাছে প্রমাণ করিয়া যখন পাড়ায় প্রমাণ করিল, তখন গ্রামের বালকেরাও আর বলাইকে টিট্‌কারী না দিয়া ছাড়িল না। বলাই যে মোটেই কাজের লোক নয়, ইহাও প্রমাণ করিতে সে বিলম্ব করিল না। রসিকের মায়ের যেমনতর ভাই ই বলাই হউক না কেন, রসিকের মা কিন্তু ভাইটিকে মন্দ বাসিত না। ছেলে ও বৌ যখন কথায় কথায় বলাইএর দোষ ধরিত তখন রসিকের মা ভাইয়ের হইয়া দু'কথা বলিতে যাইত, কিন্তু উপযুক্ত ছেলের কাছে ধমক খাইয়া অগত্যা শেষে তাহাকে ছেলের মতেই মত দিতে হইত।

রসিকের ছেলেটা বলাইএর কোলেপিঠেই মানুষ হইতেছে। বলাইও ভালবাসিবার পাত্র পাইয়াছে; শিশুটিও স্বার্থশূন্য সরল প্রাণে বলাইয়ের বুকে ঝাপাইয়া পড়িয়া, বুকে বুক লাগাইয়া, মুখে মুখ রাখিয়া খোলা-মনে শিশুর সরল হাসি হাসিয়া, বলাইকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। সকলের অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার ও তীব্র তিরস্কারের মধ্যে এই কচি শিশুর সরল হাসিতে সে সত্যসত্যই মনে করিত, অনেক দিনের যন্ত্রণাময় ক্ষতে কে যেন অমৃতের মলম দিয়া প্রলেপ দিয়াছে। এতদিনের পর সুস্থ শরীরের শান্তি সে একটু-একটু অনুভব করিতেছে।

শিশুটিকে বুকে লইয়া বলাই তাহাকে একটা মুড়ীর

মোয়া খাইতে দিল। শিশু আবদার ধরিল, "আমি কলা খাব।"

নেপথ্য হইতে রসিকের স্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "বয়সে কি আর বুদ্ধি বাড়ে! চায় কলা, দিলে মুড়ির মোয়া! মোয়াকে মোয়াও গেল, কলাকে কলাও যাবে,—মাঝ থেকে ছেলেটা আবদারে হবে,—বায়না নিলে আমারই প্রাণ বেরুবে।" ইহার একটা কথাও বলাইয়ের কাণে গেল না।

বয়সে বুদ্ধি বাড়ে কি না, কথাটা ভাবিতে-ভাবিতে বলাই নিঃশব্দে ঘরে গিয়া একটা কলা আনিয়া অৰ্দ্ধেক খোকাকে একটু একটু করিয়া খাইতে দিল। বাকী অৰ্দ্ধেক আপনার হাতের মুঠার মধ্যে রাখিয়া বলিল, "দূর যা—পাখীতে কলা নিয়ে গেল! দাঁড়াও ত একবার কোল থেকে নেমে, কোথায় গেল পাখীটা উড়ে, একবার দেখে আসি—আমার দাদুর কলা!"

খোকা দু' একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া মুখ মলিন করিয়া বলিল, "আমি খাব না, হাতে ক'রে রাখব।"

বলাই হাসিয়া বলিল, "পাবে কোথায়? পাখী কি আর ফিরিয়ে দেবে।"

খোকা কথা না বলিয়া দাদার বাঁ হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। বলাই হাসিয়া ছোট্ট দাদামণিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "গা টা যে গরম হয়েছে দাদুমণি।" কথাগুলা উচ্চারণ করিতে না করিতে নেপথ্য হইতে পনরায় শিশুর মায়ের মন্তব্য বলাইএর কাণে গেল, "গা গরম হয়েছে, তবে কলা খেতে দেওয়া হ'ল কেন? বাড়ী এসে এ কথা শুনলে আজ বাড়ীশুদ্ধ লোককে ঝাঁটাপেটা করবে।"

"না মা, আমার গা গরম হয় নি।"

"তুই ত ছাই বুঝিস্, হতভাগা ছেলে! হতভাগা ছেলে যে যা দেবে, তাই খাবে—তাই খাবে! আয়, শিগ্‌গির নেমে আয়, দেখি আমি গায় হাত দিয়ে।"

বলাই কিছু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "খোকা আর কলা না চায়, সেইজন্যেই বলেছিলাম;—খোকা ভাল আছে।"

পাছে মায়ের কর্ত্তব্যের কঠোর শাসনে খোকা নিগৃহীত হয়, বলাই সেই ভয়ে খোকাকে ছাড়িয়া দিল। সন্তান-বাৎসল্যে স্বরূপ থার্ম্মোমেটারে, মায়ের পরীক্ষায় খোকা যখন উত্তীর্ণ হইয়া 'দাদার' গলা জড়াইয়া ধরিল, তখন বলাই ধীরে-ধীরে বলিল, "খোকাকে নিয়ে একটু বাইরে যাব?"

"না—অসুখ করবে।"

"তা হ'লে খোকাকে নাও। আমার মাথাটা কেমন ক'চ্ছে, আমি একটু হাওয়ায় ঘুরে আসি।"

"গরুর ঘাস-জল নাই। কৃষাণরাও বাড়ী গেছে। চাকর দুটো বিদেয় দেওয়া হ'ল, এখন আমি সকলের পায় তেল মাখিয়ে বেড়াই।"

বলাই ধীরভাবে বলিল, "এসে দোব এখন।"

"এসে আর দিতে হবে না। গো-বধের ভয় আমারও আছে। খুকীটের জ্বর হয়েছে, একটা পাচন যোগাড় ক'রেও দিতে পাচ্ছি না, এমনই অদেষ্ট।"

কি একটু ভাবিয়া লইয়া বলাই বলিল, "আচ্ছা, ঘাস জল দিয়েই যাচ্ছি আমি, পাচনে কি কি চাই, তুমি ততক্ষণ তাই ঠিক ক'রে রাখ।"

ঘাস জল দেওয়া হইলেও বাহিরে যাওয়ার হুকুম মিলিল না, বরং বলাই বুঝিতে পারিল, বাহির অপেক্ষা ঘরে তাহার বিশ্রামের চেয়ে ঢের বেশী কাজ জমিয়া আছে। গোহালে গরু রাখিতে হইবে, ছেলে ভুলানো ছড়া গাহিয়া খুকীকে ভুলাইতে হইবে, জাল দিয়া পুকুরে মাছ না ধরিলে নুন-ভাত হয় ত অদৃষ্টে জুটিবে। তা ছাড়া উঠান থেকে কাপড়-চোপড় ঘরে তুলিতে হইবে, তামাক কাটিয়া মাখিতে হইবে, সময় পাইলে মোল্লাবাড়ী হইতে কেনা কাঠগুলো যতটা পারা যায়, আনিতে হইবে। সে-দিনের মত তার মাথার যন্ত্রণার কথা তাকে ভুলিতে হইল। গোহালে গরু রাখিয়া, যখন মাছ ধরিবার উদ্যোগ করিল, এমনই সময় রসিকচন্দ্র আসিয়া হুকুম দিল, শিগ্‌গির বাজারে যাও, সম্বন্ধী মদন বাবু আসিতেছেন, শিগ্‌গির দুধ, মাছ, পান নিয়ে এস।

খুকীর পাচনের জন্য ঔষধের দরকার আছে কি না, বলাই দু'বার জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন জবাব পাইল না; অগত্যা টাকা পয়সা লইয়া বয়সে বুদ্ধি বাড়ে কি না, ভাবিতে-ভাবিতে মাছ, দুধ কিনিতে বাজারে চলিয়া গেল।

সে ভাবিয়া দেখিল, বুদ্ধি তার অনেক বাড়িয়াছে। অন্ততঃ নিজের অবস্থা বুঝিবার বুদ্ধি তার এতই বাড়িয়াছে যে, সে কিছুতেই ভাবিয়া পায় না, সে এত কষ্ট কেন করে! স্ত্রী-পুত্র বোধ হয় এ জন্মে তার নাও হইতে পারে। বাড়ী

ঘর,—সে ত বিনা অর্থে হইতেই পারে না। বাকী রহিল শুধু পেটের চিন্তা—সে জন্য অবশ্য কারও কাছে তার জবাবদিহি নাই। এমন ঢের দিন হয়, বোন্ বা বোন্‌পোর তিরস্কারে পেট খালি থাকিলেও পেটে দুটো ভাত দেওয়ার জন্যও কেহ অনুরোধ করে না! তবে তার কি ঠেকা! আর সে ঠেকাই বা এমন কি, যে ক্রমাগত এত জুতো, লাথির পর এক মুঠো ভাত চাই-ই চাই!

বাজার হইতে মোট মাথায় করিয়া আনিয়াই বলাই বলিল, "দিদি! আমার মাথাটা কেমন কচ্ছে—আমি একটু শুয়ে পড়ি।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে তার নির্দ্দিষ্ট অতি মলিন ছেঁড়া কাঁথায় শয়ন করিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিল, কি ঠেকা! কিসের ঠেকা!

রসিকচন্দ্র একটা ধমক দিয়া মিঠেকড়া ভাষায় বলিল, "আজকে ফাঁকি দেওয়া চল্‌বে না মামা! বাড়ীভরা ভদ্দরলোক, তামাক দেওয়ার লোক পর্য্যন্ত নাই,—কাজের অন্ত নাই;—অথচ এমনি সময় তুমি নির্লজ্জের মত শুয়ে থাক্‌বে, আর আমার কাজকর্ম্মের বেবন্দোবস্ত দেখে মদন ভায়া টিট্‌কারী দিয়ে বল্‌বে, তুমি লোকজন শাসনে রাখ্‌তে জান না—এ কিছুতেই হ'তে পারে না। ওঠ শিগ্‌গির, লুচীটুচী ভেজে ফেলে, ওঁদের সকাল-সকাল খাইয়ে তারপর অসুখ হ'য়ে থাকে এসে না হয় শুয়েই থেকো।"

'যাচ্ছি,' বলিয়া বলাই পাশ ফিরিয়া শুইল, আর নিজের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। মাথা বড় গরম হইয়াছে বুঝিয়া মাথায় একটু জল দিয়া বলাই রান্নাঘরে ঢুকিল। রান্নাঘরে বসিয়াই খবর পাইল, খোকার জ্বর হইয়াছে, রসিকের স্ত্রীর রান্নাঘরে আসা আজ অসম্ভব।

রসিকের তর্জ্জন গর্জ্জন বলাইএর কাণে গেল। বলাই রাগিল বটে, কিন্তু চুপ করিয়া গেল। রসিক রান্নাঘরে ঢুকিতেছে দেখিয়া বলাই লুচীর খোলা নামাইয়া রসিকের উৎকট রাগের বিকট মুখভঙ্গী দেখিয়া আপনাকে আপনি সাম্‌লাইয়া লইতে লাগিল।

অর্দ্ধখণ্ড কদলীতে অন্নের মাত্রা কতটা বাড়াইতে পারে, রসিক-পত্নী বিনাইয়া-বিনাইয়া যতই স্বামীকে তাহা বলিতে লাগিল, ততই রসিকের মা কি জানি কেন এই দূর সম্পর্কীয় ভাইটির জন্য আজ কথা কাটাকাটি করিতে লাগিল। রসিক যখন মাকেও ভ্রূকুটী-ভঙ্গীতে শাসন করিল, তখন বলাই আরও অধীর হইয়া পড়িল। মা যখন কাঁদিয়া-কাটিয়া শুইয়া পড়িল, রসিক তখন পত্নীর ইন্ধন প্রদত্ত সমস্ত ক্রোধাগ্নি দুর্ব্বল বলাইএর সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া দিয়া তাহাকে পোড়াইয়া মারিতে লাগিল। বলাই নতমুখে কেবল বলিল, "বাড়ীতে অতিথি, হাতে ঢের কাজ,—আজ থাক, কাল যেন আমার বিচার হয়।"

ক্রোধান্ধ রসিক আরও উত্তেজিত হইয়া বলিল, "আজ সকলের সামনে তোমায় ঝাঁটা মেরে বিদায় করবো, তবে আমি ছাড়বো। যে আমার ছেলেকে মেরে ফেল্‌তে পারে, সে আমাকেও খুন করতে পারে! তোমার মত ছোট লোকের সম্পর্কেও আমার কোন প্রয়োজন নেই—সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে আজ রাত্তিরেই তুমি আমার বাড়ী থেকে বিদায় হও।"

বলাই কখনও রাগে না; কিন্তু আজ রাগে কাঁপিতেছিল। ইহা শুধু অন্য দিনের ক্রোধ বা তিরস্কার নহে, আজ আত্মীয়, স্বজন, অতিথি ও স্বজাতির সম্মুখে ঘোর অপমান! চিরসহিষ্ণু বলাইএর কাছে ইহা আজ অসহ্য বোধ হইল। সে রান্নাঘর ছাড়িয়া উঠানে দাঁড়াইয়া গামছায় গায়ের ঘাম মুছিতে লাগিল, আর আত্মসম্বরণের চেষ্টা করিতে লাগিল।

অবস্থা দেখিয়া রসিক একটু সঙ্কুচিত হইল। তথাপি সাহসে ভর করিয়া বলিল, "কি, তুমি রাঁধবে না?"

দৃঢ়কণ্ঠে বলাই বলিল, "ইচ্ছা নাই।—তবে বাড়ীতে অতিথি, না খাইয়ে দিলে তারাও অনাহারে থাকবে, দিদিরও বকুনী খেতে হবে।"

রসিক তার স্পর্দ্ধা দেখিয়া বিস্মিত হইল। চোখ লাল করিয়া বলিল, "আজ যদি আমার অপমান কর ত তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন! গাছতলায়ও তোমায় দাঁড়াতে দোব না।"

বলাই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সেও চোখ লাল করিয়া বলিল, "বটে! তবে আমি রাঁধব না।"

"রাঁধবে না?"

"না।"

"কি ছোটলোক! আমার খেয়ে, আমার প'রে আমায় অপমান! এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর! আমার সামনে দাঁড়িয়ে এত বড় কথা! বেরো—বেরো আমার বাড়ী

থেকে! বেরো শিগ্‌গির—বেরো!"

রসিক অপেক্ষাও বলাই রাগে বেশী কাঁপিতেছিল। বেগতিক দেখিয়া সুদন আসিয়া রসিকের হাত ধরিতে গেল। রসিক হাত ছিনাইয়া লইয়া মামাকে মারিতে উদ্যত হইল। বলাই মার খাওয়ার জন্য যখন অগ্রসর হইল, বলাইএর চক্ষু দেখিয়া রসিক তখন বুঝি বা ভয়েই সঙ্কুচিত হইল।

বলাই অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া, বলিল "বাড়াবাড়ি করো না বলছি। এখনও বলছি চুপ কর।"

রসিক আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সুদন বলাইকে ইঙ্গিত করিলে সে সরিয়া গেল। যারা গোলমাল শুনিয়া তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, বলাইএর ধমক খাইয়া তারাও যা তা বলিতে বলিতে সরিয়া গেল।

সুদন রসিকের হাত ধরিয়া যখন তাকে বৈঠকখানায় লইয়া গেল, স্ত্রী-কণ্ঠের কঠোর শাসন তখনও বলাই সহিষ্ণুতার সহিত হজম করিতেছে। বলাইমামা মাথায় আর একটু জল দিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। কিন্তু সব রান্নাই গোলমাল হইয়া গেল। লুচি ভাজিতে ঘি কম পড়িল, ছোলার ডালে নুন দিল না, ভুলে ডালনায় দুবার নুন দেওয়া হইল। পিষ্টক অর্দ্ধপোড়া হইল, অম্বল পানসা হইয়া গেল। দ্বিতীয় নম্বর মোকদ্দমায় বলাই অকথ্য তিরস্কার শুনিয়া, অতিথি ভোজন করাইয়া, অনাহারে শয্যায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কিসের ঠেকা আমার?—কার কেনা গোলাম আমি! কেন এত সহিব!

(৩)

কেহ বলিল, বলাইএর বয়স হইয়াছে, বুদ্ধি হইয়াছে, দুর্ব্ব্যবহারে ভগিনীপতির সংসার ছাড়িয়াছে। কেহ বলিল, ভাগ্নের মাথায় হাত বুলাইয়া দু-পয়সা হাতে করিয়াছে, বিয়ে-থাওয়ার যোগাড় করিয়া সংসারী হইবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ বলিল, রসিক এত করিয়া মানুষ করিয়াছে, আজ স্বার্থপরের মত তাকে একলা ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে! বলাইএর কাণে কিন্তু ইহার কোন কথাই পৌছিল না! সমালোচনা, নিন্দা বা সুবুদ্ধি প্রদান, কিছুই বলাইর কাজে লাগিল না; এ দিকে কিন্তু মণ্ডল-সংসার অচল হইল। বিনাবেতনে বলাই চাকর যেমন প্রাণ দিয়া খাটিত, টাকা দিলেও তত কেহ খাটে না, রসিক ইহা ক্রমশঃ বুঝিল; কিন্তু রসিক-গৃহিণী বারবার বুঝাইয়া দিল, মাইনের চাকর কথা শোনে, মনীবকে মানে; চুরী করিতেও ভয় পায়, কথা বলিতেও আগুপাছু ভাবিয়া লয়। তা ছাড়া এ খায় বেশী কাজ করে কম, আমাকে ত মোটেই মানে না। রসিক কোন জবাব না দিয়া একটা 'হুঁ' দিয়া বাহিরে গেল। রসিক-পত্নী বুঝিল, জঞ্জালটা আর আসিয়া জুটিবে না।

টাকার গায়ে হাত পড়িয়াছে বলিয়া রসিক পত্নীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়াও মামার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। রসিকের বৃদ্ধা মাতাকে শুধু বধূর সঙ্গে রান্নার সাহায্য করিতে হইত তাহা নহে, পুকুরঘাটের কাজ, উঠান ঝাঁট দেওয়া, ছেলে রাখা, বাসনমাজা অনেক কাজই বুড়ীকে করিতে হইত। কথা বলিলে রক্ষা থাকিত না, বধূ বুঝাইয়া দিত, দুটো যে অন্ন জোটে, সেও তারই কৃপায়। বৃদ্ধা বধূর সম্মান বুঝিয়া চলিলে বউও মা, ওমা, মা বলিয়া সুমধুর ডাকে বৃদ্ধার কাণ অমৃতে ভরিয়া দিত। নিতান্ত দরকার হইলে শাশুড়ীর হইয়া একটু আধটু কাজ করিত, এমন কি শাশুড়ীর খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধার কথায়ও কখন কখন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিত।

বৃদ্ধ বয়সে অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর ভাঙ্গিলেও বধূকে সে সাধ্যপক্ষে কোন কাজ করিতে দিত না। এ ঔষধে বধূরও প্রদর-রোগের কিছু কিছু প্রশমিত হইত; কিন্তু বৃদ্ধা যখন অপারগ হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল, বধূও তখন স্বামীর কাছে তার রোগের মাত্রা বাড়াইতে লাগিল। স্বামী তার অসুখের কথায় কাণ দেয় না দেখিয়া সেও শয্যা গ্রহণ করিল। লোক রাখিয়া সুবিধা হয় না বুঝিয়া রসিকচন্দ্র প্রমাদ গণিল। অগত্যা মা ও স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য পাশের গাঁয়ের নূতন কবিরাজ ধন্বন্তরী দাসকে ডাকিতে হইল। রসিক নিজে নিত্যরোগী, অথচ পয়সার ভয়ে কখনও ঔষধ খায় না। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, ঔষধ খাওয়া আমি পছন্দ করি না। সেই রসিক যখন কবিরাজ ডাকিয়াছে, তখন গাঁয়ের সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা হইলে তার মা ও স্ত্রীর অসুখ নিশ্চয়ই বেশী হইয়াছে।

বধূর অসুখের দিকে বিশেষ নজর না দিয়া রসিকের মার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া কবিরাজ যখন হতাশ

হইলেন, তখন রসিক বড়ই ভাবনায় পড়িয়া গেল। মায়ের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিয়া ভাবিতে লাগিল, তার ভবিষ্যৎ কি! ডেপুটীগিরীর কল্পনা ঘুচিয়াছে, এখন যে কেরাণি-গিরিও জুটিবে না, চাষবাস করিতেও পারিবে না, ইহা ভাবিয়াই তার মাথা ঘুরিয়া গেল। লাঙ্গল চষিতে, গরু তাড়াইতে, জুতা জামা ছাড়িতে, অভিমান ছাড়িতে, পরের কাছে সাহায্য চাহিতে, সে কিছুতেই পারিবে না।

সময় বুঝিয়া শত্রুপক্ষ অত্যাচার আরম্ভ করিল। শত্রুপক্ষ মিথ্যা মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়া জমি বেদখল করিল, দাঙ্গাহাঙ্গামায় রসিকচন্দ্রকে মারধোর করিল। রসিক শত্রুপক্ষের ভয়ে মনে-প্রাণে মামাকে ডাকিতে লাগিল। মামাকে পাইলেই যে ইহার প্রতিশোধ দিতে পারিবে, বুঝিয়া দিনরাত্রি মামার চিন্তা করিতে লাগিল।

রসিক জীবনে কখনও এক পয়সাও উপার্জ্জন করিয়া দেখে নাই; অথচ তার বিশ্বাস ছিল, তার মত লোককে রাখিবার জন্য না জানি কত লোকই ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছে। ভবিষ্যতের চিত্র দেখিয়া তার সকল বুদ্ধিবিবেচনা গোলমাল হইয়া গেল। কবিরাজকে টাকা দিয়া যখন মনে করিত তার বুকের রক্ত এক এক ফোঁটা কমিতেছে, তখন তার পুঁজির দিকেও নজর পড়িল। দরিদ্র ধোনাই রসিকের বিবাহের পরে হঠাৎ বড়লোক হইয়া মোড়লী, মাতব্বরীতে মামলা-মোকদ্দমায় কি করিয়া ক্রমে ক্রমে এমন হইয়াছে; মাও যখন চক্ষু বুজিল, বাবার কার্য্যকলাপও তত স্পষ্ট হইয়া তার অর্থকষ্ট ক্রমশঃ বাড়াইয়া দিল। ধার বাড়িল, উদ্বেগ বাড়িল। আজ সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, মণ্ডল-সংসার তার, এ সংসারের দায়িত্ব তার, ভালমন্দ তার, সব তার; অথচ সকল রক্ষার মূল যে অর্থ, সেই অর্থাভাবেই সে দুদিন পরে মানের দায়ে মাথায় হাত দিয়া বসিবে! মাঠে সেই চাষ করিবে, সে-ই লাঙ্গল চষিবে, সে-ই গরু-বাছুর রাখিবে! রসিকচন্দ্রের চোখে জল আসিল, সে একমাত্র বলাই মামাকে স্মরণ করিতে লাগিল।

(৪)

অবস্থা যেমনই হউক, মায়ের শ্রাদ্ধ, মেয়ের বিয়ে অবস্থার ধার ধারে না,—রসিকচন্দ্র তাহা বুঝিয়া ঘটা করিয়া মায়ের শ্রাদ্ধ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইল! যে-কোনও দিন কারও পরামর্শ গ্রহণ করে নাই, আজ সেই সবার পরামর্শে ধার করিয়া খুব খরচ করিয়া মান কিনিয়া বসিল! অথচ যারা মণ্ডলের পো'র প্রশংসা করিয়া দই, লুচী, সন্দেশ, রসগোল্লার জয়জয়কার করিয়াছিল, আজ তাহারাই শোধ দিতে পারিবে না বলিয়া পঞ্চাশটা টাকা ধার দিতে ইতস্ততঃ করিল। জমিবন্ধক ও বাড়ী বিক্রীতে যে এখনও টাকা পাওয়া যায়, সে পরামর্শ দিতে অনেকেই ভুল করিল না। রসিকও এসব পরামর্শ যথাসাধ্য শুনিয়া যাইতে লাগিল।

দেনার সুদ যত বাড়ে, মাথার বুদ্ধি তত গোলমাল হইয়া যায়, ইহা বুঝিয়া রসিক মনে-মনে স্থির করিল, দেনা শোধ দিতেই হইবে। কিন্তু উপস্থিত কোন উপায় না দেখিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। বিপক্ষেরাও সময় বুঝিয়া জমাজমি বেদখল করিয়া, মামলা করিয়া, দলাদলি করিয়া রসিককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

টাকার দায়ে রসিক জমি বন্ধক দিয়াছে, অথচ পত্নীকে জানায় নাই, ইহা জানিয়াই রসিক পত্নী মুখের কপাট খুলিয়া দিল। রসিক রণে ভঙ্গ দিলে একথা লইয়া একলা একলা ঝগড়া করিয়া পরাস্ত হইয়া মনে মনে কেবলই ভাবিতে লাগিল, যা আমার, তাতে আমার কোন হাত নাই। আমার পরামর্শ পর্য্যন্ত প্রয়োজন নাই! সে সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল।

পত্নীর অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে বিরক্ত হইয়াও রসিক যতই তাহার সহিত মিশিতে চেষ্টা করিল, সে ততই গম্ভীর হইয়া গেল। অনেক কাকুতি মিনতির পর স্ত্রীর সঙ্গে ভাব করিতে না পারিয়া রসিক রাগিল, কিন্তু গৃহিণী তাহা গ্রাহ্যও করিল না। রসিক ক্রমশঃ রাগে ফুলিয়া পত্নীকে স্পষ্ট বলিল যে, সে প্রয়োজন হইলে কিন্তু গেরুয়া পরিয়া উদাসীন হইয়া যে দিকে দু'চক্ষু যায়, সেই দিকেই চলিয়া যাইবে। ইহাতেও রসিকের স্ত্রী দমিল না, বা তাহাকে গ্রাহ্যও করিল না। রসিক তখন অভিমানে, ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িয়া আপনার কর্ত্তব্য আপনি এমনই ভাবে ঠিক করিতে লাগিল যে, জগতে সে একাকী, তার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, কিছু নাই! সে গেরুয়া পরিলেও কেহ যখন ফিরিয়া তাকায় না, সন্ন্যাসী হইলেও কেহ গৃহী হওয়ার জন্য যখন অনুরোধ করে না, তখন এ মায়ার বন্ধনেই বা তার কি প্রয়োজন আছে!

একাকী শয্যায় পড়িয়া ছটফট্ করিয়া, সমস্ত রজনী অনিদ্রায় কাটাইয়া রসিক আপনাকে লইয়াই আপনার ভবিষ্যৎ স্থির করিল। তার ভাবনার অংশ আর এজন্মে স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে না, ইহা সে স্থির করিল।

রসিকের স্ত্রী ক্লান্ত শরীরে বেলা চারদণ্ড অবধি ঘুমাইয়াও আবার পাশ ফিরিয়া শুইল; অন্য দিনের মত রসিক আসিয়া ডাকিয়া তুলিবে, সেই ভরসাতেই সে মনে মনে ছটফট্ করিয়াও শুইয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল, কিন্তু রসিকের দেখা মিলিল না। খোকার কান্নায় যখন সে উঠিয়া বসিল, তখন চাহিয়া দেখিল, বাড়ীঘর রোদে ভরিয়া গিয়াছে। দুপুর বেলার মধ্যেও যখন স্বামীর দেখা মিলিল না, তখন পেটের জ্বালায় রন্ধনশালায় ঢুকিয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিতেছিল, আর বলিতেছিল,' আমার এই অসুখের শরীর, পোড়ারমুখো তাও বুঝ্‌বে না।

আজ পোড়ারমুখোর দেখা পাইলে সে যে কি তুমুল-কাণ্ড করিবে, মনে মনে তার তালিকা প্রস্তুত করিয়া, মনের মধ্যেই একেবারে চাপিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু পোড়ার মুখো যখন কিছুতেই আসিল না, তখন পাশের বাড়ীর এক বুড়ীকে ডাকিয়া আনিয়া রাত কাটাইল; সকাল বেলা সেই বুড়ীকে নিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। এ ভিটা উচ্ছন্ন দিবে, সরবে বুনিবে, একথাও দু একজনকে বলিয়া গেল।

(৫)

সেদিন রাত্রিতে রসিক ও বলাই ভয়ে-ভয়ে যখন বাড়ী ঢুকিল, তখন রাত দুপুর হইয়াছে। জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। রসিক ভীত হইল। বলাই বুঝাইল, বৌমা নিশ্চয়ই বাপের বাড়ী গিয়াছে, তোমার কোন ভয় নাই। রসিক তাহা বিশ্বাস করিল না, একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল; ইচ্ছা হইল, এখনই যাইয়া অন্ততঃ খবরটা লইয়া আসিয়া নিজের পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত করে, মনে-মনেও নিশ্চিন্ত হয়। বলাই মনে-মনে হাসিল। ভাবিল, এবার বাবু তোমার জব্দের পালা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, সাঙ্গ হইতে ঢের দেরী। অনাহারে সেদিন দুটী প্রাণী পড়িয়া রহিল, কথা-বার্তায় রাত কাটিল। পরদিন সকালে গ্রাম-বাসীরা রসিককে অনেক তিরস্কার করিল, বৌ যে বাপের বাড়ী গিয়াছে, সে সংবাদটাও দিল; যে বুড়ীর সঙ্গে বৌ বাপের বাড়ী গিয়াছিল, সে বুড়ী আসিয়াও পৌঁছা-সংবাদ দিয়া গেল। রসিক কিন্তু বিশ্বাস করিল না। অথবা কিছু কিছু বিশ্বাস করিলেও সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করিতে শ্বশুর-বাড়ী গেল। মনে-মনে আশা ছিল, অপরাধ স্বীকার করিলেই খোকার মাও শান্ত হইয়া হাসিমুখে খোকাকে লইয়া তাহার সহিত চলিয়া আসিবে।

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রসিক যখন বাড়ী ফিরিল, বেলা তখন দুপুর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বলাই কখনও মনে করে নাই, শ্বশুর-বাড়ী হইতে এত সহসা জামাতা ফিরিয়া আসিতে পারে! বলাই নিজের ভাত রসিককে দিয়া আবার ভাত চাপাইল, কোন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিল না। রসিক খাইতে বসিয়াই উঠিয়া গেল। রাগের চোটে বৌএর নামে যা-তা বলিতে লাগিল। বলাই চুপি চুপি বলিল, "ঘরের কথা পরকে শোনাতে নাই।"

পরদিন প্রভাতেই রসিক প্রস্তাব করিল, বলাইকে বিবাহ করিতে হইবে। বলাই আপত্তি করিল; বলিল, "কত দিন মহাজনের পায়ে তেল দিয়ে তাদের জন্য কত গাধার খাটুনি খেটে চাকরী যোগাড় করেছি। আমার এখন ভাল চাকরী, চাকরীতে ন্যায্য-ভাবে দু-পয়সা আছে। আমি এখন চাকরী ছেড়ে সংসার পাতব না; আর পাতলেও আমার পাতানো সংসার আমার সঙ্গে থাক্‌বে, তোমার তাতে কোন উপকারই হবে না।"

"চাকরীতে যা পাবে, তা আমি পাইয়ে দোব। তুমি এখানে থাক। এখানেই বিয়ে-থাওয়া ক'রে বসবাস কর।"

বলাই বলিল, "সে কি করে হবে? আমার বাড়ী নাই, ঘর নাই, আমায় লোকে মেয়েই বা কেন দেবে? আর দিলেই বা কোন্ সাহসে আমি বে' করবো! স্ত্রী-পুত্র পালনের সঙ্গে অর্থের বড় নিকট সম্বন্ধ।"

রসিক ভাবিয়া দেখিল, ঋণদায়ে এবং শত্রুপক্ষের চাতুরীতে তাহার ভূ-সম্পত্তি ত প্রায় পরহস্তগত। এখন যদি সে মামার নামে বে-নামীতে বিষয় হস্তান্তর করিয়া দেয়, তাহা হইলে হয় ত মামাকে বিষয়ের ফাঁদে ফেলিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে এবং মাতুলের সাহায্যে বিষয় উদ্ধারও করিতে পারে। এই মনে করিয়া সে বলিল, "সে হবে মামা, সে হবে।"

বলাই বলিল, "কি করে হবে! আগে টাকা হউক, তার পর সব হবে।" রসিক বুঝিল, মামা সুযোগ পাইয়াছে। মনে-মনে ভাবিল, বিষয়-আশয়ের লোভ দেখাইয়া চাকরী ছাড়াইতে হইবে; নতুবা মামা বড়লোক হইবে। আর মামা না থাকিলে এখানে আমার টেকাও দায় হইবে। রসিক আর এক চাল চালিয়া বলিল, "তা আমার বাড়ীতেই থাক্‌বে, আমার জমিজমাই চাষ করবে, অংশমত মজুরীর ভাগ, লাভের ভাগ পাবে।"

"তোমার বাড়ী যখন ছিলাম, তখন ছিলাম; এখন আর থাকব না। গায়ের বল কিছু চিরদিন থাকবে না,—তখন তঅামার একটা উপায় হওয়া চাই।"

"আমার মত ভাগ্‌না থাক্‌তে তুমি নিরুপায় কিসে মামা?"

বলাই মৃদু হাসিয়া বলিল, "হাঁ পরের ভরসা কি আর ভরসা!"

রসিক মনে-মনে বিরক্ত হইয়া মুখে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল, "তুমি বড় স্বার্থপর হয়েছ মামা। তখন ত কই একদিনও তোমার আপন পরের হিসাব ছিল না! দু'দিন বাইরে থেকেই আমাকে পর ভাবিতে লাগলে। কি আর বলি! আমি বলছি, তুমি এখানে থাক, তোমার ভাল হবে।"

বলাই মনে মনে হাসিল। মুখে বলিল, "পরের বাড়ী আমি থাক্‌ব কেন?"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রসিক বলিল, "তা অংশ লিখে দিচ্ছি; দু আনা না হয় চার আনা তোমার থাক, কেমন?"

বলাই বুঝাইয়া দিল, তাতে তার পোষাইবে না।

তাতে যে পোষাইবে না কেন, রসিক তাহা চিন্তা করিয়া, অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "কতটা তোমার চাই?"

রসিক যাহা ভাবিতেছিল, মামা সেদিক দিয়াও গেল না। কহিল, "আমার কি জিনিস যে, আমার চাই? তবে তুমি যদি দাও ত আমার পুষিয়ে দাও। এই যদি জমাজমির বাড়ীর আদ্দেকটা দাও ত আমি তার ন্যায্য দাম দিতে রাজি আছি। তাতে তোমার দেনাও শোধ হবে, শত্তুরেও তোমায় জব্দ কর্ত্তে পারবে না। আর যে অবস্থা শুনছি, তাতে ব্যবস্থা না হলে অন্যেও ত নেবে?"

অন্যেও যে নিতে পারে, যে চিন্তা রসিকেরও ছিল। নিরুপায়ের উপায় এই ব্যবস্থাই রসিক মানিয়া লইয়া উপস্থিত শত্রুকে জব্দ করিয়া তার পর মামার সঙ্গে বুঝিবে, ঠিক করিল। তবুও এক কথায় রাজি হইল না। এমন বোকা মামাটা কি করিয়া এরই মধ্যে এত চালাক হইল! রসিক মনে মনে তাহাই ভাবিতে লাগিল এবং মনে মনে বলাইএর মনিবকে গাল পাড়িতে লাগিল। সে যদি না বলাইকে চালাক করিয়া দিত, তাহা হইলে কি এমন সর্ব্বনাশ হয়! রসিক তবুও হাল ছাড়িল না, উপায়ান্তর না থাকিলেও বলিল, "দু'আনা নিলে ত তোমার হানি নেই মামা?"

"আমার হানি আমি বুঝি রসিক। আমারও বে'থা হবে, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করতে হবে! তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে আমাকে চলতে হবে ত। হয় আট আনা দিও, আর না হয়, তোমার সম্পত্তি, যেমন করে পার, তুমিই রক্ষা করবে। মনে রেখো, তোমার শত্তুর এখন আমার শত্তুর; শুধু তোমার একার মাথা ভাঙ্গতে তারা আসবে না, দুজনার মাথা ভাঙ্গবার মত দলবল নিয়ে তাদের আসতে হবে। না হয় তোমার আপনার মামাকেও জিগেস কর, সুদন বাবুকেও জিগেস কর, আপনার মামার কথায় ও সুদনের কথায় রসিক আরও গরম হইয়া উঠিয়া বলিল, "পরের বুদ্ধি আমি কোন দিনও লই না।" বলাই জানিত, বলবার ঝগড়া হওয়ার পর তারা বুদ্ধিও দেয় না, খবরও নেয় না। বলাই বলিল, "তাহ'লে আমি একটু সবার সঙ্গে দেখাশুনা করে আসি, তুমি তোমার বুদ্ধি ঠিক কর।"

(৬)

বিবাহ করিয়াই বলাই সস্ত্রীক চাকরী স্থলে চলিয়া গেল। রসিক দেখিল, মানুষ অবস্থা ভোলে, কিন্তু আঘাত ভোলে না। যার জন্য রসিক সর্ব্বস্ব দিল, সে সর্ব্বস্ব লইয়া তার চাকরী-স্থলেই চলিয়া গেল; রসিক মরিল কি বাঁচিল, তাহা সে ফিরিয়াও দেখিল না। রসিকের সব রাগটা পড়িল তাহার স্ত্রীর উপর।

ইংরেজি লেখাপড়া শিখিয়া রসিক বছরান্তে চাকুরী করিয়া যে টাকা লইয়া দেশে ফিরিল, নিরক্ষর বলাই পাটের কেনাবেচা করিয়া তদপেক্ষা অধিক অর্থ ও সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে লইয়া দেশে ফিরিল। রসিকের স্ত্রী আসিল না, রসিকও শ্বশুরবাড়ী গেল না।

এ বাড়ীর যেন এখন বলাই মালিক, রসিক অনুগৃহীত। রসিকের এ ভাবটা মোটেই ভাল লাগিল না। বলাই ভাল ভাল ঘর তুলিয়াছে, গরু কিনিয়াছে, পুকুর কাটাইয়াছে, রসিকের কাছে কখনও এক পয়সাও চায় নাই, অথচ কোন অধিকার হইতেই তাকে বঞ্চিত করে নাই। রসিক ইহাতে সুখী হয় নাই, বরং মর্ম্মাহত হইয়াছে! দুঃখ সহিয়াছে, অথচ চুপ করিয়া সহিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে!

একে-তাকে দিয়া খবর লইয়া রসিক জানিল, খোকারও আসিবার ইচ্ছা নাই; রসিকের স্ত্রী স্বামীর নামও মুখে আনিতে চায় না। মনে মনে রসিক বুঝিল, বলাই মামাকে সর্ব্বস্ব দেওয়ার আগে তাদের মত নেওয়া উচিত ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে রাগ করিল সম্বন্ধী স্দনের উপরে। বিবাহিতা ভগিনীকে ভগিনীপতির সকল সংস্রব ত্যাগ করাইয়া রাখিতে চাহিলে আইন-সঙ্গত উপায়েও যে শ্যালক জব্দ হইতে পারে, রসিক তাহা স্থির করিয়া লইয়া এই স্থল কথাটাতেও স্দনের নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিয়া, মনে মনে অশিক্ষিত, ইতর লোকের উপর চটিল; কেন তারা ঘৃণার পাত্র তাহাও ঠিক করিল। ইতর ও ভদ্রের তফাৎ কেন হয়, তাহাও স্থির করিয়া লইল। শ্বশুর, শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিলে যে এরূপ হইত না, তাহাও সে ভাবিয়া তাঁদের জন্য এ সময়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। ভগিনীকে বাড়ীতে রাখিবার স্দনের আর কি কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া স্দনকে জব্দ করিবার নানা ফন্দী করিতে লাগিল। খোকাকে মায়ের কোল থেকে কাড়িয়া লইবে, ইহাই স্থির করিল। অবশেষে কিছুই হইল না। ছুটির দিন ফুরাইল, আবার চাকরী-স্থানে চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় বলাই মামার এত সৌভাগ্যের জন্য দু ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া, স্ত্রীটাকে অভিসম্পাত করিয়া, ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিয়া, এবং আপনাকে ধিক্কার দিয়া, রাগে ফুলিয়া, অভিমানে কাঁদিয়া ও অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল, ইহার প্রতিকার করিবে। মণ্ডল-বংশে কিসের আমার বিদ্যার গৌরব, যদি নিরক্ষর বলাইএর চেয়ে অর্থে ও সামর্থ্যে শ্রেষ্ঠ না হইলাম!

বলাই এবার বাড়ী শ্মশান করিয়া গেল না। তার এক সম্পর্কীয়া পিসীমাকে ঘরের ও এক সম্বন্ধীকে বাহিরের চাবি দিয়া জমিজমা ও বাড়ীর তদ্বিরের জন্য মজুর রাখিয়া, গরু কিনিয়া, সব ঠিকঠাক করিয়া পত্নী ও শিশুসন্তানসহ কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল। কিছুদিন পরেই তার পিসীমা তাকে চিঠি দিয়া জানাইল যে, জমাজমির শোকে মদ খাইতে খাইতে রসিকের মৃত্যু হইয়াছে; রসিকের স্ত্রী বাপের বাড়ীতে মাথা গুঁজিয়া, স্দনের বৌর একান্ত অধীন হইয়া আছে,—দিন রাত্রি চোখের জলে ভাসিতেছে! যদি কোন প্রতিকার করিতে পার করিও। বলাই প্রত্যুত্তরে জানাইল, "তার জমাজমি ও বাড়ীর অর্দ্ধাংশ বর্ত্তমান, আমি থাকিতে তার বিষয় আশয় দেখার লোকেরও অভাব নাই—সে আপনার বাড়ীতে আপনি আসিয়া থাকিলে আর তাকে পরের অধীন হইতে হয় না! সে যদি নির্ব্বোধই না হইবে, তা হইলে সে তার স্বামীর সঙ্গে এমন করিত না! সে আসিয়া ঘর করিলে রসিকও এমনভাবে মরিত না!" এ চিঠির জবাব পাইয়া বলাই বুঝিল, যে বাড়ীর সর্ব্বাংশে রসিকের স্বার অব্যাহত প্রভুত্ব ছিল, যেখানে বলাই আশ্রিত ও অনুগৃহীত ছিল, সেখানে সে এখনও অভিমান ত্যাগ করিয়া বসবাস করিতে চায় না। পিসীমাকে জানাইল, তবে আর তার জন্য আপাততঃ আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই। বলাইয়ের সম্বন্ধী চিঠির পর চিঠিতে জানাইল, শুধু শুধু অংশটা পড়িয়া আছে, কোনরূপে তাহা পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলে খুবই ভাল হয়।

বলাই বাড়ী আসিয়াই রসিকের ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য ও রসিকের স্ত্রীকে তার নিজের বাড়ীতে থাকিবার প্রস্তাব করিয়া লোক পাঠাইয়া দিল। রসিকের স্ত্রী এতটা সহানুভূতিতে আরও বিশ্বাস হারাইল। সে বরং সন্দেহ করিয়া বলিল, ভালবাসা দেখাইয়া তার ছেলেকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিয়া সম্পত্তি নিষ্কণ্টক করিবে।

বলাই দেখিল, অদৃষ্টে যার দুঃখ আছে, সে ভালকেও মন্দ বুঝিয়া লয়। সে দুর্ব্বুদ্ধিকেই সুবুদ্ধি ভাবিয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করে! বলাইদের গ্রামের পার্শ্বে একটা বিস্তৃত জঙ্গলা স্থান ছিল, বলাই সেই জায়গাটা বন্দোবস্ত লইয়া ক্রমশঃ যখন আবাদ করাইতে লাগিল, সেই সময় স্দন মণ্ডল আসিয়া একবার দেখিয়া যাইয়া তার বোনকে বলিল "বলাইয়ের যেরূপ প্রতিপত্তি বাড়্‌ল, তাতে ও-গ্রাম থেকে তোমারও অন্ন উঠ্‌ল!"

স্দন মণ্ডল বলাইএর এত কাণ্ডকারখানা দেখিয়া,

অধীর হইয়া একদিন জমাজমির কথা বলিতে আসিয়াছিল। বলাই মণ্ডল শুধু বলিল, "খোকাকে পাঠিয়ে দিও, যার জমা-জমি, তার সঙ্গেই আমার কথা হবে।"

অনেকদিন পর্য্যন্ত খোকার জন্য অপেক্ষা করিয়া মণ্ডল বড়ই উদ্বিগ্ন হইল, এই সময়ে হঠাৎ একদিন খোকা মায়ের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া ভয়ে ভয়ে আসিয়া দাদামণির পায়ের ধূলা লইয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। মণ্ডল অধীর হইয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমার দাদামণি, এতদিনে তুই এলি ভাই!"

খোকাও কাঁদিল, মণ্ডলও কাঁদিল। দুজনের চক্ষের জলে এতদিনে মনের ময়লা কাটিয়া দুজনের চক্ষের জলেই ধুইয়া গেল। মণ্ডল খোকার হাত দুখানি ধরিয়া সস্নেহে বলিল, "হলো না দাদামণি শুধু তোর পড়াশুনা! তোর যা কিছু সবই তোকে দিয়েছি। রসিক যা আমায় ঠেকায় প'ড়ে দিয়েছিল, তাও ভাই তোকে দিয়েছি! দুঃখ রইল, যে ফিরিয়ে দেওয়ার আগে সে চ'লে গেল! তুই দেরী করে নিতে এসে আমাকে দুর্নামের ভাগী করলি ভাই।" এই বলিয়া বলাই বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। খোকার চক্ষু দিয়া ঝর্‌ঝর করিয়া জল পড়িতেছিল। মণ্ডল একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "ওরে! টাকা হয়, পয়সা হয়, বন্ধু-বান্ধব সব হয়, এমন সুখের বালাকাল গেলে আর লেখাপড়া হয় না। তোরা ভাবছিস্, আমার সব হয়েছে, কিন্তু যা হয়েছে, তাও ঐ একটা ছাড়া সব বেঠিক হয়ে আছে। লেখাপড়া জানা লোকের সঙ্গে মিশি আর ভাবি, এটে যদি পাই,ত সর্ব্বস্ব দিয়ে কিনি। চক্ষু থাকতে অন্ধ থাকিস্ না ভাই, তোর এখনও সময় আছে, চেষ্টা কর, মানুষ হ'তে পারবি।"

সাময়িকী

এবারকার সাময়িকীতে প্রথমেই একটা বিবরণ দিতে চাই। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশটা কত বড়, তাতে কত লোক বাস করে, তার মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কত লোক, স্ত্রী-পুরুষ বিবাহিত-অবিবাহিত কত, সহর কতগুলি, গ্রাম কতগুলি, ইত্যাদি বিষয়ের একটা মোটামুটি হিসাব সকলেই জানিয়া রাখা ভাল। আমাদের পল্লী-সহযোগী 'বীরভূম বাণী' এ সম্বন্ধে একটা তালিকা দিয়াছেন; আমরা সেইটাই তুলিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য যে, ইতঃপূর্ব্বে যে আদম-সুমারী হইয়াছিল, তাহা হইতেই এত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রতি দশ বৎসর অন্তর এক-একবার আদম-সুমারী হয়; এই আগামী ১৯২১ অব্দে পুনরায় আদম-সুমারী হইবে। তখন আবার নূতন একটা হিসাব পাওয়া যাইবে। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে—

বিভাগ—৫, জেলা—২৮।

আয়তন—৮৪,০০০ বর্গ মাইল।

(গ্রেট ব্রীটন অপেক্ষা কিছু কম')

লোকসংখ্যা—৪ কোটী ৬০ লক্ষের কিছু উপর (সমগ্র ব্রিটিশদ্বীপপুঞ্জের লোক সংখ্যা। ১০ লক্ষ)।

সহর—১২৫; গ্রাম—১২৫,০০০

এক আনা লোক সহরে বাস করে। পনের আনা লোক পল্লীগ্রামে থাকে। সহরে ১০ আনা পুরুষ ও ৬ আনা স্ত্রী; গ্রামে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা সমান।

শতকরা ৯০ জন বাংলায় কথা কয়।

মুসলমান—২ কোটী ৪২ লক্ষ।

হিন্দু—২ কোটী ১ লক্ষ।

বৌদ্ধ—২ লক্ষ ৫০ হাজার।

ক্রীশ্চান—এক লক্ষ ৫০ হাজার।

জৈন—৭,০০০

ব্রাহ্ম—৩,০০০

শিখ—২,০০০

ইহুদী—২,০০০

বিবাহিত—

পুরুষ—এক কোটী ৯ লক্ষ।

স্ত্রী—এক কোটী ৪ লক্ষ।

অবিবাহিত—

পুরুষ—এক কোটী ২২ লক্ষ।

স্ত্রী—এক কোটী ২১ লক্ষ।

বিপত্নীক—৮ লক্ষ।

বিধবা—৪৫ লক্ষ।

অন্ধ—আন্দাজ ৩৩,০০০

মূকবধির—৩২,০০০

কুষ্ঠ—১৭০০০,

পাগল—২০০০০

বাঙ্গালা দেশের মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল। এখন খুব বড় একটা কথা বলিতে হইবে। যাঁহারা সংবাদ-পত্র পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন যে, এখন বাঙ্গলা দেশের অনেক স্থানে রায়তদিগের বড়-বড় সভা সমিতি হইতেছে; এক এক সভায় কুড়ি পঁচিশ হাজার রায়ত সমবেত হইতেছেন; তাঁহাদের অভাব অভিযোগ, অধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। আর কয়েকদিন পরেই নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত হইবে, তাহাতে জন-সাধারণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার পাইবেন। জন-সাধারণ বলিতে আমরা যাঁহাদের বুঝি, তাঁহারা অধিকাংশই এই রায়ত-শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং এই সময় সেই রায়তদিগের কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়া কর্ত্তব্য। সুখের বিষয় এই যে, 'সবুজ পত্রের' সুযোগ্য সম্পাদক, তীক্ষ্ণধী, বারিষ্টার প্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বিগত ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যার 'সবুজ-পত্রে' 'রায়ত' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে এই বিষয়ের সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির আলোচনা যে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়াছে, একথা আর বলিতে হইবে না। আমরা সেই প্রবন্ধ হইতে কয়েকটা স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলেই পাঠকগণ রায়তের কথা সহজেই জানিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের ইতিহাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হয়। তখন বাঙলার তক্তে বসলেন সিরাজউদ্দৌলা। এঁর শাসন যে দেশের লোকের কাছে কতদূর প্রিয় হয়েছিল, তার প্রমাণ, বছর না পেরুতেই বাঙলায় ঘটল রাষ্ট্রবিপ্লব। যে ঘটনায় সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের গদি ও পৈতৃক প্রাণ, দুই হারাইলেন, একে আমি রাষ্ট্রবিপ্লব বলছি, কেননা জন কোম্পানীর সেকালের কর্ত্তাব্যক্তিরা সকলেই এ ব্যাপারকে Revolution বলেই উল্লেখ করেছেন। পলাসীর যুদ্ধ জেতবার ফলে কোম্পানী বাহাদুর বাঙলার রাজগদি পান নি, পেয়েছিলেন শুধু চব্বিশ-পরগণার জমিদারী-সত্ত্ব।

১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ পর্য্যন্ত মিরজাফরের আমল। এ তিন বৎসর গোলেমালে কেটে গেল। ফলে বাঙলার অরাজকতা বাড়ল বই কমল না।

তারপর নবাব হলেন মিরকাশিম। তাঁর নবাবীর মেয়াদ ছিল পাঁচ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ধরে তিনি বাঙলার প্রজার রক্ত শোষণ করলেন। কি উপায়ে, তা বলছি।—রাজা টোডরমলের সময় বাঙলার প্রজার আসল জমা স্থির হয়। এ জমাকে Land Tax বলা যেতে পারে। এ জমাবৃদ্ধি কোনো নবাব করেন নি। আসল জমা স্থির রেখে নবাবের পর নবাব শুধু আবয়াবের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়িয়ে চললেন। এই আবয়াবকে Cess বলা যেতে পারে। মিরকাশিমের হাতে এই আবয়াব কি রকম বিপুলায়তন হয়ে উঠেছিল তার সাক্ষাৎ পাবে Fifth Report-এ। মিরকাশিমের আমলের একখানি দাখিলা দেখলে তোমার চক্ষুস্থির হয়ে যাবে।

তারপর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশা কোম্পানী বাহাদুরকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করলেন। অর্থাৎ সরফরাজ খাঁর আমলে আমলচন্দ্র রায় রায়রাঁয়ার যে পদ ছিল, ১৭৬৫ সালে কোম্পানী বাহাদুর সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তফাতের মধ্যে এই যে আমলচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গলার নবাবের কর্তৃক নিযুক্ত হতেন, আর কোম্পানী বাহাদুর দেওয়ান হলেন দিল্লীর বাদশার সনন্দের বলে। ফলে কোম্পানী পেলেন বাঙলার অর্দ্ধেক রাজত্ব, আর বাকী অর্দ্ধেক রইল নবাব নাজিমের

হাতে। একালের ভাষায় বলতে হলে—দিল্লীর বাদশা Diarchy-র সৃষ্টি করলেন।

এ ক্ষেত্রে ফৌজদারী-সংক্রান্ত সকল রাজকার্য্য নবাব-নাজিমের হাতে reserved subject-স্বরূপ রয়ে গেল। আর কোম্পানীর হাতে যে কি কি বিষয় transferred হয়ে এল, তার সন্ধান নেওয়া দরকার, কেননা এই transfer-সূত্রেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জন্মলাভ করলে। বলা বাহুল্য, নবাবের আমলে সবই ছিল অচিরস্থায়ী।

দিল্লীর বাদশার ফারমানের বলে কোম্পানী বাঙলার প্রজার কর আদায় করবার অধিকার পেলেন; কিন্তু এই কর আদায়ের ভার কোম্পানী নিজ হাতে নিলেন না—নবাবের নিয়োজিত নায়েব-দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর হাতেই রেখে দিলেন।

তারপর ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে মহা দুর্ভিক্ষে (বাঙলায় যাকে আমরা বলি ছেয়াত্তরের মন্বন্তর) যখন বাঙলার এক তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করলে, এবং দেশ যখন একটা মহা-শ্মশানে পরিণত হল, তখন কোম্পানীর বিলেতের ডিরেক্টরদের মাথার টনক নড়ল। তাঁরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে Hastings সাহেবকে বাঙলার গভর্ণর পদে নিযুক্ত করে এ দেশে পাঠিয়ে দিলেন,—প্রধানত খাজনা আদায়ের একটা সুব্যবস্থা করবার জন্য। প্রচলিত ব্যবস্থা যে সুব্যবস্থা ছিল না, তার প্রমাণ এই দুর্ভিক্ষের বৎসর যত টাকা কর আদায় হয়, তার পূর্ব্বে কোনো বৎসর তত টাকা আদায় হয় নি।

এই দুর্ভিক্ষে দেশের যে কি সর্ব্বনাশ ঘটেছিল, তার পরিচয় Hunter's Annals of Rural Bengal-এ পাবে। এ ভোগ বাঙালী জাতিকে আরও ত্রিশ বৎসর ভুগতে হয়েছিল। এ মন্বন্তরের ধাক্কা বাঙলা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও আর সামলে উঠতে পারে নি। এই কথাটা মনে রাখলে বুঝতে পারবে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কেন আমি Emergency legislation বলেছি।

Hastings সাহেব কলকাতায় এসে—বাঙলার জমির পাঁচশালা বন্দোবস্ত করলেন। এ বন্দোবস্ত করা হল কিন্তু ডাকসুরত ইজারাদারের সঙ্গে। জমিদার অ-জমিদার নির্ব্বিচারে সর্ব্বোচ্চ ডাককারীকেই জমির ইজারা দেওয়া হল। বলা বাহুল্য, ইজারাদার বাঙলার প্রজাকে লুটে নিলে। এই সূত্রে Hastings সাহেবের সঙ্গে তাঁর কাউন্সিলের ঝগড়া বাধল; কেননা ধরা পড়ে গেল যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ইজারাদারেরা স্বয়ং Hastings সাহেব এবং অন্যান্য ইংরাজ কর্ম্মচারীদের বেনামদার বই আর কেউ নয়। এই সুযোগে Hastings সাহেবের পরম শত্রু Francis সাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং কোম্পানীর বিলেতি ডিরেক্টারদের সে প্রস্তাবে সম্মত করেন। কিন্তু ডিরেক্টার-মহোদয়দের এ বিষয়ে যা হোক একটি মনস্থির করতে আরো দশ বৎসর কেটে গেল। অতঃপর অনেক বলা-কওয়া, অনেক লেখালেখির পর তাঁদের আদেশ-উপদেশ মতই, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত করা হল। এই বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াপত্তন। অর্থাৎ—যে বৎসর ফ্রান্সের প্রজার peasant proprietor-ship-এর সূত্রপাত হল, সেই বৎসরই বাঙলার প্রজা সকল স্বত্ব হারাতে বসল।

এ ক্ষেত্রে চারিটি সমস্যা ওঠে—

(১) বন্দোবস্ত কার সঙ্গে করা হবে প্রজার সঙ্গে, না জমিদারের সঙ্গে?

(২) জমিদার বলতে কি বোঝায়—ভূম্যধিকারী, না সরকারের ট্যাক্স-কালেক্টর?

(৩) যদি জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়, তা হ'লে সে বন্দোবস্ত মেয়াদি না মৌরসী করা হবে?

(৪) জমিদারকে যদি মৌরসী পাট্টা দেওয়া হয় তাহলে তার দেয়ো মাল-খাজনা চিরদিনের মত নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হবে কি না?

এই সমস্যার মীমাংসা করা হ'ল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এবং তার কারণ এই যে কোম্পানীর কর্ত্তাব্যক্তিদের মতে তা করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না, কেননা কোম্পানীর গভর্ণমেণ্ট হচ্ছে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট।

কি সব তদন্তের পর, কি যুক্তি অনুসারে জমিদারের, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা স্থির হল, তার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ Fifth Report-এ দেখতে পাবে। এস্থলে আমি সকল যুক্তিতর্ক বাদ দিয়ে Sir John Shore প্রমুখ কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারীরা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তারি উল্লেখ করছি।

প্রথম। রায়তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা অসম্ভব। এদেশে জমিজমার হিসেব এত জটিল যে, ইংরাজ কর্ম্মচারী-দের পক্ষে তা আয়ত্ত করা অসম্ভব। বিশেষতঃ তাঁরা যখন বাঙলা ভাষা জানেন না। এ ক্ষেত্রে হস্তবুদ তৈরী করবার, খাজনা আদায় করবার, বাকী বকেয়ার হিসাব-কিতাব রাখবার ভার দেশী আমলাদেরই হাতে থাকবে। তারা যা খুসি তাই করবে, তহবিল তছরূপ করবে, রাজা প্রজা দু দলকেই ফাঁকি দেবে। এবং ইংরাজ কালেক্টররা তার কোনো প্রতিকার করতে পারবেন না। কারণ এই দেশী তহশীলদারদের কাছ থেকে হিসেব নিকেশ বুঝে নেবার মত শিক্ষা ও জ্ঞান ইংরাজ কালেক্টরের নেই। অতএব খাজনা যদি নিয়মমত ও নিয়মিত আদায় করতে হয়, তাহলে জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই শ্রেয়।

দ্বিতীয়। জমিদার, ভূম্যধিকারী কিম্বা টেক্স-কালেক্টর তা বলা অসম্ভব; কেননা Ownership বলতে ইংরাজ যা বোঝে, এ দেশের লোকে তা বোঝে না। আমরা সবাই জানি Austin-এর ভাষায় স্বত্বের অর্থ হচ্ছে :—

"A right over a determinate thing indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition, and unlimited in point of duration"

জমির উপর যে তাদের উক্তরূপ স্বত্ব আছে এ কথা সে কালে কোনো জমিদারও দাবী করেন নি। কেননা তাঁরা জানতেন যে, রায়তকে তাঁরা উচ্ছেদ করতে পারতেন না, রায়তি জমি খাস করতে পারতেন না, এবং বাঙলার নবাব ও দিল্লীর বাদশা এঁদের ভিতর যার খুসি তিনিই যখন-তখন জমিদারী জমিদারের গালে চড় মেরে কেড়ে নিতে পারতেন। যেমন জাফর খাঁ ওরফে মুরশিদ কুলি খাঁ কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙলার প্রাচীন ভূম্যধিকারীদের নির্ব্বংশ করে নূতন জমিদারের দল সৃষ্টি করেছিলেন।

এ অবস্থায় কোম্পানীর কর্ত্তাব্যক্তিরা স্থির করলেন যে জমিদারেরা যদি ভূম্যধিকারী নাও হয় ত, আইনত তাঁদের তা হতে হবে। তাঁদের ধারণা ছিল যে, সভ্যদেশে জমিদারের সঙ্গে প্রজার সেই সম্বন্ধ থাকা উচিত, সে-যুগে English landlord-দের সঙ্গে Irish tenant-দের যে সম্বন্ধ ছিল। এস্থলে Sir John Shore-এর মত উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"The most cursory observation shows the situation of things in this country to be *singularly confused.* The relation of a zemindar to government, and of a ryot to government, and of a ryot to a zemindar is neither that of a proprietor nor of a vassal, but a compound of both. The former performs acts of authority unconnected with proprietory right—the latter has rights without real property. Much time will, I fear, elapse before we can establish a system, perfectly consistent in all its parts, and before we can reduce the compound relation of a zemindar to government, and of a ryot to a zemindar to the simple principles of landlord and tenant. Fifth Report Vol. II, p. 520".

এই উদ্ধৃত বাক্য ক'টির বাঙলায় অনুবাদ করবার সাধ্য আমার নেই, কেননা কি বাঙলা কি সংস্কৃত এ দুই ভাষাতে এমন কোন শব্দ নেই যা ইংরাজি real property-র প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের ভাষায় ও-শব্দ নেই, কেননা আমাদের দেশে ও-বস্তু কস্মিন কালেও ছিল না।

Shore সাহেবের কথাই প্রমাণ যে, এদেশের জমিদারের সঙ্গে এদেশের রায়তের সম্বন্ধ তাঁর কাছে বড়ই গোলমেলে লেগেছিল। কাজেই যা গোল তাকে তিনি চৌকোশ করবার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি অবশ্য এ পরিবর্ত্তন রয়ে-বসে করতে চেয়েছিলেন। Lord Cornwallis-এর কিন্তু আর তর সইল না। তিনি আইনের ঠুকঠাকের বদলে একঘায়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসলেন। ফলে বাঙলার প্রজা বাঙলার জমির উপর তার চিরকেলে সত্ব-স্বামীত্ব সব হারালে, আর রাতারাতি বাঙলার জমির নির্ব্যূঢ় সত্বাধিকারী জমিদার নামক এক শ্রেণীর লোক জন্মলাভ করলে।

Lord Cornwallis যদি অত তাড়াহুড়ো করে চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত না করে বসতেন, তাহলে রায়তের peasant proprietorship নষ্ট হত না। কারণ রাজা প্রজার যে সম্বন্ধ সে কালের ইংরাজদের বুদ্ধির অগম্য ছিল, কালক্রমে তার মর্ম তাঁরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। আজ প্রায় দেড়শ বৎসর ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অভ্যস্ত হয়ে আমা-দেরও মনে এই ধারণা জন্মেছে যে রায়তের আর যাই থাক জমির উপর কোনোরূপ মালিকীসত্ব নেই এবং পূর্ব্বেও ছিল না, লোকের এই ভুল ভাঙানো দরকার।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় অতঃ-পর কি বলিতেছেন, তাহাও শুনুন। তিনি বলিতেছেন—

"এখনই দেখা যাক এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির উপর প্রজার সত্ব চিরস্থায়ী হ'ল কিম্বা একদম কেঁচে গেল।

প্রজার যে ভিটে ও মাটী দুয়ের ই উপর কিছু সত্ব ছিল, সে সত্য Sir John Shore প্রভৃতি সকলেই আবিষ্কার করেছিলেন। এবং সেই আবিষ্কারের ফলেই না তাঁদের মনে অতটা ধোঁকা লেগেছিল! একই জমির উপর জমি-দার ও রায়ত—উভয়েরি যে একযোগে সত্ব স্বামীত্ব কি করে থাকতে পারে, এ ব্যাপার তাঁদের ধারণার বহির্ভূত ছিল। কেননা, কি Roman Law, কি বিলাতের Common Law—এ-দুয়ের কোনোটির সঙ্গেই এ ব্যাপার মেলে না। ফলে যে সম্বন্ধ ছিল মিশ্র, তাকে তাঁরা শুদ্ধ করতে চাইলেন। ভারতবর্ষের মাটীর এমনি গুণ যে, সে মাটী যে মাড়ায় সে-ই শুদ্ধিবাতিকগ্রস্ত হয়ে ওঠে।

প্রজা এখনো যেমন, তখনো তেমনি, প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল,—খোদকস্ত আর পাইকস্ত। যে প্রজার বাস্ত ও ক্ষেত দু-ই এক গ্রামস্থ, তার নাম খোদকস্ত প্রজা; আর ভিন্ন গ্রামের লোক যে-ক্ষেত্রে ঠিকে বন্দোবস্তে সুরতজমি চাষ করে তার নাম পাইকস্ত। বলা বাহুল্য যে, প্রজাসত্ব শুধু খোদকস্ত প্রজারই ছিল, কেননা পাইকস্ত প্রজার উপর জমিদারের যেমন কোনোরূপ স্বামীত্ব ছিল না, জমির উপর তারও তেমনি কোনোরূপ সত্ব ছিল না।

সে কালের প্রজাসত্বের মোটামুটি ফর্দ্দ এই।—

(১) প্রজাকে উচ্ছেদ করবার অধিকার জমিদারের ছিল না, অর্থাৎ—তার জোত ছিল দখলীসত্ববিশিষ্ট।

(২) সে জোত পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করবার অধিকার খোদকস্ত রায়তমাত্রেরই ছিল। আর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করবার সত্ব যে মালিকীসত্ব, এ বিষয়ে Privy Council-এর নজির আছে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জোত হস্তান্তর করবার অধিকার প্রজামাত্রেরই ছিল। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, সেকালে জমি হস্তান্তর করবার সুযোগ ও প্রয়োজন—এ দুয়েরি বিশেষ অভাব ছিল। প্রজার তুলনায় জমির পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, জমিদারেরা নামমাত্র নিরিখে পাইকস্ত প্রজাকে দিয়ে জমি চাষ করাতেন।

(৩) জমাবৃদ্ধি করবার অধিকার জমিদারের ছিল না। এর একটি প্রমাণ এই যে, বাংলার কোনো নবাবই আসল জমা কখনো বাড়ান নি। আসল জমা স্থির রেখে আবয়াব বাড়ানোই ছিল তাঁদের মামুলি দস্তর। রাজার প্রাপ্য ছিল প্রজার উৎপন্ন ফসলের একটি অংশমাত্র; সে অংশের হ্রাসবৃদ্ধি করবার অধিকার রাজারও ছিল না।

খালি বাংলার প্রজা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রজা এই সকল সত্বে সত্ববান ছিল। প্রমাণ স্বরূপ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম এ, পি-আর-এস মহাশয়ের "পেশবাদিগের রাজ্য-শাসন-পদ্ধতি" নামক প্রবন্ধ কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।—

"মারাঠি পল্লীর চাষীদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—মিরাসদার বা মিরাসী (খোদকস্ত) ও উপরি (পাই-কস্ত)। মিরাসীরা গ্রামেরই লোক, গ্রামের জমি চাষ করিত। সে জমিতে তাহাদের একটি স্থায়ী স্বত্ব থাকিত। খাজনা বাকী না ফেলিলে কাহারও অধিকার ছিল না যে তাহাদের জমি কাড়িয়া লয়। বাকী খাজানার দায়ে জমি হস্তান্তর হইলেও কিন্তু তাহাতে মিরা-সীর সত্ব একেবারে লুপ্ত হইত না। ৩০।৪০ এমন কি ৬০ বৎসর পরেও বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিলেই, মিরাসী তাহার জমি ফিরিয়া পাইত। * * * * *

* মিরাসীরা গ্রাম প্রতিষ্ঠাতাদিগেরই বংশধর। মনুর বিধান অনুসারে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরাই গ্রাম্য জমির মালিকীস্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন। *

অবশ্য সরকারের বার্ষিক কর প্রত্যেক গ্রামসমিতির [illegible] ও প্রথম দেয়। এই করের হার সরকারের কর্মচারীরা

"পাটীলের" (মণ্ডল) সঙ্গে একত্র হইয়া গ্রামের জমি ও চাষের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া স্থির করিতেন—" (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩২৬, পৃ: ৪১১)।

এককথায় সেকালে জমির অধিকারী ছিল প্রজা, আর তার উপসত্বের আংশিক অধিকারী ছিলেন রাজা। জমিদার এই রাজস্বেরই এক অংশ পেতেন, তিনি ছিলেন ইংরাজিতে যাকে বলে টেক্স কালেক্টর, অর্থাৎ—জমিদার আইনের বদলে আদায়ের উপর কমিসন পেতেন, আজও যেমন অনেক জমিদারীতে তহশীলদারেরা পেয়ে থাকে। তফাতের মধ্যে এইটুকু যে, একালে তহশিলদারেরা শতকরা পাঁচ টাকা হারে কমিশন পায়, সেকালে জমিদারেরা দশ টাকা হারে পেত।

জন কোম্পানী কিন্তু এদেশের জমিদার রায়তের মিশ্র সম্বন্ধকে শুদ্ধ করলেন—এই সম্বন্ধ উল্টে ফেলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে জমিদার হলেন বাংলার মাটীর সত্বাধিকারী, আর প্রজা হল তার উপসত্বের আংশিক অধিকারী।

কিন্তু এ পরিবর্ত্তন কোম্পানীর বড়-কর্ত্তারা সচ্ছন্দ চিত্তে করেন নি। এ ভয় তাঁহাদেরও হয়েছিল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বলে জমিদার প্রজার ভক্ষক না হয়ে ওঠেন। অতএব সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের রক্ষার ব্যবস্থাও যে করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত ছিলেন। এখানে আমি শুধু দুটি লোকের মত উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, প্রথম Francis সাহেবের, তারপর Lord Cornwallis-এর; কারণ এঁদের একজন হচ্ছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জনক, আর একজন তার জননী।

Mr Francis proposed, that it should be made an indispensable "condition with the zeminder, that in the course of a stated time, he shall grant new pattahs to his tenants either on the same footing with his own quit rents, that is as long as the zeminder's quit rent remains the same, or for a term of years, as they may agree—"

Francis সাহেবের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে Shore সাহেবের মন্তব্য হচ্ছে এই :—

"The former is the custom of the country, this will become a new *Assil jumma* for each ryot, and ought to be as sacred as the zeminder's quit rent—"(Fifth Report, Vol. II, p. 88).

এখন Lord Cornwallis-এর কথা শোনা যাক্।—

"Unless we suppose the ryots to be absolute slaves of zeminder's :—every '*begha* of land possessed by them, must have been cultivated under an express or implied agreement, that a certain sum should be paid for each *begha* of produce and no more—"

(Fifth Report Vol. II, p. 532).

সুতরাং দেখা গেল যে, প্রজা আজ যে-সকল সত্বের দাবী করছে, সে-সকল সত্ব প্রজার যে মান্ধাতার আমল থেকে ছিল, এ সত্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্মদাতারাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এবং শুধু স্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, প্রজার ওই সব মামুলি সত্ব যে তাঁরা আইনত রক্ষা করিবেন, এ প্রতিজ্ঞাও তাঁরা উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই লিপিবদ্ধ করেছেন—"It being the duty of the ruling power to protect all classes of people, and more particularly those who from their situation are most helpless, the Governor-General in Council will, whenever he may deem it proper, enact such regulations as he may think necessary for the protection and welfare of the dependent, raiyats and other cultivators of the soil.—"

(*Vide.* cl. I, s. 8. rig. I of 1793)

দুঃখের বিষয় এই যে, এ প্রতিজ্ঞা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোটেই পালন করেন নি; যদিচ রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পার্লেমেণ্টারি কমিটিকে কোম্পানী বাহাদুরের এই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

কোম্পানীর আমল শেষ হয়ে যখন মহারাণীর আমল সুরু হল, তখন উক্ত আইনের ৮ ধারার আশ্রয়ে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের দশ আইন পাশ করা হল। এই হচ্ছে Tenancy



মিশরের 'পিরামিড ও স্ফিংস'এর সম্মুখে

উষ্ট্র-পৃষ্ঠে কাপ্তেন রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, আই-এম-এস ও গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে কাপ্তেন কারিগাট্, আই-এম্-এস্।

By Courtesy of St. Rabindranath Chaudhuri — Blocks by Bharatvarsha Halftone Works

Actএর প্রথম সংস্করণ। এই আইন অবশ্য কালক্রমে অনেক পরিমাণে সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে।' তা সত্বেও এ আইনের 'প্রসাদে' যে, শুধু মামলা বেড়েছে তার কারণ, ইংরাজিতে যাকে বলে half-measures; অর্থাৎ আধা-খেঁচড়া ব্যবস্থা, তার ফলে শুধু নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি হয়।

আজকের দিনে প্রজার সকল দাবী আইনত গ্রাহ্য হলে, প্রজা যে হাঁফছেড়ে বাঁচবে, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই এবং জমিদারবর্গের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন এ বিষয়ে প্রজার প্রতিপক্ষ না হন। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, আজকের দিনে কেউ তা বলতে পারে না। তবে একথা ভরসা করে বলা যায় যে, গত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় সকল সমাজের, কি আর্থিক কি রাজনৈতিক, সকল ব্যবস্থারই গোড়া আলগা হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা যদি আগে থাকতেই সমাজের নতুন ঘর বাঁধতে সুরু না করি, তাহলে দু'দিন বাদে হয়ত দেখতে পাব যে আমাদের মাথা গুঁজবার আর স্থান নেই, আমরা সব রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারদের সম্বোধন করে বলেছিলেন :—

'তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার গুণে নহে, অন্য যে নীচকুলে জন্মিয়াছে সেও তাহার দোষ নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না, মনে থাকে যেন সে তোমারই ভাই-তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ এবং তাঁহার ভ্রাতা—'

তিনি আরও বলেন যে :—'এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলিবে—'

বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ বিধির কথা বলেছিলেন জানো?—ইংরাজিতে যাকে বলে Communal property। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, ইতিমধ্যে আমরা যদি বাঙলার প্রজাকে peasant proprietor না করি তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হতে আর বড় বেশি দিন লাগবে না। আশা করি এ প্রবন্ধ পড়ে কেউ মনে করবেন না যে, আমি সাম্প্রদায়িক বিবাদের সূত্রপাত করেছি। সাম্প্রদায়িক বিরোধ হতে বাঙালী সমাজকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে রায়তের সঙ্গে জমিদারের co-operationএর যে প্রয়োজন আছে, এই হচ্ছে আমার আসল বক্তব্য।"

———

স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু রায় বাহাদুর মহাশয় 'আবগারী' পত্রে আমাদের দেশের মাদকদ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চুনীবাবু মাদকদ্রব্য-ব্যবহার বিরোধী সভার একজন প্রধান সদস্য। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারিলাম যে, তাঁহাদের চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য যাহারা আবেদন করিবে, তাহাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিধারী ব্যক্তিগণের আবেদন সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হইবে। এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই যে, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি মদ গাঁজা আফিমের দোকানের লাইসেন্স গ্রহণ করেন, তাহা হইলে মাদকদ্রব্য ব্যবহার কমিয়া না যাক, উক্ত ব্যবসায়ে কোন প্রকার তঞ্চকতা বা বে-আইনি কাজ হইবে না, চাই কি মাত্রামাত্রাও খানিকটা কমিতে পারে। এই জন্য বিগত দুই বৎসরে এবং এখন পর্যন্ত এই কলিকাতা সহরে বারো জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ভদ্রযুবক মদ বিক্রয়ের লাইসেন্স লইয়া কারবার চালাইতেছেন। ইহার মধ্যে ছয় জন বি এ ও বি-এসসি; আর ছয় জন এম এ ও এম এসসি। তাহার মধ্যে এক ভদ্রলোক এই ব্যবসায় চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার কোন একটা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করিতেন। এ সম্বন্ধে সংবাদপত্র-সমূহে কিছুদিন পূর্ব্বে আন্দোলনও হইয়াছিল।

———

এই প্রকার শিক্ষিত লোকসকল এই ব্যবসায় অবলম্বন করার কি ফল হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চুনীলাল বাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি বলিতেছেন—'I may be permitted to observe that the adoption of this trade by the present batch of our educated young men hardly be attributed to any desire on their part of minimising the evil of the drink and drug-habit among their countrymen, by strictly carrying out the regulations of the Excise

Act. It appears from information at our disposal that the main reason for their taking up this trade is to make a maximum profit out of a minimum capital.'

উপরি উদ্ধৃত অংশের মর্ম্ম এই যে, শ্রীযুক্ত চুণীবাবু অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, উচ্চ উপাধিধারী যুবকগণ 'এই ব্যবসায় অবলম্বন করায় যে আবগারী আইনের বিধানগুলি যথাযথ পালন জনিত মাদকদ্রব্য ব্যবহার কম হইয়াছে,' ইহা তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। যাঁহারা ব্যবসায় করিতেছেন, তাঁহাদেরও সে উদ্দেশ্য নহে; কয়েকজন উচ্চ উপাধিধারী মাদক-ব্যবসায়ী যুবক ত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তাঁহারা অল্প মূলধনে বেশী লাভ পাইবার জন্যই এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। একজন বলিয়াছেন—"I have taken to this sort of living purely from the business point of view, because it enables me to draw the maximum profit with a minimum capital." অর্থাৎ তিনি বলিতেছেন যে, তিনি ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এ কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কারণ তিনি দেখিতে পাইতেছেন যে, এ ব্যবসায়ে অল্প পুঁজিতে বেশী লাভ হয়।

অতএব, দেখা গেল যে, ভূত ছাড়াইবার জন্য সরিষার আমদানি করা হইয়াছে; কিন্তু সরিষা তাহাতে একেবারেই গররাজী; সে ভূত ছাড়াইতে আসে নাই; সে তৈল সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে; সুতরাং এ ব্যবস্থায় ভূত ত ছাড়িবেই না, এখন ভূতের উপদ্রব আরও না বাড়িলেই মঙ্গল। শ্রীযুক্ত চুণীলালবাবু বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতেছেন যে, বিগত বর্ষে মাদকদ্রব্য ব্যবহার ত কমে নাই। দশ টাকা মণ চাউল, ছয় টাকা জোড়া বস্ত্রেও যখন মাদকদ্রব্য ব্যবহার কমিল না, তখন আর কি করা যায়?

থাকুক ও সব দুঃখের কথা। সুখের কথাও আমাদের বলিবার আছে। আমরা বাঙ্গালী; আমাদের পূর্ব্ব-গৌরবের কথা না হয় নাই বলিলাম; ইতিহাসের কথা না হয় নাই তুলিলাম। বর্ত্তমানেও আমাদের সুখের কথা আছে,—এই ভাত-কাপড়ের মহার্ঘ্যতার মধ্যেও আমাদের গর্ব্বের কথা আছে। এই বর্ত্তমান সময়েই—এই সে দিনও আমাদেরই ঘরে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর এখনও আমাদেরই ঘর আলো করিয়া আছেন রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র;—এখনও দেখাইতে পারি আমাদের সুরেন্দ্রনাথ, আমাদের সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন আমাদের ভূপেন্দ্রনাথ। সুধুই কি তাই। এই যে জ্যোতিষ্মান নক্ষত্রগুলি আমাদের বাঙ্গালার আকাশে উদিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীময় আলোক বিতরণ করিতেছেন, ইহাঁদের অন্তর্ধানের পরই যে বাঙ্গালার আকাশ অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন হইবে, তাহা কেহই মনে করিবেন না। এই সকল মহাত্মার শিষ্যেরাও বড় কম যাইবেন না। তাহার প্রমাণ আমরা পাইতেছি। অন্য বিষয়ের কথা বলিব না;—আমাদের সার প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্যেরা যে গুরুর উপরে উঠিয়া যাইবেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের দুই চারিজনের নাম করিতেছি। প্রথমেই নাম করিব ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের। তাহার 'Dilution Law' এখন পৃথিবীর রাসায়নিক সমাজে 'Ghosh's Law' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সার প্রফুল্লচন্দ্রের আর এক শিষ্যের নাম ডাক্তার নীলরতন ধর। ইহার সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত জার্ম্মাণ রাসায়নিক পণ্ডিত অধ্যাপক ব্রেডিক্ (Bredig) বলিয়াছেন 'Of all things the fact remains prominent that you are the master of a great and distinguished branch of knowledge." তাহার পর ডাক্তার রসিকলাল দত্ত, অধ্যাপক ক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ীর নাম আমরা গর্ব্বভরে উল্লেখ করিতে পারি। তারপর বিজ্ঞান-কলেজের রসায়নাগারে, সার জগদীশের মন্দিরে আরও কত সাধক নির্জ্জনে সাধনা করিতেছেন। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহাদের নাম বিশ্ব-সভায় ধ্বনিত হইবে।

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

গত চৈত্র মাসের "প্রবাসী"তে "অন্ন-সমস্যা" প্রবন্ধের তৃতীয় স্তবকে শ্রদ্ধেয় সার শ্রীযুক্ত পি, সি, রায় মহাশয় Poultry farmএর উল্লেখ করেছেন। এটা খুব লাভের ব্যবসা। Poultry farmএর কল্পনা অনেক দিন ধরে আমার মাথায় গজ্‌গজ্‌ কর্চ্চে। বোধ হয় কোন না কোন খবরের কাগজে এ সম্বন্ধে একবার আমি কিছু আলোচনাও করেছি। তা যদি নাও করে থাকি, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এই বিষয়টা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। বোধ হয় 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গেও এ বিষয় নিয়ে একবার আলাপ হয়ে থাকবে। আজ 'ভারতবর্ষে'র পাঠকদের কাছে এ বিষয়ে একটু ইঙ্গিত করে রাখি।

ব্যবসাটি লাভের বটে, কিন্তু যে সে এই ব্যবসা করতে পারবেন না। বেশ শক্ত-সমর্থ সাহসী, বলবান যুবক কিছু মূলধন যোগাড় করতে পারলে এই ব্যবসায়ে হাত দিতে পারেন। এ ব্যবসায়ের গোড়াতে কিছু মূলধন চাই; একেবারে বিনা মূলধনে এ ব্যবসায় হতে পারে না। শুনেছি, মফস্বলের কোন ধনী জমিদার—বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভার একজন মাননীয় সদস্য একবার পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে এই ব্যবসায়ে নেমেছিলেন। কিন্তু তার ফলাফল কি হ'ল, সে খবর পাই নি। যাক্ বড়লোকের বড় কথায় আমাদের কাজ নাই। আমি যে রকম ধরণে এই ব্যবসায় করবার মতলব দিতে চাই, তাতে অত মূলধন দরকার হয় না; তবে কিছু মূলধন চাই বটে। সেটা কত, তা' পাঠকেরা নিজেরা অনুমানে হিসেব করে নেবেন।

কলিকাতার কাছাকাছি একটা বড় বাগান জমা নিতে হবে। বাগানটা বেশ বড় হলেই ভাল হয়। অন্ততঃ ১০০ বিঘে জমি থাকলে চলবে। বাগানের চারদিক বেশ পাকা পাঁচীল দিয়ে ঘেরা হওয়া চাই। পাঁচীল দিয়ে ঘিরে নেওয়া যদি সম্ভব না হয়, অন্ততঃ, খুব শক্ত বেড়া দেওয়া চাই। যেন ভেড়া, ছাগল, হাঁস, মুরগীরা পালিয়ে না যেতে পারে; কিম্বা বাইরে থেকে শেয়াল কি চোর ডাকাত বেড়া ভেঙ্গে বাগানে ঢুকতে না পারে। এত বড় বাগান ঘিরে নেওয়ার খরচটাই সবচেয়ে বেশী। আর তা' না নিলেও চলবে না; কেন না, জীবজন্তুগুলা পালিয়ে গেলে ত লোকসান আছেই; আর এ রকম স্থলে শেয়ালের আর চোরের উপদ্রব হবেই। গোড়ায় সাবধান না হলে এ ব্যবসায় চলবে না।

বাগানটি ঘিরে নেওয়া হলে, তার পর, বাগানের সব জায়গায় যাওয়া যায় এমন ভাবে রাস্তা তৈরী করে নিতে হবে। পাকা রাস্তা হলে ভালই হয়; নিদেন পক্ষে কাঁচা রাস্তা। ক্রমে ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পাকা করে নিলেও চলবে। রাস্তাগুলি এমন ভাবে তৈরী করতে হবে, যে বাগানটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

তার পর বাগানের এক কোণে গুটি চারেক কি পাঁচ ছটি পাকা পায়খানা তৈরী করতে হবে। পায়খানা ফ্লোরের উপর হবে। নীচের ফোকরগুলো বাইরের দিকে একদম বন্ধ থাকবে। আর পায়খানা করবার দরজা দুইতিনটা বাগানের ভিতরের দিকে, আর দুইতিনটা বাইরের দিকে হবে। ভিতরের দরজা দিয়ে বাগানের লোকেরা পাইখানা সরবে; আর বাইরের দিকের দরজা দিয়ে পাড়া প্রতিবাসীরা সরবে। পাকা পাইখানা পেলে তারা খুব বর্তে যাবে; একবার তাদের অনুমতি দিলেই হল।

বাগানের একটা বড় ফটক, আর দুই-একটা ছোট দরজা থাকবে। ফটকের কাছে দেউড়ী হবে। সেখানে একজন কি দু'জন দরওয়ান থাকবে। বাইরের লোক হঠাৎ বাগানের ভেতর না ঢোকে, কি বাগানের চাকররা কোন পশু নিয়ে বেরিয়ে না যায়—দরওয়ানরা তার খবরদারী করবার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা দেউড়ীতে হাজির থাকবে।

বাগানের মাঝখান বরাবর ব্যবসায়ের মালিকদের আপিস ঘর আর থাকবার বাড়ী তৈরী করতে হবে। যিনি বা যাঁরা এই ব্যবসা করবেন,—তাঁদের চব্বিশ ঘণ্টা বাগানে

থাকতে হবে। না থাকলে জীবজন্তু রক্ষা করা কঠিন হবে।

পাইখানার খুব কাছে,—একেবারে ধারেই খানিকটা জমি বাগানের সাধারণ জমি থেকে কিছু নীচু হবে। দেড় কি দু'হাত নীচু হলেই চলবে। এখানে বর্ষাকালে জল জমে কাদা হয়ে থাকবে। আর অন্য সময়েও পুকুর থেকে পাম্পে করে জল তুলে জমিটিকে কাদা করে রাখতে হবে। এই জমিতে শূয়াররা কাদা মেখে বাস করবে। কাছেই তাদের খোঁয়াড় তৈরী করে দিতে হবে। ডোমদের ঘরও এইখানে হবে। পাইখানার কাছে এই রকম জমি তৈরী করবার মানে শূয়াররা ইচ্ছামত কাদা মাখতে পারবে, আর ফ্লোরের নীচে দিয়ে পাইখানার ভেতরে যেতে পারবে। এ ব্যবস্থা কেন, তা' সবাই বোধ করি বুঝতে পেরেছেন।

এইখানে প্রথমে গোটা তুত্তিন বেশ তেজাল শূয়ার, আর গোটা-পাঁচ ছয় শূয়ারী থাকবে। এই শূয়ারদের বংশবৃদ্ধি খুব বেশী। কথায় বলে শূয়রের পাল বিয়োচ্ছে। এক একটা শূকরীর শুনেছি, এক এক বিয়ানে ৩০।৪০টা করে বাচ্চা হয়। যত্নে রাখলে,—মরে না গেলে, এই শূয়ারের বাচ্চাগুলো দেখতে দেখতে অসংখ্য হয়ে পড়বে। কাজেই বলতে হবে, এরাই এই ব্যবসার প্রধান stock।

শূয়ারের ব্যবস্থা এই রকম হল। তার পর, মালিকের বাসার কাছে কতকগুলো পাকা ঘর তৈরী করতে হবে, যাতে হাঁস, মুরগী, পায়রা, ভেড়া, ছাগল থাকবে। তার কাছে ক্রমে ক্রমে দুই একটা গোয়ালঘর তৈরী করে দিতে হবে। এই সব জন্তুর ঘর পাকা করবার মানে চুরি নিবারণ। সন্ধ্যার একটু আগে—৪।৫টার সময়ে ডোমেদের দিয়ে, শূয়ার বাদে অন্য জন্তুগুলোকে তাড়িয়ে এনে, ঘরে পুরে চাবি দিয়ে, মালিক নিজের কাছে চাবি রাখবেন; আর সকাল বেলা চাবি খুলে বের করে দেবেন। রোজ সকাল বেলা গুণে বের করে দেবেন, আর সন্ধ্যার সময় গুণে তুলে রাখবেন।

জন-চার-পাঁচ ডোম মাইনে দিয়ে রাখতে হবে। জন্তুদের তদারক করা আর তাদের খাবার বন্দোবস্ত করা ডোমেদের কাজ। প্রত্যেক ডোমকে একটা করে বাঁক, আর দুটো করে কেরোসিনের টীন দিতে হবে। তারা সকাল বেলা খেয়ে দেয়ে বাঁক কাঁধে করে বেরুবে, সমস্ত দিন সহরে ঘুরে বেড়াবে, সন্ধ্যের আগে ফিরে আসবে। খালি টীন নিয়ে বেরুবে, ভর্ত্তি টীন নিয়ে ফিরবে। সহরের বাড়ীগুলোর আঁস্তাকুড় থেকে, বিশেষতঃ স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মেস, হোষ্টেল, অফিসারদের মেস—এই সব বাড়ীর আঁস্তাকুড়ে রোজ অনেক ভাত ডাল তরকারী ফেলা যায় (এমন দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্টের সময়েও! কেন না, এই শ্রেণীর লোকদের অন্নের উপর কিছুমাত্র মায়া নেই!) ডোমেরা এই সব আস্তাকুড় থেকে ভাত ডাল কুড়িয়ে কেরোসিনের টীন ভর্ত্তি করে নিয়ে আসবে। সেই ভাত তরকারী ডাল ভেড়া, ছাগল, হাঁস, মুরগী, শূয়ার—সকলেই খাবে। গরু যখন পোষা হবে, তখন তারাও খেতে পারবে। ডোমেদের যে মাসে মাসে আট ন'টাকা মাইনে দিতে হবে, এই ভাত ডাল তরকারী সংগ্রহ করাতেই সেটা পুষিয়ে যাবে। তার উপর তারা জন্তুদের যে তদারক করবে, সেটা ফাউ।

দুটো ভেড়া, পাঁচটা ভেড়ী, দুটো ছাগল, পাঁচ ছটা ছাগী, গোটা দু'তিন মোরগ মুরগী (চট্টগ্রাম অঞ্চলের মোরগ-মুরগী খুব তেজী আর বলবান, আকারেও খুব বড়, দামও বেশী—তাদের বাচ্চাগুলো বেশ দামে বিক্রী হবে), বেশ হৃষ্টপুষ্ট গোটা কতক হাঁস (মাদী ও নর) সংগ্রহ করতে হবে। কাজ আরম্ভ করবার জন্যে প্রথমে বৈঠকখানার হাটে, কি হাবড়ার হাটে, কি মেটেবুরুজ না কোথাকার হাটে—যেখানে অনেক পশুপক্ষী বিক্রীর জন্য আসে—এই সব জানোয়ার কিনলে চলবে। তার পর যেখানে যে জন্তু খুব সতেজ আর উৎকৃষ্ট পাওয়া যায়, তার সন্ধান করে, ক্রমে-ক্রমে সংগ্রহ করতে হবে।

বাগানে গোটা দু'তিন পুকুর থাকা চাই। একটা খুব বড় হবে; তাতে বড় মাছের চাষ হবে; আর একটা খুব ছোট; তাতে পোনা ছাড়তে হবে; আর একটা মাঝারি; পোনাগুলো একটু বড় হলে (২ ইঞ্চি কি তিন ইঞ্চি) ছোট পুকুর থেকে তুলে মাঝারি পুকুরে রাখতে হবে। এরা আবার আর একটু বড় (অর্থাৎ বিঘৎ খানেক) হলে তাদের বড় পুকুরে ছাড়তে হবে। সেখানে তারা বাড়তে থাকবে। এই বড় পুকুরে হাঁস চরবে। ছোট দুটো পুকুরে হাঁস চরতে দিলে,

তারা মাছের পোনা খেয়ে ফেলবে। দুই এক যোড়া রাজ হাঁস থাকলেও মন্দ হয় না। পুকুরের চার-দিকে কলাগাছ লাগাতে হবে।

রাস্তা তৈরী করবার সময় বাগানটা কতকগুলো ভাগ হয়ে যাবে বলেছি। এই রকম দু'তিনটে প্লট আলাদা করে রাখতে হবে; সেখানে কেবল ঘাসের চাষ হবে। ভেড়া-ছাগলরা এই প্লটগুলোতে সমস্ত দিন চরে বেড়াবে। এক-একটা প্লট এই রকমে দিন-কতক ভেড়া-ছাগলদের চরবার জন্যে রেখে আবার বদলে দিতে হবে। যে মাঠে ভেড়া-ছাগল চরে, সেখানে তাদের মলমূত্র জমির খুব তেজাল সারের কাজ করে। এক-একটা প্লট এই রকমে সারের তেজে খুব উর্ব্বর হয়ে উঠলে, সেখানে ভেড়া ছাগল চরা বন্ধ করে, অন্য প্লটে তাদের চরবার ব্যবস্থা করতে হবে; আর এই প্লটটাতে অন্য ফসলের চাষ হবে। এতে যে জিনিসেরই চাষ হবে, সে ফসলটা খুব উৎকৃষ্ট হবে, তা বলা বাহুল্য।

বাকী জমিগুলার খানিকটা হবে ফুল বাগান। এখানে ফুলের চাষ হবে। ইচ্ছে করলে এ থেকেও কিছু কামানো যেতে পারে। আর তা' না হলেও হানি নেই। ফুলগুলা বাগানের এবং কারবারের মালিকদের ব্যবহারে লেগে যেতে পারে; গাছে থেকেও বাগানের শোভা বর্দ্ধন করিতে পারে। ভেড়া ছাগল চরবার প্লটগুলো এমন ভাবে করা যেতে পারে, যেখানে বিকেলে রোদ পড়লে বাবুরা তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে টেনিস, ব্যাডমিণ্টন খেলতে পারেন; বেঞ্চে বসে হাওয়া খেতে পারেন; গুজব করতে পারেন।

আর গোটাকতক প্লটের কোনটাতে আলু, কোনটাতে টল, কোনটাতে বেগুন, কোনটাতে ঝিঙে, কোনটাতে ফুলের বড় পাঁ্যাজ রসুনের চাষ হতে পারবে। দুই-একটা ট বিশেষভাবে পালিত পশুপক্ষীদের খাদ্যের উপযোগী টকা ফসলের চাষের জন্যে রাখতে হবে; কেন না, তাদের ছু টাটকা ফসল স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে চাইই চাই। সেটা নতে গেলে বেশী পড়ে যাবে; বাগানে স্বচ্ছন্দে উৎপন্ন পারবে। এইখানে বলে রাখা আবশ্যক,—পশুদের স্থ্যর উপর খুব নজর রাখতে হবে। এখন বেলগেছের ভেটেরিনারী কলেজ থেকে অনেক ছাত্র পাশ কোরে বেরুচ্ছেন;—তাঁদের কাউকে মধ্যে মধ্যে কিছু কী দিয়ে এনে জীবজন্তুগুলোর স্বাস্থ্য কিসে ভাল থাকে, কিসে তারা তেজাল হয়ে খদ্দেরের মনোহরণ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। মোদ্দা কথা, এদের মধ্যে সংক্রামক রোগ মধ্যে-মধ্যে বড় প্রবল হয়। সে রকম হলে একটা পশুও বাঁচে না। এই জন্যে এ দিকে খুব খর নজর রাখতে হবে। এই বাগানে মালিকদের নিজেদের গৃহস্থালীর জন্যেও আনাজ-তরকারী উৎপন্ন হতে পারবে।

পুকুরে যে মাছের চাষ হবে, তা' পুকুর খাসে রেখে নিজেরাই মাছ বিক্রী করা যেতে পারে, জেলেদের জমাও দেওয়া যেতে পারে,—যিনি যেটা সুবিধা বুঝবেন তাই করতে পারেন।

প্রথম প্রথম কিছুদিন পশু বিক্রী করে কাজ নেই। দিন-কতক তাদের বংশবৃদ্ধি হোক। তখন বিক্রী করা যেতে পারবে। খদ্দেরের জন্যে ভাবতে হবে না। Sea-going ষ্টীমারগুলির provision contractorরা একবার সন্ধান পেলে হয়,—তারা এসে আপনার বাগানে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকবে। কণ্ট্রাক্টর না পাওয়া গেলে, জাহাজের মালিক কোম্পানী কিম্বা কাপ্তেনদের সঙ্গে directly কাজ করা যেতে পারে। বাজার-দরের চেয়ে সামান্য কিছু কমে মাল ছেড়ে দিলে লোকসান নেই, খদ্দেরেরও ভাবনা নেই।

ভেড়াদের খুব বংশবৃদ্ধি হলে, যখন অনেকগুলা ভেড়া জমবে, তখন বছরে দুবার তাহাদের লোম কেটে নিতে হবে। এই পশম কিছু জমলে বেশ দামে বিক্রী হবে। ভেড়া আর ছাগলদের যখন বাচ্চা হবে, তখন তাদের দুধ পাওয়া যাবে। সেটাও খুব দামী জিনিস। ভেড়া-ছাগলের ব্যবসা শুনে যেন নাক সেঁটকাবেন না। অষ্ট্রেলিয়ায় ভেড়া-ছাগলের ব্যবসা খুব মস্তবড় ব্যবসা। এটা ওদের একটা প্রধান সম্পত্তি। এখানেও এখনও অনেক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমানের এই সম্পত্তি আছে। ইহা উপেক্ষার ব্যবসা নয়। তার পর, একটু খোঁজ-খবর নিয়ে, যেখানে যে পশু ভাল জাতের পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করে, একটু পড়েশুনে এদের দৈহিক উন্নতি করতে পারলে ভালই হয়। Cross breeding টা ভাল করে শিখে নিতে পারলে, এদিকে খুব উন্নতি করতে পারবেন। দরকার হলে, চাই কি সরকারী কৃষি-বিভাগ (Agricultural Department) থেকে

অনেক পরামর্শ আর সাহায্য পেতে পারবেন। শিক্ষিত যুবকদের কাছে থেকে এটা আশা করলে অন্যায় হয় না।

তবে, হিন্দুর দিকে থেকে এই poultry and cattle Breeding farm করার বিরুদ্ধে একটা আপত্তি এই হতে পারে যে, হিন্দুরা যে জীবকে পোষেন, তাকে হত্যা করতে বা হত্যার জন্যে বিক্রী করতে কিছু কুণ্ঠিত হন। কিন্তু, একটু ভেবে দেখলে সে আপত্তি হতে পারে না। সোজাসুজি এই কথাটা বুঝে দেখতে হবে যে, আমরা যদি না করি, তা হলে অন্য লোকে করবে,—আমরা তা' নিবারণ করতে, কিম্বা তাতে বাধা দিতে পারব না। আর, দিনকাল বদলে গেছে; এখন আর ব্যবসায়ে জাত যাবার আপত্তি তেমন প্রবল হবার আশঙ্কা নাই। সেই জন্যেই এবার ভরসা করে এ ব্যবসাটায় ইঙ্গিত করে দিলুম। এখন করা না করা আপনাদের হাত।

এবার ইঙ্গিত লিখিতে বসিয়া আমার মনে খুব আহ্লাদ হইতেছে। ইঙ্গিত লেখা যে একেবারে ব্যর্থ হইতেছে না, ইহাই আমার আনন্দের কারণ। চট্টগ্রাম কক্সবাজার হইতে শ্রীযুক্ত অশোকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'বিশ্বকর্ম্মা'কে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, "আপনার Rubber solution ঠিক হইয়াছে। Rubber Cloth ও সঠিক প্রস্তুত করিয়াছি। জুতার তলার জন্য যে Paste Board তৈয়ারী করিয়াছি, তাহা উপযুক্ত কলের অভাবে শক্ত হয় নাই। আশা করি তাহাতেই কাজ চলিবে। এক-জোড়া বর্ম্মা-চটী তৈয়ারী করিয়া পরিতেছি। * * * *।"

আশা করি, "ইঙ্গিতের" অন্যান্য পাঠকগণের নিকট হইতেও এইরূপ প্রীতিকর পত্র পাইব।

হয় ত আরও অনেকে "ইঙ্গিতে" লিখিত suggestion গুলি লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। কেহ-কেহ হয় ত কৃতকার্য্যও হইয়াছেন; আবার অনেকে হয় ত অকৃত-কার্য্যও হইয়া থাকিতে পারেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর পাঠকগণের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, তাঁহারা নিরুৎসাহ হইবেন না; স্মরণ রাখিবেন, "Failure is but the beginning of Success."

টাইপিষ্ট

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ]

(ক)

সে বৎসর ইয়োরোপের মহারণের ডঙ্কার আওয়াজে ব্রেক্-জ (Break-jaw) কোম্পানীর কেরাণীবাবুদের ভাগ্য-সৌধ কাঁপিয়া উঠিল।

প্রথমতঃ বড়-সাহেব নোটিস্ দিলেন যে, কাজ-কর্ম্মের অসুবিধাহেতু আফিস-ষ্টাফের reduction হইবে। নোটিস পড়িয়াই লেজারবাবু বিনোদচন্দ্র কহিল, "এটা বড়বাবুর কারসাজী। আমাদের দলকে ছাঁটিয়া ফেল্‌তে তিনিই উদ্যোগী হ'য়েছেন, তা' বুঝেছ কমল?"

টাইপিষ্ট বাবু কমলকুমার উত্তর দিল, "হ'তে পারে। কিন্তু আমার চাকরী মারা শক্ত হ'বে, বিনুদা।"

বিনোদচন্দ্র অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"তা' আর বুঝলে না?" বলিয়া কমল দু'বার খটাখট করিয়া আওয়াজ করিল।

"কেন, তা' বুঝ্‌লাম না।"

"আরে, টাইপিষ্ট না হ'লে কি আফিস্ চলে? বরং বর না হ'লে বিয়ে হ'তে পারে,—স্বামী থাকলে বিধবা হ'তে পারে; কিন্তু দাদা, কৃষ্ণের যেমন বাঁশী চাই-ই চাই, তেমনি আফিসে টাইপিষ্ট চাই-ই চাই।"

ক্যাসবাবু বিপিনবিহারী কহিল, "আমার পক্ষেও তাই হে কমল! আমি সাড়ে ১১ হাজার জমা দিয়ে ৭৭ টাকার চাক্‌রী করি।" কমল তাহার কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার ভাবনা কি বিপিন। বড়বাবুর ডান-হাতের কব্জি তুমি, দাদা!"

এমন সময়ে বড়বাবুর বেহারা আসিয়া ক্যাস্‌বাবুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। বিপিন বড়বাবুর ঘরে যাইতেই বড়বাবু কহিলেন, "বিপিন, সাহেব reductionএর list (তালিকা) পাঠিয়ে দেছে। বাহিরে তুমি, হরেন ও সুরেন ছাড়া আর কেউ থাক্‌বে না। কমলবাবুর দলকে সেটা বুঝিয়ে দাওগে।"

মাসখানেক হইতে কমলের সহিত ঘনশ্যাম বাবুর একটু প্রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল। দোষটা কোন পক্ষের, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তবে কমলের দোষের মধ্যে সে তাহার হাস্য-কৌতুক দিয়া বড়বাবুর ভরাট্ গাম্ভীর্য্যকে বড়ই উপহাস্য করিয়া তুলিত। সে বড়-বাবুর নাম দিয়াছিল, "চিদ্‌ঘন" অর্থাৎ "মনের মেঘ।"

বিপিন লিষ্টখানি হাতে করিয়া বলিল, "বাঁচা যায়! ওরা ভাবে, আফিস ওদের না হ'লে চল্‌বে না।"

ঘনশ্যামবাবু হাসিয়া কহিলেন, "এইবার বুঝতে পারবে। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা বেশী দিন চলে না, বিপিন।"

বিপিন "তা'ত নিশ্চয়ই" বলিয়া listখানি হাতে করিয়া বাহিরে আসিল। তাহার হাতে অত বড় একখণ্ড কাগজ দেখিয়াই লেজারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটা কি হে, বিপিন?"

"আজ্ঞে, দেওয়ানী পরওয়ানা।"

"কি রকম? দেখি—" বলিয়া লেজারবাবু সেখানি নিজের হাতে টানিয়া লইয়া প্রথমেই নিজের নামটি দেখিয়াই শুকাইয়া উঠিলেন। কমল তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি, শুকিয়ে যাও যে বিন্‌দা। যুদ্ধে যেতে হ'বে না কি? Defence force এ, না বেঙ্গলী কোরে?"

বিনোদচন্দ্র একটু শুষ্ক স্বরে বলিল, "না, যুদ্ধে নয় হে। একেবারে হাস্‌পাতালে।"

"তাই না কি? দেখি—" বলিয়া কমল listখানি ক্যাস্‌বাবুর হাত হইতে কাড়িয়া লইল। তার পর সেখানি পড়িয়া চোখ্ বড় করিয়া বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, "এই যে, শ্রীমান্ কমলকুমার বাদ যায় নি। জয় চিদ্‌ঘন!" বলিয়াই সে আবার আওয়াজ বাহির করিল, "খটাখট্।"

বিপিন হাসিয়া বলিল, "ও কি হে কমল? অত স্ফূর্তি

"আর দাদা! চড়কের বাজনা বাজাচ্ছি। ড্যাং ড্যাং ছ্যাডাং ড্যাং।"

"সে কি?"

"কিছু না।" বলিয়াই কমলকুমার উঠিয়া একেবারে বড়-বাবুর ঘরে উপস্থিত হইল। বড়বাবু তখন অন্যমনস্ক হইয়া কি দেখিতেছিলেন; তাহাকে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সেদিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি চান কমলবাবু? কি খবর?"

কমল মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, খবর কমলের দুঃখ হয়েছে।"

"সে কি?"

"এই আর কি? পাত্রে প্রণয় নাস্তি, অপাত্রে প্রণয় আসক্তি। এ আফিসে থাক্‌তে আমার বাঞ্ছা জন্মাচ্ছে। টাইপ্ না হ'লে আফিস্ চল্‌বে কি ক'রে বড়বাবু?"

ঘনশ্যাম একটু গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "সে ভাব্‌না তোমার চেয়ে আমার বেশী। তোমার উপর যা হুকুম হ'য়েছে তাই করগে।"

"বটে! বটে!" বলিয়া কমল একটু হাসিল। তার পর বড়বাবুর দিকে চাহিয়া চোখ দুটি একবার বুজিল। শেষে সেখান হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

বিপিন একটু কটাক্ষপাত করিয়া তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া বলিল, "কি হ'ল হে?"

"এই থিয়েটারে যেতে হ'বে, তাই বড়বাবুকে বলতে গিছ্‌লাম।"

"কি থিয়েটার?"

"রাণী দুর্গাবতী। বড়বাবু সেটা বড় ভালবাসেন হে।"

"কেন হে?"

"বড়বাবু দুর্গাবতীকে ভালবাসেন হে। তাকে বিবাহ করেছেন।"

"তুমি কি ক'রে জান্‌লে?"

"সে আর জানতে কি? ঘনশ্যামের স্ত্রী যে চঞ্চল-হাসিনী হবে না, তা'র প্রমাণ ভূরি-ভূরি আছে। যেমন বিপিনের স্ত্রী পুঁটি বা টেঁপী ছাড়া আর কিছু হয় না।"

শুনিয়া বিপিনচন্দ্র চুপ করিল। লেজারবাবু একবার মুখ তুলিয়া কমলের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া ঈষৎ হাসিল মাত্র।

(খ)

কর্ম্মত্যাগের প্রায় তিন-চার দিন পরে কমল "ষ্টেট্‌স-ম্যানের" কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনের মধ্যে দেখিল যে, ব্রেক্-জ কোম্পানী একজন লেডী টাইপিষ্ট চাহিতেছেন। দেখিয়া সে একটু হাসিল।

সেখানি হাতে করিয়া কমল রাস্তায় বাহির হইল। সে জানিত, রোজ বিপিন তাহার বাড়ীর গলির মোড় দিয়া আফিসে যাতায়াত করিত। সে দাঁড়াইয়া বিপিনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। আফিসের লোক কেহ বা ট্রামে, কেহ বা হাঁটিয়া, কেহ আহারাদির পর চলার দরুণ উদরে ব্যথা অনুভব করিতে করিতে, কেহ তাড়াতাড়িতে নষ্ট টেরীকে শুধ্‌রাইতে-শুধ্‌রাইতে, ছুটিয়াছে। কমল দেখিয়া একটা আশ্বাস ও শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। তার পর অল্পক্ষণ বাদে দেখিল, বিপিন আসিতেছে।

বিপিন কমলকে দেখিয়া একটু বিদ্রূপ হাসিয়া বলিল, "ওহে কমল, আমাদের আফিসে লেডী-টাইপিষ্ট আসছে।"

কমল ব'লল, "তা' ত দেখ্‌ছি। তাই তোমার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে আছি।"

"কেন? আমি কি করবো?"

"তুমি যদি একটু অনুকূল থাক, তবে আমি ঘনশ্যামকে একবার বৃন্দাবনের ধেনু চরাই।"

"কি রকম করে হে?"

"সেটা পরে বুঝে নিও। তবে যদি আমাকে মেম দেখ্‌তে পাও, চম্‌কে উঠো না ভাই। এটা তোমায় বল্‌তে এলাম। আমি ঘনশ্যামের বুকে ব'সে চাক্‌রী করবো ব'লে।"

বিপিন শুনিয়া 'হো' 'হো' করিয়া হাসিয়া বলিল, "ও! তাই বুঝি! আচ্ছা, আমি কিছু বল্‌বো না। তুমি চেষ্টা কর। মজাটা মন্দ হবে না। এখন যাই ভাই, বেলা হ'য়ে গেল।"

বিপিন চলিয়া যাইতে, কমল তাহার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া আহারাদি সারিয়া লইল। তার পর জামা জুতা পরিয়া বাহির হইয়া গেল।

ধর্ম্মতলা-ষ্ট্রীট্ ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বিপিন একটি পেণ্টারের দোকান বাহির করিল। একজন মিশ্রাঙ্গ দোকানে বসিয়া ছিল;—সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই?" কমল একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিল, "সাহেব, তুমি আমাকে মেম সাজাতে পার্‌বে?"

"কেন?"

"থিয়েটার করতে হবে। রোমিও জুলিয়েট্ সাজ্‌বো। অবশ্য দুটোই একলা সাজ্‌বো না, কিম্বা তোমাকে রোমিও করবো না। তবে আমার একটা সাজ চাই। তাড়া দেবে?"

"তা দিতে পারবো না, বাবু। তুমি Suit কিনে আন, আমি তোমাকে মেম সাজিয়ে দিতে পারি। তবে Charge বেশী পড়বে।"

"কেন?"

"মেম ত আমি সাজাব না। আমার স্ত্রী তোমাকে সাজিয়ে দিতে পারে। তুমি সুট্ প'রে এস।"

"আচ্ছা" বলিয়া কমল সেখান হইতে উঠিয়া, চৌরঙ্গী Whiteaway Laidlaw কোম্পানী হইতে একটা মেমের সুট কিনিয়া আনিল। সেদিন আর সেই পেণ্টারের দোকানে গেল না। বাড়ীতে ফিরিয়া স্ত্রী সুচারুকে কহিল, "শুনছো, এইটা আমি যদি পরি, তবে আমাকে কেমন দেখায়?"

সুচারু হাসিয়া বলিল "গোঁফ-দাড়ি কি হবে?"

"সেটা বাদ দেব।"

"কি হবে তাতে শুনি।"

"থিয়েটারে সাজ্‌বো। অত চেঁচিও না; ও-ঘরে বাবা আছেন।"

(গ)

পরদিন সেই মিশ্রাঙ্গের দোকানে উপস্থিত হইয়া কমল তাহাকে বলিল, "সাহেব, এইবার এস। Romeo, Romeo! A suit for my Romeo!"

সাহেব একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "বাবু, এটা ত এ-কালের মেমের পোষাক। সে সময়কার ধরণে সাজা চাই ত?"

"কেন?"

"তা' না হ'লে স্বাভাবিক হবে না।"

"দূর করো তোমার স্বাভাবিক। আমি মডার্ণ রোমিও হ'ব, এরোপ্লেনে হনিমুন করবো, গোরে যাব না। সেক্সপীয়রের একটা দুঃখকে বাদে ফেলেছি। ...

[illegible]!" বলিয়াই কমল একখানি চেয়ারের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব সন্ত্রস্ত হইয়া কহিল, "বাবু বুঝেছি। এস, নেমে এস। তোমাকে মডার্ণ জুলিয়েট্ সাজাচ্ছি।" কমল তখন নামিয়া আসিল। সাহেব তাহাকে শীঘ্র-শীঘ্র বিদায় করিবার জন্য হাত চালাইয়া সাজাইতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ অতীত হইলে, কমল জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব, দাড়ি-গোঁফ কামিয়েছি। কিন্তু হাওয়া লাগ্‌লে রাস্তায় আবার গজাবে না ত'?"

সাহেব গাউনের ভাঁজ খুলিতে-খুলিতে বলিল, "রাত্রে তা' কেউ বুঝ্‌তে পারবে না।"

"দিনে?"

"দিনে একটু দেখা যেতে পারে বাবু!"

"সে কি? তা' হ'লে যে সব পণ্ড। সাহেব তোমার লোমনাশক লোসন্ আছে।"

"আছে বাবু, তবে তা' দিলে আর গোঁফ উঠ্‌বে না। সেটা ভাল হবে না।"

কমল একটু ম্লান ভাবে বলিল, "না, তা হবে না।"

তার পর সাহেব মাথায় পরচুলা ঠিক করিয়া দিয়া টুপী বসাইয়া দিল। মাথায় হাত দিয়া কমল তখন জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব, সব ত' হ'ল। কিন্তু তোমাকে আরও একটু কাজ কর্‌তে হ'বে।"

"কি?"

"মেয়ের চলন্ ও কথা-বলার ধরণটা আমাকে শিখাতে হবে।"

"কেন বাবু?"

"আরে, তা' না হ'লে audience যে বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

"তবে বাবু, তোমাকে কিছু বেশী charge দিতে হ'বে। আর তুমি অপেক্ষা কর, আমার মেম আসুক। সে আমার চেয়ে ভাল করে তোমাকে শিখাতে পার্‌বে।"

"তার আস্‌তে কত দেরী হ'বে?"

"বেশী নয়। সে এল বলে। আমি এইবার একবার বাজারে ক্যান্‌ভ্যাস কর্‌তে যাব, সে দোকান দেখ্‌বে।" "তবে বাবু, বলে রাখ্‌ছি, বেশী charge দিতে [illegible]।"

"[illegible] সেই সাহেব। তোমার বিয়ে হ'য়েছে, সাহেব শুনে আমার আহ্লাদ হ'চ্ছে। কত দিন হয়েছে?"

"অনেক দিন বাবু! যখন আমার বয়স প্রায় ১৬ বৎসর, তখন থেকে আমি তা'কে ভালবাসি—"

"বল কি? তোমার কল্‌জে ত' খুব শুক্‌নো দেখছি! বাব্‌লা কাঠের মত ঝাঁ করে' ধরে গেল?"

"হাঁ বাবু। সেই থেকে আমি মেমকে ভালবাসি। মেমও আমাকে খুব ভালবাসে।"

কথা শেষ হইতে না হইতে মেমসাহেব আসিয়া দোকানে প্রবেশ করিল। সাহেবকে দেখিয়া কমল মেঘাবৃত অমানিশার কথা ভাবিয়াছিল, কিন্তু মেমকে দেখিয়া সে বুঝিল মেম সত্যই সুন্দরী। তাহারই মত বয়সে ও গঠনে। মেম দোকানে প্রবেশ করিতেই সাহেব বলিল, "মেরী, এই সেই বাবু। আমি এঁকে একরকম সাজিয়ে দিয়েছি, তুমি এঁকে একটু motion শিখিয়ে দাও। তার জন্য charge করবে।"

মেম সস্মিত মুখে কমলের দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা।"

সাহেব তখন তাহার ধড়া-চূড়া পরিয়া, একটা ব্যাগ হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল। দোকানে মেরী, কমল ও একটা উড়িয়া বেহারা ছাড়া কেহই রহিল না।

(ঘ)

কমল তখন মেমসাহেবকে কহিল, "মেমসাহেব, আমাকে একটু মেয়েলী চাল্-চলন্ দুরস্ত করিয়ে দাও।"

মেরী হাসিয়া বলিল, "বাবু, তা' কি তুমি পার্‌বে? ছেলেরা কি মেয়ে সাজ্‌তে পারে?"

"খুব পারব মেম। তুমি শিখাও না। প্রথম বল তোমরা কি করে চল।"

মেরী হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা। প্রথম ডান পা ফেল।"

কমল ডান পা ফেলিল।

"এইবার বাম পা' ফেল। আর ডান পা' তুলিবার আগে পায়ে একটু টিপ্‌নি দাও।"—বলিয়া মেমসাহেব একবার নিজে হাঁটিয়া দেখাইয়া দিল।

কমল মেমসাহেবের অনুকরণ করিল। দেখিয়া মেরী হাসিয়া বলিল, "হ'ল না। ফের চেষ্টা কর।"

একবার-দুইবার করিয়া প্রায় মিনিট-পোনের চেষ্টা

নব কমল হতাশ হইয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়া মেরী বলিল, "বাবু, তোমার হ'বে না। তুমি এমনি স্বাভাবিক রকমেই চল। তাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না।"

কমল 'হাঁ' করিয়া তাহার মুখের দিকে কিছুকাল তাকাইয়া বলিল, "মেমসাহেব! একটা কথা তোমায় বলতে পারি?"

মেমসাহেবও নিকটস্থ একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিল, "কি?"

"কেন আমি এ সাজ্‌ছি জান?"

"থিয়েটার করবে?"

"না। আমি টাইপিষ্ট সাজ্‌বো।"

মেম একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, "সে কি?"

তখন কমল তাহাকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। শেষে কহিল, "দেখ মেমসাহেব, এ যা দেখ্‌ছি, তাতে এখন বছর দশেক প্র্যাক্‌টিস্ করলে তবে মেম হ'তে পারবো। এক ত এই উঁচু হিল্ ওয়ালা জুতা পরে আসমান দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখে সরষে ফুল দেখ্‌ছি। তা'র উপর তোমার ও কি চলন্ তা' দেখেও বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তাই বল্‌ছি, তুমি কি আমায় একটু সাহায্য করতে পারবে?"

"কি রকম ক'রে?"

"দেখ, তোমাতে আর মেমরূপী আমাতে বিশেষ তফাৎ নেই। বিশ্বাস না হয় ঐ আর্সিতে দেখ। প্রথম দিনটা আমি না হয় সে আফিসে যাই। কিন্তু আমার যে দাড়ি গোঁফের বালাই আছে, তাতে ঠিক যে স্ত্রীলোকই বরাবর থাকতে পারবো, তার আশা নেই। যদি কামাতে ভুলে যাই! তবে? মহা বিপদ হ'বে, মেমসাহেব। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে, সেই বড়বাবুকে একটু জব্দ করি। তুমি যদি দিন-কতক আমার হ'য়ে বাহির হও, তাহা হইলে দেখ, তোমায় এ সুট্ ত দিবই, এর উপর নগদ ১০০৲ টাকা। কেমন রাজী?"

মেমসাহেব কিছুক্ষণ ভাবিলেন। তার পর সম্মুখের আর্সিতে একবার নিজের চেহারা দেখিয়া লইলেন। কমল বলিল, "মেমসাহেব, তোমাকে দেখলে তা'রা কেন, বড়-সাহেবেরও মাথা বিগ্‌ড়াবে।"

"তা ত বুঝ্‌লাম বাবু। কিন্তু আমার সাহেব যদি রাজী না হয়?"

"খুব হ'বে। কেন হবে না, মেমসাহেব। দুদিনের জন্য বৈ ত নয়।"

"তুমি কি করে জানলে যে দু'দিন?"

"তার ব্যবস্থা আমি করেছি। তুমি রাজী ত?"

মেরী আবার কিছুক্ষণ ভাবিল। তার পর কহিল, "রাজী বাবু। তবে টাকাটার কিছু আমাকে আগে দিতে হবে।"

"বেশ্। কালই আমি তোমাকে টাকা দিয়ে যাব।"

বলিয়া কমল দাঁড়াইল। তারপর সেদিনের জন্ম যাহা খরচ তাহা মেমের হাতে দিয়া 'গুড্ বাই' বলিয়া বিদায় লইল।

সেখান হইতে কমল আপন মনে হাসিতে-হাসিতে সোজা রেকজ কোম্পানীর অফিসের দিকে চলিল। সে যাহা মনে ভাবিয়াছিল, তাহাই ঘটিয়াছিল। বিপিন সেদিন আফিসে আসিয়াই বড়-বাবুকে বলিল, "বড়বাবু, আপনি যে লেডী টাইপিষ্টের খোঁজ করেছেন, তাতে একটু সাবধান্ হবেন।"

ঘনশ্যাম কিছু বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেন?"

"বোধ হয় কমল বাবুই ফের মেম সেজে আস্‌বে। সে আজ আমাকে তাই আভাস দিলে।"

"বল কি? তবে তাকে শ্রীঘর যেতে হ'বে এবার। False impersonation বড় সোজা চার্জ নয়। একবার আসুক না দেখি। তা'র মত কমল আমি তিনশো সতেরটা দেখেছি।"

সুতরাং যখন কমল সেখানে উপস্থিত হইল, তখন বড়বাবু বিশেষই সতর্ক ছিলেন। কিন্তু সে এমন বেমালুম মেম সাজিয়াছিল, যে, তাহাকে চেনা বড়ই কঠিন হইয়াছিল। বড় ঘরের ছেলে; চিরকালই ঘৃত দুগ্ধে পালিত। রঙটা খুবই ফর্সা ছিল। তার উপর বুড়া স্মিথ সাহেব ও মেরীর তত্ত্বাবধানে তাহাকে একেবারে নিখুঁৎ মেম করিয়া তুলিয়াছিল। ঘনশ্যাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখিয়াও সহসা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

কমল একেবারে বড়সাহেবের নিকট তাহার আরজি পেশ্ করিল। বড়সাহেব কহিলেন, "বড়বাবুর কাছে যাও।

তিনি তোমাকে টেস্ট (Test) করিবেন, যদি ভাল রিপোর্ট হয়, এখনই তোমার চাকরী হইবে।"

কমল একটু হাসিয়া বলিল, "বাঙালীর কাছে?"

বড়সাহেব একবার মেমের হাস্যমণ্ডিত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তার পর নিজেও একটু লঘুভাবে কহিলেন, "আচ্ছা, তবে তুমি যদি তাহাতে রাজী না হও তা' হলে থাক্। কিন্তু আমার ত' সময় নেই।"

"আচ্ছা, আমায় নিয়োগ-পত্র দেওয়া হোক,—আমি বড়বাবুর কাছে যাচ্ছি।" বলিয়া মেম আবার একটু হাসিল।

সাহেব সে সুন্দর মুখ দেখিয়া ভুলিলেন; সে আঁখির চপল চাহনির পাকে আত্মহারা হইলেন। তখনই একখণ্ড কাগজে নিয়োগ-পত্র লিখিয়া দিলেন। মেম উঠিয়া একটু কুর্ণিশ করিয়া বাহিরে বড়বাবুর নিকট গেল। ঘনশ্যামবাবু মেমকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মেমসাহেব, টাইপ্ রাইটার কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঘনশ্যাম ব্যস্ত হইয়া টাইপ রাইটার দেখাইতে গেল। দেখিয়া মেমসাহেব কহিলেন, "বাবু, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?"

ঘনশ্যাম মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "তোমাকে টাইপ দেখাবার জন্য।" "ওঃ। তা'র জন্য? তা' আমাকে কি পরীক্ষা দিতে হ'বে?"

"হাঁ।"

"কেন বড়বাবু? তুমি ত' মনে করলেই একখানা ভাল রিপোর্ট আমাকে দিতে পার। সবই ত' তোমার হাত।"

এমন মোলায়েম করিয়া মেম কথা কহিল যে, ঘনশ্যাম কি করিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। মেমসাহেব তখন এক অপরূপ কাণ্ড করিয়া বসিল। খাঁ করিয়া বড়বাবুর হাত ধরিয়া বলিল, "বাবু, থ্যাঙ্কস্। তুমি যে আমাকে Test করলে না, তার জন্য থ্যাঙ্কস্। আর আমি ত' তোমার লোক হ'য়েই থাক্‌বো,—তখন তুমি যা মনে কর্‌বে, আমি তাই কর্‌বো;—বুঝ্‌লে?"

ঘনশ্যামের হাতে মেমসাহেবের স্পর্শটা বেশ নারী-জনোচিত বলিয়া মনে হইল না। তবু তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া মেমের হাসিতে নিজের নির্বুদ্ধিতার হাসি মিশাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা মেমসাহেব। তাই হ'বে।"

মেমসাহেব তখন আবার থ্যাঙ্কস্ দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় ঘনশ্যামের দিকে একবার সহাস্য কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া গেল। সে হাসির আলোকে ঘনশ্যামের 'চিদ্‌ঘনের' অন্ধকার কাটিয়া যাইবার পূর্ব্বেই বিপিন তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল, "বড়বাবু! চিন্‌তে পেরেছেন?"

ঘনশ্যাম চকিতের মত বলিল, "কা'কে?"

"কমলকে? ঐ যে মেমসাহেব সেজে এসেছিল গো, নিয়োগ-পত্র নিয়ে গেল যে।"

"বল কি? না! না।"

"আর না! যাবার সময় আমার সঙ্গে কথা ক'য়ে গেল।" ঘনশ্যাম দাঁতে দাঁত দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘনশ্যামের সে রাত্রে সুনিদ্রায় যাথাত যথেষ্টই ঘটিল। আজ পর্য্যন্ত খুব কড়া লোক বলিয়া, আর অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ বলিয়া তাঁহার মনে একটা আত্মাভিমান ছিল, কিন্তু আর সেটা অটুট অক্ষুণ্ণ রহিল না।

অনেকটা রাত্রি পর্য্যন্ত শুইয়া ঘনশ্যাম ঠিক করিলেন যে কমলকে ইহার উচিত মত শিক্ষা দিতে হইবে। ঐ আহাম্মক, বিপিনটা! একটু পূর্ব্বে যদি আভাস দিতে পারিত, তবে ত' এতক্ষণে কমল হাজতে থাকিত! আচ্ছা। নিঃ এখনও যায় নাই। সে নিজেকে ধরা দিয়াছে। শ্রী দুর্গা— স্বামীর অন্যমনস্কতার কারণ দু'একবার জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাইল না।

পরদিন ঘনশ্যামবাবু আফিসে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বদিনের লেডী নিজের আসন অধিকার করিয়া, টাইপ রাইটারের চাবিগুলি পরীক্ষা করিতেছে। দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রাগে কম্পিত হইল। বলিলেন, "মেম সাহেব, কখন এসেছ?"

মেমসাহেব একটু অর্থপূর্ণ হাসিয়া কহিল, "কেন বাবু ঠিক সময়েই ত' এসেছি। বরং তোমারি লেট্ হ'য়েছে; তা' তুমি বড়বাবু কি না।"

ঘনশ্যাম মনে মনে ভাবিলেন, "উঃ কি ভয়ানক। আচ্ছা!"

তার পর ঘনশ্যাম ভাবিলেন, তাইত! কি করিয়া তাহাকে অপদস্থ করা যায়! কিন্তু ঘনশ্যাম যখন উপায়োদ্ভাবনের জন্য মাথা ঘামাইতেছিলেন, তখন নবীনা টাইপিষ্ট আপন মনে টাইপ রাইটারের শ্রাদ্ধ-কার্য্য করিতে নিযুক্তা ছিলেন।

হঠাৎ একটি উপায় মনে আসিল। ঘনশ্যাম উঠিয়া একেবারে বড়সাহেবের কামরায় হাজির হইলেন। সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "কি বাবু?"

ঘনশ্যাম উত্তর দিলেন, "সাহেব, কাল যে লেডী টাইপিষ্ট নিযুক্ত করেছ, ও লেডী নয়।"

সাহেব সবিস্ময়ে বলিল, "সে কি ?"

"হাঁ, সাহেব। ওটা মস্ত জোচ্চোর। আমাদের আফিসের যে টাইপিষ্ট ছিল, সেই মেম সেজে false personation করেছে,—তুমিও চিন্‌তে পার নাই, আমিও পারি নাই।"

"তাই না কি,—আচ্ছা তাকে ডাক ত'!" বলিয়া বড় সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঘনশ্যাম প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, একেবারে ওকে Police এর হাতে দাও। আর গোলযোগ করে কাজ নাই।"

ঘনশ্যাম বুঝিলেন যে, সাহেব আপনার মূর্খতা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। বাহিরে আসিয়া, দরওয়ানকে দুজন পাহারাওয়ালা ডাকিতে আদেশ করিয়া, যেখানে টাইপিষ্ট বসিয়া ছিল, সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ম্যাডাম, তুমি ওঠ ত একবার।"

ম্যাডাম না উঠিয়াই হাস্য-বিলাসের সহিত কহিল, "কেন বাবু ?"

"ওঠ না। তোমাকে পরীক্ষা করব।"

"কিসের জন্য ?"

"তোমার বডি সার্চ্চ করবো।"

মেমসাহেবের মুখ শুকাইয়া গেল। তবু জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়া কহিল, "বাবু, তুমি ঠাট্টা করছো !"

বড়বাবু চটিয়া উঠিয়া, সুর চড়াইয়া বলিলেন, "ঠাট্টা নয় ম্যাডাম। ওঠ বলছি! জোচ্চুরির জায়গা পাওনি ?"

মেমসাহেব নির্ব্বাক, নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। দেখিয়া ঘনশ্যাম তাহাকে চেয়ার হইতে তুলিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া—সর্পাহতের মত পিছাইয়া আসিল! মেমসাহেবও চীৎকার করিয়া উঠিল! বিপিন ক্যাস্ হইতে ঘুল-ঘুলির ভিতর দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বড়বাবু ?"

বড়বাবুর কপালে তখন স্বেদবিন্দু দেখা দিয়াছে! বিপিনের কথা শেষ হইতে না হইতে একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই বড়বাবুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বড়বাবু! নমস্কার? কেমন চল্‌ছে ?"

ঘনশ্যাম মুখ ফিরাইয়া দেখিল, কমলকুমার!

চির-শ্যাম

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ]

তুমি শ্যাম, তাই তোমার ধরণী এত শ্যামে শ্যামে ভরা।
নয়নাভিরাম তুমি, তাই আঁখি জুড়ায় শ্যামল ধরা'॥
বাজাইলে বাঁশী—তাই কাণ দিয়া,
এই নিখিলের মরমে পশিয়া,
কূজনে গুঞ্জে কলতানে, আজো মানবের মনোহরা।
ফাগে ফাগে তুমি খেলেছিলে দোল,
ফাগুনের বনে তাই কলরোল,
বাগে বাগে তাই অশোক পাটলে, শোভা লালেলাল-করা।
গোকুলের হৃদি করিলে হরণ,
তাই দেহে দেহে চুরি যায় মন,
তাই গেহে গেহে ওই পায়ে পায়ে, প্রেমের শিকলি পরা॥

সুর ও স্বরলিপি

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

সা না II ।র্স -া া । া ধা -া । ধা না ধা । পা পা পা I
তু মি শ্যা ॰ ম ॰ তাই ॰ তো মা র প র ণী

রা গা মধা । পা মগা মা । রা সা া । া র্সা না ; I
এ ত শ্যা॰ মে শ্যা॰ মে ভ রা ॰ ॰ "তু মি"

সা সা I ।মা গা মা । -পা ধা পা । া পা -সা । ধা না ধা I
ন য় না ভি রা ম তু মি ॰ তা ই আঁ খি জু

[র্সা না]
ড়ি

I পা া -া । মা গা ম । রা মা -া । া সা সা ; II
ডা ॰ য় শ্যা ম ল ধ রা ॰ ॰ "ন য়"

অন্তরা

-া -া II পা পা ধা । পা র্সা র্সা । র্সা র্র্সা র্সা । -া সা সা
॰ ॰ বা জা ই লে বাঁ শী তা॰ ॰ই কা ণ দি য়া

I না র্সা র্রা । র্রা র্রা -া । র্সা না র্সা । ধা পা পা I
এ ই নি খি লে র ম র মে প শি য়া

I র্সা র্সা র্সা । ধা -না ধা । পা পা মা । গা রা গা I
কু ঞ্জ নে গু ঞ্জে ক ল তা নে, আ জো

I মা পা মা । -গা গা মা । রা সা -া । -া র্সা না II
শী ত বে দ ম নো হ রা ॰ ॰ "তু মি"

শোক-সংবাদ

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ আর ইহলোকে নাই। হঠাৎ পক্ষাঘাত-রোগে তিনি অকালে চলিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে বিদ্যাভূষণের নাম জানেন না, শিক্ষিত সমাজে এমন লোক নাই। যেখানে যখন যে কোন সদনুষ্ঠান হইয়াছে, যেখানে যে সভা-সমিতি হইয়াছে, তাহাতেই বিদ্যাভূষণ থাকিতেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে, অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনি বৌদ্ধ-শাস্ত্রের চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন; পালি-সাহিত্যে তাঁহার



মহামহোপাধ্যায় ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

অসাধারণ অধিকার ছিল। এত বড় পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, কিন্তু বিদ্যাভূষণকে দেখিলে, তাঁহার সহিত কথা বলিলে সহসা কেহ তাহা বুঝিতেই পারিতেন না;—যাহাকে মাটীর মানুষ বলে, তিনি তাহাই ছিলেন; গর্ব্ব, অহঙ্কার কিছুই তাঁহাতে ছিল না। কত জন যে কত ভাবে তাঁহার কাছে উপকার পাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু কালের আহ্বানে এমন মহাপুরুষ আত্মীয়-স্বজনকে কাঁদাইয়া, অকালে [illegible] ত্যাগ করিলেন। [illegible] সমাজের এক মহারত্ন চলিয়া গেলেন। আমরা কি বলিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের এই গভীর শোকে সান্ত্বনা প্রদান করিব?

শরৎকুমারী চৌধুরাণী

বিদুষী, মনস্বিনী, সুলেখিকা, পূজনীয়া শরৎকুমারী চৌধুরাণী দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার একটু পরিচয় দিই। তিনি পরলোকগত সুকবি অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ছিলেন, সহযোগিনী ছিলেন। স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর এই সুদীর্ঘকাল তিনি একমাত্র কন্যার লালন পালন, সাহিত্য-সেবা ও সর্ব্বোপরি 'মহিলা-সমিতি'র উন্নতি বিধানে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'শুভদৃষ্টি' একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক মাসিক পত্রিকায় সর্ব্বদা প্রবন্ধাদি লিখিতেন; আমাদের 'ভারতবর্ষে'ও তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি শিক্ষিতা মহিলার আদর্শ-স্থানীয়া ছিলেন; আমরা তাঁহার কাছে যে আদর, যে স্নেহ পাইয়াছি, তাহা কোন দিন বিস্মৃত হইব না। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান নাই; একমাত্র কন্যা ও জামাতাকে লইয়াই তিনি এতদিন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এতকাল পরে তিনি তাঁহার প্রিয়তম স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন; আমরা তাঁহার পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিব না। ভগবান তাঁহার আজীবন সাধনা সম্পূর্ণ করিলেন, তিনি আনন্দলোকে চলিয়া গেলেন।

রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর

পূর্ব্ববঙ্গের ভাগ্যকুলের ধনীবংশের মুকুটমণি সীতানাথ রায় বাহাদুর পরলোকগত হইয়াছেন। ভাগ্যকুলের বাবুদের ধনের খ্যাতি দেশ-বিখ্যাত; কিন্তু সীতানাথ বাবু অগাধ বিত্তের, প্রভূত ধনের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই এত প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই; [illegible] [illegible]



রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর

তৈষী, স্বাধীনচেতা ব্যক্তি অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার মহাজন-সভার তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন; কলিকাতা মিউনিসিপালিটী, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতির সদস্যরূপে তিনি তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি, বিচক্ষণতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখাইয়া গিয়াছেন। দেশ-হিতকর কার্য্যে তিনি ও তাঁহার উপযুক্ত [illegible] শ্রীযুক্ত রাজা [illegible] রায় ও শ্রীযুক্ত রায় [illegible] যে [illegible] অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সীতানাথ বাবু অক্লান্তভাবে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ লোকের সংখ্যা বড় কম নহে; বিলাতী বড় বড় লোকেরা তাঁহার গুণের [illegible] করিতেন। এই সময়ে তাঁহার ন্যায় কর্ম্মী ব্যক্তির অভাব আমাদের দেশে বিশেষভাবে [illegible] ভগবান তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে [illegible] করুন।

অজ্ঞাত কবি

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

বিজন বনের এই ধূলি-তলে
ঘুমায়ে রয়েছে অচিন্ কবি,
জগতের পটে পারেনি আঁকিতে
পরাণের প্রিয় আশার ছবি।
গোপন রহিল মরমের কথা,
নীরব রহিল বীণার তান,
বধির বিশ্ব শুনে নাই কভু,
পল্লী-কবির প্রাণের গান।
বুঝেছিল যারা হিয়ার সে সুর,
শুনেছিল যারা কবির গান;
তোলেনি ত' তারা মানবের মত
পল্লী-কবির মূরতিখান।
তাই যে গো, তারা রহিয়াছে ঘিরি
কবির বিজন সমাধিখানি,
হরিতেছে তার চিত্ত-বেদনা
নিত্য নূতন অর্ঘ্য আনি।
গন্ধ-আকুল মঞ্জুল ফুল
কণ্ঠে পরায় জয়ের মালা,
মন্দ-মধুর স্নিগ্ধ পবন
জুড়ায় তাহার বুকের জ্বালা।
তটিনীর কল-কল্লোল তানে
মন্দ্রিত তার জয়ের গান,—
চাঁদের রজত মধু-জোছনায়
আলো হয়ে আছে সমাধিখান।
স্বর্গলোকের লক্ষ পরীরা
তপোবনে তার আসিছে নিতি,
পারিজাত ফুলে সাজায় সমাধি—
অন্তরে ঢালে পুণ্য প্রীতি।
বিজন বিপিনে নন্দন রচি
নিদ্রিত আজি পল্লী-কবি,—
জগতের পটে পারেনি তবু সে
আঁকিতে হিয়ার গোপন ছবি!

সাহিত্য-সংবাদ

৷৷০ আনা সংস্করণের ৫১ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ প্রণীত "নাচওয়ালী" প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রণীত নূতন উপন্যাস "পাগল" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৷ টাকা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন নাটক "কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১, টাকা।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "বাদশা পির" প্রকাশিত হইল। মূল্য ২, টাকা।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "নিষ্পত্তি" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১৷০ সিকা।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন পাইন প্রণীত নূতন নাটক "হরিদাস" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১, টাকা।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পূর্ণিমা" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১৷০ সিকা।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত এম-এ, ডি-এল প্রণীত "অগ্নি-সংস্কার" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১৷৹ টাকা।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "পল্লী মোড়ল" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১৷০ টাকা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "পুণ্যস্মৃতি" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১৷০ টাকা।

শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন ঘোষের—"সাধের বিয়ে" প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম-বি সম্পাদিত "শিশু-পালন" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আট আনা।

[illegible] অহঙ্কার।
[illegible] তাহারে [illegible]

Publisher: [illegible] Hariдas Chatterjea,
[illegible], Gurudas Chatterjea & Sons,
[illegible] Street, CALCUTTA.

Printer—[illegible] Nath,
The [illegible] Printing Works,
[illegible]